পাঁচটি উপন্যাস
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচি

মৃন্ময়ী

এক

শেষ পর্যন্ত সাদুল্লা আমগাছটায় মুকুল আসায় বাবার গাছ লাগানো যেন ষোল আনা সার্থক। বাবার একটাই দুঃখ ছিল, গাছের কলমটা তাহলে সৈয়দ আলি ঠিক দেয় নি। সব গাছে মুকুল আসে, এটায় আসে না কেন—হাতের দোষ মনে করতে পারেন না। তবে তো সব গাছই বাঁজা থাকত। মাটির দোষ মনে করতে পারছেন না, তবে তো কোন গাছেরই এত বাড় বাড়ন্ত হত না। পরিচর্যার অভাব, তাই বা কি করে ভাবেন—গাছের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা তল্লাটের কে না জানে।

আমার কলেজের সহপাঠী মুক্ল পর্যন্ত একখানা সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে বাবাকে। গাছতলায় মাদুরে শুয়ে মুক্লের কেন জানি মনে হয়েছিল, এমন গাছপালা নিয়ে ঘরবাড়ি বাবার মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কথাটা বাবার কানে উঠতেই বলেছিলেন, এরা বেঁচে থাকে বলে মানুষ বেঁচে থাকে। পাখপাখালি উড়ে আসে। কীটপতঙ্গ ফড়িং প্রজাপতি কী নেই বাড়িটাতে। একটা বাড়ির এ সবই হ'ল গে শোভা। মানুষ কেন বোঝে না এটা, তিনি তার মানে ধরতে পারেন না।

নতুন গাছের প্রথম পাকা আমটি গৃহদেবতার ভোগে দেওয়া হয়। তারপর আমরা। আরও পরে প্রতিবেশীরা। এবং নতুন গাছের আম কেমন সুস্বাদু খেতে, সবাই না জানলে গাছটা লাগানোর সার্থকতা যেন তাঁর কাছে থাকে না।

ঘরবাড়ির বিষয়ে বাবা বড় সতর্ক থাকেন। মুকুল সাইকেলে আসে। সে শহরে থাকে। এই আসা-যাওয়াটা বাবার কাছে ভারি গর্বের বিষয়। বড় পুত্রের সহপাঠী এবং বন্ধু—তিনি তাকে নিজ হাতে আম কেটে না খাওয়াতে পারলে শান্তি পান না। থালায় সাজানো কাটা আম। লাল টকটকে আভা বের হচ্ছে। কাটার আগে তার নানাবিধ প্রক্রিয়া—অর্থাৎ আমটির বোঁটা কেটে ফেলে জলে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া, এতে ভেতরের কস মরে যায়। ঝাঁঝটি থাকে না। আম খাওয়ার নিয়মকানুন বাবা এত সময় ধরে বোঝাতে শুরু করেন যে মুকুল বিরক্ত না হলেও আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

এ সময় মুকুল বড় বেশি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। গাছতলায় মাদুর বিছিয়ে দুই সমবয়সী তরুণের তখন কথোপকথন এ রকমের—

—তুমি বিলু রাগ কর কেন বুঝি না। মেসোমশাই এতে এক ধরনের তৃপ্তি পান। আমার তো বেশ ভাল লাগে শুনতে। দেশ ছেড়ে এসে কত কষ্ট করে বাড়িঘর বানিয়েছেন, গাছপালা লাগিয়েছেন, তাঁর গর্ব তো হবেই।

আসলে মুকুল আমাকে প্রবোধ দেয়। বাবার ব্যবহারে কেউ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এটা সে চিন্তা করতেই পারে না।

চৈত্রের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। বৈশাখের খর রোদে কখনও আমরা সাইকেল চেপে বাদশাহী সড়কে উঠে যাই। ঘরবাড়ির আকর্ষণের চেয়েও কি এক বড় রহস্য আমাদের বাইরে টানে। বাদশাহী সড়কের দু-পাশে গাছপালা—কখনও ছায়া, কখনও রোদ্দুর—আমরা তার ভেতর দিয়ে ছুটি।

আমদের ছুটতে ভাল লাগে।

আমাদের কেউ দেখতে পায়, ধূ ধূ মাঠের উপর দিয়ে দুই সাইকেল আরোহী যাচ্ছে। কেউ দেখে, কোনো গাছের নিচে বসে আছি আমরা।

আবার কোনো নদী পার হয়ে যাই।

জ্যোৎস্না রাতে আমরা দুজন বন্ধু মিলে কখনও চলে যাই জিয়াগঞ্জে। গঙ্গার জল নেমে গেছে। বালির চরা জেগেছে। হাঁটু জল ভেঙে সেই চরায় উঠে রাতের জ্যোৎস্না দেখি। নক্ষত্র দেখি। দূরে শ্মশান।

আমাদের মধ্যে ক্রমে এক নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। বোধহয় কোন গভীর রহস্যময় বনভূমিতে ঢুকে যাবার আগে সবার এটা হয়।

অর্থহীন ঘোরা। লালদীঘির ধারে সাইকেলে চক্কর মারি। কথা আছে কেউ এই পথ দিয়ে যাবে। আমরা তাকে দেখব সে নারী, তার নারী মহিমা ঝড়ো হাওয়ার মতো আমাদের কিছুক্ষণ বিহ্বল করে রাখে।

আসলে লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর আমি আর কালীবাড়িতে থাকতে পারি নি। একজন নারী জীবনের চারপাশে না থাকলে কত অর্থহীন, সেই দেবস্থানে তা প্রথম টের পাই। লক্ষ্মী আমার কে হয়, কি হয় জানি না, কিন্তু লক্ষ্মী না থাকলে দেবস্থানের গাছপালার পাতা নড়ে না, ঝিলের ঘাটটা বড় নির্জন, রেললাইন কোনো দূরের কথা বলে না, এটা টের পেয়েছিলাম। এক গভীর বিষণ্ণতা আমাকে তিলে তিলে গ্রাস করছিল। বাড়ি এলে বাবা মুখ দেখেই টের পেয়েছিলেন, কিছু একটা আমার হয়েছে। বাবা, মা, ঘরবাড়ি, ভাইবোন সবাই মিলে কত সহজে সেই গভীর অন্ধকার থেকে আবার আমাকে আলোয় পৌঁছে দিয়েছিল।

বাবা বলেছিলেন, তবে বাড়িতেই থাক। আর যেয়ে কাজ নেই। দেখি মানুকে বলে দু' একটা টিউশন ঠিক করে দিতে পারি কিনা।

টিউশন ঠিক হল, তবে শহরে নয়। মিলের ম্যানেজারের কোয়ার্টারে। তার দুই মেয়ে—অষ্টম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রী। শহরের স্কুলে তারা ঘোড়ার গাড়িতে যায়। কুড়ি টাকা দেবে। রোজ সকালে তাদের এখন পড়াবার দায়িত্ব আমার। একটা পুরানো সাইকেল এখন আমার নিত্য সঙ্গী। দু-চার ক্রোশের দূরত্ব আমার কাছে কোন আর সমস্যাই নয়।

সাইকেলটার সঙ্গে আমার মেজ ভাই পিলুর বড় বেশি শত্রুতা। কোনো কারণে সাইকেল না নিয়ে বের হলে, পিলু তার উপর খবরদারি করবেই। সাইকেলটার কিছু না কিছু অঙ্গহানি না করে সে ছাড়বে না।

পিলু কেন বোঝে না এই সাইকেলটা আমাকে আবার নিরাময় করে তুলেছে। লক্ষ্মীর অপমৃত্যুতে সহসা আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম—যেন সে আমার সব শক্তি হরণ করে নিয়ে ঝিলের ওপারে উধাও হয়ে গেল। বাবা, নিবারণ দাসের আড়ত থেকে সাইকেলটা নিয়ে না এলে আমার মধ্যে আবার বেগের সঞ্চার হত না। সাইকেলটার খবর দিয়ে বাবা বলেছিলেন, তুমি দেখ সাইকেলটা চড়তে পারো কি না। আমার সঙ্গে অবশ্য পিলুও সাইকেলটা আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। সে বলত, দিবি দাদা তোর সাইকেলটা, চড়ব।

পিলু সাইকেলটার হ্যাণ্ডেল ধরে রাখত। আমি ওপরে উঠে চালাবার চেষ্টা করতাম। বাবা যজন যাজন সেরে ফেরার পথে আমার আবার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে দেখলে শান্তি পেতেন। বলতেন, সাবধানে চালিও। হাত পা কেট না। হাত পা কাটলেও তেমন কিছু আসত যেত না। কারণ বাড়ির সীমানায় ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া। তার কষ ক্ষতস্থানে বড় উপকারী। বড় হতে হতে গাছপালার গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদেরও অনেক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে। সাইকেলটা যে আমার পিলু বোঝে। সে কারণে-অকারণে চড়তে পারলেই খুশি। বড় বেশি জোরে চালাবার স্বভাব। সাইকেলটা ওর নয় বলে কেমন মায়া দয়া কম। কখনও স্পোক ভেঙে রাখে, কখনও হ্যাণ্ডেল বাঁকিয়ে ফেলে। পুরানো লজঝরে সাইকেলে যে যত্ন নিয়ে চড়তে হয় সেটা সে বোঝে না।

সাইকেলটায় চড়ে বসতে পারলে কেন জানি মনে হয়, সামনের দূরত্ব বড় কম। রেল-লাইন, টাউন-হল, পুলিশ ব্যারাক, খেয়াঘাট সব বড় কাছে। গায়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। নিজেকে বড় হাল্কা মনে হয়। সারা আকাশ জুড়ে মেঘ সঞ্চার হতে শুরু করলে, সাইকেলটা ঘর থেকে বের করে নিই। তারপর যেদিকে চোখ যায় উধাও হয়ে গেলে টের পাই ভেতরের সব মেঘ কখন কেটে গেছে। বাবা কি করে যে টের পান সংসারে বেঁচে থাকতে হলে বিলুর এখন একখানা সাইকেলের দরকার, যে বয়সের যা।

মিলের টিউশনির খবরটা এনেছিলেন নরেশ মামা। বাবার দেশ-বাড়ির সঙ্গে নরেশ মামার কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। ওরা আমাদের জমিটা পার হলে যে আম বাগানটা ছিল সেখানে বাড়িঘর তুলে কিছুদিন ধরে আছেন। বনটা যথার্থই এখন একটা কলোনি হয়ে গেছে। চার পাঁচ বছর আগেকার

সেই নিরিবিলি ভাবটা একেবারেই নেই। রাস্তাঘাট হচ্ছে। পুলিশ ক্যাম্পের সামনে সারবন্দি সব ঘরবাড়ি উঠে গেছে। নিশি করেরা তিন ভাই। সবাই দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। বাবাই চিঠি দিয়ে খবরটা জানিয়েছিলেন। জলের দরে জমি। চলে এস। পরে এলে আর ফাঁকা পড়ে থাকবে না। ফলে আমাদের বাড়ির লপ্তে পর পর সব বাড়িগুলি, বাবার দেশ-গাঁয়ের মানুষে ভরে যেতে শুরু করেছে।

জমির বিলি বন্দোবস্ত রাজবাড়ির উপেন আমিনকে দিয়ে করানো হচ্ছে। টাক মাথা মানুষটি। গোলগাল চেহারা। জামা কাপড় ফিটফাট। বিক্রমপুরে বাড়ি। কথায় কথায় বিক্রমপুরের মানুষ বলে এক ধরনের গর্ব দেখানোর চেষ্টা আছে। এদিকটায় এলে, একবার হাঁক দেবেনই, বাঁড়ুজ্যে মশাই আছেন।

সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনলেই বোঝা যেত আমিন এসেছে। তার সঙ্গে থাকে যদুপতি বলে একজন পেয়াদা। মাথায় লম্বা জোকারের মতো টুপি। কোমরে বেল্ট। তাতে ছাপ মারা কাশিমবাজার রাজ এস্টেট। এই ছাপটি দেখিয়ে সে এখন বাড়তি পয়সা কামায়। গায়ে খাকি শার্ট, পায়ে কেডস্। হাফপ্যান্ট খাকি রঙের। চুল সজারুর মতো খাড়া। খ্যাংরা কাঠি আলুর দম হয়ে উপেন আমিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের হাসি পায়। চালচলনে রাশভারি, গম্ভীর কথাবার্তা—এ জমিতে কেন, এখানে কার গরু? এ গাছ কে কেটেছে! বাঁশঝাড়ে হাত দাও কেন? রাজবাড়িতে নালিশ ঠুকে দেব। জমি এখনও সব বিলিপত্তন হয় নি বলে, সবাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, সীমানা বাড়িয়ে নেবার। যদুপতির বড় সতর্ক নজর। কাঠা, দুকাঠা বাড়তি জমি একটা বিড়ি খাইয়েও কেউ কেউ সীমানার মধ্যে টেনে নিয়েছে। যদুপতিকে কিছু দিলেই হল। একখানা পেঁপে। তাই সই। একফালি কুমড়ো, তাতেও খুশি। যদুপতির ব্যাগটায় উঁকি দিলে এমন সব নিদর্শন পাওয়া যাবে বলে, পিলুর বড় ওর পাশে ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। পিলু বলবে, দেখি আজ তোমার কি আদায় হল।

যদুপতি বলবে, হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি আমার ঝোলা দেখছ কেন?

পিলু বলবে, ল্যাংরা বিবির হাতায় বসতে দেবে বল?

—মাছ নেই।

—হ্যাঁ আছে।

—ও তো দেড়মণি দু-মণি মাছ। তোমার কম্ম নয় তোলার।

—যদুপতিকা, তুমি একবার দিয়েই দেখ না।

যদুপতি একলা না যে দেবে। যদুপতির সঙ্গে আরও একজন পেয়াদা এই তল্লাটে ঘুরে বেড়ায়। রাজা না জানলেও, ওরা জানে এই সুমার আমবাগান এবং বনভূমি ছাড়া কোথায় কি হাতা আছে, পুকুর দীঘি আছে—কোনটায় কি মাছ বড় হচ্ছে—কাগে বগে সম্পত্তি ঠুকরে না খায়, সেজন্য দিনমান সাইকেলে চক্কর দিয়ে বেড়ানো। পাহারার কাজ যদুপতির।

এই যদুপতি আগেও এসেছে। তবে খুব কম। তখন সে আমার বাবার কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকত না। বনভূমির মধ্যে বাবা একলা সাহস করে বাড়ি ঘর বানাচ্ছে দেখে সে কিছুটা তাজ্জবই বনে গেছল। তার ভাবনা, এত বড় গভীর বনে কে যে বাবার মাথায় এমন একটা দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে! তবু রাজবাড়ির স্বার্থ বলে কথা—যার নুন খেতে হয় তার গুণ গাইতে হয়। জমি যে নিষ্ফলা নয় সেটাই ছিল বাবার কাছে যদুপতির একমাত্র সান্ত্বনা। সান্ত্বনা দিয়ে বলত, বসে যখন গেছেন, তখন আর ঠেকায় কে। দেখুন না কি হয়! পাকিস্তান একেবারে উজাড় করে সব বেটারা পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসছে। শহরের এত কাছে এমন খোলামেলা জায়গা আর কোথায় পাওয়া যাবে! যদুপতিও জানত, বাবা যা একখানা মানুষ, কখন না জানি আবার লোটা কম্বল নিয়ে গরুর গাড়িতে ফের উঠে বসেন। সেই ভয়ে সে সব কাজেই বাবাকে বাহবা দিত। একটা গাছ লাগালেও। তা আপনার হাত লেগেছে গাছ কথা না কয়ে পারে! একজন বাড়িঘর করে যখন বনটায় বসে গেছে তখন আবাসযোগ্য জায়গা অন্যের ভাবতে কষ্ট হয় না। বাবা চলে গেলে সেটাও যাবে। ফলে যদুপতি এদিকটায় খুব কমই আসত। যেন ভয়, এসেই দেখবে আর ঘরবাড়ি নেই। বাড়ির মানুষজন সব চলে গেছে। কারণ যদুপতি এলেই বাবার তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন, আর কে নিল জমি?

—তিনখানা দরখাস্ত পড়েছে।

—কে নিল জমি?

—সন্তোষ সরকার পীলখানার পাশের জমিটা নিয়েছে।

—কে নিল জমি?

—টাঙ্গাইলের সরকাররা।

জমির বিলি বন্দোবস্তের কথা বলে একখানা পরচা বাবার চোখের সামনে মেলে ধরত। বলত, দেখেন, সোজা রাস্তাটি যাবে কারবালার সড়কে। বাদশাহী সড়ক থেকে আর একটা রাস্তা যাবে মিলে। এই যে আমবাগান দেখছেন, এখন দু'শ টাকা বিঘা প্রতি উঠেছে। এখানটায় বাজার হবে। এটা স্কুলের মাঠ। বাবা পরচা দেখে কেমন আবেগের সঙ্গে বলতেন, হলেই বাঁচি। বিলুটার যা হোক একটা গতি হল। পিলুটা না হয় যজমানি করবে। ছোটটাকে নিয়েই ভাবনা। কোথায় যে পড়াশোনা করবে!

যদুপতির কথাই শেষ পর্যন্ত ঠিক। নরেশ মামা এসে একটা স্কুলেরও গোড়াপত্তন করে ফেললেন। একা মানুষ। চুল ছোট করে ছাঁটা। হাঁটুর ওপর কাপড় পরেন। গায়ে ফতুয়া। রেওয়া রাজস্টেটে কাজ করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে চলে এসেছেন। স্ত্রী বেঁচে নেই। ছেলে আসানসোলে কোন এক কারখানায় কাজ করে। মেয়েরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ঝাড়া হাত পা। মানুষকে বসে থাকলে চলে না, কিছু একটা করতে হয়। তিনিই বাড়ি বাড়ি গিয়ে বললেন, কিছু দাও। একটা ঘর খাড়া করি। নরেশ মামা একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। কলোনিতে তাঁর কথা কেউ ফেলতে পারে না। এমন একজন মানী ব্যক্তি বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত পাতলে কে আর না দিয়ে থাকতে পারে। বাবাও দিলেন, জমির খড় এবং বাঁশ। বললেন, চৌধুরী মশাই, নগদ টাকা তো হবে না।

চৌধুরী মামা এতেই খুশি। তিল সঞ্চয় করলে তাল হয় সে কথাটিও বলে গেলেন। চৌধুরী মামাদের বাড়ির পরে একটা ডোবা এবং বাঁশের জঙ্গল এখনও চোখে পড়ে। ওটা কিনেছে পরাণ চক্রবর্তীরা। বামুনের বাড়ি হওয়ায় বাবার যে মৌরসীপাট্টা ছিল, সেটা যাবার ভয়ে কেমন তিনি কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ ছিলেন। বাড়িতে গৃহদেবতা আছে, না নেই, সে সব খবর সংগ্রহ করে এনে একদিন বলেছিলেন, বুঝলে ধনবৌ, বাড়িতে ঠাকুর নেই সে আবার কেমন বামুন। মা-ও বলেছিল, দেখ কি জাত! এ দেশে এসে তো সবাই কায়েত বৈদ্য বামুন হয়ে গেল। জাতের আর বাছবিচার থাকল না।

নরেশ মামা আমাকে একটু কেন জানি অন্য চোখে দেখেন! আমাকে দেখলে দাঁড়িয়ে যান। পড়াশোনার খবর নেন। এবং আমি যে খুব মেধাবী এটাও তাঁর খুব কেন জানি মনে হয়। আচার-আচরণে আমার প্রতি তাঁর একটা কেমন স্নেহপ্রবণ মন আছে বুঝতে পারি। এটা হয়ত আমিই এই অঞ্চলটার একমাত্র কলেজ-পড়ুয়া বলে কিংবা আমার মধ্যে এমন কিছু গোপন বিনয় থাকতে পারে যা কোন বিদ্যোৎসাহীকে বিদ্যাদানের জন্য উৎসাহ যোগায়। আমাদের সংসারে যে বড় বেশি অভাব আছে তাও তিনি টের পান। তাঁর কাছেই খবর পাওয়া গেল, মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরীর বাবা নরেশ মামার গাঁয়ের লোক। খবরটা বাবাই নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, বুঝলে ধনবৌ, মহজুমপুরের মনমোহন চৌধুরীকে মনে আছে? রাসুর বিয়েতে গিয়েছিলেন।

মা মনে করার চেষ্টা করলে বাবা বললেন, মনে নেই জোয়ান মানুষটা হেই বড় একটা লম্বা ঢাইন মাছ বরদির হাট থেকে জেলেদের দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মার বোধহয় তখন বালিকা বয়স। বাবার বোধহয় তখন কৈশোর কাল—সে যাই হোক মা সহসা মনে করে বললেন, হ্যাঁ গালের একটা দিকে শ্বেতী আছে না।

—ওঁরই ছেলে মিলের ম্যানেজার। আমাদের দেশের লোক।

আমার তখন যথেষ্ট ক্ষেপে যাবার কারণ থাকে। এই একটা সমাচার—বাবার দেশের লোক মিলের ম্যানেজার—এখন এই সম্বল করে না আবার নিবারণ দাসের আড়তে চলে যান। যার এতদিন শুধুই পুত্র-গৌরব সম্বল ছিল, সে আর একটা গৌরবের হদিশ পেয়ে না আবার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে যান এটা আমি চাই না। তাঁর দেশের লোক একজন ম্যানেজার হয়েছে ত কি হাতি ঘোড়া হয়েছে!

বাবা স্নানে যাবার আগে কথা হচ্ছিল। শীতকাল এলে বাবা রোদে বসে বেশ সময় নিয়ে তেল

মাখেন শরীরে। দিব্যকান্তি বাবার। শীতকালে এত তেল মাখেন যে শরীরের গাত্রবর্ণ ঈষৎ রক্তাভ হয়ে ওঠে। তেলের বাটি সামনে। জলচৌকিতে বাবা বসে। শীতের রোদ্দুর গাছপালার জন্য বাড়িটাতে এমনিতে কম ঢোকে। আকাশের প্রান্তে ঘাড় হেলিয়ে সূর্যদেব তবু যে কিছুটা কিরণ দেন, সে উঠোনটা বড় বেশি প্রশস্ত বলে। এই খানিকটা রোদের আশায়, রোদে বসে তেল মাখার আশায় বাবার শীতকালে স্নান করতে একটু বেশিই বেলা হয়ে যায়। মা'র গজগজ বাড়ে। তেলের বাটি সামনে নিয়ে প্রথমে নখাগ্রে তা ঈশ্বরেভ্যো নমঃ বলে উর্ধ্বগগনে পাঠাবেন। তারপর ঈশান নৈর্ঋত কোণে নখাগ্রে তেল সিঞ্চন এবং পরে বসুন্ধরার প্রতি এবং এভাবে বুড়ো আঙ্গুলের নখে, নাসিকা রন্ধ্রে, চোখের দুই কোণে, কর্ণকুহরে এবং নাভিমূলে তেল স্পর্শ করানোর পর তাঁর আসল মাখামাখিটা শুরু হয়। বাবার যে জীবনে সর্দি কাশি হয় না তার মূলে নাকি এই তৈল কৃপাধার নামক মোক্ষম প্রয়োগের জের। সুতরাং আমার কথায় তাঁর নিরতিশয় মর্দনে মনসংযোগ বিনষ্ট হলে কেমন হতবাক হয়ে বললেন, কি বললে!

—না বলছিলাম, এই মানে ম্যানেজার কি হাতি ঘোড়া নাকি!

—হাতি ঘোড়া হতে যাবে কেন। ম্যানেজার সোজা কথা! দেশের ছেলে, মিলের ম্যানেজার কত বড় কথা!

আমি জানি বাবার পৃথিবী এক রকমের। আমার আর এক রকমের। কালীবাড়ি থাকতে রায়বাহাদুর থেকে সব ধনপতি কুবেরের সঙ্গে আমার মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। দূরত্ব না থাকলে কৌতূহল থাকে না। সমীহভাব গজায় না। কাছাকাছি এতসব ডাকসাইটে মানুষকে দেখেছি বলেই একজন ম্যানেজার আমার কাছে তেমন আর জীবনে গুরুত্ব পায় না। আর কি জানি কি হয়, সহজে কাউকে আর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে রাজি থাকি না। বরং কারো প্রশংসায় কেমন ভেতরে ক্ষুব্ধ ভাব জাগে।

বাবা বললেন, কটা লোক মিলের ম্যানেজার হতে পারে বল। আর কত বড় কাপড়ের মিল। যোগেশ সরকারকে তো চিনতে। মিলের কেরানীবাবু—কি দাপট ছিল গাঁয়ে।

যোগেশবাবুকে আমি চিনি। নারায়ণগঞ্জে থাকত বাসা করে। যোগেশ সরকারের ছেলে সুকেশ গ্রীষ্মের ছুটি-ছাটায় দেশের বাড়িতে আসত। টেরি কাটত। ইস্তিরি করা জামা প্যান্ট পরত। সুকেশের দিদি গন্ধ তেল মাখত। জানালায় বসে নীল খামে চিঠি লিখত। সব সময় পায়ে চটি পরে থাকত। এ সব আমাদের কাছে ছিল তখন ভিন্ন গ্রহের খবর। কতদিন সুকেশের দিদির নীল খামে চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দেবার জন্য, বিলের জল ভেঙে হাইজাদির কাছারি বাড়িতে উঠে গেছি।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বললেন, কি চুপ করে থাকলে কেন। বল! একজন কেরানীর এত দাপট হলে ম্যানেজারের কত দাপট হতে পারে। একটা মিল চালানো সোজা কথা! হাজার লোক কাজ করে। সবার খবর রাখতে হয়। তার মর্জিতে মিলের ভোঁ শুনতে পাও। কটা বাজল টের পাও। সে না থাকলে সব ফাঁকা। কত দূর থেকে এই মিলের বাঁশি শোনা যায়। লোকটা তার দড়ি ধরে বসে থাকে। সে টানলে বাজবে, না টানলে বাজবে না।

বাবার সঙ্গে আজকাল আমার তর্ক করার স্বভাব জন্মেছে। আগে এটা একেবারে ছিল না। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথায় পেরে না উঠলে গুম মেরে যান। ছেলে লায়েক হয়ে গেছে মনে করেন। তখন কেন জানি আমাকেই হার মানতে হয় বাবার মুখের দিতে তাকিয়ে। যেন আমি তর্ক করছি না, বাবার পিতৃত্বের অধিকার হরণ করে নিচ্ছি। বলেছিলাম, এগুলো কথা হল বাবা!

মাথার তালুতে হাতের তালু সহযোগে বাবা প্রায় তখন তবলা বাজাচ্ছিলেন। মুখের উপর কথা বলায় কিঞ্চিৎ রুষ্ট। রুষ্ট হলে, হাত পা এমনিতে মানুষের কাঁপে। বাবার তালুতে তালু সহযোগে তেলের ক্রিয়াকলাপ প্রসার লাভ করেছে মস্তিষ্কে, না তিনি ক্ষেপে গিয়ে এমন অধীর চিত্ত হয়ে পড়েছেন যে হাত নামাতে ভুলে গেছেন বুঝতে পারলাম না। বেগ থামাবার জন্য বললাম, তাই বলে আপনি একজন ম্যানেজারকে নিয়ে গর্ব করতে পারেন না। তিনি তো আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নন।

—ঠিক। তবু যার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য দিতে হয়। সংসারে এতে সুখ আসে। বিদ্যাসাগর প্রাতঃস্মরণীয়। কোটিতে গুটি। ম্যানেজার লাখে এক। দাবার বড়ের মতো যার যেমন বল। তাই বলে কেউ ছোট নয়। মানুষকে বড় ভাবার মধ্যেও একটা মহত্ত্ব থাকে। এ সব সংসারে শিক্ষণীয় বিষয়।

এগুলো তোমার পরিচয়। তুমি শুধু আমার সন্তান এই পরিচয়ের সঙ্গে মিলের ম্যানেজার তোমার দেশের লোক কথাটা কত গুরুত্ব বাড়ে বুঝতে শেখ।

আসলে বাবা যা বলতে চান বুঝতে পারি। মানুষের এ ভাবে একটা ডাইমেনশান তৈরি হয়। ছিন্নমূল পিতা তাঁর পুত্রের এবং পরিবারের ডাইমেনশান খুঁজতে চান বলেই এত সব কথা। আমি অগত্যা মেনে নিয়ে বলেছিলাম, কখন পড়াতে যেতে হবে।

বাবা বলেছিলেন, সকালে যেতে পার, বিকালে যেতে পার, সন্ধ্যায় যেতে পার। যেমন তোমার সুবিধা। নরেশ চৌধুরীই তোমার হয়ে বলে এসেছেন।

—কবে থেকে যেতে হবে?

—পয়লা জ্যৈষ্ঠ। তবে আমি রাজি হইনি।

—রাজি হন নি মানে!

—দিনটা ভাল না। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ভাল না। তুমি বুধবার সকালে যাবে। তিথি নক্ষত্র ঠিক আছে।

এবং খবরটা নরেশ মামাকে দিতে হয়। আমার একটা টিউশন সত্যিই দরকার হয়ে পড়েছে। কলেজে পড়লে টিউশন করার হক জমে যায়। মাগ্যি গন্ডার বাজারে টাকাটা নেহাত কম না। কুড়ি টাকায় এক মণ চাল হয়ে যায়। মা-র সাদাসিধে হিসাব। সংসারে এক মণ চালের দাম বিলু রোজগার করে আনবে সোজা কথা না। টিউশনের প্রথম টাকায় কি কি হবে তারও একটা তালিকা তৈরি হয়ে গেল। পিলু বারান্দায় বসে বঁড়শির সুতো পাকাচ্ছিল। সে তালিকাটি শুনছিল বোধহয়। তার মনঃপূত হয় নি। ছিপ বঁড়শি সব একদিকে ঠেলা মেরে রেখে রান্নাঘরে হাজির। মা-র এলাকা এটা। মা পছন্দও করে না পিলু যখন তখন রান্নাঘরে ঢুকে যাক। কারণ রান্না না হতেই ওর এটা ওটা হাত বাড়িয়ে খাবার স্বভাব। —দাও না মা, তিলের বড়া একটা। দাও না মা একখানি ডিমের ওমলেট। মা তখন ভারি রেগে যায়। —খেতে বসলে দেব কি। সুতরাং পিলু রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ায়, মা তার রান্না করা তরিতরকারি সামলাতে থাকল। পিলু সেদিকে মোটেই গেল না। কেবল বলল, দাদা তোর দেখিস কিছু হবে না।

এমন কথায় মা খুব রেগে গেল। —তুই বড় অলুক্ষণে কথা বলিস পিলু, এমন বলতে নেই।

—ঠিকই বলেছি। দাদা কথা দিয়ে কথা রাখে না। রহমানদা এতগুলি টাকা দিল, সব সাবাড়। নবমীকে দাদা শীতের চাদর কিনে দেবে বলেছিল।

—দেওয়ার সময় তো যায় নি। পরে হবে।

পিলু বলল, কথা দিলে কথা রাখতে হয়।

আমি বললাম, কথা রাখা হবে। কথা রাখা হবে না কে বলেছে?

—কথা রাখা হয়নি, আমি বলছি। নবমী শীতে বড় কষ্ট পায়।

পিলুর সব মনে থাকে। নবমীকে আমি কথা দিয়েছিলাম, একটা চাদর দেব প্রথম উপার্জনের টাকায়। বদরিদা আমায় হাত খরচ দিতেন সামান্য। পিলুর মতে ওটিই আমার প্রথম রোজগার। সেখান থেকে সঞ্চয় করে উচিত ছিল নবমী বুড়িকে একটা চাদর কিনে দেওয়া। সেটা হয়ে ওঠেনি। পিলু এতে সংসারের অমঙ্গল হচ্ছে ভেবে থাকে। সে তালিকাটির সামান্য পরিবর্তন করে বলল, একটা চাদরের আকাঙক্ষা নিয়ে মরে যাবে—সে হয় না। দাদা টাকা পেলেই সে একটা চাদর কিনে আনবে এই জেদ ধরে বসে থাকলে মা বলল, অত দান ধ্যান করবে কোত্থেকে। তোমাদের বাবার কি জমিদারি আছে। হুট করে কথা দিলেই হয়। হবে না। এখন হবে না যাও।

—একশ বার হবে। দাদার টাকা, তোমার টাকা না।

মা কেমন রোষে উঠল। —আমার টাকা না, কার টাকা। পেটে না ধরলে আসত কোত্থেকে। দাদাকে পেতে কোথায়। দাদার রোজগার হত কোত্থেকে!

বাবা বারান্দায় বসে সব শুনছিলেন। চোখ বুজে মা-ছেলের কথা কাটাকাটির মজা উপভোগ করছেন। বোঝ এবার। ছেলেরা বড় হচ্ছে, বোঝ এবার। আমিই তো কেবল দানছত্র খুলে বসে থাকি—এখন

কে করে! গ্রহগুরু বাড়ি এলে ফলটল দিতে হয়, দিতে গেলেই তোমার বাজে। সংসারের কুটো গাছটি পর্যন্ত তোমার লাগে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর রমণী। বাবার মুখ দেখে টের পাই তিনি এ সবই চোখ বুজে ভাবছেন। একটা কথা বলছেন না। মায়া বলছে, দিক না মা। দাদার এতে খুব ভাল হবে।

—দিয়ে দাও না। সবই দিয়ে দাও। কে বারণ করেছে।

বাবা আর যেন পারলেন না। তিনি স্নানে যাবার আগে বললেন, পিলু যখন বলেছে দাও।

—বললেই দিতে হবে, ও কি বাড়ির কর্তা। বিলুটার একটা ভাল জামা নেই। কি পরে যাবে? ভেবেছ !

বাবা আর রা করলেন না। পিলু বুঝল সুবিধে হবে না তর্ক করে। মা একখানা যেন কিরীটেশ্বরী। হাতে খড়্গা তুলেই আছে। তবু মাকে জব্দ করার জন্য সে নিমেষে হাত বাড়িয়ে দুটো তিলের বড়া নিয়ে ছুট লাগাল। মাও আমার ক্ষেপে গেছে ততোধিক। হাতে খুন্তি নিয়ে ছুটছে মেজ পুত্রটির পিছু পিছু। মেজ পুত্রটির নাগাল পাওয়া কঠিন। সে যত দৌড়ায় না তার চেয়ে বেশী লাফায়। মাকে দেখিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খাচ্ছে। মা'র চিৎকার, খেতে আসিস। দেব খেতে। শুধু ভাত দেব। গোনা গুনতির বড়া তোর এত নাল গড়ায় জিভে। তোর কোথাও জায়গা হবে না দেখিস।

পিলুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমি বললাম, ঠিক আছে আর বকো না। নবমীকে চাদর দিতে হবে না। তোমার কথা মতোই সব হবে।

—দিতে হবে না তো বলি নি, পরে দেবে। ম্যানেজারের বাসায় তোমার টিউশনি—এক জামা গায় দিয়ে গেলে ওরাই বা কি ভাববে!

—পিলুর দোষ নেই মা। আমি বলেছিলাম, ওকে দেব। এখনও দেওয়া হয়নি। কথা দিলে খেলাপ করতে নেই।

মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা যে হুট করে কথা দিস কেন বুঝি না। কথা যখন দিয়েছিস, দিবি। তবে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, পিলুকে আমি খেতে দিচ্ছি ত আমার নাম সুপ্রভা দেবী নয়।

সে তুমি দিও না। যেমন পাজি ছেলে, বুঝুক না খেয়ে থাকলে কেমন লাগে।

খেতে বসার সময় দেখলাম, মায়া আমার বাবার আর পুনুর আসন পেতেছে। পিলুকে যখন খেতে দেওয়া হবে না ঠিক হয়েছে তখন আর আসন পেতে কি হবে। মা দেখছিল মায়ার কান্ড। কিছু বলছে না। একবার উঠোনে বের হয়ে দেখল তার মেজ পুত্রটির সাড়া শব্দ পাওয়া যায় কি না। না নেই। মা'র রাগ পড়ে গেছে বুঝতে পারি। রাগ পড়লেও জেদ কমে না। পিলুর খোঁজ খবর দরকার। মা কিছু না বললেও এটা আমাদের যেন বোঝা উচিত। অথচ আমরাও পিলু সম্পর্কে উচ্চ বাচ্য করছি না দেখে কেমন গুম মেরে গেল। এবং এ সময় দেখেছি, মা'র রাগ যত বাবার উপর। বাবা আসনে বসলে বলল, নাও খেয়ে নাও। নিজেরটা ষোল আনা—আর কে খেল না খেল দেখার দরকার নেই। ভাতের থালা সামনে রেখে বলল, আর এক দন্ড বাড়িটাতে থাকতে ইচ্ছে হয় না। আমার হয়েছে মরণ। এক একজন এক এক রকমের। যাব যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে।

বাবা বললেন, বিলু যা তো বাবা ডেকে নিয়ে আয়। না এলে খেতে বসেও শান্তি পাবি না। এবং পিলুকে ডেকে এনে খেতে বসালে, মা আমাদের চেয়েও বেশি বেশি দিল পিলুকে। বলল, দেখিস, চাদরের একটা কত দাম দেখিস। কথা দিলে কথা রাখতে হয়। কবে মরে যাবে, না দিলে শেষে পাপ হবে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। ভয় লাগে বাবা।

রাতে ভাল ঘুম হয় নি। মাথায় দুশ্চিন্তা থাকলে যা হয়। সকালে উঠে টিউশনিতে যেতে হবে। বাবা দিনক্ষণ দেখে রেখেছেন। অন্ধকার থাকতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি শুয়ে শুয়ে স্তোত্রপাঠ করছেন।

আমার আর পিলুর জন্য বাড়িতে একখানা তক্তপোষ হয়েছে। ওটায় আমরা শুই। রান্নাঘরের

পাশে মাটির দেয়াল দিয়ে একখানা ঘর। ওটাতে আমরা থাকি। পুবের ঘরে মা, পুনু, মায়া আর বাবা থাকেন এখন। স্তোত্র পাঠ আজ একটু বেশি জোরে জোরেই হচ্ছে।

এখন একখান উঠোনের চার ভিটের চারখানা ঘর। একটা গোয়াল, একটা ঠাকুরের একটা আমাদের আর একটা বাবা-মার। উঠোনের কোণায় একটা পেয়ারা গাছ। পুবের ঘরের কোণে ডালিম গাছ। তার পাশে তুলসী মঞ্চ। টালির লম্বা বারান্দায় একখানা কাঠের চেয়ার থাকে। জলচৌকি থাকে। ঘরবাড়িতে বাস করতে হলে এগুলোর দরকার, বাবার ধীরে ধীরে এ সব বোধ জাগ্রত হচ্ছে দেখে মা খুব খুশি। রাতে চেয়ার এবং জলচৌকি ভিতরে তুলে রাখতে হয়। মানুষের আবাস হলে চোর-বাটপাড়েরও উপদ্রব বাড়ে। ইতিমধ্যে মা'র একখানা কাঁসার গ্লাস চুরি যাওয়ায় বাবা মাঝে মাঝে লণ্ঠন জ্বেলে গভীর রাতে বারান্দায় বসে তামাক খান। অথবা শুয়ে থাকলেও শোনা যায় বাবার গলা খাকারি। যেন, বাড়ির এই গাছপালা ইতর প্রাণীসহ সবাইকে জানিয়ে দেওয়া ঘরবাড়ির মানুষটা ঘুমান না। কোনো শব্দ হলেই টের পাবেন। বৃথা তোমাদের ঘোরাঘুরি।

মাথায় দুশ্চিন্তা এইজন্য, ম্যানেজারের দুই মেয়েকে আমি কতটা সামলাতে পারব। ছোটটি নাকি বড়ই চঞ্চল। টিউশনের অভিজ্ঞতা দেবস্থানে বছর দেড়েক ঝালিয়েছি। ওরা শত হলেও আমারই গোত্রের। দরকারে প্রহার কিংবা নীল ডাউন যখন যা খুশি করাতে পেরেছি—কিন্তু এখানে দুই বালিকা না বলে কিশোরী বলাই ভাল—তারা আমাকে কতটা সুনজরে দেখবে—ভয়টা এখানেই। পড়া ঠিকমতো করবে কিনা, কিংবা আমাকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য এমন সব কঠিন টাস্ক রেখে দেবে যাতে দুরবস্থার এক শেষ। আর অঙ্ক বিষয়টি এমনিতেই আমার কব্জার বাইরে। ইংরাজির পাংচুয়েশন কিংবা টেনস ভেতরে সব সময় কেমন টেনসান সৃষ্টি করে—শেষে না অপদস্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। অধীত বিদ্যার তুলনায় একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে যেন টিউশনটা নিয়ে। রাতে দুশ্চিন্তাটা বেশ করেই মাথায় জাঁকিয়ে বসেছিল—শেষ রাতের দিকে ঘুম লেগে এলেও, বড় পাতলা ছিল ঘুম। বাবার স্তোত্রপাঠে তাও ভেঙে গেল।

মা রোজই খুব সকালে ওঠে। আজ যেন একটু বেশি সকালে উঠে পুকুরে বাসন মাজতে চলে গেছে। জমির শেষ লপ্তে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে একটা ছোট্ট পুকুরও আবিষ্কার করা গেছিল। এমন কি তার ঘাটটাও বাঁধানো। আমরা পুকুরটা আবিষ্কার করে তাজ্জব হয়ে গেছিলাম। ঘাটটার সানে অশ্বত্থের গাছ। আর এমন ঝোপঝাড় যে আমরা ওর ভিতরে ঢুকতেই সাহস পেতাম না। এমন কি পিলু পর্যন্ত একবার গভীর আগাছার এবং কাঁটা গাছের জঙ্গলে ঢুকে দেখেনি কি আছে। ঘাটলাটার বড় জীর্ণ অবস্থা। ভাঙাচোরা। অনেকটা পাড় ভেঙে যাওয়ায় সিঁড়ির ধাপ আর স্পষ্ট বোঝা যায় না। মাটির ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে আছে যেন। বাবা মাটি সরিয়ে জঙ্গল সাফ করে এবং আরও কিছুটা খুঁড়ে ফেললে, যে জলের দেখা মিলল, তাতে করে সম্বৎসর জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়ে গেল। মা বাসন মাজে, কাপড় কাচে, এমন কি চানের জন্যও মা আর কালীর পুকুরে যায় না। পুকুর না বলে ডোবা বলাই ভাল। তবে বাবা এটাকে পুকুরই বলতে চান। টাকা পয়সা হাতে এলে পাড়ে আরও কিছুটা মাটি ভরাট করে দিলে পুকুরই হয়ে যাবে। যদিও এক কোণায় আছে বাঁশের ঝাড়, বাঁশপাতা পড়ে পুকুরের জল কিছুটা বিবর্ণ হয়ে যায় তবু বাবা আশা রাখেন এই জলে স্নান থেকে আরম্ভ করে গৃহদেবতার ভোগের রান্নার জলও মিলে যাবে।

এতদিনে যেন আমরা বুঝতে পারি বাবা কেন জমি সাফ করতে করতে সহসা সব থামিয়ে দিলেন। পাঁচ বিঘের মধ্যে বিঘে চারেক উদ্ধারের পরই বাবা আর এগোলেন না। বাবা কি মাকে ঘরবাড়ির শেষ খবর আচমকা দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন, তুমি আমাকে সোজা মনে কর না। জমি আমি চিনি। আমি কেন, সেই আদিকাল থেকেই এই জমির উপর মানুষের প্রলোভন। ঘরবাড়ি করেছে। ঘাটলা বাঁধিয়েছে। এখানে যে মাটির নিচে কোন নীল কুঠি কিংবা পর্তুগীজ লুটেরাদের গুপ্তধন পোঁতা নেই কে বলবে! ধীরে ধীরে সব তুমি পেয়ে যাবে।

বাবা অবশ্য পুকুরটার খবর পান গত পূজার পর। আমি বাড়ি এলে, বাবা টের পান, ভিতরে আমার বড় কষ্ট। লক্ষ্মী আত্মঘাতী হওয়ায় আমি কেমন ভেঙে পড়েছিলাম। রাতে ঘুমাতে পারতাম

না। যেন দেখতে পেতাম লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে এক শস্যক্ষেত্রে। বুকের কাছে একটা পুঁটুলি। সে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে পুঁটুলিটা খুলে দেখাবে বলে। তারপর খুলে দেখালেই সেই এক দৃশ্য, একটা ছাগশিশুর কাটা মুণ্ডু। চোখ স্থির। কান খাড়া। কলাপাতায় রক্তের দাগ। এমন একটা দুঃস্বপ্নের তাড়নাতেই আমাকে শেষ পর্যন্ত দেবস্থান ছাড়তে হয়। বাবা নানা প্রকার অমোঘ ভয় নিবারণী ওষুধ এবং টোটকা সংযোগে আমাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। বাবার একনম্বর টোটকা ছিল একটি নিম গাছ রোপণ। সেটি আমাকে দিয়ে রোপণ করালেন। আত্মঘাতী হলে আত্মার বড় স্পৃহা হয় বাতাসে ভেসে বেড়ানোর। সে মুক্তি চায়। নিমগাছটি যত বড় হবে, যত এর সেবায় আমার জীবন নিযুক্ত থাকবে তত লক্ষ্মীর মায়া কাটবে। ইহজীবনে সবই মায়া এমনও বোঝালেন। মন খারাপ লাগলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা কর। কথা বল, জীবনে দেখবে নতুন পাতা গজাচ্ছে। একজনের মৃত্যুতে সংসার আটকে থাকলে ঈশ্বরের লীলা খেলার মাহাত্ম্য কোথায়। তাঁরই ইচ্ছেতে সব। তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র। মহাকালের গর্ভে তুমি আমি এই গাছপালা প্রাণীজগৎ এবং বসুন্ধরা কে নয়—সব হারিয়ে যাবে। তবে এত ভাবনা কেন!

এ বাবাকে আমি তখন চিনতে পারি না। বাবার টোটকা যে কত ফলদায়ক হপ্তাখানেক পার না হতেই বুঝেছিলাম।

বয়স মানুষকে কত প্রাজ্ঞ করে বাবাকে না দেখলে বোঝা যায় না। সবচেয়ে বিস্ময় লাগে বাবা যেন আগে থেকেই সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল টের পান। তাঁর অভয় আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনার জন্ম দেয়। সকালেই বাবা বললেন, যাবার আগে ঠাকুর প্রণাম করে যেও। প্রথম যাচ্ছ। সাবধানে যাবে।

এ সব কথা কেন—বুঝি! আশ্রয় এবং আত্মবিশ্বাস মানুষের বড় দরকার। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার এটাই একটা বড় সুবিধা। এবং ঠাকুর প্রণাম সেরে নরেশ মামার দেওয়া চিরকুটটি পকেটে পুরে যখন রওনা হলাম তখন কেন জানি মনে হল, আমি অনেকটা দুশ্চিন্তা-মুক্ত।

নরেশ মামার নির্দেশ মতো আমি মিলের একনম্বর গেটে গিয়ে চিরকুটটি দেখালেই গেট খুলে দেবে। মিলের ভেতরটা কি রকম জানি না। পিলুর ভারি ইচ্ছা ভেতরটায় ঢুকে দেখে। মা বলেছে, বিলু তো যাচ্ছে। একদিন তোকে নিবে যাবে।

আমার কেন জানি এ সব কথাতে পিলুর উপর বড় রাগ হয়। কেমন আদেখলা স্বভাব পিলুর। আমি একজন গৃহশিক্ষক মিল-ম্যানেজারের—যেন ম্যানেজারের চেয়ে আমার সম্মান কম না—সমানে সমানে যখন, তখন কিনা তুই আমার ভাই হয়ে একটা মিল দেখার বাসনা মনে মনে পুষে রেখেছিস! তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না! হলে কি হবে, গোঁয়ার হলে যা হয়, সে মাকে বলে রেখেছে, দাদা গেলে আমিও যাব। —তা যা না, কে বারণ করেছে। আমার সঙ্গে কেন! অবশ্য সবই মনে মনে—কারণ পিলুকেও জানি, অভিমান তার বড় বেশি। আজকাল অভিমান হলে সে আমাকে এড়িয়ে চলে। যেন আমার সঙ্গে সত্যি পিলুর একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। বলেছিলাম, আগে যাই তো, পরে দেখা যাবে।

পিলু বলেছিল, আমি জানি, দাদা আমাকে নেবে না!

—জানিস তো বেশ।

কথা-কাটাকাটির পর্বে বাবার উদয় হয়। —লেগে গেল খণ্ডযুদ্ধ। নিয়ে যেতে তোমার আপত্তিটা কিসের!

আপত্তি কেন, আমিও বুঝি না। কালীবাড়িতেও পিলু গেলে আমি রাগ করতাম। রাগের হেতু একটাই, পিলু গেলে যেন সবাই টের পেয়ে যাবে আমরা কত গরীব। কারণ পিলুর পোশাক-আশাক আচরণ সবই গরীব মানুষের মতো। বাইরে বের হয় নি। বের হলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে বুঝত ভিতরের দৈন্য ভাবটা সবাই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। পিলুর সেই সুযোগই হয় নি। সে হয় তো গিয়েই হামলে পড়ে বলবে, এটা কি, ওটা কি, ঐ তারের লাইনটা কোথায় গেছে! টিপে দিলে আলো জ্বলে—ওরে বাবা, রেডিওতে গান হলে সে তাজ্জব বনে যায়। একখানা যন্ত্র না দাদা—কি করে হয়! কি করে হয়, তার ব্যাখ্যা কম লোকই জানে। তাই বলে চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকা কি যে বাজে ব্যাপার! পিলুটা তা বোঝে না।

রাস্তায় বের হলেই কেমন মৃদুমন্দ হাওয়া লাগে গায়ে। বেলা যত বাড়ে রোদের তাত তত বাড়ে।

লু বয়। গরম হাওয়া বাড়িটার উপর দিয়ে বয়ে যায়। গাছপালাগুলির অন্তরালে থাকে ঠাণ্ডা এক জগৎ। দুপুরের গরম কেমন আটকে রাখে তারা। বিকালে এই গাছের ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে থাকার মধ্যে আছে এক অশেষ আরাম।

কলোনি থেকে দুটো পথেই যাওয়া যায় মিলে। বাড়ি থেকে বের হয়ে চৌধুরী মামাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ঢুকে গেলে পড়বে তেলির বাগান। জায়গাটায় কত বড় বড় গাছ দাঁড়িয়ে থাকে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। আর তার ছায়া অনেকখানি পথ জুড়ে। গ্রীষ্মকাল বলে একটু বেলাতেই কেমন গরমে হাঁসফাঁস করে শরীর। ছায়ার লোভে সেই পথটাই আমায় টানে। সাইকেল যত চলে, তত ভেতরে এক গুঞ্জন। আমি বড় হয়ে যাচ্ছি। আমার অস্তিত্বের সংকট তৈরি হচ্ছে। আমি নিজেই একটা যেন আলাদা গ্রহ। আমার এই গ্রহে সুমার মাঠ যেমন আছে, আছে পাহাড় এবং ফুলের উপত্যকা এবং গভীরে দেখতে পাই হিংস্র শ্বাপদেরা চলাফেরা করে বেড়ায়। ছোড়দি এবং লক্ষ্মী আর রায়বাহাদুরের নাতনি মিলে আমার ভেতর বেঁচে থাকার বড় হবার সংকট সৃষ্টি করে গেছে। এই সংকটই আমাকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটিয়ে মারছে। গোপনে সব সুন্দরী তরুণীরাই আমার প্রেমিকা হয়ে যায়। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার সময় দেখতে পাই, ওরা দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত তুলে দিয়েছে। ওদের অবাক করে দেব, আমার বাহাদুরিতে ওরা চোখ বিস্ফারিত করে তাকাবে, আমার মধ্যে গড়ে উঠবে কোন গৌরবময় অধ্যায়—এমনই যেন আমার আকাঙ্ক্ষা।

রাস্তাটা এসে কারবালার সড়কে মিশেছে। তারপর সোজা উত্তরে—দু তিনটে পাটের আড়ত পার হয়ে চৌমাথায়। বাঁ দিকে ঘুরে গেলে বড় লাল ইঁটের দালান, সামনে লন, পরে ঘাটলা বাঁধানো বিশাল পুকুর এবং তারপরই মিলের পাঁচিল আরম্ভ। রাস্তার ডান দিকটায় নিচু সমতল জমি। ধান পাটের চারা হাওয়ায় দুলছে। মিলের এক নম্বর গেটের পাশে টিনের শেড দেওয়া যামিনী পালের চায়ের দোকান। দুটো টুল, কেতলি, কাঁচের গ্লাস, টিন ভর্তি লেড়ো বিস্কুট। দু-একজন লোক ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে, চা খাচ্ছে। একটা লোক টুলে শুয়ে এই সাত সকালে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। একটা গুম গুম আওয়াজ ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

পাঁচিলটা এত উঁচু যে ভিতরে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। আমি, পিলু রাস্তাটায় আরও দু-একবার এসেছি। পাঁচিলটার ওপাশটায় এক রহস্যময় জগৎ আছে এমন কেবল মনে হত। একটা কাপড়ের মিল কত বড় হয় আমাদের জানা নেই।

গেটের দারোয়ানকে চিরকুটটা দেখাতেই আমাকে সেলাম করল। এটা খুবই আমার কাছে অভাবিত বিষয়। নিজের পোশাক-আশাক আর একবার ভাল করে দেখলাম। আয়না থাকলে এখানেও মুখখানা আর একবার ভাল করে দেখতাম। আজকাল কু-অভ্যাস হয়ে গেছে, গোপনে আর্শিতে নিজের মুখ উবু হয়ে পড়ে দেখতে বড় ভালবাসি।

বাবার সামনে আর্শিতে মুখ দেখা যায় না। আর্শি নিয়ে টেরি কাটলে এবং বারবার মুখ দেখলে বাবা কেমন ক্ষুব্ধ হন। তাঁর কাছে এটা হয়ত বেয়াদপির সামিল। কারণ দু-একবার তাঁর চোখে পড়ে গেলে তিনি বলতেন, এ সব কু-অভ্যাস ছাড়। এগুলো ভাল না। এতে নিজেকে ছাড়া তোমার আর কিছু আছে ঘরবাড়িতে মনে হয় না। বাবা মা দুজনেই বিষয়টা পছন্দ করত না। ফলে এটা আমারও মনে হয়েছে মানুষের অনেক কুঅভ্যাসের মধ্যে একটা। যেমন বাবার কাছে, চা খাওয়া, সিগারেট খাওয়া কুঅভ্যাসের মধ্যে পড়ে এবং বাবা যে তামাক খান তাও খুব ভাল একটা অভ্যাস নয় তখন কথায় কথায় তা ধরিয়ে দিতে ভুলে যান না। এটা আমার হয়েছে রহমানদার কাছে থাকতে। তখন আমি বাড়ি থেকে পলাতক। সেখানে এক ছোড়দিকে আবিষ্কারের পরই কুঅভ্যাসটা গড়ে উঠেছে। ছোড়দিকে দেখার পরই মনে হয়েছে, আমার কিছু নিশ্চয়ই আছে যা ছোড়দিকে ক্ষেপিয়ে দেয়। সেই অভ্যাসটা দেবস্থানে বেড়েছিল। লক্ষ্মী দেখলে বলত, মাস্টার তুমি দেখতে খারাপ না গো। আয়নায় এত কি দেখছ হামলে পড়ে।

এ সবই বোধহয় বড় হওয়ার লক্ষণ। একদিন আমি আর মুকুল সেলুনে গিয়ে দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেললাম। নরম সবুজ দাড়িতে গাল ভরে থাকলে কেমন বেঢপ লাগে নিজেকে। এবং সেদিনটায়

বাড়িতে বাবার কাছে প্রায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলাম। বাবা এ দরজা দিয়ে ঢোকে ত আমি ও দরজা দিয়ে বের হয়ে যাই। কুকর্ম করে ফেললে, পিতার কাছে পুত্রের যে অপরাধ ধরা পড়ে এও যেন অনেকটা তাই। মায়া তো চিৎকার করে বলেই ফেলেছিল, ওমা দাদাকে কেমন লাগছে দ্যাখ মা। দাদা তুই কিরে!—যা ভাগ বলে সরিয়ে দিয়েছিলাম মায়াকে। পিলুটার গোঁফ এখন উঠব উঠব করছে। দু-তিন বছরে পিলু হঠাৎ বেড়ে গিয়ে যেন আমার মাথা ছুঁয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝেই পাশে দাঁড়ালে, মাকে উদ্দেশ্য করে বলে, মা দেখ, আমি দাদার সমান হয়ে গেছি না?

পিলু আমার সমান হবে লম্বায় কিছুতে সহ্য হত না। বলতাম, তুই আমার সমান লম্বা হবি, তা'লেই হয়েছে। নরেশ মামার স্কুলে পিলু ভর্তি হয়েছে। মায়া যায়। পুনু কলাপাতায় অ আ লেখে। সেও শ্লেট বগলে করে স্কুলে যাবার জন্য মাকে তাড়া লাগায়।

দুই

আসলে বুঝতে পারছি আমি অন্যমনস্ক থাকার চেষ্টা করছি। ছিমছাম বাংলো বাড়ির দিকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একটা সবুজ লন। বড় একটা নীল রঙের নেট টাঙানো। দু'পাশে নীল রঙের বেতের চেয়ার সাজানো। ওটা পার হলেই সুন্দর একটা গোল ছাতার মতো গাছ। দেশী গাছ নয়। বিলিতি গাছ না হলে তার এমন পরিচর্যা হতে পারে আমার ধারণায় আসে না। সব যেন জ্যামিতিক মাপে তৈরি করা। এমন কি একটা বোগেনভেলিয়া গাছেরও যে এত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লাল সাদা ফুল হতে পারে এখানে না এলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গলা কিছুটা শুকিয়ে উঠেছে। তবে রক্ষা, এই বাংলো বাড়ির মালিক বাবার দেশ বাড়ির মানুষ। বাবা বলেছেন, কাজে কর্মে ম্যানেজারের বাবা মা আমাদের বাড়িতে এসেছেনও দু-একবার। বাবা না হোক আমার ঠাকুরদার কল্যাণে খুব একটা এখানে জলে পড়ে যাব না।

বিশাল বারান্দা। এখানেও সেই নানা কারুকাজ করা চেয়ার টেবিল। সিলিংয়ে ফ্যান। অজস্র ছবি দেয়ালে। সবই ম্যানেজার সাহেবের বোধহয়। কখনও শিকারীর বেশে, কখনও সভাপতির বেশে। হরেক রকম বেশভূষায় নিজেকে দেয়ালে সাজিয়ে রেখেছেন। যেন বারান্দায় উঠেই মানুষজন সতর্ক হয়ে যায় কত বড় মাপের মানুষ তিনি। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল দারোয়ান। তারপর ফ্যান চালিয়ে দিলে কেমন স্বস্তি বোধ করলাম। মুশকিল হল, টিউশনি সেরে বাড়ি গেলে, মা এবং বাবার, এমন কি পিলুরও কত রকমের খবর জানবার যে আগ্রহ জন্মাবে। একজন ম্যানেজারের বাড়িতে কি কি থাকে, কি ভাবে কথাবার্তা হয়, কেমন তার আচরণ সব জানার জন্য বাবা মা নানা প্রকারের প্রশ্ন করে ঠিক ব্যতিব্যস্ত করে তুলবেন। মেঝেটাও কী মসৃণ। টাইল বসানো। লাল হলুদ ফুলের কল্কা আঁকা। আমি যে বসে আছি তারও প্রতিবিম্ব ভাসছে মেঝেতে। চক্‌চকে, যেন আর একখানা বিশাল আর্শি। যতবার খুশি এবার নিজেকে দেখে নাও। পায়ে স্যাণ্ডেল। খুব চক্‌চকে নয়। দু-চার জায়গায় সেলাই খেয়েছে। মেঝের পক্ষে আমি এবং আমার স্যাণ্ডেল দুই বেমানান। ততক্ষণে চিরকুটটি ভিতর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ধুতি পরা, ফতুয়া গায়, টাক মাথা, বেঁটে একজন বৃদ্ধ আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, নরেশ পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে এস।

একটা ঘর পার হয়ে পাশের ঘরে ঢুকে গেলাম। এই ঘরটায়ও বড় বড় সব ছবি। সবই ম্যানেজারের। ছবিতে তিনি বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কোথাও টেনিস হাতে কোথাও কোন সাহেবের পাশে তিনি দাঁড়ানো। সাহেবের সঙ্গে তাঁর করমর্দনের ছবিটা ধরে রাখা হয়েছে বেশ গর্বের সঙ্গে। অর্থাৎ এ বাড়ির মানুষজন যে সে ঘরানার নয় ছবিগুলি টাঙিয়ে রেখে তার প্রমাণ রাখার চেষ্টা চলছে।

—তুমি এবারে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। অবশ্য বলতে ইচ্ছে হল, নরেশ মামা আপনাকে বলেনি কিছু? কিন্তু কুড়ি টাকার টিউশনি সোজা কথা না! কোন বাঁকা কথাই চলবে না কুড়ি টাকার টিউশনি রাখতে হলে। একজন

ম্যানজারের পক্ষেই সম্ভব কুড়ি টাকা দিয়ে একজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা। বাবা হাবে-ভাবে এসব অনেক আগেই আমাকে শুনিয়ে রেখেছেন। শুধু আমাকে কেন, বাড়ির সবাইকে। বাবার সবটাই সর্বজনীন ব্যাপার। বিষয়টা, বাড়িতে যে এসেছে তাকেই কদিন ধরে বোঝানোর কাজ চলছে বাবার। আমার শুনে শুনে এর গুরুত্ব উপলব্ধি ঘটেছে। ফলে বাড়তি কথা না বলে, শুধু আজ্ঞে আজ্ঞে করে যাচ্ছি।

—কলেজে হেঁটে যাও?

—আজ্ঞে না।

—কিসে যাও তবে?

—সাইকেলে।

তিনি বললেন, ভাল।

সাইকেলে যাই না, হেঁটে যাই এমন বেয়াড়া প্রশ্ন কেন বুঝলাম না। হেঁটে গেলে কি পত্রপাঠ বিদায় করে দিতেন। তা দিতেই পারেন। বাড়ি থেকে চার মাইল হেঁটে কলেজ ঠেঙিয়ে ফিরে এসে আবার এক ক্রোশ পথ হেঁটে ম্যানেজারের মেয়েদের পড়ানো চলে না। কুড়ি টাকা যে দেয় সব জেনে শুনে নেবার তার হক থাকতেই পারে।

আমাকে বসতে বলে বললেন, কোন্ ডিভিসনে পাশ করেছ।

আজ্ঞে এখনও পাশ করিনি।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছো বলছ, পাশ করনি মানে।

আজ্ঞে ম্যাট্রিকের কথা বলছেন? ঢোক গিললাম।

আর এ সময়েই হৈ হৈ করে দুই বালিকার প্রবেশ। দাদু তুমি জান, বাবা না, এত বড় দুটো পাখি শিকার করে এনেছে! ওরে বাবা, কত বড় চকা পাখি। মুরগির মতো দেখতে। পেটটা না সাদা। এস না, এস দেখবে। তারপর আমাকে দেখেই কিঞ্চিৎ চোখ উপরে তুলে দুজনেরই সহসা প্রস্থান।

মনমোহন চৌধুরী বিগলিত হাসলেন এবার—এই আমার দুই নাতনি। ভূপাল ভোর রাতে গঙ্গার চরে গেছিল পাখি শিকার করতে। অব্যর্থ হাত। পাখির মাংস বড় নরম। সুস্বাদু খেতে। তুমি কখনও পাখির মাংস খেয়েছ?

—আজ্ঞে না। খরগোশের খেয়েছি। তা একবারই। আর খাওয়া হয়নি। বাবা বলেন, সজারুর মাংস নাকি খুব খেতে ভাল। তবে আমরা খাই নি।

তিনি বোধহয় আমার এত কথা শুনতে আগ্রহী নন। আসলে আমিই চাইছি ফের তিনি ডিভিসনের কথায় না এসে পড়েন! কারণ তিনি কৃতী পুত্রের জনক। দেশ বাড়ি ছেড়ে তিনিও এ দেশে এসেছেন। তবে আমার বাবার মতো লোটাকম্বল সার করে নয়। তাঁর পুত্র যে কত কৃতী এবং তার জন্য তাঁর কত গর্ব পাখি শিকার দিয়েই সেটা শুরু করেছেন। অব্যর্থ হাত বলে শেষ করলে বাঁচতাম। কিন্তু তিনি এখানেই বোধহয় থামবার পাত্র নন। বললেন, দুই নাতনির ইচ্ছা ডাক্তারী পড়বে। ইংরাজির উপর একটু বেশি জোর দেবে। ছোটটির মাথা খুবই পরিষ্কার। বড়টি পড়তে চায় না। তা এ বয়সে সবাই এক-আধটু ফাঁকি দেয়। দেবেই। ভূপালেরও ইচ্ছে মেয়েরা ডাক্তার হোক। এখানে ভাল ডাক্তারের অভাব। নরেশ বলল, তার হাতে ভাল ছেলে আছে। পড়াশোনায় খুব ভাল। খুব কষ্ট করে পড়াশোনা করছে। এতেই আমার মনে ধরে গেল। তোমার বাবা কি করেন?

বাবা কি করেন এমন প্রশ্ন আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। বাবার কাজটা আমার কাছে খুব সম্মানজনক মনে হয় না। যজন যাজন বললে, শুধু যে বাবাকেই তাঁরা খাটো চোখে দেখবেন না, সঙ্গে আমাকেও তার দায় বহন করতে হবে—অভাবী পিতার সন্তান এমন কেউ ভাবুক বিশেষ করে দুই বালিকা, ঠিক বালিকা একজনকে বললেও অন্যজনকে বলা চলে না, শ্যামলা রঙ, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, লম্বা ফ্রক হাঁটুর নিচে নামানো এবং এ বয়সে ফ্রক পরা অবস্থায় একজন তরুণী এমন তরুণ অর্বাচীন গৃহশিক্ষকের কাছে বসে থাকলে অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে, বলি কি করে! তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। না বলে দেখছি পার পাওয়া যাবে না। সমস্ত রাগ নরেশ মামার উপরে গিয়ে পড়ছে। কোথায় বলবেন, তোমার বাবা কেমন আছেন, তোমরাও ত আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়

হও, তোমাদের বাড়ির আম কাঁঠাল যে না খেয়েছে সে জানেই না, পৃথিবীতে এত রকমারি আম কাঁঠাল থাকতে পারে—সে সবের মধ্যে না গিয়ে বাবা কি করেন জানতে চাইছেন। একবার বলতে ইচ্ছে হল বাবা হাতি বেচাকেনা করেন। আসলে বাবা কি কাজ করলে মর্যাদা রক্ষা হবে এটাই এখন মাথায় আসছে না। একজন পিতৃদেব তাঁর সন্তানকে এ হেন বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন আমার দুরবস্থা না দেখলে কারো মাথায় আসবে না।

—আজ্ঞে কিছু করেন না।

—কিছু না করলে চলে কি করে?

—আজ্ঞে চলে যায়।

আর তখনই আবার ছোট নাতনি হাজির।—দাদু এস না। দেখবে না!

তিনি ওঠার সময় হাতের তাগাতে রুদ্রাক্ষটি স্বস্থানে আছে কিনা যেন পরখ করে দেখলেন। অর্থাৎ পাখি শিকার করে পুত্র ফিরে এসেছে এটা তাঁর কাছে বড় একটা স্বস্তি। রুদ্রাক্ষটি বোধহয় তাঁকে সাফল্যের চূড়ায় তুলে দিয়েছে। এটি ঠিকঠাক আছে কি না অভ্যাসবশত দেখা। ঠিক থাকলে, সংসারের চাকা ঠিক মতো গড়াবে। খানাখন্দে পড়ে হোঁচট খাবে না।

মুশকিল হল, একজন গৃহশিক্ষক বাড়িতে উপস্থিত হলে ছাত্রছাত্রীর মনে চাঞ্চল্য কিংবা ভয় ভীতি যাই হোক অথবা কৌতূহল অন্তত একটা কিছু থাকা দরকার। এদের দুজনের দেখছি কিছুই নেই। আমরা কলোনিতে থাকি এমন খবর ওরা নিশ্চয়ই পেয়েছে। কলোনিতে তাদের গৃহশিক্ষক থাকে কিনা এই প্রশ্নে ঘোর আপত্তিও উঠতে পারে তাদের মধ্যে। তবু যখন আমার নিতান্ত পুণ্যফলে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে তখন আমার প্রতি কিঞ্চিৎ হলেও সম্ভ্রম দেখান দরকার। ওদের চোখে মুখে তার বিন্দুমাত্র রেশ নেই। ঘরটাতে কেউ নেই। ম্যানেজার মানুষটি একবার উঁকি দিয়ে দেখলেনও না কে বসে আছে, কেন বসে আছে। আমরা ত অন্যরকমের। কেউ বাড়ি এলে ঘিরে ধরার স্বভাব। উঁকি দেবার স্বভাব। মা মায়া পুনু পিলু কেউ বাদ যাবে না।

দেয়াল-ঘড়িতে পেণ্ডুলাম দুলছে। সব বড় বেশি ঝকঝকে। দেয়ালে একটা দাগ নেই। সংসারে কোন দাগ লেগে থাকুক এরা বোধহয় পছন্দ করে না। এমন কি মেঝেতে সুন্দর কারুকাজ করা কার্পেট পাতা। একটা ছোট গোল টেবিলের উপর রজনীগন্ধার ঝাড়। ঘরে ভারি সুগন্ধ। আমি কি করি আর— খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছি। মেঝের কিউবিকগুলি, কখনও চৌকোনো, কখনও পাশা খেলার ঘুঁটি হয়ে যাচ্ছে। সামনে জানলা, পরে পুকুর,—তারপর টিনের লম্বা প্ল্যাটফরমের মতো সারি সারি ঘর। কেমন ঝমঝম শব্দ হচ্ছে অদূরে। তাঁত চলছে।

কিছুক্ষণ এ ভাবে একা বসে থাকার পর ভিতরটা কেমন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, উঠতেও পারছি না। চলে যেতেও পারছি না। যদিও এ অবস্থায় যে কোন সুস্থ মানুষের উঠে পড়া স্বাভাবিক। ভেতরের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলল, কলোনির লোক। দাদু আর লোক পেল না! তবে নারী কণ্ঠস্বর নয়। তাহলে সবই যেত। যাদের পড়ার কথা তারাই যদি কলোনির লোক বলে, তবে আর ইজ্জত থাকে কি করে! খুবই অবজ্ঞার সামিল।

যাবার সময় দাদুর বলে যাওয়া উচিত ছিল, বোস। ওরা আসছে। আর পছন্দ না হলেও বলা উচিত ছিল, পরে কথা বলব নরেশের সঙ্গে। বেকুফের মতো এ ভাবে কেউ কাউকে বসিয়ে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়! লোকটা একা মঞ্চে চুপচাপ বসে থাকলে দর্শকরা হাসাহাসি করবে না! এমন কি ঢিলও ছুঁড়তে পারে। একটা সূত্র থাকবে তো, পরের ঘটনা কি ঘটবে না জানলে চলে। কেন জানি মনে হল, আমি বসে থাকলেও খুব অরক্ষিত অবস্থায় বসে নেই। অন্তরালে এমন গোপন কোন স্থান আছে যেখান থেকে আমি কি করছি না করছি সব দেখা যায়। নিরাপত্তার খাতিরে তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে রেখেছে। টেবিলের কলম-দানিতে বেশ দামী কলম। নেড়ে চেড়ে দেখার শখ হলেও হাত দিতে সাহস পাচ্ছি না। একেবারে অতীব সজ্জন সাধুর মতো মুখ করে বসে আছি। আর ভিতরে দাঁত কটমট করছি।

এ সময় সেই মহামান্য বৃদ্ধ মানুষটি ফের এসে বললেন, ওরা খাচ্ছে। তুমি বরং কাগজটা দেখ।

যাক, কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম বোধ তবে জন্মেছে।

—শ্যামাপ্রসাদ শুনছি কলোনিতে আসবেন।

—তাই নাকি?

আমার অবাক হওয়া দেখে বুড়ো মানুষটি ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, শ্যামাপ্রসাদ কে জান?

—আজ্ঞে জানি। স্যার আশুতোষের ছেলে।

—বেশ তবে খবর রাখ দেখছি। হিন্দু মহাসভার মিটিং হবে কলোনিতে। আমরা তাড়া খেয়ে এসেছি। এ দেশ থেকেও তাড়া দিয়ে ওদের খেদাতে হবে।

কেন এ কথা বলছেন, বলতে ইচ্ছে হল। ওদের বলতে রহমানদা-দের কথা হচ্ছে। খেদাতে হবে। খেদানোর ইঙ্গিতটি বেশ তিক্ত শোনাল আমার কাছে। কোন কথা বললাম না।

এবার তিনি টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। গুরুজন, তাছাড়া আমার পিতৃদেবের আবদার, এঁরা তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সুতরাং সম্মান দেখাতে হয়। নিজেও উঠে দাঁড়ালাম। তিনি প্রথমে দশম শ্রেণীর ইংরাজি বইটা আমার সামনে খুলে ধরে বললেন, লুসি কবিতার সহজ ইংরাজিতে একটা সাবস্ট্যান্স লিখে রাখ—এই খাতায়। বেশ ভাল করে। আমার নাতনি যেন দশে অন্তত আট পায়। নোট তো আর দশ রকমের পাওয়া যায় না। এম. সেন না হয় জে. এল. ব্যানার্জী। সবাই ঐ মুখস্থ করে লেখে। আমি চাই আমার নাতনির সারমর্ম একেবারে নাতনির মতোই হবে। কেউ আর তার মতো লিখতে পারবে না।

লুসি কবিতা আমার পড়া আছে। এম. সেনের নোট সর্বস্ব আমার পড়াশোনা অবশ্য এখন কিছুই মনে পড়ছে না। বড়ই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। সদ্য ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে দশম শ্রেণীর লুসি কবিতার সারমর্ম বিদেশী ভাষায় লেখা সম্ভব কি না একবার বুড়োমানুষটিকেই প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে হল। এবং আমি বেশ ঘামছি। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে, কিন্তু কুড়ি টাকা—মার হিসেবে এক মণ চাল হয়ে যায়। বাবার সংসারে এটা কত বড় সুরাহা এরা তা বুঝবে না। পাতা উল্টে অন্য কি আর কবিতা এবং গদ্য আছে দেখছি। আসলে ভান করছি—এই লেখা শুরু হল বলে। তিনি ততক্ষণে ফের আরও দুটি বই টেনে, তার প্রশ্নোত্তর লিখে দিতে বলে আজকের মতো নিষ্ক্রান্ত হলেন। পরের প্রশ্নগুলি আমার পক্ষে খুবই সহজ। বিষয় বাংলা এবং ভূগোল। খাতায় যত্ন করে উত্তর লিখে, অন্য একটি কাগজে লুসি কবিতা টুকে পকেটে গোপনে পুরে ফেললাম এবং দেখলাম ঘড়িতে নটা বাজে। ছাত্রীদের দেখা নেই। মুখ তুলতেই দেখি আবার রুদ্রাক্ষ জড়িত মহামান্য সফলকাম ম্যানেজারের পিতৃদেব হাজির। মনে মনে মহামান্য সফলকামই মনে হল দাদুকে। টেবিলের কাছে কোঁচা দুলিয়ে এলে, খাতা দুটো এগিয়ে দিয়ে বললাম, হয়েছে। লুসি কবিতা সম্পর্কে বললাম, বাড়ি থেকে লিখে নিয়ে আসব।

—ঠিক আছে তাই নিয়ে এস। অর্থাৎ এবার আমি যেতে পারি। ছাত্রীরা এ মুখো হলই না। ঠিক বুঝলাম না, পড়াশোনা ওদের সরাসরি না, বুড়োর মাধ্যমে। এর আগেও দুজন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছিল—তারা তিষ্ঠোতে পারে নি। আমি তিন মাসের মধ্যে তৃতীয়। তৃতীয় গৃহশিক্ষক ঘর থেকে বের হলে মহামান্য সফলকাম দরজাটি অতি সযত্নে বন্ধ করে ফেললেন। আমি একা, কেমন এক নির্জন ভূখণ্ডের মানুষ, বাইরে এসে হাওয়া লাগতেই ঘাম শুকিয়ে গেল। কলার টেনে নিজেকে সাইকেলে করে নরেশ মামার কাছে। বললাম, মামা হবে না।

—হবে না কেন রে!

সব শুনে বললেন, মনমোহনদা কি ভাবে নিজেকে বুঝি না! আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এই হয়। কি করবি। টাকাটা তো দরকার। কবিতাটা রেখে যা, আমি সারমর্ম লিখে রাখব। এই করে চালিয়ে যা, দ্যাখ কি হয়।

বাড়ি এলে মা বলল, ম্যানেজার তোর সঙ্গে কথা বলল, প্রণাম করলি!

আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল মা'র কথায়। কিছু বললাম না।

মেজাজ আমার খুবই অপ্রসন্ন। মানুষ এমন হয় এর আগে আমি জানতাম না, ব্যবহার এমন হয় জানতাম না। কেমন যেন বলতে গেলে অপমানিত হয়েই ফিরে এসেছি। সফলকাম মহামান্য আমাদের কলোনির লোক ভেবে বড় বেশি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছেন। মা'র প্রশ্নে আরও বেশি রুষ্ট হয়ে উঠেছি। আমি কথা বলছি না দেখে উঠে এল। বলল, কিরে ম্যানেজার তোর সঙ্গে কি কথা বলল!

—কথা বললে কি হাতি-ঘোড়াটা হবে মা!

আমার এমন তিক্ত জবাবে মা হতভম্ব হয়ে গেল।

মা কেমন কাঁচুমাচু গলায় বলল, না ভেবেছিলাম দেশের লোক। তোদের লতায় পাতায় আত্মীয়ও হয়। তোর বাবার কথা যদি কিছু বলে।

কেন জানি মা'র অসহায় মুখ দেখে আমার আর রাগ থাকল না। মা যাতে খুশি হয় সে ভেবেই জবাব দিলাম—বলেছেন বাবা কেমন আছে। কতদিন দেখা হয় নি। একবার যেতে বলেছেন। পরেই ভাবলাম, না যেতে বলেছেন বলা ঠিক হবে না। কারণ বাবা জানতে পারলে, সপরিবারে বেরিয়ে পড়বেন মিলের উদ্দেশে। একটু ঘুরিয়ে বললাম, যেতে বলেন নি ঠিক, গেলে খুশি হবেন এমন বলতে চেয়েছেন। আরে এ তো বাবার পক্ষে আরও মারাত্মক খবর। গেলে খুশি হবেন যখন, তখন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করতেই হয়। শেষে না পেরে বললাম, ওরা বড়লোক মা। আমরা কারা, বাবা কে, কোন খোঁজ-খবরই আর ওদের দরকার নেই। পড়ানো নিয়ে কথা, বাবা বাজার করে তখন হাজির বাড়িতে। বারান্দায় থলে রেখে বললেন, মনোমোহন কাকাকে বললি না বেড়িয়ে যেতে। সবাইকে প্রণাম করেছিস তো?

—তুমি থাম তো বাবা। তোমার মনোমোহন কাকা আর কাকা নেই—এমন বলার ইচ্ছে। হলে কি হবে, বাবাকেও এসব আর বলা যায় না। বললাম, আসবেন বেড়াতে। বৌমা সহ। নাতনিদের সহ।

আসবেন না মানে! আমাদের বাড়ি এলে তো যাবার নাম করত না। না এসে পারে! তোকে কি খেতে দিল!

—লুচি সন্দেশ বেগুনভাজা পরোটা রসগোল্লা।

—লুচি পরোটা দু'রকমেরই দিল!

—আরও কয়েক রকমের দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি। পেটে না ধরলে খাই কি করে!

মায়া বলল, দাদা আমি তোর সঙ্গে যাব একদিন।

—যাস। বলে আর দাঁড়ালাম না। সাইকেলটা নিয়ে জীবনের সব অপমান থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাদশাহী সড়কে উঠে গেলাম। রোদে ঘুরলাম। মাথাটা দিয়ে আগুন ছুটছে। ছুটুক। তবু আজ যত খুশি রোদে টো টো করে ঘুরব।

তিন

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে/ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে/ উতরোল বড় সাগরের পথে অন্তিম আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রাণে/তবুও কাউকে আমি পারি নি বোঝাতে/ সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়, আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

মুকুল বলল, কি বিস্ময় ছত্রে ছত্রে।

আমি বললাম, কার কবিতা?

মুকুল গাছের নিচে শুয়ে পড়ল। বলল, বল না কার হতে পারে।

কবিতা আমি ঠিক চর্চা করি না। অভাবী পিতার পুত্র বই পত্র কোথা পাব। তবু দু-একবার কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়েছে রায়বাহাদুরের নাতনি মিমির পীড়াপীড়িতে। মনেও রাখতে পারি না। মনের মধ্যে এত অপমানের জ্বালা বয়ে বেড়ালে বিলুরই বা দোষ কি! মুকুল পারে, তার খাতায় সুন্দর

হস্তাক্ষরে সে কবিতা লিখে আমাকে শোনায়। মানুষের তরে এক মানুষের গভীর হৃদয়—এমন শব্দমালা আমার মধ্যে কেমন ঝড় তোলে। শহরের ইঁট কাঠ, ঘরবাড়ি, বালিকার নরম জানু এবং লতাপাতা আঁকা ফ্রকে যেন রয়ে যায় গভীর এক সুষমা। মুকুল সহসা উঠে বসল ফের, কিছু ভাল লাগে না। আমার কিছু ভাল লাগে না। কি যেন করতে হবে। কে যেন বলে, এই বসে আছ কেন, কিছু কর। তখন কবিতা পড়ি। যা কিছু এখন চারপাশে সবই যেন আমার হয়ে কথা বলছে, মুকুল, বসে আছ কেন? যাও, দেখ হৃদয়ের গভীরে সে তোমার অপেক্ষায় বসে। বলেই শেষে হতাশ গলায় বলল, চৈতালীর সঙ্গে আজও দেখা হল না।

—কী গভীর উন্মাদনা ছত্রে ছত্রে। আমি যদি এমন কবিতা লিখতে পারতাম। কথাটা বলে মুকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক। বড় ব্যর্থ প্রেমিকের মুখ।

তবু মুকুল আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য বলল, পারবে না কেন। কত সুন্দর তোমার সেই লাইনটা শহর ঘুমিয়ে আছে—আমি জানি একজন ঘুমায় নাই। শুয়ে আছে জানালায় মুখ রেখে। চাঁদের ওপিঠে কলঙ্ক কালি, সে দেখে একফালি রোদে।

মুকুল আবার আবৃত্তি করল, তবু অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—সিন্ধুর রাত্রের জল আনে—আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ; কেমন অনন্যোপায় হওয়ার আহ্বানে / আমরা আকুল হ'য়ে উঠে / মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে/ জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায / যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

বিকেলের ঝড়ো হাওয়ায় আমরা বসে আছি। আমাদের চোখ বিস্ফারিত, কোথায় যেন যাওয়ার কথা আছে আমাদের। বিকেল হলেই সাইকেলে আমরা চলে যাই নিমতলা পার হয়ে। বাদশাহী সড়কের পাশে নিচু জমির ছায়ায় বসে প্রকাণ্ড এক ঝিলের ওপারে চাষীদের বীজ রোপণ দেখি। আমি বসে থাকি। মুকুল একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে যায়। সব দুঃখ অপমান আমাদের কে যেন নিমেষে হরণ করে নেয়।

তারপরই সহসা মুকুল বলল, কি ব্যাপার বল তো, কদিন থেকে মুখ ভার দেখছি তোমার?

আমিও এবার শুয়ে পড়লাম। ঘাসের ওপর শুয়ে আছি। হাত পা ছড়ানো। দাঁতে ঘাস কাটছি। মাথার উপর নিরন্তর আকাশ। আর মনের মধ্যে অপমানের ঝড়। আত্মরক্ষার উপায় যেন খুঁজে পাচ্ছি না। মুকুলের সঙ্গে ঘুরলে আমার কেমন মনটা হাল্কা লাগে। কি ভাবে সে যেন আমার গোপন কষ্ট সব টের পায়। কলেজের শেষ দিকে সে আমার সঙ্গে একদিন যেচে আলাপ করতে এল। বলেছে, কলেজ ম্যাগাজিনে তোমার কবিতাটা দারুণ হয়েছে। ওকে বলতে পারি না—ওটা আমাকে ভয় দেখিয়ে লেখানো হয়েছে। ওটা না লিখলে কালীবাড়ির পুরোহিত করে আমাকে সবাই ছাড়ত। বলতে পারা যায় রায়বাহাদুরের নাতনি মিমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করে লিখিয়েছে। এতে আমার কোন হাত ছিল না। কিছুই জবাব না পেয়ে, সে কেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিল, তোমার হবে।

আমি বলেছিলাম, হবে মানে?

—তোমার চোখ বলে হবে।

—হওয়ার কথা কি চোখে লেখা থাকে!

—লেখা থাকে। সেই থেকে আমার কি হয়েছিল, বাড়ি এসে নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে বসেছিলাম। চোখে এমন কি আছে যা দেখে মুকুল বলতে পারে, হবে। আমি ঠিক বুঝি না। একদিন তারপর মুকুল আমাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে বলল, কথা আছে।

একটা দেবদারু গাছের নিচে সে আমি বসলাম। সে কেমন সংকোচের সঙ্গে বলল, দুটো কবিতা লিখেছি শুনবে!

আমি বললাম, তোমার ইচ্ছে হয় কবিতা লিখতে।

মুকুল হা হা করে হেসে দিয়েছিল। বলেছিল, যত অপমান সব মিছে, যদি পারি দিনান্তে কোনো অস্তগামী সূর্যের রঙ ফোটাতে।

কবিতা লিখলে সব অপমান মুছে যায়? আমার প্রশ্ন!

বারে, যায় না? যত দূর সেই অগাধ স্বার্থপরতা/ যত দূরেই যাক, একদিন থাকে না তার কোলাহল / সে হয় অবনত মৃত্যু তীক্ষ্ণ সুধা / ফুল যদি ফোটে, ফুটে থাকে সেই আমার ঈশ্বর / শেষ বিকেলে সে যদি হেঁটে যায়—আমার প্রতিমা/ প্রতিমার মতো দু হাতে তার থাকে করবদ্ধ অঞ্জলি / আমার সব অপমান মিছে / সে আছে বলেই বেঁচে থাকি/ বাঁচি—জীবন বড় দুরন্ত বালকের হাতছানি।

কী সুন্দর কবিতা। উচ্ছ্বাসে সেদিন ফেটে পড়েছিলাম।

তারপর থেকেই কী যে হল জানি না, মুকুল এক সকালে আমাদের বাড়ি চলে এল। থাকল খেল। গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াল। মাকে মাসিমা, বাবাকে মেসোমশাই এবং যেন কতদিন থেকে বাবার এমন বাড়িঘরে সে আসবে বলে প্রতীক্ষায় ছিল। কলেজের যখন যা নোট আমার জন্য করে রাখত। আমাদের অভাবের সংসারে বই কেনা বাড়তি খরচা সে সেটা টের পেয়ে যখনকার যে বই দরকার দিয়ে গেছে। বাড়িতে নিয়ে গেছে। তার দাদাকে বলেছে, জান, বিলু কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছে। কি আশ্চর্য মায়াবী কবিতা। এটা এমন একটা কাজ যেন আমি ছাড়া আর কেউ পারে না। বৌদিকে ডেকে বলেছে, তুমি দেখতে চেয়েছিলে—এই আমাদের বিলু।

মুকুল বোধহয় একটু বেশি বেশি করেই আমার সম্পর্কে তার বৌদিকে বলে রেখেছিল। দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। পি ডবলু ডির কোয়ার্টার। দাদা তার সরকারী অফিসে কাজ করে। বাংলো ধরনের বাড়ি। সামনে ফুলের বাগান। পাশে মাঠ। মাঠ পার হলে, স্টেশনে যাবার রাস্তা। চৈত্রের দুপুরে মাতাল হাওয়ায় আমরা তোলপাড় হতে থাকলে, বৌদি হাজির। কাপে চা। কখনও ডিমের ওমলেট। টোস্ট। যখনকার যা।

মুকুলের ঘরে বসে আড্ডা মারি। কত অর্থহীন কথা হয়। এরই মধ্যে একদিন বলেছিল মুকুল, জান একটা ভাল কবিতা লিখতে পারলে অনেক ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

এ সব আমি ঠিক বুঝি না। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না। কেমন ফাঁপরে পড়ে যাই। কবিতা লেখার ব্যাপারে বলি, ও হবে না আমার। তোমাকে নিয়ে আমার ঘুরতে শুধু ভাল লাগে।

মুকুল বলেছিল, তবু লেখ কিছু।

টিউশনি করতে গিয়ে রোজ যে অপমানিত হচ্ছি আজ মুকুলকে সব খুলে বললাম।

মুকুল শুনে বলল, এই অপমানের জবাব একটাই। আমাদের কিছু একটা করতে হবে। নানা রকম স্বপ্নের জলছবি বোনা হতে থাকে। চুপি চুপি মুকুল একদিন বলল, একটা কবিতা কলকাতার কাগজে পাঠিয়েছি। ওটা যদি ছাপা হয় কী না হবে! তুমি একটা লেখ। তোমারটাও পাঠিয়ে দেব।

—কি হবে পাঠালে!

—বা, কত লোক জানবে! কত লোকে আমাদের নাম জানবে!

জীবনের এ দিকটা আমি আদৌ ভেবে দেখিনি। বললাম, আচ্ছা তুমি বল, মেয়ে দুটোর সব টাসক দাদু দিয়ে যায়। আজ পর্যন্ত একটা কথা বলতে পারলাম না ওদের সঙ্গে। রাগ হয় না!

—দেখতে কেমন!

—দেখার কথা বলছি না। এটা কত বড় অপমান বল।

মুকুল বলল, ওরা কি ভাবে, তুমি ওদের খেয়ে ফেলবে!

—ঠিক জানি না। আসলে দাদুটা নষ্টের গোড়া। বাড়িতে এমন হাল ফ্যাশন, আর উঠতি মেয়ে দুটোর বেলায় এত রক্ষণশীল।

মুকুল বলল, এক কাজ করবে?

—কি!

—একটা মাসিক পত্রিকা বের করব। তুমি সম্পাদক হবে। তুমি কাগজের সম্পাদক হলে ওরা আর হেলাফেলা করবে না।

—যা, হয় না। ওসব আমি বুঝি না।

—কাগজটা করতে বেশি খরচ পড়বে না। যারা লিখবে তারা পয়সা যোগাবে। বেশি তো লাগবে না। আমার বৌদি জান, কলেজে পড়ার সময় কবিতা লিখত। বৌদিকে পার্টনার করব। তোমাকে

কিছু দিতে হবে না। রাম নিখিল ওদের কাছে প্রস্তাবটা রাখি চল। আর তোমার রায়বাহাদুরের নাতনি যদি রাজি হয় তবে ত কথাই নেই।

কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। বলি, ওর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না। ওর দাদু আমাকে কালীবাড়ির পূজারী বানাবার তালে ছিল। সেটা না হওয়ায় তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। পরী আমার সঙ্গে শেষ দিকে কথাও বলত না।

আমি পরী বলি, মুকুল ডাকে রসময়ী। আসলে কলেজে রায়বাহাদুরের নাতনি নিজের নামটা হারিয়ে ফেলেছিল। জনে জনে আলাদা নামে ডাকত। আমি শেষ পর্যন্ত পরী নামটাই জুতসই মনে করেছি। যদিও ওর আসল নাম পরী নয়, মিমি, মৃন্ময়ী এবং দীপান্বিতা।

বললাম, পরীকে সঙ্গে পেলে ভাল হয়। তবে কি জান ওর কাছে আর যেতে ইচ্ছে হয় না। তাছাড়া পত্রিকা বের করে হবেটা কি!

মুকুল বলল, হবে, সব হবে। একটা নামও ঠিক করেছি। বলব কি না ভাবছি।

—নাম ঠিক করেছ, বলবে না মানে!

—না, এই আর কি। চৈতালী নামটা কেমন।

চৈতালীকে মুকুল ভালবাসে। চৈতালী ভালবাসে কি না, সেটা আমাদের জানার বিষয় নয়। আমরা এখন সুন্দর মেয়ে দেখলে ভালবাসতে পারলেই খুশি। মুকুলও খুব খুশি। সে চৈতালীকে ভালবাসে। এত গুণ যে নারীর, তাকে না ভালবেসে থাকা যায় না। একবার নাকি চৈতালী তাকে চোখ তুলে দেখেছে। এই দেখা থেকেই তার ভালবাসার জন্ম। এবং কবিতার জন্ম।

একই পাড়ার না হলেও বেশি দূরে নয় চৈতালীদের বাড়ি। ওর দিদি স্কুল শিক্ষয়িত্রী। এক দিদি গার্লস কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপিকা। এক দিদি ল্যালা ক্ষ্যাপা। মুখ দিয়ে লালা ঝরে সব সময়। আমরা বিকেল হলে, একবার কি দুবার বাড়িটার পাশ দিয়ে সাইকেলে রাউণ্ড মারি। মুকুল অন্তত সারাদিনে একবার চৈতালীকে না দেখতে পেলে কেমন মনমরা থাকে। কিছুদিন থেকে এই দেখার কাজটিতে মুকুল আমাকে সঙ্গে নিতে পছন্দ করে। আমরা অধিকাংশ দিন চৈতালীকে দেখতে পাই না। লম্বা বারান্দায় ল্যালা ক্ষ্যাপা দিদিটা দাঁড়িয়ে কেবল দুলতে থাকে। গায়ে লম্বা সেমিজ পা পর্যন্ত। একজন সুন্দর তরুণীকে দেখতে এসে এমন কুৎসিত দৃশ্য দেখলে কার না ক্ষেপে যাবার কথা।

মুকুল ক্ষেপে গিয়ে বলে, চৈতালী আমাকে ভালবাসে না। ভালবাসলে দিদিটাকে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রাখে!

কখনও দেখা হয়ে গেলে মুকুল কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঐ আসছে। দাঁড়াও না।

মুকুল তখন কেমন দাঁড়াতেও ভয় পায়।

বলি, কোন কথা হল! ওর দিদি ত তোমার বৌদির বন্ধু। কি করে কথা হবে বল! সকালে রেয়াজ। টাউন হলের ফাংশানে কি মাইরি গাইল। সেই গানটা আজকাল মুকুল সব সময় গায়। মুকুলের সুর তাল লয় চমৎকার। সে গুন্‌গুন্ করে গায় যখন, তখন বোঝাই যায় না, তার ভালবাসায় দুঃখ আছে। তারপরই তার হাহাকার হাসি, চল, যত সব মন খারাপের ব্যাপার। আমার বয়ে গেছে। কথা তো আমার ভালবাসার। আমি যখন ভালবেসেছি তখন আর কথা কি। চৈতালী ভালবাসল না বাসল বয়ে গেল!

আমি বললাম, এ হয় না।

—হবে না কেন! তুমিও ভালবাস কাউকে। বুকে হাত দিয়ে বল। উপেন রায়ের ছোট মেয়েটাকে দেখে বলেছিলে না, কি লাভলি দেখতে! চোখে যেন সেই বিদিশার নিশা!

মুকুল টের পায়, এ বয়সে শুধু ভালবাসলেই পরমায়ু বাড়ে। আর এইটুকুই কখনও কোনো মাসিক কাগজ বের করা, কিংবা কবিতা লেখাতে পরিপূর্ণতা পায়। বললাম, চৈতালী নামটা সত্যি ভারি সুন্দর। এ নামে কাগজ বের হলে শহরে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

দুজনে সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যাই তখন। মুকুল কেমন আনমনা গেয়ে ওঠে, দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

সাইকেল চলে। আমরা পাশাপাশি দু-জন। পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প পার হয়ে পঞ্চানন তলার দিকে যাই। আমাদের চুল ওড়ে। লাল সড়কে ধুলো ওড়ে। মুকুলের গলা ভারি হয়ে আসে—চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই....। ভাকুড়ির মোড়ে এসে আমাদের গতি স্তব্ধ হয়। সে নামে। আমিও নামি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে এক প্রিয় নারীর সন্ধান চলে। মুকুল তখনও গায়, এত ভালবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই!

মুকুলের সেই বড় বড় চোখে কবিতার মতো তখন স্বপ্ন ঝুলে থাকে। ডাকি, মুকুল।

—হুঁ।

—কাগজটা যে করেই হোক বের করতে হবে।

সে আমার দিকে তাকায়। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলে, কাগজটাকে আমরা বাঁচাবই। কাগজ বের করা ছাড়া তাকে অবাক করে দেবার মতো আমাদের আর কোন সম্বল নেই।

তা ঠিক। কারণ আমাদের দুজনের পরীক্ষার নম্বর ভাল না। আমরা দুজনে থার্ড ডিভিসন সব কাজে। চৈতালী কিংবা অন্য তরুণীরা সব ফার্স্ট ডিভিসন, সব বিষয়ে। পড়ায়, গানে, রূপে। আমাদের হাতে এটাই যেন ক্ষুরধার অস্ত্র হয়ে ওঠে, একটা কাগজ বের করতে পারলে, মিলের ম্যানেজার সাহেব থেকে আরম্ভ করে চৈতালীর অহংকার কাচের বাসনের মতো টোকা মেরে ভেঙে দিতে পারব। মিমিরও। বললাম, কাগজ বিক্রির কি হবে?

—কেন আমরা নিজেরা করব। তমলুকে তরুণ আছে। ওকে লিখব। সে যেন বিশ ত্রিশ কপি বিক্রি করে দেয়। আমরা রোজ স্টেশনে দাঁড়িয়ে বলব, চৈতালী নিন। কবিতা গান নাটক সব এতে পাবেন। দাম করব চার আনা। সুন্দর মলাট—নিখিল মলাটে ছবি আঁকবে। মফঃস্বল শহরে এটা কত বড় খবর হবে বুঝতে পারছ না।

আমার সব অপমান নিমেষে কেমন উবে গেল। আত্মপ্রকাশের এই সুযোগ হেলায় ছাড়া যায় না। ভিতরে যে মিমি থেকে আরম্ভ করে ম্যানেজারের অপমানের জ্বালা আগুন হয়ে বিশ্ব সংসার অর্থহীন করে তুলেছিল মুহূর্তে আমাদের কাছে তা নতুন এক গৌরবময় অধ্যায় খুলে ধরল।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাবা জেগে থাকেন। সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ শোনার জন্য তিনি উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকেন। আমি ফিরলে মনে হয় বাবার ঘরবাড়ির আবার ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গেছে। সাইকেল ঘরে তোলার সময় শুনতে পাই বাবার গলায় অভিযোগ, এত রাত করে ফিরিস না। রাস্তাঘাট ভাল না। সেদিন টিকটিকি পাড়ার কাছে ছিনতাই হয়েছে। পঞ্চাননতলা জায়গাটা ভাল না। তোর মা সেই কখন থেকে জেগে আছে।

বাড়ি ফিরলে টের পাই কেউ ঘুমায়নি। মার গলা শুনতে পাই, তোদের এত কি যে বাইরে কাজ থাকে! রাত হয় না! এত রাতে ফিরলে চিন্তা হয় না। মাকে বাবাকে বোঝাই কি করে আমার ভেতরে অহরহ এক জ্বালা আমাকে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে মারছে। আমি তো আর তাঁদের আগের বিলু নেই। আমারও যে কিছু ভাল লাগে না, সব আছে অথচ কি যেন নেই, এর থেকে উদ্ধার পেতে চাই।

সকালে উঠে দেখি, মায়া একখানা পূজায় পাওয়া কোরা লালপেড়ে শাড়ি পরেছে। মায়াকে শাড়ি পরলে বেশ বড় বড় লাগে দেখতে। মায়া ফ্রক পরুক বাবার পছন্দ না। মা'র সঙ্গে এই নিয়ে বাবার কথা কাটাকাটি গেছে কদিন। বাবা মানতে রাজি না। শাড়ি পরলে বাবার ধারণা, মেয়েদের মধ্যে যে নারীত্ব আছে তা এক ধরনের মহিমা পায়। উজ্জ্বল, সপ্রতিভ এবং বড় হয়ে ওঠার মধ্যে মেয়েদের মধ্যে যে নারী-মহিমা আছে তা প্রকাশ পায়। বাবা এ জন্য শুভদিন দেখে রেখেছেন। আজ বোধ হয় সেই শুভদিন। মায়ার বয়স ত বারোও পার হয়নি। এ বয়সে মেয়েরা শাড়ি পরলে মায়ার বয়সটা ধরা পড়ে যায় ভেবেই বোধ হয়, শাড়ি পরার ব্যাপারে মা'র মত পাওয়া যায় নি। তবু মা আজকাল বুঝেছে, বাড়ির একজন অভিভাবক না থাকলে সংসারে শৃংখলা থাকে না। বাবার কথাই শেষ কথা।

মায়া শাড়ি ভাল করে পরতে পারে না। মা শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে। কেমন জবু থবু দেখাচ্ছিল। সকালে স্নান করে শাড়ি পরায় ভিজা চুল জড়ান। ওর নাক তীক্ষ্ণ। শ্যামলা রঙ। বড় বড় চোখ,

এক মাথা ঘন চুল। বিনুনি খোলা। ভিজা চুল ছড়ানো পিঠে। শাড়ি পরে বোধ হয় লজ্জা পাচ্ছিল। কেমন সব সময় আড়ালে থাকছে। আজ থেকে মায়া ঠাকুর ঘরের পূজার আয়োজনের ভার পেয়েছে। বাবা সকালে স্নান করে এসে মায়াকে বলল, মাকে প্রণাম করেছ?

কেমন আনত মুখে মায়া দাঁড়িয়ে আছে। তার ভিতর যে তরলমতি এক বালিকা ছিল, শাড়ি পরায় তা নিমেষে উবে গেছে। ভারিক্কী এবং গম্ভীর লাগছিল দেখতে। শাড়ি পরলে মেয়েরা কি বুঝতে পারে—তারা এবারে মা হয়ে যাবে। মায়ার আচরণে কেমন তা ফুটে বের হচ্ছে। বাবা বললেন, প্রথম শাড়ি পরলে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়। মাকে, দাদাকে....।

মায়া মাকে প্রণাম করল, বাবাকে করল। তারপর আমার পায়ের কাছে টুপ করে গড় হল। আমরা কুলীন এবং পুরোহিত বংশ বলে প্রণামটা সেই কবে থেকে পেয়ে আসছি। এতে আমাদের কোন লজ্জা সংকোচ থাকে না। প্রাপ্য বলে ধরে নিই। মায়া উঠে দাঁড়ালে দেখলাম, কপালে সুন্দর লাল টিপ পরেছে। বড় পবিত্র এবং মায়াবী মুখ তার। যেন বলছে, দাদারে, আমরা সবাই কেমন বড় হয়ে যাচ্ছি দেখ। বাবা খুব প্রশান্ত গলায় আজ কথাবার্তা বলছেন।

মায়া শাড়ি পরে আছে বলে বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করছে না। গোপাল করের মা এসেছিল, শুভ দিন দেখতে। তার মেয়ে স্বামীর কাছে যাবে—একটা দিনক্ষণ দেখে না দিলে হয় না। বাবা থামে হেলান দিয়ে পঞ্জিকা দেখছেন। গোপাল করের মা মার সঙ্গে কথা বলছিল। বড় সহজ সরল কথা। কি কি রান্না হবে তার ফিরিস্তি দিচ্ছিল মাকে। মাও কি আজ রান্না করবে গোপাল করের মাকে বলে যাচ্ছিল। সংসারে রান্না যে সন্তান সন্ততির খাওয়ার তৃপ্তি সৃষ্টি করে—দু এক রকমের বেশি পদ করে খাওয়াতে পারলে যে ভেতরে এক অনাবিল সুখের সন্ধান পাওয়া যায়, এই দুই নারীর কথাবার্তা না শুনলে তা বোঝা যায় না। স্নেহ, মায়া মমতা সব এতে যেন উজাড় করে দিতে পারে মা।

একটা থালায় কিছু কচি পাটের ডগা। একটা থালায় দুধ কচু কাটা। কিছু গন্ধপাঁদালের পাতা, থানকুনি পাতা, কাঁচকলা আর বেগুন কাটা পেতলের গামলায়। মটর ডাল যত্ন করে ধোওয়া। কচি আম কাটা একটা পাথরবাটিতে। দেখলেই বোঝা যায় পাট পাতার বড়া, গরম মুচমুচে পাতে দেবে মা। শুকতোনি হবে। কচুর ডগা দিয়ে মটর ডাল। কাচকি মাছ সরষে বাটা দিয়ে, আর কি লাগে! এই রান্নার জন্য হয়ত রাতে মা শুয়ে শুয়ে কত ভেবেছে—কাল কি হবে! বাড়িতেই প্রায় সব পাওয়া যায়। কেবল সকাল বেলায় মা'র কাজ ঘুরে ঘুরে এ সব সংগ্রহ করা।

সকাল হলে মা'র সঙ্গে মায়াও ঘুরে বেড়ায়। শাক পাতা, কাঁচকলা, থোড় কিংবা মোচা সংগ্রহ। রোজ একই রকম খেতে দিলে সন্তান সন্ততি নিয়ে আর বাড়ি ঘরে থাকা কেন। আজ একরকম, কাল আর একরকম। মা তার জীবনের সার্থকতা এরই মধ্যে আবিষ্কার করে বড় বেশি তৃপ্তি পায়।

খেতে বসলে, আমরা চারজন। মায়ার কাজ নুন জল দেওয়া। মা পাতে দেবে আর লক্ষ্য রাখবে আমরা কতটা পরিতৃপ্ত হচ্ছি মা'র হাতের রান্না খেয়ে। কোন কারণে যদি নুন ঝাল একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় মা'র কি আপসোস। যেন দিনটিই তার মাটি হয়ে গেল। —আর একটু দিই। এই খেয়ে পেট ভরেনি! সেকি গো! আর দুটো পাট পাতার বড়া দেব? কাঁচা লংকাটা মেখে নাও না। সরষেটা জান ভাল না। ঠিক ঝাঁজ হয় না। খেতে বসলে মা'র এ সবই অভিযোগ থাকে শুধু। একজন মা যে কত দরকারি, সংসারে খেতে বসলে আমরা সবাই এটা বেশি যেন টের পাই।

খেতে খেতে মনে হয় জীবনে এমন মাধুর্য না থাকলে আমরা এত ঘরবাড়ির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতাম না। কোথাও দু-একদিনের জন্য গেলে কিংবা থাকলে সেটা আরও বেশি করে মনে হয়। কালীবাড়ি থাকতে, ছুটি ছাটায় কিছুতেই লক্ষ্মী কিংবা বৌদি আটকে রাখতে পারত না।

এখন গ্রীষ্মের দুপুর। কত রকমের পাখির কলরব বাড়িটাতে। গাছপালায় ঘেরা এই বাড়িঘর দেখে কে বলবে, আমরা প্রবাসে আছি। আমরা ছিন্নমূল। দেশবাড়ির স্মৃতি আমাদের কাছে যেন অন্যজন্মের কথা। খাওয়া হলে, মাদুর নিয়ে গাছতলায় গড়াগড়ি দেওয়ার হুটোপুটি পড়ে যায়। পুনুটা এসে আমার পিঠে এক পা তুলে শুয়ে থাকবে। পিলুটা বলবে, সর না দাদা, আমি একটু শুই। শুয়ে থেকেও স্বস্তি

থাকে না। কখন টুপ করে হাওয়ায় আম পড়বে অপেক্ষায় থাকি। সারাদিনই চলে এমন। মা'র কান বড় সজাগ। পেছনের জমিটাতে বোম্বাই, রাণীপসন্দ আমগাছ থেকে টুপ করে আম পড়ে। মা ঠিক শুনতে পায়—যা মায়া দেখ, আম পড়েছে। সে কোঁচড়ে করে নিয়ে আসে। এত আম জামের খবর পেয়ে কোথাকার সব কাচ্চা বাচ্চা ঘুরে বেড়ায় বাড়িটার আনাচে কানাচে। পাখি, কাঠবেড়ালি, হনু, যেন প্রাণী জগতের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়—বড় ফলবতী সব বৃক্ষ। বাবা কাউকে তেড়ে যান না। শুধু হনুর উৎপাত বাড়লে কোটা নিয়ে পিলু এ-গাছ ও-গাছের নিচে ছুটে বেড়ায়। আর মা'র কাজ বাড়ে। সব আম সাজিয়ে রাখা তক্তপোষের নিচে। কোন্‌টা কোন্ গাছের, কেমন খেতে, সব মা'র মুখস্থ। বাবা বিকেল হলেই বারান্দায় বসবেন আমের ঝুড়ি নিয়ে। পাশে এক বালতি জল। আম কেটে সবার হাতে দেওয়া বাবার এক যেন আলাদা আনন্দ।

মাদুরে আমি শুয়ে, পিলু গাছে উঠে আম পাড়ছে। মায়া মা, আম ঝুড়িতে তুলে রাখছে—বাবা লিচু গাছের উপর জাল বিছিয়ে দিচ্ছেন যাতে হনুতে কচি লিচু নষ্ট না করে যায়। দুটো গাছেই ঝাঁপিয়ে লিচু এসেছে। আম শেষ হলে লিচু, লিচু শেষ হলে জাম, তারপর জামরুল। শেষে তাল। তালের কচি শাঁস বিকেলের প্রচণ্ড গরমে কে না খেতে ভালবাসে! ফলে এ কটা মাস আমাদের বাড়িটা কেমন আরও বেশি সকলের নজর কাড়ে। কেউ আসে দুটো আম নিতে টক খাবে বলে, কেউ আসে, পাকা আমের আশায়। বাবা দিয়ে থুয়ে খুশি থাকেন। মা কিন্তু এটা পছন্দ করে না। এমন কি একবার বাবার বেশি বাড়াবাড়ি দেখে মা আম মুখেই দিল না। আজকাল এর জন্য বাবা মাকে বলেই দেন। কখনও মা না থাকলে গোপনে দিয়ে বলবে, যা পালা। পাইকার আসে যদি গাছ বিক্রি হয়। বাবার এক কথা, সবাই খাবে বলে হয়েছে। এ তো বিক্রির জন্য লাগানো হয়নি বাপু।

আর এ-সময়েই পিলুর মগডাল থেকে চিৎকার, দাদা, মুকুলদা আসছে। সঙ্গে আরও কারা যেন। মায়া কথাটা শুনেই দৌড়ে ঘরে পালাল। ও শাড়ি পরেছে নতুন। ওদের সামনে বের হতে তার লজ্জা। মা বলল, মুকুলের জামাইবাবু কি একটা চাকরি দেবে বলেছিল, তার কিছু বলল।

মাকে বোঝাই কি করে চাকরি পাওয়া বড় কঠিন। জানা-শোনা না থাকলে হয় না। তবে এখন আমি একটা চাকরি নিতে পারি। মুকুলের জামাইবাবু বলেছেন স্পেশাল ক্যাডার শিক্ষক নেবার একটা পরিকল্পনা সরকারের আছে। প্ল্যান এপ্রুভ হয়ে গেলে তিনি আমার জন্য চেষ্টা করবেন।

নিখিল রাম প্রণব সুধীন মুকুলের সঙ্গে আসতে পারে। মুকুল আমাদের ঘরবাড়ি এবং গাছপালার এমন এক অলৌকিক গল্প করেছে, যেন ওরা না এসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে তার মেসোমশাইটির। সে তো জানে না, পুত্রের বন্ধুরা সব অবস্থাপন্ন ঘরের—তারা এলে ঘরবাড়ির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এক হাতে করা, পুত্র সুস্থিতি লাভ করেছে এটাই বাবার বড় সান্ত্বনা। পরিচয় মানুষকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। আপদে কাজ দেয়। এই যে চাকরির কথা হচ্ছে, মুকুল তার জামাইবাবুকে ধরেছে, বিলুকে একটা চাকরি করে দিতেই হবে, এ ত, পরিচয়ের সূত্র থেকে। এই সূত্র থেকেই ঘনিষ্ঠতা এবং বন্ধুত্ব। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা। এটা না থাকলে স্ত্রী পুত্র ঘরবাড়ি নিয়ে বেঁচে থাকার মাহাত্ম্য কোথায়!

রাস্তা থেকেই চিৎকার, বিলু আমরা এসে গেছি। চার পাঁচটা সাইকেল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। এক পা মাটিতে, আর এক পা সাইকেলে। গাছের ছায়ায় আমি হেঁটে যাচ্ছি। কি রোদ! ওরা রাস্তায় রোদে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, ভিতরে এস।

—দেখ কারা এসেছে। বলে মুকুল হা হা করে হাসল।

আমি জানি মুকুল বড় সহজে সব কিছু তুচ্ছ করতে পারে। এত রোদে এসেও হাসিটুকু তার বড় সজীব।

নিখিল বলল, ব্যাটা তুমি এমন একটা আশ্রমের মতো বাড়িতে থাক ঘুণাক্ষরে তো বলনি।

আমি কি বলব। ওরা সাইকেলগুলি গাছে হেলান দিয়ে মাদুরে এসে বসল। বাবা বারান্দায় তামাক সাজছেন। আসলে তিনি তামাক সাজছেন না, পুত্র এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের কথা শুনছেন! কেমন পাট ভাঙ্গা প্যান্ট জামা সব পরনে। বিলুটার এদের তুলনায় কিছুই নেই, কিছুটা তার মনকষ্ট হতে পারে। উঠোনের এক কোণ থেকে গাছতলার সবটাই দেখা যায়।

রাম মুকুল এসেই মাদুরে শুয়ে পড়ল। বাবার আতিথেয়তা একটু বেশি। শক্ত তেল চিটচিটে গোটা দুই বালিস না আবার হাজির করেন বাবা। একবার উঠে গিয়ে বাবাকে সতর্কও করে দিয়ে এলাম। আর বাবার অদ্ভুত স্বভাব। বন্ধুরা কেউ এলেই, বাবাও সেখানে গুটি গুটি হাজির হবেন। তারপর চলবে, তোমার বাবার নাম কি? দেশ কোথায় ছিল? কি করেন তিনি? তোমরা ক ভাই বোন? বিশদ জানাজানির পর বাবা বলবেন, বাসা বাড়িতে থাক, না নিজের বাড়ি? একদিন মা বাবাকে নিয়ে বেড়িয়ে যাবে।

মুকুল মাঝে মাঝে আসে বলে, বাবার স্বভাব চরিত্র তার জানা। মাঝে মাঝে বাবার অহেতুক কৌতূহলে আমি ক্ষুণ্ণ হলে মুকুল বলবে, মেসোমশাই তো ঠিকই বলেছেন, তুমি রাগ কর কেন বুঝি না।

মুকুলের হাতে একটা কবিতার বই। সুদীনবাবুর হাতে রাজনারায়ণ বসুর একাল সেকাল। কোথাও গেলে হাতে কবিতা কিংবা গল্প প্রবন্ধের বই এখন আমাদের থাকা চাই। কারণ আমরা আলাদা গোত্রের এটা যেন চারপাশের মানুষকে বোঝানো দরকার। শুধু খাওয়া পরাটাই সব নয়, বাড়ি ঘরই সব নয়, জীবনে আরো কিছু দরকার।

নিখিল বলল, একেবারে বামুন ঠাকুর সেজে বসে আছিস। তোকে আমাদের কাগজের সম্পাদক মানাবে না।

মুকুল বলল, বিলুর বিদ্যাসাগর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গলায় পৈতা, পরনে কোরা ধুতি আর একটা চাদর গায়ে দিলেই একেবারে বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর। বিলুকে আমি আমাদের পত্রিকার জন্য নাটক লিখতে বলেছি।

প্রথমত আমাকে বিদ্যাসাগর বলে ঠাট্টা করায় একটু চটে গেছিলাম। এটা ঠিক, বাড়িতে প্যাণ্ট সার্ট কেউ আমরা পরি না। পাজামা গেঞ্জি কিংবা পাঞ্জাবি পরা যায়। ওদের বাড়ি গেলেই দেখি, ওরা কেউ খালি গায়ে কখনও থাকে না। পাজামা গেঞ্জি না হয় পাঞ্জাবি পরে আছে। এমন কি ঘরেও তারা চটি পরে থাকে। আমাদের স্বভাব অন্যরকম। কলোনির মানুষ হলে যা হয়। পুজোর কিংবা শ্রাদ্ধে দানের কাপড় দিয়ে আমাদের সব। এমন কি সেই কোরা কাপড় কেটে সার্টও বাবা তৈরি করে দেন আমাকে, পিলুকে। মার শেমিজ। বাড়িতে আমি খালি গায়ে থাকি। খালি পাঁয়ে হাঁটি। সোডায় কাচা কোরা কাপড় পরে থাকি। একবার একটা কোরা ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরলে বাবার কি ক্ষোভ! তোমরা বামুনের সন্তান, না চণ্ডালের সন্তান! বামুনের বাড়িতে ও সব চলবে না।

রাম নিখিল সুধীন সবার বাড়ি মুকুল আমাকে নিয়ে গেছে। বাইরে একটা সবার বসার ঘর থাকে। কারো ঘরে দেখেছি বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া। বাবার কাছে এ সবের কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। নীল রঙের ক্যালেণ্ডার। টেবিলে বাতিদান—কত সুন্দর কারুকাজ করা লেসের কাজ পর্দায়। জীবনে এগুলি মোহ তৈরি করে বুঝি। বাবাও আমার এ সব দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে বাড়ির এ সব অর্থহীন, বরং জায়গা থাকলে একটা গাছ লাগাবার পরামর্শ দিয়ে আসেন। এমন কি বাড়িতে এসেও তাঁর আক্ষেপ—কত বড় বাড়ি—কি সব সুন্দর সাজানো ঘর ধনবৌ—সব মাটি বুঝলে না—বাড়িটাতে একটা ফলের গাছ নেই। পূজা আর্চার জন্য একটা ফুলের গাছ নেই। মানুষ এভাবে ধর্মহীন হয়ে বাঁচে কি করে! সুতরাং এরা আমাদের বাড়ি এলে একটা অন্য গ্রহে হাজির হয়েছে মনেই করতে পারে।

মুকুল বলল, তা হলে তুমি নাটকের ভার নিচ্ছ!

আমি বললাম, ক্ষেপেছ! নাটক কি করে লিখতে হয় আমি জানি না। কবিতা থেকে নাটকে! হয় না।

সুধীন বলল, সিরাজদৌল্লার নাটক তোমাকে পড়তে দেব। বুঝতে পারবে যথার্থ নাটক কাকে বলে!

নাটক আমার একখানাই পড়া আছে। আমাদের সিলেবাসে নাটকটি ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাম নাট্যকারের। তার টীকা এবং ব্যাখ্যা আমাকে এতো জ্বালাতন করেছে, নাটকের নাম শুনলেই ত্রাসের সঞ্চার হয়। বিদ্যাবিনোদ মশাই আমাদের মতো পড়ুয়াদের যে অথৈ জলে ফেলে গেছেন,

নতুন নাটক লিখে আবার আমি আগামী দিনের পড়ুয়াদের কাছে নতুন সমস্যা সৃষ্টি করতে রাজি না। বললাম, হবে না।

—হবে। তুমি পারবে।

—আমি পারি না জান। কেন যে জোরজার কর বুঝি না। এমন করলে তোমাদের সঙ্গে আর নেই। কেন যে পত্রিকা বের করার ইচ্ছাটা মাথায় এসেছিল।

বেশ কঠিন শোনাল বোধ হয় কথাগুলি। ওরা চুপচাপ থাকল। বলল, কবিতা লেখার অনেক লোক পাওয়া যাচ্ছে। সুধীনবাবু বাংলা চলচ্চিত্রের উপর প্রবন্ধ লিখবে বলেছে। ছোটগল্পও দুটো একটা পাওয়া যাবে। প্রণবের বাবা বলেছে, প্রণবকে দিয়ে একটা ছোট গল্প লিখিয়ে দেবেন। সমালোচনা বিভাগে থাকবে। এটার ভার নেবে নিখিল। তুমি তা'লে......।

আমি তা'লে কিছু না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। খাটা-খাটনি আমাকে দিয়ে হবে। কিন্তু লেখা হবে না।

রাম বলল, ওকে বরং কবিতাই লিখতে দাও। ও যখন ওটা পারে ওকে দিয়ে তাই লেখানো উচিত।

তাতেও রাজি না দেখে সুধীনবাবু একটু ক্ষেপেই গেল। কলেজ ম্যাগাজিনে ত বেশ লিখেছিলে!

ওটা চাপে পড়ে লিখতে হয়েছে। ও কথা বাদ দিন।

অমন সুন্দর কবিতা কেউ চাপে পড়ে লেখে বিশ্বাস হয় না।

ওরা কিছুক্ষণ যেন দম নিল—পরে কি ভাবে আমাকে চাপ সৃষ্টি করা যায় ভাবছে। আমি হুট করে ওদের অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গেলাম। বললাম, প্রণব না বলে প্রণবের বাবা কেন বলল! প্রণবই তো বলতে পারে সে গল্প লিখবে।

প্রণবের বাবাকে আমরা জানি—বড় অমায়িক মানুষ, তিনি চান তাঁর পুত্র বড় লেখক হোক। মাঝে মাঝেই বলেন, প্রণব যাও, উপরে উঠে যাও, লেখগে। লিখতে লিখতে হাত খোলে।

প্রণব আমাদের আড্ডায় দু-একবার গল্প শুনিয়েছে। বাক্য বন্ধন শিথিল, প্রেম এবং আবেগ ছাড়া কিছু থাকে না! ওকে দিয়ে হবে না এটা আমাদের জানা। কিন্তু কাগজের একটা বড় খরচের বহর প্রণবের বাবা দিতে নাকি রাজি হয়েছেন। শর্ত একটাই তাঁর পুত্রের গল্প ছাপাতে হবে। সব বাবারাই দেখছি এক ধাতুতে গড়া। আমার বাবা অবশ্য শুনলে কিছুটা শংকাই বোধ করবেন। কারণ তাঁর কাছে লেখক কবি নাট্যকারের কোন দাম নেই সংসারে। উচ্ছন্নে না গেলে কেউ নাটক কবিতা গল্প লেখে না। এতে বাড়ি ঘরের অমঙ্গল হয়।

বাবা দেখছি তখন পিলুকে খোঁজাখুঁজি করছেন। একবার যাবার সময় শুধু বলে গেলেন, তোমরা ভাল আছ তো? বাবা বোঝেন আমাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতি আমি অপছন্দ করি। বিরক্ত বোধ করি। বাবা আজকাল আমার ভাল লাগা মন্দ লাগার বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিতে শিখেছেন। পিলু যে আমগাছে চুপচাপ বসে আমাদের কথা শুনছে বাবার খেয়াল নেই। আমিই বললাম, এই পিলু, বাবা তোকে ডাকছে না!

সে তড় তড় করে গাছ থেকে নেমে পড়ে বলল, ডাকছ কেন?

বাছুর ধরবি। দুধ দোওয়াতে হবে।

বুঝতে পারছি, বাবা তাঁর পুত্রের উপস্থিত বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়নের যোগাড় করছেন।

রাম বলল, গাছে কত আম! আমের কি মিষ্টি গন্ধ!

নিখিল ওদিকে গেল না। সে জানে আমি একজনকে বড় বেশি এড়িয়ে চলি, সে তারই কথা তুলে ফেলল।

সে বলল, শেষ পর্যন্ত দেখছি পরীকেই লাগাতে হবে।

—তার মানে?

মানে পরী বলছিল, আসবে।

—কোথায়?

—তোমার কাছে।

—কেন?

পরী তো কাগজে টাকা দিচ্ছে। পরী কবিতা লিখবে। তুমি কাগজে আছ শুনেই সে রাজি হয়ে গেল। পরী এলে আমাদের আর ভাবনা থাকবে না।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। পরী এ বাড়িতে এলে বিলুর ঠিকুজী কুষ্ঠী জানতে বাকি থাকবে না। যেন পরী এলে সে অপমানিত হবে আবার। বললাম, পরীকে আসতে বারণ কর। ওর আসা আমার বাবা পছন্দ নাও করতে পারেন। বাবার দোহাই দিয়ে পরীর এখানে উদয় হওয়া থেকে নিজের আত্মরক্ষার এটাই যেন আমার একমাত্র উপায় জানা। আমি বারণ করেছি শুনলে সে এখানে রোজ এসে হাজির হতে পারে। পরী বার বার শুনিয়েছে, সে যে-সে মেয়ে নয়। সে রায়বাহাদুরের নাতনি। সে সুহাসদার সঙ্গে মিছিল করে, মিটিং করে। সাইকেল চালিয়ে যতদূর খুশি চলে যেতে পারে। সকাল বিকালে তাকে পার্টি অফিসে পাওয়া যায়। সে মেয়ে এখানে এলে বাধা দেবে কে!

পরীকে কতদিন দেখেছি মিছিলের আগে ঝাণ্ডা হাতে। কতদিন দেখেছি, মিটিং-এ সে মাইকে নাম ঘোষণা করছে। পরী কী যে হবে, সে নিজেও বুঝতে পারে না। পার্টি অফিসে গেলে দেখা যায়, সে বসে বসে পোস্টার লিখছে। রাস্তায় দেখা যায় সে মিছিলের আগে আছে। নাটকে দেখা যায়, সে নায়িকার পাঠ করছে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় দেখা যায়, চাঁদ যেন ঝলসান রুটি। একটা মেয়ে একা এত করতে পারে, সে আমার বাবার দোহাই কতটা মানবে বুঝতে পারছি না। বড় লোকের নাতনি, তা আদুরে হবে বেশি কি! গাড়ি চালিয়ে একদিন কালীবাড়ি হাজির। আবার গাড়ি চালিয়ে কলেজে হাজির! অথচ প্রথম দিকে, কী ধীর পায়ে কলেজের সিঁড়ি ভাঙত। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হেঁটে যেত—কারো দিকে তাকাত না। সুহাসদা কলেজ ইউনিয়নের পাণ্ডা। তার পাল্লায় পড়ে পরী একেবারে অন্য ধাতু হয়ে গেল। পরের দিকে গাড়িতে আসত না। এতে বোধহয় গণসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। সে আসত সাইকেলে। সুতরাং যদি পরী মনে করে আসবে, তবে তা কেউ রোধ করতে পারবে না। বাবার দোহাই দিলেও না।

আমি বাধ্য হয়ে মনমরা হয়ে গেলাম। মুকুলের সঙ্গে পত্রিকা বের করা নিয়ে জড়িয়ে না পড়লেই হত। আসলে সেই ভায়া দাদু টিউশনিটাই আমার ঘিলুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

লক্ষ্মীর আত্মহত্যার কারণ এই পরী। পরীকে এ কথা বলা যায় না। বললে সে খারাপ ভাববে। সেদিন জ্যোৎস্না রাতে পরীকে নিয়ে রেল লাইন ধরে হেঁটে না গেলে লক্ষ্মী আত্মহত্যা করত না। একটি অন্ত্যজ কিশোরী বালবিধবা হয়ে দেবস্থানে যে মানুষটাকে সে নিজের মনে করে সারাদিন চোপা করত সেই মানুষটা এমন বেইমানি করবে সে কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সেই মুখ এখনও আমাকে তাড়া করে। পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা এবং কপালে সিঁদুর পরে সে শুয়ে আছে যেন। কে বলবে মেয়েটা বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। লক্ষ্মী আমার উপর অভিমান বশে চলে গেল। নিরন্তর সেই জ্বালা মাঝে মাঝে আমাকে এখনও উদাস করে তোলে। সেই থেকে আমি পরীকে এড়িয়ে চলছি। পরী এলে আবার কোন্ আপদ এসে বাড়িটায় ভর করবে কে জানে!

পরী এলে বুঝতে পারছি এক অপমান থেকে আর এক অপমানের দরজায় আমি ঢুকে যাব। সে অপমান কি নতুন সংকট সৃষ্টি করবে কে জানে। একদিন মুকুলকে সোজাসুজি বললাম, পরীকে আমার পিছু লেলিয়ে দেবে না। ওকে আমি চিনি।

আমরা বিকাল হলে সাইকেলে সারা শহর চক্কর মারি। কখনও পুলিস মাঠে গাছের ছায়ায় বসে থাকি। শহরটা যেন আমাদের কাছে কত সব সুন্দর খবর বয়ে আনে। সূর্য অস্ত যাবার আগে সারা লালদীঘি কেমন আরও মায়াবী হয়ে ওঠে। কোনো তরুণী কিংবা যুবতী আসে হেঁটে। আমরা বড় দূর থেকে দেখি—পৃথিবীর কোন গ্রহ নক্ষত্রে এরা বড় হয় এমন প্রশ্ন জাগে মনে! পরীকে দেখলেও হত। কিন্তু পরীর প্রতি আমার আকর্ষণ অন্য রকমের। পরী আগেও ভয় দেখিয়েছে, বিলু একদিন তোমার বাড়ি যাব। তখন লক্ষ্মী বেঁচে। লক্ষ্মীই পরীকে বলেছিল, মাস্টার তোমাকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে, তা'হলেই হয়েছে। কালীবাড়িতে তখন ছাত্র পড়াই। থাকি, খাই, কলেজ করি।

নিখিল বলল, পরী—কি করেছে?

—বললাম, কি করেছে বলা যাবে না। পীড়াপীড়ি করবে না। ওকে কবিতা দিতে গিয়ে যত ফ্যাসাদ। পরীর জন্যই তো লক্ষ্মীটা বিষ খেল।

—বলছ কি!

—কাউকে কিন্তু বোল না।

—তুমি যে কিনা! এত বড় খবরটা চেপে গেছ!

—তখন তো তোমার সঙ্গে আমার ভাল আলাপ হয় নি। জানতো পরীর মাথা খারাপ আছে। ওকে বাড়িতে মিমি বলে ডাকে। ওকে বেশি আস্কারা দিও না।

আমরা ঘাসের উপর শুয়ে আছি। এ দিকটা নির্জন। দূরে এগ্রিকালচারের মাঠ, পরে সাহেবদের কবরখানা। পাশে বিশাল ঝিল। রিকশার প্যাঁক প্যাঁক শব্দ। আর দূরের রেল-লাইন পার হয়ে গাছের ছায়ায় অনেকটা দূরে আমার বাড়ি। পরীর কথা ভাবলে, আমার কেন জানি বাড়িতে ফেরার ইচ্ছে থাকে না। তবে আর যাই মানাক, আমাদের বাড়িতে মিমিকে মানায় না। আমি বললাম, ওর বোধহয় সুন্দর ছেলে দেখলেই ভাল লাগে। বড় লোকের মেয়েদের কত শখ থাকে। আমি ওর শখের জিনিস। বরং মজা বলতে পার। আমাকে নিয়ে ও মজা করতে ভালবাসে। ওর মধ্যে আমি আর নেই।

পরী তো বলছে, তোমাকে সম্পাদক করতে।

—পরীকে বলবে, আমি রাজি না। ওকে দয়া করে আমাদের বাড়িও নিয়ে যাবে না। পরী আমার বাড়ি চেনে না।

—আমরা কে ওকে নিয়ে যাবার? সে ইচ্ছা করলে সব জায়গায় যেতে পারে। একা নাকি কানপুর যাচ্ছে, বাবার কাছে। সেখানে মাস খানেক থাকবে।

—বাঁচা গেল।

মুকুল তড়াক করে উঠে বসল, বাঁচা গেল মানে! তুমি কি বিলু, মেয়েটা তোমার জন্যই টাকা দিচ্ছে। তোমার কথা উঠতেই বলল, যা লাগে দেব। দাদুকে বলব। দাদু বিলুকে চেনে। ওকে সম্পাদক করতে হবে।

আসলে মুকুলকে কি করে বোঝাই, সেই ভায়া দাদু টিউশনিটাই যত নষ্টের মূলে। ম্যানেজার সাহেবের দুই মেয়ে অবশ্য এখন মাঝে মাঝে সামনের টেবিলে বসে পড়া দেখিয়ে নেয়। একেবারে পর্দার অন্তরালে আর থাকে না। বাবার গৌরবে মেয়েরাও গর্বিত। বাবার হয়ে তাদের গর্ব করার শেষ নেই—বাবা টেনিস খেলে, বাবা আবৃত্তি করে। বাবা নাটক করে। সব ছবি একদিন আমাকে দেখিয়েছিল। বাবার শেষ কৃতিত্বের ছবি বাবার একখানা কবিতা। কবিতাটি সাহেবের স্ত্রী সূচীশিল্পে ধরে রেখেছেন। এবং তাদের ভিতরের ঘরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। তাহলে ম্যানেজার সাব কবিতা লেখেন। আর সে কাগজের সম্পাদক, এখানে একটা যেন তার বড় অমোঘ জায়গা আছে। বিজ্ঞাপনের জন্য সাহেবকে অনুরোধ জানান হবে। এবং তার জন্য মিমিকে পাঠালে কাজে আসবে—শহরের বনেদী পরিবার, এক ডাকে সবাই তার দাদুর নাম জানে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আলাদা ইজ্জত। এবং আমি জানি, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ঠিক একটি কবিতা ধরিয়ে দেবে। এই আশা আমাকে কুহকে ফেলে দিচ্ছে। সুতরাং বুঝতে পারছি, এই কুহকই আমাকে সম্পাদক না করে ছাড়ছে না। আমি বললে, মিমি দয়া করে ফোনে জানিয়ে দেবে, আর একটা কবিতা পাঠাবেন। বিলুর পছন্দ না। বিলু মানে আমাদের কাগজের সম্পাদক।

চার

ঘাসের উপর শুয়ে যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। টিউশনিটা ছাড়তে পারছি না। অথচ বড় ইজ্জতে লাগছে। চাকর-বাকরের মতো ব্যবহার। এমন কি এক কাপ চা পর্যন্ত দেয় না। সাহেবের বাপ কাছ থেকে নড়ে না। মেয়ে দুটো পড়ে, আমি বসে থাকি, অংক না পারলে বুঝিয়ে দিই, ইংরাজী ট্রান্সলেশন করবার সময় বুক কাঁপে। কোথায় কি ভুল করে না বসি। সব যে ঠিক হয়না বুঝতে পারি। তবে সাহেবের

বাবাটির ইংরাজি জ্ঞান আমার চেয়ে প্রবল নয়। টাসক করাবার পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হয় সব ভুল না হয়ে যায়। একেবারে যে হয় না তা নয়। ছোটটির না হলেও বড়টির বেলায় হামেশাই হয়। বড়টির কেন জানি, মাষ্টার মশাইর প্রতি সামান্য মায়া জন্মেছে। স্কুলে ঠিকঠাক করে দিলে, স্কুলে বসেই ফেয়ার করে নেয়। দাদুকে বুঝতে দেয় না মাষ্টার মশাই ভুল শিখিয়ে গেছেন। দাদু খাতা দেখতে চাইলে ফেয়ার করা খাতাটি দেখায়। এই আকর্ষণটুকুর জন্যই এখনও টিউশনিটা ছাড়তে পারছি না। আর দেখছি বড় মেয়ে নমিতা মানে নমু, আমার দিকে চোখ তুলে কথা বলতে ভরসা পায় না। চোখে চোখ পড়ে গেলে নামিয়ে নেয়। দাদুটি কি বোঝেন কে জানে, নমুর দিকে তাকিয়ে বলেন, কোথাও অসুবিধা হলে বলবে। লজ্জার কি, ও তো কলোনির ছেলে!

আমিও বলি, সত্যি লজ্জার কি আছে। আমি তো তোমাদের মাষ্টার মশাই। কলোনিতে থাকি।

আসলে বুঝতে পারি, ফ্রক পরে সে আমার কাছে বসে থাকতে লজ্জা পায়। যতই আমি কলোনির ছেলে হই না কেন, তার কাছে আমার যেন কিছুটা মর্যাদা আছে। কেন যে এ বয়সে ফ্রক পরিয়ে রাখা তাও বুঝতে পারি না। একদিন দেখলাম নমিতা শাড়ি পরে সেজে গুজে আমার সামনে পড়তে বসেছে। এবং ক্রমে বেশ চোখে ধার উঠে যাচ্ছে। এতেও বুক কাঁপে। পরী অর্থাৎ মিমির চোখে এসব আমি লক্ষ্য করে জেনে গেছি—মেয়েদের চোখে একজন পুরুষের সম্পর্কে কখন কি দুর্বলতা দেখা দেয়—চোখের চাউনিতে তার আভাস থাকে। এসব কারণেও ভারি ডিপ্রেসড্ থাকি। মুকুল তা টের পায়।

সে বলে, কি হয়েছে তোমার। কেবল চুপচাপ থাক। মাসিমা তো সেদিন কান্নাকাটি করল। তুমি নাকি বলেছ, টিউশনি ছেড়ে দেবে।

—ধুস, ভাল্লাগে বল! আমি যেন বেটা চোরের দায়ে ধরা পড়েছি। ওর দাদুটা কি ভাবে! কলোনিতে থাকি বলে আমরা কি মানুষ না! সব সময় সামনে বসে থাকে। নাতনিদের পাহারা দেয়। বল, খারাপ লাগে না?

—কিছু বলেছে?

—বলতে হয়! আমি কিছু বুঝি না মনে কর! দাদুটি সব সময় ঘরে থাকলে কেমন লাগে বল। মেয়ে দুটোই বা কি ভাবে। আমি তোর নাতনিকে ফুসলে ফাসলে পালাব ভাবছিস! অথচ দ্যাখ কি মজা, ছাড়িয়েও দিচ্ছে না।

—বাপটা কি বলে?

—উনি তো সাহেব মানুষ। পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে যান আসেন। কথা বলেন না। আমার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত সম্মানে তাঁর বাধে। সব সময় ব্যস্ত। বাড়িতে লম্বা আলখেল্লার মতো সিল্কের কি এক বিদ্ঘুটে পোশাক পরে থাকেন। মুখে চুরুট। আর দেখলে কি সব কথা। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই—যেন শুনিয়ে দেওয়া বোঝ আমি কত দরের।

—মা-টা আসে না?

—কখনও মুখ দেখিনি।

—মাসিমা যে বলল, তোমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

—ওটা মা-র কথা, বাবার কথা। বাদ দাও। লতাপাতায় কি সম্পর্ক আছে! মাস দুই হয়ে গেল, একবারও জানতে চায়নি আমার বাবামশায়টি কেমন আছেন।

—অদ্ভুত তো। আগে মেসোমশাইকে চিনত।

—বাবা তো বলেন, মনোমোহন কাকা।

—কাকা হয়ে ভাইপো সম্পর্কে এত নীরব!

—আর নীরব। একদিন বলে কি জান?

—কি বলেন?

—তোমার বাবা কি করেন? আমার ইচ্ছে হয়েছিল বলি হাতি বেচা কেনা করেন। বলতে বাধল, শত হলেও বাবার খুড়োমশাই। আচ্ছা, কি বলা যায় বলত! বাবা তো যজন-যাজনে ব্যস্ত। বাবা

পুরুতগিরি করে বলতে লজ্জা লাগে না! বাপ পুরুতগিরি করে জানলে মেয়ে দুটোই বা কি ভাববে!

মুকুল বলল, এ যে দেখছি খুবই বড় সংকট। সুতরাং সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার একটাই পথ। যে করেই হোক কাগজটা বের করতে হবে। পরী এলে তুমি যাও। পরীর সঙ্গে নিখিলেরও ভাব আছে। ওরা দুজনেই যখন পার্টি করে তখন সংকট থেকে তারাই আমাদের উদ্ধার করতে পারে।

আমরা বুঝতে পারি আসলে দু'জনেই আমরা ভালবাসার সংকটে পড়ে গেছি। আমার বেলায় মিমি, কিংবা ম্যানেজার সাহেবের বড় মেয়ে নমিতা। আর মুকুলের বেলায় চৈতালি। মিমি আমাকে ভালবাসে না, বরং আমাকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসে।

আর মুকুলের ভালবাসার সংকট আবার অন্যরকমের। চৈতালির সঙ্গে তার আলাপই নেই। আজ পর্যন্ত একদিনও সে কথা বলে নি। শুধু তার বৌদি চৈতালির দিদিকে চেনে। কলেজে একসঙ্গে পড়ত।

শহরের ফাংশানে চৈতালি নেই ভাবা যায় না। উদ্বোধন সঙ্গীত কিংবা রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ওর প্রোগ্রাম ঠাসা। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা ওর গান শুধু শুনি। মুকুল কবিতা লেখে, চৈতালি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আর দেখতেও ভারি সুন্দর। এই একটা জায়গায় মুকুলের মনে হয়েছে, পৃথিবীতে একজন পুরুষই তার সঙ্গী হতে পারে। সে স্বপ্নেও চৈতালিকে দেখে। বিকাল হলেই সে আর ঘরে থাকতে পারে না। মন নাকি তার উদাস হয়ে যায়। যে করেই হোক চৈতালিকে একবার দেখতে না পেলে দিনটা তার মাটি।

মুকুল ঠিক টের পায়। বলে, না নেই। চল টাউন হলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রিক্সা করে ফিরতে পারে।

—কোথায় যায়?

—কে জানে! আসলে কি জান, ও ঠিক টের পেয়ে গেছে আমি ওকে ভালবাসি। চৈতালিকে লুকিয়ে রেখে মুকুলকে এভাবে শাস্তি দেওয়ার কোনো মানে হয়! আমাদের এটাও ইজ্জতের প্রশ্ন এখন। একটা কাগজ বের করতে পারলে বোঝানো যাবে আমরা একেবারে ফ্যালনা লোক নই।

মুকুল বলল, প্রেসে গেছিলাম।

—প্রেস ঠিক করে ফেলেছ?

—ঠিক হয় নি। তুমি তো জান, দিলীপদের প্রেস আছে, ওকে বললে কেমন হয়।

দিলীপ আমাদের কলেজের সহপাঠী। ওর বাবাকে দেখেছি। খাগড়া যেতে প্রেসটা পড়ে। বান্ধব প্রেস। একটা টেবিলে ওর বাবা চশমা চোখে বসে থাকে। সকাল বিকাল সব সময়। সন্ধ্যায়ও। ঝাঁটা গোঁফ। গোলগাল চেহারা। লোকটাকে দেখে খুব আমার ভাল লাগেনি। দিলীপ কলেজ ম্যাগাজিনে একটা গল্প দিয়েছিল। পরী সেটা ছাপেনি। সুতরাং কতটা সুবিধা মিলবে বোঝা মুশকিল।

দেখি পেছনে কখন নিখিল এবং সুধীনবাবু এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়টা আমরা গাছের নিচে গোল হয়ে বসে আড্ডা মারি। শহরের উঠতি যুবা আমরা। সবাই ভালবাসার ব্যাপারে নানারকম জটিলতায় ভুগছি। সুধীনবাবু ব্যর্থ প্রেমিক। নিখিল তার এক দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোনের প্রেমে পড়ে গেছে। প্রণব পাশের বাড়ির মেয়ে অপর্ণার সঙ্গে ভাবটাব করছে। প্রণবের বাবা, নিচের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বিকাল্ বেলাটায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকেন। যেমন লম্বা, তেমনি দশাসই চেহারা। মাসিমা এবং মেসোমশাই আমাদের দেখলেই বড় প্রীত হন। গেলেই, এক কথা, যাও, উপরে উঠে যাও। প্রণব আছে। ও লিখছে।

ছেলের জন্য এলাহি ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দোতলায় একটা বিশাল ঘর প্রণবের একান্ত নিজস্ব! সেখানে গেলে প্রায়ই দেখি, রায়বাবুর বড় মেয়ে প্রণবের চেয়ার টেবিল বই পত্র এবং বিছানা ঠিকঠাক করছে। একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো। কিন্তু প্রণব মেয়েটি সম্পর্কে কোনো আভাসই আমাদের দেয় না। ভালবাসে, না, বাসে না তাও বলে না। আমরা যখন আমাদের সঙ্কট নিয়ে আলোচনা করি সে তখন চুপচাপ থাকে। মাঝে মাঝে শুধু অর্ডার, অপু যাও, নিচে গিয়ে বল চার কাপ চা। অপু তখন নিচে চলে যায়। আর উপরে ওঠে না। বড় রক্ষণশীল পরিবারের মতো ব্যবহার। তবু একটা জায়গায় আমাদের মিল—সাহিত্য-চর্চার আসর। সব এক একজন অংশীদার। গেলেই প্রণব, তার খাতা বের

করে গল্প পাঠ করতে শুরু করবে। আমরা চায়ের লোভে, খাবারের লোভে গল্প পাঠ শেষ পর্যন্ত না শুনে উঠতে পারি না। ওঠার সময় বলি, চল—ঘুরব। বের হবার মুখে মেসোমশাইর একটাই কথা। টর্চটা নিয়ে যাও। জ্যোৎস্না রাত, রাস্তায় আলো, খুব দূর অন্ধকারে যাবারও কথা নেই, তবু মেসোমশাই প্রণবকে হাতে টর্চ না ধরিয়ে ছাড়বেন না। সুতরাং সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে প্রণব আছে, অথচ হাতে টর্চ নেই কোনদিন সেটা দেখিনি।

নিখিলের তখন এক কথা, তোর কিছু হবে না। জানিস তো লেখক কবিরা জীবনে খুব বেপরোয়া হয়। বেপরোয়া না হলে অভিজ্ঞতা হয় না। মহাস্থবির জাতক পড়ে ফেল। অসাধারণ, তুলনা নেই।

আমরা তখন কে কি পড়ছি, এটাও ছিল আড্ডার বিষয়। আমার অবশ্য কিছুই পড়া হয়ে ওঠে না। একটা চাকরির খুব দরকার। আর দরকার কলোনির গন্ধটা কিভাবে মুছে ফেলা যায়। পরী ঠিকই বলেছে, বিলু তুমি কবিতা লিখলে, গন্ধটা থাকবে না। তুমি একজন কবি। কবিরা কলোনিতেই থাকুক, আর শহরেই থাকুক তারা কবি।

আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। পায়ের কাছে নিখিল সুধীনবাবু বসে। মুকুল মাথার কাছে। আমার মন খারাপ। কলোনির ছেলে বললে, কাঁহাতক ভাল লাগে। কলোনিতে কোনো মানুষ থাকে না, এটা বোধহয় ওরা ভাবে। ওরা যত না ভাবে আমি তার চেয়ে বেশি ভাবি। সেদিন এই যে বলা, লজ্জা কি, ও তো কলোনির ছেলে,—সেটা আমাকে বড় কাবু করে রেখেছে।

সুধীনবাবুই বলল, কি, কতদূর এগোল!

আমি উঠে বসলাম। বললাম, পরী কানপুর থেকে কবে ফিরবে?

নিখিল বলল, কানপুর যায় নি। কাঁদি গেছে। 'মহেশ' নাটকে ওর পাঠ আছে। মুকুল বলল, যাই হোক কিছু করতে হবে। আর অপমান সহ্য করতে পারছি না।

—কিসের অপমান? বলে নিখিল একটা সিগারেট ধরাল।

—আছে, তোমরা বুঝবে না।

—কাগজের নাম ঠিক করে ফেলেছ?

আমি বললাম, ঠিক হয়ে গেছে!

—কি নাম হবে?

—চৈতালি।

সুধীনবাবু বলল, মন্দ না নামটা। এখন পরীর পছন্দ হয় কিনা দেখ।

পরীর পছন্দ না হলেও কিছু করার নেই। এই নামই থাকবে। কারণ বুঝতে পারছি, মুকুলের এ ছাড়া অন্য নাম পছন্দ হবে না। —তবে একটা কথা, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, সম্পাদক আমি হতে পারব না। আমি সঙ্গে আছি।

মুকুল বলল, বেশ সঙ্গে থাকলেই হবে।

সুধীনবাবুই বলল, তোমার টিউশনির খবর কি? খুড়োমশাই তোমার বাবার কোনো খবর নিলেন?

—না।

ওরে বাপস্, দেখি পরী পেছনে। সাইকেল থেকে নেমে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে—তোমরা এখানে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বিলু, তোমার বাড়ি গেছিলাম।

—তুমি না কাঁদি গেছ!

—কে বলল?

—এই যে নিখিল বলল।

—যাঃ, আমি কখন বললাম। আমি জানিই না কিছু। নিখিল বেমালুম অস্বীকার করে ভাল মানুষ সেজে গেল।

—যাকগে, শোন। মেসোমশাই খুব দুঃখ করলেন। বিলুটার মতি গতি বুঝতে পারছি না। ওর যে কি হয়েছে। টিউশনিটা ছেড়ে দেবে বলছে কেবল।

ইস! বাবার কি মতিভ্রম হয়েছে—পরীকে সব কথা বলার কি দরকার। পরীকে তো বাবা এর আগে কখনও দেখেনি। নামও শোনে নি। আমি গুম মেরে থাকলাম।

পরী বলল, সত্যি টিউশনি ছেড়ে দিচ্ছ!

—জানি না।

—ছাড়লে ভাল হবে না। মেসোমশাই কি সুন্দর মানুষ। নিজে আম কেটে খাওয়ালেন। বললেন, বড় সৌভাগ্য মা, তুমি এয়েছ। তোমাকে তো দেখলে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মনে হয়। বিলু তোমার সঙ্গে পড়ে!

আমি মিমির সঙ্গে পড়ি এটা আমার বাবার কত বড় সৌভাগ্য কথায় বার্তায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

—শোনো!

পরী এলে আমরা আর কেউ কথা বলতে পারি না। এমন জাঁহাবাজ মেয়ের সঙ্গে কেউ কথা বলে পারেও না। পরী পার্টির কর্মী বলে, এক দঙ্গল যুবার সঙ্গে যতক্ষণ খুশী বসে থাকতে পারে। তবে পরীকে আমরা বলে দিয়েছিলাম, তুমি সব বলতে পার। কিন্তু বিপ্লব ফিপ্লব নিয়ে কোনো কথা বলবে না। পার্টির ইস্তাহার হয়ে কথা বললে, তক্ষুনি আমরা চলে যাব। ফলে মিমি আমাদের সঙ্গেই একটু প্রাণ খুলে অন্যরকম কথা বলতে অভ্যস্ত।

—কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না? পরী লাল রঙের লেডিজ সাইকেলটি এবারে ঝপাৎ করে মাটিতে ফেলে আমার মুখের সামনে এসে বলল, কি বলছি, শুনতে পাচ্ছ না! কেবল চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে জান। উঠে বসতে শেখনি।

—ধুস, ভাল্লাগে! উঠে বসলাম ঠিক, কিন্তু ভেতরের ক্ষোভ আরও বাড়ছে। বললাম, তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি কেন গেছিলে বল। তোমাকে বলেছি না আমাদের বাড়িতে যাবে না।

—কবে বললে?

সত্যি কবে বলেছি মনে করতে পারি না। আদৌ বলেছি কিনা জানিও না। তবে পরী আমাদের বাড়ি গেলে আমরা কত হত দরিদ্র টের পাবে। একজন সহপাঠিনী শুধু কি সহপাঠিনী—জ্যোৎস্না রাতে মহা-অষ্টমীর দিনে পরী অমন একটা লোভে আমাকে ফেলে না দিলেই পারত। কালীবাড়িতে ওর কি যে দরকার ছিল জ্যোৎস্না রাতে রেল-লাইন ধরে হাঁটার।

নিখিল চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে বলল, তোরা কি! দেখা হলেই ঝগড়া। এ কি রে বাবা। তা গিয়েছে তো কি হয়েছে। আমরা যাই না!

পরী লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরেছে। হাত খালি। ডান হাতে সোনার ব্যান্ড দেওয়া ঘড়ি। পায়ে হলুদ রঙের স্লিপার। ওর রঙ শ্বেত চন্দনের মতো। বিকেলের লাল আভায় কোনো ফোটা পদ্মের মতো মনে হয়। পরীকে দেখলে, আমার মধ্যে বড় উষ্ণতার জন্ম হয়—কিন্তু পরী আমাকে বাড়ি গিয়ে আসলে হেয় করতে চেয়েছে, ওটাও কেন জানি ভুলতে পারছি না। কে জানে বাবা তখন গামছা পরে আমগাছ থেকে আম পাড়ছিলেন কি না। কে জানে পুনুটা কি করছিল। ওকে তো কিছুতেই প্যান্ট পরানো যায় না। উলঙ্গ হয়ে ঘোরে। আমি রাগ করলে বাবা বলবেন, ছেলেমানুষ, থাকুক। যতদিন শরীর খোলামেলা রাখা যায়। বন্ধন বড় কঠিন বিষয়। শরীর খোলামেলা থাকলে হাওয়া বাতাস লাগে। মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। বাবা বাড়িতে খালি গায়ে থাকেন। মা বাড়িতে কোনোদিন ব্লাউজ পরে না। মায়াটা শাড়ি পরতে শিখেছে। কিন্তু শাড়ির সঙ্গে সায়া ব্লাউজ দরকার মা কিংবা বাবা কিছুতেই মানতে রাজি নয়। বাড়িতে আবার কে কবে সারা শরীর মুড়ে বসে থাকে। অসুস্থ হয়ে পরবে না। আর পিলুর কথা না বলাই ভাল। হাফ প্যান্ট পরে গলায় গামছা প্যাঁচিয়ে সে হয়তো পরীকে দেখা মাত্র মাকে বলেছে, কে মা? আমাদের কে হয়? মা পিলুকে কি বলেছে কে জানে।

আমি গুম হয়ে আছি দেখে পরী বলল, অনেকদিন দেখা নেই। মনটা খারাপ লাগছিল তাই গেলাম। তুমি তো একবার দয়া করে যেতে পারতে। কোনো গুণ তো নেই। মুখ ভার করে বসে থাকা। বাপ জ্যাঠাদের মতো হুম! অত মুখ ভার করে থাকলে কাহাতক ভাল্লাগে।

আমি পায়ের উপর পা রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে আছি। পরীর কোন কথা শুনছি না এমন উদাস ভাব।

—মেসোমশাই দুঃখ করলেন, তোমার সঙ্গে পড়ে মা। ওকে একটু বুঝিয়ে বল! কুড়ি টাকা! সোজা কথা! কুড়ি টাকায় এক মণ চাল হয়। এভাবে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! তা খুড়োমশাই এ দেশে এসে আমাদের নাই চিনতে পারেন। ছেলে কত কৃতী বল! মিলের ম্যানেজার সোজা কথা। তাদের আত্মীয় কলোনিতে থাকে, এতে ওরা ছোট হয়ে যেতেই পারে। তুই গরীব বামুনের ছেলে, তোর কি এ সব নিয়ে মান-অভিমান সাজে! বলে পরী চুপ করে আমাকে কান্নি মেরে দেখল।

আমি মুখ বিকৃত করে বললাম, থামলে কেন। চালিয়ে যাও। মোটরে কি তেল ফুরিয়ে গেছে।

—তেল ফুরাবে কেন! সব ঠিকই আছে। টিউশন তুমি ছাড়বে না বলে দিলাম।

—আদেশ!

—আদেশ উপদেশ বুঝি না। মেসোমশাই কী সরল সোজা মানুষ। তুমি তাঁর ছেলে ভাবতে অবাক লাগে! বুঝলে নিখিল, এক একটা আম কেটে দিচ্ছেন, আর বলছেন, এটা শা-দুল্লা, এটা রাণীপসন্দ, এটা বোম্বাই। সবই মা আমার হাতে লাগান। কেমন মিষ্টি না! সুস্বাদু না! গাছের কলম কোথা থেকে এনেছেন, মুর্শিদাবাদের কার বাগানের কলম, দশ ক্রোশ দূর থেকে নাকি একটা আমের কলম মাথায় বয়ে এনেছিলেন...

আর আমার সহ্য হচ্ছে না। বললাম, এই আমি উঠলাম।

সুধীনবাবু বলল, তার মানে! কথা ছিল, আজ কাগজের নাম, কে কি ভার নেবে ঠিক হবে—চলে গেলে হবে কেন!

—নাম ঠিক করে ফেলেছি বললাম তো। আমি উঠতে গেলে পরী খপ করে হাত চেপে ধরল। বলল, তোমার মাথা খারাপ আছে বিলু।

—হ্যাঁ আছে। আমার মাথা এখনও ঠিক আছে ভাবলেই বরং কষ্ট পাই। তারপর পরীকে আঘাত করবার জন্য বললাম, যতই গণসংযোগ কর, কোনো লাভ হবে না। বাবাটি গান্ধী মহারাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না।

—কি বললে!

—বললাম তো গণসংযোগে কোনো কাজ হবে না।

—আমি গণসংযোগ করতে তোমাদের বাড়ি গেছিলাম ভাবছ!

—তাছাড়া কি!

—তুমি বিলু এটা বলতে পারলে।

আমি আচরণে কেমন আরও রূঢ় হয়ে উঠলাম। বললাম, এটা তোমাদের বিলাস পরী!

—বিলাস!

—হ্যাঁ বিলাস! হাত ছাড়। আমি এখন যাব।

হঠাৎ দেখি পরীর চোখ চিক্‌চিক্ করছে। সে সহসা মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেন কেউ আমরা ওর মুখ দেখতে না পাই। সে আমার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। পরীর মুখ ভাল করে ফের দেখা না পর্যন্ত আমি কেমন অস্থির হয়ে পড়ছি। পরীকে এভাবে অপমান করা বোধহয় আমার ঠিক হয়নি। এই নিয়ে পরী কতবার যে আমার অপমান সহ্য করেছে। অথচ পরী আজ পর্যন্ত আমাকে কোনোদিন অপমান করার চেষ্টা করেনি। বরং আমাকে বড় করে তোলার মধ্যে ওর কোথায় যেন একটা বিজয়ের ভাব আছে। অথচ আমি তাকে সব সময় পরাজিত দেখলে আনন্দ পাই।

মুকুল নিখিল প্রণব সবাই তটস্থ। সুধীনবাবু পরীকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে। সে বলল, এই মিমি, বোস, তোরা যে কি!

মুকুল বলল, বিলু বোস তো। বলে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। কিন্তু পরী তখনও দাঁড়িয়ে। লালদীঘির দিকে মুখ। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

আমি একটা কথা বলতে পারছি না। বাবার সরল সহজ জীবন আমাকে এভাবে পীড়া দেবে বুঝতে পারিনি। বিশেষ করে পরীর কাছে এত সব বলার কী যে দরকার। বাবা কেন বুঝতে পারেন না, যারা আমাকে চাকর-বাকরের মতো দেখে, তাদের গুণগান পরীর কাছে কেন, কারো কাছেই করা ঠিক না। যারা আত্মীয় বলে আমাদের স্বীকার করে না, অথচ তাদেরই গর্বে বাবার মুখ কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভাবতে কষ্ট লাগে। মাথাটা এমনিতেই খারাপ হয়ে আছে। বার বার বলেছি, আপনি কখনও কারো কাছে মিলের ম্যানেজার আপনার আত্মীয় বলে পরিচয় দেবেন না। কে শোনে কার কথা! পরী যেতেই শুনিয়ে দিয়েছে, আমাদের দিন এমন ছিল না মা। গত জন্মের পাপ ভোগ। যেন বাবা ছিন্নমূল না হলে পরীকে বৌমা করেও আনার ক্ষমতা ছিল তাঁর! বাবা তো জানেন না, পরীদের কি বিশাল বাড়ি, সদর দরজায় দারোয়ান। পরীর দাদু এই শহরের চেয়ারম্যান। পরীর দাদা বৌদিরা সব যেন অন্য গ্রহের জীব। পরীকে দেখেই সেটা বাবার টের পাওয়া উচিত ছিল। পরী কী একবারও বলেছে, তার দাদুর নাম এই, তারা এই শহরের সবচেয়ে বনেদী পরিবার। আহাম্মক না হলে কে এত সব বলে! বাবার সারল্য কেন জানি আজকাল আমার একদম পছন্দ না। বাবাকে আহাম্মক ভাবতে কষ্ট লাগে। চোখে জল চলে আসে। আমিও গুম মেরে গেছি। কারণ সবার কাছে দারিদ্র্যের জ্বালা কত বড় চোখের জলে না আবার ধরা পড়ে যাই।

পরী আমার সামনে বসে। আমি আর ওর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। সবাই আজকাল একটু বেশি সাহিত্য-পাগল হয়ে উঠেছি কাগজের নামে। মুখে যতই বলি না, আমি এর মধ্যে নেই খাটাখাটনিতে আছি, তবু জানি গোপনে কবিতা লেখার বাসনায় ভুগছি। আর এই বাসনা, আর কাউকে খুশি করার জন্য যেন লেখা। আমরা কেউ কথা বলছি না। দু-একটা গাছের পাতা আমাদের সামনে হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছে। দূরে রেললাইন মাঠ পার হয়ে, একটা মালগাড়ি যাচ্ছে।

আমরা সবাই উসখুস করছি কথা বলার জন্য। কিন্তু কিভাবে আবার আড্ডার স্বাভাবিক প্রাণ ফিরে পাব বুঝতে পারছি না।

পরীই দেখলাম পারে। সহসা সে হেসে ফেলল।

পরীর হাসি আমাকে একেবারে হালকা করে দিল। আবার পরমুহূর্তেই মনে হল, এমন এক ঝড় ওঠার পর এত নির্মল আকাশ সহসা কে কবে আশা করে। পরী মুহূর্তে গম্ভীর, মুহূর্তে লঘু হয়ে যাওয়াটাও আমার কেন জানি পছন্দ না। বললাম, হাসির কি হল! এই প্রথম ওর দিকে ঝড়ের পরে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, চোখের জলের দাগ এখনও সজীব।

পরী বলল, হাসব না তো কি করব! কারো মুখে রা নেই। যেন সবাই বিষণ্ণ চিত্তে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ দেখছি। তোমাদের মুখ চোখ কি হয়ে গেছে!

মুকুল বলল, বিলুটা ও রকমই।

পরী বলল, শুধু বিলু হবে কেন, তোমরা সবাই। এত করে বললাম, কাগজের নাম ঠিক করে ফেল, বাকিটা আমি দেখছি। কাগজের নাম ঠিক করতেই দেখছি বাবুরা সব হিমসিম খাচ্ছেন।

আমি বললাম, কাগজের নাম ঠিক হয়ে গেছে।

—আমাকে জানাও নি তো! পরী আঁচল জড়িয়ে আরও পা ঢেকে বসল।

—শুনলাম তুমি কানপুর যাচ্ছ। বাড়ি থাকবে না।

—কানপুর যাবার কথা ছিল। তোমাদের কাগজের কথা ভেবেই যাইনি।

—তুমি কানপুর যাচ্ছ শুনেই, আমাদের আর তোমার কাছে যাওয়ার দরকার আছে মনে হয়নি।

—তোমার কবে আমাকে দরকার মনে হয়েছে জানি না তো।

মুকুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আবার! তোমরা এমন করলে এক্ষুনি উঠে পড়ব। পরীকে দেখলেই তুমি যে কেন এত রেগে যাও বুঝি না।

মুকুলের দিকে তাকিয়ে পরী বলল, বাদ দাও তো। ও ওরকমই। কবে থেকেই ঠাকুর চিনে বসে আছি। এখন যা বলছি শোনো—কি নাম ঠিক করলে? সুধীনদা তোমার মাথায় কোনো নাম আছে?

—আমি তো বলেছিলাম, 'ইংগিত' নাম হবে।

—আর পারা যায় না। বললাম, নাম ঠিক হয়ে গেছে বলছি না।

—কি নাম?

—চৈতালি নামটাই আমাদের পছন্দ।

মুকুল বলল, ইংগিত নামে একটা কাগজ মেদিনীপুর থেকে বের হয়।

প্রণব বলল, স্মরণ নামটা কিন্তু দারুণ।

এবারে সত্যি উঠতে হয়। কাগজ বের করার পরিকল্পনা মুকুলের। কাগজ বের করতে পারলে আর কিছু না হোক যাকে ভালবাসে তার একটা নিদর্শন থাকবে। নামের মধ্যে সেটা সে প্রকাশ করতে চায়। চৈতালির দিদিরা তাকে এত হেলাফেলা করে, কাগজ বের করতে পারলে বোঝাতে পারবে রুচি তার কত উঁচু। গোপন ভালবাসা কত মধুর মুকুলের মুখ না দেখলে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতালি নামটাই যদি না রাখা গেল তবে কাগজ বের করার দরকার কি। বললাম, আমি যাই। তোমরা নাম ঠিক কর।

মুকুলের মুখটা ভারি বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। পরী যখন কাগজের দায়িত্ব নিতে চাইছে, তখন কাগজ বের হবেই। কিন্তু যদি নামটাই বাতিল হয়ে যায় তবে আমরা এতে নেই। আমরা দু'জনে যে করে পারি, এক দেড় ফরমার কাগজ হলেও বের করব এবং তার নাম রাখব চৈতালি।

আমাকে উঠতে দেখে পরী বলল, তুমি যে বললে নাম ঠিক করে ফেলেছ। নামটা বলবে তো।

মুকুল চুপচাপ। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সাঁজ লেগে গেছে কখন। চারপাশের আলোক উজ্জ্বল শহরের এই নিরিবিলি মাঠে বসে সে যেন একা এখন আকাশের তারা গুণছে।

—বললাম তো, আমার ইচ্ছে কাগজের নাম চৈতালি রাখি।

—বা সুন্দর নাম! সুধীনদা, তুমি কি বলছ?

—খারাপ না।

নিখিল বলল, এরা দুজনেই ক্ষ্যাপা আছে। চটিয়ে লাভ নেই। পরীরও যখন পছন্দ, চৈতালি নামই থাকুক।

রাত বাড়ছে।

পরী বলল, টাকার জন্য ভাবতে হবে না। আট-দশটা বিজ্ঞাপন যোগাড় হয়ে যাবে। ওতে কাগজের খরচ উঠেও কিছু থাকবে। এখন দয়া করে লেখাগুলি তোমরা দিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি, পরী উঠে দাঁড়াল।

আমরাও সবাই উঠে দাঁড়ালাম। পরী এই প্রথম আমাদের আড্ডায় এসেছে। পরীর সম্মানার্থেই যেন আমাদেরও এবার আড্ডা ভঙ্গের দরকার। আমার ভাঙ্গা সাইকেলখানায় পা রেখে যাবার সময় পরীকে কাছে ডাকলাম। কাছে এলে বললাম, তুমি আর আমাদের বাড়ি যাবে না।

—কেন! পরী কেমন বিস্ময়ের গলায় কথাটা বলল।

—গেলে অপমানিত বোধ করব। মনে রেখো। তারপরও বলতে পারতাম, আগে বাবার ছিল দিনেশবাবু। এখন মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরী। বিপদে আপদে কিংবা পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে, তখন দিনেশবাবুর দোহাই। দিনেশবাবুকে চেনেন না—ঢাকার এত বড় জমিদার, আমি তার সেরাস্তার লোক, কত বড় কথা! এখন এসে দাঁড়িয়েছে মিলের ম্যানেজারে। আমার ভয়, পরী গেলে বাবা যে দেশবাড়িতে গোমস্তা ছিলেন, সেটাও না প্রকাশ হয়ে পড়ে। বলে ফেলেন, আমরা দেশে তো মা এমন ছিন্নমূল ছিলাম না। ঘর বাড়ি জমি জমা, তারপর জমিদার বাড়িতে আদায়ের কাজ, কত কিছু ছিল। কারণ আমার বাবার কাছে কিছুই হেলা ফেলার নয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এক বিষয়ে পাশ করতে পারি নি, কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছি—তাতে আমি দমে গেলেও বাবা দমেন নি। বলেছিলেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে নটা বিষয়ে পাস সোজা কথা। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে। বুঝলে, পরী বিলু দশটা বিষয়ের মধ্যে নটা বিষয়ে পাস করেছে। সুতরাং এ হেন বাবাটি পরীর কাছে, তার পুত্র-গৌরব শেষ পর্যন্ত কোথায় কতদূর নিয়ে যাবে কে জানে। আমি কম্পার্টমেন্টালে পাস পরী জানলে আমার যে মাথা কাটা যাবে, তা আর ভালমানুষ বাবাটিকে বোঝাই কি করে।

পরী কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তারপর দুম করে বলে বসল, আমি যাব। আমি গেলে তোমার অপমান! দেখি সেটা কতদূর। বলেই সে বেগে সাইকেলে উঠে টাউন হলের রাস্তায় উঠে গেল। পরীকে আর দেখা গেল না। অন্ধকারে আমি একা। পরী আমার সঙ্গে কথা বলছে বলে মুকুল কাছে আসছে না। পরী চলে যেতেই সে এসে বলল, পরী চলে গেল!

আমি বললাম, না চলে যায় নি। আবার যাবে বলে গেল।

পৃথিবীতে কি যে দারুণ দাবদাহ—ক্রমে টের পাচ্ছি। বড় হওয়ার এই সংকট থেকে কি করে পরিত্রাণ পাব জানি না। বাড়ি ফিরে যেতে হয় যাই। কেমন ক্রমে স্বার্থপর হয়ে উঠছি। আগেকার সম্পর্কগুলি ক্রমে কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে একদম মন টেকে না। কেমন উড়ো স্বভাব গড়ে উঠছে আমার মধ্যে।

পরী যখন বলেছে, যাবে, সে যাবেই।

আমরা দুজনে সাইকেল চড়ে কারবালার রাস্তার দিকে যাচ্ছি। মুকুল আমাকে রেল-লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসে। অবশ্য রেল-লাইনের গুমটি ঘরের কাছে এলেই আমাদের মনে হয় এখনও ফেরার সময় হয়নি। ফিরে কিই বা করব। ফিরলেই দেখব বাবা বসে আছেন জলচৌকিতে—মা দরজায় ঠেস দিয়ে। আমি না ফিরে গেলে যে মা খাবে না, মা জেগে থাকবে—এটা যেন আর এখন কোনো ব্যাপারই না। বরং মা আমার জন্য জেগে থাকে বলে রাগ হয়। মা বাবা খেয়ে নেয় না বলে রাগ হয়। ওদের জন্যই আমার দেরি করা চলে না। মনটা উসখুস করে। মুকুলের অনুরোধ রাখতে পারি না।

এই আর একটু বোসো না। এমন বললে কেন জানি উঠতে ইচ্ছে হয় না। আশ্চর্য সব স্বপ্নের মধ্যে আমরা কাছাকাছি মানুষ। আমাদের স্বপ্নের কথা কেউ জানে না। আমরা নিজেরাও জানি না সেই স্বপ্নটা কি! যেখানে পরীরা ঘুরে বেড়ায় চৈতালিরা জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে—সমবয়সী সব যুবতীরা তাড়া করছে আমাদের এটুকু শুধু বুঝতে পারি। ওদের নিয়ে আমরা কতদূর যেতে পারি জানি না। শেষ পর্যন্ত তো সেই মা বাবা, এবং জীবনে এত সব উদ্বেগের শরিক—যেমন আমার মা বাবা এখনও জেগে বসে আছেন।

মুকুল বলল, কি ব্যাপার একেবারে চুপ মেরে গেলে!

—না ভাবছি।

—কি ভাবছ?

—আচ্ছা পরী কেন যাবে?

—গেলে কি হয়! তুমি এই নিয়ে মাথা গরম করছ কেন বুঝি না। পরী তোমাকে ভালবাসে।

—ধুস ভালবাসা। ও আসলে আমাকে অপমান করতে চায়। তুমি একদম পরীর কথা বলবে না।

মুকুল বুঝতে পারে কোথায় আমার লেগেছে। আমরা গুমটি ঘরের কাছাকাছি এসে গেছি। এদিকটায় খুবই নির্জন। কেবল বোস্টাল জেলের আলো জ্বলছে রাস্তায়। বড় বড় সব রেন ট্রি রাস্তার দু-পাশে। দু-একজন সাঁওতাল বাদুড় ধরার জন্য গাছের নিচে ওৎ পেতে বসে আছে। হাতে সরু লম্বা বাঁশ। বাঁশের ডগায় পাখি ধরার খাঁচা।

সামনে ঘাসের একটি চটি মতো আছে। গরমকাল বলে সাপখোপের উপদ্রব। টর্চ জ্বেলে মুকুল এগিয়ে গেলে বললাম, আজ আর বসব না। চলি।

—গিয়েই তো মুখ ভার করে মেসোমশাইকে এক চোট নেবে।

—আচ্ছা তুমিই বল, বাবার কি দরকার বলার ম্যানেজার আমাদের আত্মীয় হয়। তুমি জান, এই যে যাই, একদিন বলে না, মাস্টারমশাই আপনার চা! পড়াই আর দেখি আমার সামনে দিয়ে চা জলখাবার যাচ্ছে বসার ঘরে। সব বন্ধু-বান্ধব ম্যানেজারের। ক্লাবের মেম্বার। শহরের এস ডি ও। পুলিশ সাহেব কত সব মহামান্য ব্যক্তি যে আসেন সকাল সন্ধ্যায়। নিজেকে তখন এত ছোট মনে হয় যে সব ভাঙচুর করে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। সেই লোকটাকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে আমি লজ্জা বোধ করি। আর দেখ বাবা পরীকে পর্যন্ত জানিয়ে দিয়েছে। বল, মাথা গরম হবে না!

মুকুল পাজামা পাঞ্জাবী পরে আছে। আমি পরেছি প্যান্ট শার্ট। বাড়িতে ঘটি গরম করে একই

জামা প্যাণ্ট ইস্ত্রি করে নিই। মুকুলের জামা প্যাণ্ট ধোপা বাড়ি থেকে ধুয়ে আসে। আমার পাশে যেন কাউকেই মানায় না। এরা যে আমাকে এত কাছের ভাবে সে শুধু কলেজ ম্যাগাজিনে আমার লেখা অসাধারণ কবিতার জন্য। হবু সব কবি মহলে এই নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন চলছে। মুকুলকে বললাম, কাগজটা বের না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

মুকুল বলল, আমিও না।

—কিন্তু আমাকে যে দেখছি কবিতাই লিখতে হবে।

—কবিতাই লেখ না। কলেজ ম্যাগাজিনে তো তুমি দারুণ লিখেছিলে। পরী সবাইকে বলেছে আমার অবিষ্কার! পরীর এই নিয়ে একটা গর্ব আছে।

—তা'লে কবিতাই লিখছি। তবে শোন, মুকুলের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললাম, তুমি দয়া করে পরীকে বলবে ...

—কি বলব?

—না, এই মানে, পরী না হলেও চলছে না। কি যে করি। আচ্ছা, পরী খুব ওকগুঁয়ে, না?

—সে তো তুমি আমার চেয়ে ভাল জানো।

—কিন্তু পরীকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এতদিনেও ঠিক জানি না পরী আমার কাছে কি চায়।

—বললাম, পরী যখন দায়িত্ব নিয়েছে, তখন মনে হয় পত্রিকাটি আমাদের সত্যি বের হবে।

—বের করতেই হবে। বের না করলে ইজ্জত থাকবে না। চৈতালি জেনে গেছে আমরা কাগজ বের করছি। ঠাট্টা করে বলেছে, তা'লেই হয়েছে। মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করা যাদের স্বভাব—তারা বের করবে পত্রিকা। আমাদের চরিত্রে নাকি দৃঢ়তা নেই।

—কে বলল! অবাক হয়ে বললাম।

—অপু।

—মানে প্রণবের প্রণয়ী?

—হুঁ, সেই রানী। প্রণব আমায় বলেছে, কেউ যেন জানতে না পারে। চৈতালির দিদিরা মনে করে আমরা সব উচ্ছন্নে-যাওয়া ছেলে। আমাদের দিয়ে কিছু হবে না। কাগজ বের করছি শুনে কী হাসাহাসি! নীতার দেওরটার মাথা খারাপ আছে বলেছে। আর সঙ্গে যে থাকে তার তো আরও বেশি। আমরা নাকি লালু ভুলু। পরীকে আমাদের মক্ষীরানী বলেছে।

—আচ্ছা!

অন্ধকারেও দেখলাম, মুকুল গম্ভীর। চৈতালি প্রসঙ্গে আর বেশি কথা বলা ঠিক হবে না। আমাদের তো আরও সংকট সামনে। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে কিছুই জানি না। রেজাল্ট বের হতেও খুব দেরি নেই। পাস করতে পারব কি না তা নিয়েও সংশয়। যদি ফেল করি তখন কি হবে। টিউশন কি তখনও চালিয়ে যেতে পারব। একজন ফেল ছাত্রের পক্ষে ম্যানেজারের দুই মেয়েকে পড়ানো কি যে মর্মান্তিক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত বাবার এক মণ চালের আয়টা যাবেই। তার আগে কাগজটা বের করতে পারলে বেশ হবে। ফেল করলে আমাদের কার কি মতি হবে কে জানে। তবে পরী পাশ করবেই। সে দু বিষয়ে লেটার পাওয়া ছাত্রী। আমার মতো কম্পার্টমেন্টালে পাস নয়। ওর সায়েন্স, আমার কমার্স। পরিচয় কালীবাড়ির সূত্রে। কলেজে সে আমাকে কখনও দেখেছে প্রথম আলাপে বিশ্বাস করতে পারে নি।

নিখিল মুকুল এরা আমাকে তবু বিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর ভাবে। সেটা যে পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, আমার কিছু আচার নিষ্ঠা, এবং বাড়িতে খালি গায়ে পৈতা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বুঝতে কষ্ট হয় না। আমাকে বিদ্যাসাগর বলে ওরা আনন্দ পায়। আমিও ওদের এক একজনের নাম দিয়ে ফেলেছি —যেমন মুকুলকে আমরা ডাকি বিহারীলাল। তার কাব্যে নাকি বিহারীলালের প্রভাব আছে। সুধীনবাবু আমাদের এ কালের মোহিতলাল। দেখা হলেই, সম্ভাষণ, এই যে মোহিতলাল মশাই, আধুনিক গদ্যরীতি সম্পর্কে আর কিছু ভাবলেন?

আসলে আমরা সামনের এক গভীর কুয়াশার দিকে হেঁটে যাচ্ছি—কিংবা প্রহেলিকা বলা যায়।

সংসারে যে নিশ্চিত আয়ের খুবই দরকার হয়ে পড়েছে বুঝতে পারি। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে বড় হওয়া কত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ভাই-বোনগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। তাদের পরবার মতো ভাল জামাকাপড় পর্যন্ত নেই। বললাম, জামাইবাবু আর কিছু বললেন?

—হবে। সারকুলার এলেই তুমি এপ্লাই করবে। হয়ে যাবে মনে হয়।

—বাড়ি থেকে দূরে হবে না তো।

—কাছাকাছি কোনো স্কুলে দিতে বলব। ছোড়দি বলেছে, বিলুটার জন্য কষ্ট হয়।

মুকুলের ছোড়দির আমার জন্য কষ্ট হবারই কথা। বিকেল বেলায় একবার ছোড়দির বাসায়ও আমরা রাউণ্ড দিয়ে আসি। অনেকদিন গেছে, ছোড়দির বাসায়ও আমাকে মুকুলকে থাকতে হয়েছে। জামাইবাবুর ট্যুর থাকে। মাঝে মাঝেই রাতে তাঁর ফেরা হয়ে ওঠে না। তখন আমাকে আর মুকুলকে ছোড়দির বাড়িতে রাত কাটাতে হয়। আমার জন্য সেদিন ছোড়দি বেশ ভাল মন্দ রান্না করে রাখে। আমরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলে, ছোড়দি খুব খুশি হয়। সুতরাং আমার জন্য ছোড়দির কষ্ট হতেই পারে। ছোড়দি নাকি বলেছে, আর কারো না হলেও যেন বিলুর কাজটা হয়। সুতরাং সার্কুলার এলে আমার চাকরি হয়ে যাবে এই একটা আশায় বুক বেঁধে আছি। তখন আর কে যায় টিউশনি করতে। আশি টাকা মাইনে—ভাবা যায়। বাবার হাতের কাছে স্বর্গ ঝুলে আছে বাড়ি গেলেই টের পাই। আমার চেয়ে বাবার বেশি উদ্বেগ এ ব্যাপারে। বাড়ি গেলেই বলবে, মুকুল কিছু বলল।

কিছু বলল, মানে, চাকরির কথা জানতে চান। বাবা তখন এমন নিরুপায় চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন যে তাঁকে নিরাশ করতে কষ্ট হয়। বলি, হবে। সার্কুলার এলেই হয়ে যাবে।

রাত বাড়ে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে থাকে। গাছপালা কেমন অন্ধকারে নিথর। সোজা পাকা সড়ক চলে গেছে। আগে এই বাদশাহী সড়কটা ছিল খোয়া বাঁধানো। এখন সরকার থেকে পিচ ঢেলে পাকা করে দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটা গেছে লালবাগের দিকে। রেল গুমটি পার হলে দু' দিকে দুটো সড়ক। কারবালা দিয়ে গেলে রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বড় বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কবরখানা পার হয়ে রাস্তাটা আমাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। আগে কালীবাড়ি থাকতে এই রাস্তায় কতবার গেছি। ইঁটের ভাটা পার হয়ে নবমী বুড়ির কুঁড়ে ঘর পার হয়ে ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুটা মাঠ ভাঙলে আমাদের বাড়ি। দিনের আলোয় সাহস পেলেও, রাতে ঐ রাস্তা ধরে একা যেতে ভয় করে। বাদশাহী সড়ক ধরে যাবারও একটা ল্যাটা আছে। সড়ক থেকে নেমে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পে ঢুকে যেতে হয়। রাত বেশি হলে, সিপাই হল্ট বলে চিৎকার করবেই। তখন বলতে হয় আমি পিলুর দাদা। ব্যস, এই যে কথা, পিলুর দাদা, এতেই হয়ে যায়। পিলুর খ্যাতি সর্বত্র।

তারপরই ট্রেনিং ক্যাম্পের আর্মারি। আর্মারি পার হলে মাঠ। মাঠে কাঁটা তারের বেড়া। মাঠে নামলেই আমাদের পাড়াটা চোখে পড়ে। বেড়ার গেট পার হলে দেখতে পাই লম্ফ জ্বলছে ঘরে ঘরে। অন্ধকার রাতে এগোনো কঠিন। গাছপালার ছায়ায়, নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। তবু পথটা এত চেনা যে, যেতে কোনো কষ্ট হয় না। কুকুর বেড়াল কিংবা মানুষের গায়ে না পড়ি এ জন্য অনবরত ক্রিং ক্রিং বেল বাজাই। যারা আছে সরে যাও বলি। বাবা মা এমন কি পিলু দূর থেকেই তখন টের পায় তার কলেজে পড়া দাদাটি ফিরছে। দেশের জন্য আর কারো তেমন কোনো মায়া-মমতা নেই। যেন চলে এসে আত্মরক্ষা করা গেছে। এবং মান মর্যাদা বিপন্ন হবার আর ভয় নেই। আমাদেরও আর মনে হয় না, আমরা ছিন্নমূল। বরং এই যেন আমাদের দ্বিতীয় জন্মভূমি। এমন কি কোথাও গিয়ে আজকাল আর ভালও লাগে না। বাড়িতে মন টেকে না, সে অন্য কারণ। যদি কাজ হয়, বাড়ির কাছে হলে ভাল হয়। বাড়ির কাছে না হলে কাজটা নেওয়া ঠিক হবে কি! কারণ এই বাড়ি ঘরের সঙ্গে বাবার মতো আমিও এক গভীর মায়ায় জড়িয়ে গেছি। বাড়ির গাছপালা, সাইকেলে চেপে উধাও হওয়ার মধ্যে কি যেন এক গভীর আনন্দ খুঁজে পাই। কাজটা দূরে হলে বাড়ির সঙ্গে সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। মনে হয় বাড়ি ছেড়ে বেশিদূর কোথাও গিয়ে থাকতেই পারব না। আর এ হেন বাড়িতে, পরী এসে আমাকে কিছুটা বিপদে ফেলে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে মান অভিমান জন্মাতে কতক্ষণ। বাড়িতে ঢোকার মুখে এ সব ভাবছিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি মা বাবা শুধু জেগে নেই। সবাই জেগে বসে আছে। এত রাতে এমন তো হয় না।

সাইকেল তোলার সময় পিলু বলল, জানিস দাদা, আজ না কী সুন্দর একটা মেয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল সাইকেলে চেপে। এসেই বলল, বিলু আছে?

আমি গম্ভীর হয়ে আছি।

পিলুর সব বিষয়ে কৌতূহল একটু বেশি। বলল, মেয়েটা তোর সঙ্গে পড়ে বলল।

—মিছে কথা বলেছে।

বাবা বোধ হয় ও ঘর থেকে শুনতে পেয়েছেন কথাটা। পুত্রের সঙ্গে এমন এক আধুনিকার পরিচয় আছে ভাবতেই বোধহয় বাবার বুক গর্বে ভরে গেছে।

বাবা বললেন, মেয়েটি আচরণে বড় লক্ষ্মীমতী। মৃন্ময়ী তোমার সঙ্গে পড়ে বলনি তো!

—আমার সঙ্গে পড়বে কেন!

—মৃন্ময়ী তো তাই বলল।

—আমাদের কলেজে পড়ে।

—সে একই কথা। বাড়িটা দেখে কি খুশি!

—বলল, কী সুন্দর বাড়ি। একেবারে আশ্রমের মতো মেসোমশাই।

বাড়িটা আশ্রমের মতো বললে বাবা খুব খুশি হন। তা কিছুটা আশ্রমের মতোই বলা যায়। পরী বাবাকে খুশি করার জন্য বলেনি। রাস্তার ধারে বড় একটা আমলকি গাছ! পাশে স্থল-পদ্ম, শ্বেত জবা, রাঙ্গা জবা, অতসী-অপরাজিতা এবং গৃহদেবতার পূজার জন্য যতরকম ফুলের দরকার। বাবা বাড়িটার সামনে সবই লাগিয়েছেন। গাছগুলির যে পরিচর্যা একটু বেশি বেশিই বাবা করে থাকেন দেখলেই টের পাওয়া যায়। এক পাশে একটু আলগা জায়গায় গোয়াল ঘর। দক্ষিণের ভিটেতে একটা বাছারি ঘর। বাবা একটা কাঠের টেবিলও বানিয়েছেন। আরও একখানা চেয়ার বানাবার পরিকল্পনা আছে। আমার কাজ হয়ে গেলে এ সবে হাত দেবেন। মা'র রান্নাঘরটি খুব ছোট। মেটে হাঁড়ি কলসিতে ঘরটা ভর্তি। সংসার করতে গেলে কত কিছুর দরকার হয় মা'র রান্নাঘরে গেলে টের পাওয়া যায়। খড়কুটো থেকে আরম্ভ করে বাবা সব সংগ্রহ করে রেখেছেন। বর্ষায় এ সবে হাত দেওয়া হবে। গ্রীষ্মে রান্নার জন্য জ্বালানি, বাড়ির গাছপালার ঝরা পাতাই যথেষ্ট। গাছের নিচ থেকে শুধু ঝাঁট দিয়ে তুলে আনা। পরী মার রান্নাঘরটি না দেখে গেছে আমার মনে হয় না।

মা'র গলা পেলাম। আমি ঘরে ঢুকেই সাইকেল তুলে চুপচাপ আমার তক্তপোষে বসে আছি টের পেয়েছে। ঘরের টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। আমার আর কোন সাড়াশব্দ নেই। মায়া দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, মিমিদি কি ভাল! আমাকে থুতনিতে ধরে আদর করল!

ভিতরে ক্ষোভ রয়েছে। অথচ বোনটার নিষ্পাপ চোখ আমাকে কেমন সহজ করে তুলেছে। বললাম, এত রাত অবদি জেগে আছিস! কি ব্যাপার!

মিমিদি বলেছে আবার আসবে। আমার হাত খালি দেখে বলেছে, তোমাকে সুন্দর কাঁচের চুড়ি এনে দেব। আমাকে একটা পুঁতির মালাও দেবে বলেছে।

মায়ার হাতে একগাছা করে পেতলের চুড়ি আছে। সেই কবে একবার রাজবাড়ির রাশ থেকে মা কিনে দিয়েছিল। রাজবাড়ির রাস মেলায় মা'র সঙ্গে মায়া গিয়েছে। আমরাও যাই রাসমেলায়। তবে আমি পাড়ার সুবোধ তাফুকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পছন্দ করি। মা বাবার সঙ্গে কিংবা ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে যেতে কেন জানি না লজ্জা হয়। রাস থেকে কাঁচের চুড়ি কিনবে মায়া বায়না ধরেছিল, পুঁতির মালা, কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু মা কিছুতেই রাজি হয়নি। টাকা-পয়সার টানাটানি। মা বলেছিল পরে কিনে দেবে। মায়া মিমির আদর খেয়ে যদি আবদার করে থাকে—বিষয়টা মাথার মধ্যে কাজ করতেই ক্ষোভের গলায় বললাম, তুই আবার চাসনি তো!

মায়া চুপ করে থাকল।

মা ডাকছে, কিরে হাত মুখ ধুয়ে নে। কত রাত করবি। খাবি না।

আর খাওয়া! মিমি বাড়িতে এসে এইসব অভাব অনটনের মধ্যে আমরা বড় হচ্ছি টের পেয়ে গেছে। বললাম, খাব না, খেতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা এবার আর ও ঘরের বারান্দায় বোধ হয় চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। বললেন, কী হয়েছে, খাবে না কেন, শরীর খারাপ। মিমি আবার আসবে বলে গেছে। বড় ভাল মেয়ে। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল। ও ঘরে কে থাকে? বললাম, ওটা ঠাকুর ঘর।

বাবা বলে যাচ্ছেন। আমি শুনছি না, জামা প্যাণ্ট ছাড়ছি। একটা দড়িতে জামা প্যাণ্ট ঝোলানো থাকে। ধুতি টেনে নিলাম একটা। খালি গা। খুব ঘামছি। ঘরের জানালা ঝাঁপের। সামান্য হাওয়া ঢুকছে ঘরে। বাবা ঝাঁপটা আরও তুলে দিয়ে বললেন, মিমি নিজেই শেকল খুলে ঠাকুর ঘর দেখল। চরণামৃত দিলাম। কি ভক্তিমতী মেয়ে! হাঁটু গেড়ে দু-হাতের অঞ্জলিতে চরণামৃত নিয়ে খেল, বুকে মাথায় মাখল। আজকাল তো শহরের মানুষজনদের মধ্যে ঠাকুর-দেবতার প্রতি কোনো নিষ্ঠা নেই। যা খেয়ে নে!

এবারে আর পারা গেল না। বললাম, আচ্ছা বাবা আপনি কেন বলতে যান, মিলের ম্যানেজার আপনার আত্মীয় হয়?

বাবা কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, কি হয়েছে তাতে। আত্মীয়কে অনাত্মীয় ভাবতে তোমাদের কষ্ট হয় না? এমনিতেই তো মানুষ আজকাল কেমন একা হয়ে যাচ্ছে। একা হয়ে যাওয়াটা সংসারের পক্ষে মঙ্গল নয় জান। সব মানুষই পরিচয় সূত্রে গাঁথা—তাকে ছিন্ন করতে হয় না। বেঁচে থাকার পথে এগুলো জরুরী। তোমরাও যে একদিন বড় হবে না কে বলতে পারে। তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার পরিচয় দিলে, তুমি খাটো হয়ে যাবে, না তারা খাটো হয়ে যাবে।

আমি জানি বাবার সঙ্গে কথা বলা বৃথা। এতে যে মানুষ মজা পেতে পারে বাবা বুঝতেই পারেন না। বাবার কোনো খোঁজ-খবর নেয় না, এমন কি একবার আজ পর্যন্ত আমাদের পরিবার সম্পর্কে কোনো আগ্রহও প্রকাশ করে নি, এমন কি বাবার খুড়োমশায়টি তো আমাদের কলোনির লোক ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। না হলে বলতে পারে নাতনিকে, কলোনির ছেলে, লজ্জা কি! যেন মানুষ না। একজন উঠতি বয়সের কিশোরী একজন সদ্য যুবার দিকে চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা পেতেই পারে। সেটাও খুঁড়োমশায়টির বিশ্বাস করতে কষ্ট। বললাম, মিমিকে আপনি চেনেন না। আমি চিনি।

বাবা অত্যন্ত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন কথাটাতে। বললেন, মিমির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—হয়েছে।

—সে কি আমাদের নিন্দা করেছে?

—না।

—তবে!

—তবে আবার কি। ওরা কত বড়লোক আপনি জানেন না। ম্যানেজার আত্মীয় বললে ও খুব আমাদের বড় মনে করবে না। আমরা যা আছি তাই।

—যাই বল, বড় সরল সাদাসিধে মেয়েটি। আমার বয়স হয়েছে, আমি দেখলে বুঝতে পারি কার মনে কি আছে। পরিচয় সূত্রে মিমি তোমার খুবই উপকারে আসতে পারে। এ দেশে এসে আমরা আগেকার সব হারিয়েছি—এখন আবার নতুন করে আমাদের জীবন শুরু। যেখানে যেটুকু পাবে সবটাই গ্রহণ করবে। অবহেলা করা ঠিক না। যাও হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমার সঙ্গে পড়ে মেয়েটি, তোমার প্রতি ওর টান আছে।

বাবা কি তবে সব টের পেয়ে গেছেন। বলতে ইচ্ছে হল, আচ্ছা বাবা, আপনি বোঝেন না কেন, এ সব বড় ঘরের মেয়েদের এগুলি এক ধরনের মজা। আমি বলতে পারলাম না, মিমি পার্টি করে, মিমি গণসংযোগ করে বেড়ায়। আমার মতো তার অজস্র পুরুষ বন্ধু আছে। সে আমাকে আর পাঁচজনের মতোই দেখে। তার বাইরে কিছু নয়। কথা বাড়ালে বাড়বে। পিলু আমাদের কথা চুপচাপ শুনছিল। সে দাদার মিমি-সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা বোধহয় পছন্দ করছে না। সে বলল, আমাকে মিমিদি বলে গেছে ওদের বাড়ি যেতে। মিমিদিদের বাড়ি আমি চিনি। একটা কাকাতুয়া আছে বাড়িটাতে।

—তা'লে আর কি! ড্যাং ড্যাং করে চলে যাও। তোর তো মান-সম্মান বোধ এতটুকু নেই। মিমি বলে গেছে বলেই যেতে হবে! একদম যাবে না।

—বারে, আমাকে যে বলল, পিলু তুমি সকালের দিকে যেও। অন্য সময় গেলে পাবে না।

—গিয়ে কি করবি শুনি।

—কি করব আবার। কাকাতুয়া পাখিটা দেখব। রাস্তা থেকে ভাল দেখা যায় না। ওটা নাকি কথা বলে!

পিলুর পাখি এবং জীবজন্তুর প্রতি এমনিতেই একটা আগ্রহ আছে। বাড়ির পোষা কুকুরটি পিলুরই সংগ্রহ করা। পিলু একটা বাঁদরের বাচ্চাও সংগ্রহ করে এনেছে। এটা এখন এ-বাড়ির আর একজন। কেউ এলেই পিলু ওটা কাঁধে নিয়ে হাজির। একটা ঠ্যাং খোঁড়া বাদরটার। পা টেনে টেনে হাঁটে। মার খুব ন্যাওটা। মিমিকে ঠিক পিলু বাঁদরটার কাছে নিয়ে গেছে। এ সব যত ভাবছি তত মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। খেতে একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। হাত মুখ ধুয়ে এসে বললাম, মায়াকে তো বলেছে, কাঁচের চুড়ি এনে দেবে, পুঁতির মালা দেবে। তোকে কিছু দেবে বলেনি?

—আমাকে দেবে বলেছে।

—কি দেবে?

—ওদের বাড়ির কাকাতুয়া দেবে।

—তার মানে!

—মানে কি আবার! মিমিদি বলল, খাগড়ার বাজারে যেতে বড় বাড়িটা দেখনি? সামনে বাগান দাঁড়ে একটা কাকাতুয়া, ওটাই আমাদের বাড়ি।

বাড়িটা আমি পিলু কবে থেকে চিনি! তখন জানতামই না মিমি বলে এক তরুণী এ বাড়িতে বড় হচ্ছে। কাজেই মিমি তার বাড়ির কথা বললে, এক নিমেষে পিলু টের পেয়ে গেছে সেই বাড়িটা, ওরে ব্বাস! তার একবার ইচ্ছেও হয়েছিল বাগানের ভিতর ঢুকে সাদা রঙের অতিকায় পাখিটা দেখে। কিন্তু সাহসে কুলায় নি। শত হলেও কলোনির লোক আমরা। বাড়ির কলাটা মূলোটা বাজারে বিক্রি করে ফেরার পথে ঢুকতে চাইলে, দারোয়ান যে তেড়ে আসবে না, সেটা সে বোঝে। এখন সাক্ষাৎ জননী নিজে হাজির। পিলুর অনেকদিনের বাসনার কথা জেনে কাকাতুয়াটি যে দেবে না সেটাও বলা যায় না। দিতে পারে। কারণ সে তো যতভাবে পারে আমাকে জব্দ করার তালে আছে। আমাকে জব্দ করার জন্য কাকাতুয়াটি উপহার দেবে সেটা আর বেশি কি। খেতে বসে বাবাকে বললাম, আপনি পিলুকে বারণ করে দেবেন, ও যেন মিমিদের বাড়ি না যায়। মিমিদের বাড়ির কাকাতুয়াটি নাকি ও নিয়ে আসবে বলেছে!

বাবা বললেন, ভালবেসে দিলে নিতে হয়।

আর পারলাম না। বললাম, তাহলে নেবেন। আমি তবে বাড়ি থাকব না। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।

বাবা এতে টের পেলেন, আমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছি। এর আগেও আমি একবার বাড়ি থেকে পলাতক হয়েছি বলে, বাবা খুব ঘাবড়ে গেলেন।

বাবা বললেন, তোমার আপত্তি থাকলে আনবে না। তোমরা বড় হয়েছ, যা ভাল বোঝ করবে। বাবা ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। পিতা পুত্রের মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে বাবা আগেই বুঝতে পেরেছেন, আজ যেন সেটা আরও বেশি অনুভব করলেন। বাইরে বের হয়ে দেখলাম, বাবা ঠাকুরঘরের দরজা খুলে শালগ্রামশিলাটি দেখছেন। প্রদীপের নিষ্প্রভ আলোতে বাবার মুখ খুবই করুণ দেখাচ্ছে। এরপর আর ক্ষুব্ধ থাকা যায় না। হাত মুখ ধুয়ে ডাকলাম, মা খেতে দাও।

খেতে বসলে মা বলল, তোমার বাবাকে ডাক।

হাত জলে ধুয়ে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশে গণ্ডুষ করার আগে ডাকলাম, বাবা আপনার ভাত দিয়েছে।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে যেন হালকা বোধ করেন। মিমিকে নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল পুত্রের সেটা কেটে

গেছে ভেবে তিনি হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন। গণ্ডুষ করার সময় আমাকে গোপনে দেখছেন তাও টের পাচ্ছি। কিন্তু আমি তাকাতে পারছি না। বাবা বড় সরল মানুষ। এদেশে এসে স্ত্রী পুত্র সন্তান-সন্ততি নিয়ে অথৈ জলে পড়ে গেছিলেন। এখন ঘর বাড়ি করে স্থিতি লাভ করায় কিছুটা 'সুখী গৃহকোণ বাজে গ্রামাফোন' ভাব তাঁর। তিনি আমাকে নিয়ে বড় কিছু স্বপ্ন দেখতেই পারেন। একবার শুধু বললেন, মুকুলের জামাইবাবু কিছু খবর দিল?

—বলেছে হবে।

বাবার যেন আর কোনো দুঃখ থাকল না। খাবার পর তিনি বারান্দায় কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে তামাক টানলেন। শোবার আগে তাঁর স্বভাব, গোয়াল ঘরে একবার ঢোকা, তারপর লণ্ঠন হাতে নিয়ে সারা বাড়ি প্রদক্ষিণ করা। সব ঘরের দরজা বন্ধ কিনা, কিংবা ঠাকুর ঘরে শেকল তোলা আছে কিনা, সব দেখে শুনে সবাই শুলে তিনি শুতে যান। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করার সময় টের পেলাম, আমার বাবা সংসারের মঙ্গলার্থে এখন লণ্ঠন হাতে বাড়িটা প্রদক্ষিণ করছেন। কিছু স্তোত্র পাঠ করছেন। গভীর অন্ধকার নিশীথে বাড়িটা আবার কোনো অশুভ প্রভাবে না পড়ে যায়—এ সব কারণেই তাঁর এই স্তোত্র পাঠ। ঈশ্বর নির্ভর মানুষের এ ছাড়া যেন আর কোনো গতি নেই।

কটা দিন আমার খুবই অস্বস্তিতে কাটল। বাড়িতে কখন না মিমি এসে হাজির হয়। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের গরম, খালি গায়েই থাকা যায় না, তার উপর যদি সারাদিন গায়ে জামা রাখি—কী যে কষ্ট! তবু উপায় নেই, হুট করে মিমি এসে হাজির হলে দেখতে পাবে আমি খালি গায়ে বারান্দায় কিংবা ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। কিংবা নিজের ঘরে চুপচাপ বসে কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। কখন হুট করে ঢুকে যাবে, কেউ বলতে পারে না। কাজেই সকালে উঠেই জামা গায়, চান করে এসেও জামা গায়, বিকেলে বের হবার আগেও জামা গায়—বাবা এক দু-দিন লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কি কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে!

বাবা মঙ্গল চণ্ডীর পূজা দিতে রওনা হবার আগে এমন কথা বললেন। বাবার খালি গা। নামাবলী চাদরের মতো জড়ানো। হাতে একটা গামছা। গামছাখানা সঙ্গে রাখেন, পূজা আর্চা হয়ে যাবার পর যজমানদের দেওয়া প্রসাদ এবং ভোজ্য সব গামছায় পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আসেন। বাবা এখন যত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে চলে যান তত মঙ্গল। আমি চাই না, বাবার এই বামুন ঠাকুরের চেহারা মিমি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করুক। পা খালি। বোধহয় ক্রোশখানেক পথ যেতে হবে, এ জন্যে খড়ম পায়ে এতটা পথ যাবার তাঁর সাহস নেই। খালি পায়ে রওনা হয়েছেন। বাবার ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। ফেরার পর দেখা যাবে, ট্যাঁকে দুটো তামার পয়সা দক্ষিণা, আর গামছায় কিছু চাল কাঁচা হলুদ আলু এমন সব মিলে পোয়াটেক জিনিস। এরই জন্য সকাল সকাল স্নান সেরে গৃহদেবতার পূজা শেষ করে বের হয়ে পড়েছেন। পূজা আর্চার জন্য তিনি নিরম্বু উপবাসে অনেক কাল থেকে অভ্যস্ত। ফিরে এলে তাঁর আহার। মাও ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে। অসুখ-বিসুখ হয়নি বলেও পার পাওয়া যাবে না। আমার উত্তরের আশায় ডালিম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। হাঁটা দিতে পারছেন না। বলতেই হয়, অসুখের কি দেখলেন!

—জ্বর জ্বালা যদি হয়! তবে তোমার চোখ তো পরিষ্কার। তোমার কি শীত শীত করে?

—শীত করবে কেন!

—ঠাণ্ডা লাগেনি তো?

—না, ঠাণ্ডা লাগেনি। ভালই আছি। আমার কিছু হয় নি।

—কিছু হয়নি তো গায়ে সারাক্ষণ জামা রাখছ কেন?

মহানুশকিল আমার এই বাবাটিকে নিয়ে। গায়ে কেন জামা রাখছি তারও কৈফিয়ত দিতে হবে।

—গরমে হাঁসফাঁস আর তুমি কি না গা থেকে জামা খুলছ না। ঘাম বসে বুকে কফ-টফ না বাধিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

—আমার কিছু হবে না। বলে ঘরে ঢুকে গেলে বাবা বুঝতে পারলেন, এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে রাজি না। তিনি চলে যাবার সময় বললেন, যা খুশি করো। আমার কি! আমি

আর ক'দিন? তোমরা বড় হয়েছ, এখন তোমাদের মেজাজ-মর্জি আমি বুঝব কি করে! আমার কোনো কাজই তোমাদের পছন্দ না।

এতটা পর্যন্ত শুনেছি, পরে কি বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন বুঝতে পারলাম না। পিলু পুকুর থেকে জল-শাক তুলে এনেছে এবং সঙ্গে যথেচ্ছ সাঁতার কাটা সহ, ডুব সাঁতারে পুকুর এ-পার ও-পার হওয়ার কাজটুকু সেরে আসায়, চোখ জবা ফুলের মতো লাল। বোধ হয় বাবা বাড়ি থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাড়ি ঢুকতে সাহস পায়নি। চোখ দেখলেই বাবা টের পেতেন তাঁর মেজ সন্তানটি পুকুরের জলে সকাল থেকেই অদৃশ্য হয়েছিল। মাঠে গরু দিয়ে আসার নামে সে যে এতক্ষণ নিখোঁজ ছিল, তার একটাই কারণ, জল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়া। গরম থেকে পরিত্রাণের এর চেয়ে যেন বড় উপায় তার হাতের নাগালে আর কিছু নেই।

জল-শাক তুলে এনেছে বলে মা'র কোনো আর অভিযোগ নেই পিলুর বিরুদ্ধে। মুসুরির ডালে বড়ি দিয়ে বাবা জল-শাক খেতে খুব পছন্দ করেন। সুতরাং পিলু মাকে কোঁচড় থেকে জল-শাক তুলে দেবার সময় বলল, মা, বাবা গজগজ করতে করতে যাচ্ছে। তুমি বাবাকে কিছু বলেছ?

মা বলল, আমি বলবার কে! আমার আর গুরুত্ব কি। আমি বললেই কে শোনে!

আসলে সবটাই আমাকে উপলক্ষ্য করে বলা।

—তা'লে দাদার সঙ্গে হয়েছে।

—জানি না। দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর।

পিলু মাথা মুছছিল গামছা দিয়ে। আর একটা গামছা পরনে। ভাল করে ঢাকাঢুকি নেই। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, দাদা তুই বাবাকে কিছু বলেছিস?

—কী বলব? কিছু বলিনি। সব তো দেখা যাচ্ছে। তুই কি রে!

পিলু নিচের দিকে তাকিয়ে জিভ কামড়ে ছুটে বের হয়ে গেল।

এ বাড়িতে আমার কত সমস্যা বাবা মা কেউ বুঝতে পারবে না। পিলু দৌড়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে সত্যি একেবারে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। ঢাকাঢুকির ব্যাপারে কোনো সতর্কতা নেই। আমাদের পরিবারের সব কিছুই বড় খোলামেলা। মিমিকে দেখলে বুঝতে পারি কোথায় আমাদের সঙ্গে তার কতটা দূরত্ব। সে যেন যোজন প্রমাণ। এত বড় দূরত্ব অতিক্রম করার সাহস কিংবা সামর্থ্য আমার নেই। সুতরাং সে গায়ে পড়ে এলে, বুঝতে হবে আমায় অপমান করা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। সে বোঝে আমি কেন তাকে এড়িয়ে চলি।

পাঁচ

আশ্চর্য, চার-পাঁচ দিন হয়ে গেল মিমির আর কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। নিখিল বলল, মিমি পার্টি অফিসেও যাচ্ছে না। আমরা রাউণ্ড মারতে বের হলে শুধু দেখি, চৈতালীর ন্যালা ক্ষ্যাপা দিদিটা বারান্দায় গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা ম্যাকসি গায়ে। মুখ দিয়ে সেই লালা ঝরছে। দু' হাত ঝুলে আছে দু'দিকে। আর ঘাড় কাত করে একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে দুলছে। আড্ডায় পত্রিকা নিয়ে যা শেষে গড়াল তাতে কিছু করা যাচ্ছে না। মিমির বাড়ি গিয়ে যে খোঁজ করব তারও জোর নেই। আমি যখন বলতে পারি তুমি যাবে না, গেলে আমি অপমানিত হব, তখন মিমিও মনে করতে পারে তার বাড়ি গেলে সে অপমানিত হবে। আসলে মিমিদের বাড়ি যাবার জোরটাই যেন হারিয়ে ফেলেছি।

হঠাৎ একদিন সকালে মুকুল বাড়ি এসে হাজির। খুব হন্তদন্ত অবস্থা। সে আমার ঘরে ঢুকেই তক্তপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, খবর ভাল না।

—কিসের খবর?

—কাগজের নাম চৈতালী রাখা চলবে না।

—কেন, কি হল?

—চৈতালী ক্ষেপে গেছে। দিদিদের নালিশ দিয়েছে। তাকে ছোট করার জন্যই নাকি আমরা কাগজটার নাম চৈতালি রাখছি।

আমি টেবিলে পা গুটিয়ে বসি। বললাম, এদের তুমি কিছুতেই মহান করে তুলতে পার না। নারী জাতির কি যে ভাব বুঝি না ভাই। বাবা ঠিকই বলেন—যা দেবী সর্বভূতেষু দেবীরূপেন সংস্থিতা। কি নাম রাখবে তবে? এদিকে মিমির পাত্তা নেই। মিমি এ বাড়িতে এসে মাসিমা মেসোমশাই করে গেছে। সে এ বাড়িতে পরী নয়, মিমিও নয়, একেবারে মৃন্ময়ী। কখন উদয় হবে ভয়ে মরছি, আর এখন একেবারে বেপাত্তা। বল, ভাল্লাগে!

মুকুল চিৎকার করে বলল, মাসিমা জল। এক গ্লাস জল।

মায়া জল রেখে গেলে বলল, কিরে তুইও দেখছি বড় হয়ে গেলি। মায়া শাড়ি পরে এসেছিল, মুকুলের কথায় দৌড়ে পালাল।

—তা'লে পরী এখন তোমাদের বাড়িতে মৃন্ময়ী।

—বোঝ তবে! বাবা তো মৃন্ময়ী বলতে অজ্ঞান। মৃন্ময়ী বড় ভক্তিমতী। কী লক্ষ্মী মেয়ে! হাঁটু গেড়ে ঠাকুর প্রণাম! চরণামৃত পান। বল কত সহ্য করা যায়।

—খুব বিপদ। বলে মুকুল হাই তুলল একটা। জলটা খেল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তা'লে কি হবে?

এমন প্রশ্ন করলে আমাদের দুজনেরই চুপ করে থাকার কথা। এমন অবসর বেলায় এখন আমাদের দুই বন্ধুতে সাইকেল চেপে উধাও হওয়ার কথা। কারণ চার পাশে রাস্তাঘাট শহর, বাড়ি, গাছপালা সব আমাদের টানে। আর এ সময়ই প্রশ্ন, তাহলে কি হবে! পরী কি আমাদের সঙ্গে নেই! না থাকুক, ভারি বয়ে গেল। নাম 'চৈতালী' হবে না। না হোক, অন্য নাম রাখব। ভয়ের কি আছে। সুধীন বাবুরা তো লিখেই খালাস। লেখা সংগ্রহ করা থেকে সব কিছু আমাদের। সবাই না হয় চাঁদা তুলে করব। একমাসের টিউশনির টাকা না হয় আমি দেব। আর কাজটা হয়ে গেলে তো কথাই নেই। কাজের টাকা বাবার। টিউশনির টাকা কাগজের। বললাম, একবার যখন নামা গেছে পিছিয়ে আসা যায় না। আমরা কাউকে অপমান করব বলে কাগজের নাম চৈতালী রাখিনি। নারীদের আমরা শ্রদ্ধা করি।

আমার মুখে রীতিমতো বক্তৃতা শুনে মুকুল ঘাবড়ে গেল। আগে আমিই কাগজ সম্পর্কে নিস্পৃহ ছিলাম, এখন আমিই কাগজ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছি দেখে মুকুল মনে মনে খানিক আত্মপ্রসাদ লাভ করল। সে-ই আমাকে টেনে নামিয়েছে কাজে—আমার যা স্বভাব কিংবা গোঁ, কে জানে, কখন একেবারে হিতে বিপরীত করে বসতাম। ফলে সে আমার কাছে সাহস পেয়ে বলল, চৈতালী ছাড়া আর কি নাম রাখা যায় বল তো!

—প্রাংশু!

—ধুস! তুমি কি না।

—করালী!

—তুমি ঠাট্টা করছ কেন বিলু। এখন থেকে কাজের গুরুত্ব যদি আমরা বুঝতে না শিখি তবে কবে থেকে শিখব। জামাইবাবুর কানে কথাটা উঠেছে। তিনি ডেকে বলেছেন, কাগজ নিয়ে বেশি মাতামাতি করবে না। ওতে আখের নষ্ট। রেজাল্ট বের হলে, মন দিয়ে লেগে যাও। চাকরি-বাকরি পাওয়া খুব কঠিন। কাগজে পেট ভরবে না।

—ছোড়দি কিছু বলল না?

ছোড়দিই তো রক্ষা করল। —রাখ তোমার চাকরি-বাকরি। ছেলেমানুষ, এ বয়সে কত শখ থাকে। এরা তো ভারি নিষ্পাপ ছেলে। কোনো খারাপ স্বভাব আজ পর্যন্ত দেখিনি। আজকাল দেখি তো সব স্যাম্পেল।

—আচ্ছা মুকুল, ছোড়দির কাছে কিছু টাকা বাগানো যায় না। তা'লে পত্রিকাটা একেবারে মৃন্ময়ী-নির্ভর হয়ে থাকত না।

—যায়। মুসকিল কি জান, ছোড়দি লুকিয়ে দেবে। বললেই দেবে। কিন্তু জান তো জামাইবাবুটিকে। কি কঠিন প্রকৃতির। ধরা পড়লে অশান্তি হবে।

—কি যে করি! সত্যি আমাদের ছোড়দি এত সুন্দর আর আমাদের জন্য যদি কটু কথা শুনতে হয়, না, ঠিক হবে না। বললাম, থাক তবে—

—কিন্তু নামটা ঠিক করে ফেল। মুকুল উঠে বসল।

—তোমার মাথায় আসছে না?

—না। চৈতালী ছাড়া আমার মগজে কোনো নাম নেই।

আচ্ছা যদি 'অপরূপা' রাখি। দুই কূলই সামলে দেওয়া গেল। আমরা তো চৈতালী নামটা রেখে তোমার অপরূপাকে মহৎ করতে চেয়েছিলাম। যাকে বলে চিরস্মরণীয় চৈতালী বদলে অপরূপা। কারও কিছু বলার থাকবে না। তুমি আমি জানলাম আমাদের অপরূপাটি কে।

ব্যাস। ভাবা যায় না। একটা ডামি করে ফেলতে হবে। চল বের হয়ে পড়ি। সোজা দিলীপের কাছে। প্রেসে সব কথাবার্তা হবে। সে একটা মোটামুটি চার পাঁচ ফর্মার কাগজ বের করতে কত লাগবে বলতে পারবে। ত্রৈমাসিক না ষাণ্মাসিক।

ষাণ্মাসিক খুব লং গ্যাপ। অত বড় গ্যাপ রাখা ঠিক হবে না।

তা'লে ত্রৈমাসিক। আর মনে হয় এর মধ্যে তোমার কাজটা হয়ে যাবে। আমারও ইচ্ছে ছিল কাজ নিই, দাদা একেবারে রাজি না। দু-দিক সামলানো নাকি আমার কম্ম নয়। আমি নাকি নিজে কি পরে বের হব তারও খবর রাখি না। আত্মনির্ভরশীলতার বড় অভাব। বৌদি-সর্বস্ব হয়ে আছি। কি জ্বালা বল, নিজে করতে গেলে বৌদি বলবে, আমি কি মরে গেছি। কিছু করারও উপায় নেই, অথচ হরদম খোঁচা সহ্য করতে হবে। পরীক্ষায় পাস করার পর ভাবা যাবে—দাদার এক কথা।

মুকুলের এটা সত্যি বড় সৌভাগ্য। বৌদির এমন মিষ্টি স্বভাব যে আমার মতো লাজুক ছেলেকেও হার মানিয়েছে। আড্ডা মারতে গিয়ে বেলা হয়ে গেল, বৌদি দাদার একখানা কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলবেন, চান করে এখানেই বাবুর দুটো খেয়ে নেওয়া হোক। রোদে আর বাড়ি ফিরতে হবে না। কতদিন এ ভাবে আর বাড়ি না ফিরে সারাটা দিন শুয়ে বসে, ঘুরে ফিরে এক মুক্ত জীবনের স্বাদ বয়ে বেড়াচ্ছি। টিউশনি আর মিমি বাদে গলায় কোনো কাঁটা বিঁধে নেই।

বের হতে যাচ্ছি, দেখি রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে। বেশ সুপুরুষ মানুষটি। —বিলুবাবু এখানে কোন্ বাড়িটায় থাকেন?

—আমিই, বলুন।

—মিমি পাঠিয়েছে।

একটা প্যাকেট। যুবকটি বোধহয় রিকশায় কিংবা গাড়িতে এসেছে। আমাদের বাড়িতে সাইকেলে আসা যায়। তারপর আর কোনো যানের পক্ষেই অগম্য আমাদের রাস্তা। গরুর গাড়ি অবশ্য আসতে পারে। তাই বলে আমার বাড়ি আসার জন্য যুবকটির পক্ষে গাড়ি ভাড়া করা সমীচীন হবে না ভেবেই, পাকা সড়কে গাড়ি কিংবা রিকশা রেখে এসেছেন। আমি মুকুলের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোককে, ঠিক ভদ্রলোক বলা যায় না, আমাদের চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড়, কি আরও কিছু—কিন্তু তিনি যে মৃন্ময়ীর কে বুঝতে পারলাম না।

আমার নাম পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ও আপনি, মানে আমার মুখে কথা সরছিল না। এখানকার স্থানীয় এস ডি ও সাহেব। একবার যেন এঁকে মিলের ম্যানেজারের বাড়িতে দেখেওছি। গলায় টাই, একেবারে সুটেড বুটেড মানুষ। পাজামা পাঞ্জাবি পরে থাকলে চিনি কি করে! আর তখনই দেখি বাবা গরু বাছুর ছেড়ে দিয়ে মাঠের উপর দিয়ে আসছেন। সর্বনাশ! কাছে এলেই হাজার প্রশ্ন, মহোদয় আপনার নিবাস। কি করা হয়। তাড়াতাড়ি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। পরেশচন্দ্রকে এগিয়ে দেওয়া দরকার। বাবা এসে পড়লে রক্ষা থাকবে না। বললাম, চলুন, আমরা বের হচ্ছিলাম।

সুপুরুষ মানুষটি চারপাশটা এখন খুব লক্ষ্য করে দেখছেন। কি ভেবে বললেন, প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে মিমি বলল, তুমি এটা দিয়ে এস। ট্রেনিং ক্যাম্প পার হলেই ওদের বাড়ি। নাম বললেই দেখিয়ে দেবে। কী যে এত জরুরী বুঝলাম না।

-মিমির তো পাত্তা নেই। ওকে বলবেন, ও না থাকলেও কাগজ আমরা ঠিক বের করব।

মুকুল বলল, না না ওসব বলতে যাবেন না। মিমির কি কোনো অসুখ-বিসুখ হয়েছে। বাড়ি থেকে কোথাও যাচ্ছে না?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, না ভালই আছে। বাড়ি থেকে কিছুদিন বোধহয় ওর বের হওয়া বারণ।

আমি খুব করুণ গলায় বললাম, কেন, কি হয়েছে?

—ও এমনি। বলে ভদ্রলোক মজার হাসি হাসলেন।

আমাদের বাড়িতে খোদ এস ডি ও সাহেব, খুবই অভাবিত ব্যাপার। এবার যেন বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছি। যত অনুধাবন করছি তত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি। কি ভাবে একজন এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হয় তাও জানি না। বাড়িতে বসতে বলা দরকার ছিল—এটা ভদ্রতা। জানি বসতে দেবার মতো জায়গায়ও আমাদের নেই। যত সঙ্গে যাচ্ছি এগিয়ে দিতে তত ঘাবড়ে যাচ্ছি। প্যাকেটটা খুলে দেখাও হয়নি ভিতরে কি আছে।

বললাম, প্যাকেটে কি আছে?

—কি যেন বলল, কিসের একটা ডামি।

সে যাই হোক—রাস্তায় খুলে আর এস ডি ও সাহেবের প্রতি অমনোযোগী হতে পারি না। বাবা বাড়ি ফিরলে ঠিক জিজ্ঞেস করবেন, কে? বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে। বসতে বললে না। এটা তো পরিবারের নিয়ম না।

সুতরাং এখন আমি আর মুকুল, দুজনেই ক্রমে বিষয়টা অনুধাবন করে, আপনি আজ্ঞে শুরু করেছি। বলছি, মিমিটা যে কি। ও নিজেই দিয়ে গেলে পারত। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও পারত। আপনাকে অহেতুক....

আরে না না। ও কিছু ভাববেন না বিলুবাবু।

খুব সম্মান দিয়ে কথা বলছেন। স্বাভাবিকভাবেই সাহেবটিকে বড় বিনয়ী মনে হল। আমরা উঠতি যুবা, ফাংশান টাংশানে যাই, রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করি। আরও কত অনুষ্ঠান সূচী—ঠিক এক মুহূর্তেই মনে হল, এস ডি ও সাহেবের নামটি মিমি বলেছিল। কলেজ সোস্যালে মিমি, ডি এম, এস ডি ও এবং কলকাতা থেকে একজন বড় সাহিত্যিককেও নিয়ে এসেছিল। মিমির পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব নয়।

ট্রেনিং ক্যাম্প পার হতেই আমগাছের ফাঁকে দেখলাম সড়কে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। শহরের গাড়ি বলতে মিমি এবং দুই রাজবাড়ির দুটো গাড়ি আছে। ছোট রাজার বুইক, আর বড় রাজার মার্সিডিজ। মিমিদের গাড়িটা খুবই চকচকে, নতুন। মিমি সাধারণত গাড়িতে কোথাও যায় না। একমাত্র কালীবাড়ীতে পূজা দিতে গেলে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে মিমিকে দেখা যেত। অবশ্য বিপ্লবী মেয়ের পক্ষে বোধহয় গাড়ি চড়া শোভাও পায় না। কাছে গিয়ে অবাক! দেখি সেই বিপ্লবী মেয়েটি দারুণ সেজে জিপ গাড়িতে বসে আছে। আমাকে দেখেও দেখল না। বুকটা সহসা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মিমি আমার পাশে মুকুলকে দেখে যেন কিছুটা স্বাভাবিক। বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। দয়া করে সম্পাদক মশাইকে বলবেন, কার লেখা কোথায় যাবে তার যেন একটা লে-আউট করে দেন। আর নিজের কবিতাটি যেন দয়া করে সঙ্গে পাঠান। গোটা দশেক বিজ্ঞাপন পাওয়া গেছে।

একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। কিন্তু খোদ এস ডি ও সাহেবের গাড়িতে যিনি বসে আছেন তাঁর সঙ্গে মতান্তর আছে ভাবাটাই যেন আমার অপরাধ।

পরেশচন্দ্র বললেন, চলি বিলুবাবু।

গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মিমি একবার চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। অনেকক্ষণ স্তব্ধ আমরা দুজনেই। মুকুল বলল, আর দেখতে হবে না। চল। আগুন নিয়ে খেলছিলে। বোঝ মজা!

—আমি খেলতে যাব কেন। আমার সে দুঃসাহস নেই। খারাপ লাগছে মিমি একটা কথা বলল না।

ছয়

আমি আর মুকুল সেদিন সারাটা বিকেল ঘুরলাম। কিছু ভাল লাগছিল না। এমন অর্থহীন নিজেকে কখনও মনে হয় নি। আমি তো আশা করি না। মিমি নিজেই আমার কাছে ধরা দিয়েছিল। প্রথমে ছিল ওটা ওর মজা। কালীবাড়িতে এসেই লক্ষ্মীর কাছে শুনেছিল, বদরিদা নটু পটুর জন্য বাচ্চা মাস্টার রেখেছে। চিড়িয়াখানায় জীব যেভাবে দেখতে আসে, মিমি সেদিন সেভাবেই আমাকে দেখতে এসে আমাকে নিয়ে মজা করবে ভেবেছিল।

কালীবাড়িতে লক্ষ্মী কখন মাস্টার সম্বল ভেবে আমার সব কাজ, খাওয়া-দাওয়া, বিছানা করা, জামা প্যান্ট কেচে রাখা থেকে স্নানের জল তোলার কাজটা হাতে নিয়ে ফেলেছিল। কলেজ থেকে দেরি করে ফিরলে দেখতাম লক্ষ্মী নিম গাছের নিচে আমার ফেরার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই লক্ষ্মীও এক জ্যোৎস্না রাতে সব টের পেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার পাপের শেষ নেই। আজ কেন জানি এটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, জীবনে অনেক ভোগান্তি আছে।

রেল লাইনের কাছে সেই গুমটি ঘর। তার পাশে ঘাসের চটান। নিরিবিলি জায়গা। এখানাটায় এসে মুকুলকে বললাম, চল বসি। প্যাকেটে কি আছে দেখি।

সাইকেল ঘাসের উপর ফেলে রেখে আমরা বসলাম। বললাম, তোমার কি মনে হয়?

মুকুল বুঝতে না পেরে বলল, প্যাকেটটা খুব ভারি। খুলে দেখি না।

—আরে না। মিমি পরেশচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরছে—আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

—ও একটু তরলমতি আছে। কখন কি করবে আমরা কেউ টের পাই না। বাড়ির মানুষজনও টের পায় কি না সন্দেহ আছে। ও নিয়ে ভেবো না।

—না, ভাববার কি আছে! ভাবব কেন। তারপর বলার ইচ্ছে হল ভাববার অধিকারই বা আমাদের কতটুকু। আফটার অল আমরা কলোনির ছেলে। জান, কলোনির বাইরের লোকের ধারণা আমরা মানুষ না।

মানুষ না ভাবলে মিমি তোমার কাছে যেত না।

মানুষ ভাবলে আমার সামনে দিয়ে ধুলো উড়িয়ে কেউ যেতে পারে না।

বারে, তুমি ওকে অপমান করতে পারলে রাজা আর সে তোমাকে অপমান করতে পারলে রাণী হবে না সে কেমন করে হয়।

আমি চুপ করে বসে থাকলাম। প্যাকেট খোলা হলে দেখলাম ওতে অনেকগুলো কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা। একটা হাত চিঠি, মিমি লিখছে,

বিদ্যাসাগর মশাই, আপনার জন্য পাঠালাম। আপনার নির্বাচনই শেষ কথা। যেটা যাবে তার উপর আপনি দয়া করে একটা সই করে দেবেন। অমনোনীত লেখাগুলোতে ক্রশ চিহ্ন। সুধীন দা, দিলীপের সঙ্গে কথা হয়েছে। ডামির উপর কাগজের নাম লিখে দেবেন। ইতি মিমি।

তা'লে সুধীনবাবুর কাছে থেকে জেনে ফেলেছে, আমাকে তারা বিংশ শতাব্দির বিদ্যাসাগর মশাই বলে সম্বোধন করে। আমাদের আড্ডায় কে কাকে কি নামে ডাকে, মিমির মতো তরলমতি যুবতীর কাছে না বললেই হত। সে আমাকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি।

একা ফিরছি। রাত হয়ে গেছে। এতক্ষণ মুকুল সঙ্গে থাকায় মনটা হালকা ছিল। একা হয়ে যেতেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেলাম। জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ ঘাট ভেসে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কোথাও দূরে বৃষ্টিপাত হয়েছে টের পেলাম। উত্তাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিংবা দুঃখ কষ্ট মানুষের চিরজীবন থাকে না। ছিন্নমূল পিতার সন্তান—যেকোনভাবে পারি তার থেকে পরিত্রাণ চাইছি। অভাবের তাড়নায় একবার মেট্রিক পরীক্ষা দেবার পর পলাতকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম, মিমির জন্য আবার না পলাতক হতে হয়।

বাড়ি ফিরে অবাক।

পিলুই খবরটা দিল।

—দাদা মিমিদি এসেছিল।

কখন?

তুই বের হয়ে গেলি ঠিক তারপর।

-মানে!

পিলু মানেটা বুঝবে কি করে! মায়া লাফিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, এই দ্যাখ দাদা, আমার চাঁড়, পুঁতির মালা।

বাবা ঠাকুরঘরে বৈকালি দিচ্ছিলেন। ঘণ্টা নাড়ার শব্দ পেলাম। যেন দ্রুত তিনিও ঠাকুরের শয়নের ব্যবস্থা করে ঘর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছেন। এলেনও। বাইরে বের হয়ে বললেন, মৃন্ময়ী আমাদের একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে যাবে বলেছে। ওদের বাড়িতেও নাকি বিগ্রহের মন্দির আছে।

মিমি কি বাবাকে ওদের বাড়িতে পূজার বামুনের কাজটা দিতে চায়। ওরা ভাল মাইনে দেয়—বাবা যদি রাজী হয়ে যান। বললাম, না কেউ যাবে না।

—কি বলছিস তুই! মাও দেখলাম কেমন রুষ্ট গলায় কথাটা বলল।

বাবা বললেন, মৃন্ময়ী তো বলল, ওর ঠাকুরদা তোমার উপর খুব প্রীত।

—তাই নাকি!

আমার আচরণে আজকাল মা বাবা কোনো অর্থ খুঁজে পান না। হয়তো ভাবেন, বিলুটা দিন দিন কেমন রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে। কোন কথাই বলা যায় না। ওঁরা হতবাক হয়ে গেছেন। বাবা আর কিছু না বলে তামাক সাজতে বসলেন। সব ক্ষোভ দুঃখ যেন তিনি এক ছিলিম তামাক খেতে পারলে ভুলে যেতে পারেন।

টের পাচ্ছিলাম মাথাটা ধরেছে খুব। জলচৌকিতে বসে বললাম, আমার কাজ হয়ে যাবে। সার্কুলার এসেছে। কেউ কোনো কাজের কথা বললে, নেবেন না।

বাবা এবার কলকেতে তামাক টিপতে টিপতে বললেন, সে রকমের তো কোনো কথা হয়নি। মৃন্ময়ী বলল, মেসোমশাই, আপনাদের এসে নিয়ে যাব। ওদের বাড়িতে শ্রাবণে খুব ঘটা করে লক্ষ্মীপূজা হয়। ওর দাদুরও ইচ্ছে তাই। দাদুকে বলেছে, কালীবাড়িতে বাবাঠাকুরের নাকি তুমি খুব প্রিয়জন ছিলে। বাবাঠাকুরের শরীর ভাল না। একবার তাঁকে তোমার দেখে আসা উচিত।

সত্যি তো, সেই যে কালীবাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম, আর ওদিকটায় আমার যাওয়া হয় নি। বৌদি, বদরিদা, বাবাঠাকুর কে কেমন আছেন খোঁজই নিইনি। আসলে, আমি যেতে ভয় পাই। কারণ যখনই যেখান থেকে কালীবাড়ি ফিরেছি, দেখেছি মন্দিরের দরজায় লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। এখন গেলে দেখব কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বড় ফাঁকা লাগবে, শূন্যতা এসে গ্রাস করবে। কেউ আর বলবে না, মাস্টার তোমার এত দেরি!

মাথার কাছে টেবিলে হ্যারিকেনটা জ্বলছে। মৃদু আলো। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দেওয়া যায়। আমার তাও ইচ্ছে করছে না। মিমির দেওয়া প্যাকেটটা পড়ে আছে। লেখাগুলো খুলে দেখাই হয় নি কী আছে ভিতরে। ইচ্ছেও করছে না। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি। পরেশচন্দ্র এবং মিমির উধাও হয়ে যাওয়া এবং সে বের হয়ে গেলে মিমির একা বাড়িতে আসা বড়ই রহস্যজনক ব্যাপার। সঙ্গে পরেশচন্দ্র থাকলে বাবা ঠিক বলতেন। মিমি কী তবে বাঁকের মুখে নিমতলায় গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে একা হেঁটে এসেছিল! এসে সারা বিকাল বাড়িতে কাটিয়ে গেছে। মেয়েটা দজ্জাল, তরলমতি না বিপ্লবী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চৈতালীর দিদিরা ওর নাম দিয়েছে মক্ষীরানী। তা ও কিছুটা পুরুষ-ঘেঁষা। পার্টি করলে যা হয়। মিছিলের আগে শুধু নয়, মিছিল পরিচালনা করতেও তাকে শহরের পথে দেখা গেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার জ্বালাময়ী ভাষণ বড় মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। আর হাতের কাছে এমন সব যুক্তি খাড়া করে রাখে যে মনেই হয় না সে এতটুকু অসত্য ভাষণ করছে। আসলে ভিতরে মিমি এখন চরম সংকটের মুখে। সেই এক আত্মপ্রকাশ। কিন্তু পরেশচন্দ্র যে একটা কাঁটা হয়ে গলায় গেঁথে আছে সেটা টের পেয়ে চোখ আরও জ্বালা করতে থাকল। ভিতরে আমারও এক আত্মপ্রকাশের জ্বালা—যার

থেকে রেহাই নেই। একমাত্র কবিতা সৃষ্টি করে বুঝিয়ে দিতে পারি আমি তোমার চেয়ে কম কিসে।

সুতরাং আমার ঘুম নাও আসতে পারে। পিলু পাশে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার কাকাতুয়া পাখি চাই। মিমি একদিন তাও দিয়ে যেতে পারে, কিংবা বলতে পারে, চল পিলু, কাকাতুয়া পাখিটা নিয়ে আসবি। সেই আনন্দেই আছে। মিমিদি সেই কাকাতুয়া বাড়িটায় থাকে জেনে চরম বিগলিত হয়ে গেছিল। কত বড় বাড়িরে দাদা! কি বিশাল বিশাল কারুকার্য করা থাম। ও! ভাবা যায় না! পিলু কেন, বাবাও ঠিক বাড়িটা দেখেছে। শহরে কাকাতুয়া তো ঐ একটা বাড়িতেই আছে। রিকশায় চড়ে কিংবা উঁচু বা লম্বা মানুষ হলে পাঁচিলের ও পাশে দাঁড়ে ঝোলান কাকাতুয়াটা কারো চোখে পড়বে না কথা নয়। বাবা ঠিক বুঝতে পেরেছেন কোন্ বাড়ির মেয়ে মৃন্ময়ী। ওদের বৈভবই মৃন্ময়ীর প্রতি বাবার যত সম্ভ্রমের কারণ।

মনে হল, বাবাকে যেন ছোট করছি। বাবা তো আমার এমন মানুষ নন। বাবা কি তবে মৃন্ময়ীর আচরণে মুগ্ধ। কত বড় বাড়ির মেয়ে তাঁর বাড়ি নির্দ্বিধায় আসে। তাঁর ছেলের সঙ্গে এক কলেজে পড়ে। আসলে বাবার সেই এক পুত্র-গৌরব। পুত্রটি একদিন খুব বিখ্যাত ব্যক্তি হবে এমনও আশা পোষণ করে থাকতে পারেন। আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠীতে এমনই নাকি লেখা আছে। বৈভব বাবাকে কোনোদিন বিচলিত করে না। কারণ বাবার কাছে তাঁর এই বাড়িটুকু, গাছপালা, বিগ্রহ এবং গাভী সকল মিলে লক্ষ কোটি টাকার চেয়েও মূল্যবান। বাবা আমার এ দেশে এসে কত সহজে মাটির ভিতরে শিকড় চালিয়ে দিতে পারলেন।

বুঝলাম ঘুম আসবে না। উঠে বসলাম। কিছু লেখা যায় কিনা চেষ্টা করলাম। না মাথা ফাঁকা। একটা লাইন আসছে না। শুধু সব লাইনে পরীর দুই ভরা চোখ, পুষ্ট স্তন, এবং ঋজু কোমর এবং নাভিমূলে এক পরমাশ্চর্য দ্বীপ আবিষ্কারের আকাঙক্ষাতে মরিয়া হয়ে উঠেছি। পরী সেদিন কালীবাড়িতে জ্যোৎস্না রাতে কেন যে বনের গভীরে নিয়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে চেয়েছিল। সবটা দেয়নি। কিছুটা দিয়েছে। এই কিছুটাই আমাকে যে পাগল করে দিচ্ছে বুঝি।

লিখতে বসে কত সব স্মৃতি আমাকে পাগল করে তুলছে। একটা লাইন নেই মাথায়। দুই পাশে দুই নারী। মিমি আর লক্ষ্মী। আরও একজন, সেই ভায়া দাদু টিউশনির বড় মেয়ে। এই বয়সে মানুষ একা হয়ে যায়। সে নারীসঙ্গের জন্য পাগল হয়ে থাকে। বুঝতে পারি আমার লেখা লিখি সবই এই নারীসঙ্গ থেকে পরিত্রাণের পথ। ইচ্ছে করলেই তো কোনো নারী সম্ভোগে এখন তৃপ্ত হতে পারি না। কত রকমের পাঁচিল চারপাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছি, যতই চেষ্টা করি না কেন লেখা এখন হবে না। প্যাকেট খুলে কাগজগুলি দেখে রাখা ভাল। মাথায় মুখে চোখে জল দিয়ে এলাম।

তারপর প্যাকেট পুরো খুললে দেখলাম একটা কাগজের ডামি। ছয় ফর্মার কাগজ। সম্পাদকের নাম মিমিই সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে রেখেছে। এমন কি প্রিন্টার্স লাইন পর্যন্ত। টাইটেল বিজ্ঞাপন সব সাজিয়ে কোথায় কোন্ গল্প যাবে, কারণ গল্প বেশি পাওয়া যায় নি, কেবল পাওয়া গেছে গুচ্ছের কবিতা। কবিতা নির্বাচন আমার। কবিতাগুলি পড়ে দেখা দরকার। আর কাগজের নাম পরী লেখেনি। আমি সম্পাদকের নামের মাথায় আরও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখলাম—অ প রূ পা। লিখে বার বার পড়লাম। অ.....প.....রূ.....পা। এ যে কী আনন্দ, কী আনন্দ! ডামিটা হঠাৎ ছুঁড়ে লুফে নিলাম, তারপর সহসা জোরে আচমকা ডেকে ফেললাম—অ প রূ পা।

পাশে দেখি তখন পিলু ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। চোখ রগড়ে বলছে, ও দাদা, তোর কি হয়েছে?

ভারি লজ্জায় পড়ে গেলাম। নিজেকে সংযত করে বললাম, না কিছু না। তুই ঘুমো।

পিলু, শুধু পিলু কেন, মায়া, মা বাবা আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যান। তাঁরা বোঝে না আমি কেন দিন দিন এত গম্ভীর হয়ে যাচ্ছি। আমার পছন্দ অপছন্দের প্রতি তাঁরা আজকাল খুবই গুরুত্ব দেন। এই যে বলেছি, না তোমরা যাবে না, এটা বাবা দিন কয়েক বাদে আর

একবার জিজ্ঞেস করবেন আমাকে, যাওয়াটা বোধহয় উচিত হবে। তুমি ভেবে দেখ। অর্থাৎ বাবা বুঝতে পারেন আমার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকলে, খুবই নিরীহ এবং গোবেচারা স্বভাব আমার। সময় বুঝেই কথাটা তুলবেন।

পিলু আবার শুয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমাচ্ছে। ওর জীবনে কোন সংকটই নেই। ওকে কেন জানি ভারি হিংসা হচ্ছে। ও তো বুঝতে পারে না ভাল একটা কবিতা লিখতে না পারলে কি জ্বালা বোধ করি!

কবিতাগুলি দেখতে গিয়ে অবাক। সবই অপাঠ্য। কবিতা গোটা দুই তিন ছাপা যায়। আরে, এ যে একটা পদ্য লিখেছেন তিনি। নিচে লেখা ভূপাল চৌধুরী। সুন্দর প্যাডে লেখা, উপরে নাম, কোয়ালিফিকেশন্। সব দেখে বুঝলাম, মিলের ম্যানেজার-প্রবর না হয়ে যায় না। উপরে ক্রস চিহ্ন দিয়ে কেমন একটা জ্বালাবোধের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন পর প্রতিশোধ নেওয়া গেল। অর্থাৎ অমনোনীত। কবিতা ছাপার উপযুক্ত নয়। কবিতার তুমি অ আ ক খ বোঝ না। তোমার জীবন অর্থহীন।

তোমার বাবার জীবনও। সঙ্গে সঙ্গে এখন আমার হাই উঠছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। এতদিন পর ভিতরের যে অপমানবোধে পীড়িত হচ্ছিলাম, তা নিমেষে কেটে গেল। আমি জানি, মিমি ঠিক মিলের ম্যানেজারের কাছ থেকে কোনো বিজ্ঞাপন আদায় করেছে। সেই সূত্রে তিনি কবিতা গছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমি সম্পাদক। এমন অপাঠ্য কবিতা ছেপে আর যাই করতে পারি অপরূপাকে হেয় করতে পারি না।

সকালে উঠে মনে হল দীর্ঘদিন পর আমি সারারাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। কী তৃপ্তি, কী আনন্দ।

সাত

কদিন থেকে জোর বর্ষা শুরু হয়েছে। আমাদের বাড়ির সামনের নালাটা জলে ভেসে গেছে। সামনের মাঠ ঘাট সব। রাস্তায় এসে দাঁড়ালে, দূরের বাদশাহী সড়ক আম জাম গাছের ফাঁকে দেখতে পাই। বর্ষার সময়টা বাড়িতে আটকা পড়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ বাড়ি থাকতে এখন কেন জানি আর ভাল লাগে না। বৃষ্টিটা কবে যে ধরবে। রাস্তাটা আমাকে টানে।

সেদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে ফর্সা। আশ্বিন-কার্তিকের আকাশের মতো। ভিতরটা কেমন আনন্দে রে রে করে উঠল। মা বলল, ওঠ বাবা ওঠ। একেবারে পচে গেলাম।

আমাদের এই বাড়িঘরে কাঠকুটোর বড় দরকার। বর্ষার সময়টায় মা'র খুবই কষ্ট। পাটকাঠি, না হয় শুকনো ডালপালা, খড়, এ-সব দু-বেলা খাবার ফুটিয়ে খেতে বড় দরকার। আমাদের উঠোনটা কচ্ছপের পিঠের মতো। জল দাঁড়ায় না। একটু রোদ পেতেই শুকনো খটখটে। যে ঘরটায় আমি আর পিলু থাকি, বৃষ্টির সময়, সব খড়কুটো ডালপালা সেখানে তুলে রাখা হয়।

এ-নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার মতান্তর চলছে। বাবাকে বলে বুঝেছি, লাভ নেই। মা'র সায় না থাকলে বাবা কিছুতেই মত দেবেন না।

বারান্দায় জলচৌকিতে বসে মনে হল, এ-সময়েই কথাটা তোলা দরকার।

পিলু, মায়া, মা সব খড়কুটো, শুকনো পাতা বাইরের উঠোনে মেলে দিচ্ছে। বাবা একটা লম্বা বাঁশ টেনে আনছেন। বাঁশটা দু-গাছের ডালে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। পিলু একবার আমার দিকে তাকাল। আমার বসে থাকাটা বোধ হয় তার পছন্দ হচ্ছে না। তবে পিলু জানে, আমার মেজাজ খারাপ। পরীক্ষার রেজাল্টের জন্য রোজই শহরে যাই। মুকুল, নিখিল, নিরঞ্জন আমার সঙ্গে পড়ে। পত্রিকায় যদি খবর বের হয়, ওরা বাড়িতে কাগজ রাখে। পরী অবশ্য অনেক আগেই আগাম খবর দিয়েছে আমাদের, রেজাল্ট বের হতে এ-মাসের শেষাশেষি, কেন যে এত হেদিয়ে মরছি বুঝি না।

ক'দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় শহরে যাওয়া হয়নি। রাস্তাটা যেমন টানে, শহরে যাওয়ার টানটাও আমার কম নয়। আমাদের ত্রৈমাসিক কাগজের অফিসটা মুকুলের বাড়িতে। ওর দাদার পি ডবলু ডির কোয়ার্টারের বসার ঘরটা 'অপরূপা' কাগজের অফিস। সামনে লম্বা বারান্দা, পরে লন, লোহার

রেলিং দেওয়া পাঁচিল, পরে লাল ইঁট সুরকির পথ। দুটো বড় দেবদারু গাছ পার হলে, শহরের বিশাল মাঠ। মাঠ পার হয়ে সোজা স্টেশনে যাবার রাস্তা।

আমার একটাই ভয়, পরী আবার যে কোনোদিন চলে আসতে পারে। কিছু একটা উপলক্ষ খুঁজে চলে আসবে। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আমার যত না মাথাব্যথা, পরীর তার চেয়ে বেশি। মেয়েটা সত্যি আশ্চর্য। নিজের কথা ভাবে না। পাশ করলে, ফেল করলে কিছুতেই না। অবশ্য পরীকে আমরা ভালই জানি। ওর রেজাল্ট মিনিমাম ফার্স্ট ডিভিসন—আমরা ধরেই নিয়েছি। আমার দুশ্চিন্তা, আমার কী না জানি হবে, পরীর দুশ্চিন্তা বিলুটা যা স্বভাবের পরীক্ষার এদিক ওদিক হলে আবার না বাড়ি থেকে ভেগে পড়ে। সে জেনে গেছে, বাড়ি থেকে একবার উধাও হয়েছিলাম, আবার উধাও হওয়াটা বিচিত্র নয়।

বাবা দেখছি পাটকাঠির আঁটিগুলি গুনে বাঁশে হেলান দিয়ে রাখছেন। আমার ঘর থেকে ভেজা পাট তুলে নিয়ে রোদে শুকোতে দিচ্ছেন। আর বসে থাকা যায় না। বাড়িতে আমি বাবার কলেজ পড়ুয়া ছেলে বলে, এ-সব কাজে হাত লাগাই এখন বাবারও পছন্দ না। মা অবশ্য গজগজ করে। মাকে খুশি রাখতে পারলে কাজটা উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। মা'র সঙ্গে কাজে লেগে পড়লাম। ঘর সাফ করে সব বের করে দিলাম। মা হঠাৎ বললে, তোর কী হয়েছে রে?

এ-সব কাজে হাত লাগিয়েছি দেখেই মা অবাক। বললাম, কৈ কিছু হয় নি তো।

মা এখন একটা চাটাইয়ে ধান ছড়িয়ে পা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছে। বড় পুত্রটির সুমতিতে বোধ হয় কিছুটা হতভম্ব। বললাম, মা আমার ঘরটায় পাট-ফাট রাখতে বাবাকে বারণ কর। কী পাটপচা গন্ধ! লোক এলে ভাববে কী!

—তোমাদের বাড়িতে আসেটা কে? এত যে ভাবনা!

বাবা বাড়ির বাইরের দিকে কাজ করলেও কথাটা বোধ হয় কানে গেছে। বাবার ইজ্জতে লেগেছে। বাবা সোজাসুজি উঠোনে এসে বললেন, এটা কেন বলছ ধনবৌ? আসে না কে?

—সেই তো। আমি বাবার কথায় সায় দিলাম।

মা'র হাতে অনেক কাজ। মায়া বলল, মা আজ ধান সেদ্ধ হবে?

—দেখি। আকাশের যা অবস্থা। বরুণ দেবের কি কৃপা হবে কে জানে।

বাবার কথার কোনো জবাবই দিচ্ছে না মা।

বাবা বারান্দায় উঠে এলেন। এত কষ্ট করে ঘরবাড়ি করা, গাছপালা লাগান, সবই তো মানুষের জন্য। ধনবৌ বলছে কিনা, কে আসে!

—আরে আসে না কে? সকাল থেকেই তো আসতে শুরু করে। বাবা বেশ ঝাঁঝের গলায় কথাটা বললেন।

মা ধানের পাত হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, আসে ভজাতে।

বাবা ঠিক বুঝতে পারলেন না, মা'র মাথা সকাল বেলাতেই এত গরম কেন! চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। কয়েক মণ ধান বাবা মা'র পরামর্শ মতোই কিনেছেন। চাল এতে অনেক সস্তা হয়। তাছাড়া ধানের তুষ, চালের কুঁড়া সংসারে লাগে না হেন জিনিস নেই, কিন্তু এবারে এত বর্ষণ হবে, মার বোধ হয় ধারণা ছিল না। আমাদের পাঁচ বিঘা জমির বিঘাখানেক শুধু ঘরবাড়ি, গাছপালা, গোয়াল ঘর, ঠাকুর ঘর, রান্নার ঘর, আমার পিলুর জন্য থাকার আলাদা ঘর, তক্তপোষ। বাঁশের একটা জঙ্গল আছে জমির শেষ দিকটায়। সেখানটায় কিছু আবাদ হয় না। কিন্তু ঘরবাড়িতে বাঁশের কত দরকার আমরা এখন বুঝতে পারি। পাটকাঠির বেড়া পাটকাঠির চাল, তার কোণায় চারটে মজবুত বাঁশ। মাঝে তিন খানা করে পলকা বাঁশ, চাল দুটো উপরে তুলে বেড়া লাগিয়ে দিলেই ঘর। বাবা যজন-যাজনের কাজ সেরে, বাড়িটা নিয়েই পড়ে থাকেন।

সেই বাড়ি নিয়ে খোঁটা!

বাবাও কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

মা'র গজ গজ তখনও চলছে। কে করে অত! আর ডাকলেই হল, কর্তা আমার বাড়ি শনি পূজা!

তা জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে—তোমার দাম বাড়ে না! এ কি রে বাবা, এক পয়সা দু-পয়সা দক্ষিণা! ছটা পেট ওতে চলে! সেই এক কথা।

তাহলে গতকালের জের চলছে। মা'র আবার শুরু হয়েছে।

বাবা প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করে এক ক্রোশ হেঁটে পূজা করতে গেছিলেন। কী দুর্যোগ! বার বার মা'র এক কথা, যেতে হবে না। অন্ধকারে কিসে কোথায় পা দেবে, তখন দেখবেটা কে?

বাবা বলেছিলেন, ধনবৌ, ও-কথা বলতে নেই। রাখে কৃষ্ণ মারে কে! বাবা অন্ধকারেই দুর্যোগের মধ্যে মার কথা না শুনে বের হয়ে গেছিলেন। যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, বারের পূজা। আমার জন্য বিঘ্ন ঘটলে সংসারে অমঙ্গল হতে কতক্ষণ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।

মাও আর কিছু বলতে সাহস পায়নি। সত্যি তো—বারের পূজা, শনির কোপে শ্রীবৎস রাজার কথা কে না জানে। মা আর উচ্চবাচ্য করে নি। বেশ রাত করে বাবা একেবারে বৃষ্টির জলে নেয়ে ঘরে ফিরলেন খালি হাতে। দরজা বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সোঁসোঁ বাতাসের গর্জনে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। বাবা বাড়িতে ঢোকার আগেই মা কি করে যেন সব টের পায়। দরজা খুলে দিল। বাবা, শুধু বলেছিলেন, কুণ্ডু মশাইর আক্কেল ভারি কম। খবর দিলেই পারতিস। দুর্যোগের জন্য বাজার হাট করা যায় নি।

মা একটা কাপড় এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, আগে সব ছেড়ে ফেল। পরে কুণ্ডুমশাইকে নিয়ে পড়বে। যেমন তুমি, তেমন তোমার যজমান। দু-জনেই সমান।

বাবার মুখে একটা কথা নেই তখন। আমরাও বাবার ফিরে আসার জন্য জেগে আছি। এমন দুর্যোগের রাতে বাবা শনিপূজা করে ফিরে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। সেই বাবা ফিরে আসায় ঘরবাড়ির সব ঠিকঠাক আছে এমন ভেবে শুয়ে পড়তে চলে গেছিলাম। রাতে দু'জনের মধ্যে আক্কেল নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে পারে। সকাল বেলায় তারই সম্ভবত জের চলছে।

মাথায় রাগ পুষে রাখা সংসারের পক্ষে অকল্যাণকর বাবা বোধহয় এটা বোঝেন। বোঝেন বলেই ক্রোধ নিবারণ করতে বাবা তাঁর জানা বিচিত্র সব ধন্বন্তরির আশ্রয় নেন। তার একটি বসে বসে নিবিষ্ট মনে তামাক সাজানো, কলকেয় আগুন দেওয়া, তারপর চোখ বুজে টেনে যাওয়া। তখন বাবার চোখ মুখ দেখলে কে বুঝবে মানুষটা এ-জগতে আছে। মা'র এ-হেন দৃশ্য সহ্য হয় না। একেবারে শিব ঠাকুর সেজে সংসারে কালাতিপাত, একটু যদি জ্ঞানগম্যি থাকে। হেন দৃশ্য চোখের সামনে কে দেখে! মা সোজা রান্নাঘরে।

বাবা টিপে টিপে কলকেয় তামাক ভরছিলেন। মা রান্নাঘরে উঠে গেছে। একবার রান্নাঘরের দিকে তাকালেন বাবা, পরে আমার দিকে। বললেন, এই তো সেদিন এস ডি ও সাহেব ঘুরে গেলেন! তা তোমার মা জানে, এস ডি ও সাহেব বস্তুটি কি!

মা রান্নাঘরে ঠিক কান খাড়া করে রেখেছে—এবং আমরা বুঝতে পারি, এই কথা কাটাকাটির সময় দু-পক্ষেরই কান বড় সজাগ। যে যেখানেই থাকুক না কেন সব শুনতে পায়।

বিলু তোর বাবা কি সাহেব বলল—আমি বুঝি না!

আমি বললাম, এস ডি ও সাহেব।

—পরীর সঙ্গের লোকটার কথা বলছে!

বাবা বললেন, হ্যাঁ। লোকটা বল না, ভদ্রলোক বল। তিনি হলেন সদরের এস ডি ও। ধুতি শার্ট পরে এসেছিলেন বলে তুমি তার মূল্য বোঝ না। এই ঘরবাড়িতেই এসেছিলেন।

—তোমার খোঁজে?

—আমার খোঁজে হবে কেন! বিলুর খোঁজে।

মা রান্নাঘর থেকেই কথা চালাচালি করছে। বলছে—আমি ভাবছিলাম তোমার খোঁজে বোধ হয়।

ভারি অপমানবোধে বাবার মুখ কেমন পীড়িত দেখাল। মা'র এই খোঁচা দেওয়া কথা কি কঠিন বাবার দিকে তাকিয়ে টের পাচ্ছিলাম। বাবাকে প্রবোধ দেবার জন্য বললাম, আমার খোঁজে আসা বাবার খোঁজে আসা একই কথা। তুমি মা না, কি যে সব বল!

বাবা এতে বোধহয় ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। বললেন, তোমার মাকে বল, এই কলোনিতে কার ঘরবাড়িতে কবে সাক্ষাৎ এস ডি ও সাহেব এসেছিলেন। বোঝাও! আমি তো চোখ বুজে থাকি। সংসারের কিছু দেখি না। আমার বাড়িতে কেউ আসে না।

এই সুযোগ। এস ডি ও সাহেবের আসার বদান্যতায় বাবা যদি আমার ঘরটায় আর কাঁচা পাট, খড়কুটো সব না রাখেন। বন্ধু-বান্ধবরা আসে, আবার এস ডি ও সাহেব আসতে পারে—বললাম, ভাগ্যিস বাড়ির ভিতর ঢুকাই নি।

—এটা তোমার অন্যায় কাজ হয়েছে। কেউ এলেই মনে রাখবে বাড়ির অতিথি। তার আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি রাখতে নেই। তুমি তার সঙ্গে রাস্তাতেই কথা সেরে ছেড়ে দিলে।

—ও তো পরীর দেওয়া একটা খাম দিতে এসেছিল। ওর জিপ রাস্তায়। পরী ওর সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল—যাবার পথে দিয়ে গেছে। বাবা পরী কথাটাতে একটু বিভ্রান্তিতে পড়লেন, তবে কিছু বললেন না।

—তবু এই বাড়িঘরে তিনি এসেছিলেন। তুমি এখানে আছ বলেই না এসেছিলেন। অন্যথায় আসতেন! বাড়িঘরের মাহাত্ম্য ভুললে চলবে কেন?

—এনে বসাবটা কোথায়! আমার ঘরটাতে পা ফেলা যায় না। ঢুকলেই পচা পাটের গন্ধ। এতে আপনার বাড়িঘরের সুনাম রক্ষা হত না।

বাবা কি বুঝলেন কে জানে। বাড়িতে আজকাল বড় পুত্রের বন্ধু-বান্ধবরা আসে। তারা সবাই সম্পন্ন ঘরের ছেলে। পুত্রের মর্যাদা বলে কথা। বললেন, দেখি পাট বিক্রি হলে, মুনিষ নিয়ে আর একটা ঘর করা যায় কি না! সবই তো আছে—শুধু মুনিষের খরচটা।

মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। বাবার সঙ্গে এত কথা আমার, তা ছাড়া বৃষ্টি বাদলার দিনে খড়কুটো, কাঁচা পাট রাখার জন্য একটা ঘর উঠবে, মা'র পরামর্শ নেওয়া হবে না—মা সহ্য করবে কেন, ঘর থেকেই স্বর ভেসে এল, আজও তুই বিলু টিউশনি কামাই করলি!

অর্থাৎ মা'র আর ইচ্ছে নয় বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলি। বললাম, যাব। কাল থেকে যাব। তুমিই তো যেতে দিলে না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরজ্বালা হলে কে দেখবে।

—আজ তো বৃষ্টিও নেই। দুর্যোগও নেই। ওরা কি ভাববে। কুড়িটা টাকা সোজা কথা!

আসলে আমি বারান্দায় বসে থাকি মা চায় না। বাবা আজকাল সব বিষয়েই আমার মতামতের গুরুত্ব দেন। মা যে আমার কত অবুঝ সেটা ধরিয়ে দেবার জন্যও আমি। বাবা এখন মাকে আমার মারফতে কি-ভাবে খোঁচা দেবেন, সেই ভয়ে বলা।

বাবা তখন হুঁকোয় টান দিয়ে খানিকটা বোধহয় স্বস্তি বোধ করছেন। বললেন, তোমার মা তো এস ডি ও সাহেব কি, কেন, তাঁর ক্ষমতা কত কিছুই জানে না। আমাদের মহকুমার এস ডি ও ছিলেন বরদাবাবুর ছেলে। বরদাবাবু হল গে দীনেশবাবুর মাসতুতো ভাই। সোজা এস ডি ও হয়ে এল। মহকুমার মালিক। আর একটা সিঁড়ি ভাঙলেই ডি এম। তা কি তোমার মা বোঝে! ডি এম, এস ডি ও'র কত ক্ষমতা জানে! কি তফাৎ বোঝে!

মা'র পক্ষে অবশ্য এ সব জানার কথা না। বাবার পক্ষে জানার কথা। মামলা-মোকদ্দমায় নারায়ণগঞ্জ ঢাকা গেছেন। তিনি বুঝতেই পারেন। বাবাদের আমলে নাকি বাঙালী ডি এম হাতে গোনা যেত। এ-সবও বললেন।

মা হঠাৎ বোধহয় ক্ষেপে গিয়ে বলল, তা পরীর সঙ্গে কী সম্পর্ক! পরী তো কলেজে পড়ে। বাড়িতে ওর মা বাবা নেই! এমন একটা সোমত্ত মেয়েকে একলা ছেড়ে দেওয়া। বলি, আক্কেল কি বাড়ির।

মা ঠিক বোঝে না পরীকে সবই মানায়। পরী এখানকার এক বিপ্লবী পার্টির ক্যাডার। মিছিল করে মিটিং করে সরকারের বিরুদ্ধে। আবার এস ডি ও সাহেবের জিপেও চড়ে বেড়ায়। মার বোধ হয় আপত্তিটা সেখানে।

মা বলল, কী গেছো মেয়ে রে বাবা!

বাবা বললেন, গেছো মেয়ে বলছ কেন। ও তো সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। একেবারে দেবীর মতো চোখ মুখ। কত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে। সেও এই বাড়িঘরে আসে। আসে না কে? এবারে তোমার মাকে বোঝাও।

আমার বাবাকে ইতিমধ্যে একবার এসে পরী তার ভাল নামটাও জানিয়ে গেছে।

বাবা হঠাৎ কেমন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, পরী পরী করছ কেন তোমরা বুঝি না! ওর নাম মৃন্ময়ী। বাড়ির লোকেরা মিমি বলে ডাকে। তা রায়বাহাদুরের এমন আদরের নাতনির নাম মিমি না হলে মানাবে কেন? আমার দিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, তুমিও দেখছি ওকে পরী বলেই ডাক।

বাবাকে তো আর বলতে পারি না, পরী নামটা আমিই কলেজে দিয়েছি। কালীবাড়িতে আলাপ হবার পর পরীকে কথাটা বলতেই সে কি হাসি। শরীর থেকে আঁচল খসে পড়েছিল। আঁচল সামলে বলেছিল, তুমি বিলু আমাকে কিন্তু পরী বলেই ডাকবে। না হলে ভীষণ রাগ করব।

নাও এবারে ঝামেলা পোহাও। বাবাকে বলি কী করে আমি ওর নাম দিয়েছি পরী। পরী নামে না ডাকলে ও রাগ করে। বাবা তখন বলতেই পারে, ওর নাম থাকতে আবার একটা নাম দেবার দায় কে তোমাকে দিল!

আমি চুপ করে আছি। নিজের এই দুর্বলতা পরিহার করা শ্রেয়। কিন্তু কি যে হয়েছে, পরী এখন আমার এত কাছের যে তাকে পরিহার করে চলাই কঠিন। আমাদের কাগজের সব সে। কাগজের সম্পাদক পরীর ইচ্ছেতেই আমাকে হতে হয়েছে। যত ভাবি বিদ্রোহ করব তত পরী যেন নানা ভাবে আমাকে কাবু করে ফেলছে। কাগজটাও যে বের হচ্ছে পরীর চেষ্টাতে, সে-ই বিজ্ঞাপন আদায়ের ভার নিয়েছে, সে-ই টাকা পয়সা সংগ্রহ থেকে প্রেস ঠিক করা সব তার।

বাবা ফের বললেন, মুকুল তো ওকে রাণী বলে ডাকে।

বাবা তাহলে সবই শুনতে পান। নিখিল, নিরঞ্জন, মুকুল সাইকেল চালিয়ে শহর থেকে কোনো বিকেলে চলে এলে আমার ঘরে জম্পেশ করে আড্ডা। পরীক্ষা হয়ে গেলে কি আর করার থাকে—তবে আমরা বসে নেই। অপরূপা নিয়ে মেতে আছি। আসলে পরী বোধ হয় আমার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে চায়। দেখ, যাকে তুমি হেলা ফেলা কর—তারই আজ্ঞাবহ দাস একজন এস ডি ও।

বাবাকে বললাম, পরীকে আমি ও নামেই ডাকি।

—নামটা খারাপ না। তা দেখতে তো পরীই। ও রাগ করে না?

বললাম, না।

বাবা কথাটা শুনে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মুখে কিছুটা দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল দেখলাম।

বাবাকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে। পরীর কথা আবার তুলবে ভেবেই সাইকেলটা বের করে জামা গলিয়ে বের হয়ে পড়লাম। মন ভাল না। রেজাল্টের দুঃশ্চিন্তায় ঘুমও আসে না।

মা বলল, কোথায় বের হচ্ছিস।

পিলু বলল, আজ দাদা তুই ঠাকুরপূজা করবি। আমি পারব না।

আমার কেন জানি সহসা মাথাটা গরম হয়ে গেল—বললাম, পারব না।

বাবার মুখে এমন দুশ্চিন্তার রেখা কখনও ফুটে উঠতে দেখি নি। বের হবার সময় শুধু বললেন, কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না।

মাও বের হয়ে এল। বলল, এখন বের হবার সময়?

—একটু ঘুরে আসছি। মাকে প্রবোধ দিলাম।

কিন্তু বাবা কেমন নাছোড়বান্দা। বললেন, শোন।

বাবার গলা এত গম্ভীর যে সাইকেল থেকে নেমে পড়তেই হল।

—কোথায় যাচ্ছ বলে যাও।

বাবা এ-ভাবে কখনও কথা বলেন না। বাবার স্বভাবও রাশভারি নয়। তবু না বলে পারলাম না, মানুকাকার কাছে যাচ্ছি।

—কেন!

—যদি রেজাল্টের খবর পাই।

—মানু দিতে পারবে?

—দেখি, না হয় বাজারের দিক থেকে ঘুরে আসি।

ক'বছরে এখানে একটা বাজারও হয়ে গেছে। চায়ের দোকান, মুদির দোকান, মাছ, কাঁচা আনাজ সবই পাওয়া যায়। চায়ের দোকানে কাগজ আসে। কলোনির লোকেরা চাও খায়, কাগজও পড়ে। ওদিকটায় আরও দু-একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলে আছে। কাগজ বের হচ্ছে শুনে, তাদের সঙ্গে আমার এই কলোনিতে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাদের একজন পালিয়ে কবিতাও লেখে। দুটো কবিতা রেখেও গেছে। ভাবলাম, ওখানেই তবে যাই। আসলে বাড়িতে একদন্ড থাকতে কেন জানি ইচ্ছে হচ্ছে না।

সাইকেলে চড়ে বসলেই কেমন নিজের এক অন্য জগৎ ফিরে পাই। রাস্তায় নেমে গেলে গাছপালার ছায়ায় কোথাও হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কেন এটা হয়। বাড়িঘর এত প্রিয়, সেই বাড়িঘরেই মন বসে না। কেমন উড়ো উড়ো একটা ভাব মনের মধ্যে কাজ করে। কিছুটা এসেই বুঝতে পারলাম বাজারের দিকে যাওয়া যাবে না। কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালান মুশকিল। সাইকেলের মাডগার্ডের মধ্যে কাদা ঢুকে যাচ্ছে। কিছুটা হেঁটে সাইকেল নিয়ে পাকা সড়কে উঠে গেলাম। কোথায় যে যাব বুঝতে পারছি না। কালীবাড়ি গেলে কেমন হয়। কতদিন বৌদিকে দেখি না। বাবাঠাকুর কেমন আছেন খবর রাখি না। বাবা একদিন বলেওছিলেন, এতদিন সেখানে কাটালে, অথচ বাড়ি এসে সেখানে আর গেলে না।

আর যা হয়, মনের মধ্যে গভীর এক বেদনার জন্ম নেয়। লক্ষ্মী আমার উপর অভিমান করে চলে গেল। এসব মনে হলে আমার পীড়ন বাড়ে। কিছুই মনে থাকে না, আমার ঘরবাড়ি আছে বাবা মা আছে মনে থাকে না। কেমন উদাস হয়ে যাই এখনও। বাবার মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। বাবা কি টের পেয়েছেন, আমি একটা ভাঙা লঝ্ঝরে সাইকেল নিয়ে, নতুন মার্সিডিজ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছি! আমাকে নির্ঘাত পেছনে ফেলে, গাড়িটা পলকে যে উধাও হয়ে যেতে পারে, আমার অপরিণত বুদ্ধির পরিণামে বাবা কি শংকিত?

দুটো কারণে পরীকে আমি অপছন্দ করি।

এক, পরীর রাজনীতি আমার বিলাস মনে হয়।

দুই, পরী লক্ষ্মীর মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে জোরজার করে সব কিছু আদায় করে নিতে চায়। বড়লোকের অহংকার নেই এমন একটা ছদ্মবেশকেও পরীর আমি ঘৃণা করি। চট করে সে সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারে, চট করে সে বলতেও পারে, বিলু তোমাদের বাড়ি আমি যাব।

আমি বলেছিলাম, না।

না বলেছিলাম এ-জন্য, আমরা কত গরীব, পরী আমাদের বাড়ি এলে টের পাবে।

পরী শোনে নি।

পরী সেই কালীবাড়ি থেকেই বায়না জুড়েছিল, বিলু আমরা ঠিক যাব। তোমার বাবা মাকে দেখে আসব।

পরীদের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে কে আর শখ করে যায়। নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে কে যায়। আমার সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য পরী শেষ পর্যন্ত ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়েছিল বলেই যাওয়া। পরী আমাকে সেদিন একা পেয়ে হল-ঘর থেকে সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল। আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি পরীর ব্যবহারে। আমাকে একা পেলেই পরী এটা করে।

—এই পরী কি হচ্ছে। ছিঃ তুমি কী—

—আমি কিছু না। কেউ আসবে না।

—না আসুক, এমন করলে কোনোদিন আসছি না।

—না এলে আমার বয়েই গেল। আমার কচু, বলে ছেড়ে দিলে। দেখলাম সত্যি, বাড়ির

এমন নির্জন এক এলাকায় নিয়ে এসেছে যে পরী যা কিছু করলেও দেখার নেই। তাই পরীর এত সাহস।

আমার ভিতরে কেমন একটি অপমানবোধ গর্জে উঠেছিল। পরীকে শিক্ষা দিতে হবে। কতটা পরী যেতে পারে দেখব। নেমে যাচ্ছিলাম সিঁড়ি ধরে। পরী সহসা পেছন থেকে নেমে হাত জড়িয়ে বলেছিল, আমাকে ক্ষমা কর বিলু। যাবে না। দাদুকে বলেছি, বিলুকে মন্দিরের পুরোহিত করা ঠিক হবে না। ও একবার কুড়িটা টাকা চুরি করেছিল। গ্যারেজে কাজ করত। ওখানকার গোবিন্দ কৌটোয় কুড়িটা টাকা রেখেছিল, তাই নিয়ে উধাও। আর যাই কর একজন চোর-ছ্যাঁচোড়কে মন্দিরের পুরোহিত করতে যেও না।

বুদ্ধিটা আমারই দেওয়া। অবশ্য পরী বানিয়েও বলে নি। এসব কারণে আমি পরীর প্রতি আবার খুবই কৃতজ্ঞ।

পরী তার লাল সাইকেলে ভর দিয়ে সেদিন কথা বলছিল, আমি যে খুবই ক্ষেপে আছি বুঝতে পেরে বলল, ঠিক আছে আমি আর যাচ্ছি না। শোনো, লেখাগুলো প্রেসে দিতে হবে। দিলীপকে দিয়ে দিলেই হবে।

আমি উঠে পড়ার সময় বললাম, মুকুলের কাছে আছে। দিলীপকে নিয়ে যেতে বলবে।

—কেন দিয়ে আসতে পারবে না?

—না।

মুকুল বলল, তোমরা একেবারে দেখছি সাপে-নেউলে—অ্যাঁ, এ কিরে বাবা! ঠিক আছে মিমি, আমি দিয়ে আসব। আমার দিকে তাকিয়ে মুকুল বলল, পরী তোমাদের বাড়ি গেছে তো কী হয়েছে! এতে এত রাগেরই বা কী আছে!

আমি বলেছিলাম, না আর যাবে না। এ-সব বিলাস আমার পছন্দ নয়। সেই সব কথাও বার বার মনে হয়।

পরী সাপের মতো ফণা তুলে বলেছিল, বিলাস! বিলাস বলছ! ঠিক আছে, আমি যাব, আমি যাব। দেখি তুমি কী করতে পার।

পঞ্চাননতলা পার হয়ে ভাকুড়ির দিকে কখন এসে একটা বড় গাছের নিচে বসে পড়েছি খেয়াল নেই। সাইকেলটা গাছের নিচে, সামনে আদিগন্ত মাঠ। শস্যক্ষেত্র। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। সারাটাক্ষণ মাথায় পরী। কতবার ভেবেছি পরীকে নিয়ে মাথা গরম করব না, সে তো আমার কেউ না, আমাকে জড়িয়ে পরীর চুমো খাওয়াটাও বিলাস। বিলাস কথাটা ভাবলেই মাথা স্থির থাকে না। পরীর কথা ভাবলে আমার পরীক্ষার দুঃশ্চিন্তাও মাথায় থাকে না।

এ-সব মনে পড়লেই পরীর উপর আমি আরও কেন যে খাপ্পা হয়ে যাই। আমার মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ডাগর চোখের অনাথা মেয়ে লক্ষ্মী আমাকে নিয়ে নিভৃতে গোপন একটা স্বপ্নের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেদিনের ঘটনায় লক্ষ্মী এতই ভেঙে পড়েছিল, যে তার বেঁচে থাকার চেষ্টা বড় অর্থহীন—সে এ-জন্য মরে গেল। পরী এবং আমি দুজনে মিলে লক্ষ্মীকে আত্মঘাতী করেছি।

এ-সবই ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। মানুকাকার কাছেও যাওয়া হয়নি, বাজারের দিকেও যাইনি—পরীর কথা ভাবতে ভাবতে পরীক্ষার দুঃশ্চিন্তা একেবারে উধাও। কখন বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। কতটা বেলা হয়েছে খেয়াল নেই। গাছের নিচে ঘাসের ভিতর শুয়ে জীবনের বিচিত্র ঘটনায় যখন মুহ্যমান, তখনই পিলুর গলা, এই দাদা, তুই কিরে। এখানে একা শুয়ে আছিস। মা বাবা বসে আছে। খায় নি।

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম।

পিলুর চোখে বিস্ময়। দাদাটি তার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। —এই চল। বসে থাকলি কেন!

—তুই যা। আমি যাচ্ছি।

—না আমার সঙ্গে যেতে হবে। তুই কিরে, মা বাবার কষ্ট বুঝিস না!

তবু বসে আছি। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। সত্যি তো আমি এমন হয়ে যাচ্ছি কেন। পিলুর

চোখ মুখ শুকনো। দাদাকে নিয়ে তার ভারি চিন্তা। কম কথা বলে। কখন আবার ফেরার হয়, এই ভয়ে সে সব সময় দাদার সম্পর্কে বড় সতর্ক থাকে। আমি সঙ্গে না গেলে সে যে যাবে না বোঝাই যাচ্ছে। সাইকেলে উঠে বললাম, চল।

পিলু পাড়ার কারো সাইকেল নিয়ে আমাকে খুঁজতে বের হয়েছে। সে মুকুলের বাড়িতে গেছে, পরীদের বাড়ী গেছে, কালীবাড়ি গেছে সবাইকে ঠিক খবর দিয়েছে, দাদা সকালে কিছু না খেয়ে কোথায় যে বের হয়ে গেল। পিলু পেছনে আসছে। যেন আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম, বাবা তামাক সাজছেন। বাবার এটা স্বভাব। সংসারে বড় রকমের গরমিলের আঁচ পেলে, খেপে খেপে ঘন্টায় তিন চারবার তামাক খান। আমার ফিরতে দেরি হওয়ায় তাঁর এখন সেই তামাক খাবার পর্ব চলছে।

পিলু বলল, জান বাবা, দাদা না...

ওকে আর বলতে দিলাম না। —এই থামবি! দাদা না...! দাদা কী করেছে!

—করেছিস তো।

—করেছি ভাল করেছি। তুই বলে দ্যাখ না।

পিলু কী ভাবল কে জানে। সে বোধ হয় বুঝতে পারে গাছতলায় শুয়ে থাকাটা মানুষের স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। বাবাকে বললে, আমার রাগ হতে পারে। আমি আবার কোন এক বিচিত্র কান্ড বাধিয়ে বসব ভয়েই পিলু আর কিছু বলল না।

মায়া গামছা তেলের বাটি এনে সামনে রাখল।

বাবা বললেন, বিশ্রাম করে স্নানটান সেরে নাও। তুমি স্নান করলে আমরা একসঙ্গে খেতে বসব।

তাহলে বাবা পিলু মা মায়া এখনও খায়নি। আমার ফেরার অপেক্ষাতে বসে আছে। নিজের উপরই তখন কেমন ক্ষেপে যাই। আমার হয়েছেটো কি! আমার তো এখন দরকার অভাব অনটন থেকে গোটা সংসারটাকে বাঁচানো। আমি একটা কাজ পেলে বাবা হাতে স্বর্গ পাবেন। বাবার চাল-চলনে, কথাবার্তায় এমন একটা আভাস আমি সেই কবে থেকে পেয়ে আসছি। মানুকাকা বাবাকে সাফ বলে দিয়েছে, আমাকে বিলুর কাজ সম্পর্কে কিছু বলবেন না। শ্যামাপদর কাছে আমার মাথা হেঁট। বছর দুই আগে শ্যামাপদবাবুর গ্যারেজ থেকেই আমি যে পালিয়ে গেছিলাম তাতে তিনি রুষ্ট। ফের কাজের ব্যবস্থা করে বিশ্বাস-ভঙ্গের দায়ে তিনি আর পড়তে চান না। ভাবলাম, খেয়ে দেয়ে একবার মুকুলের জামাইবাবুর কাছে যাব।

আসলে পাশের খবরের চেয়ে আমার কাছে কাজের খবরের গুরুত্ব বেশি। বেকার যুবকের মতো ভিতরে হাহাকার জেগে উঠছে। মার ইচ্ছে নয়, আমি পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিই। পিলুও চায় না। মায়ারও ইচ্ছে দাদা বি কম পাশ করবে। দাদা এম কম পাশ করবে। দাদার গৌরবে এই বাড়ি ঘর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কিন্তু আমি জানি, যা সময়কাল বি এ এম এ পাশ করাটা সহজ। কাজ পাওয়াটা কঠিন। যাদের ধরা করার কেউ নেই, তাদের জন্য কাজও নেই।

বাবার গলা পেলাম। যাও স্নানে যাও।

মায়া দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, যা দাদা। বসে থাকলি কেন!

পিলু এখন এত বাধ্যের যে সে এসে বলল, দাদা, তোর সাইকেলটা তুলে রাখি?

—রাখ।

—দাদা, পরীদি না বাড়ি নেই।

—কোথায় গেছে?

—'জাগরণ' নাটক হবে। নাটকের রিহারসেলে গেছে।

আসলে পরী আমাদের বাড়ি এলে যে আমি খুশি হই না, পিলু বোঝে। পরীদের বাড়িতে আমাকে খোঁজ করতে যাওয়ায় খুবই যে আমি অপ্রসন্ন পিলু তাও বোঝে। কারণ পরী এই অজুহাতে ঠিক আমাদের বাড়ি চলে আসতে পারে। —বিলুকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি ভাববেন না

মেসোমশাই—আমরা দেখছি। কোথায় যায় দেখব। পরীর আশ্বাস পেলে বাবা হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমি বিরক্ত হব, পিলু এটা বোঝে বলেই বলা, পরীর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। বাড়ির দারোয়ানই খবরটা দিয়েছে। সুতরাং দাদার খবর সে জানে না। দাদার খোঁজেও সে আসবে না।

আমি স্নান করতে বের হয়ে যাচ্ছি। মা আমার সঙ্গে এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। কেমন বোকার মতো মা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার এই আচরণ মা'র কাছে খুব অস্বাভাবিক ঠেকে। মা কি গোপনে এখন চোখের জল ফেলে আমার জন্য। পৃথিবীতে সব মায়েরাই কি সন্তান-সন্ততির এই বয়সটা নিয়ে বিমর্ষ থাকে। মাকে খুশি করার জন্য বললাম, মা আমি দৌড়ে ডুব দিয়ে আসছি। খুব খিদে পেয়েছে। ভাত বেড়ে ফেল।

সামান্য এই আশ্বাসে মা'র চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি খেলে গেল। সারা বাড়িটায় যে এতক্ষণ এক অপার বিষণ্নতা বিরাজ করছিল, স্নানে যাবার আগে টের পেলাম সব কেটে গেছে।

স্নান সেরে ফিরে এলাম তাড়াতাড়ি। মায়া ছুটে এসে আমার ভেজা গেঞ্জি এবং কাপড় হাত থেকে নিয়ে নিল। রোদে মেলে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি পিলু আয়না চিরুনি এগিয়ে দিয়ে বলছে, চুলটা আঁচড়ে নে দাদা।

আমাদের এই ঘরটায় শুধু কাঠের দরজা হয়েছে। বাবা আমার টিউশনির টাকাটা মাকেই দিয়ে দেন। মা টাকাটা বড় যত্ন করে তুলে রাখে। টাকাটা মা চায় বাড়ির আসবাবপত্র তৈরিতে খরচ করা হবে। শেষ পর্যন্ত আর তা হয়ে ওঠে না। সংসারে দু-বেলা আহার জোটাতে যখন বাবার প্রাণান্ত তখনই টাকাটা মা বের না করে দিয়ে পারে না। মা-র আশা ছিল আমার টাকাটা দিয়ে একটা তক্তপোষ বানানো যায় কি না, সেটা আর হয়ে উঠছে না। এবারে ধান কিনতে গিয়ে আমার উপার্জিত টাকা খরচ হয়ে গেছে বলে বাবার উপর মা'র বিশেষ ক্ষোভ আছে। এই ক্ষোভ থেকেই বাবার সঙ্গে কত অকারণে যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় যা আমার মা-বাবাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। এ-ঘরের কাঠের দরজাটা হয়েছে মা খুব হিসেবী বলে। পূজার দানের কাপড় মা তুলে রাখে। চার পাঁচটা কাপড় একসঙ্গে বিক্রী করে মা কাঠের দরজা বানাবার টাকা বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল। এতে বাবা বোঝেন মা'র প্রয়োজনটা এই সংসারে কত বেশি।

খেতে বসলে মা পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, মিমি কোথায় গেছে যেন বললি।

—রিহারসেলে গেছে।

—রিহারসেল জায়গাটা আবার কোথায়?

পিলু খবু বিরক্ত গলায় বলল, ওফ্, মা তুমি না কিচ্ছু বোঝ না।

—না আমি বুঝব কেন, সব তোমরা বোঝ। এই 'বোঝ' কথাতে বাবার প্রতি যে কিছুটা কটাক্ষ আছে তা বাবা বুঝতে পারেন। একবার শুধু মা'র দিকে চোখ তুলে তাকালেন, তারপর গণ্ডুষ করে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। কিছু বললেন না।

এখানে বাড়িঘর করার পর মা বছরে একবার যাত্রা দেখার সুযোগ পায়। মিলে ধুমধাম করে কালীপূজা হয়। তখন যাত্রা হয়। সেদিন মিলের দরজা সবার জন্য খোলা থাকে। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে মা যাত্রা দেখতে যায়। পিলু মায়া সঙ্গে থাকে। আমি যাই না। বাবাও না। মা যাত্রা দেখেছে। নাটক দেখে নি। এখানে আসার পর মানুকাকার দৌলতে দু-বার মা মায়া পিলু সিনেমাও দেখেছে। রামের সুমতি বই দেখে এসে মা'র সে কি আনন্দ। —বুঝলি বিলু একেবারে সত্যি ঘটনা রে! আহা মাছ দুটোর জন্য জানিস আমারও মায়া হয়। মায়া তো ভ্যাক করে কেঁদেই ফেলেছে।

এত সব জানা সত্ত্বেও রিহারসেল বস্তুটি মার জানা নেই এতে পিলু বিরক্ত। তার মা'টা যদি এ-সব না বোঝে তবে যেন তার দাদাটিরও আত্মসম্মান থাকে না। পরীদি এলে কথাটা উঠলে, মা'র এমন কথায় দাদার ইজ্জত যেতে পারে বলেই বুঝিয়ে বলা, রিহারসেল দিতে হয়। নাটক করার আগে রিহারসেল দিতে হয়। পার্ট মুখস্থ করতে হয় না! প্রম্পটার থাকে না! রিহারসেল দিয়ে ঠিক করে নিতে হয়, কোথায় রাগ করতে হবে, কোথায় শান্ত থাকতে হবে, কোথায় কাঁদতে হবে। রিহারসেল দিয়ে

দিয়ে সব মুখস্থ করতে হয়। পরীক্ষার আগে পড়া মুখস্থ করার মতো। বুঝলে। মিমিদি নাটকের সেই রিহারসেল দিতে গেছে।

—মিমি নাটক করে?

—বারে মিমিদি নাটক করে শুধু! মিটিং মিছিল করে। আমি ওদের অফিসে গেছি। পুরানো ভাঙা বাড়ি। দোতলায় ওদের পার্টির অফিস ঘর। মিমিদি পোস্টারে ছবি আঁকে কী সুন্দর।

—তাই বলে মেয়েমানুষ নাটক করবে সে কেমন কথা।

আমার এ-সব সময়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। আমারও পছন্দ নয়, পরী নাটক করে। ভিতরে কোথায় যেন একটা কূট মানুষ আছে আমার যে সব কিছু সংশয়ের চোখে দেখে। পরীর এত স্বাধীনতা আমার পছন্দ নয়। এই স্বাধীনতা না থাকলে কাগজে তাকে এ-ভাবে পেতামও না। যেন কাগজটা বের করা আমাদের চেয়ে পরীর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। তার মূল কারণ কি তাও বুঝি। ভায়া দাদু টিউশনিতে আমার প্রতি মিলের ম্যানেজার ভূপাল চৌধুরী এবং তার বাবা অবহেলা দেখিয়েছে, আমাকে কাগজের সম্পাদক করে, এবং আমার কবিতা দেখিয়ে পরী তার যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

মিলের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ভূপাল চৌধুরী একজোড়া কবিতাও পরীকে ধরিয়ে দিয়েছিল। শহরের খোদ চেয়ারম্যানের নাতনি কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন চাইতে গেলে না দিয়ে থাকে কি করে! এই সঙ্গে তিনিও যে কাব্যচর্চা করেন, তার নমুনা হিসাবে এক জোড়া কবিতা দিয়েছিলেন মিমির হাতে। বিজ্ঞাপনের অর্ডার ফর্মে সই হয়ে যাবার পর মিমি বলে এসেছে, কবিতা নির্বাচনের ভার সম্পাদকের। তিনিই বলতে পারবেন ছাপা হবে কি হবে না।

দুটোই বাতিলের খাতায় পড়েছে। আমি যে কাগজের সম্পাদক, ম্যানেজার সাহেব এখনও জানেন কিনা জানি না। কবিতা দুটো ফেরত দেওয়া হয়ে গেছে। ফোনে বলেও দিতে পারে। বাবার কানে কি করে কথাটা উঠেছিল, পিলু বলতে পারে, মাও খবরটা জেনে খুব দুঃখ পেয়েছে। বাবা বলেছেন, ভূপালের দুই মেয়েকে তুমি পড়াও। নরেশ চৌধুরীমশাই তোমাকে ভালবাসেন বলে, টিউশনিটা ঠিক করে দিয়েছেন। মাস গেলে সংসারে কুড়িটা টাকা আসে। তারই লেখা তুমি ছাপছো না, ভূপাল জানলে রাগ করতে পারে।

খাওয়া হয়ে গেলে উঠে পড়লাম। মা দুটো ডালের বড়া বেশি দিয়ে বলেছে, এ-কটা ভাত খেলি। তোর খিদে পায় না। কিছুই তো খেলি না।

আমি একটু কম খেলেও মা-বাবার মনে শংকা। বললাম, খেলাম তো। আর কত খাব।

—কি খেলি? শালগমের ডালনা দিই। আর দুটো ভাত খা।

বাবা বললেন, তোমাদের বয়সে আমাদের কি রাক্ষুসে খিদে ছিল। তুমি তো দেখছি, কিছুই খেতে চাও না। তোমার মা কত যত্ন করে রান্না করে, তোমরা দুটো তৃপ্তি করে খাবে বলে। আর তাই যদি না খাও, তোমার মা'র কত কষ্ট বোঝ না।

আসলে বাবা তো জানেন না, তাঁর বয়সকালে পরী বলে কোনো মেয়ে তাঁকে ধাওয়া করে নি। পরী নাটক করতে যাবে। রিহারসেল দিতে যায়। পরী কি খুব পুরুষ ঘেঁষা নারী? পুরুষ ছাড়া থাকতে পারে না? 'জাগরণ' নাটক হবে পার্টির তরফে। ভোট আসছে। 'জাগরণ' এবং 'মহেশ' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে পার্টি থেকে। তবে নাটকে পরী থাকবে সে-কথা আমাকে বলে নি। কেন গোপনে করে গেল!

এই নিয়েই আমার মাথায় একটা কেমন জ্বালা ধরে গেল। বিকেল বেলায় সাইকেলে চড়ে শহরে চলে গেলাম। একবার ইচ্ছে হয়েছিল পরীর কাছে যাই। কিন্তু আমার যা মেজাজ তাতে পরীর সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা হলে তিক্ততা বাড়বে। আমার কথা সে গ্রাহ্য করবে কেন। আমি তার কে! পরীর পুরুষ ঘেঁষা স্বভাব আমার মধ্যে যে আজকাল জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারলে সে আরও বেশি মজা পাবে। অগত্যা টাউন-হলের মোড় থেকে ফিরে এলাম। লালদীঘির ধারে মুকুলের কাছে ঘুরে

গেলে হয়। কাগজের প্রুফ আসতে পারে। একবার খবর নিলে হয়। তাছাড়া, মাথায় যখন জ্বালা ধরে যায়, তখন মুকুলের সঙ্গে বসে কথা বললে, মনটা হাল্কা হয়ে যায়।

কারণ আমরা একই অসুখে ভুগছি। মুকুল চৈতালি পাগল। তবে সে এবারে ভেবেছে বি এ পড়ার সময় চৈতালির কাছ থেকে বাংলা অনার্সের নোট নেবার অজুহাতে আলাপ করবে। চৈতালি বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বে, এটা শোনার পরই মুকুল ঠিক করে ফেলেছে সেও বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বে। চৈতালি আমাদের কলেজে পড়ে না। মেয়েদের একটা কলেজ আছে ওটাতে পড়ে। আমাদের কলেজে পড়লেও একটা সুযোগ তৈরি করে নেওয়া যেত—আর চৈতালির জন্য মুকুল তো মেয়েদের কলেজে ভর্তি হতে পারে না। সে এত মরিয়া যে সুযোগ থাকলে বুঝি তাও করত।

আসলে, চৈতালিদের বাড়ি থেকে টের পেয়েছে, ছোঁড়া দুটো এদিক দিয়ে যে সাইকেলে যায়—সে একটাই কারণ। ওর দিদিরা বোধহয় টের পেয়েই সাবধান করে দিয়েছে। ওকে আজকাল বাড়ির জানালায়ও দেখা যায় না। এমন কতদিন হয়েছে, রাশি রাশি রিকশা আরোহীর মধ্যে কখন যেন দূর থেকে মনে হয়েছে, ঐ ওখানে আছে। আমরা দ্রুত সেদিকে ছুটে গিয়ে দু-একবার হতাশও হয়েছি। আবার কখনও ধোবিখানার মাঠে বসে, চোখ আমাদের চৈতালিদের বাড়ির দিকে। কে বের হল! সে যদি আসে মুকুলের চোখ মুখ উন্মুখ হয়ে থাকে তখন। কখনও সত্যি দেবী দর্শন হয়ে যায়। দেবী দর্শন হয়ে গেলেই মুকুল যেন কি এক মুক্তির আনন্দে গান গেয়ে ওঠে। তবু আমরা বুঝি, একটা বড় রকমের অবহেলা আছে—ওর দিদিরা টের পায়, তখন একটা কিছু করতেই হয়। যেন দেখিয়ে দেওয়া, তুই গাইয়ে, আমরা কবি, লেখক। তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম না!

সাইকেল থেকে নেমে পড়ি। মুকুল দরজা খুলে প্রাণখোলা হাসিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। জানালা থেকেই দেখা যায়। সাইকেলটা বারান্দায় তুলে ফেললে, মুকুল বলল, আরও একটা বিজ্ঞাপন এসেছে। মিমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তক্তপোষে বসে বললাম, কেন মিমি দিয়ে যেতে পারল না।

প্রশান্তও উঠে পড়েছে। সে ও-কথায় গেল না। বলল, দেখ ডামিটা। প্রথমে সম্পাদকীয়। তুমি তো লিখলে না। আমাকে লিখতে হল। শোন, সুধীনবাবুরা যদি বলে কে লিখেছে, তুমি কিন্তু বলবে, তুমি লিখেছ।

—আমি লিখি নি, অথচ বলতে হবে আমি লিখেছি।

—বললে ক্ষতি কি! পরীরও ইচ্ছে তাই।

—পরী কি আমার গার্জিয়ান। তোমরা সব কথায় পরীর দোহাই দাও কেন বুঝি না।

—পরী যে বলল, আমার কথা বললে ও ফেলতে পারবে না।

এত অধিকার জন্মায় কী করে! পরীর কি ধারণা বাড়িতে তার জেদের কাছে সবাই হার মেনেছে বলে আমিও হার মানব। তা না হলে, পরী যে বাড়ির মেয়ে তাকে তো রাস্তাতেই দেখার কথা না। তবে পরীদের বংশে রাজনীতির রক্ত সবার গায়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামে পরীর দাদু থেকে বাবা কাকারা অনেকেই জেল খেটেছে। পরী অন্য ধাতের হয়ে গেল। সে কংগ্রেসকে বুর্জোয়াদের পার্টি মনে করে। এত বড় গরীব দেশে, পরীর ধারণা, দাদু বাবা কাকারা রাজনীতি করেছেন নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। বাড়িতে নাকি সবার মুখের উপরই আজকাল তর্ক করে।

আমি বললাম, সম্পাদকীয় খুব জম্পেশ করে লিখেছ। ওটার কৃতিত্ব আমার নাই থাকল।

—তুমি সম্পাদক, এটা কিন্তু ঠিক হবে না।

—আরে আমি নাম কা ওয়াস্তে।

—তোমার কবিতা প্রথমে থাকছে। মুকুল প্রুফ তুলে বলল, কবিতার ফর্মাটা চোখ বুলিয়ে নাও। সুধীনবাবু প্রবন্ধ দেখছে। 'সাহিত্যের প্রতিশ্রুতি'-পর্ব দারুণ লেখা। এটা পরের সংখ্যায় দেব। বলে আর একটা প্রবন্ধ টেনে বের করে দেখাল। ওপরে নাম লেখা, 'হালফিলের গদ্য কবিতা'। নামটা বেশ, না!

তারপরই মুকুল, র‍্যাক থেকে আর একটা লেখার বান্ডিল বরে করে বলল, এটা দিতে চাই।

দেখলাম, শহরের গত তিনমাসের অনুষ্ঠান সূচী। কে কে গান গেয়েছে, কবিতা আবৃত্তি করেছে, নাটক হয়েছে কোথায়—তার সমালোচনা সহ বিবরণ।

আমি বললাম, নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবু দেখেছে?

—ওদের বলি নি।

—সবাইকে বলে নেওয়া ভাল।

কারণ আমি চাই না, এটা করতে গিয়ে চৈতালির প্রশংসা কাগজের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠুক। এতে সুধীনবাবুরা চৈতালি সম্পর্কে মুকুলের যে দুর্বলতা আছে টের পেতে পারে। ভালবাসলে বোধ হয় মানুষ কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মুকুল প্রথমে কাগজটারই তো নাম চৈতালি দিতে চেয়েছিল। এখনও মুকুলের মাথায় শুধু একটা বিষয়ই বেশি নড়ানড়ি করে। এত বড় কর্মযজ্ঞের মধ্যে চৈতালি থাকবে না কী করে হয়। সে এটা মানতে পারছে না। এ-জন্য প্রায় এক ফর্মা জুড়ে শহরের তিনমাসের অনুষ্ঠান সূচী এবং তার আলোচনা রেখেছে। আমি রাজী হলে, অন্যরা আপত্তি করবে না মুকুল জানে। আমার রাজী হওয়া মানেই পরীকে আমাদের দিকে পাওয়া। মুকুল আমার দিকে এমন প্রত্যাশার চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে যে আর না বলতে পারলাম না। বললাম ঠিক আছে থাকবে।

মুকুল উজ্জ্বল প্রাণবন্ত যুবক—সে মুখ গোমড়া করে রাখতে জানে না। দু হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

বললাম, চৈতালি কিছু মনে করবে না তো।

—কেন করবে। ওর তো প্রশংসাই আছে। প্রশংসা কে না চায়। তা-ছাড়া কি জান, যারা শহরের সাহিত্য শিল্প নাটক নিয়ে আছে তারা সবাই কাগজটা কিনতে রাজী হবে। আর একটা বড় আকর্ষণ, এই শহরে কে কে আগে গল্প কবিতা লিখে নাম করেছেন, তাদেরও একটা পরিচয় লিপি থাকবে। ভাল হবে না!

আমি বললাম, দারুণ। কাগজ আমাদের হট-কেকের মতো বিক্রি হয়ে যাবে।

কাগজ বিক্রি নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হলেই, মুকুলের হাঁক, বৌদি চা। বিলু এসেছে।

ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল, এখন হবে না। করে খাওগে।

—বৌদি বিলু কি বলছে শোনো!

—কী বলবে জানি। বৌদি দেখতে পারে না। বৌদি খারাপ।

—না বৌদি এমন আমি কখনও ভাবি না।

ভেতর থেকেই কথা ভেসে আসছে।

—না ভাবে না। সেদিন এত করে বললাম দুপুরে আর নাই গেলে। এখানেই দুটো খেয়ে বসে যাও, না মা ভাববে! আমাদের আর বাবা-মা ছিল না।

আমি হেসে ফেললাম।

—না হাসার কথা নয়। খুব খারাপ বলেছি! আমরা তো তোমার কেউ না। কেন মাসিমাকে বলে আসতে পার না, দুপুরে ফিরতে পারবে না। রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়েছে বৌদির বাড়িতে—ফেরা মুশকিল।

সত্যি রাজসূয় যজ্ঞ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুধীনবাবুরা এসে যাবে। পত্রিকার লেখা পাঠ করা হবে। মতামত দেওয়া হবে। পত্রিকার দ্বিতীয় ইসু থেকে ঠিক হয়েছে, সবাই মিলে মিশে পড়া হবে। তারপর বিতর্ক, তারপর লেখা ছাপা যেতে পারে, রায়, আর তারপর শেষ কথা বলার আমি। পরী তখনই নাকি বলে দিয়েছে। পরী বলে দিতেই পারে। প্রথম সংখ্যার সব লেখা আমাকে দেখতে পাঠালে বলে পাঠিয়েছিলাম—অত আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। একটা প্রাথমিক নির্বাচন থাকা দরকার। যে-ভাবে গাদা গাদা লেখা আসছে—পাগল হয়ে যাবার যোগাড়।

আমরা ত্রৈমাসিক কাগজ বের করছি। এটা শহরে এত প্রচার হলো কী ভাবে বুঝি না। এমনিতে গল্প কবিতা যারা লেখে তারা যে উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে ধরেই নেওয়া হয়। চৈতালিদের বাড়ি থেকেও

আমাদের প্রতি ভাল ধারণা নেই। আমরা নষ্ট চরিত্রের এমনও ধারণা হয়েছে। পরীকে সবাই এমনিতেই নষ্ট চরিত্রের ভেবে থাকে। অন্ততঃ চৈতালির দিদিরা তো বটেই। এত সব জানার পরও আমাদের কেন জানি মনে হয় আমরা অন্য সবার থেকে আলাদা। রাস্তায় দল বেঁধে বের হলে আজকাল কেউ কেউ লক্ষ্যও করে দেখছি। আমরা এমন গাম্ভীর্য নিয়ে থাকি যে দেখলে মনে হবে, আমাদের মতো চিন্তাশীল লোক হয় না। আসলে, মেয়েরা দল বেঁধে যখন যায় তখন সেটা একটু বেশি বেশি। ছোট শহর বলে, কে কোন বাড়ির কার ভাই, কোন পাড়ায় থাকে ভিতরে ভিতরে সব মহলেই মোটামুটি খবর জানা থাকে। আমরা যেমন সুন্দরী মেয়েদের খবর রাখি, তারাও আমাদের অনেকের খবর রাখে। কেবল চৈতালি এবং তার দিদিরা আমাদের দেখলে প্রসন্ন হয় না। চৈতালি এমন ভাবে পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, যেন সে আমাদের চেনেই না। চৈতালির দিদিরা বৌদির ক্লাশফ্রেন্ড বলে—দিদিরা বেড়াতে আসত—কিন্তু চৈতালির নামে কাগজ বের হচ্ছে শুনেই ওরা সেই যে খাপ্পা হয়ে গেল, তা আর মিটল না। এখন চৈতালির দিদিরা আসে না।

মাঝে মাঝে মুকুল একা থাকলে আমাকে ভারি করুণ গলায় বলে, কী করি বলত।

আমি সান্ত্বনা দিই, কাগজটা বের করি আগে তখন দেখবে চৈতালি নিজের গরজেই হাজির হবে।

—না না। যা অহংকারী, কখনও আসবে না।

আমি বলি, আসবে।

মুকুলের এক কথা, আসবে না।

—আলবাৎ আসবে।

—কি করে?

—প্রথম সংখ্যায় প্রশংসা।

—বেশ।

—দ্বিতীয় সংখ্যায় গানের সমঝদার দিয়ে আলোচনা।

—বেশ।

—তৃতীয় সংখ্যায় ছবি।

—বেশ।

—চতুর্থ সংখ্যায় হাজির।

মুকুল ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলল, দেখ একদিন সুচিত্রা মিত্রের মতো বড় গাইয়ে হবে। কী সুন্দর গলার কাজ। আমরা ওর এত ভক্ত আর আমাদের ও এমন অবহেলা করে।

আমি বললাম, অবহেলা আমাদের প্রাপ্য।

—কেন বলত।

—আসলে আমরা ভালবাসার কাঙাল। মেয়েরা খুব সেয়ানা হয় বুঝলে। ওরা দেখলেই বুঝতে পারে। —কি বলে তখন জান?

—কী বলে।

—দেখছিস কেমন হ্যাংলার মতো দেখছে।

—ওরা বুঝি দেখে না।

—কই কাছে এলে তো মনে হয় ওরা রাস্তার নুড়ি পাথর দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে।

—দেখতে দেখতে না, শুঁকতে শুঁকতে।

—ওই হল আর কি।

মুকুল যেতে যেতেই তখন কত কথা বলে যায়। সে মেয়েদের মনস্তত্ত্বও ব্যাখ্যা করতে ভালবাসে। —জান বিলু, মেয়েরা অনেক দূর থেকে আগেই দেখে নেয়।

—কী করে বুঝলে।

—ওদের চোখের পাওয়ার বেশি। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মনে হবে, ওরা এতে নেই। কিছুই বোঝে না যেন। জান সবটাই কিন্তু ছলনা। আমি তো মেয়েরা পাশ দিয়ে গেলে ওদের ঘ্রাণ পর্যন্ত

নিতে ভালবাসি। আহা, এক নারী তোমার পাশে শুয়ে রয়েছে। সে তোমার। তার সব কিছু তোমার। ভাবতে ভাল লাগে না।

আমি মুকুলের এমন কথায় কি বলব বুঝতে পারি না। পরীকে নিয়ে যে এভাবে ভাবি না, তা নয়। মন তখন ভারি উতলা হয়ে ওঠে। কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যাই। যেন পরী, আমার সব অস্তিত্ব হরণ করে নিয়ে গেছে। আর ঠিক এ-সময়ই ও বলল, পরীকে বোঝা যায় না।

—কেন!

—ক'দিন দেখা নেই। একেবারে ডুব। ভাবলাম, আমাদের কাগজ সম্পর্কে ওর কোনো ভাবনা নেই। সকালে দিলীপদার কাছে গিয়ে শুনি, পরী কাগজ কে দেবে, কভার কোন কাগজে ছাপা হবে, সব দিলীপকে বলে এসেছে। প্রুফ উঠে গেলেই, দিলীপ একসঙ্গে ছেপে দেবে। ছ' ফর্মার তো কাগজ। শুধু দুটো আরও বিজ্ঞাপনের জন্য কভার ছাপার অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না।

—কভার কেমন হল দেখেছ?

—পরী বলেছে, ও কভার করবে।

—ও করবে কেন!

—করুক না। পরী তো সুন্দর ছবি আঁকে। এত করছে, এই সুযোগটা তাকে না হয় দিলেই।

—আমি রাজি না।

—তার মানে।

—না। পরী কী ছবি আঁকবে আমি জানি। পরীর জীবনযাপনের সঙ্গে ছবির কোনো মিল থাকবে না। পোস্টার মার্কা ছবি করবে। সে তার দলের হয়ে এই কাগজে ছবি আঁকলে, সে ছবি যাবে না।

মুকুল আমাকে জানে। পরীর অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়। সে খবরটা পরদিন দিয়েও এল। পরী জবাবে বলেছে, ওকে বল, আমি কভার এঁকে ফেলেছি। পরে না হয় ওর পছন্দমতো কভার হবে।

মুকুল আমার বাড়ি এসে খবরটা দিলে আমি গুম হয়ে থাকলাম।

মুকুল কেমন ক্ষেপেই গেল—আচ্ছা বিলু, যে সব করছে, এমন কি কাগজের দাম, ছাপার খরচ সব দিচ্ছে, কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে সে টাকাটা নেবে বলেছে—তার একটা কভার যাবে এতেও তোমার আপত্তি।

সেদিন আমি তক্তপোষে শুয়ে আছি। মুকুল আমার পাশে। কথা বলছি না দেখে বলল, এত কি ভাবছ।

সহসা আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। উঠে বসলাম, বললাম, ও কী ছবি আঁকবে তুমি জান না। আমি জানি।

—কী ছবি আঁকবে।

—ঐ কোনো চাষীর উদ্যত হাত। কিংবা শ্রমিকের।

—বেশ ভাল তো। ক্ষতি কী।

—এটা সাহিত্যের কাগজ, রাজনীতির নয়। পরী কিন্তু আমাদের সেদিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমি চাই না অমন ছবি থাকুক। পরীর জীবনের সঙ্গে একজন শ্রমিকের কী সম্পর্ক বল। কোনো সম্পর্কই নেই। বই পড়ে সব জেনে ফেলেছে ভাব। বই পড়ে সব জানা যায় না। পরীর এ-সব আমার ছলনা মনে হয়।

—আমার মনে হয় না ও রকম ছবি আঁকবে।

—আঁকলেই বা ঠেকায় কে! ওর তো মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করা আছে। সেখান থেকে বের করে আনা সহজ হবে না। সুহাসদা ওর মাথাটি খেয়েছে।

মুকুল বোঝে আমার কষ্টটা কেন এত গভীর। ঘরের ভিতর বসে থাকলে সেটা আরও ভারি হয়ে ওঠে। পিলু এসে বলল, মুকুলদা বাবা তোমাকে ডেকেছেন।

মুকুল বলল, যাচ্ছি। বলেই উঠে গেল। বাবা বারান্দায় বসে। মা চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার ঘরটা উঠোনের শেষ প্রান্তে। বারান্দার কোনো কথাবার্তাই কানে আসবে না। হঠাৎ মুকুলকে ডেকে বাবা কী জানতে চান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকুল ফিরে এল। বাবা মুকুলকে ডেকেছিলেন কেন, এ-সম্পর্কে আমার যেন কোনো কৌতূহলই নেই। আমি শুধু বললাম, জামাইবাবু ট্যুর থেকে ফিরেছে?

মুকুল জানে আমি তাকে কেন এমন প্রশ্ন করছি। সে বসে কি দেখল আমার চোখে মুখে। তারপর বলল, ওটা তোমার হয়ে যাবে। সার্কুলার এলেই হবে। তুমি একটা দরখাস্ত ছোড়দির হাতে দিয়ে আসতে পার। আমাকেও দিতে পার। টাইপ করে দিলে ভাল হয়। রিফিউজি কথাটার কিন্তু উল্লেখ করবে।

—কেন রিফিউজি না হলে হবে না!

—হবে না কেন! হবে। তবে রিফিউজি হলে জামাইবাবু সহজেই ডি আইকে দিয়ে এপ্রুভ করিয়ে নিতে পারবে। রিফিউজিদের জন্য আলাদা কোটা আছে।

টাইপ করে দেবার কথা বলছে! কোথায় করাব জানি না। হাতে লিখে দিলে অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাইলে, মুকুল বলল, ঠিক আছে ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আমি জামাইবাবুকে দিয়ে ড্রাফট করিয়ে নেব। টাইপ করে রাখব। সইটা করে দিও। তুমি নাকি সেদিন ভাকুরির কাছে কোন গাছতলায় শুয়েছিলে?

—বাবা বুঝি বললেন।

মুকুল বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল। পাজামা সামান্য তুলে পায়ে কি দেখতে দেখতে বলল, জান আমার পায়ের চামড়া কি খসখসে! দেখ হাত দিয়ে! শীত আসার আগেই গোড়ালি ফাটতে শুরু করে। তোমার পা দুটো কী সুন্দর!

মুকুল এ-রকমেরই। হাত পা এবং চোখ মুখ সব মিলে মুকুলের মধ্যে একটা শান্তশ্রী আছে। উঁচু লম্বা। কালো রঙটা যেন এই চোহারার সঙ্গে ভারি খাপ খেয়ে গেছে। তার এক কথা, ভগবানই যাকে মেরে রেখেছেন, তার আর কিছু হবার নয় বিলু। চৈতালিকে আমার পাশে মানাবে কেন। ঘুরে ফিরে কী করে যে আমরা হয় চৈতালি না হয় পরীতে চলে আসি।

আমি উঠে বসলাম। মায়া দুধ রেখে গেছে দু-গ্লাস। মুকুলকে মা বাড়ির ছেলের মতোই ভেবে থাকে। মা বুঝতে পারে, মুকুল তার পুত্রের একজন প্রকৃত হিতৈষী। বাবাও এমন বোধহয় ভাবতে শুরু করেছেন। কত অসহায় হলে বাবা তার পুত্রের মতিগতি নিয়ে মুকুলের শরণাপন্ন হতে পারেন এই প্রথম আমি যেন টের পেলাম। বাবার জন্য কষ্টবোধ থেকেই যেন বলা, বাবা আর কিছু বললেন?

—বলেছেন।

—কী!

—ও-সব তোমাকে বলা যাবে না।

—ও-রকম বাবা বলতেই পারেন না। পুত্রের কোনো অগৌরবের কথাই বাবা কাউকে আজ পর্যন্ত বলেন নি। বলতে চান না। তুমি জান বাবাকে। বাবার এখন একটা চিন্তা, পরীক্ষায় আমি ফেল টেল করলে আবার না বাড়ি থেকে উধাও হই। দু-বছর আগের বিলু দু-বছরের পরের বিলুতে কত তফাৎ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তখন জীবনে পরী ছিল না। লক্ষ্মী ছিল না। পরীক্ষায় এক বিষয়ে ফেল করেছি বলতে গিয়ে চোখে জল এসে গেছিল। বাবা কত সহজে বলেছিলেন, জীবনে দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতে পাশ করেছ—সোজা কথা! জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাশ করে। সব দুঃখ এক পলকে মুছে গেছিল। কিন্তু এখন, পরীক্ষায় ফেল করলে, গুম মেরে থাকব। বাবা কোনো সান্ত্বনার কথা বললে হয়তো রেগে যাব। দু-বছর আগে যে বিশ্বাস নিয়ে বাবার সব কিছু মাথা পেতে নিয়েছি, এখন আর তা নিতে পারব না। বুঝতে পারছি, কেউ আমার শেকড় আলগা করে দেবার চেষ্টা করছে।

দুধের গ্লাসটা ওকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, খাও। বাড়িতে গরু আছে, দুধটা এখনও পাবে। বাবা পরীকেও তাঁর গরুর দুধ খাইয়েছেন। বাবা আমার অদ্ভুত মানুষ। তুমি চলে গেলেই বলবেন, মুকুল

কিছু বলল, মানে দুধটা যে শহরের জল মেশান দুধ নয় খাঁটি দুধ, তাই তিনি জানতে চান। কিন্তু আজ এমন কি বললেন, যা বলতে পারছ না।

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে বকছি দেখে মুকুল উঠে দাঁড়াল। বলল, চল বের হই। বলে চুমুক মেরে দুধটা শেষ করে সাইকেলে ওঠার আগে বাবাকে বলল, দারুণ খেতে। আমাদের দুধ—সে আর বলবেন না। খাঁটি দুধের স্বাদই ভুলে গেছি। এতে বাবা ভারি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মুকুল বলায় আমি ক্ষুব্ধ হই নি। কিন্তু পরী বললে, আমার রাগ হত। মনে হত সব তাতেই পরীর ছলনা। বাবাকে ভালমানুষ পেয়ে খুব চাল মেরে গেল।

বের হবার সময় বললাম, ফিরতে রাত হবে। ভেব না। টিউশনি সেরে ফিরব।

আমি আর মুকুল আর সেই চিরপরিচিত বাদশাহী সড়ক। আমরা দু'জনই এখন বড় হবার স্বপ্ন দেখছি। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু সেটা কি, দু'জনেই ভাল জানি না। আমার তো যা অবস্থা, তাতে শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হওয়া ছাড়া অন্য কিআর অবলম্বন থাকতে পারে। বাদশাহী সড়কে উঠে দু'জনে পাশাপাশি যাচ্ছি। বাবা মুকুলকে ডেকে কী বললেন, জানার কৌতূহল আছে, অথচ আমি নিজে আর কথাটা যেচে জানতে চাই না এমন এক ভাব দেখাচ্ছি। অন্য প্রসঙ্গ এসে গেল। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে, ফেল করলেও যা এখন, পাশ করলেও তাই। কারণ প্রাথমিক স্কুলের চাকরির জন্য যে পড়াশুনা থাকা দরকার সেটা আমার আছে। কাজেই কাজটা হয়ে গেলে এমনিতেই কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে এবং এ-কারণেই পরীর সঙ্গে আর আমার কোনো সংযোগ থাকবে না। কষ্টটা যত বড়, তার চেয়েও বড় বাবাকে নিদারুণ অভাব থেকে রক্ষা করা। মা'র সঙ্গে বাবার আজকাল একদম বনাবনি হচ্ছে না। যেন দু'জনেই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আর্থিক অনটন এর মূলে বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না।

মুকুল এক সময় গলা ছেড়ে গান ধরেছিল। মুকুল ভারি সুন্দর গায়। গানের চর্চা করলে সেও চৈতালির চেয়ে কম নাম করতে পারত না এমন আমার মনে হয়। আসলে লেগে থাকা, সেটাই আমাদের মধ্যে নেই। কবিতা লিখি, মুকুল কিংবা সুধীনবাবুরা শোনে। আমি জানি কিচ্ছু হয় না, অথচ সবাই অসাধারণ বলে এক সঙ্গে হল্লা করতে থাকে। বুঝি না, এটা আমাকে খুশি করবার জন্য, না পরীকে। পরী আমার কবিতার অনুরাগী। পরী অখুশি হলে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমটাই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাগজ নিয়ে পরীর উৎসাহ কমে গেলে ওটা বের করা আমাদের পক্ষে কত শক্ত কাজ বুঝি। তখনই যেন আরও ক্ষোভ বাড়ে।

আমরা ভাকুরি পার হয়ে সারগাছির দিকে যাচ্ছি। হু হু করে হাওয়া বইছে। চার পাঁচ দিন বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় পুকুর নালা ডোবা জলে ভর্তি। কোথাও জমিতে জল জমে আছে। সেখানে চাষ-আবাদের কাজ চলছে। প্রকৃতি সবুজ সমারোহ নিয়ে যেন এখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা চারপাশের গাছপালা মাঠ দেখতে দেখতে কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতে চাইছি।

সামনে কালভার্ট একটা। মুকুল বলল, এস বসি। পাশে চায়ের দোকান। সে সাইকেলটা কালভার্টে দাঁড় করিয়ে দুটো চায়ের অর্ডার দিয়ে এল। এসেই বলল মেসোমশাই খুব ঘাবড়ে গেছেন।

আমি বললাম কেন?

—তুমি নাকি গাছতলায় শুয়েছিলে। পিলু তোমাকে খুঁজে এনেছে।

—বললেন!

—হ্যাঁ। বললেন, এখন কি করি বলতো মুকুল! তুমি কিছু জান?

—তুমি কি বললে?

—কি বলব! আমি বললাম, ও কিছু না। আপনি ভাববেন না।

—কিছু না। কী করে বুঝলে?

—ওটা এ-বয়সে হয়। আমারও হয়। তবে কী জান, আমার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই। থাকলে টের পেতেন। বৌদি বোঝে। বুঝে মজা পায়। বৌদির এক কথা। বি এ পাশ করলেই কাজে ঢুকিয়ে দেবে দাদা। তারপর কাঁধে জোয়াল তুলে দেবে। সব রোগ নাকি তখন আমার সেরে যাবে। কবিতা

ফবিতা সব মাথায়। কাগজ নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞ বন্ধ। বৌদি ঠাট্টা করে বলেন, তখন একটাই হোম। তাতে দু-পাশে দু-জন। মাঝে হোমের কাঠ প্রজ্বলিত। আমাদের মধ্যে তখন একটাই কথা—ওম অগ্নয়ে স্বাহা—হে অগ্নি তুমি সব গ্রহণ কর। তিনি হলেন অগ্নি, সর্বভূক—ঘি হবি যা ঢালবে সবই তিনি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং হজম করে ফেলবেন। বলেই মুকুল একটু বেশি সাধু ভাষায় কথা বলে হা হা করে হেসে উঠল। বৌদিটা বড্ড ফাজিল। আমার মুখ চোখ দেখে এখন বৌদি আরও মজা পায়।

—তুমি কি বল বৌদিকে।

—বলি ও-সব বিয়ে-ফিয়েতে আমি নেই। কবিতা-আহা—সুচারু সব সপ্নের সাধ / কখন কী যে বনভূমি হয়ে যায় / আমার তোমার মাঝখানে এক সুবিশাল প্রাচীর / গন্ধরাজ লেবুর ঘ্রাণের মতো আমার বাসনা / ক্রমে বিস্তারিত মাঠ পার হয়ে সাদা জ্যোৎস্নায় দেখি / তুমি আছ নগ্ন হয়ে নতজানু আমি।

—বা সুন্দর তো! তোমার মুখে শুনলে মনেই হয় না আমার লেখা।

মুকুল চা খেতে খেতে হাসছে। বলল, জান, চৈতালীকে দেখলে আমি কেন জানি তোমার এই কবিতাটাই আওড়াই।

—দারুণ মানিয়ে গেছে।

মুকুল বলল, একটা কবিতা লিখতে পারলে মনে হয় না—সবই বড় অকিঞ্চন, আশা কুহকিনী, সব শেষে দু-লাইন কবিতার আর্শিতে পৃথিবী অতীব মায়াবী, মনে হয় না তোমার! আমার কি মনে হয় কি বলব। চুপ করে গেলাম।

হেসে বলল, তখন চৈতালিকে আমার জান ভিখারিণী মনে হয়। আমি সম্রাটের মতো সেই ভিখারিণীর পাশে দাঁড়িয়ে বলছি, ওঠো জাগো, হাত ধর। চল কোনো সাদা জ্যোৎস্নায় আলস্যের নদী অথবা সাগরে ডুব দিতে যাই।

আমি চা শেষ করে বললাম, এটাকে আলস্যের সাগর বলছ কেন? কী মিন করতে চাইছ!

—না মানে ...

মুকুলের আবার সেই গলা ছেড়ে হাসি। —কী এক রহস্য গোপন করে রেখেছ নারী / আমার গভীর ঘুম পাতলা হয়ে আসে / নক্ষত্রের মতো বিন্দু বিন্দু কুয়াশার জল টলটল করে রক্তে / এবং এই আমি তুমি গভীর সহবাসে লিপ্ত / যদি কোনো দিন কোন জন্মের ইশারা / কেউ হেঁকে যায় / আছ নাকি বেঁচে স্বপ্নের ভিতর।

আমি বললাম, শুধু তিক্ততা তার রক্তে / বিলাস তার স্বপ্ন, আধো ঘুমে আধো জাগরণে / কবিতা পাঠ করে কোনো এক নারী — যার দু-হাতে বিশাল থাবা / মরণ কামড়ে আমায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে ভালবাসে / তার বিলাস প্রেমে, বিলাস আগমনে / বিলাস শুধু নিঃসঙ্গ কোনো যুবকের চুম্বনে / তার হাড় মাসে মজ্জায় রক্ত তুফান / আমি ছিন্নভিন্ন ছেঁড়া পালে গলিত এক শব / পড়ে থাকি নদীর চড়ায় /

—দারুণ, দারুণ।

আমি বললাম, বয়েস আমার যন্ত্রণা / বয়েস আমার উধাও করা মাঠ / চাষ-আবাদ শেষে চাষীর প্রত্যাগমন হয় / বাড়ি ফেরে / জলে জলে নেয়ে তার হৃদয় শেষ বেলায় হতাশায় ডুবে থাকে / তাকে আমি চিনি সেও আমায় চেনে / হেসে বলে কেমন আছ / বলি, ভাল নেই / জীবনের শুভাশুভ সব খড়ের মাঠ—খরায় জলে / চিতার আগুনে পুড়ে সে শেষ হয়ে গেছে / তাকে আর জাগাতে যেও না—নাভিমূলে তোমার সোনালী রেশম / উষ্ণতায় ডুবে আছে জেনেও সে শুয়ে থাকে চিতার আগুনে।

মুকুল সহসা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। ভালমন্দ কিছু বলল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে ভাকুরির মাঠে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হয়। আমরা দুই সাইকেল আরোহী বাড়ি ফিরি। আমরা কেউ আর কিছু বলছি না। উভয়ে কেমন ফেরারী আসামীর মতো নিজেদের গোপন করে রাখছি।

মুকুল এক সময় বলল, মেসোমশাই খুব ঘাবড়ে গেছেন বিলু। পরীকে নিয়ে তাঁর ভাবনা দেখা দিয়েছে। বললেন ...। বলেই চুপ করে গেল।

—কি বললেন?

—না, মানে তুমি পরীকে নিয়ে কোনো ফ্যাসাদে পড়ে গেছ তিনি ঠিক টের পেয়ে গেছেন।

—বাবা কি পরীর কথা কিছু বললেন?

—না।

—তবে?

—দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

—কিসের দ্বিধা?

—পরীকে নিয়ে তুমি খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছ।

—মোটেই না।

—পরী বাড়ি গেলে তবে রাগ কর কেন। আমরাও তো যাই। তুমি তো রাগ কর না!

—আমি রাগ করতে যাব কেন!

—কিন্তু পরী পালিয়ে যায় জান?

—দু-একবার গেছে।

—এখনও যায়।

—কবে গেছিল?

—কালও গেছে।

—কখন?

—তুমি কখন বাড়ি থাক না পরী ঠিক জানে। সকাল বেলায় টিউশনিতে যাও পরী সব খবর রাখে।

আমি সকাল বেলাতেই মিলে পড়াতে যাই। আজ সকালে যাওয়া হয় নি। সন্ধ্যায় যাব। কিন্তু পরী আসে, অথচ কোনো খবরই পাই না। পিলু পর্যন্ত বলে না। পরী কি বাড়িতে আমার চেয়েও বেশি তাদের নিজের হয়ে গেছে! পরীর জেদের কাছে এ-ভাবে পরাজিত হতে আমি রাজী না। আমার ভেতরটা সবার উপর কেমন ক্ষোভে হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মায়া, মা, বাবা, পিলুকে পরী হাত করে ফেলেছে। ভাবতেই কেন জানি মনে হল, পরীর ছলনা ভাঙতেই হবে। পরীকে আবার অপমান করতে হবে। কিন্তু মুশকিল, অপমানে পরীর চোখ যেমন জলে ভার হয়ে ওঠে, শুকিয়ে যেতেও তা সময় লাগে না। না হলে, গোপনে সে কিছুতেই আমার অবর্ত্তমানে আমাদের বাড়ি ফের যেতে সাহস পেত না। আজই গিয়ে তুলতে হবে কথাটা। কেন আসে? আমার যা কিছু অপছন্দ তাই করে বেড়ায় পরী। আমরা গরীব বলে সে ভেবেছেটা কী!

কিন্তু মুকুল তখন বলছে, এই নিয়ে তুমি মেসোমশাইকে কিন্তু কিছু বলবে না। কথা দাও।

আমরা পঞ্চাননতলার কালীমন্দিরের কাছে এসে গেছি। এখান থেকে মুকুল রেল-লাইন পার হয়ে শহরে চলে যাবে। আমি যাব কলোনিতে। বেড়াতে বের হলে আমাদের এই জায়গাটাতে থামতে হয়। সাইকেল থেকে নেমে মন্দিরের চাতালে বসে কোনোদিন গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়। জায়গাটা বড় নির্জন। কোনো দোকান পাট নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস রাস্তা পার হলে জঙ্গলের মধ্যে। পুরানো আমলের বাড়ি। কোনোকালে, রাজরাজড়ার প্রাসাদ ছিল। সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস। সন্ধ্যা হলেই পরিত্যক্ত বাসভূমির মতো লাগে। শহর থেকে সাইকেলে কেউ ফিরে যায় রাস্তা ধরে। সাইকেল, রিকশা এবং গরুর গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। আর দু-পাশে গভীর জঙ্গল আর বিশাল সব আমবাগান। রাত হলে জোনাকি জ্বলে। দূরে দেখতে পাই লণ্ঠনের আলো। বাড়িটার দারোয়ানের কুঁড়েঘরে তখন একমাত্র আলো জ্বলে। মুকুলের বোধ হয় এখানটায় আরও কিছু সময় কাটিয়ে যাবার ইচ্ছা। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বস।

আমার টিউশনি আছে। মনটাও ভাল নেই। পরীর জেদের কাছে বার বার হেরে যেতে আমি আর রাজী না। বললাম, আজ আর বসব না। চলি।

—মেসোমশাইকে কিছু কিন্তু বলবে না।

—ঠিক আছে বলব না।

—মেসোমশাইর অগাধ বিশ্বাস আমার উপর।

—জানি।

—বললে খুব দুঃখ পাবেন।

—বললাম তো কিছু বলব না।

—জান সেদিন পরী গঙ্গার ধারে কী সুন্দর গাইল!

আমি জানি ভোট আসছে বলে এখন শহরে গাঁয়ে গঞ্জে শুধু প্রচার চলছে। পরীর পার্টি এখানে সেখানে জনসভা করছে। পরী সে-সব সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। যেন এক একটা কথা আগুনের ফ্‌লকি হয়ে ওড়ে। তারপরই আমি কেন যে অবাক হয়ে যাই—শুনি পরী এস ডি ও সাহেবের জিপে কোথায় গেছে। হাওয়া খেতে বের হয়। একবার সাহেবটি নিজের বাড়িতেই কবিতার আসর বসিয়েছিল। সঙ্গে রকমারি খাবারের ব্যবস্থা। সাহেবটির চেয়ে পরীরই যেন বাংলো বাড়িটাতে বেশি আধিপত্য। সে সেদিন, আমার কবিতা পর পর আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি সবার চেয়ে আলাদা তার কাছে। একপাশে আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম। পরীর দিকে ভাল করে তাকাতেও পারি নি সেদিন।

আমি বললাম, কি গাইল!

—কোরাস।

পরী গান গায় জানতাম না। বললাম, কোরাস মানে?

—পরীর সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে গাইল। মাইকের সামনে পরী। পাশে সব পার্টির ছেলেরা। নদীর বিশাল চরে মঞ্চ। মানুষজনে ভর্তি। পরী অবলীলায় সংগ্রামী গান গেয়ে গেল। হাত তুলে যখন ওর সেই সুন্দর গান মাইকে ভেসে আসছিল, তখন আমার যে কি গর্ব। পরী আমাদের। আমাদের পরী গাইছে—মাউণ্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জহর কান্দে, প্যাটেল কান্দে, কান্দে মৌলানায়—মাউণ্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জারিগানের সুর। সভার মানুষজন স্তব্ধ হয়ে শুনছে। লাল পাড়ের শাড়ি পরনে। নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সে এক বিশাল ব্যাপার। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তারপর যখন গাইল, এস মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার, তখন কি মনে হয়েছিল জান, পরী আমাদের নয়, পরী অন্য জগতের বাসিন্দা। যেন অলৌকিক মহিমা তার সারা গানে বিরাজ করছে।

মুকুল থামতে চাইছে না। পরীর প্রশংসা করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

সহসা আমি কেন যে চিৎকার করে উঠলাম, থাম থাম। রাবিশ, আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। পরী একটা বাজে মেয়ে। খারাপ মেয়ে। জেদী, অহংকারী—আমি পরীকে তোমার চেয়ে ভাল চিনি। একদম আর কোনো প্রশংসা না। আমাকে যেতে দাও। বলেই সাইকেলে উঠে পাগলের মতো কেমন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললাম। আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ এল মিলের গেটে এসে।

এত দ্রুত সাইকেল আমি চালাই না। অন্ধকার রাস্তায় আমি কেমন পাগলের মতো ছুটে এসেছি। হাঁপাচ্ছি। সাইকেল থেকে নেমে কিছুক্ষণ রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি কেমন নির্বিষ নিরুপায় এক মানুষ।

হুঁশ ফিরে এলে যেন মিলের ঘণ্টা পড়ল। সাতটার ঘণ্টা। আমি অসহায় মানুষের মতো কুড়ি টাকা মিলবে বলে টিউশনি করতে যাচ্ছি। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতেই মনে হল, শরীর থেকে এই সব পোকামাকড়ের বিষ ঝেড়ে ফেলা দরকার।

পরী আমার কেড না। মুক্ত হতে চাইলাম। রুমালে মুখ মুছলাম। ঘামে জবজব করছে জামা প্যান্ট। সাইকেল ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাব, দেখি খোদ ম্যানেজার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বিগলিত হাসি, এই মাত্র মিমির সঙ্গে ফোনে কথা হল।

এখানেও মিমি! আর ম্যানেজার সাহেব তো আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেন নি।

মুকুল এক সময় বলল, মেসোমশাই খুব ঘাবড়ে গেছেন বিলু। পরীকে নিয়ে তাঁর ভাবনা দেখা দিয়েছে। বললেন ...। বলেই চুপ করে গেল।

—কি বললেন?

—না, মানে তুমি পরীকে নিয়ে কোনো ফ্যাসাদে পড়ে গেছ তিনি ঠিক টের পেয়ে গেছেন।

—বাবা কি পরীর কথা কিছু বললেন?

—না।

—তবে?

—দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

—কিসের দ্বিধা?

—পরীকে নিয়ে তুমি খুব যন্ত্রণার মধ্যে আছ।

—মোটেই না।

—পরী বাড়ি গেলে তবে রাগ কর কেন। আমরাও তো যাই। তুমি তো রাগ কর না!

—আমি রাগ করতে যাব কেন!

—কিন্তু পরী পালিয়ে যায় জান?

—দু-একবার গেছে।

—এখনও যায়।

—কবে গেছিল?

—কালও গেছে।

—কখন?

—তুমি কখন বাড়ি থাক না পরী ঠিক জানে। সকাল বেলায় টিউশনিতে যাও পরী সব খবর রাখে।

আমি সকাল বেলাতেই মিলে পড়াতে যাই। আজ সকালে যাওয়া হয় নি। সন্ধ্যায় যাব। কিন্তু পরী আসে, অথচ কোনো খবরই পাই না। পিলু পর্যন্ত বলে না। পরী কি বাড়িতে আমার চেয়েও বেশি তাদের নিজের হয়ে গেছে! পরীর জেদের কাছে এ-ভাবে পরাজিত হতে আমি রাজী না। আমার ভেতরটা সবার উপর কেমন ক্ষোভে হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মায়া, মা, বাবা, পিলুকে পরী হাত করে ফেলেছে। ভাবতেই কেন জানি মনে হল, পরীর ছলনা ভাঙতেই হবে। পরীকে আবার অপমান করতে হবে। কিন্তু মুশকিল, অপমানে পরীর চোখ যেমন জলে ভার হয়ে ওঠে, শুকিয়ে যেতেও তা সময় লাগে না। না হলে, গোপনে সে কিছুতেই আমার অবর্ত্তমানে আমাদের বাড়ি ফের যেতে সাহস পেত না। আজই গিয়ে তুলতে হবে কথাটা। কেন আসে? আমার যা কিছু অপছন্দ তাই করে বেড়ায় পরী। আমরা গরীব বলে সে ভেবেছেটা কী!

কিন্তু মুকুল তখন বলছে, এই নিয়ে তুমি মেসোমশাইকে কিন্তু কিছু বলবে না। কথা দাও।

আমরা পঞ্চাননতলার কালীমন্দিরের কাছে এসে গেছি। এখান থেকে মুকুল রেল-লাইন পার হয়ে শহরে চলে যাবে। আমি যাব কলোনিতে। বেড়াতে বের হলে আমাদের এই জায়গাটাতে থামতে হয়। সাইকেল থেকে নেমে মন্দিরের চাতালে বসে কোনোদিন গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়। জায়গাটা বড় নির্জন। কোনো দোকান পাট নেই। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস রাস্তা পার হলে জঙ্গলের মধ্যে। পুরানো আমলের বাড়ি। কোনোকালে, রাজরাজড়ার প্রাসাদ ছিল। সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস। সন্ধ্যা হলেই পরিত্যক্ত বাসভূমির মতো লাগে। শহর থেকে সাইকেলে কেউ ফিরে যায় রাস্তা ধরে। সাইকেল, রিকশা এবং গরুর গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। আর দু-পাশে গভীর জঙ্গল আর বিশাল সব আমবাগান। রাত হলে জোনাকি জ্বলে। দূরে দেখতে পাই লণ্ঠনের আলো। বাড়িটার দারোয়ানের কুঁড়েঘরে তখন একমাত্র আলো জ্বলে। মুকুলের বোধ হয় এখানটায় আরও কিছু সময় কাটিয়ে যাবার ইচ্ছা। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বস।

আমার টিউশনি আছে। মনটাও ভাল নেই। পরীর জেদের কাছে বার বার হেরে যেতে আমি আর রাজী না। বললাম, আজ আর বসব না। চলি।

—মেসোমশাইকে কিছু কিন্তু বলবে না।
—ঠিক আছে বলব না।
—মেসোমশাইর অগাধ বিশ্বাস আমার উপর।
—জানি।
—বললে খুব দুঃখ পাবেন।
—বললাম তো কিছু বলব না।
—জান সেদিন পরী গঙ্গার ধারে কী সুন্দর গাইল!

আমি জানি ভোট আসছে বলে এখন শহরে গাঁয়ে গঞ্জে শুধু প্রচার চলছে। পরীর পার্টি এখানে সেখানে জনসভা করছে। পরী সে-সব সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়। যেন এক একটা কথা আগুনের ফ্‌লকি হয়ে ওড়ে। তারপরই আমি কেন যে অবাক হয়ে যাই—শুনি পরী এস ডি ও সাহেবের জিপে কোথায় গেছে। হাওয়া খেতে বের হয়। একবার সাহেবটি নিজের বাড়িতেই কবিতার আসর বসিয়েছিল। সঙ্গে রকমারি খাবারের ব্যবস্থা। সাহেবটির চেয়ে পরীরই যেন বাংলো বাড়িটাতে বেশি আধিপত্য। সে সেদিন, আমার কবিতা পর পর আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি সবার চেয়ে আলাদা তার কাছে। একপাশে আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম। পরীর দিকে ভাল করে তাকাতেও পারি নি সেদিন।

আমি বললাম, কি গাইল!

—কোরাস।

পরী গান গায় জানতাম না। বললাম, কোরাস মানে?

—পরীর সঙ্গে সবাই গলা মিলিয়ে গাইল। মাইকের সামনে পরী। পাশে সব পার্টির ছেলেরা। নদীর বিশাল চরে মঞ্চ। মানুষজনে ভর্তি। পরী অবলীলায় সংগ্রামী গান গেয়ে গেল। হাত তুলে যখন ওর সেই সুন্দর গান মাইকে ভেসে আসছিল, তখন আমার যে কি গর্ব। পরী আমাদের। আমাদের পরী গাইছে—মাউন্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জহর কান্দে, প্যাটেল কান্দে, কান্দে মৌলানায়—মাউন্টব্যাটেন সাহেবও, তুমি সাধের ব্যাটন কারে দিয়া যাও। জারিগানের সুর। সভার মানুষজন স্তব্ধ হয়ে শুনছে। লাল পাড়ের শাড়ি পরনে। নদীর ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সে এক বিশাল ব্যাপার। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। তারপর যখন গাইল, এস মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার, তখন কি মনে হয়েছিল জান, পরী আমাদের নয়, পরী অন্য জগতের বাসিন্দা। যেন অলৌকিক মহিমা তার সারা গানে বিরাজ করছে।

মুকুল থামতে চাইছে না। পরীর প্রশংসা করতে পারলে সে আর কিছু চায় না।

সহসা আমি কেন যে চিৎকার করে উঠলাম, থাম থাম। রাবিশ, আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। পরী একটা বাজে মেয়ে। খারাপ মেয়ে। জেদী, অহংকারী—আমি পরীকে তোমার চেয়ে ভাল চিনি। একদম আর কোনো প্রশংসা না। আমাকে যেতে দাও। বলেই সাইকেলে উঠে পাগলের মতো কেমন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চললাম। আমার কোনো হুঁশ ছিল না।

হুঁশ এল মিলের গেটে এসে।

এত দ্রুত সাইকেল আমি চালাই না। অন্ধকার রাস্তায় আমি কেমন পাগলের মতো ছুটে এসেছি। হাঁপাচ্ছি। সাইকেল থেকে নেমে কিছুক্ষণ রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি কেমন নির্বিষ নিরুপায় এক মানুষ।

হুঁশ ফিরে এলে যেন মিলের ঘণ্টা পড়ল। সাতটার ঘণ্টা। আমি অসহায় মানুষের মতো কুড়ি টাকা মিলবে বলে টিউশনি করতে যাচ্ছি। নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতেই মনে হল, শরীর থেকে এই সব পোকামাকড়ের বিষ ঝেড়ে ফেলা দরকার।

পরী আমার কেউ না। মুক্ত হতে চাইলাম। রুমালে মুখ মুছলাম। ঘামে জবজব করছে জামা প্যাণ্ট। সাইকেল ঠেলে ভিতরে ঢুকতে যাব, দেখি খোদ ম্যানেজার দরজায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বিগলিত হাসি, এই মাত্র মিমির সঙ্গে ফোনে কথা হল।

এখানেও মিমি! আর ম্যানেজার সাহেব তো আমার সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা কথা বলেন নি।

এ-ভাবে আমাকে দেখে বিগলিত হাসিও দেখি নি। আমার সম্পর্কে কাকা হয়। বাবা তো প্রথমে যখন টিউশনিতে আসি, বলে দিয়েছিলেন, ভূপাল সম্পর্কে তোমার কাকা হয়। প্রণাম করবে!

আমি ভূপাল কেন তাঁর বাবাকেও প্রণাম করি নি। আমরা যে তাঁদের আত্মীয় হই বিষয়টাই যেন বড় হাস্যকর। আমার সম্পর্কে তাঁরা কোনো খবর নেন নি। নরেশ মামা ভূপালের বাবার কাছের মানুষ, সেই সুবাদে আমার পড়াবার অনুমতি মিলেছে। আসলে একটা উদ্বাস্তু পরিবারকে কিছুটা যেন সাহায্য করার মতো। কিন্তু আজ নীলরঙের বেতের চেয়ার দেখিয়ে আমার কাকাবাবুটি বললেন, বোস, তুমি আমাদের দেশের ছেলে জানতামই না। তোমরা আমাদের আত্মীয় হও।

দেখি তখন তাঁর বাবাও হাজির।

যেন কত আপনার মানুষ, তুমি তো আচ্ছা ছেলে বিলু। তোমার বাবা আমার ভাইপো সম্পর্কে —অথচ এ-সব কিছুই তো বল নি।

বলে কি! নরেশমামা তো জানে, আমাদের সঙ্গে লতায় পাতায় আত্মীয়তা আছে।

আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেলে যা হয়। মিমির ফোন! আমার আত্মীয়! বসার ঘরে নিয়ে হাজির! —এত কেন হচ্ছে!

ভূপালের বাবাটি বলল, বোস। তোমার ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে কত গেছি। তা তোমার ঠাকুরদার বড় টোল ছিল—মহামহোপাধ্যায় তিনি। তোমার ঠাকুরদার নামডাক ছিল—এক ডাকে সবাই চিনত।

আমার বাবার নাম করে বলল, তোমার বাবা তো সেদিকে মাড়ালই না হাফ-ব্যাক খেলতে গিয়ে একবার মজুমপুরের স্কুলের মাঠে পা ভাঙল। এই ভূপাল, আরও সবাই মিলে তোমার বাবাকে বাড়ি দিয়ে এল।

আমার বাবা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন জানতাম না। বাবার কাছে কোনোদিন শুনিও নি। মাও বলে নি, বাবা ফুটবল খেলতেন। তবে বাবা এখন যে-ভাবে ফুটবল খেলছেন তাতে আমার চাকরির খুবই দরকার।

ম্যানেজার সাহেবের বাবা আমার বাবার কাকা হন এটুকু শুধু জানতাম! টিউশনি ঠিক হলে বাবা বলেছিলেন, ভূপাল মিলের ম্যানেজার। আমাদের আত্মীয়। মার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আরে মনে নেই, একবার এত বড় একটা চাইন মাছ নিয়ে এসেছিলেন, তুমি মনে করতে পারছ না! কারো বিয়ে কি অন্নপ্রাশন এমনই কিছু বলেছিলেন, তবে আমার ঠিকঠাক মনে নেই। দেশের কথা কোনোদিন ওঠে নি। আজ শুধু দেশের কথা না, আমি তাঁদের আত্মীয়, আমার ঠাকুরদা মহামহোপাধ্যায়, অনেক শিষ্য, বাড়িতে টোল ছিল, আরও কত খবর দিয়ে নিমেষে নিজের মানুষ করে ফেলতে চাইছেন। তাহলে কি মিমি ফোনে বলেছে সব? সাহেবের কবিতা দুটো যাচ্ছে না। সম্পাদক রাজী না।

আজ পড়াশোনার পাট উঠে গিয়ে বাড়ির অন্য চেহারা। সাহেবের পত্নী হাজির। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তুমি বিলু বড় মুখচোরা স্বভাবের মানুষ। মিমি তো বলল, ও এ-রকমেরই।

মিমি আর কি বলেছে জানার ইচ্ছে। কিন্তু আমি চুপচাপ বসে আছি।

—একদিন আমরা যাব।

বললাম, যাবেন।

—তোমার বাবাকে বলবে, আমরা খুব রাগ করেছি। এতদিন আছি দিদি একবার বেড়িয়ে গেলেন না!

বললাম, বলব।

আমি জানি তিন মাসের মাথায় আমার এত আদর আপ্যায়নের মূলে মিমি। এখানেও মিমির প্রভাব। মিমি ভেবেছে কি?

ম্যানেজার সাহেব বললেন, চা খাও তো!

—খাই।

তারপর বললেন, মিমির সঙ্গে কি করে আলাপ?

—এক সঙ্গে পড়ি।

—ওদের বাড়ি গেছ?

মনে হল বলি, না গেলে কী চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে আমার মধ্যে একটা ভীতু মানুষ আছে—সে এ-সব কথায় সংকোচের মধ্যে পড়ে যায়। বললাম, গেছি।

—ওর দাদু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

—জানি।

—খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার!

—শুনেছি।

এ-সময় দুই ছাত্রী আমার হাজির। একজনের হাতে চায়ের কাপ। অন্যজন মিষ্টির প্লেট নিয়ে হাজির। আমার সামনে রাখছে।

বড় ছাত্রীটি আজ আবার শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরলে কত সুন্দর লাগে দেখতে। কেন যে পরে না। ফ্রক গায়ে আমার সামনে বসলে আমি ঠিক মুখ তুলে তাকাতে পারি না। আমি যে একজন তরুণ যুবক, আমার মধ্যে বড় হবার স্বপ্ন আছে এতদিন এ-বাড়িতে এমন বিশ্বাস কারো ছিল না। মানুষ বলে গণ্য না করলে যা হয়। নরেশমামার কথা ফেলতে পারে না বলেই যেন রাখা।

চা, খাবার একটা টিপয়ে রাখলে তাদের পিতৃদেবের হুকুম—প্রণাম কর। কত বড় বংশের ছেলে জান না! ওর ঠাকুরদাকে দেশে সবাই এক ডাকে চিনত।

আমার ঠাকুরদা যে এত নামী মানুষ আমি এই প্রথম শুনলাম। আমার জন্মের আগেই ঠাকুরদা গত হয়েছেন। দুটো খবরই আমাকে আজ কেমন বিভ্রমের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এক বাবা বড় ফুটবল খেলোয়াড়, দুই, আমার ঠাকুরদা মহামহোপাধ্যায়। বাবা তো এ-দেশে এসে কোথাও ঠেকে গেলে একমাত্র দীনেশবাবুর দোহাই দিতেন। বাবা কেন যে ঠাকুরদার নাম বলতেন না বুঝতে পারি না।

ওরা প্রণাম করে উঠে পাশের সোফায় বসে পড়ল। প্রণামে আমার কোনোদিন আপত্তি নেই। ছোট বয়েস থেকেই ওটা পেয়ে আসছি বামুন ঠাকুর বলে। পাশের সোফায় পায়ের উপর পা রেখে দাম্ভিক এবং গুরুগম্ভীর ম্যানেজার পাইপ নামিয়ে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, মিমি তো দেখছি এখানে এলে তোমার কথা ছাড়া কিছু বলে না। তুমি নাকি ছাইচাপা আগুন। তুমি বলছি বলে মনে কিছু কর না কিন্তু।

আমি প্রায় আর্তনাদ করতে যাচ্ছিলাম—না না, তাতে কী হয়েছে।

তারপর বলার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি তো আপনার ভাইপো। সেটা বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে বলে চুপ করে গেলাম।

—খাও। কাকীমার গলায় স্নেহ ঝরে পড়ছে।

মিমি ভেবেছেটা কী! আমি ছাইচাপা আগুন! ও এখন ফু দিয়ে তা জ্বালাবার চেষ্টা করছে।

এ-ঘরের দেয়াল যেন নতুন করে ফের দেখছি—কাকীমার কিছু সূচীশিল্পের নিদর্শন আছে। সূচীশিল্পে মহামান্য ম্যানেজারের পদ্য লেখা। পদ্যের নিচে নাম, ভূপাল চৌধুরী। পতীর পুণ্যে সতীর পুণ্য গোছের সব পদ্য। তার স্বামীটি শুধু এত বড় মিলের ম্যানেজারই নয়, একজন কবিও। তার সঙ্গে তিনি যে শিকারী সে ছবিও এই ঘরে! বসার ঘরটা জীবনের প্রশংসাপত্রে ভরে ফেলেছে। কোথাও কোনো বিদায় সম্বর্ধনার প্রশংসাবাক্য, কোথাও সাহেব মালিকের পাশে দণ্ডায়মান ছবি, কোথাও সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন তার ছবি। এই প্রথম বুঝতে পারলাম গোটা পরিবারটাই ভূপাল চৌধুরী নামক একজন কৃতী মানুষের অহঙ্কারে ভুগছে। সারা পরিবার এবং আগামী বংশধররাও এই মহান কৃতী পুরুষের জীবন নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে। তাই সব কিছুই বাঁধিয়ে রাখা!

—কিছু খাচ্ছ না যে!

—এত খাব না।

—আরে খাও। ছেলেমানুষ। তোমাদের বয়সে আমরা সব গোগ্রাসে খেতাম।

দাদুটি বললেন, তোমার ঠাকুরদা খুব খাইয়ে মানুষ ছিলেন। আস্ত পাঁঠা খেতে পারতেন। কী বিশাল

চেহারা। আর তেমনি সুপুরুষ। সাদা কদমছাঁট চুল—লম্বা টিকিতে লাল জবা। গায়ে শুধু রেশমের উত্তরীয়। পায়ে খড়ম।

ভূপাল চৌধুরী মশাই বললেন, ব্যাপার কি জান, আমিও একসময়ে কাব্যচর্চা করতাম। আমার কবিতা বাণী, রূপা, চম্পা কাগজে প্রকাশিত হত। নানা ঝামেলায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুঝলে না একজন মানুষের পক্ষে সব দিক বজায় রাখা কত কঠিন।

আমি বললাম, তা ঠিক। বলার ইচ্ছা ছিল বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ কেন। ছাত্রী দুজন আমার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এতদিন তারা শুনে আসছে—ওরে তোরা কোথায়। মাস্টার এসে বসে আছে। এখন তারা ভাবছে, মিমিদি এই মানুষটিকে বড় সমীহ করে। মিমিদি ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করা মেয়ে। মিমিদি নাটক করে। শহরে এমন লোক কমই আছে মিমিদের নাম জানে না। মিমিদির দাদুকে চেনে না। মিমিদিদের গাড়ি আছে। সেটাই এখন লেটেস্ট মডেলের। মিমিদিরা গাড়িতে এলে এই বাংলোর বাসিন্দাদের ইজ্জত বেড়ে যায়। সে-ই যখন বলে গেছে, ছাইচাপা আগুন, বিলুকে এমনিতে বোঝা যায় না, জেদী অহংকারী, মাথা নিচু করে কথা বলে কিন্তু যা ভাবে তা করবেই। ওর মধ্যে দারুণ তেজস্বিতা আছে। কবিতা দারুণ লেখে। কুঁড়ের হদ্দ। লেগে আছি। হয়তো মিমি তার দু-একটি কবিতাও এখানে আবৃত্তি করে যেতে পারে। এত বড় বংশের এমন সুন্দর তরুণীর সার্টিফিকেটের কত দাম মিষ্টি মুখে দিতে টের পেলাম। কিন্তু আমি কেন যে ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে মরছি বুঝতে পারছি না। মিমির পরিচয়ে আমার পরিচয়। মিমি বললে, আমি রাজা, না বললে আমি ভিখারী। কখ্খনও না। এ হতে দেওয়া যায় না।

ঢোক গিলে বললাম, মিমি মিছে কথা বলেছে।

সহসা কেমন সম্বিত ফিরে আসার মতো ভূপাল চৌধুরী মশাই মানে আমার এখনকার কাকাবাবুটি প্রায় অনেকটা নড়ে বসলেন। বললেন, না না, মিমি কখনও বাজে কথা বলে না।

আমারও মাথা গরম। বললাম, খুব বলে।

—তাহলে বলল যে অপরূপার সম্পাদক তুমি।—তুমি এর মধ্যে নেই?

—না।

মিমি যে বলল, বিলুর ইচ্ছে নয়। ও অপরূপার সম্পাদক। ও রাজী না হলে কিছু করা যাবে না।

—ঠিক বলে নি।

দাদুটি বললেন, আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে! আর অত ছেড়ে দিলে হবেই বা না কেন! এর ওর বাগানে মুখ তো দেবেই।

এই এক ফ্যাসাদ আমার। ওর প্রশংসা সহ্য হয় না। অপ্রশংসাও না। দাদুটির কথায় আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। মিমি খারাপ মেয়ে। এর বাগানে ওর বাগানে মুখ দেয়।

কাকাবাবুটির পাইপ টানা বন্ধ হয়ে গেছে। ইজ্জতে লেগেছে। তবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, মিমির উৎসাহে আমি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছি।

তাহলে মিমির দিব্যি আছে মাথায়। আমার হাসি পাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে বসে আছি। হাসলেই গেল। এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, হাসা ঠিক না। অনেকদিনের সাধ লোকটাকে অপমান করার। কবিতা অমনোনীত—ব্যাস—তারপরই মিমির বাকি কাজ। এটা মিমি করবে আমি জানতাম। কারণ মিমি জানত আমার হেনস্থার কথা।

বললাম, মিমির এটা স্বভাব। ও সবাইকে উৎসাহ দেয়।

—মিমি না বললে, এ বয়সে কে আর সাধ করে কবিতা লেখে। দেয়ালের বাঁধানো কবিতা দেখেই বলল, বা কী সুন্দর হাত আপনার। ওটা ছেড়ে দিলেন কেন!

মিমি এমন বলতেই পারে না। সৌজন্যের খাতিরে বলতে হয়তো পারে। কাকাবাবুটি জীবনের সব প্রশংসাপত্র এই ঘরে লটকে রেখেছেন। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার স্বভাব। হয়তো মিমিরা এলে সব দেখিয়েছেন। কোন ছবি কবে কোথায় তাও বলতে পারেন। কোন্ প্রশংসাপত্র কোন মিল থেকে বিদায় সম্বর্ধনায় পাওয়া। কোন বনে কোন হরিণ শিকার করেছেন। বাঘের চামড়াটি আছে। ওটাও

তাঁর শিকার করা। এত সব কৃতিত্বের সঙ্গে পদ্যের প্রশংসা না করলে অশোভন। মিমি তাই বলতে পারে, ছেড়ে দিলেন কেন! আসলে মিমি হয়তো বলতে চেয়েছিল, ছেড়ে দিয়ে ভাল করেছেন। নাহলে নিজেও ডুবতেন, অনেক সম্পাদককেও ডোবাতেন। তবে মিমি দেখেছি আমাকে ছাড়া রূঢ় কথা আর কাউকে বলে না। সবার সঙ্গেই মধুর ব্যবহার। আমি ছাড়া দেখছি ওর আর কোনো বড় প্রতিপক্ষ নেই। মিমিও আমার সঙ্গে ঝগড়া করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বাড়িতে গোপনে আসাটাও আমার কাছে কেন জানি এক রকমের শত্রুতা।

কাকাবাবুটি সোজাসুজি বললেন, তাহলে মিমি আমাকে ব্লাফ দিল! যেন স্বগতোক্তির মতো। কারো দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন না। ছাত্রী দু'জন পিতৃদেবের অপমান সহ্য করতে না পেরে বিমর্ষ— কিংবা পিতৃদেবের এমন করুণ মুখ হয়তো জীবনেও তারা দেখে নি, দাপটে যে মানুষ এত বড় মিল চালায়, সেই মানুষকে এতটা কাহিল দেখালে পরিবারের লোকজনদের কষ্ট হবারই কথা।

দাদুটি মুখে দোক্তা পাতার গুঁড়ো দু-আঙুলে ফেলে বললেন, এক্ষুনি ফোন কর। এসব কি ফাজলামি।

আর তক্ষুনি মনে হল, এই রে খেয়েছে। আমাকে বসিয়ে রেখে কথা বলতে চান। বলুক না। যেন মিমিকেও জব্দ করা যাবে এই ভেবে মজা পাচ্ছিলাম। স্রেফ অস্বীকার করব। বলব, না না আমি সম্পাদক নই। আমার টাকা কোথায়! আমাকে কে বিজ্ঞাপন দেবে! মিমির ইন্টারেস্ট কি আমাকে সম্পাদক করার। আমার এমন যুক্তির কাছে মিমি হেরে যেতে বাধ্য। কাজেই আদৌ ঘাবড়ে গেলাম না।

বললাম, দেখুন না ফোনে পান কি না! সত্যি তো এ-ভাবে ব্লাফ দেওয়া ঠিক না।

দাদুটি বলে উঠলেন, অসভ্য মেয়েছেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার কী হয়ে যায়! আমি নিজেও জানি না। সব মিষ্টি যেন ভেতর থেকে উঠে আসছে। আমি জানি, এই টিউশনির আজ এখানেই ইতি। সব জেনেও চেপে আর যেতে পারলাম না।

বললাম, ওকে অসভ্য মেয়েছেলে বলবেন না। ও অমন মেয়ে নয়!

—কী বলছ তুমি! ভূপালের মতো মানুষের কাছে সরাসরি মিছে কথা বলে গেল!

—ও মিছে কথা বলে নি। আপনার পুত্রগৌরবের সামান্য হানিতেই এত ক্ষেপে গেলেন! দুটি পদ্য ছাপা হল কি হল না এই ভেবে ওকে অসভ্য মেয়েছেলে বলা ঠিক হয়নি।

—আলবাৎ হয়েছে। ওর দাদু ওর মাথা খেয়েছে। ও অসভ্য মেয়েছেলে ছাড়া কিছু না। যারা নাটক করে, পার্টি করে, সব পুরুষদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। স্বভাব ঠিক থাকে তাদের?

—একদম এ-রকম বলবেন না। ভূপালবাবুর পদ্য আমি বাতিল করেছি। কবিতা আর পদ্য আলাদা— আমার 'অপরূপা'য় কবিতা ছাপা হয়। পদ্য ছাপা হয় না। জীবনে সবার সব হয় না দাদুমশাই। মানুষকে ইজ্জত দিতে হয়। আগে মানুষকে ইজ্জত দিতে শিখুন, পরে অসভ্য মেয়েছেলে বলবেন। মিমি মানুষকে ইজ্জত দিতে জানে। সে কখনও ব্লাফ দেয় না। অপরূপার সম্পাদক আমি। হ্যাঁ আমি। মিমির কোনো রাইট নেই, আমি না বললে, সে ছাপতে পারে না! মিমিকে অসভ্য বলার আগে আপনারা কতটা অসভ্য ভেবে দেখবেন। উঠি।

আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। বাইরে বের হয়ে চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। কুড়িটা টাকা। বাবা শুধু বলবেন, কুড়িটা টাকা সোজা কথা। দেড় মণ ধান হয়।

মা বলবে, কুড়ি টাকা টিউশনিতে কে দেয়। দশ টাকা পাঁচ টাকা দেয়। তুই এ-ভাবে সবাইকে অপমান করে চলে এলি! তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। সংসারের কী হাল বুঝতে পারিস না। মায়াটার একটা জামা নেই, পিলু ছেঁড়া প্যান্ট পরে স্কুলে যায়। আমার পরবার একটা ভাল শাড়ি নেই। তোর বাবা তো ন্যাংটা বাউণ্ডুলে। তার কিছুতেই কিছু আসে যায় না।

তবু যেন অনেক দিনের অপমানের জ্বালা আজ শেষবারের মতো উগরে দিয়ে আশ্চর্য এক মুক্তির স্বাদ পেলাম। বাড়ি এসে খেলাম, নিজের ঘরে ঢুকে গেলাম।

দু-দিন বাদে মুকুল এল। হাতে টাইপ করা খাম। সেই সব করে এনেছে। শুধু সই করে দিতে বলল।

বাড়িতে এ দু-দিন কারো সঙ্গে বড়ো একটা কথা বলছি না। মা সকাল হলেই তাড়া দিচ্ছে, কিরে টিউশনিতে গেলি না!

—যাব।

সব কথা বলতেও সাহস পাচ্ছি না। কুড়িটা টাকা মাসান্তে সংসারে কত দাম বুঝি। বললেই মা ভেঙে পড়বে। বাবা হয়ত বলবেন, সব ভবিতব্য।

এই ভবিতব্য কথাটা নিয়ে ঝড় উঠবে। মা'র গলা পাওয়া যাবে, ভবিতব্য ধুয়েই এখন জল খাও। সারাটা জীবন আমাকে তুমি জ্বালিয়েছ। এমন নিষ্কর্মা মানুষের হাতে পড়ে আমার হাড় মাস জ্বলে গেল। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কিছুতে। কাল কি খাবে, তার চিন্তা নেই। গাছপালা আর যজমান নিয়ে পড়ে থাকলেন। ঠাকুরপো এত করে বলল, দ্বারকা দাসের আড়তে খাতা লেখার কাজ নিতে। তাতে ওনার অপমান। ছয়কে নয় করতে পারবেন না। এখন বোঝ, ছেলের কি, সে তো বোঝে না কোথা দিয়ে কী হয়!

কিন্তু এ-সব ঘটনা চাপা থাকে না। নরেশ মামাই এসে খবরটা দিলেন। নরেশ মামা অবশ্য সব বলে শেষে বলেছেন, বিলু ঠিক করেছে। ওরা ভাবে কি? আরে বাবা দেশে থাকতে তোর মা তো মুড়ি ভাজত। স্কুলে কে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। মানুষের দিন সমান যায় না। বিলুটাকে শুনেছি মানুষ বলে গণ্যি করত না। আমি নিজেই ভাবছিলাম বলব, আর যেয়ে দরকার নেই।

সুতরাং এ-সব শোনার পর বাড়িতে যে ঝড়ের আশংকা করেছিলাম সেটা সহজেই কেটে গেল। এখন শুধু আমার জামাইবাবুর পেছনে লেগে থাকা। জামাইবাবুকে বলে স্পেশাল কেডারে যদি শিক্ষকতা পাওয়া যায়। এই আশাই এখন পরিবারের সবার কাছে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগাচ্ছে। মুকুল টাইপ করা দরখাস্ত নিয়ে যাবার পর, সংসারে সামান্য অভাব অনটন নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলেই, বাবার এখন একটাই আপ্ত-বাক্য, আরে কটা দিন সবুর করতে তোমার কি হয় বুঝি না ধনবৌ!

আমার পড়া হবে না জেনে পিলু খুবই দমে গেছে। দাদাটার কত বড় হবার কথা। সে এখন প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার হয়ে যাবে। মাও মনের দিক থেকে ভাল নেই, সংসারে একজন নীলবাতি জ্বালাবার যাও চেষ্টা করে যাচ্ছিল, ইস্কুলের চাকরি হলে সেটাও যাবে। মানুষের ঘরবাড়িই তো সব নয়। সঙ্গে পুত্র কন্যার যশ খ্যাতি সবই দরকার।

বাবা ছাতা বগলে নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে একদিন খবরও দিয়ে এল, বিলু দরখাস্ত করেছে দাস মশাই। মনে হয় চাকরিটা হয়ে যাবে। চাকরিটা হলে সংসারে স্থিতি আসবে। আমার ব্রাহ্মণীকে তো জানেন। বিন্দুমাত্র সহ্য ক্ষমতা নেই। অভাব অনটন কার নেই। যার লাখ টাকা আছে তারও আছে, যার কিছু নেই তারও আছে। মাথা গরম করলে চলে!

আট

একদিন বাড়ি এসে শুনলাম, মিমি এসেছিল। মিমি কলকাতা থেকে কাকে ধরে আমাদের কজনের পাশ ফেলের খবর নিয়ে এসেছে। ওদের প্রভাব আছে—আনাতেই পারে। সবার আগে আমাদের বাড়িতে এসে খবর দিয়ে গেছে, মাসিমা বিলু পাশ করেছে। মিমি নাকি আনন্দে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, তোমার দাদা পাশ করেছে—তোমাদের কী আনন্দ! দাদাকে বল, হ্যাঁ।

মায়াকে ঘরে ডেকে বললাম, ও কোন ডিভিসনে পাশ করেছে জিজ্ঞেস করলি না!

সেই তো! মায়া কেমন অবাক হয়ে গেল। মিমিদির খবরটা নেওয়া হয় নি। সে ছুটে গেল বাইরে, মাকে বলল, মিমিদি পাশ করেছে মা?

—জানি না তো!

বাবাকে বলল, মিমিদি পাশ করেছে বাবা?

—কিছু তো বলল না!

হঠাৎ পরিবারের সবাইকে কেন জানি আমার সহসা স্বার্থপর মনে হল। যে মেয়েটা বাড়ির ছেলের খবর বয়ে দিয়ে যায় তার পাশ ফেলের খবরটা নেওয়ার দরকার পর্যন্ত কেউ মনে করল

না। মিমির পাশ ফেল নিয়ে কোনো কথা বলার অপেক্ষা সে-রাখে না। র‍্যাংক নিয়ে তার ভাবনা।

বাবা হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ বলেছে। ও নিজ থেকেই যেন একবার বলল, আমিও পাশ করেছি মেসোমশাই। এসেই মিমি আমাকে তোর মাকে প্রণাম করল। আসলে খেয়াল ছিল না।

খেয়াল না থাকারই কথা। বাবার কাছে এত বড় খবর কেউ কখনও আজ পর্যন্ত দিয়ে যায় নি। মিমি এসেই নাকি চলে গেছে। তোর মা বলল, একটু বস। মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়।

সে নাকি বলেছে, আর একদিন হবে।

তবু বাবা ছাড়েন নি—সে হয় না মা, তুমি এত বড় খবর নিয়ে এলে, একটু মিষ্টিমুখ করবে না হয় না। বস। বলেই নাকি মাকে বলল, দুধ দাও। দুটো মোয়া দাও। পূজার সন্দেশ আছে দাও। নাড় করেছিলে সেদিন, থাকলে দাও।

সব খবরই মায়ার। বলল, জানিস দাদা মিমিদিকে দেখলে আমার কেমন কষ্ট লাগে। তুই কখন এসে পড়বি ভয়ে তটস্থ থাকে। যতক্ষণ বসেছিল, কেবল রাস্তার দিকে চোখ। মিমিদি চোরের মতো আসে। তুই কিন্তু আবার মিমিদিকে বলতে যাস না। মিমিদি আমাদের বাড়ি এলে ক্ষেপে যাস কেন বুঝি না। ছোড়দা মিমিদিকে কিছুতেই ছাড়বে না। ছোড়দার এক কথা, মিমিদি কোথায় তুমি নাটক করছ বল না। আমি দেখতে যাব।

—মিমি কি বলল?

—বলল, না, ও তোমাকে দেখতে হবে না। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। দেখছ তো মেসোমশাই সারাদিন এক দণ্ড বসে থাকেন না। সব কিছুর প্রতি কি যত্ন। ঘরবাড়ি, গাছপালা সব। তোমরা যদি মানুষ হও তবে তাঁর এ-সব করা সার্থক।

আমার মনে হল, বেশ উপদেশ ঝাড়ছে মিমি। এ-বাড়ির সবার মানুষ হওয়া নিয়ে ভাবনা। কে তাকে এত দায় চাপিয়ে দিল।

আমার মুখ গোমড়া দেখে মায়া বলল, তোর কাগজ দু-একদিনের মধ্যে বের হবে। তোকে একবার মিমিদি যেতে বলেছে।

—কোথায় যাব! বাড়িতে পাওয়া যায় না।

—সে তো বলে যায় নি। কেবল বলল, দাদাকে বল, পাশের খবর দিয়ে গেলাম, দাদাটি যেন একবার দয়া করে দেখা করে।

মিমির সঙ্গে আমার যে দেখা হয় না তা নয়। আমাদের কাগজে অস্থায়ী অফিসে দেখা হয়। কখনও বিকালে টাউন হলের মাঠে বসে যখন সবাই আড্ডা মারি তখন দেখা হয়। ওর সঙ্গে চার পাঁচজন পার্টির ক্যাডার থাকে। জরুরী কাজের খবরটুকু দিয়েই উধাও। অস্থায়ী অফিসে লেখা নিয়ে কখনও কোনো বিতর্কে মিমি সহজে জড়িয়ে পড়তে চায় না। কারণ জানে যত লেখা সম্পর্কে সে খুঁটিনাটি ত্রুটি উল্লেখ করবে, তত আমি ত্রুটিগুলো আদৌ ত্রুটি নয়, শিল্পের খাতিরে মানিয়ে গেছে, এমন বলে তার বিরোধিতায় নামব। কাজেই চুপচাপ থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে। আমার সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই এমনও ভাবতে পারে হঠাৎ দেখলে কেউ। সে আমাকে একা পেতে চায়। কিন্তু এই একা পাওয়ার মধ্যে আমার দু দু-বার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ওকে সতীসাধ্বী ভাবতে কষ্ট হয়। এটা আবার হলে মাথা বিগড়ে যেতে পারে।

মায়া আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, জানিস দাদা, মিমিদি না যাবার সময় কেমন শুকনো মুখ করে চলে গেল।

—কেন বাবা কিছু বলেছে?

আমি জানি বাবা তো আমার কাউকে কোন রূঢ় কথা বলেন না। মিমিকে তো বলতেই পারেন না। মিমি বাবার কাছে মৃণ্ময়ী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। যে সংসারে যাবে ধনে জনে লক্ষ্মী বিরাজ করবে।

—নারে দাদা, বাবা কি বলবে! বাবা শুধু বললে, মিমি বিলুর আর একটা সুখবর আছে। তুমি

জানলে খুবই খুশি হবে। ও একটা চাকরি পাচ্ছে। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি। মুকুলের জামাইবাবু করে দিচ্ছে। সংসারে এটা আমাদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় খবর।

মায়া তারপর থেমে দরজার বাইরে উঁকি দিল। তারপর ফের আমার টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, শুনেই মিমিদির মুখটা কেমন শুকনো হয়ে গেল। মিমি কি চায় না, একটা প্রাইমারী স্কুলে আমি মাস্টারি করি।

খুব সাহসী মানুষের মতো বললাম, বাদ দে। ওর শুকনো মুখ দেখলে তো আমাদের পেট ভরবে না। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারি কি খারাপ কাজ! কত ছেলে লাইন দিয়ে আছে। নিজের লোক না থাকলে, এ-কাজও এখন কারো জোটে না। তারপর মনে হল মায়াকে এ-সব বলে লাভ নেই। আমি প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারি করি, তাতে কার কি পছন্দ অপছন্দ এ-সব ভাবলে চলবে না। আর এটাও ভেবে কূল পাই না, মিমিরা তো শ্রমিক দরদী, গরীব মানুষকে শোষণ থেকে মুক্ত করতে চায়। তাদের কাছে মানুষের কাজ দিয়ে মনুষ্যত্বের বিচার হয় না। কেউ ছোট না, কেউ বড় না। সবাই সব কাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ছোট ভাববার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সে তবে কেন আমার এত বড় খবরে শুকনো মুখ করে চলে গেল! আসলে সে আমাদের ভাল চায় না।

মায়া বলল, মিমিদি কিন্তু বলে গেল তোকে যেতে। কোথাও আর যাবে না বলেছে। বাড়ি গেলেই দেখা পাবি।

—কেন, ও যে মহেশ নাটকে শুনছি আমিনার পাঠ করবে!

—সে তো কিছু বলল না। কেবল যাবার সময় আমাকে চুপি চুপি বলে গেল, দাদাকে বলবে কিন্তু। বলবে আমি কোথাও আর যাচ্ছি না। সারাদিন বাড়িতেই থাকব। বলবে কিন্তু লক্ষ্মীটি।

মিমি আর কাউকে এ-কথা বলে যেতে পারে না। মায়া মেয়ে বলেই তাকে বলে যেতে পেরেছে।

মায়া বোঝে সব। বোঝে বলেই বোধ হয় গোপনে এত কথা বলল। দরজায় উঁকি দিয়ে দেখার মধ্যে টের পেলাম মায়ার মধ্যেও সেই নারী-মহিমা জেগে উঠছে। নারী বলেই সে বুঝতে পারে মিমিদির কষ্ট কত গভীর।

আমার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মায়া আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু আমি জানি ও কি বলবে। বলবে কবে যাচ্ছিস দাদা! পিলুকে দিয়ে খবর পাঠাতে বলেছে।

—সে আমি বুঝব। এখন যা তো! আসলে কেন জানি নিজেকে একা পাবার জন্য ছটফট করছিলাম। এটা কি মিমির আত্মসমর্পণ। মিমি কোথাও যাবে না বলে গেছে। ওর নাটক, মিছিল, ভাষণ আমার অপছন্দ বোঝে। মুখে প্রকাশ না করলেও আমার আচরণে সে টের পায়, তার গান, তার জনসভায় বক্তৃতা আমার অপছন্দ। রক্ষণশীল পরিবারে বড় হলে যা হয় এবং গরীব হলে তো কথাই নেই। সব মিলে মিমির আত্মপ্রকাশের প্রতি আমার বিরূপ ধারণাই গড়ে উঠেছে। মিমি কিছু একটা হতে চায়, কিছু করতে চায়। তার মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠেছে। সহসা সেই আগুন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেবার এত বড় কী কারণ থাকতে পারে! মিমির এ-সব ছলনা নয় তাই বা কে বলবে!

যাই যাই করেও সাত আট দিন হয়ে গেল মিমির বাড়িতে যাওয়া হয়ে উঠল না। আসলে একটা বড় ঝড়ের আশংকা করছি। এই ঝড়ে আমাদের দুজনকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে।

মুকুলের বাড়ি যাবার মুখে ভাবি, একবার ঘুরে আসা যাক। এত করে বলার কী আছে! মিমি যাই ভাবুক আমার পক্ষে এই কাজের সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না। মা বাবার মুখের দিকে তাকালে আমি আরও কেমন অসহায় বোধ করি। মাঝে মাঝে মনে হয় যে মেয়ে এস ডি ও সাহেবের গাড়িতে হাওয়া খেতে যায়, তার পক্ষে আমার সামান্য চাকরি নিয়ে ভাববারই বা কী থাকতে পারে। আসলে আমি একটু বেশি ভাবছি। মিমির উপর আমার অধিকারই বা কতটুকু। মিমি দুবার সামান্য দুর্বলতা প্রকাশ করেছে ঠিক—তাই বলে আমিই তার সব এমন কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠে নি। আমাদের মধ্যে ভালবাসাবাসির কোনো কথাই হয় নি! ভালবাসাবাসির ব্যাপারটা মিমির কাছে ন্যাকামি মনে হতে

পারে। আমি নিজেও সে ভাবে কিছুই ভাবি নি। ভাববার সাহসও হয় নি। কটা দিন নিজের মধ্যে একটা প্রবল সংশয় নিয়ে ঘোরাফেরা করছি মা'র বুঝতে কষ্ট হলো না!

খেতে বসলে মা বলল, তোর কী হয়েছে বল তো!

—কী হবে আবার!

—কিছু খেতে চাস না। চোখ মুখ শুকনো। আয়নায় একবার নিজেকে দেখেছিস!

তা আয়নায় রোজই তো নিজেকে দেখি। একটু বেশি বেশিই দেখি। আমার প্রতিবিম্বের সঙ্গে কথা হয়। সে বলে, কী বিলুবাবু এত কি দেখছ!

—কিছু দেখছি না।

—দেখছ বাবা, লুকিয়ে যাচ্ছ। যাও না ঘুরে এস। ভয় কি!

একটা ব্যাপারে আমি বেশ তাজ্জব বনে গেছি। মিমি বলে যাবার পরও সাত আট দিন হয়ে গেল, আমি যাই নি, মিমিও আসে নি—কেন গেলাম না জানতে! তবে মায়া কি নিজের অনুমান থেকে কথা বলেছে। দাদাকে যেতে বল। বলেই যেতে পারে—কিন্তু তার সঙ্গে যাবার সময় মুখ শুকনো—এ-সব বুঝল কি করে মায়া! ছেলেমানুষ সে। মিমির অন্য কোনো দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। সেটা কি আমি জানি না। চোখে চোখ পড়লে আজকাল সে কেমন অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মিমির কিছু একটা হয়েছে। কেমন দায়সারা কথাবার্তা সেরে সাইকেলে অদৃশ্য হয়ে গেল সেদিন। চোখের নিচে কালি পড়েছে।

পরদিন দেখি মুকুল হাজির। সে এসেই বলল, প্যানেলে নাম উঠে গেছে। তারপর 'অপরূপা' কাগজের দু'কপি আমার হাতে দিয়ে বলল, মিমি দিয়েছে। আট দশ দিনের মধ্যেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে। কাছে কোথাও কোনো স্কুলে দিতে বলেছে ছোড়দি। বাড়ি থেকেই করতে পারবে।

আজকাল মুকুলকে বাড়ির ছেলে বলেই ধরে নিয়েছে মা বাবা। বাবা বললেন, এখানেই দুপুরে দুটো খেয়ে যেও।

মুকুল রাজী হয়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া সেরে সাইকেলে দু'জনে বের হব। সাধারণত দু'জনে বের হলে, আমাদের মধ্যে আশ্চর্য এক প্রাণের সঞ্চার হয়। আজ মুকুল হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, আমি সকাল থেকেই খুব মনমরা হয়ে আছি। এত বড় একটা সুখবরের পরও আমি রে রে করে উঠতে পারছি না। কোথায় যেন কেবল কুণ্ঠাবোধ করছি। বের হবার মুখে মুকুল সহসা বলল, কি ব্যাপার বল তো, আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ।

—কি জানি, আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার জীবনে যে বড় একটা ঝড় উঠে গেছে মুকুলকে বলতেও পারছি না।

মুকুল বলল, মিমিকেও দেখছি কেমন হয়ে যাচ্ছে। দু-দিন এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গেছে।

—কিছু বলল?

—না তেমন কিছু না! তোমার কিছু হয়েছে কিনা জানতে এসেছিল।

—কিছু হয়েছে মানে!

—এই অসুখ-বিসুখ।

—অ! আর কিছু বলে নি?

—না।

এরপর থাকা গেল না।

বললাম, নাটক করতে যাচ্ছে না!

—না, বাড়িতে ওর কিছু একটা হয়েছে। কোথাও যাচ্ছে না।

ভিতরটা আমার কেমন দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। মুকুলের সঙ্গে সাইকেলে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলে গেলাম। সেখানে একটা পুলের নিচে ফাঁকা মতো জায়গায় দুজনে শুয়ে থাকলাম। মুকুল সারাক্ষণ চৈতালি প্রসঙ্গে কথা বলল । চৈতালি ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে। বাংলায় অনার্স নেবে। সে আমাদের এক বন্ধু মারফৎ একটি কাগজ চৈতালির বাড়িতেও পাঠিয়েছে। খুব সর্তক এই পাঠানোর ব্যাপারে

মুকুল। যেন ও পাঠায় নি, বন্ধুটি হাতে করে নিয়ে গেছে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় আছে সে। কেবল বলল, কি যে হবে!

আমি বললাম, কী আবার হবে, খুশিই হবে!

আসলে আমাদের বয়েসটা এমন যে আমরা শুধু স্বপ্নই দেখতে জানি! কিন্তু সেই স্বপ্নের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। আমাদের জীবনের শুরুটাই ভাল করে হয় নি। অথচ রাজার মতো বেঁচে আছি মনে হয়। যুদ্ধ জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সেই যুদ্ধটা কি কেবল জানি না।

মুকুলকে বললাম, আমার একটু কাজ আছে। যাচ্ছি। মুকুলকে লালদীঘির ধারে ছেড়ে দিয়ে টাউন হলের দিকে চলে গেলাম। মিমিদের বাড়ি সোজা সামনে। মিমিদের বাড়ি আমি এই নিয়ে তৃতীয়বার যাচ্ছি। বাড়িতে ঢুকতেই কেমন অস্বস্তি লাগে। সদর দরজায় দারোয়ান। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। বললাম, মিমি বাড়ি আছে?

—আছে। যান।

মিমিদের বাড়ি মানুষের যাতায়াত একটু বেশিই। সামনেই ফুলের বাগানে সেই কাকাতুয়া পাখিটি আমাকে দেখে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, দিদিমণি, বিলু দাদা। আমি এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনে কাকাতুয়া পাখিটার সামনে দাঁড় করিয়ে মিমি বলেছিল, বিলু দাদা। পাখিটার আশ্চর্য স্মরণশক্তি। কাকাতুয়া পাখি এত সুন্দর কথা বলতে পারে আমি জানতাম না। সামনে বিশাল বারান্দা। বড় বড় থাম। শ্বেত পাথরের টাইল বসানো। উজ্জ্বল আলোতে গোটা বারান্দা ঝকঝক করছে। ভিতরে ঢুকতেই দেখি সিঁড়ির মুখে মিমি। আমার আসার খবর পাখিটার কাছে থেকে পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে যেন ছুঁটে এসেছে। এসেই আমাকে ভিতরের বসার ঘরে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সে তার সব রকমের যুদ্ধ জয় করায় যে অপার শক্তি বহন করে বেড়াচ্ছিল, আমাকে দেখা মাত্র সব তার কে হরণ করে নিয়েছে। একেবারে স্থাণুবৎ। আমি নিচে। সিঁড়ির মুখে রেলিং ভর করে মিমি। দামী মুর্শিদাবাদ সিল্ক পরনে। লাল নীল রঙের লতাপাতা শাড়িতে। মিমি আশ্চর্য এক দেবী মহিমায় প্রকাশিত। কিছু বলছে না। বড় ধীরে ধীরে নেমে আসছে। সন্তর্পণে। এদিক ওদিক হলেই যেন টলে পড়ে যাবে।

মিমি রেলিং ধরে নেমে আসছে। খুব সর্তক পায়ে। আমাকে অপলক দেখছে।

আমিও কেমন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছি। উঠে গিয়ে হাত ধরে নামিয়ে আনলে যেন ভাল হয়। ওর কি কোনো বড় রকমের অসুখ করেছে। এত চঞ্চল ছিল ক'দিন আগে, আর কি হয়ে গেছে!

ধীরে ধীরে কাছে এসে বলল, বোস!

আমার উদ্বেগ সারা চোখে মুখে টের পেয়ে মিমি হাসল। বড় নির্জীব হাসি। বললাম, তোমার কী হয়েছে পরী?

পরী বড় আস্তে বলল, কিছু না। যাক তবু যে এলে। কবে থেকে আশায় আছি তুমি আসবে। সারাদিন বারান্দায় বসে থাকি। রাস্তায় মানুষজন দেখি। তোমাকে দেখতে পাই না। যেন মিমির খুব কষ্ট হচ্ছিল কথাগুলো বলতে।

আমি বললাম, তুমি বোস। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

সে সোফার হাতলে ভর করে বসল।

আমার হঠাৎ কি যেন হল। বললাম, কী হয়েছে তোমার। কী হয়েছে বলবে তো! না ভাল্লাগে না। কিছু বলছে না। কী মেয়ে রে বাবা।

—কিছু হয় নি। সত্যি বলছি কিছু হয়নি। সে এইটুকু বলে সোফায় মাথা এলিয়ে দিল। চোখ ছাদের দিকে। ছাদে ঝোলান ঝাড়লণ্ঠন, বাতাসে রিন রিন করে বাজছে। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র, মিমিদের পূর্বপুরুষদের সব বাঘা বাঘা ছবি। মোটা গোঁফ, মাথায় পাগড়ি। গলায় পাথরের মালা। দামী পোশাকে মানুষগুলো বংশগৌরব রক্ষা করে চলেছে। দেয়ালে ঝুলে থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, তোমার আস্পর্ধার শেষ নেই। ছবিগুলোর দিকে তাকাতে আমার কেন জানি ভয় করছিল। এত বড় প্রাসাদতুল্য বাড়িতে দু-একজন ঠাকুর চাকরের দেখা পাওয়া গেল। ওরা সিঁড়ি ধরে উঠে যাবার সময় আমাকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছে। কালী বাড়ির বাবাঠাকুরের বড় অনুগ্রহভাজন এই তরুণ যুবক। তারা

বোঝে এ-বাড়িতে বাবাঠাকুরের সুবাদে আমার আলাদা মর্যাদা আছে। যাবার সময় দূর থেকেই গড় হয়ে ওরা উঠে যাচ্ছে।

মিমির দাদুকে দেখছি না। আমি যতবার এসেছি, দেখেছি তিনি বসার ঘরে কারো জন্য যেন অপেক্ষা করছেন। সিল্কের পাঞ্জাবি পাট করা ধুতি পরনে, পায়ে রুপোলি কাজ করা চটি। তিনিই ডেকে হেঁকে মিমিকে উপরে খবর পাঠিয়েছেন।

ওর বাবা কাকারা অবশ্য এতটা ডাকাডাকি করেন না। দেখলেই প্রশ্ন কেমন আছ? বাবাঠাকুর কেমন আছেন? আজ কাউকে দেখছি না।

মিমি বলল, কাগজটা দেখলে?

—দেখেছি।

—কভার?

—দেখেছি।

—কভার পছন্দ হয় নি?

—হয়েছে।

—আমি জানি তুমি কী পছন্দ কর। দুটো প্রজাপতি একটা ফুল এঁকেছি এজন্য। কোনো ঝাণ্ডামার্কা ছবি আঁকি নি। তোমার খুব ভয় ছিল ও-রকম ছবি হবে বলে।

—ভয় না। মুশকিল কি জান, আমার বাবা একরকমের, তোমরা একরকমের আবার তুমি আর এক রকমের। আচ্ছা পরী তুমি বিশ্বাস কর, আমরা এ-ভাবে মানুষকে শোষণ থেকে উদ্ধার করতে পারব? আমরা নিজেরা যদি কাজে এবং মননে ঠিক না থাকি—এই বাহ্যিক বিপ্লবের আড়ম্বরে আসল ইস্যুটাই হারিয়ে যাচ্ছে না। মানুষ যদি নিজের ঘর থেকে বিপ্লব শুরু না করে, বাইরের লোক এসে বিশেষ করে তোমাদের মতো মানুষেরা তাদের ভাল ভাল কথা বললেই শুনবে কেন। তাদের সঙ্গে তোমাদের জীবনের কোনো মিলই নেই।

—আজ না হয় এ-সব কথা থাক। আমি তোমাকে জানি অনেক পীড়ন করেছি। আজ আমার সঙ্গে এ-সব বলে শত্রুতা নাই করলে।

এ-সময় মনে হল সিঁড়ি ধরে কেউ আসছে। হাতে ট্রে। চা খাবার উপর থেকে আসছে।

মিমি উঠে গিয়ে ট্রেটা হাতে নিল। সন্তর্পণে টেবিলে রেখে দু-কাপ চা বানাল। একটা আমাকে দিল, মিষ্টির প্লেট, জল দিল। নিজে এক কাপ চা সামনে রেখে বসল। আঁচল দিয়ে গা ঢাকল ভাল করে। শাড়ি টেনে পায়ের পাতা ঢেকে দিল।

মিমির এই বসার ভঙ্গি আমাকে এক আশ্চর্য সুষমার জগতে নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি। ওর দীর্ঘ ঋজু চেহারা, দেবীর মতো চোখ মুখ, তিল ফুলের মতো নাক এবং এলোমেলো চুলের সুঘ্রাণ কোনো এক অলৌকিক মহিমার কথা যেন আমাকে কানে কানে বলছে।

মিমি বলল, খাও।

—আমি কিছু খাব না। তুমি এ-রকম কেন হয়ে গেলে! কেন! কেন! অসুখ করে নি বলছ, হয় মিছে কথা বলছ, নয় এড়িয়ে যাচ্ছ আমাকে।

—তুমি তো আমার কিছুই পছন্দ করতে না বিলু! আমি তো সব ছেড়ে দিয়েছি।

—ছেড়ে দিতে তো বলি নি! তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তবু ভাল হয়ে যাও। আমি তোমার সব মেনে নেব।

—ঠিক বলছ মেনে নেবে?

—হ্যাঁ। আমি অপছন্দ করি বলে, পার্টি, নাটক মিছিল সব তুমি ছেড়ে দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়বে এ আমি কখনও চাই নি। সত্যি বলছি চাই নি।

—কিন্তু আমি যে সব ছেড়ে দিতে চাই। পায়ের নিচে মাটি থাকলে কিছুই ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে না। গাছ তো মাটিতে বেঁচে থাকে। আমার গোড়া উপড়ে নিতে চায় এখন সবাই।

—সবাই মানে।

—মা বাবা কাকা দাদু সবাই।

—তারা তোমার খারাপ করবে কেন!

—করছে।

হঠাৎ যেমন হয় ক্ষেপে যাবার স্বভাব আমার, চিৎকার করে বলে উঠি, কি হয়েছে খুলে বলবে তো!

—আগে কথা দাও।

—কি কথা!

—আমার পায়ের নিচেকার মাটি সবাই সরিয়ে নিলেও তুমি নেবে না।

—সবাই সরিয়ে নিলে, আমি একা কি করতে পারি।

—ওটুকু থাকলেও আমি ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারব।

এসব হেঁয়ালিপূর্ণ কথা আমার মাথায় ঠিক খেলছে না। মিমি কি বলতে চায়। মিমির কি বাসনা? বললাম,পরী প্লিজ, তুমি খুলে বল। খুলে বল কী হয়েছে। না হলে আমি এক্ষুনি চলে যাব।

সহসা পরী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। বলল, বিলু তুমি আমার চরম শত্রু। তুমি কেন এত বড় সর্বনাশ আমার করলে। কেন, কেন। কি করেছি আমি! আমার কি দোষ!

আমি হতবাক। আমি ওর সর্বনাশ করেছি! বড় নিচ মনে হলো নিজেকে। পরীর সম্পর্কে কোথাও তো কোনোদিন কোনো কুৎসা রটনা করেছি আমার মনে পড়ে না। আমার জন্য পরীর জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

আমি কথা বলছি না দেখে, মাথা নিচু করে রেখেছি দেখে পরী ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল। সামনের বেসিনে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা দিল। আঁচলে মুখ মুছে ফের এসে বসল। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমাদের দুজনের কারোরই মনে নেই সামনে চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। আমরা কেমন দুজনেই অতলে ডুবে যাচ্ছিলাম। বিশেষ করে আমি। কিছু বলারও সাহস পাচ্ছি না। পরীর সর্বনাশ করতে আমি কোনো দিন চাই নি। পরীকে কেউ নিন্দা করলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত। সেই পরী আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

উঠে পড়ে বললাম, জেনে শুনে কোনো সর্বনাশ আমি তোমার করি নি। না জেনে করলে ক্ষমা করে দিও।

সহসা মিমি তার শীর্ণ হাত বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরল। কি ঠাণ্ডা হাত! কিছু বলছে না। আমারও মনে হল বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গেছি। নড়তে পারছি না। শরীর অবশ হয়ে আসছে। বসে পড়লাম। মিমি অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় বলল, তুমি চাকরিটা নিচ্ছ!

—না নিলে কি উপায়!

—পড়াশোনা বন্ধ করে দিচ্ছ?

—আপাতত তাই।

আর এ সময়েই দেখলাম মিমির দাদু সিঁড়ি ধরে নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই যেন তিনি স্বর্গ হাতের কাছে পেয়ে গেছেন। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তিনি কাছে চলে এসে বললেন, কখন এসেছ?

—এই খানিকক্ষণ।

—ভাল হয়েছে। তুমি মিমিকে একটু বুঝিয়ে যাও তো—ও তোমার কথা শোনে। পরেশ চন্দ্রকে চেন! আরে আমাদের সদরের এস ডি ও। পাকা কথা দিতে পারছি না। বড় অশান্তি চলছে। ঝড়। দেখেছ তো কী চেহারা করেছে। অথচ পরেশের বাবার খুব আগ্রহ—এমন সুপাত্র কেউ হাতছাড়া করে! তুমি বল।

—করা উচিত নয়।

সহসা মিমি সাপের মতো ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। গেট আউট। আই সে গেট আউট। তুমি কে আমার। উচিত অনুচিত তুমি ঠিক করবে।

দাদু সহসা খুবই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন, ছি! মিমি কী হচ্ছে! তুই এটা কী বলছিস বিলুকে?

মিমি আবার ভেঙে পড়ল, দাদু তুমি জান না, ও আমার কত বড় শত্রু, দাদু তুমি জান না, ওর শত্রুতার শেষ নেই। তারপর সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে গেল। মুখে আঁচল চেপে সে তার হাহাকার কান্না সমালাচ্ছে।

আমি এ সময় কি করব বুঝতে পারছি না। আমরা দুজনেই ধরা পড়ে গেছি। মাথা নিচু করে বসে ছিলাম। উঠে যে বের হয়ে যাব সে সাহসও নেই, শক্তিও নেই।

কেমন ঘাবড়ে গেছি খুব। মিমির দাদু এখন কী বুঝলেন কে জানে! পাশে বসে বললেন, ও কি! চা খাবার কিছু খেলে না।

—খাচ্ছি।

তিনি হাসলেন, নরেশ, ও নরেশ।

যেন সবাই উৎকর্ণ হয়ে থাকে—নরেশ হাঁক শুনেই নেমে আসছে।

—আর এক কাপ চা দে বিলুকে।

আমি বললাম, থাক। চা খাব না।

—তবে মিষ্টিগুলো খাও।

তারপরই তিনি বললেন, ওর কোনো ইচ্ছেই আমরা অপূর্ণ রাখি নি বিলু। কিন্তু মেয়েদের একটা বয়েস থাকে, যখন সব মানিয়ে যায়। পরে আর মানায় না। ও কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। বাবাঠাকুরও বলেছেন, রাজযোটক। হাতছাড়া করবি না। কী ফ্যাসাদে পড়েছি বল। পরেশের দেবদ্বিজে ভক্তি প্রবল। বাবাঠাকুরের কাছে মাঝে মাঝে চলে যায়। তারপর কি ভাবলেন, তুমি তো জান বিলু আমরা সব অবহেলা করতে পারি কিন্তু বাবাঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। বাড়ির সব কাজে তাঁর অনুমতি না হলে চলে না।

আমি শুধু বললাম, যাই।

—না যাবে না। বোস। তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

আসলে এই মানুষটি কালীবাড়িতে দেখেছেন, কথায় কথায় বাবাঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন, নে তুই আমার পাশে বোস। বই খুলে রাখ। ভুল হলে ধরিয়ে দিবি। বাবাঠাকুরের ভুল ধরিয়ে দিতে আমিই পারি, কারণ বাবাঠাকুর হয়ত আমাকে খুব অনাথ ভেবেছিলেন। আমার বিষণ্ণতা বাবাঠাকুরের মধ্যে কোনো অপত্য স্নেহেরও জন্ম দিতে পারে— যে কারণেই হোক মন্দিরে একমাত্র থানের ফুল বেলপাতা আমিই তুলে সবার হাতে দিতে পারতাম। আর কাউকে তিনি মন্দিরে ঢুকতে দেন না। অবশ্য বদরিদা এবং বৌদি ঢুকতে পারে। এ-সব পরীর দাদু জানেন বলেই হয়ত আমার পরামর্শ এই পরিবারে এত বেশি দরকার।

অথচ আমি বুঝতেই পারছি না—সংকট শুধু তো এ-পরিবারের নয়। আমারও।

কাজেই বলতেও পারলাম না, আমি ছেলেমানুষ—এত বড় সংকটে আমার পরামর্শে কী আসে যায়।

তবু বসে আছি। উঠতে পারছি না।

তিনি বললেন, তুমি মিমিকে বুঝিয়ে বল। এখন বলে লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা হোক। পরে বলবে। কবে আবার আসছ?

—দেখি।

—দেখি না, আমি ভেবেছিলাম নিজেই যাব। কিন্তু মিমির এক কথা। গিয়ে দেখ না! বিলু ওদের বাড়ি আমাদের যাওয়া পছন্দ করে না। গেলে খারাপ হবে বলে শাসিয়েছে। তুমি কাল সকালে আসবে। আসছ তো!

আমার কী হল কে জানে, বললাম, দাঁড়ান, আমি এখনই কথা বলছি।

দাদুর মুখটি কেমন শুকিয়ে গেল। এত বড় মানুষ, দাপট যাঁর সারা শহরে, সেই মানুষ মিমি সম্পর্কে এত দুর্বল এই প্রথম টের পেলাম।

তিনি বললেন, তোমাকে আবার অপমান করতে পারে।

বলার ইচ্ছে হল, অপমান আমার গা-সওয়া। দেশ ভাগের পর থেকেই নানাভাবে মান-অপমানে

জ্বলছি। মিমি আমাকে আর কি অপমান করবে! ওর অপমান অমার কাছে কত মধুর যে এখন এই বুড়ো মানুষটিকে বোঝাই কী করে।

মিমির দাদু উপরে উঠে গেলেন।

মিমি আবার নেমে আসছে।

আমি হেসে ফেললাম। বড় অভিমানী বালিকা। মুখ থমথম করছে।

বললাম, বোস।

মিমি বসল।

—আমি মাস্টারি করি তুমি চাও না।

মিমি চুপ করে থাকল।

—মানুষ এতে ছোট হয়ে যায় না।

কেমন বালিকার মতো মিমি বলল, তুমি তাহলে যে আর পড়াশোনা করতে পারবে না। তুমি জান না বিলু তুমি কি—তুমি জান না, জানলে পেটি একটা মাস্টারি করতে যেতে না।

—মাথা ঠাণ্ডা করে ভাব। তুমি তো জান আমার বাড়ির অবস্থা।

—জানি।

—চাকরিটা অভাবের সংসারে পড়ার চেয়ে বেশি দরকার। আচ্ছা তুমি বুঝছ না কেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষ কী না করতে পারে।

—তা পারে।

—তবে।

মিমি এবার আমার দিকে তাকাল। বড় শান্ত চোখ। বলল, পারবে?

—পারতেই হবে। আমার স্বপ্নই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আগুন যখন জ্বালিয়ে দিয়েছ, দেখ না সে কতটা জ্বলতে পারে। সামান্য একটা চাকরি করলেই আমার ভেতরের আগুন নিভে যাবে তোমাকে কে বলল! অবোধ বালিকার মতো এ-সব ভাবলেই বা কী করে।

হঠাৎ মিমির চোখ কোমল হয়ে গেল। আমার হাত ধরে বলল, বিলু আমি যে তোমার আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালবাসি। আমার মরণ হল না কেন। তুমি যদি ছোট হয়ে যাও, সরু গলিতে ঢুকে পড় সেখান থেকে আমি তোমাকে কী করে বের করে আনব?

—সরু গলি তো শেষ পর্যন্ত বড় সড়কে গিয়ে মেশে।

পরী আজ এই যেন প্রথম বুঝতে পারল, আমি তার চেয়ে পৃথিবীর এই গাছপালা, মাঠ, নদী এবং বড় সড়কের কথা বেশি জানি। শুধু বলল, তুমি যা ভাল বোঝ কর। আমার কিছু বলার নেই। তারপরই পরী বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বলল, দাদুর কাছে কিছু শুনলে?

—শুনেছি।

—কী করব বলে যাও।

আমি বললাম, একবার বাবাঠাকুরের কাছে আমাকে যেতে হবে আর কি। আমি জানি তিনি সাধক মানুষ। তিনি রাজযোটক বলতেই পারেন। কিন্তু তোমার যে অমত আছে তা তো তিনি জানেন না। শুধু বাবাঠাকুরকে এই খবরটাই দিতে হবে। ভেবো না।

আর সঙ্গে সঙ্গে পরী সত্যি যেন অবোধ বালিকা হয়ে গেল। আমাকে জড়িয়ে ধরল, বিলু, আমি তোমার পায়ে পড়ব। দোহাই তুমি আমাকে রক্ষা কর।

সেবারে মিমি গোটা পরিবারটিকে সংকট থেকে ত্রাণ করার জন্য আমার পা ছুঁয়েছিল অনিচ্ছায়। এবং তারই হেতুতে আমি প্রথমে মিমির কাছে মজার বিষয় হয়ে গেছিলাম। ফাঁক পেলে মিমি আমাকে আড়ালে আবডালে হেনস্থা করেছে। আজ সে নিজের ইচ্ছায় পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

বললাম, উঠি মিমি। মাথা খারাপ কর না। আমি আছি।

মিমি বলল, তুমি আছ বলেই আমি বেঁচে থাকব। তুমি আছ বলেই আমি আর নষ্ট হয়ে যেতে পারব না। তারপর মিমি আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল। বলল, শুনবে না?

—কী শুনব?

—সেই কবিতাটা। 'জীবন বড় দুরন্ত বালকের হাতছানি।'

—এখন!

মিমি চোখ নামিয়ে নিল। আমি বুঝি, আমার কবিতা পাঠে সে কোথাও মুক্তির স্বাদ খোঁজে । কেন জানি মনে হল আজ সারাক্ষণ পরীর পাশে বসে থাকি। পরীকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মনের সঙ্গে আমার কথার এতটুকু যে মিল থাকে না মিমিই বোধ হয় সেটা সবার আগে টের পায়। বললাম, বল। শুনি।

পরী প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে আমার কবিতা আবৃত্তি করে গেল— যতদূর যাই অগাধ স্বার্থপরতা/যত দূরেই যাক, একদিন থাকে না তার কোলাহল/ সে হয় অবনত বৃক্ষ মৃত্যু তীক্ষ্ণ সুধা/ফুল যদি ফোটে, ফুটে থাকে আমার ঈশ্বর/ শেষ বিকেলে সে যদি হেঁটে যায়—আমার প্রতিমা/প্রতিমার মতো দুই হাতে থাকে তার করবদ্ধ অঞ্জলি/ আমার সব অপমান মিছে/ সে আছে বলেই বেঁচে থাকি, বাঁচি/ জীবন বড় এক দুরন্ত বালকের হাতছানি।

মিমি এবার চোখ খুলে আমাকে দেখল। উদ্ভাসিত চোখ। কুয়াশার জলে ধোয়া মুখ। সব বিবর্ণতা যেন নিমেষে কেটে গেছে। বললাম, বাবা ঠিকই বলেন।

পরী বলে, কী বলেন?

—ও মিমি হবে কেন, ও তো মৃণ্ময়ী। বাবা তোমাকে পরী বললে রাগ করেন। মিমি বললেও।

পরী আর কোনো কথা বলল না, শুধু বের হবার সময় বলল, সাবধানে যেও।

আমি বের হয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম। সাইকেলে চলে যাচ্ছি। পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাব, পরী বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে আমাকে লক্ষ্য রাখছে। পৃথিবীটা যেন অন্যভাবে আজ আমার সামনে হাজির। সরু রাস্তাটা বড় সড়কে কোথায় গিয়ে পড়েছে আমাকে তা আজ থেকে পরীর জন্য যেন খুঁজে বার করতেই হবে।

চার পাশের আলো ঘরবাড়ি পাকা সড়ক ধরে গাছপালার ছায়ায় চলে যাচ্ছি। যাচ্ছি, না বার বার ফিরে আসছি! কার কাছে! পরীর কাছে! যত দূরেই যাই সে যেন টানে। পরীর উপর দিয়ে বড় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেই ঝড় থেকে শেষ পর্যন্ত যদি তার আত্মরক্ষা না করতে পারি! নিজেকে খুব অসহায় লাগছে। শহর পার হয়ে গুমটি ঘরের কাছে আসতেই গভীর অন্ধকার। রেল-লাইন পার হয়ে পঞ্চানন তলার মাঠে আমি। মাথার উপর আকাশ আর অজস্র নক্ষত্র। ধরণী শান্ত। শস্যক্ষেত্রে আবাদের শুরু। কোথাও কীটপতঙ্গের আওয়াজ। জীবনে পরী না থাকলে আমি কত নিঃস্ব এই প্রথম টের পেলাম। এবং পরীর জন্য আশ্চর্য আবেগে ভেসে গেলাম। নিজের জন্য কেউ এ-ভাবে কাঁদে আগে জানতাম না। আমার চোখ পরীর কথা ভেবে জলে কেন যে ভেসে যাচ্ছিল।

নয়

বৃষ্টি বাদলার দিনে বাড়িঘরের চেহারা কেমন পালটে যায়। কদিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট ভেসে গেছে। বাড়ির সামনে এক চিলতে খাল। কবে এখানকার স্থানীয় মহারাজ—এই অঞ্চলে আখের চাষ করবেন বলে এই খাল কাটিয়েছিলেন, মহারাজদের খেয়াল—কে কী বোঝায়, আর তাতেই লেগে পড়া। দু-এক বছর চাষ আবাদে বানের জলের মতো টাকা কামাবার ধান্দা। তিনি চাষবাস বন্ধ করে দিতেই জায়গাটা ঝোপ জঙ্গল, বাঁশের বন, এবং বলতে গেলে ঘোর অরণ্য—এমন একটা অঞ্চলেই আমার বাবা জলের দরে জমি পেয়ে এখন বলতে গেলে থিতু হয়ে বসেছেন। প্রাইমারী স্কুলে চাকরি হয়ে যাওয়ায় বাবার অভাব অনটনও আর সেভাবে নেই। মোটামুটি আমরা ভালই আছি।

কেবল মা'র আপসোস আমার আর পড়াশোনা হল না। আর দুটো বছর পড়তে পারলেই গ্র্যাজুয়েট হওয়া যেত। ছিন্নমূল পরিবারের পক্ষে এটা যে কত বড় মর্যাদার প্রশ্ন বাবা বুঝলেন না। আমারও গোঁয়ার্তুমি কম নয়। পড়ার চেয়ে চাকরিটাই বেশি। মাঝে একদিন পরী এসে ক্ষোভে দুঃখে যা মুখে আসে বলে গেছে!

পরী বলে গেছে, আসলে মাসিমা ওর জেদ। মেসোমশাইকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কত করে বোঝালাম, আর তো দুটো বছর, তর সইল না। চাকরি না হলে ওর অন্ন জুটবে না। অন্নই সার বুঝেছে। আসলে আমি বুঝি পরী মনে প্রাণে চায় না, আমি একটা প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করি। এই নিয়ে পরীর সঙ্গে পরে আবার কথা কাটাকাটি হয়েছে। দেখাশোনা বন্ধ হয়েছে। অবশ্য আমার দিক থেকে সাড়া না পেলে, সে বোধহয় স্থির থাকতে পারত না। বেহায়ার মতো সাইকেলে চলে এসেছে শহর থেকে। একটা কলোনিতে আমরা আছি। পরী এই কলোনিতে কেন বার বার আসে লোকের বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য সবাই বোঝে—ও বড় লোকের ঝি। কতরকমের খেয়াল—আমার মতো একটা খেলনা পেয়ে পরীর সাময়িক মতিভ্রম হয়েছে। বয়স বাড়লে কেটে যাবে। আমারও বিশ্বাস তাই। পরীকে পাত্তা না দেওয়াটা আবার কেমন একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ইদানীং।

সকালবেলায় বাবা পাটের জমি থেকে উঠে এসে বললেন, তুমি একবার পরীদের বাড়ি যাবে। পরীর ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা, বললেন, বিলুকে আসতে বলবেন, বড় বিপাকে পড়েছি।

বিপাকে পড়ারই কথা। রায়বাহাদুরের একমাত্র নাতনি, আদরে আদরে মাথাটি গেছে। একসঙ্গে কলেজে পড়ার সময় সেটা ক্রমে বুঝেছি। বিপাক থেকে আমিই এত বড় সম্ভ্রান্ত বংশকে রক্ষা করতে পারি তিনি জানেন। কিন্তু সেদিন যেভাবে পরী তাদের বিশাল বৈঠকখানা ঘরে সহসা চিৎকার করে উঠেছিল, তাতে পরীর দাদুর ঘাবড়ে যাবারই কথা!

বাবা পাটের জমি থেকে উঠে এসেছেন তবে এই কারণে। আমাকে খবরটা দেবার জন্য।

স্কুলে বের হব। স্নান সারা। বারান্দায় মায়া আসন পেতে দিচ্ছে। আসনে বসে গণ্ডুষ করার সময় বললাম, কোথায় দেখা হল?

—কাদাইয়ে। মানুর বাসা থেকে বের হচ্ছি। দেখি গাড়ি থেকে তিনি নামছেন।

—তোমাকে দেখে নামলেন!

—তাই তো মনে হল!

—চিনলেন কী করে!

—কেন ওদের অন্নপূর্ণা পূজায় সেবারে গেলাম না।

আমি ভুলে গেছি। পরীই সবাইকে দাদুর হয়ে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। আমার বারণ ছিল, না, না যাবে না। তোমরা কিছুতেই যাবে না।

বাবার এক কথা—দেবদেবী নিয়ে তিনি খেলা করতে পারেন না। পিলু বলেছিল, দাদাটা যে কী! পরীদি কত করে বলে গেছে!

মা'র কথা, সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল আছে না!

সুতরাং সবাই গেলেও আমি যাইনি। পরী আমার বাবা-মাকে তাদের বৈভব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে অন্নপূর্ণার পূজা একটা অজুহাত। এসব কারণে পরীর উপর আমার যত ক্ষোভ। বাবা হাঁটুর উপর কাপড় পরেন। পায়ে জুতো পরেন না। বিশাল টিকি রেখেছেন। তাতে আমাদের গৃহদেবতার পূজা শেষে লাল জবা বেঁধে দেন। সবই করা সংসারে অশুভ প্রভাব যাতে পড়তে না পারে। মা'র ভাল একখানা শাড়ি নেই। পিলুর জামা প্যান্ট ক্ষারে কাচা। সুতরাং বাবা তার লটবহর নিয়ে অন্নপূর্ণার প্রসাদ নিতে গেলে, বিলুর মান-সম্মান কতটা পরীদের বাড়ি বজায় থাকে, বাবা যদি বুঝতেন।

—কী বলল!

মুসুরির ডাল দিয়ে ভাত মাখছি। বৃষ্টি ধরে এসেছে। দুটো গরম কুমড়ো ফুলের বড়া মা খুন্তিতে তুলে দিয়ে গেল। গ্রাস তুলব মুখে—বাবা বললেন, তোমার কথা জিগ্যেস করল।

—আমার কথা!

—হ্যাঁ, বলল, তুমি সত্যি সত্যি প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারিটা করছ কিনা! বাবা কলকেয় টিকে গুঁজে দুবার গুড়ক গুড়ক টানলেন। বাবার কথা এরকমেরই। বিশেষ করে তামাক খাবার সময় বাক্য অসমাপ্ত রেখেই মনোযোগ সহকারে হুঁকায় নিমগ্ন হওয়া—দেখলে মনে হবে আর তাঁর কথা নেই, উঠে পড়া যাক—তখনই আবার কথা শুরু—বললাম, ঈশ্বরের কৃপায় বিলুর কাজটা হয়েছে। বললাম আশীর্বাদ

করবেন, সুনামের সঙ্গে যেন কাজটা করতে পারে। সরকার মাইনে দিচ্ছে, একরকমের সরকারি কাজই বলতে পারেন।

বাবার সঙ্গে কেন যে রায়বাহাদুরের দেখা হয়ে যায়। এটাও যেন একটা কাকতালীয় ব্যাপার। বলার ইচ্ছে হল, শুনে বোধহয় তিনি খুবই প্রীত হলেন। কত বড় সরকারি কাজ, প্রীত হবারই কথা। কিন্তু আমার কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না। কলেজ ছেড়েছি বলে, পরীর জ্বালা আছে। পরীর এই জ্বালাই যেন আমার মধ্যে জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে—আমি তোমার গোলাম! তোমার পছন্দমতো আমি সব করব! আমরা কত গরিব তোমরা বোঝ না! চাকরিটা হাতছাড়া হলে আবার কবে চাকরি পাব ঠিক আছে! পড়াশোনায় আমার নম্বরও খুব ভাল নয়। পাশ করে যাচ্ছি কোনরকমে। তাই এর চেয়ে আর কী ভাল চাকরি হতে পারে! আমি যা তাই। চাকরি করব, কলেজ যাব না। দেখি তুমি কী করতে পার! তুমি অর্নাস নিয়ে পড়বে। জেলার সেরা ছাত্রী, জলপানি পেয়েছ, পড়াশোনা তোমাকে সাজে। সেদিন পরীর খোঁজ করতে গিয়ে এ-সবই ছিল দু-পক্ষের মধ্যে বিতর্কের বিষয়। এবং আরও বড় বিষয় যেটা, সেটাই বেশি আমাকে ভাবাচ্ছে। পরীর বাবা কাকারা সম্বন্ধ ঠিক করছে এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে। পরীর চেয়ে সাত আট কি দশও হতে পারে বড়। পরী রাজি হচ্ছে না। পরীদের সংসারে এই নিয়ে অশান্তি। নিজের উপরই ক্ষোভ হয়, কেন যে ওদের অশান্তিতে আমাকে জড়াচ্ছে!

আমি বললাম, পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন, আমার সময় হবে না!

বাবা আমার ঔদ্ধত্যে অবাক হয়ে গেলেন! —কী বলছে বিলু। কত বড় মানী মানুষ। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—সোজা কথা। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রোজই তো বিকেলে শহরে যাও। মৃন্ময়ীদের বাড়ি যেতে তোমার এত আপত্তি কেন?

আপত্তি কেন বোঝাই কী করে!

বাবা তো জানেন না, সেদিন পরী আমাকে কী বলেছে! জানলে বাবারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

আমি বাবাকে এড়িয়ে যাবার জন্য মিছে কথা বললাম, পরী পছন্দ করে না।

বাবা হুকোটা বেড়ায় ঝুলিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, মৃন্ময়ী তো এমন স্বভাবের মেয়ে নয়। সে যা ভাল বোঝ করবে। বাবা কী বুঝলেন কে জানে। উঠোনে নেমে পাটের জমির দিকে রওনা হলেন। পাট কাটা হচ্ছে। কাছে না থাকলে জনমজুর দিয়ে কাজ করানো যায় না। কাজেই বাবা রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলে, জামা প্যাণ্ট পরে সাইকেলে চেপে বসলাম।

পরীর এখন এক কথা, দুটো তো বছর। এতদিন চলেছে, দুটো বছর চলবে না। না হয় আর একটু কষ্ট করবে সবাই।

আমি বলেছি, না। তা হয় না কষ্টের সীমা আছে।

—তাহলে ঠিকই করে ফেলেছ পড়া ছেড়ে দেবে! আমার কথা রাখবে না।

—ঠিক করে ফেলেছি!

তারপর আমরা দু'জনই চুপচাপ। অন্যদিকে আমি তাকিয়েছিলাম। পরীর এক কথা, তুমি পড়া ছেড়ে দিলে আমার কোনো সম্বল থাকবে না বিলু। আমি ভারী একা হয়ে যাব।

আমি হাঁ! বলে কী! শুনে বলেছিলাম, প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি তোমার অপছন্দ বুঝি। তোমার পছন্দ নিয়ে আমার ভাবলে চলবে না পরী। আমার নিজেরও পছন্দ-অপছন্দ আছে। একা হয়ে গেলেও কিছু করার নেই।

সহসা পরী সেদিন কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল, তোমাকে দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না। তোমার কোনো স্বপ্ন নেই। স্বপ্ন না থাকলে বড় হওয়া যায় না। সব তোমার মরে যাবে। তারপরই উঠে চলে গিয়েছিল। আবার কী ভেবে ফিরে এসে বলল, স্বপ্ন না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। তুমি কী সেটা বোঝ!

আমি বলেছিলাম, বুঝে দরকার নেই। অনেক বোঝা হয়ে গেছে। মাথায় কবিতা ঢুকিয়ে জীবনটাকে আমার জগাখিচুড়ি কেন বানাতে চাও বুঝি না! ও করে কিচ্ছু হয় না। আমার তো নয়ই।

আসলে সবই জেদের বশে বলা। ও যদি আমার চাকরিটাকে এত অপছন্দ না করত আমি হয়তো,

এসব বলতাম না। কবিতা লেখার মধ্যে যে আশ্চর্য মুক্তি আছে—একটা ভাল কবিতা লিখতে পারলে মনে হয় আমি রাজার মত বেঁচে আছি—পরীই আমাকে কবিতার পোকা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং আমার কবিতা নিয়ে ওর গর্বের শেষ নেই—সুতরাং বুঝতে পারি পরীকে একমাত্র মোক্ষম আঘাত হানতে পারি শুধু কবিতাকে অপমান করে। আমি তাই করেছিলাম। —দেখ পরী যাকে যা সাজে। আমাকে সাজে না। কবিতা তো নয়ই।

সাইকেলে যাচ্ছি, আর ভাবছি।

সাইকেলে চাপলেই আমি কেমন যেন এক ঘোড়সওয়ার মানুষ। দ্রুত গাছপালা, মাঠ পার হয়ে যাওয়ার মধ্যে আশ্চর্য এক আনন্দ আছে। এখন কেমন লাগছে! কোনো আনন্দ নেই। ভিতরে ভিতরে আমিও ঠিক নেই। আড্ডায় কথাবার্তা কম। পরীদের বাড়ির সেই ঘটনার পর কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না। অপরূপা কাগজ বের হবে কি হবে না তা নিয়ে গরজ নেই। এবং বাড়িতে থাকলেই আমার মাথা গরম থাকে, মা'র এমন অভিযোগ। সাইকেলে উঠলে সেটা থাকে না।

পরীর দাদু উপরে উঠে ফের পরীকে নিচে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাবার সময় বলেছিলেন, তুমি একটু বোস বিলু।

পরী ধীরে ধীরে নেমে এসে আমার সামনে বসেছিল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুমি পার বিলু।

—কী পারি?

—পরেশচন্দ্র এঁটুলির মত লেগে আছে।

পরী নিজের স্বভাবদোষেই মরেছে। তোর কী দরকার ছিল এস ডি ও সাহেবকে আশকারা দেবার। না দিলে সে এত পাগল হয় কী করে—পরেশচন্দ্র তার বাবা-মাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে—ঘন ঘন যাতায়াত। এমন সুপাত্র পরীর দাদুই বা হাতছাড়া করে কী করে। কেন জানি মনে হয় পরীর আশকারা না থাকলে পরেশচন্দ্র এত পাগল হত না। নিজের দোষে নিজে মরেছে, আমি কেন তার সঙ্গে মরতে যাব!

বলেছিলাম, দোষ তোমার।

—মানছি সব দোষ আমার। আচ্ছা বিলু মানুষ ভুল করে না? আমি কী জানতাম এটা এতদূর গড়াবে। বন্ধুর মতো মিশলে কী দোষের।

—দোষের-অদোষের বলছি না।

—তবে কী বলছ?

বলেছিলাম, পরেশচন্দ্র খারাপ কী! তোমার এত অমতের কী থাকতে পারে বুঝি না। বিয়ে হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

পরী ফোঁস করে উঠেছিল, আমি যা বলছি পারবে কিনা বল। অত কথা আমি শুনতে চাই না। তোমরা আমাকে জান না। আমি সব করতে পারি। বিয়ে হলে ঠিক হবে কি বেঠিক হবে সেটা আমি বুঝব।

বলে কী! আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়ে বলেছিলাম, আমাকে কী করতে বলছ।

পরীকে এতদিন দেখে বুঝেছি, সে সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে নয়। পরীদের সংসারে ঝড় উঠেছে, পরীর বাইরে ঘোরাঘুরি আর বাপ-কাকারা পছন্দ করছেন না, কারণ পরেশচন্দ্রের ইচ্ছে নয়, পরী মিছিল করে, পরী ইউনিয়ন করে, পরী অপরূপা কাগজ করে। পরী এখন ঘরে থাকবে—যেমন দশটা মেয়ে বিয়ের আগে কোথাও বের হয় না, পরীও সে-ভাবে থাকবে, পরেশচন্দ্র এমন চায়।

পরেশচন্দ্রের সবই ভাল। জাঁদরেল মানুষ। অল্প বয়সে কত বড় দায়িত্বশীল কাজ করছেন সরকারের। মাথায় কবিতার পোকা না থাকলে পরেশচন্দ্রের মতো ব্যক্তি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা জায়গায় পরেশচন্দ্র হেরে বসে আছে—সে সেটা জানে না। জানে না বলেই পরীর মতো মেয়েকেও জীবনে আর দশটা বিষয়ের মতো অর্জন করা যায় ভেবে ফেলেছে।

আমি বলেছিলাম, আমাকে কী করতে হবে বল। যদিও আমি জানি পরী দুম করে এমন কথা বলতে পারে যাতে আমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে আসতে পারে। কিন্তু পরীর কাতর মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, জীবনে সে এত বড় সর্বনাশের মুখোমুখি কখনও হয়নি। আমার তো ধারণা ছিল, পরী এস ডি ও সাহেবের জিপে যখন ঘুরে বেড়ায়—কোথাও কিছু একটা কিন্তু আছে। আছে বলেই পরীর প্রতি সংশয়। আমি সহজে তাকে কোনো আশকারা দিতে রাজি না।

পরী মাথা নিচু করে বসেছিল। কিছু বলছিল না।

—বল।

—রাখার মতো হলে রাখব।

—তুমি একবার বাবাঠাকুরের কাছে যদি যাও। সেই এক কথা!

কিছুটা স্বস্তিবোধ করেছিলাম। ভাগ্যিস বলেনি, আমাকে নিয়ে পালাও। কারণ পরী পারে না এমন কাজ নেই। বলেছিলাম, কেন?

—তুমি তো জান বাবাঠাকুর পারেন—

আরে এ যে দেখছি আমি নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি। আসলে আমি নিরুপায়। যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না। পরীকে কেন যে কথা দিতে গেলাম। এখন বুঝতে পারছি, বিষয়টা খুব সহজ নয়। কতদিন হয়ে গেল কালীবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। বাবার অভিযোগ, মার অভিযোগ, তুমি একবার গেলে না। তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে, খবরটা দিতে হয়। তোমার বদরিদা, বউদি, বাবাঠাকুর কত খুশি হতেন।

সত্যি যাওয়া দরকার। সেবাইত বদরিদা, আর বউদির মতো মানুষ হয় না। আমার পড়াশোনার খরচ তিনিই দিতেন। থাকা খাওয়া সব। এবং প্রায় বাড়ির আর একজন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যে একটা বেইমান বাস করে টের পাই। তোমার হাত ধরে বলছি, তুমি যাও। বাবাঠাকুরকে তুমি বললে বুঝবেন। বলবে, মৃন্ময়ীর ইচ্ছে নয় এখন বিয়ে করে। পড়াশোনা করছে। বাবাঠাকুর তো পড়াশোনা পছন্দ করেন। আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, তোর হবে।

পরীর কাতর মুখ দেখে কথা দিয়ে এসেছিলাম, যাব। বাবাঠাকুরকে বুঝিয়ে যে করেই হোক পরীর গলার কাঁটা তুলে ফেলতে হবে।

—কথা দিচ্ছ।

না পরীর দিকে তাকানো যায় না। কার আশায় এই সজল চোখ। প্রাইমারী ইস্কুলের একজন মাস্টারকে নিয়ে তার কোনো স্বপ্ন থাকতে পারে না। ভাল লাগা আর ভালবাসা দুটো তো এক নয়। আমাকে তার ভাল লাগতে পারে—এ পর্যন্ত। এর বেশি নয়। কথা দিয়ে এসেছি, যাব।

সেই যাওয়াটা আজও হয়নি। কী যে করি।

সাইকেল থেকে নেমে ইস্কুলের মাঠে হেঁটে যাচ্ছি। পাশে মসজিদ, মসজিদ সংলগ্ন মাটির দেওয়াল ঘেরা লম্বা চালাঘর। ছোট ছোট সব বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে। সামনে বড় সড়ক। দু-পাশেই বাড়িঘর। গরিব মুসলমান মানুষজন চারপাশে। স্কুলের হেড স্যার জাহির সাহেব। চালাঘরের দরজা নেই। টেবিল চেয়ার রাখার জন্য শেষ দিকটায় একটা ঘরের দরজার বন্দোবস্ত হয়েছে। স্কুল ছুটি হলে সব ঘর থেকে টেবিল বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ড ও ঘরটায় নিয়ে গিয়ে তুলে রাখা হয়। ইস্কুলের খাতাপত্র জাহির সাহেবের বাড়িতে থাকে। আমাকে নিয়ে পাঁচজন শিক্ষক। জাহির সাহেব লুঙ্গি পরেন। মাথায় দেন ফেজ টুপি। লম্বা আলখাল্লার মতো পাঞ্জাবি গায়ে দেন। পায়ে জুতো পরেন না। তিনি চাবি নিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদের পাশে আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তখন মাঠে ছোটাছুটি করে। দৌড়ে বেড়ায়। তাদের নতুন মাস্টার গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পেরেই দু-একজন দৌড় লাগাল। জাহির সাহেবের বাড়ি কিছু জমি পার হয়ে গাছপালা ঘেরা গাঁয়ের মধ্যে। এত কাছে বাড়ি অথচ একদিনও বলেন নি, চলুন বাড়ি। একটু বসবেন। কাউকেই বলেন না। ওরা দু'একজন কেন ছুটছে বুঝতে পারছি। আমার ঘড়ি নেই, থাকার কথাও নয়। মিলের ভোঁ শুনে আমরা সময় ঠিক করি। দশটায় ভোঁ পড়ে। ওই শুনে চানে যাওয়া, খেতে

বসা। তারপর সাইকেল চালিয়ে আসা। এগারটা বেজে যাবার কথা। রোজই দেখি, দেরি হয়ে গেছে ভেবে যতই দ্রুত সাইকেল চালাই না কেন, স্কুলের দরজা তখনও বন্ধ।

যারা ছুটে গিয়েছিল, তারাই আবার ফিরে আসছে। এসেই তালা খুলছে। ওরা বুঝতে পারে তালা খুললেই, আমি সাইকেল ঘরে তুলে ফেলব। আমি দাঁড়িয়ে থাকলে ওদের দৌড়ঝাঁপ করতে অসুবিধা হয় বুঝি। সেজন্য কিনা, এটা প্রায় রোজকার ঘটনা, সময়মত ইস্কুলের দরজা খোলা হয় না। আমি বুঝতে পারি, জাহির সাহেবই হোক আর কল্যাণ, বসিরুদ্দিন যেই হোক—ইস্কুলের কাজটা ফাউ। জোতজমি ঘরবাড়ির আর দশটা কাজ সেরে, একটু সময় করে ইস্কুলে এসে কিছুক্ষণ দয়া করে থেকে যাওয়া। আমার এত তাড়াতাড়ি আসাটা জাহির সাহেবের খুব একটা পছন্দ নয়। কিছু বলতে পারেন না, খোদ একজন স্কুল ইন্সপেক্টর আমার এই চাকরির মূলে। এমনিতে সমীহ করেন। আগেকার কালের গুরু ট্রেনিং পাশ। স্কুলের গোড়ার দিক থেকে আছেন। গাঁয়ের মান্যগণ্য মানুষ।

স্কুল করে ফিরতে তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে। এসে ভাত খেয়ে নিজের ঘরে খানিকক্ষণ লম্বা হয়ে শুয়ে থাকি। চাকরিটা হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে আমার ওজন আরও বেড়ে গেছে। আগের মত আর পিলু যখন-তখন ঘরে ঢুকে ষাঁড়ের মতো কাউকে ডাকাডাকি করে না। সে ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে ফিরে খুব সন্তর্পণে বইখাতা টেবিলে রাখে। আমি লম্বা হয়ে শুয়ে আছি দেখতে পায়। মুখের উপর হাত ফেলা। ফলে চোখ ঢাকা থাকে। আমি যে ঘুমাইনি, জেগেই আছি সে টের পায়।

ঘুম আসার কথাও নয়।

কেন জানি আশঙ্কা হয় যে-কোনোদিন, যে-কোনো বিকেলে পরীর দাদু গাড়ি নিয়ে বাবার বাড়িঘরে হাজির হবে। কেন যে পরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল—এটা আমাকে ভাবায়। বড়লোকদের মর্জি আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বাবা সকালে বলেছেন, যা ভাল বোঝ কর। অর্থাৎ বাবাও আমাকে আর ঘাঁটাতে চান না।

কিন্তু টের পাই ভিতরে আমিও কম অস্থির হয়ে উঠিনি। যে করেই হোক বাবাঠাকুরকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। কিন্তু বোঝাই কী করে। একেবারে বেটা ন্যাংটা সন্ন্যাসী। গেরুয়া নেংটি পরে থাকেন। মন্দির সংলগ্ন তাঁর ঘর। মেঝের উপর কম্বল পাতা থাকে শীত-গ্রীষ্মে। মন্দিরে সকালে ঢোকেন। ঢোকেন এই পর্যন্ত। পূজা আর্চা তাঁর নিজের পছন্দ মাফিক। ইচ্ছে হলে ফুল জল দেন, ইচ্ছা না হলে দেন না। বড় জাগ্রত দেবী। পূজার সময় দেবীকে উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠের চেয়ে বশি খিস্তিখাস্তা করেন। সেবাইত বদরিদা সবসময় তটস্থ থাকেন। এহেন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোই কঠিন।

আমার মাঝে মাঝে এসব মনে হয়—যা ভবিতব্য তাই ঘটছে। ঘটবে। কিন্তু এটা কী আমার শরশয্যা...। রাতে ভাল ঘুম হয় না। প্রাইমারি ইস্কুলে মাস্টারি নিচ্ছি শুনে পরী মহাখাপ্পা। বলেছিল, বিলু আসলে তুমি অত্যন্ত প্রতিশোধপরায়ণ!

আমি তখন হাঁ বলেছিলাম, আমি প্রতিশোধপরায়ণ!

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে খাটো করতে পারলে আর কিছু চাও না।

আমি প্রাইমারী ইস্কুলে মাস্টারি করলে ওর খাটো হবার কী কারণ থাকতে পারে বুঝি না।

পরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, আমিও জানি তোমাকে কী করে শায়েস্তা করতে হয়।

এস ডি ও পরেশচন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশাটা তারপরেই বাড়িয়ে দিয়েছিল ফের। এতটা ভাল দেখায় না ভেবেই হয়তো বাড়ি থেকে হতে পারে কিংবা পরেশচন্দ্র নিজেও বাপ মাকে আনিয়ে পরীর দাদুর কাছে প্রস্তাবটা দিয়েছিল। পরেশচন্দ্র তো জানে না, আমাকে শাস্তি দিয়ে পরী নিজে জ্বলছে। আর সেই থেকে মহাফাঁপরে। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছে।

কিছুই ভাল লাগছে না। শুয়ে থাকতে না, বসে থাকতে না—কেমন এক গুঞ্জন ভেতরে—গুঞ্জন না গঞ্জনা, জামা গায় দিয়ে সেই বাদশাহি সড়কে উঠে যাব বলে বের হচ্ছি, মা বলল, সাবধানে যাস। বাবা বললেন, সকাল সকাল ফিরবি। রাস্তাঘাট ভাল না। ট্রাকগুলো যা যমদূতের মতো ছোটে।

সাইকেল ঘর থেকে বের করার সময় বাবা বললেন, যাচ্ছ যখন, মৃন্ময়ীদের বাড়ি ঘুরে এস।

বুড়ো মানুষ, বারবার বললেন, যাক ভালই হয়েছে দেখা হয়ে, বিলুকে একবার আসতে বলবেন। না হলে আমি যেতাম পরীকে নিয়ে।

পরী আমাদের ঘরবাড়ি দেখেছে, পরী কী শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে, তার দাদুকে আমাদের ঘরবাড়ি দেখিয়ে নিয়ে যাবে!

এসব মনে হলে আমি কেমন যেন একটা মজাও পাই—তুমি আমাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই এখন জালে জড়িয়ে পড়েছ। বোঝ এবার।

মুকুলের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু মুকুলের কাছে গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে। মুকুল সহজে ছাড়বে না। চৈতালি একদিন নাকি ওর কাছে নিজেই হাজির। চৈতালি প্রসঙ্গ উঠলে মুকুল আর থামতে চায় না।

পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে বাদশাহি সড়কে উঠলেই আগে আমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠত। এই রাস্তা যেন আমার আজন্মকালের সঙ্গী। হাজার বছর আগেও মনে হয় এমন এক সড়ক ধরে সমানে ছুটছি। আমি এক অশ্বারোহী। খটাখট আওয়াজ উঠছে ঘোড়ার ক্ষুরের। আমার উষ্ণীষ চন্দ্রালোকে ঝলমল করছে। বড় বড় গাছের ছায়া পার হয়ে দ্রুতবেগে ছুটছি। সেই আমি আজ বিলু। আমার অশ্ব নেই, উষ্ণীষ খুলে নেওয়া হয়েছে। ভাঙা তরবারি। অবশ্য বাবার ভাষায়, যেদিন যায়, তাই সুদিন। যেদিন অনাগত, তা দুঃসময়।

সত্যি কি আমার দুঃসময় উপস্থিত! আমার তো মানসিক যন্ত্রণার জন্ম হলে কবিতা মাথায় আসে—কবে যেন সেদিন এক গভীর অন্ধকারে / দেখি মাথার উপরে আকাশ, এক অলৌকিক নক্ষত্র জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়/নীহারিকার খবর কে আর কতটা রাখে / কে জ্বলে, কে নেভে, কোথায় দগ্ধ আত্মা করে লুকোচুরি—তুমি আমি সব তার ছাইভস্ম, উড়ে যায়/নিরন্তর মাঠ পার হয়ে ও কার অনুসন্ধান/ব্যাপ্ত বেদনা অস্থির চকমকি কাঠ—শুধু সে জানে আগুন জ্বালাতে। আমি তার আগুনে পুড়ে মরি বারবার/ যেমত অস্থির পতঙ্গ ধায় প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

আমিও ধেয়ে যাচ্ছি।

রেলগুমটি পার হয়ে জেলের পাঁচিল, ঝাউগাছের বন অতিক্রম করে শহরের দিকে উঠে যাচ্ছি।

কী মনে হল কে জানে। গেলেই পরী নেমে এসে বলবে, বিলু! দেখে আত্মহারা হয়ে যাবে। তারপর চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকলে একসময় বলবে, গিয়েছিলে! আর কতদিন লড়ব! তোমরা কী চাও আমি মরে যাই। বিয়ে হলে কেউ মরে যায় পরীই বলতে পারে। তার স্বাধীন জীবন শেষ হয়ে যাবে। এ জীবন থেকে সে নড়তে চায় না। আর আশ্চর্য হাবে ভাবে বুঝিয়ে দেবে আমি তার ভরসা। বাবাঠাকুরই একমাত্র পরীর বিয়ে রদ করতে পারেন। তিনি পরীদের পরিবারে সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। তিনি যদি বলেন, পরীর বিয়ে এখানে দিও না, আমার মনে খটকা লাগছে, তবেই সব উল্টে যাবে। পরীকে কথা দিয়ে এসেছি যাব। যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি। পরীকে পক্ষকালের উপর এড়িয়ে চলছি।

আজও সেই এক—বারবার কেন জানি অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। পরী আশায় রয়েছে, আমার যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে, বলি কী করে! —পরীর জন্য তোর এত মাথাব্যথা কেন বিলু! পরী তোর কে? তার ভালমন্দ তুই কতটা বুঝিস? তার বাবা-মা আছে, বিনয়েন্দ্র আছে, তারা বোঝে না, তুই বুঝিস। যদি বলে ভাগ। দূর হ।

কী যে করি!

কখন আমি লালদীঘির পাড় ধরে যাচ্ছি, নিজেই টের পাইনি। এ পথটা পরীদের বাড়ি যাবার পথ নয়। আমি আমার অজ্ঞাত ইচ্ছের তাড়নায় পি ডবলু ডি-র কোয়ার্টারের দিকে এগুচ্ছি। সাইকেল নিয়ে ঢুকতেই মুকুল দরজা খুলে বারান্দায়। পাজামা পাঞ্জাবি পরনে। ভারী প্রসন্ন মুখে ভেতরে ঢুকে হাঁকডাক শুরু করে দিয়েছে। বউদি বিলু এসেছে। বউদি বউদি।

বউদি দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, আর কি, এবারে বসে পড়। দুজনের যে এত কী কথা থাকে বুঝি না। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না পর্যন্ত!

সত্যি আমরা দুজনে যখন ঘরে ঢুকে যাই, পৃথিবীর অন্য জানালা আমাদের কাছে বন্ধ হয়ে যায়।

মুকুল বলল, ভিতরে গিয়ে বস। আমি সাইকেলটা তুলে রাখছি। ঘরে ঢুকে বললাম, বউদি এক গ্লাস জল।

বউদি বলল, এত তেষ্টা পায় কেন?

—কী গরম!

—শুধু গরম। তা গরমই বলতে পার। আমারই খেয়াল নেই, ভাদ্র মাস এটা। শরতের আকাশ পরিষ্কার।

বলতে ইচ্ছে হল, বউদি আকাশ পরিষ্কার নয়। বড়ই ঘোলা। আমার মুখ দেখে টের পাও না। বউদি আমাদের জননীর মতো। কখনও দিদির মতো, রঙ্গরসিকতা করলে বউদি।

মুকুল ঘরে ঢুকে বলল, আঃ কী মজা! আজ আমরা ঘুরব।

—কোথায়?

—সন্ধ্যার পর বালির ঘাটের দিকে চলে যাব। আজ পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াব।

—হঠাৎ!

—আঃ কী মজা। চৈতালি এসেছিল।

—সে তো জানি। বলেছ।

—চৈতালি খুব খুশি। বলল, মুকুলদা তুমি এত সুন্দর লিখতে পার?

—কী লিখতে পার?

—কেন কবিতা, আমার কবিতা ওর ভারী পছন্দ বলেছে।

—ওর ওপর লেখাটার কথা কিছু বলল না।

—না!

—ওকে তো সঙ্গীত-সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দিয়েছ।

—কী গায় বল! টাউন হলের ফাংশনে সেই গানটা—দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় থাকি...অপূর্ব। অসাধারণ। কী গলা! যেন এরই প্রতীক্ষায় সে অনন্তকাল বসে আছে। ও গাইবে আমি শুনব। আমাদের থাকবে ছোট্ট বাংলো প্যাটার্নের একটা বাড়ি।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই কোন পাহাড়ী উপত্যকায়।

—ঠিক বলেছ। বাংলোর চারপাশে গভীর বনজঙ্গল। ফুল-ফলের গাছ। রঙিন প্রজাপতি উড়বে।

আমি বললাম, পাশে একটা ঝর্ণা থাকলে ভাল হয়।

—ঝর্ণা কেন?

—বা অমন সুন্দর মেয়ে আর তুমি—সারা দিন সারা বেলা শুধু গাছপালা ফুলফুল দেখবে? ঝর্ণার জলের শব্দ শুনবে না?

—শব্দ!

—কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে।

—তুমি ঠাট্টা করছ বিলু?

—না ঠাট্টা নয়। শুধু ভাবছি, এইটুকু প্রশংসাতেই এই। বুঝতেই পারছ, মেয়েরা একটুকুন প্রশংসাতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

বউদি এক গ্লাস জল রেখে বলল, আমার হয়েছে জ্বালা।

এ কথা কেন! ভাবলাম।

বললাম, তোমার আবার জ্বালা কিসের! দাদা থাকতে তোমার জ্বালা হবার তো কথা নয়।

—এই ফাজিল ছেলে!

—বারে ফাজলামিটা দেখলে কোথায়? জ্বালা আমাদের।

ও সবারই হয়। বয়স হলে জ্বালা হয়, জ্বালা থেকে যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা থেকে ঘা হয়। তারপর সংসারে সেই ঘা-টা আর শুকায় না।

বউদি আজ কোনো ক্ষোভে জ্বলছে তবে। বউদির মুখ ব্যাজার। বললাম, কী ব্যাপার! কী হয়েছে বলবে তো?

মুকুল আগ বাড়িয়ে বলল, ব্যাপার আবার কী! আমাকে ইকনমিক্স-এ অনার্স নিতে বলছে।

মুকুল ইচ্ছে করলে ইকনমিক্সে অনার্স নিতে পারে। ম্যাট্রিকে টেনেটুনে সেকেণ্ড ডিভিসন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ই চৈতালির প্রেমে পড়ে যায়। চৈতালির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। পরীক্ষার ভাল ফলটাও চৈতালির প্রতি গোপন প্রেম, ইমপেটাসের কাজ করেছে। এবং এসব কারণে পরীক্ষার নম্বর তার আশাতীত ভাল। সে আমাকে বলেছে, মেসোমশাই জান ঠিকই বলেন—যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

আমি বললাম, সে তো বাবা মা'র সঙ্গে ঝগড়ায় পেরে না উঠলে চণ্ডীপাঠ শুরু করে দেন। মা তো এতে আরও ক্ষেপে যায়।

সে বলেছিল, চৈতালির প্রেমে না পড়লে আমি এত ভাল নম্বর পেতাম না। চৈতালির দিদিরা আমাদের বাঁদর বলেছে—এখন বুঝেছে আমরা কে?

তারপরই থেমে বলল, বড় হবার সময় কেউ পাশে না থাকলে সাহস পাওয়া যায় না। একজন এসেই যায়। সেই একজনের জন্যই তো বিলু আমরা সব করি। ঠিক কি না বল! এই যে বড় হওয়া, কবিতা লেখা, পরীক্ষার ভাল নম্বর তোলা, শুধু সে একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে। কী বল, তাই না।

আমি কিছু বললাম না। জল খেয়ে গ্লাসটা রাখার জন্য রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি। দেখি বউদি বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে, বলল, বিলু শোন।

সহসা যিনি বিকেলে গা ধুতে যাবার জন্য শাড়ি সায়া পরে ঘর থেকে বের হয়ে আসছিল, সেই আমাকে কেন যে অভিভাবকের মতো ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। আমি কিছুটা হতভম্বই হয়ে গেছি। আবার কেউ কোনো নালিশ-টালিশ করেনি তো!

বউদিকে আমরা এমনিতে খুব সমীহ করি। এক সন্তানের জননী বাপের এক মেয়ে। আদুরে। টুনি বাড়িতে নেই। বোঝাই যায়। থাকলে আমার সাড়া পেলে ছুটে আসত। লতাপাতা ফ্রক গায়ে দিয়ে টুনি আমাকে দেখলেই স্কিপিং করতে শুরু করে দেয়। সে কত ভাল স্কিপিং করতে পারে এটা দেখানোর মধ্যে ভারী আনন্দ পায়। বোধহয় ওর দাদু-দিদিমার কাছে এখন আছে। সৈদাবাদের দিকে বউদির বাপের বাড়ি। বউদির দুঃখ, এমন আংটা পরিয়ে দিয়েছে সংসার যে, এক রাত বাপের বাড়িতে থাকার সময় নেই তার। সারাটা দিন, এই বাসাবাড়িটি ছিমছাম রাখতে ব্যস্ত। একদণ্ড বসে থাকার যদি ফুরসত মেলে। আমার এসব দেখলে কেন যে মনে হয়, সংসারে এত দায় যে কে তার উপর চাপিয়ে দিয়েছে! কেউ তো বলেনি, সারাক্ষণ এই সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। জানালার পর্দা থেকে গ্রিল কোথাও এতটুকু ধুলোবালির চিহ্ন থাকে না। আসলে এটাই বোধহয় বউদির স্বপ্নের পৃথিবী। সেই স্বপ্নের পৃথিবীতে কে আবার নখের আঁচড় কাটল। এসব যখন ভাবছিলাম তখনই বউদি বলল, বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে বল বিলু। আমরা জানি তুমি বললে ও কথা রাখবে। জামাইবাবু পর্যন্ত রেগে গেছেন।

কী নিয়ে এত জটিলতা বুঝতে পারছি না। সংসারে তবে কী কেউ ভাল থাকে না। যেখানেই যাব আমাকে জড়ানো হবে।

বললাম, কী হয়েছে?

—আর কী হবে। সকালে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

মুকুল এমনিতে খুবই শান্ত স্বভাবের, কিছুটা প্রকৃতি প্রেমিক। আসলে আমরা সবাই। ভীরু প্রকৃতির না হলে কবিতা গল্প কেউ লেখে না এটাও কেন জানি আমার মনে হয়। আমরা যা চাই, স্বপ্ন দেখি—তা সোজাসুজি বলতে পারি না বলেই বোধহয় এই একটা নরম জায়গা আছে যেখানে সহজেই আশ্রয় পেতে পারি।

বউদি বলল, বোস। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

ভিতরে ডবল খাট। মাথার দিকে দুটো জানালা। জানালায় পেলমেট— রঙিন পর্দা, খাটের বিপরীত দিকে ড্রেসিং টেবিল—মাথা সমান আয়না। বিবাহিত জীবনে এই আয়নাটা মানুষের বড় দরকার। আমি নিজের পুরো ছবিটা দেখতে পাচ্ছি। আসলে ওটা আমার বাইরের ছবি। ভেতরে আর একটা ছবি আছে—যা আয়নায় আমার কোনোদিন ভাল করে দেখা হয়নি। পরী এমন আয়নার সামনেই আমাকে নিয়ে দাঁড়াতে চায়।

বললাম, কী হয়েছে বলবে তো! কী নিয়ে কথা কাটাকাটি!

—আর কী নিয়ে। বাবু ঠিক করেছেন, বাংলা অনার্স নিয়ে পড়বেন।

—ভাল তো।

—তুমিও ভাল বলছ? বৌদি জ্বলে উঠল।

—বাংলা অনার্স নিয়ে পড়লে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি নয়! বউদির মুখ ভারী গম্ভীর।

বললাম, কী ক্ষতি?

—এর কোনো ভবিষ্যৎ আছে?

সত্যিই বিষয়টা আমি তলিয়ে দেখিনি।

বউদি ফের বলল, সব ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলায় এম এ পড়বেন। বাংলায় ডক্টরেট করবেন। দাদারা তো শুনে হাঁ। বাংলা নিয়ে পাশ করলে কী হয় তোমরা ভালই জান।

বউদির গম্ভীর মুখ দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমরা দল বেঁধে আসি। আমাদের কাগজের অস্থায়ী ঠিকানা এই বাড়ি। অস্থায়ী অফিস, মুকুলের ঘর। কাজেই কোনো কোনো দিন বেশ রাত হয়ে যায় আমাদের আড্ডা ভাঙতে। মুকুলের দাদাকে আমরা সবাই বড়দা বলি। তাঁর তাস খেলার আড্ডা আছে সন্ধ্যায়। চেককাটা লুঙ্গি পরে ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে তাসের আড্ডায়। যাবার মুখে দরজায় উঁকি দিয়ে একবার দেখবেন, কে কে আছি আমরা। তারপর হেসে বলবেন, বউদির মেজাজ ঠিক আছে, আর এক রাউণ্ড চা মেরে দিতে পার। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে আমরা আর এক রাউণ্ড চায়ের অর্ডার দিতে পারি। যেন উসকে দিয়ে যাওয়া। সেই মানুষের সঙ্গে সকালে মুকুলের কথা কাটাকাটি হয়েছে। ভাবতে খারাপ লাগছে। বললাম, আমি বুঝিয়ে বলব। বউদি বড় হালকা বোধ করল।

তারপরই মনে হল, কী বুঝিয়ে বলব।

আমি বললাম, কী বলতে হবে বল তো? ও ইকনমিকস-এ অনার্স নিয়ে পড়ুক এটা তোমরা চাও?

বউদি বলল, আমি তোমার দাদা আমরা সবাই চাই ও ইকনমিকস-এ অনার্স নিক। এখন যাও বোঝাওগে। তুমি বোঝালে বুঝবে।

—দেখছি।

আমার উপর খুব নির্ভর—বিশেষ করে তার দেবরটির ব্যাপারে।

বউদি ফের বলল, আমি তোমার দাদাকে বলেছি, রাগারাগি কর না। বিলুকে আসতে দাও! সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি হুঁ-হাঁ কিছু না বলে বের হয়ে এলাম।

বাইরের ঘরে ঢুকে দেখি মুকুল লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সামনের জানালার পর্দা সরানো। ওর চোখ জানালা পার হয়ে রাস্তায়। ওর স্বভাব শুয়ে শুয়ে পা নাড়ানো। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, বউদির সঙ্গে নিভৃতে এত আলাপন—ভাল ঠেকছে না। চৈত্রের ঝরাপাতার বড় ওড়াওড়ি। হেমন্তের অপেক্ষায় থাকি— সোনালি ধানের গুচ্ছ, সবুজ ঘাসের মাঠ পার হয়ে যায় দেখ—উদাসী বাউল একতারা বাজায়। তারপরই ঝটকা মেরে উঠে বসে বলল, আমি আমার মতো বাঁচতে চাই। এত ব্যাগড়া দিলে চলে!

বুঝতে পারি মুকুল আজ ভাল নেই—সে তার কবিতার দু-একটা লাইন আউড়ে মনে প্রশান্তি আনার চেষ্টা করেও পারেনি, তাই ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি কী নিয়ে পড়ব না পড়ব তাও বাড়ি

থেকে ঠিক হবে। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের দাম নেই! বলে আর একটা বালিশ সে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি যাতে আয়েস করে বসতে পারি কিংবা পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে পারি সেজন্যে সে একটা বালিশ আমার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আমি বিছানায় না বসে পাশের চেয়ারে বসে পড়লাম। কিছু বললাম না। শুধু জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই জানালাটা আমারও ভারী প্রিয়। রাস্তার পর মাঠ, তারপর পুলিশ সাহেবের বড় বাংলো, বিশাল এলাকা জুড়ে পাঁচিল। কতরকমের গাছপালা—বাড়ির পাশ দিয়ে জজ কোর্টে যাবার রাস্তা—অনেক দূরের এইসব দৃশ্য এবং মানুষজনের পাশাপাশি মনে করিয়ে দেয় পরীর সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ লাল রঙের লেডিজ সাইকেল। বড় শৌখিন সাইকেলে চেপে পরী কোনো বিকেলে সহসা আমাদের আড্ডায় হাজির। কত বিকেল এমন অপেক্ষায় কেটেছে। তারপর কোনোদিন সে এলে, আমি বোবা বনে গেছি। পরী এলে আমি কিভাবে কথা বলব বুঝতে পারতাম না। পরী বড় চঞ্চল, পরিহাসপ্রিয় এবং এক অদম্য উৎসাহের ভাণ্ডার। পরী এলে কেন যে গম্ভীর হয়ে যেতাম—সবাই মিলে একশটা কথা বললে, আমার একটা দুটো কথা। তার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিত পরী। আমি হাঁ বললে হাঁ, না বললে না।

আমি চুপচাপ থাকলে মুকুলের মধ্যে অস্বস্তি দেখা দেয়। সে জানে, স্কুলের মাস্টারি নিয়ে পরীর সঙ্গে আমার রেষারেষি চলছে। পরী একদিন মুকুলকে বলে গেছে, বন্ধুটিকে শেষ পর্যন্ত প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার বানিয়ে ছাড়লে। এই তোমার বন্ধুকৃত্য! এটা মুকুলকেও বোধহয় ভাবিয়েছে। কাজটা শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ হল বুঝতে পারছে না। সে তার জামাইবাবুকে ধরাধরি না করলে কাজটা আমার হতই না। পরী এমনও নাকি শাসিয়ে গেছে, তোমাদের কাগজে আর আমি নেই। ফলে কাগজের ভবিষ্যৎ নিয়েও আমরা সংকটের মধ্যে আছি।

অপরূপা কাগজ তো আর কাগজ নয়—আমাদের কিছু হবু গল্পকারদের প্রাণ। ওটা না বের হলে আমাদের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি। পরীর যে বিয়ে ঠিক। বাড়ি থেকে পরীর বের হওয়া বন্ধ। কিন্তু পরীর এক কথা। এখন বিয়ে-ফিয়ে আমি করব না। পড়ব। এর চেয়ে পরী বেশী কিছু বলে না।

পরেশচন্দ্র পরীর দাদুকে বলেছে, মিমি পড়তে চায়—পড়ুক না। পরেশচন্দ্রের বাবা বলেছেন, নিশ্চয় পড়বে। আমরা পড়াব। এমন ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রী না পড়লে চলবে কেন। শুভ কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

এখন সব কিছুতেই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পরীর বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না। গেলেই পরীর এক কথা, গিয়েছিলে!

যাই কী করে। যাওয়া হয়নি।

আমার মাস্টারি নিয়ে রেষারেষি পরীর সঙ্গে। পরী শেষ পর্যন্ত হয়তো বিয়ের পিঁড়িতে বসে আমাকে রক্ষা করতে পারে। দেখ এবার, তুমি প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি করতে পার আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারি না! আমি সব পারি। মিছিলে যেতে পারি, পার্টির পোস্টার লিখতে পারি, আর 'মাউন্টব্যাটন, সাধের ব্যাটন কারে দিয়া গ্যালা' গাইতে পারি, নাটকে নায়িকার পার্ট করতে পারি—আর বিয়ের পিঁড়িতে টুক করে বসেও যেতে পারি। তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। লক্ষ্মী ঠিকই বলেছে, তোমাকে মাস্টারি মানায় না, রাখালি করগে, যেন পরী বলতে চায়, আমি সব পারি, তুমি কিছুই পার না।

এখানে এসে আর এক জট। মুকুলের সঙ্গে ওর বড়দার সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

মুকুলকে বললাম, দাদা, বউদি, জামাইবাবুর যখন ইচ্ছে ইকনমিকস-এ অনার্স নিয়ে পড়ার, তাই পড়।

—তার মানে!

—মানে একটাই বাংলায় অনার্স নিলে ভবিষ্যত ঝরঝরে। আমার মাস্টারির মতো।

—বাংলায় অনার্স আমার বিধিলিপি।

—বিধিলিপি মানে?

—বিধিলিপি বোঝ না? নিয়তি। বুঝলে নিয়তি! বাংলায় অনার্স আমাকে নিতেই হবে।

—নিতেই হবে।

—নিতেই হবে। বলে মুকুল ফের চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, যেন বড়ই অসহায়। কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

—চৈতালির দিব্যি নাকি?

আর তখনই রাস্তায় কাকে দেখে মুকুল ধড়ফড় করে উঠে বসল। বলল, এই শিগগির। তাড়াতাড়ি কর। দেখ কে আসছে?

দেখলাম যিনি আসছেন, তিনি আর কেউ নন—চৈতালির দিদি। প্রচণ্ড মোটা, মাথার সামনের দিকটায় টাকের মতো, লাল রঙের সিল্ক পরা। রিকশা থেকে নেমে, দরজার কাছে এসে বউদির নাম ধরে ডাকছে।

বউদি বাথরুমে। মুকুল দু-লাফে তক্তপোষ থেকে নেমে ওদিকের দরজা খুলে আড়ালে কথাটা বলে এদিকে আবার চলে এল। ভদ্রমহিলা বুঝতেই পারল না, কে দরজা খুলে দিল। এক দরজা দিয়ে তিনি ঢুকলেন, অন্য দরজা দিয়ে মুকুল আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল। তারপর দেখছি মুকুল ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছে। আমি পিছিয়ে পড়লে বলেছে, ইস শিগগির।

কী কারণ বুঝতে পারছি না।

—কী হয়েছে? ছুটছ কেন!

—চলে এস, শিগগির চলে এস।

বাড়ির আড়ালে পড়ে যেতেই কিছুটা যেন স্বস্তিবোধ করছে মুকুল। একবার পেছন ফিরে তাকায় আবার হাঁটে।

—আরে হলটা কী?

—আর হল।

এদিকটায় বড় মাঠ, ইষ্টিশনে যেতে হলে এই বড় মাঠ পার হয়ে যেতে হয়। না পেরে বললাম, আমরা কি ট্রেনে করে পালাচ্ছি?

—প্রায় তাই বলতে পার!

বুঝতে পারছি না চৈতালির দিদিকে দেখে মুকুল এহেন আচরণ করছে কেন! চৈতালি নিজে এসে মুকুলের কবিতার সুখ্যাতি করে গেছে! দিদির পারমিশন না পেলে চৈতালির এক পাও নড়বার উপায় নেই। সেই দিদিকে দেখে এত ভয়? ভয় হবার তো কথা নয়। বাড়ি থেকে ছাড়পত্র না পেলে মুকুলের কাছে চৈতালি আসতেই পারে না। কারণ এর আগে কম ঝক্কি যায়নি —মুকুল ফাঁক পেলেই সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দিত। মুকুল দিলে আমি না দিয়ে থাকি কী করে। মাধ্যাকর্ষণের টান। মুকুল এই টানে কোথায় যাবে জানি, আর গিয়ে কি দেখবে তাও জানি। বড়দি ছাড়পত্র না দিলে চৈতালি মুকুলের কাছে আসে কী করে। না কি গোপনে এসে দেখা করে গেছে! গোপনে এসে দেখা করেছে ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চ বোধ করলাম।

আমি ডাকলাম, এই মুকুল শোন। কোথায় যাচ্ছ?

—পালাচ্ছি।

—পালাচ্ছি মানে! চৈতালির দিদি কি ধাওয়া করবে ভাবছ?

—করতে পারে।

মুকুল আসলে কত ভীরু প্রকৃতির বুঝতে কষ্ট হয় না। ওকে সাহস দেবার জন্য বললাম, রাখ তো—দেখা আছে সব। তুমি কী অন্যায় করেছ যে ভয় পাবে। বলে দৌড়ে হাত ধরে ফেললাম।

এখানে কিছু বড় গাছ আছে। মাঠে সবুজ ঘাস। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। দুজন উঠতি যুবকের পক্ষে মাঝে মাঝে এ-সব জায়গা খুবই মনোরম। প্রাণ খুলে কথা বলা যায়। ওকে হাত টেনে বসালাম। বললাম, ব্যাপার কী বল তো!

মুকুল পা ছড়িয়ে বসেছে। গাছের কাণ্ডে শরীর হেলানো। পাঁচটার ট্রেন চলে যাচ্ছে। আকাশ নীল এবং স্বচ্ছ। শরতের আকাশ। আজ জ্যোৎস্না উঠবে।

তখন মুকুল বলল, রুদ্রাক্ষ ধরা পড়ে গেছে।

রুদ্রাক্ষ মুকুলের ছদ্মনাম। সে নিজের নামে কবিতা লেখে। শহরের অনুষ্ঠান নিয়ে যে আলোচনার পাতা বরাদ্দ করা আছে সেটাও সে লেখে। ছদ্মনামে না লিখলে চলে না। অনুষ্ঠানের সমালোচনাও থাকতে পারে—সবাই সমালোচনা সহ্য করতে পারে না, পথেঘাটে ধরে ধোলাই দিলে কে কাকে রক্ষা করবে ভেবেই মুকুল ছদ্মনামটি নিয়েছে। অপরূপার প্রথম সংখ্যায় শহরের বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিন-চতুর্থাংশ জায়গা চৈতালির জন্য দিয়েছে। এতে চৈতালির খুশি হবার কথা—কোনো বিপাকেই পড়ার কথা নয়, তাছাড়া চৈতালি মুকুলের সঙ্গে কথা বলেছে, এরপর আর কী হুজ্জতি হতে পারে—ভেবে পেলাম না।

বললাম, কার কাছে?

—আর কার কাছে! ওর দিদিরা টের পেয়েছে ওটা আমি লিখেছি।

—খারাপ কিছু তো লেখনি!

—খারাপ লিখব কেন? চৈতালির খারাপ হয় এমন কিছু আমি লিখতে পারি? তুমিই বল!

—না কিছু বুঝছি না! চৈতালি তো তোমার কবিতার প্রশংসা করে গেছে। তুমিই বলেছ!

—না করেনি।

—তবে যে সেদিন বললে, চৈতালি কী খুশি!

—ওটা আমার ধারণা। জান, বিলু আজকাল আমার যে কী হয়েছে! মনে মনে যা ভাবি, সেটা কেন জানি মনে হয় সত্যি ঘটেছে। চৈতালি আসবে, ঠিক আশা করেছিলাম সে আলোচনা পড়ে খোঁজ করতে আসবে, কে লিখেছে?

—সমালোচনা পড়ে ও আসবে ভাবলে কী করে? না আসারই তো কথা।

—বুঝলে না, মনের উপর তো আমার হাত নেই। আমি ভাবলাম, ব্যস হয়ে গেল। মনে হল সত্যি সে এসেছে। আমার সঙ্গে কথা বলেছে। মুকুলদা তুমি কী সুন্দর কবিতা লিখেছ বলেছে। এই ভাবনাটাই আমার কাছে সত্যের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই বলেছিলাম। জান সে আসেনি! জান বউদিকে ওর দিদিরা বলেছে, তোর বাঁদর দেওর এটা লিখছে। চৈতালিকে নিয়ে এত পাঁচ কাহন করার কী আছে। কী কারণ। কী সূত্র। বলবি আমি একদিন যাব। ধুইয়ে দিয়ে আসব। জীবনে ও আর চৈতালিকে নিয়ে যেন লিখতে সাহস না পায়। এ কী রে বাবা, নাক টিপলে দুধ গলবে, এখনই এই ভাষা—কী যাদু বাংলা গানে, চৈতালির সেই উচ্চকিত কণ্ঠ—যেন সেতারের মুর্ছনা, শেষ হয়েও শেষ হয় না। যা অনন্ত, যা অসীম, চৈতালির গান শুনলে তা টের পাওয়া যায়। যেন আকাশ মাটি গাছপালা কীটপতঙ্গ সব স্তব্ধ। ঝড়ের পর প্রকৃতির সেই নিরুপম সৌন্দর্য তার সঙ্গীতে। এত কাব্য করা হয়েছে কেন! তোর রুদ্রাক্ষকে বলবি, আর যেন চৈতালিকে নিয়ে বাঁদরামি না করে!

—বউদি বলল!

—হ্যাঁ সেই তো। দাদাও জেনে গেছে।

—কী জেনে গেছে?

—আমি চৈতিকে নিয়ে একটু ইয়েতে আছি।

—এটাই আমাদের গেরো। যাকে ভালবাসি সেই কেমন শত্রুপক্ষ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে পরীর সম্পর্কটা ভালবাসার পর্যায়ে পড়ে না—বরং সবাই জানে, পরীকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না। সংসারে আমরা উভয়ে উভয়ের চরম শত্রু। পরীর কোনো কাজই আমার পছন্দ নয়। বেহায়া বলে পরী মেশে!

ভাবলাম, সত্যি রুদ্রাক্ষ চৈতিকে নিয়ে একটু বেশি কাব্য করে ফেলেছে।

আমি বললাম, আর কতক্ষণ বসে থাকবে?

—গিয়ে যদি দেখি বসে আছে!

—থাকুক বসে। বসে থাকল তো বয়ে গেল। ভালবাসা অন্যায় নয়। আমাদের ইচ্ছে আমরা ভালবাসব। ভালবাসা মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট তুমি জান?

—সে তো জানি।

—আমরা তো বলছি না, চৈতিকেও এজন্য তোমাকে ভালবাসতে হবে, কী বল? তুমি কখনও জোর খাটিয়েছ? আমাদের ইচ্ছে আমরা ভালবাসব। কার কি বলার আছে?

—কারও কিছু বলার নেই।

—তুমি বলেছ, আমি ভালবাসি, তোমাকেও ভালবাসতে হবে? না ভালবাসলে হুজ্জতি হবে? এমন তো দাবি করনি।

—না।

—তা হলে মামলা দাঁড় করাবে কার ভিত্তিতে?

—চৈতালির দিদিরা সব পারে। হেডমিসট্রেস বলে কথা।

—ভয় পেলে চলে না। এক কাজ করব?

—কী করতে চাও?

—প্রণবের মারফত কাজটা করা যায় না?

—না, না। ও করতে যেও না। হিতে বিপরীত হবে। ও করতে যাবে না। দাদা পর্যন্ত বলল!

—কী বলল?

—তোরা চৈতির পেছনে লেগেছিস! চৈতিকে না দেখলে আমাদের মন মানে না, সেজন্য যাওয়া। পেছনে লাগার কী হল!

—তুমিই বল বিলু, শুধু দেখি। আমরা শিস মারি না, মাস্তানি করি না, শুধু দেখি। চৈতিকে না দেখলে মনে হয় দিনটা মাঠে মারা গেল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দেবী চলে যাচ্ছেন। বাংলায় অর্নাস নিয়ে পড়ব চৈতির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে বলে।

মেয়েদের কলেজে এখনও অর্নাস ক্লাস খোলা হয়নি। বাংলায় অর্নাস নিতে হলে চৈতালিকে আমাদের কলেজেই ভর্তি হতে হবে। বাংলায় অর্নাস নিয়ে পড়ার বাসনা তবে মুকুলের সেই জন্য। এক সঙ্গে ক্লাস, এক সঙ্গে বের হয়ে আসা; করিডোর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। নোট টুকে নেবার ছল করে, কথা বলার সুযোগ—এত সব ভেবে মুকুল বাংলায় অর্নাস নিয়ে পড়বে বলে ঠিক করেছে। আর সেই নিয়ে মুকুলের বাড়িতে ঝড় উঠে গেছে।

ক্রমে সাঁঝ নেমে এল। ইস্টিশনে আলো জ্বলছে। শহরের রাস্তায় আলো। আজ আর তবে দু বন্ধুতে সাইকেলে বালিরঘাটে জ্যোৎস্না দেখতে যাওয়া হল না। দিগন্ত প্রসারিত মাঠে নেমে জ্যোৎস্নায় ডুবে যাওয়া আমাদের বিলাস। আমি চুপ মেরে বসে থাকি, মুকুল গলা ছেড়ে গান ধরে—দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি। আমি তখন আর বিলু থাকি না, মুকুল তখন আর মুকুল থাকে না। এক রাজার পৃথিবী আমাদের সামনে। মাথায় উষ্ণীষ, এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম—পেছনে বসে আছে রাজকন্যা সংযুক্তা। পৃথ্বিরাজ জয়চন্দ্রের কন্যা হরণ করে পালাচ্ছে।

সব যুগেই এই পৃথ্বিরাজদের কপালে দুঃখ থাকে।

বললাম, এবারে ওঠো। আমাদের সাহসী হওয়া দরকার।

—তুমি বলছ সাহসী হতে?

—আলবত।

আমার মধ্যে মুকুল নুতন কিছু যেন আবিষ্কার করে মনমরা ভাবটা কাটিয়ে ফেলল। আমি এভাবে কখনও কথা বলি না। কথা সব আমার মনের সঙ্গে। বাইরের লোক দেখলে ভাবে আমি এক বিষণ্ণ মানুষ। মুকুল নিজেও এ অনুযোগ করেছে বার বার। বিলু তুমি এত বিষণ্ন থাক কেন? এত কম কথা বল কেন? আজ আমার মধ্যে সেই বিষণ্ণতা টের না পেয়ে সে অবাকই হয়ে গেছে। এ যেন অন্য এক বিলু তার সঙ্গে কথা বলছে। দারিদ্র্য বিলুকে তবে আর পঙ্গু করে রাখতে পারছে না। দুর্জয় সাহসের অধিকারী বিলু। বলল, বিলু পারবে ফেস করতে?

—দেখ পারি কি না?

মুকুল বলল, তুমি পারবে। চল। নো কম্প্রোমাইজ। যদি বলে, রুদ্রাক্ষ ছদ্মনাম তোমার? বলব, হ্যাঁ! যদি বলে তুমি চৈতিকে নিয়ে কাব্য করেছ? বলব, হ্যাঁ। যদি বলে চৈতিকে নিয়ে তোমার এত কাব্য করার বাসনা কেন? বলব হ্যাঁ, বাসনা থাকে। আপনারও ছিল। মাস্টারি করে করে সব হারিয়েছেন। বিয়ে থা করলেন না। সময়ে বিয়ে না করে পস্তালেন। চৈতির জীবন আমি নষ্ট হতে দেব না।

আমরা ফিরছি। মুকুলের আবেগ এসে গেছে। আমার বলার ইচ্ছে ছিল, এত বলার দরকার হবে না।

তার আগেই কাট।

হঠাৎ মুকুল থেমে গেল। —কী ব্যাপার বিলু তুমি কিছু বলছ না? যা বললাম, ঠিক বলিনি? মনের কথা ফস করে বেরিয়ে গেল—এত বলার দরকার হবে না। তার আগেই কাট।

—কাট মানে?

—চিত্রনাট্য দেখছিলাম। তাতে কাট কথাটার খুব ব্যবহার।

—চিত্রনাট্য দেখছিলে মানে?

—আরে সেদিন বিমল কলকাতা থেকে নাটকের কাগজ নিয়ে এল না।

বিমলই আমাদের মধ্যে একমাত্র নাটকের চর্চা করে। সে কলকাতায় গেলে নাটক সম্পর্কিত যত কাগজ পায় নিয়ে আসে। সেই আমার কাছে কাগজটা দেখার জন্য রেখে গিয়েছিল। কী সুন্দর ছাপা! পরিচ্ছন্ন কাগজ। আমাদের অপরূপার কোনো অঙ্গসজ্জা নেই। কাগজটার পাশে অপরূপা খুবই ম্যাড়মেড়ে। ইচ্ছে ছিল কাগজটা পরীকে দেখাব। পরী দেখলেই তার বাসনা হবে অপরূপাকেও সেভাবে সাজানো যায় কি না! কারণ কাগজটা তো আমাদের প্রাণ। কাগজের সম্পাদক আমি, কাগজের তিন- চতুর্থাংশের ইজ্জত আমার। আমার ইজ্জত বাড়লে পরী কেন জানি গর্ববোধ করে। কিন্তু একে একে এমন সব জটিলতা এসে জুটবে, কে জানত! যে-পরী কাগজের সব, তাকে নিয়েই বাড়িতে চরম অশান্তি।

পরীর দাদু যেতে বলেছে। মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়। কিন্তু মুকুল গেলে পরীর দাদু কিছু নাও বলতে পারেন। অবশ্য উপরে নিয়ে যেতে পারেন তিনি। মুকুলকে একা নিচে রেখে উপরে যাওয়া ঠিক শোভন হবে না। মুকুল বড় সেনসিটিভ। একা যেতেও ভয় করছে। এই ভয় থেকে মুকুলের কাছে চলে আসা। অথচ বলতে পারছি না, জান পরীর বিয়ে নিয়ে অশান্তি দেখা দিয়েছে। পরীর বিয়ে শুনলে, সবাই সটকে পড়বে।—বল কী! পরীর বিয়ে! কার সঙ্গে! পরী রাজি! পড়বে না! কলেজ করবে না! আমাদের কাগজের কী হবে!

আমার প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারি করায় পরীর যাই ক্ষোভ থাকুক যতই ভয় দেখিয়ে যাক, তোমাদের কাগজে পরী আর নেই—কিন্তু মুকুল প্রণব সুধীনবাবুরা জানে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পরীর সব ক্ষোভ জল হয়ে যাবে। ওরা বোঝে বিলুর চরিত্রে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা পরীর মতো মেয়েকেও ভাবায়। কাগজের আর্থিক দিকটায় কোনো জটিলতা দেখা দিলেই পরীর সামনে ওরা আমাকে ঠেলে দেয়।

সেই পরীর বিয়ে ঠিক, পরী রাজি নয়, পরীর চোখ বসে গেছে, যেন বড় একটা অসুখ থেকে উঠেছে দেখলে মনে হয়—আর সেই চিৎকার, দাদু জান না, তুমি জান না, ও আমার কত বড় শত্রু। সেই হাহাকারের ছবি চোখে ভেসে উঠলেই আমি স্থির থাকতে পারি না। রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। কাউকে বলতেও পারি না।

আমার বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে—বলি, পরী সত্যি আমি তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু। আমার শত্রুতার শেষ নেই।

বাবাঠাকুরের কাছে যাইনি, এও এক ধরনের শত্রুতা। সব দায়ভার আমার উপর অর্পণ করে বসে আছ, আমার উপর তোমার প্রবল বিশ্বাস—কথা যখন দিয়েছি বাবাঠাকুরের কাছে যাব। আমি না গিয়ে থাকতে পারব না। এখন বুঝতে পারছি এ যাওয়াটা আমার পক্ষে কত কঠিন। —আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?

আমরা কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ হাঁটছিলাম। কথা বলছিলাম না। 'কাট' চিত্রনাট্যে ব্যবহার হয়ে

থাকে। পরিচালক তার কাহিনী বিন্যাস অনেকগুলো দৃশ্যে ভাগ করে নেয়। অর্থাৎ এক একটা শট তোলার পরই কাট। আমার কাছে 'কাট' এই শব্দটি অনেকভাবে এখন প্রযোজ্য। মনের মধ্যে 'কাট' রয়ে গেছে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না—কথাগুলি পরী সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা থেকে মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে। মুকুল বুঝল চৈতালি সম্পর্কে কোনো নুতন পন্থা মাথায় আমার এসেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, কী কাজ করলে হয় না বিলু?

আমি কী বলি!

এটা যে আমার নিজেরই সলিলকি বোঝাই কী করে! মুকুলের এমন সঙ্কট মুহূর্তে নিজের জটিলতা নিয়ে অস্থির হয়ে উঠছি তাও তো বলতে পারছি না। মুকুল তবে ভাববে বিলুটা বড় স্বার্থপর। সে নিজেকে ছাড়া কিছু ভাবে না। নিজের মান অপমান ক্ষোভ নিয়ে ব্যস্ত।

বললাম, না। মানে আমরা যদি এখন গিয়ে বলি, দেখুন আমরা সত্যি বাজে ছেলে নই। বাঁদর নই। কারণ আমরা এখন জ্যোৎস্নায় হেঁটে যেতে চাই। জ্যোৎস্না আমাদের চারপাশে এখন খেলা করে বেড়াচ্ছে। কত রকমের প্রজাপতি উড়ছে আমাদের চারপাশে। কত রকমের গাছ আমাদের ছায়া দেয়। আমরা তারই সৌন্দর্যে বিভোর। নারী আমাদের কাছে এখন দেবী ছাড়া কিছু নয়। সব তরুণীই আরাধ্যা দেবী। এখন আমাদের কোনো বাসনা নেই। বরং চৈতালির যে কোনো অপমান আমাদের অপমান। চৈতালিকে খাটো করলে আমরাই খাটো হয়ে যাব। রুদ্রাক্ষ চৈতালির সৌন্দর্যের পূজারী।

মুকুল অবাক হয়ে বলল, পারবে বলতে?

—পারব না কেন?

মুকুল সহসা যেন আলোর খোঁজ পেয়ে গেছে। ওর মধ্যে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছে কেউ। সে ঘুসি পাকিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল তার দুঃখ। সে বলল, পারতে হবে। হাতের তালুতে আর এক ঘুসি মেরে বলল, সত্যের বিনাশ নেই। বিলু আমাদের পারতেই হবে। কিছুতেই হেরে যাব না।

তারপর থেমে আমার মুখের দিকে তাকাল। কী ভাবল কে জানে! সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আমরা হেরে যাবার জন্য জন্মাইনি। আমরা হারব না।

সে আমার হাত তুলে ইস্তাহার দেখাবার মতো অথবা শ্লোগান দেবার মতো বলল, বল, আমরা হারব না, হারব না।

ওকে খুশি করার জন্য বললাম, আমরা হারব না, হারব না।

আবার সে বলল, আমরা ভয় পাব না, ভয় পাব না।

কিছুটা ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে ভেবে বললাম, ভয় পাবার কী আছে?

—না তবু বল হাত তুলে, বজ্রমুষ্টি তুলে বল, আমরা ভয় পাব না, ভয় পাব না।

পি ডব্লু ডি-র কোয়ার্টার্স থেকে ইস্টিশনের পথ অনেক দূরে। ক্রোশব্যাপী এই মাঠ—উত্তরে শহরের রাস্তা লালবাগের দিকে চলে গেছে। দক্ষিণে শহরের রাস্তা জেলের পাঁচিল ঘেঁসে মোহন সিনেমার পাশ দিয়ে ইস্টিশনের দিকে গেছে। ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমরা যতই চিৎকার করি না কেন কেউ শুনতে পাবে না। জ্যোৎস্নায় কিছু জীব এখনও মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো ধোপাদের গাধা। আমরা দুজন এবং কিছু গাধা বাদে, এই মাঠে অন্য কোনো প্রাণীর সাড়া নেই।

মুকুল আবার বলল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

আমি চুপ করে আছি দেখে বলল, বল, একসঙ্গে বল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

বুঝতে পারছি মুকুল কী সাংঘাতিক নার্ভাস ফিল করছে। এখন না বলেও উপায় নেই। এমন বন্ধু না থাকলে আমার ইস্কুলের মাস্টারিটাই হত না। মিলের টিউশনি করতে গিয়ে কী অপমানের বোঝা না বইতে হত!

ইস্কুলের মাস্টারিটা হয়ে যাওয়ায় কত বড় নিষ্কৃতি পরী যদি বুঝত।

আমি কিছু না বলায় মুকুল বোধহয় আহত হয়েছে। আমি যে আমার মধ্যে থাকি না, মানুষের চিন্তা ভাবনার কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না, আমরা ভালবাসব শ্লোগান আমার মাথায় ঢোকেনি, ক্ষণিকের মধ্যে কত স্মৃতি ভিড় করে এসেছিল মুকুলকে বোঝাই কি করে?

বললাম, কী বলতে বলছ?

—বল, আমরা ভালবাসব, বাসব।

দুজনে সমস্বরে বললাম, আমরা ভালবাসব, বাসব।

—আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

—কিসের অধিকার মুকুল?

—কেন ভালবাসার অধিকার।

—কাকে?

—চৈতালিকে।

আমি আর পারলাম না। বললাম, এ তো অর্জন করতে হয়। অধিকার অর্জন করতে হয়।

—কী করে করব বুঝতে পারছি না।

—আমিও ঠিক জানি না! তবে নিজেকে বড় করে তোলার মধ্যেই এই অর্জনের অধিকার জন্মায়। বড় অর্থে মুকুল আমি কৃতী হতে বলছি না, একজন গরিব মানুষও খুব বড় হতে পারেন—তাঁর চরিত্রই তাঁকে বড় করে। এত অধীর হলে চলবে কেন। নারীমহিমা সব মেয়েদের মধ্যেই আছে। বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে হ্যাংলামিটা একটু বেশি। চৈতালিকে নিয়ে আর একটি লাইনও নয়। এবার থেকে অন্য যারা আছে, তাদের কথা থাকবে। চৈতালিকে নিয়ে অপরূপায় আর একটি লাইনও নয়।

—তবে এত খাটাখাটনি কার জন্য?

—কেন নিজের জন্য!

—ধুস আমার বয়ে গেছে।

আমি বোঝালাম, শোন মুকুল, ভেবে দেখ—শহরে লীলা রত্না কম ভাল গায় না?

—ভাল গায়।

—সমর অধীরও জলসায় গায়।

—গায়।

—এরাই শহরের সব অনুষ্ঠানের মণি।

—চৈতালিকে বাদ দিচ্ছ কেন?

—চৈতালিও আছে। থাক না। একবার চৈতালিকে নিয়ে লেখা গেল, এবারে রত্নাকে নিয়ে। প্রফেশনাল জেলাসি বুঝলে না? তুমি রুদ্রাক্ষ একবার দয়া করে প্রমাণ কর, সব লেখাতেই তোমার কাব্য থাকে। আমি চাই কাব্যটা রত্নার বেলায় আর একটু বেশি থাকুক। আমরা খুবই নিরপেক্ষ এটা প্রমাণ করা দরকার।

—নিরপেক্ষ প্রমাণ করব, কাগজ কী আর বের হবে? ওর গলায় ভারী হতাশার সুর।

—কাগজ ঠিক বের হবে। কাগজ আমরা কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না। কাগজ আমাদের কাছে এখন মর্যাদার প্রশ্ন।

আমরা এসে গেছি। দেবদারু গাছের ছায়া পার হলেই ওদের কোয়ার্টার্সের সামনেকার বাগান। মুকুলের দাদার ফুলের শখ। জবা, জুঁই বেলফুলের গাছ। গাছগুলিতে বেলফুল ফুটেছে। জ্যোৎস্নায় গাছে খই হয়ে ফুটে আছে। বেলফুলের সুগন্ধে সারাটা বাগান ম ম করছে। মুকুল থমকে গেছে। বাগানে ঢুকছে না। আমাকে ঠেলে দিচ্ছে।

চৈতালির প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা নেই। তবু কেন জানি মনে হয় চৈতালি আমাদের সঙ্গে খুবই বেমানান—ঠিক যেমন পরী, সব সুন্দরী তরুণীরাই অন্য কারো জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে। আমরা ফালতু। যত নিজেদের ফালতু মনে হয় তত কাব্যচর্চার প্রতি কেন জানি অনুরাগ জন্মায়। মাথায় এই অনুরাগের ঠেলা খেলে অনেক সাহসী কাগজ বের করে ফেলতে পারি। আর পারি বলেই লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে গেলাম। চৈতালির দিদিকে পরোয়া করি না। দেখলাম, বউদি একা বসে কী একটা বই পড়ছে। চৈতালির দিদি নেই।

খুব সর্তক পায়ে ঢুকে বললাম, চলে গেছে?

—কে?

—মানে যে এসেছিল?

বউদি হাহা করে হেসে দিল। তোমরা ওকে এত ভয় পাও কেন বল তো?

—ভয়, না ভয় নয়। মানে—

—মানে আর বোঝাতে হবে না। বন্ধুটি কোথায়।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

—ডাক।

আমি ডাকলাম, মুকুল ভয় নেই। চলে এস।

মুকুল যেন কথাটার অর্থই ধরতে পারেনি—একেবারে তাজ্জব। সে বারান্দায় উঠে বলল, কে নেই! কার কথা বলছ!

—যার থাকবার কথা ছিল!

—তিনি কে? থাকলে আমার কী, না থাকলেই বা আমার কী। আমরা কারোর দাস নই।

বউদি শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়ালেন—বইয়ের ভাঁজে একটা কাগজ রেখে বললেন, তোমাদের কোকিলকণ্ঠী কলকাতায় চলে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবে। আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে গেল। বড়দার কাছে চিঠি লিখতে হল।

শুনে মুকুল আমি হতভম্ব।

মুকুল কখন ঘর থেকে বের হয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেছে খেয়াল করিনি।

—চিঠি কেন?

—সুপারিশ।

বউদির বড়দা প্রেসিডেন্সিতে পড়ায় জানি। নিজের দাদা নয়। বউদির বড় পিসিমার ছেলে। এটা বউদি আমাদের অনেক সময়ই শুনিয়েছেন। বউদির সুপারিশ তাহলে দরকার হয়। আর বউদির দেবরটি বাঁদর! বাড়িতে বাপু সুপারিশ চাইতে আসা কেন! কীরকম রাগ এবং বিদ্বেষ জন্মাল—স্বার্থপর—আমরা যা করি তাই অপছন্দ। বললাম, তুমি চিঠি দিলে কেন?

বউদি আমার দিকে না তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। যাবার সময় বলল, গেলে বাঁচি বাপু যা চলছে।

তবে কী বউদিও চায় চৈতালি শহর ছেড়ে চলে যাক। চৈতালি মুকুলের মাথাটি চিবোচ্ছে। চৈতালি মুকুলের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে ছাড়বে। সব পক্ষই সমান। বউদি বুঝল না, আমাদের এই ভালবাসা বেঁচে থাকার রসদ। কবিতা লেখার রসদ। মুকুলের সব অনুপ্রেরণা এই মেয়েটি। সে চলে গেলে মুকুল ভারী ভেঙে পড়তে পারে। দিনে অন্তত একবার যাকে না দেখলে দিনটা বিফলে গেল এমন মনে করে—তার পক্ষে চৈতালির শহর ছেড়ে যাওয়া বড়ই হতাশা সৃষ্টি করবে। কাগজের জন্য মুকুলের খাটাখাটনি বৃথা মনে হবে। কাকে যে এখন চাঙ্গা করি। মুকুলকে না পরীকে। পরীকেও তো কথা দেওয়া আছে। না কোনোদিকে পথ পাচ্ছি না।

ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। আমাদের হয়ে কেউ ভাবে না। বউদিকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললাম, চৈতালি চলে গেলেও মুকুল যা ভেবেছে তাই করবে।

ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বউদি আমাকে দেখল। বলল, কী বললে?

—না মানে, ও তো বলছে বাংলায় অর্নাস নেবেই।

—নিক না। কে বারণ করেছে! আমরা আর কতদিন! বাবুর এখন পাখা গজিয়েছে। বাবুকে বলে দিও, জীবনটা এত সহজ নয়।

আসলে বউদি তো মুকুলকে ছোট থেকে বড় করেছে। সন্তান-স্নেহ। বুঝি সব। সবসময় ভয় জীবনটা না মাটি হয়ে যায়। দুর্ভাবনা। দুর্ভাবনা কেবল দেখছি আমার বাবারই নেই। যা কপালে লেখা আছে তা নাকি খণ্ডাবার ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই।

পরীর দাদুর অনুগ্রহ লাভে বাবা খুবই খুশি। শহরের এমন জাঁদরেল মানুষ বাবাকে দেখে গাড়ি

থামিয়ে নেমে এসেছেন, এটা বাবার ইহজীবনে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তাঁরই ইচ্ছে সব। না হলে একজন ছিন্নমূল মানুষের শেকড় চালিয়ে দেবার সময় এতসব সৌভাগ্যলাভ হয় কী করে। শুধু কী নেমে আসা! বাড়ির সবাইকার খোঁজখবর নিয়েছেন। পিলু পড়াশোনা করছে কিনা জানতে চেয়েছেন। দু-এক বছর বাদে পিলুর যে একটা হিল্লে হয়ে যাবে বাবা পরীর দাদুর কথাবার্তায় এমনও অনুমান করে এসেছেন। তাঁর পরিবারের পক্ষে মাথার উপর এত বড় মানুষের কৃপাদৃষ্টি পড়বে স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

ও-ঘর থেকে মুকুলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বউদি কখন এক কাপ চা, কিছু নোনতা বিস্কুট রেখে গেছে টেরই পাইনি। চোখ বুজে সোফায় গা এলিয়ে বসে আছি। আসলে মানুষ একসময় বড় হয় স্বপ্ন দেখতে দেখতে। স্বপ্নে সে রেলগাড়ি চালিয়ে দেয়। এক একটা ইস্টিশনে থামে, যাত্রী ওঠে, নেমে যায়, তারপর একসময় শেষ স্টেশনে গেলে, কেউ আর থাকে না। গাড়িটা আর সে। এখন আমি সেই রেলের চালক। বাবা-মা ভাইবোন নিয়ে রওনা হয়েছি —একটা নির্জন স্টেশনে কেউ দাঁড়িয়ে। তার আঁচল উড়ছে। নীল বাতির মতো জ্বলছে। সিগনালিং। গাড়িতে আর একজন উঠবে বলে স্টেশনে এসে অপেক্ষা করছে। তাকে এবার তুলে নাও।

বউদি ডাকল, এই বিলু চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! কার ধ্যানে মগ্ন হলে!

তাকালাম।

বউদি হাসল। বলল, বাবুকে ডাক।

চেয়ে দেখি টেবিলে দু-কাপ চা। ডাকলাম, এই মুকুল, এস। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি খাও।

—আরে এস। বাংলায় অর্নাস নিয়েই পড়বে। দাদা বউদি কিছু আর বলবে না!

সহসা মুকুল লাফ দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, আমি কী নিয়ে পড়ব না পড়ব কাউকে ভাবতে হবে না। বলে চা নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

বসে বসে চা-টুকু শেষ করলাম। পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা না করে গেলে বাবার অনুযোগ শুনতে হবে। বাবা বলবেন, আমি ঠিক তোমাদের বুঝতে পারি না। নামী মানুষকে সম্মান দিতে তোমরা শেখনি। সম্মান দেখালে কেউ ছোট হয়ে যায় না। নিজেকে নিজে ছোট না করলে, কেউ তাকে ছোট করতে পারে না। তোমাদের মতিগতি আমি ঠিক বুঝতে পারি না! কী ভাববে মানুষটা! ভাবতে পারে, তোমার বাবার সংসারে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা নেই । ভাবতে পারে, খবরটা আমি তোমাকে দিইনি। তোমার বাবার দায়িত্বজ্ঞান কম। এ-সবও তো তিনি ভাবতে পারেন। একবার দেখা করতে দোষ কোথায়।

চটপট উঠে পড়লাম। —না যাওয়া দরকার। আমার জন্য না হলেও বাবার সম্মানের কথা ভেবে যাওয়া দরকার। মুকুলের ঘরে ঢুকে বললাম, যাচ্ছি। নতুন কপি সব ঠিক করে রেখ। প্রেসে দিয়ে দেব।

মুকুল শুনল কী শুনল না বুঝলাম না। সে বলল, বউদি কী বলল? চৈতালির দিদি কেন এসেছিল? প্রেসিডেন্সিতে সত্যি ভর্তি হবে!

—সুপারিশ পত্র নিতে।

—কার জন্য সুপারিশ?

—চৈতালি সেনের হয়ে সুপারিশ পত্র লিখে দিলেন বউদি!

—কার কাছে?

—প্রেসিডেন্সির তোমাদের সেই আত্মীয়ের কাছে।

—কেন? বউদি লিখতে গেল কেন?

—সে তুমি জিজ্ঞেস করগে।

চৈতালি সেন চলে গেলে এই শহরের জ্যোৎস্না মরে যাবে। চৈতালি সেন চলে গেলে, এই শহরে আর ফুল ফুটবে না। চৈতালি সেন চলে গেলে, লালদীঘির ধার, শহরের সদর রাস্তা, টাউন হল,

সব নির্জন পরিত্যক্ত নগরী হয়ে যাবে। অন্তত একটা মানুষের কাছে এই শহর মৃতের শহর বলে মনে হবে। কথাটা বলি কী করে!

মুকুল চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, তুমি তবে বলবে না!

কী আর করি! কেমন অসহায় চোখ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মুকুল, মনে হয় কিছুটা শুনেছে—সবটা শোনেনি। কিংবা সবটাই শুনেছে, আমার কাছে আবার জানতে চায় বউদির এটি ঠাট্টা কিনা। চৈতালি সেনকে নিয়ে বউদির ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। বললাম, চৈতালি সত্যি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

—আমাদের জন্য?

—কী জানি! আমরা তো শিস্‌ও দিইনি, টিজও করিনি। কেন যে চলে যাচ্ছে!

—ঠিক জান চলে যাচ্ছে?

—তাই তো বউদি বলল। প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হবে।

মুকুল মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর বলল, আচ্ছা বিলু এক কাজ করলে হয় না?

—কী কাজ!

—আমি চৈতালি সেনের কাঁটা!

—তুমি কাঁটা হবে কেন!

—না হলে চলে যাবে কেন। ভাবছি আমিই বরং চলে যাব। এ শহরে চৈতালি না থাকলে শহরটা অর্থহীন হয়ে যাবে।

—কী আজেবাজে বকছ?

—আজেবাজে বকছি না। একটা শহর/বাঁচে, বেঁচে থাকে/ সেই নারী যবে হেঁটে যায় অকুস্থলে। কী কারণ জানি না/ বাঁচি না আমি/ আমার আত্মা খাঁচায় আছে জানি/ সেই আত্মার জন্য, নীল আকাশ চাই চাই ঘরবাড়ি/ বাড়ি আছে গাছ নাই, ফুল আছে পাখি নাই, নদী আছে জল নাই—সব শূন্য/অন্ধকারে ডুবে আছে গভীর নক্ষত্র।

মুকুল তার একটি প্রিয় কবিতা বলে শুয়ে পড়ল। পাশ ফিরে মুখ লুকাল।

আমি ওর পাশে বসলাম, বললাম, মুকুল চৈতালি না থাকুক আমরা তো আছি। ছেলেমানুষী করতে যেও না। তুমি চলে গেলে বালির ঘাটে গিয়ে আমার সঙ্গে কে তবে জ্যোৎস্না দেখবে। ভেবে দেখ তো সেই জ্যোৎস্না, বালিরঘাট, বাদশাহি সড়ক, বাঁশের সাঁকো কত কবিতার জন্মই না দিয়েছে। একা চৈতালি সেন সব কবিতার জন্ম দেয় না মুকুল! আমরাও আছি। তুমি না থাকলে আমি কত একা হয়ে যাব।

মুকুল কী ভেবে বলল, সারাটা দিন আমি ভাল ছিলাম না। দাদা বউদির সঙ্গে ঝগড়া করেছি। একটা স্বার্থপর মেয়েকে না ভালবাসাই ভাল।

—এই তো চাই।

মুকুল উঠে বসল। দীর্ঘকায় মনে হচ্ছে মুকুলকে। ভরাট গাল, রেশমের মত নরম দাড়ি গালে, একমাথা ঘন চুল ব্যাকব্রাশ করা, পাঞ্জাবি গায়ে গেরুয়া রঙের—বাহার যাকে বলে, এমন সুপুরুষ যেন আমার চোখে কমই ঠেকেছে। মুকুলের স্বভাব, আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাবার জন্য ঘুসি পাকিয়ে কথা বলা—সে বলল, আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। আমরা দূরে যাবই। সেই বহুদূরে, যেখানে অচলা পার্বতী সব বিষপান করে শিবের সঙ্গিনী। সেখানে আমরা যাবই।

—আমাদের যেতেই হবে।

এই যেতেই হবে বলে বেরিয়ে পড়ার সময় বললাম, তাহলে বলে যাই।

—কী বলবে?

—বউদিকে বলে যাই তুমি ইকনমিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়বে।

—আমার না হয় হল, তোমার কী হবে?

—কেন মাস্টারি করব। প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার। দারুণ। ভাবা যায় না। কোনো দায় নেই,

শুধু পড়িয়ে খালাস। তারপর মুক্ত স্বাধীন। তারপর আমার সাইকেল, আর বাদশাহি সড়ক। তারপর, শহরে বিকেল নেমে আসবে, গাছপালার ছায়ায় আমি চলে আসব তোমার কাছে। তারপর আমরা যাব, ধোবিখানার মাঠে। সেখানে সবাই মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্যচর্চা। আর অপরূপা তো থাকলই। সে আমাদের সব। আর কিছু না পারি একটা কাগজকে ভালবাসা কম কথা নয়। কাগজ তো নয়, লিটল ম্যাগাজিন। সব নতুন কথা, নতুন খবর মানুষের ঠিকানায় পৌঁছে দেব। পুরনো সব ঝেড়ে ফেলতে হবে। নতুন জেনারেশন তৈরী হচ্ছে, আমাদের কাগজটা হবে তারই মুখপত্র। কোথাও বেঁচে না থাকতে পারি, কাগজটার মধ্যে অন্তত বেঁচে থাকতে পারব।

আসলে মুকুল বুঝতে পারছে, ওর ভেতরে যে ঝড় উঠেছিল তার প্রশমন হওয়ায় সে দারুণ খুশি। আমার আর কোনো সম্বল নেই—বাবার দীনেশবাবু আছেন, মানুকাকা আছেন, ইদানীং পরীর দাদু সম্বল হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মতো করে আমাকে দেখার পাশে কেউ নেই—একমাত্র মুকুল, মুকুল সেটা জানে, বোঝে। বোঝে বলেই আবেগের চোটে এত কথা বলে যাচ্ছি তা ধরতে পারি। এমনিতে আমি খুব কম কথা বলি, সাহিত্যচর্চার আসরেও একমাত্র মুকুল আর আমি এক সঙ্গে থাকলে কখন প্রগলভতা দেখা দেয়। মুকুল সব সময় মেনে নেয় আমার এই প্রগলভতা।

মুকুল বলল, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু মিমি তো মিছে বলেনি! ইস্কুলের মাস্টারি জামাইবাবুকে ধরপাকড় করে না দিলেই ভাল ছিল। সত্যি বোধহয় তোমার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করে দিলাম।

হাহা করে হেসে ফেললাম—হেসে ফেললাম জোর করে। বিষয়টাকে উড়িয়ে দেবার অথবা হালকা করার আর কোনো পথ জানা ছিল না। বললাম, বাদ দাও মিমির কথা।

—কি বলছ! মিমি তোমার জন্য কত ভাবে! আর তুমি একথা বলছ!

—মিমি আর কদ্দিন!

—কেন, কদ্দিন মানে!

একটু রসিকতা করার প্রলোভনে, আসলে রসিকতা নয়, কোনো গুরুত্বই দিচ্ছি না প্রমাণ করার জন্য বলা, যদিদং হৃদয়ং মম...তারপর কী যেন...আর সহসাই মনে হল এ কী ছলনা করছি নিজের সঙ্গে!

—তার মানে!

কোনো জবাব দিতে পারছি না। সব কেমন বিস্বাদ ঠেকছে। বললাম, ও কিছু না। যাই।

মুকুল আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য সাইকেল বের করছে। সে আমাকে রোজ রেল গুমটি পর্যন্ত রাতে এগিয়ে দিয়ে আসে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সাইকেল বের করার আগে দরজায় উঁকি মেরে বললাম, বউদি যাই।

বউদির সেই কথা, সাবধানে যেও।

মুকুল বারান্দার নিচে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা পথ আমরা পাশাপাশি হাঁটব। দুজনের হাতে সাইকেল। কিছুটা পথ দুজনে সাইকেলে পাশপাশি, কিছুক্ষণ আবার গাছের ছায়ায় বসে থাকা কিংবা সাহেবদের কবরখানার কালভার্টে। কিছুতেই ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হয় না। বাড়িতে মা-বাবা চিন্তা করে, পিলুটা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে—এ সবের টান না থাকলে আমি যেন ফেরার কথা ভুলেই যেতাম।

সাইকেল বের করার সময় মুকুলই মনে করিয়ে দিল, বউদিকে বললে না!

—ওঃ ভুলেই গেছি। ও বউদি, বউদি শোনো।

বউদি বোধহয় মুকুলের ঘরের বিছানার চাদর পাল্টাচ্ছিল—কিংবা বিছানার লণ্ডভণ্ড অবস্থা ঠিকঠাক করছিল—আসতে পারছে না —ঘর থেকেই বলল, এত চেঁচাচ্ছ কেন! বলতে পার না। আমি কালা না কিরে বাবা!

—বউদি, মুকুল ইকনমিক্স-এ অনার্স নেবে। দুজনে বসে অনেক আলোচনার পর এটাই ঠিক হল!

বউদির ভারী গম্ভীর গলা—সে'বাবু যা ভাল বুঝবেন, করবেন। তোমরা যা ভাল বুঝবে করবে।

আসলে সংসারে যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, কী খাবে, পরবে সব ঠিক রাখে, তারই কোনো গুরুত্ব নেই। দু'বছরের মধ্যে কোথাকার এক বিলু এসে মাথার উপর বসে গেছে।

বউদির অভিমানটা কোথায় টের পাই। বউদি কী জানে না—একটা বয়সে মা-বাবা, ভাইবোন, একটা বয়সে সমবয়সী বন্ধুবান্ধব, আর একটা বয়সে চৈতালি সেন। চৈতালি সেন এলেই জীবনের একটা মহৎ পর্ব শেষ। এই পর্বটার কথা মানুষ কোথাও গিয়ে ভুলতে পারে না—এই পর্বটা বড় রহস্যময়, এই পর্বটা আছে বলেই পৃথিবীটা মানুষের কছে চিরদিন বেঁচে থাকার কথা বলে। সে যখন সব হারায়, তার এই পর্বটা, নদীর পারে কোন দূরবর্তী খেয়ার মতো থেকে যায়।

বউদির কোথায় লেগেছে বুঝি! বউদির ধারণা, আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে মত পাল্টেছি। আসলে তো অন্য ব্যাপার। চৈতালি কলকাতায় চলে গেলে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার আর কোনো মানে থাকছে না। আসল কারণ সেটাই। কিন্তু এসব কথা তো আর বউদিকে বলা যায় না।

রাস্তায় নেমে আসতেই শরতের এক আকাশ নক্ষত্র আর জ্যোৎস্না ঝপ করে মাথার উপর নেমে এল। লালদীঘির ধারে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। কত রকম ফ্যাশানের বাড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। শৌখিন মানুষেরা এখানে থাকে। জানালায় লাল নীল রঙের পর্দা। ভিতরে নিয়ন আলো। কোনো জানালায় সদ্য যুবতী হবে বলে বসে আছে মেয়ের মেঘলা করুণ মুখ। সবই আমাদের চোখে পড়ে। বিশাল দীঘির জল নিস্তরঙ্গ। নির্জন জ্যোৎস্না সেখানে খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমরা দুই সদ্য যুবক হয়ে-ওঠা পুরুষ চারপাশে নারী অন্বেষণে থাকি। স্বপ্নে তারা আসে। কখনও কোনো ফুলের উপত্যকায় হাত ধরে নিয়ে যায়। সহবাসের হাহাকার ভেতরে। এই হাহাকার নারীকে অপার মহিমায় আমাদের কাছে সাজিয়ে তুলছেন এক অদৃশ্য শক্তি—যেতে যেতে টের পাই। আমাদের যা কিছু আমাদের বড় হওয়া তারই জন্য এমন মনে হয়। যে-পথে সে হাঁটে বড় পবিত্র মনে হয়।

তখনই মুকুল বলল, যেখানেই যাক ছাড়া পাবে না। আমরা তাকে ছাড়ব না! তাকে ভালবাসবই।

কার সম্পর্কে মুকুলের এই ক্ষোভ বুঝি। সব কথাতেই মুকুল আমি না বলে আমরা বলে। আমরা যেন একটা কোড। আমরা অর্থাৎ এই যারা আমাদের মতো বয়সী মানুষেরা বড় হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে চৈতালি সেনদের আত্মরক্ষার কোনো উপায়ই নেই।

'আমরা' আরও নতুন অর্থ বয়ে আনে আমাদের কাছে। আমরা চৈতালি সেনকে ভালবাসব। এই 'আমরা' অর্থে আমি এবং মুকুল। মুকুল মাঝে মাঝেই বলবে চৈতালিকে আমরা দুজনেই ভালবাসব। কী বল! যেন চৈতালির মতো মেয়ের পক্ষে একজনের ভালবাসা যথেষ্ট নয়। তার জন্য দুজন পুরুষ দরকার।

ঠাট্টা করে বলতাম, কিন্তু এক ঘরে দুজনে ঢুকব কী করে?

—কেন, দ্রৌপদী যদি পঞ্চপাণ্ডব সামলাতে পারে, চৈতালি আমাদের দুজনকে সামলাতে পারবে না।

—পারবে তবে অসুবিধা আছে।

—না কোনো অসুবিধা নেই। তোমার জুতো দেখলেই বুঝব, ঘরের ভেতর তুমি আছ। আমার দেখলে বুঝবে আমি আছি।

—তা হলে বলছ, দু-রকমের দু জোড়া।

—তাই। তবে আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। কী ঠিক বলিনি।

—ঠিক না বলে আমার উপায় থাকে না। যে মেয়ে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে , তার জন্য দু জোড়া কেন, পাঁচ জোড়া থাকলেও অসুবিধা হবার কথা না।

মুকুল ভারী তৃপ্তি পেত এমন সব আজগুবি চিন্তা-ভাবনা করে। পুরুষের কাছে মেয়েদের এই নারীমহিমার কথা চৈতালির দিদিরা টেরই পেল না। আইবুড়ো হয়ে থাকল—কিসের অপেক্ষাতে আমাদের মাথায় সেটা কিছুতেই আসে না।

লালদীঘির পাড় ধরে আমরা হেঁটে যাই। কিছু মানুষজনের চলাফেরা, একটা রিকশা চলে গেল, আমরা এত অন্যমনস্ক থাকি যে রাস্তাটার ধার ধরে হাঁটতে হয়। সাইকেলে উঠি না। সাইকেলে উঠলেই রাস্তাটা কেমন খুব ছোট হয়ে যায়। যেন উঠতে না উঠতেই রাস্তা শেষ। শহর থেকে রেল-লাইনের দিকে যে রাস্তা গেছে, সেখানে এলে আমরা সাইকেলে চাপি। ধীরে ধীরে, হাওয়া খেতে খেতে এগোনো।

আসলে বুঝতে পারি, বাড়ি গেলেই কেন জানি একা হয়ে যাই। কারো পাশে থাকার কথা যেন। সে না থাকায় অর্থহীন মনে হয় সব কিছু।

বাড়ি যেতেই দেখলাম পিলু দৌড়ে আসছে। পিলু দৌড়ে এলেই বুঝি, বাড়িতে আমাদের জন্য কেউ সুখবর বয়ে এনেছে। খবরটা আগে পিলু দিতে না পারলে শান্তি পায় না। কতক্ষণে দাদাকে বলবে, জানিস দাদা, আজ না.....।

পিলু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দাদা আজ না....

—আজ কি?

—আজ না, মিমিদির দাদু এসেছিল।

বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। আমার যাবার কথা ছিল, যাইনি বলে নিজেই হাজির! পরীর কিছু হয়নি তো! শহরের এতবড় মানী মানুষ, এমন একটা জঙ্গলের মধ্যে হাজির হয়েছিল!

বললাম, কেন এসেছিল? পরী পাঠিয়েছে?

—পরীদি পাঠাবে কেন? পরীদি কিছু জানেই না। বাবাকে বলল, দশ কান করবেন না। চেষ্টা করছি, মনে হয় হয়ে যাবে।

সাইকেল থেকে নামতে লণ্ঠনের আলোয় বারান্দায় বাবাকে দেখা গেল। মা পাশে বসে আছে। দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পুত্রের ফেরার আশায় থাকতে কোনোদিন দেখিনি। বাবাকে মা তালপাতার পাখায় হাওয়া করছে।

বুঝতে পারছি, আমাদের পরিবারের পক্ষে বড়ই সুখবর কেউ দিয়ে গেছে আজ। মা বাবা সবাই বড় বেশি প্রসন্ন। আমাকে দেখেই বাবা বলবেন, সাইকেলটা রেখে বিশ্রাম কর। পিলু তোর দাদার সাইকেলটা তুলে রাখ। মায়া যা, দাদাকে এক বালতি হাতমুখ ধোবার জল এনে দে।

বারান্দায় একটা জলচৌকি, কাঠের চেয়ার। মার তাগাদাতেই এসব করা। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর আরও কত কাজ বাকি থাকে বাবাকে দেখে বুঝতে পারছি। যজন-যাজনে সংসার চলে, যজমানরা কেউ কেউ বেশ সচ্ছল। শুভদিন, শুভযাত্রা, পূজা-আর্চ্চার বিধি এসব জানতে তারা আসে। বসতে দেবার কিছু না থাকলে ঘরবাড়ির সুনাম নষ্ট। মা লেগে থেকে হালে এ দুটো মূল্যবান জিনিস মিস্ত্রি লাগিয়ে করে নিয়েছে। প্রতিবেশীদের কার বাড়িতে কী নতুন জিনিস এল মার কানে পিলু তুলবেই। কিংবা বিকালে মা এর-ওর বাড়ি গেলে দেখতে পায় বালতি, পেতলের হাঁড়ি। কবে কিনলি আকাশীর মা। সের দুই চালের খিচুড়ি ধরবে। মার কাছে পেতলের ডেগ, পেতলের বালতি, পেতলের ঘটি সোনার চেয়েও দামী। বাড়ি ফিরে অপ্রসন্ন মুখে শুধু অভিযোগ, কিছু নেই, এই যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আসছে, একটা পেতলের ডেগ লাগে না। চেয়ে চিনতে কাহাতক আনা যায়। বাবা তখনই বুঝতে পারেন হয়ে গেল, কিনে না আনা পর্যন্ত সময়ে অসময়ে মার চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে যাবে।

আজ অন্যরকম। জলচৌকিতে বসতেই বাবা বললেন, ঈশ্বরের করুণাই সব। তাঁর কী মর্জি কেউ বুঝতে পারে না।

বাবা আমাকে কিছু বলবেন, তারই প্রস্তুতিতে এসব ভাষণ। আমি চুপচাপ আছি। পরীর দাদু কেন এসেছিল, জানার যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বড়লোকদের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা নেই। মনে হয় এই অর্থ প্রতিপত্তির পেছনে বড় রকমের কোনো অনাচার কাজ করছে। এঁরা সাধু পুরুষ নন। মানুষ তার পরিশ্রমের বিনিময়ে কতটা উপার্জন করতে পারে আমি বুঝি। পরীদের যা বৈভব, তা রক্ষা করতে কোথাও কারও চোখ উপড়ে ফেলা হচ্ছে না, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। শহরের রাস্তাঘাট ধরে যাবার সময় বিশাল বিশাল বাড়িঘর দেখলেও এটা মনে হয়। এরা কেউ সৎভাবে বেঁচে নেই। সৎভাবে একজন মানুষের উপার্জন এত প্রাচুর্য এনে দেয় না—এটা আমার বিশ্বাস। পরীদের বাড়ি গেলে এটা আমার আরও বেশি মনে হয়। দাবার কূট চালে এরা প্রতিপক্ষকে হারিয়ে ঘোড়া হাতি সব কেড়ে নিয়েছেন। সেই মানুষ আমাদের কলোনিতে এলে, বাবার গর্ব বোধ হতে পারে, আমার কেন জানি হয় না। বাবার প্রচণ্ড ঈশ্বর বিশ্বাসও মাঝে মাঝে আমাকে ক্ষোভের শিকার করে

তোলে। ভেতরে চটে যাই—বাবা কষ্ট পাবেন বলে কিছু প্রকাশ করি না। যতটা পারি কম কথা বলি। হাঁ হুঁ—এই পর্যন্ত।

মায়া বারান্দার নিচে এক বালতি জল রেখে ঘরে গামছা আনতে গেল। চিরদিনই কিছুটা গম্ভীর এবং কম কথার মানুষ আমি। বাবার জন্যই যেন এটা হয়েছে আমার। আমার বাবা একজন অপরিচিত মানুষের কাছে যে ভাবে ঘরবাড়ির কথা খোলাখুলি বলে দেন—আমার তা পছন্দ নয়। আমার সম্পর্কেই তাঁর বেশি গৌরব। এই যে বিলুটা আই এ পাশ করল সোজা কথা! আই এ পাশ করলে সরকারি কাজ পাবেই। পাবে না মানে—প্রাথমিক ইস্কুলের মাস্টারি বেশিদিন করবে না। ঠেকা দেওয়া, চেষ্টা-চরিত্র চলছে, মানুও চেষ্টা-চরিত্র করছে। লোকের কাছে এমন শুনলেই আমার মাথা আর ঠিক রাখতে পারতাম না। —রাখেন তো আপনার মানু! তিনি আমাকে বাসের কনডাকটার করতে পারলেন না এটাই তাঁর জ্বালা! আমি সব বুঝি বাবা। নিজের ছেলেগুলো সব চোর বাটপাড় হচ্ছে, আপনার ছেলের ভাল তিনি চাইবেন কেন! না হলে একটা গ্যারেজে আমাকে ঢোকায়!

এ-সব কথাবার্তা রাতে খেতে বসলেই বেশি হয়।

বাবা বলতেন, মানু কী জানত গোবিন্দ তোকে মারধর করবে।

—গ্যারেজে কী হয় আপনি জানেন না বাবা! আর বাবাকে তো বলাও যায় না, কত রকমের কুৎসিত কথাবার্তা হয়। আমাকে যার তার বাচ্চা বলে গাল দেয়। বাবাকে এইসব খিস্তিখাস্তার কথা বলতেও পারি না, অথচ বাবার মানুপ্রীতি আমার মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার করে। সেই জ্বালায় দেশান্তরী হয়েছিলাম। ভাগ্যিস ছোড়দি ছিল! না হলে হয়ত এ-জীবনে আর ফেরাই হত না, পড়াও হত না, পরীর সঙ্গে দেখাও হত না।

বাবার এই এক স্বভাব, কারো কাছে এতটুকু উপকার পেলে বর্তে যান। আমরা ছিন্নমূল হবার পর নানা জায়গায় ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত বাবার খুবই নিকট আত্মীয় মানুকাকার বাসায় এসে উঠেছিলাম। চার-পাঁচ বছর আগে বাবা এই উঠতে পারার কৃতজ্ঞতায়, এখনও এক কথা, মানুটা না থাকলে কী যে হত!

—দোষ নেই। গুণই বা কী আছে। ক্যাম্পে যান দাদা—ক্যাম্পে নাম লিখিয়ে দিচ্ছি। সোনার হারটা বন্ধক ছিল, সেটা নাকি সুদেই উশুল হয়ে গেল। দু-ভরির হার। ভাগ্যিস আর তোমার ভাইয়ের বুদ্ধিতে পড়িনি। সব বিক্রি করে এই জমি। থাকলে আমাদের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত।

বাবার তখন আপ্তবাক্য—কেউ কাউকে সর্বস্বান্ত করতে পারে না ধনবৌ। নিজে সর্বস্বান্ত না হলে, কেউ কাউকে সর্বস্বান্ত করতে পারে না।

এখন আর বাবার সেই চরম আপ্তবাক্যটি আমাদের শুনতে হয় না। নতুন নতুন আপ্তবাক্য বাবা এখন ঝোলায় সংগ্রহ করে রাখছেন।

একদিন কী কারণে মা'র ক্ষোভ বাবার উপরে চরমে উঠলে, কেঁদে ফেলেছিল মা—তোমার মানুভাই, বুঝলে তোমার পরম আত্মীয় আমার দু-ভরির হারটি বন্ধকই দেয়নি। তুমি ফুসলালে বলে দিয়েছিলাম। তুমিই তো বললে,—মানুর বাসায় উঠেছি, একা এতগুলি পেট চালাবে কী করে। কিছু থাকলে দাও। ওর হাতে দিই। বন্ধক দিয়ে কিছু যদি মেলে। ও টাকাটা হাতে ধরে দিতে পারলে, সময় পাওয়া যাবে—ঠিক কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমরা জানতাম, মা'র স্বর্ণালঙ্কার নেই। ইস্টিশনে পড়ে থেকেছি, ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছি, দু-একটা অলঙ্কার যে মা বাবার হাতে তুলে দেয়নি অন্ন সংস্থানের জন্য তা নয়, তবে মা দিয়েই বলত, আর কিছু নেই। এই নেই নেই করেও মা তার শেষ সম্বল বাবার হাতে তুলে দিয়েছিল এই জঙ্গলের মধ্যে জমি কেনার জন্য। তার আগে মা'র দু-ভরির হারটি মানুকাকা সুদের নাম করে গস্ত করেছে। মানুকাকার বাড়িতে গিয়ে মা একদিন দেখে এসেছে হারটি কাকিমার গলায় শোভা পাচ্ছে।

এখন আবার পরীর দাদু হাজির। তাঁর কী মর্জি বুঝতে পারছি না। তিনি কেন এই কলোনিতে হাজির বুঝতে পারছি না। আমাকে তাঁর এত কী দরকার, যে কারণে এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। হাতমুখ ধুয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছি রান্নাঘরে—মা থালা সাজিয়ে দিচ্ছে, মায়া পাতে

পাতে নুন দিচ্ছে, জল দিচ্ছে, বাবা গণ্ডুষ করছেন, আমি পিলু গণ্ডুষ করছি—অথচ কেউ কোনো কথা বলছি না।

বোধহয় বাবা পরীর দাদুর আগমনবার্তাটি আমাকে কীভাবে দেবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

বাবা খাচ্ছেন। গাছার উপর একটা কুপি জ্বলছে। শেয়াল ডাকছিল। কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। মা ভারী প্রসন্ন—বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবাই বলবেন বোধহয় এমন ঠিক হয়ে আছে। পিলু যে পিলু রাস্তায় গিয়ে রায়বাহাদুরের আগমনবার্তাটি দিয়েছিল সেও চুপ।

বাবা ভাত থেকে একটি ধান বেছে থালার বাইরে ফেলে দেবার সময় বললেন, বুঝলে মানুষই মানুষের সম্বল।

আমি জানি, কিছু না বললেও বাবা তাঁর কথা বলে যাবেন।

—বুঝলে, শুধু মানুষ হবে কেন, এই যে কীটপতঙ্গ, প্রাণিজগৎ, গাছপালা, মাটি জল হাওয়া সবই মানুষের বেঁচে থাকার জন্য। তাঁরই অশেষ করুণা না থাকলে, রায়বাহাদুরের মতো মানুষ তোমাদের ঘরবাড়িতে আসবেন কেন!

বাবা তাঁর ঘরবাড়ি বানাবার পর, কোনো বিশিষ্ট মানুষ এলে খুবই খুশি হন। যেন বলা, দেখ এই যে ঘরবাড়ি বানিয়েছি, ও শুধু তোমার আমার আশ্রয় নয়—ঘরবাড়ির সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নও থাকে। মানুষজন এলে সেটা বাড়ে।

বাবা কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলছেন ঠিক যেন এখন বুঝতে পারছি না। পরীর সঙ্গে একবার বাদশাহি সড়ক দিয়ে জিপে এস ডি ও পরেশচন্দ্র আমাদের বাড়ি হেঁটে এসেছিল—একটা ম্যানাস্ক্রিপ্টের প্যাকেট দিয়ে পরী পাঠিয়েছে। এস ডি ও সাহেব আমাদের বাড়ি আসায় বাড়িঘরের মর্যাদা বাবার কাছে কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, টের পেয়েছিলাম পরে। নিবারণ দাসের সঙ্গে দেখা, কী বিলু, তোমাদের বাড়িতে নাকি সদরের এস ডি ও এসেছিলেন।

বলেছিলাম, হ্যাঁ।

জীবন পরানের সঙ্গে দেখা, তাদেরও এক কথা।

কলোনির ঘরে ঘরে বাবা খবরটা পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। আসলে তাঁর পুত্রগৌরব কোথায় গিয়ে ঠেকেছে সেটাই প্রমাণ করার উদ্দেশ্য। নরেশমামা পর্যন্ত তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন শুনে। তিনি নিজে একটা মেয়েদের প্রাথমিক ইস্কুল খুলেছেন, তাঁর অনুমোদন যদি এস ডি ও সাহেবকে ধরে করিয়ে দিই—এই মানুষটির প্রতি কেন জানি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। পরীকে কথাটা বলতেই, সে বলেছিল হবে। এবং হয়েও গেছে।

বাবা ফের বললেন, তোমার তাঁর কাছে যাবার কথা, তুমি গেলে না। তোমাদের মান-সম্মান বড়ই ঠুনকো। বড়লোক কেউ এমনিতে হয় না। ভিতরে কিছু না থাকলে অত উপরে ওঠা যায় না। পূর্বজন্মের পুণ্যফল। তুমি গেলে ছোট হয়ে যেতে না। তিনি যে এলেন তাতেও তিনি ছোট হয়ে যাননি। তোমার প্রতি তাঁর কত আগ্রহ যদি বুঝতে! তোমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন।

আগ্রহ থাকারই কথা। পরীর দাদুর এখন মহাসঙ্কট। তিনি পরী ছাড়া সংসারে কিছু বোঝেন না। পরীর বাবা রেলে খুবই বড় কাজ করেন। এখন মোকামাঘাটে আছেন। পরীর মাও সেখানে। রেলে খুবই বড় কাজ করলে, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। পরী সেজন্য দাদুর কাছেই মানুষ। পরীর মাকে একবারই দেখেছি কালীবাড়িতে। পরীর বাবাও গিয়েছিলেন। রায়বাহাদুর মানুষটি পূজা উপলক্ষে বাড়ির ছেলেরা প্রবাস থেকে ফিরলে বাবাঠাকুরের কাছে সবাইকে নিয়ে যান। সেই উপলক্ষেই দেখা।

বাবা বললেন, আই এ পাশ করে তুমি মাস্টারি করছ—এতে নাকি কোনো উন্নতি নেই।

আমি বললাম, কী বলেছে বলুন না। কারণ ধৈর্য রক্ষা করতে পারছি না।

বাবা মা'র দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন।

—খুবই সুখবর। ঠাকুর চোখ তুলে তাকিয়েছেন।

সুখবরটা কী বুঝতে পারছি না। পিলুর দিকে তাকিয়ে আছি সে যদি সুখবর দুম করে দিয়ে দেয়। কিন্তু পিলু এতবড় সুখবর দিতে সাহস পাচ্ছে না কেন বুঝি না। রায়বাহাদুরের সঙ্গে বাবার কথাবার্তার সময় পিলু কাছে থাকবে না, হয় না।

বাবার দাঁতের ফাঁকে কুমড়োর ডাঁটার ছিবড়ে ঢুকে গেছে। বাবা এখন যা, দু-আঙুলে বের করার চেষ্টা করছেন। খুবই উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন, আবার কোথাও একটা যেন গলায় কাঁটা ফুটে আছে। সুখবর অথচ বাবার এহেন অবস্থায় আমি কিছুটা বিপাকে। ধৈর্য রাখা গেল না। পাত থেকে উঠে পড়লাম। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বাবার সুখবরের প্রত্যাশায় কতক্ষণ আর বসে থাকা যায়।

বাবা খুব নিরুত্তাপ গলায় বললেন, বোস।

আবার বসে পড়তে হল।

—রায়বাহাদুর একটা চিঠি টাইপ করিয়ে রাখবেন। তুমি কাল গিয়ে সই করে দিয়ে এস।

—কী চিঠি!

—রেলে তোমার চাকরি। বললেন, বিলু ইস্কুলের মাস্টারি কী করবে! খুবই ধীর স্থির ছেলে। বিচারবুদ্ধি আছে। ঠিক জায়গায় পড়লে চড়চড় করে উন্নতি।

—রেলে চাকরি!

—তাই। বললেন, দরখাস্তটা তিনি তাঁর বড় ছেলের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। রেলের হোমরাচোমরা হতে তোমার সময় লাগবে না।

বাবার ধারণা, পরীর বাবা রেলের হোমরাচোমরা এবং আমারও সেই সম্ভাবনা যখন আছে, তাছাড়া এমন মন্তব্য পরীর দাদু যখন করে গেছেন—তখন আমরা পরীদের প্রায় সমপর্যায়ের। বাবার গৌরব রাখার দেখছি এখন জায়গা নেই।

বাবা বললেন, সবই গ্রহরাজের কৃপা বুঝলে। গ্রহরাজ প্রসন্ন থাকলে কেউ আটকাতে পারে না। গ্রহের ফেরে আমরা এতদিন দারিদ্র্য ভোগ করছি। গ্রহ প্রসন্ন, সুতরাং আমাদের সুদিন সমাগত। বাবা যেন পারলে এমনও বলতেন।

খবরটা আমার খুবই সুখবর সন্দেহ নেই। এতটা আশা করতে পারিনি। পরী তবে সত্যি আমার জন্য ভাবে। পরেশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ ঠিক, পরীর মত নেই বলে শুভ কাজ হচ্ছে না, আমার উপর দায় ছিল, বাবাঠাকুরকে ধরে বিয়ে ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করা—কিন্তু বাবাঠাকুরের কাছে আমার যাও-য়াই হয়নি, এসব সত্ত্বেও পরী আমার জন্য ভাবে, তার সঙ্গে আমার যত বিরোধ ইস্কুলের মাস্টারি নিয়ে, সে চায় না, চায় না বললেই তো হবে না—অন্য কিছু একটা বন্দোবস্ত না করলে বাবার সংসারই বা চলবে কী করে। পরী এত বোঝে। অথচ পরীকে অপমান করার চেয়ে বড় সুখ আর আমার কিছু নেই।

—বিলু এ লেখাটা দেখ ছাপা যায় কি না। ভদ্রলোক বলেছেন, একটা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দেবেন।

—রেখে যাও। দেখব।

—না রেখে যাব না। তোমাকে কথা দিতে হবে বিলু।

—কথা দেওয়া যাবে না। পাঠ্য হতে হবে। অপাঠ্য হলে কী করে ছাপব? দয়া করে তোমার আমাদের কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ না করলেও চলবে। বিজ্ঞাপনের জন্যে কাগজে ছাই-পাঁশ ছাপতে আমি রাজি না।

পরী সহসা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আর ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেই কেন জানি আমি আরও বেশি মজা পাই।

পরীর তখন এক কথা, আমি বেহায়া বলে আসি। অন্য মেয়ে হলে তোমার মুখ দর্শন করত না। স্বার্থপর।

— কে আসতে বলেছে! তুমি না থাকলেও কাগজ ঠিক চালাব।

আমি জানি পরী না থাকলে কাগজ চালাবার মুরোদ আমাদের থাকবে না। কিন্তু পরীর কাছে

আর সবই করতে রাজি কিন্তু খাটো হতে রাজি না। আসলে এদেশে আসার পর সচ্ছল পরিবারের প্রতি আমার কেন জানি বড় রাগ জন্মে গেছে। বড়লোক হলে তো কথাই নেই। পরী আমাদের ঠেকে ভিড়ে যেতেই, হাতের কাছে একটা চরম সুযোগ পাওয়া গেছে যেন। পরী কী বোঝে কে জানে, মাঝে মাঝে একা থাকলে, বিরোধের সময় চোখ জলে ভেসে যায়। আর পরী এটা জানে, আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু চোখে জল সহ্য করতে পারি না। তখন পরী যা বলবে, আমি গোলামের মতো সব করে যাব। পরীর কথাই শেষ কথা।

নিজেকে বড়ই অকৃতজ্ঞ ঠেকছে। পরী এত করছে। অথচ আমি একবার বাবাঠাকুরের কাছে গেলাম না। আমি গেলে তিনি বালকের মতো চঞ্চল হয়ে পড়বেন জানি। চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে, ওরে বদরি, ও বউমা, দেখ বিলু এসেছে। আমার দিকে তাকিয়ে হয় তো বলবেন, এই ছোঁড়া না বলে না কয়ে ভেগে গেলি। বেটা লক্ষ্মীকে ভজাতে চেয়েছিলি—লক্ষ্মী ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। কিছুই মুখে আটকায় না। আর এ সময় যদি পায়ে গড় হই, বলি বাবাঠাকুর পরী আমাকে পাঠিয়েছে। অবশ্য পরী বললে তিনি চিনবেন না, সুতরাং বলতে হবে, বাবাঠাকুর মৃন্ময়ী আমাকে পাঠিয়েছে। পরীর দাদু আপনার অনুমতি নিতে আসবে বাবাঠাকুর। আপনি অনুমতি না দিলে মিমিদের সংসারে কুটোগাছটি নড়ে না, বাবাঠাকুর আপনি অনুমতি দেবেন না, বাবাঠাকুর মিমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছে বিয়ের কথা ভেবে। পরীর বিয়ে হয়ে গেলে, কোথায় এস.ডি ও সাহেব বদলি হয়ে যাবেন, আমরা পরীকে আর দেখতে পাব না, পরী আমাদের দেখতে পাবে না—পরীর কষ্ট, পড়া ছেড়ে দিতে হবে—পরীর কষ্ট, সে মিছিল করতে পারবে না, নাটক করতে পারবে না, পরী না থাকলে আমাদের অপরূপা কাগজ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের কবিতা ছাপবার জায়গা থাকবে না। কবিতা ছাপা না হলে আমরা কী নিয়ে থাকব। কী নিয়ে বাঁচব। এসব যে কতবার ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে রাত কাবার করে দিয়েছি, ঘুম আসেনি। পরী আমি সমবয়সী, পরী কেন বোঝে না, আমার পক্ষে এমন কথা শোভন নয়। বাবাঠাকুর বলতেই পারেন, তুই ক্যারে, ভাগ। ওর দাদু ভাল বোঝে, না তুই ভাল বুঝিস। মিমির বিয়ে হবে কি হবে না, সে ঠিক করবে ওর বাবা কাকারা। তোর কথায় আমি বলব! আমি একটা চ্যাংড়া ভেবেছিস। বের হ। এই বদরি শোন, বিলু কী বলছে! মিমির নাকি ইচ্ছে নয় বিয়েতে বসার। মিমির ইচ্ছে অনিচ্ছে কি। বাবা-মার ইচ্ছে অনিচ্ছেই সব। এ কি অনাসৃষ্টি কথা! তুই দেখছি মিমির সর্বনাশ করতে চাস্। তুই মিমির ঘোর শত্রু। ভাগ ভাগ! পরেশচন্দ্র রত্ন বিশেষ।

সবার কাছেই পরেশচন্দ্র রত্ন বিশেষ। আমার বাবার কাছেও। এইটুকুন ছেলে সদরের এস.ডি ও। ত্রিশও হয়নি মনে হয়। কী সৌম্য আচরণ!

রেগে গিয়ে বলেছিলাম, কী সৌম্য আচরণ দেখলেন। আপনার সঙ্গে তো কথাই হয়নি।

—তোমার সঙ্গে কথা বলার ধরন দেখে বুঝেছি।

পিলু তখন বলল, বাবা, দাদা রেলে কী চাকরি করবে?

—শিক্ষানবিসীর কাজ। ট্র্যাফিক ইনসপেক্টর হয়ে যাবে পরে—এরকমই কী যেন বলল। ইস্কুলের ডাবল মাইনে হাতে পাবে। সংসারের খাওয়াপরা নিয়ে আর আমাদের ভাবতে হবে না। আসলে বুঝতে পারছি, বাবার চোখে কৃতী পুত্রের ছবি ভেসে উঠছে। যজমানি বামুনের পুত্রটি কত লায়েক বাবা পূজাআর্চা করতে গিয়ে গর্বের সঙ্গে বলতে পারবেন।

বাবা বারান্দায় উঠে যাবার সময় বললেন, কত দেশ তোমার ঘোরা হবে। রেলের পাশ পাবে। রেলের পাশ পেলে ভাবছি তোমার মাকে নিয়ে তীর্থ করতে যাব।

আমার বাবা এরকমেরই। এখনও কিছু ঠিকই হয়নি—অথচ ভেবে ফেলেছেন, চাকরিটা আমার হয়ে গেছে।

বাবা এখন জলচৌকিতে বসে তামাক খাবেন।

মা আজ এতই প্রসন্ন যে, মায়াকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাবাকে তামাক সাজিয়ে দেবার জন্য।

রান্নাঘর থেকেই বললে—হ্যাঁগো আমরা আগে তারকেশ্বরে যাব। জাগ্রত ঠাকুর। মানত করেছিলাম, বিলুটার ভাল কাজটাজ হলে শিবের মাথায় বেলপাতা দেব।

—শুধু তারকেশ্বর কেন ধনবৌ। কামাক্ষ্যা বল, কাশীর বিশ্বনাথ বল সব তোমার পুত্রের কল্যাণে দর্শন হয়ে যাবে। গ্রহাচার্য বলেছে, আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বৃহস্পতি এখন একাদশ স্থানে—যা কিছু হবার এই সময়। বড় সুসময় আমাদের।

এই কাজটা হলে আমি সত্যি তবে বর্তে যাব। স্বপ্নের দেশে যেন চলে যাচ্ছি। এখনই কাউকে বলা যাবে না। আগে একবার যাই, দেখা করি পরীর দাদুর সঙ্গে। দরখাস্তে সইসাবুদ হয়ে গেলে তিনি তাঁর বড় পুত্রের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তিনি চাকরির পাকা বন্দোবস্ত করছেন এমনও বলে গেছেন পরীর দাদু। কিন্তু পরীর সঙ্গে দেখা হলে কী বলব!

মনে হল পরীকে সোজাসুজি বলে দেওয়াই ভাল হবে, না যাইনি। বাবাঠাকুরের কাছে আমার যাওয়া হয়নি। সাহসে কুলাচ্ছে না।

কিন্তু জানি, এমন কথা শুনলে, পরীর দু চোখে তিক্ততা ফুটে উঠবে। কাতর চোখে সহসা আগুন জ্বলে উঠবে—তুমি বিলু নিজেকে ছাড়া কিছু বোঝো না। তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। তুমি আমার শত্রুতা করতে পার, কিন্তু কোনোদিন আমি তোমার শত্রুতা করব না। তোমার মাস্টারি আমার ভাল লাগছিল না, তোমার মতো ছেলে একটা প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ে থাকলে, আমার কোনো আর অবলম্বন থাকে না। রেলে বড় চাকরি হলে, আমার সাহস বাড়বে।

এই সুখস্বপ্নটা আমাকে কাতর করছিল। রেলের চাকরিটা হলে পরীর মর্যাদা নষ্ট হবে না। কিন্তু কোথায় সদরের এস ডি ও আর কোথায় রেলের একজন শিক্ষানবিসী। তার আগেই পরী চলে যাবে। নিজেকে কেন জানি বড় অসহায় লাগছিল। দূরে চাকরি নিয়ে চলে গেলে পরীকে আর দেখতে পাব না এও একটা কষ্ট। এই বাড়িঘরের প্রতিও টান ধরে গেছে, মাঠ পার হলে বাদশাহি সড়ক, দুই বন্ধুর সাইকেল আরোহীর অলৌকিক ভ্রমণ, বালিরঘাটে বসে জ্যোৎস্নায় ডুবে যাওয়া সব আমার হারিয়ে যাবে। আমি খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে যাব।

এতগুলি বিষয় আমাকে ভাবাচ্ছে।

পিলু দরজা বন্ধ করে মশারি টানিয়ে আমার পাশে এসে শুল। বলল, দাদা আমি তোর সঙ্গে যাব।

—যাবি। আগে কাজটা হোক।

—কাজটা হবে।

—কী করে বুঝলি?

—মিমিদির বাবার হাতেই সব। মনে হয় মিমিদিরই ইচ্ছে। না হলে মিমিদির দাদু ছুটে আসতেন না।

পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, হবে হয়ত!

—তুই ছুটিতে আসতে পারবি।

—তাও বলে গেছে?

—হ্যাঁ, সবই তো বলল, অনেক ছুটি আছে। রেলের পাশ, উপরি রোজগার কত কী!

—উপরি রোজগার! সে আবার কী!

পিলু বলল, বাবাও অবাক। বললেন, উপরি রোজগার মানে?

—এ কাজে অনেক উপরি রোজগার। সে আপনি বুঝবেন না! আপনার ছেলে কাজে ঢুকলে বুঝতে পারবে।

উপরি রোজগারটা ঠিক ধরতে পারছি না। ঘুষের কথা বলছেন। ঘুষ না নিলে বড় হওয়া যায় না। মর্যাদা রক্ষা হয় না পরিবারের।

কিন্তু বাবা ঘুণাক্ষরে টের পেলে, সোজা বলবেন, দরকার নেই—মানুষের অসাধু জীবন, সংসারে মঙ্গলজনক হয় না। পাপ। কত পাপে না জানি দেশছাড়া হয়েছি, পাপ বাড়িয়ে লাভ নেই। জীবন তো একটাই। পরজন্মে, কীটপতঙ্গ হয়ে কে বেঁচে থাকতে চায়।

অর্থাৎ এই পাপ বাবার জীবনে শুধু ইহকালের দায় নয় পরকালেরও। এমন বাবার পুত্রের পক্ষে

উপরি রোজগার খুবই বিপজ্জনক বিষয়। বাবা হয়তো কথাটার অর্থ ধরতে পারেননি, অথবা ভেবেছেন, অসৎ কাজে প্রবৃত্ত হবে এমন ইন্দ্রিয়াধীন তাঁর পুত্র নয়। না হলে এই একটা কথাই বাবার সব প্রসন্নতা নিমেষে হরণ করে নিত।

শুয়ে পাশ ফিরছি। এ-পাশ ও-পাশ করছি। ঘরের বেড়াতে খোপকাটা দরমার জানালা। হাওয়া একদম ঢোকে না। বাবা এই গরমে বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। মা-ও। মাঝরাতের দিকে গরমের তাপ কমলে ঘরে উঠে যান। আমি ঘামছিলাম। শিয়রে তালপাতার পাখা থাকে। মাঝে মাঝে হাওয়া করছি। বাইরে জ্যোৎস্না। ঘুম আসছিল না। পিলু বেশ ঘুমোচ্ছে। শরীরে এত তাপ নিয়ে বাঁচা যায় না। দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলাম। বারান্দায় দেখছি মা বাবা কেউ নেই। শুধু গাছপালাগুলি বাড়িটাকে এখন পাহারা দিচ্ছে। সাপের উপদ্রব আছে। তবে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি ভাসমান বলে সব দেখা যায়। রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে খাল। জলে ভরে গেছে। দু একটা মাছের নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে। জোনাকি উড়ছিল। বাদশাহি সড়কে গরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। কোথাও কুকুর ডাকছে। কটা ডাহুক পাখি তারস্বরে ডেকে উঠল। সবই কেমন বিস্ময়ের সঞ্চার করছে। রেলের চাকরি হয়ে গেলে—এই জীবন থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়ে যাব। কোন সুদূরে চলে যাব কে জানে।

এই জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে কী এক অপার রহস্য মানুষের জীবনে, ভাবছিলাম—মানুষ নিরন্তর স্থানান্তরে চলে যাচ্ছে। তার শেকড় এক জায়গায় ঢুকে যায়, অন্য প্রজন্মে সেই শেকড় আবার আলগা হয়ে যায়। আমি চলে গেলে, বাবার এই ঘরবাড়িতে আমার জন্য রাতে কেউ আর অপেক্ষা করে থাকবে না। হুটহাট পরী চলে আসবে না। মুকুল নিখিল নিরঞ্জন সাঁঝবেলায় জ্যোৎস্নায় সাইকেলে এসে হাজির হবে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকবে না, বিলু আমরা। অযথা একসঙ্গে সাইকেলগুলির বেল বেজে উঠবে না। কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে আম গাছের ছায়ায় আমি আর মুকুল শুয়ে বসে কবিতা পাঠ করব না। আমার কবিতা মাথায় উঠে যাবে। আসলে মানুষ সঙ্গদোষে বোধহয় কবি হয়, গল্পকার হয়—পরী মাথার মধ্যে কবিতা ঢুকিয়েছিল, সঙ্গদোষে তার বাড়াবাড়ি ঘটেছে। আসলে জীবনে বাহবা অর্জনই এই কবিতাচর্চার দিকে আমায় টানছে। আর এই বাহবা পরী যখন দেয়, তখন আমি রাজার মতো বেঁচে থাকি।

অথচ সেই পরীর খোঁজ নিইনি। তার কাছে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। কাল আমাকে পরীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। পরীকে দেখার জন্য মনটা কেন এই গভীর রাতে এত আকুল হয়ে উঠল বুঝতে পারছি না। যেন পারলে এক্ষুনি সাইকেল নিয়ে ছুটে গেলে ভাল হয়। পরী কী রোজ দোতলার বারান্দায় আমার জন্য সকাল বিকাল অপেক্ষা করে থাকে। পরীর দাদু কী পরীর কোনো খবর দিয়ে যাননি! পরীর যে বিয়ে হবে—কথাবার্তা চলছে, বাবা কী তা জানেন! এ সময় নিজের উপরই কেমন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একবারও আমি পিলুকে ডেকে বলিনি, পরীর কথা কিছু বলল। পরী তো চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। পরী খোলামেলা, বেপরোয়া, অথচ মেয়েটার মধ্যে কোনো অতি চালাকি নেই—এমন যার স্বভাব, সে কেন একবার অন্তত খোঁজ নিতে এল না, বাবাঠাকুরের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটাতে আমি কী করলাম!

তাহলে কী পরী ভেবে ফেলেছে, বিলুটা কর্মের নয়। পরী আমার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। যে পরীর জন্য এতটুকু সাহস দেখাতে পারে না, তার উপর নির্ভর করা নিছক পাগলামি। পরেশচন্দ্র অনেক বেশি নির্ভরশীল। ভাবতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। পরী হয়ত সবই মেনে নিয়েছে। তবু আমি থাকলে পরীদের পরিবারে কাঁটা হয়ে থাকব, সেই ভেবে কী পরীর দাদু আমাকে দেশান্তরী করতে চাইছেন। ঠিক কিছুই বুঝছি না।

যত এ-সব ভাবছিলাম, তত কেমন তলিয়ে যাচ্ছি। গাছের গুঁড়িতে চুপচাপ হেলান নিয়ে বসে আছি। দরজা ভেজিয়ে বাড়ির বাইরের রাস্তায় শা-দুল্লা আমগাছের নিচে এক অসহায় তরুণ কোনো এক রাজকন্যার স্বপ্নে বিহ্বল হয়ে পড়ছে। আমার কেন জানি, পরীর জন্য চোখে জল এসে যাচ্ছিল। পরী জানেই না, তার জন্য গোপনে আমি কখনও কাঁদতে পারি। জানলে পরী না এসে থাকতে পারত না। সামনা-সামনি সব সময় পরীকে ছোট করা আমার স্বভাব। পরী সেটাই সত্য জেনে বসে আছে।

তখনই গলা পেলাম কার!

দেখি পেছনে, পিলু, বাবা-মা।

ওরা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে।

বাবার প্রশ্ন, এত রাতে এখানে বসে আছ?

—গরম। ঘরে শোওয়া যাচ্ছে না।

পিলুর কী মনে হল কে জানে—আমাকে নিয়ে মা-বাবার যেমন দুশ্চিন্তার শেষ নেই, পিলুরও তেমনি। সে আমার হাত ধরে টানতে থাকলে, বললাম, যাচ্ছি।

মনে হল ওরা আমার আচরণে খুবই ভয় পেয়ে গেছে। আমি কখন কী করে বসব, এই ভয়ে পিলু আমার পাশে রাতে শোয়।

পিলুকে বললাম, হাত ছাড়। যাচ্ছি।

—যাচ্ছি না, এক্ষুনি ওঠ।

বাবা বললেন, তোমার কী হয়েছে! ক'দিন থেকে আবার মনমরা দেখছি। বলবে তো। না বললে বুঝব কী করে?

কী করে বোঝাই, পরীর বিয়ের কথা হচ্ছে। পরীকে কথা দিয়েছিলাম, বাবাঠাকুরের কাছে যাব—কিন্তু যেতে পারছি না। —কেন যে কথা দিতে গেলাম। পরী যদি বিশ্বাস করে থাকে, কথা যখন দিয়েছি, আমি ঠিক যাবই, যদি বিশ্বাস করে থাকে বিলুর স্বভাব নয় কথা দিয়ে কথা না রাখার। কিন্তু পরী তো বুঝছে না, কী বিপাকে পড়ে বলেছিলাম, আমি যাব।—তুমি এই নিয়ে মন খারাপ করবে না। কী চেহারা করেছ? তারপরও যদি না যেতে পারি মন মানবে কেন! তারপর সব যদি ছেড়ে চলে যেতে হয়, না গিয়েও কী উপায়! যে-ভাবে ট্রেনে, রেল স্টেশনে পড়ে থেকেছি মাসের পর মাস, যে-ভাবে চেকারবাবুদের দেখলে বাবা সাক্ষাৎ ভগবান হাজির ভেবেছেন, যে-ভাবে স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে সবুজ বাতি, সবুজ বাতি দোলালে ট্রেন চলবে, না দোলালে চলবে না, একটা ট্রেনের এই স্বপ্ন এখন সত্যি হতে যাচ্ছে—অথচ সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে হবে—এতসব কষ্ট আমাকে বিচলিত করে তুলছে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি আমার এখন এই অবস্থা। সেখানে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকা ছাড়া অন্য কী উপায়।

ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লে, দেখলাম পিলু দরজা ভাল করে বন্ধ করে দিচ্ছে। মশারির নিচে ঢুকে সে পাখা তুলে এমনভাবে হাওয়া করছে, যেন সবটা হাওয়া আমার গায়েই লাগে।

আমি হেসে বললাম, এই পিলু তোর কী হয়েছে রে?

পিলু অবাক। ওর হাতপাখা বন্ধ।

পিলু হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল, তুই দাদা কেন বের হয়ে গেছিলি? বল কেন বের হয়ে গেলি।

—আরে এমনি। তুই কী রে!

—আমার ভয় করছে। তুই কেমন হয়ে যাচ্ছিস দাদা।

হঠাৎ মনে হল, আমি আর, পিলু কিংবা মায়ার জন্য, মা-বাবার জন্য, এমনকি সংসারের ভালমন্দের জন্য যেন খুশি অখুশি কিছুই হচ্ছি না। পিলু এটা বুঝতে পেরেই আশঙ্কা করছে, আমি কিছু করে না বসি। বাবা-মাও কি এমন আশঙ্কায় সর্বক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। সন্তান বড় হলে জটিলতা যে কত রকমের। আমরা তো এখন বলতে গেলে বেশ ভালভাবে খেয়েপরে বেঁচে আছি—কিন্তু ভিতরে যে আমি ভাল নেই। একসময়ে শুধু পেট ভরে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ পেয়েছি, এখন আর তা পাই না কেন। খাওয়াটাই সব নয়। এরপরও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য বুঝি উত্তাপের দরকার হয়। আমার মধ্যে যে উত্তাপের সৃষ্টি হচ্ছে, তারই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কবিতা, পরী, প্রেম, রেলের নীল বাতি। এসব না থাকলে জীবন অর্থহীন। কিন্তু এসব কথা পিলুকে বলি কী করে, বললেই বা বুঝবে কেন?

তখনই পিলু বলল, পরীদি আর আসে না। আমি কাল যাব।

— কী করতে যাবি?

—পরীদি আসে না কেন?

—পরীদির বিয়ে। আসবে কী করে?

হঠাৎ পিলু উত্তেজনায় উঠে বসল, কবে বিয়ে রে দাদা। আমাদের খেতে বলবে না!

—বলবে, বিয়ে ঠিক হলে বলবে। এখনও বোধহয় হয়নি। পরীর কথা তোলায় সুযোগ এসে গেল। বললাম, ওর দাদু পরীর কথা কিছু বলল?

—না।

—গাড়ি নিয়ে এসেছিল?

—রাস্তায় গাড়ি রেখে হেঁটে এসেছে।

—তুই কোথায় ছিলি?

—আমি কালীর পুকুরে গরু আনতে যাচ্ছি, দেখি পরীদির দাদু আসছে। হাতে সেই রুপোর লাঠি।

—আর কেউ ছিল?

—সেই লোকটা!

সেই লোকটা কে বুঝি। ওঁর খাস চাকর। উঠতে বসতে যে একটা লাঠির মতো সঙ্গে থাকে।

পিলু বসেই আছে।—জানিস দাদা এসেই আমাদের বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখলেন। আমগাছের কোনটা কী আম বাবা বললেন। পরীদির দাদু কী খুশি! বললেন, এ তো একটা আশ্রম বানিয়ে ফেলেছেন। বাবা জানিস ঠাকুরঘর খুলে নারায়ণ শিলা দেখালেন। চরণামৃত দিলে তিনি হাত পেতে নিলেন। বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেবতা নিয়ে কথা হল। মা মায়া তো ঘর থেকে বেরই হল না। চেয়ারে বসে আমাকে ডেকে বললেন, কী খবর পিলুবাবুর?

এমন ডাকসাইটে একজন মানুষের পক্ষে পিলুর নাম মনে রাখা সহজ নয়। কিন্তু পিলুর স্বভাবে মানুষকে আত্মীয় ভাবার এমন একটা সহজ কৌশল আছে যার জন্য একবার আলাপ জমে উঠলে তাকে ভোলবার কথা নয়। পরীদের কাকাতুয়াটি আনতে পিলু একদিন সত্যি তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। আমাদের বাড়িতে, খোঁড়া গরু, খোঁড়া বাঁদর, হাঁস, কবুতর, ছাগল, গোটা তিনেক বিড়াল এবং দুটো কুকুরের সঙ্গে কাকাতুয়াটি বেশ মানিয়ে যাবে মনে হয়েছিল তার। পরী সেদিন আমাদের বাড়ি, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে হাজির। যে যা চেয়েছে পরী সেদিন দিতে রাজি হয়েছিল। সেই বাড়ির মেয়ে যদি বলে, পিলু তুই কি নিবি? পিলুর কাকাতুয়া ছাড়া আর কী চাইবার থাকতে পারে। সে সোজা বলেছিল, পরীদি তোমাদের কাকাতুয়াটি দেবে? আমি পালব। তা পিলু পালতে পারে। ওর জীবজন্তুর প্রতি আলাদা একটা মায়া আছে। সেই কাকাতুয়াটি সত্যি পিলু আনতে যাবে পরী ভাবতে পারেনি। পরী বলেছিল, পারবি পুষতে? তোদের বাড়ির হুলো বেড়াল দুটোকে না তাড়ালে পাখিটাকে মেরে ফেলতে পারে। ওর দাদু সামনে। দাদুকে বলেছিল, বিলুর ছোটভাই। কী মিষ্টি দেখতে না দাদু! কাকাতুয়া নিতে এসেছে।

আসলে পিলু কত সরল সহজ, এটা ভেবে দাদুটি বলেছিলেন, নিয়ে গিয়ে পুষতে পারবি তো?

পিলুর সোজা জবাব, হ্যাঁ পারব। কী খায়?

— কী যে খায় আমরা জানি না। আমাদের রঘু টের পায়। ওর সঙ্গে পাখিটার খাওয়া নিয়ে কথা হয়। রঘু সকাল থেকে লেগে পড়ে।

—আমাকে বলবে না!

—দ্যাখ না গিয়ে বলে কিনা! রঘুকে ছাড়া সে কাউকে বলে না জানি।

পরী নাকি হাসছিল পিলুর কান্ড দেখে। সে পাখিটার সামনে দাঁড়িয়ে শিস দিয়েছে, হাতে তুড়ি মেরেছে। পাখিটা ওকে দু-বার তেড়ে গেছে, তাতেও ঘাবড়ায়নি। সে পাখিটার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে। সুন্দর কথা বলে। পিলু বলেছিল, আমার নাম পিলু, আমার দাদার সঙ্গেই পরীদি পড়ে। এই সম্পর্কের খাতিরেই পাখিটার উচিত পিলুকে মান্য করা। কিন্তু পিলু পাখিটার কাছেই যেতে পারছিল না, দাঁড়ে ঝাপটাচ্ছিল। ধরতে গেলে ঠোকর খাচ্ছিল। পরী আর দাদু পিলুর কান্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

পিলুর স্বভাব বেপরোয়া, সে ছাড়বে কেন, একবার জোর করে পাখিটার দাঁড়ে হাত দিতে গেলেই এমন ঠুকরে দিল যে হাত থেকে রক্ত বের হয়ে আসছে। পরী ছুটে গেছে, পরীর দাদুও।—ইস কী ছেলে রে তুই! আয়। রক্ত বের হচ্ছে!

পরী বলেছিল, দস্যি বটে তুই।

পিলু হাত ছাড়িয়ে বলেছিল, কিছু হয়নি।

—হয়নি তো হয়নি। আয় বলছি। আমরা বুঝিয়ে-সুজিয়ে দিয়ে আসব।

তারপর হাতে ডেটল তুলো ব্যান্ডেজ বেঁধে একপেট খাইয়ে রিকশায় তুলে দিয়েছিল। কাজেই পরীর দাদু যত ডাকসাইটে হোক, এমন ছেলের নাম ভুলে যেতে পারে না।

পিলুকে বললাম, শুয়ে পড়। আমাকে হাওয়া করতে হবে না। ফের বেহায়ার মতো বললাম, পরীর কথা কিছুই বলল না?

—না!

—তুই পরীর কাছে যাবি কেন?

—পরীদি মনে হয় রাগ করেছে।

—রাগ করবে কেন? আমরা পরীর কে?

পিলু আমার এমন কথায় কেমন ঘাবড়ে গেল। পরীদির জন্যই রেলে চাকরি, পরীদি না থাকলে এতবড় চাকরি কে দিত, পরীদি আছে বলেই আমার কাগজ অপরূপা—অথচ তার দাদাটা বলছে কী না পরী আমাদের কে!

পিলু এবারে শুয়ে পড়ল। আমরা দু-জনেই দু-পাশে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। পরী আমাদের কে, বলার পর পিলু তার পরীদির উপর সব অধিকার যেন হারিয়ে ফেলেছে। পিলুও বোঝে পরী এলে আমাদের বাড়িটা মুহূর্তে কেমন বদলে যায়। পরীর ছোটাছুটি, পিলুকে হাঁকডাক করে বাইরে নিয়ে যাওয়া, মার রান্নাঘরে বসে টুকিটাকি কাজে সাহায্য করা সবটাই পরীর আলাদা এক মহিমা যেন। পিলু পর্যন্ত সেটা টের পেয়ে বুঝেছে, তার যাওয়া দরকার।

আমি বললাম, কাল তো যাচ্ছি। দেখা হবে।

—কাল সত্যি যাচ্ছিস?

—যাব না! কত বড় চাকরি।

পিলু কেন জানি আমার এত বড় চাকরি নিয়ে এই মুহূর্তে উচ্ছাস প্রকাশ করতে পারল না। আমি আর কোনো কথা বলছি না দেখে, সে ঘুমিয়ে পড়ল। কী কথা বলব! পরী ছাড়া আমার যে আর কোনো কথা নেই।

সকালবেলায় বাবা বললেন, যাবার আগে ঠাকুর প্রণাম করে যেও। শুভ কাজে যাচ্ছ।

পিলু সাইকেল বের করে ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার করছিল। মুড়ি দুধ কলা খেয়ে সাইকেলে বের হয়ে পড়লাম। দরখাস্তে সই করতে যেতে হবে। সইসাবুদ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা, চান খাওয়া সেরে স্কুল—খবরটা বন্ধুদের আগাম দিতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না। অথচ মনে হচ্ছে খবরটা দেব, শেষে যদি কাজটা না হয়—কতরকমের শঙ্কা আছে, তবে পরী যদি চায়, কাজটা আমার হবেই। পরীকেও দেখে আসা হবে। বাবাঠাকুরের কাছে যেতে পারিনি, এই সুযোগে সেই খবরটাও দেওয়া যাবে।

আর আশ্চর্য, সদর দিয়ে ঢুকতেই দেখি পরী ওদের দোতলার বারান্দায় মাথা এলিয়ে বসে আছে। আমি যে ঢুকলাম, সে তা লক্ষ্য পর্যন্ত করেনি। অনেক দূরের আকাশে তার চোখ। যেন সে আমাকে চেনেই না। এই হল গিয়ে মানুষের গেরো। আমি ঢুকলাম, অথচ কোনো সাড়া নেই, কেমন জটিল সব চিন্তা-ভাবনায় মাথাটা আমার গুলিয়ে যাচ্ছিল। তবে কি সে আমাকে সত্যি বাড়ির আর দশজন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তির মতো ভাবছে। দয়া চাই—এস। চাকরি চাই—এস। কাগজের বিজ্ঞাপন—এস। অনুগ্রহ করে সে কি মাথা কিনে নিয়েছে ভেবেছে। না কি সে লক্ষ্যই করেনি আমি এসেছি। কোন্‌টা!

এতসব ভাববার আমার অবকাশই ছিল না। বিরাট সেই হলঘরে বুড়ো মানুষটি যেন আমার প্রত্যাশায় বসেই ছিলেন। দরজা পর্যন্ত যেতে পারিনি, তার আগেই তিনি প্রায় ছুটে এসেছেন। আমি

যেতে পারি, এটা বোধহয় তাঁর বিশ্বাসের বাইরে ছিল। তিনি একটা বড় রকমের বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেছেন। তাঁর চোখমুখ দেখে আমার এমনই মনে হল। এই বিপর্যয় থেকে আমিই তাঁদের উদ্ধার করতে পারি—কারণ তিনি তাঁর আচরণে যেন কিছুটা বালকসুলভ, আর কেমন গোপন, খুব ধীরে এবং লঘুস্বরে কথাবার্তা-আপ্যায়ন।

—এলে! বোস।

বিরাট হলঘর। আর কেউ নেই। এমনকি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী সেও না। কত রকমের মানুষজন সকাল থেকে তাঁর কাছে আসে। বাইরের বারান্দায় বসার মতো পনের-বিশজনের জায়গা করা আছে। এক একজনের ডাক পড়ে, তিনি তাদের অভিযোগ দাবিদাওয়া সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে ছেড়ে দেন। যতবার এসেছি, দেখেছি একজন ব্যস্ত মানুষ—অন্তত সকালের দিকটাতে তিনি শহরের মানুষজন নিয়ে ভারী ব্যস্ত থাকেন। আরও সকালে তাঁর পূজা-আর্চ্চার পাট থাকে, তখন বামুনঠাকুর এই বাড়ির সর্বত্র গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। পরনে গরদ, খালি গা, গৌরবর্ণ মানুষ, ঘন চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা। গায়ে নামাবলী। হলঘরের বড় দেওয়ালে বাবাঠাকুরের বড় তৈলচিত্র। এবং সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে দেখেছি লম্বা করিডোর পার হয়ে তাঁর পূজার ঘর। সেখানেও সিংহাসনে বাবাঠাকুরের ছবি। পরী আমাকে গোটা বাড়িটা একদিন ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। কার কোন মহল, তার বাবা-কাকারা কেউ কেউ চাকরিজীবী—জমিদারি চলে যাবার পর যেন এই বৈভব রক্ষার্থেই সবাই বের হয়ে পড়েছেন।

তিনি আমাকে বসিয়ে সন্তর্পণে একটা দেওয়াল আলমারি খুলে একটা ফাইল বের করলেন। এসব বের করে দেবার লোকটিকে পর্যন্ত কাছে রাখেননি। ফাইল বের করে আমার সামনে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে বললেন, সই কর।

আমি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সই করলাম।

মাথার উপর ঝাড়-লণ্ঠন, হাওয়ায় তখন রিনরিন করে বেজে উঠল। ঘরে আতরবাতির সুঘ্রাণ।

তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ কেন যে তাকিয়ে থাকলেন বুঝলাম না। শেষে কী ভেবে বললেন, তোমার বাবাকে বলবে, তিনি যেন তোমার সার্টিফিকেট দুটো দেন। অ্যাটেস্টেড কপির দরকার হবে। কাল সকালে দিয়ে যাবে।

আমি মার্কশিট পেয়েছি শেষ পরীক্ষার। সার্টিফিকেট এখনও পাইনি জানালাম।

তিনি বললেন, মার্কশিট হলেই চলবে।

কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশ হাঁপাচ্ছিলেন। পায়ে তাঁর নাগরাই জুতো। তিনি পাখার হাওয়াতেও ঘামছিলেন।

—কাল কোথায় গিয়েছিলে? আমি সব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। না এলে আমাকে ফের যেতে হত।

আমার প্রতি এত সদয়। সবটাই পরী হেতু এমন ভাবলাম। সেই পরীর সামান্য কাজ আমি করে উঠতে পারিনি। বললাম, মিমির সঙ্গে একটু দেখা করব।

তিনি চমকে উঠলেন। আমি এ বাড়িতে এলে রঘু বিনোদ সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দিত—বিলু দাদাবাবু এসেছেন। বিলু দাদাবাবু শুধু পরীর সঙ্গে পড়ে না, বাবাঠাকুরের প্রিয়জন। যে মানুষটি এই বাড়ির শুভাশুভের দায় ঘাড়ে বহন করছেন, আমি সেই মানুষের বড় আপনজন। বাড়িতে এজন্য আমার আলাদা খাতির। অথচ আশ্চর্য, আজ বাড়িটা কেমন নিঝুম।

ঠিক এইসময় সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ পেতেই উপরের দিকে তাকালাম। আমি এলে পরী ধীরে ধীরে লঘু পায়ে সেদিন নেমে এসেছিল। আজও সে আসতে পারে। কিন্তু না—দেখছি রঘু বড় রেকাবিতে ফলমূল মিষ্টি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। আসলে আমার এই সমাদর আর কিছুর জন্য নয়—বাবাঠাকুর প্রসন্ন হবেন এই বোধ থেকে করা। আমাকে যে ঘাঁটাতে সাহস করছেন না, এটাও তার কারণ। আসলে বুঝতে পারি এই পরিবারে আমাকে কেন্দ্র করেই বিপর্যয় নেমে এসেছে। পরীর একগুঁয়েমি এবং সেদিনের হাহাকার কান্না থেকে গোটা পরিবারটি জেনে ফেলেছে, গেরো কোথায়। সেটা খুলে ফেলার জন্য রায়বাহাদুর মাথা ঠান্ডা রেখে এগোচ্ছেন। পরীরও হয়ত সায় আছে। সে

চায় না, আমার জীবন একটা প্রাথমিক ইস্কুলে আটকে থাকুক। তোমরা বিলুর জন্য কিছু একটা কর। বিলুর জন্য কিছু একটা করলে, তোমরা যা বলবে, আমি তাই করব। বিলুর হয়ে সত্যিকারের কিছু করতে পারলে পরী বোধহয় বিষও খেতে রাজি।

ক্রমেই আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিলাম।

আমার সামনে রকমারি জলখাবার। রায়বাহাদুর নিজ হাতে সাজিয়ে দিচ্ছেন। তিনি পরীর কথায় চমকে উঠেছিলেন, পরী সম্পর্কে একটা কথাও বললেন না। বরং এই চাকরিতে আমি যে একদিন খুবই বড় জায়গায় চলে যাব—এটা তাঁর স্থির বিশ্বাস। তিনি আমাকে আমার চাকরির বিষয়ে নানারকমের লোভনীয় কথাবার্তা বলে পরী সম্পর্কে উদাসীন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না।

রঘু সাদা পাথরের গ্লাসে এক গ্লাস ঠান্ডা জল রেখে গেল।

পরীর দাদু বললেন, খাও।

আমার যে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না বুঝতে পেরে বললেন, খাও। আমি বুড়ো মানুষ। জীবনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আসে, সহ্য করতে হয়। সবই জানবে বাবাঠাকুরের কৃপা। তুমি তো পরম সৌভাগ্যবান, বাবাঠাকুরের কৃপা লাভ করেছ। সেদিন বাবাঠাকুরের কাছে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম—কথায় কথায় তিনি বললেন, বিলুটার কোনো খবর নেই। বদরিকে ভাবছি পাঠাব। ছোঁড়াটা কী! না বলে না কয়ে কালীবাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মনটা জানিস মাঝে মাঝে বিলুটার জন্য বড় খারাপ লাগে। বাবা গরিব, বিলুর খুবই পড়ার আগ্রহ। দুটো বছর বিলু ছিল, দু-বছরেই কেমন আমার মধ্যে টান ধরিয়ে দিয়েছে।

আমি মাথা নিচু করে মিষ্টি এক-আধটু খাচ্ছি আর ওঁর কথা শুনছি।

রায়বাহাদুর কোঁচা মাটি থেকে তুলে কোলের উপর রাখার সময় বললেন, তোমার সব খবর দিয়েছি। বলেছি, বিলুর জন্য আপনি ভাববেন না। ও ভালই আছে। ওকে সমীরণ রেলের শিক্ষানবিসীতে ঢুকিয়ে দেবে। ও পাশ করেছে। ওর জীবনে অনেক উন্নতি হবে।

আমি কিছু বলছিলাম না। কেবল একটা কথাই বার বার এখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে—পরী গিয়েছিল আপনাদের সঙ্গে! পরীকে নিয়ে গিয়েছিলেন? কিংবা কেন গিয়েছিলেন! শুভকাজ, তার অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন। তিনি কি অনুমতি দিলেন। অনুমতি দিয়ে ফেললে আমার আর কিছু করার থাকবে না জানি। আমার ইচ্ছে থাকলেও আর বলতে পারব না, বললেও তিনি শুনবেন না। তাঁর মুখ থেকে বাক্য বের করা এমনিতেই বড় কঠিন কাজ। বাক্য না, যেন আগুন। সে আগুন একবার জ্বলে উঠলে নেবানো যায় না।

এ-সব কী করে জিজ্ঞেস করি! তবু ভেতরে এত তোলপাড় শুরু হয়েছে পরীকে দোতলার বারান্দায় দেখার পর, যে বেহায়ার মতো না বলে থাকতে পারলাম না, মিমি গিয়েছিল আপনাদের সঙ্গে?

—গিয়েছিল।

তারপরের প্রশ্ন যে খুবই কঠিন। বলি কী করে! পরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরীর শুভকাজে তিনি অনুমতি দিয়েছেন—অর্থাৎ এই অনুমতি নেবার জন্যই যাওয়া কিনা! যদি বিষয়টা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—হয়ে যাবারই কথা, দোতলার বেতের সাদা চেয়ারে পরী যে-ভাবে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তাতে মনে হয় বাবাঠাকুর পরীর ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিয়েছেন! শেষ আশ্রয় বলতে পরীর ছিল, বাবাঠাকুর। নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত এমনকি তার ওপরের আদালতের রায় হয়ে গেছে। একমাত্র রাষ্ট্রপতিই পারেন ফাঁসির হুকুম বাতিল করতে। যদি সেখানেও সেই রায় বের হয়ে গিয়ে থাকে।

ভিতরে এত জ্বালা অনুভব করছি কেন! আমি সত্যি অমানুষ। পরীদের বৈভবের প্রতি আমার ঘৃণা আছে, পরীর এই বৈভবের জন্য সে দায়ী হবে কেন! সে তো বোঝে, মানুষকে না ঠকালে, একজন মানুষ, অন্যের চেয়ে বেশি প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে না। সে নিজে মিছিলে, ভোটের প্রচারে তার দলের হয়ে বার বার এই কথাই বলে গেছে। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এমন ডানপিটে

মেয়ে, খোলামেলা বেপরোয়া মেয়ে কদিনে কী হয়ে গেল! এ জীবন তো পরীর পক্ষে আত্মহত্যার শামিল। পরী কি তার পরিবারের মর্যাদা রক্ষায় নিজে আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে!

খাওয়া আমার মাথায় উঠে গেল। বললাম, মিমিকে একবার ডেকে দেবেন। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। জীবনেও হয়ত এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কেউ কখনো তাঁকে হুকুম করেছে তিনি জানেন না। তার মুখচোখ কেমন সহসা রক্তবর্ণ হয়ে গেল। উত্তেজনায় তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন। যেন এই মুহূর্তে হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন, বের হও, বের হয়ে যাও। রাস্তার কুকুর! কিন্তু এ কি দেখছি—তিনি সহসা আমার দু-হাত চেপে ধরে অনুনয় করছেন, সব রাগ বিদ্বেষ, জ্বালা তাঁর উবে গেছে, অসহায় বালকের মতো হাত ধরে অনুরোধ করছেন, তুমি যা চাও আমি দেব, তুমি যা বলবে আমি করব। কিন্তু দোহাই মিমিকে বলবে না, রেলের চাকরি হচ্ছে তোমার। বিলাসপুর তোমাকে চলে যেতে হবে।

কিছু বলছি না আমি। কী বলব!

সামনাসামনি দু-জন টেবিলের দু-পাশে। শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। সব অহঙ্কার এই একটি টেবিল এক নিমেষে উল্টে দিতে পারে।

—বিলু তোমার দু-হাত ধরে বলছি।

তিনি আমাকে প্রচন্ড ঝাঁকুনি দিতে থাকলেন।

মাথা নিচু করে বললাম, কথা দিচ্ছি ওকে আমার কাজের কথা বলব না। রেলে কাজ পেয়েছি বলব না। এখান থেকে চলে যাচ্ছি বলব না।

তা হলে পরী জানে না, আমার রেলে চাকরি হচ্ছে। পরী কিছুই জানে না। আমার অনুমানই ঠিক, আমাকে দূরে বনবাসে পাঠিয়ে দেবার জন্য পরীর দাদুর এই চক্রান্ত। মানুষটা কত অসহায়, কোথাকার কে এক বিলু এসে এই পরিবারে ঝড় তুলে দিয়েছে। এই প্রাচুর্যের বিরুদ্ধে বড় রকমের প্রতিশোধ নিতে পারছি ভেবে ভারী মজা অনুভব করলাম আর তারপরই আমি কেমন পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠলাম।

—বিলু! বিলু! তিনি চিৎকার করছেন।

আমি হাসছি।

আমার সেই হাসির প্রচন্ড আওয়াজে ঝড় উঠে গেছে বাড়িটাতে। সবাই দৌড়ে নেমে আসছে। দেখতে পাচ্ছি পরীও এসে রেলিঙে ভর করে দাঁড়িয়ে। সে অবাক হয়ে দেখছে আমাকে।

দেখলাম পরী দ্রুত দৌড়ে নেমে আসছে।

দেখলাম পরী আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এই বিলু কী হয়েছে! কী হয়েছে তোমার! বিলু বিলু, পাগলের মতো হাসছ কেন? আমার ভয় করছে! প্লিজ বিলু!

পরী নার্ভাস হয়ে পড়ছে। এও এক মজা। এ পরিবার সম্পর্কে আমার কৌতূহলের শেষ ছিল না। এ বাড়িতে এলেই মনে হত এরা সব যেন ভিন্ন গ্রহের মানুষ। লম্বা দীর্ঘকায় সব পুরুষ, সৌম্য। এবং আভিজাত্য চলাফেরায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকলে সুঘ্রাণ। সব তকতকে ঝকঝকে। মারবেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলে ভয় লাগত। পা পিছলে পড়ে যেতে পারি। পরী কত সহজে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাবার সময় বলত, এস না ভয় কী! সেই পরিবারে আমার সামান্য হাহাকার হাসি ঝড় তুলে দিয়েছে।

পরী নার্ভাস হয়ে পড়লেই পরীর চোখে জল চলে আসে। আসলে পরী বড় হয়েছে এক সুন্দর ফুলের উপত্যকায়—সে জানেই না, এই পৃথিবীতে বনজঙ্গল কাঁটাগাছই বেশি। সে জানে না, এ পৃথিবীতে বড় হতে গেলে পার হতে হয় অনেক উঁচু টিলা, গিরিখাত। আমি আর হাসতে পারলাম না। কতদিন পর যেন পরীর সঙ্গে দেখা। পরীকে বললাম, তোমার কোনো পাত্তা নেই। কী ব্যাপার?

—কোনো ব্যাপার নেই। তুমি বোস। আর একদম হাসবে না।

পরী কী আমার মধ্যে টের পায় এক ভালবাসার পাগল কাঙাল হয়ে আছে। অথচ ভীরু বলে চাইবার সাহস নেই। ভীরু বলে জোরজার করার ক্ষমতা নেই। সবসময় অহঙ্কার নিয়ে বেঁচে থাকার

মধ্যে পরীর প্রতি আমার ছলনা আছে। ওটা আমার বর্ম। পরী কি ধরতে পেরেছে, আমার সব বিরূপতা আসলে দুর্বলতা থেকে!

পরী আমার অস্বাভাবিক আচরণে ঘাবড়ে যেতে পারে ভেবে আমি আর হাসলাম না। আসলে পরীর দাদু আমাকে কত ভয় পান, আমি তাঁর গলার কত বড় কাঁটা, সেই ভেবে হাসা। সামান্য এক বিলু, প্রাথমিক ইস্কুলের মাস্টারি পেয়ে যে বর্তে গেছে, সেই বিলু এক দোর্দন্ড প্রতাপশালী মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—সেই ভেবে হাসা!

পরীকে বললাম, জান আমার যাওয়া হয়নি।

—হয়নি তো বেশ। ও নিয়ে তোমায় আর ভাবতে হবে না। সে এবার পেছনের দিকে তাকালে দেখলাম—যে যার মতো দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। ওর দাদু পর্যন্ত। পরী এতদিন নিজে মুষড়ে পড়েছিল, আজ আমার অস্বাভাবিক ব্যবহারে সে ভেবেছে, তাকে শক্ত হতে হবে।

পরী বলল, চল বের হব।

—কোথায়?

—চলই না।

পরী যেন এই কারাগার থেকে বের হয়ে মুক্তি পেতে চায়। আবেগের বশে এসব চলে, কিন্তু জীবনের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে আমি তার অচল পয়সা।

দাদু সিঁড়ি থেকে ফিরে এলেন, কোথায় যাবে?

—বাবাঠাকুরের কাছে।

তার তখনই চিৎকার, রঘু, রঘু।

বুড়ো মানুষটার কী ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলা। সবাই দৌড়ে আসছে।—মিমি কালীবাড়ি যাবে। গাড়ি বের করতে বল।

মিমি বলল, দাদু গাড়ি লাগবে না। আমি বিলুর সঙ্গে সাইকেলে যাব। বাবাঠাকুর বললেন না, বিলুকে পেলে ধরে আনবি তো!

বাবাঠাকুরের কথায় দেখলাম তিনি একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলেন।

পরীকে বললাম, বাবাঠাকুর সত্যি ধরে নিয়ে যেতে বলল?

—হ্যাঁ বিলু, বলেই সে দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। কত অস্বাভাবিক দেখেছি পরীকে কিছুক্ষণ আগে, মুহূর্তে পরী আবার কত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। সে কি বুঝে ফেলেছে, আত্মহত্যা করার অধিকার তার আছে, কিন্তু বিলুকে গলা টিপে মারার অধিকার তার নেই। সে কি সেই ভেবে এত সহজ হয়ে গেল। ঠিক আগেকার পরী। সিঁড়ি ধরে নেমে এল খুব সাদামাটা পোশাকে। আমার সঙ্গে সাইকেলে বের হবার সময় দারোয়ানকে বলল, পরেশচন্দ্র এলে বলবে দিদিমণি বাড়ি নেই। কখন ফিরবে ঠিক নেই।

আর অবাক, কিছুটা এগিয়ে টাউন হলের কাছে এসে এক পায়ে মাটিতে ভর দিয়ে সাইকেল থামিয়ে বলল, চল আগে পরেশচন্দ্রের কোয়ার্টারেই যাওয়া যাক। তারপর কেমন অসহায় গলায় বলল, দাদুর কষ্টটা বুঝি। দাদুর কাছেই আমি মানুষ। দাদু বাবা সবাই চায় আমার ভাল হোক। আমি বুঝি বিলু—কিন্তু মানুষের কী ভাল কী মন্দ কেউ বলতে পারে! কোথায় সে তার ভালমন্দ খুঁজে পায় কেউ জানে না!

পরী আমার সঙ্গে বের হয়ে আমায় কিছুটা সঙ্কোচের মধ্যে ফেলেছিল। আমার চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হবে কিনা কে জানে। পরীর বের হয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। যখন বিয়ে ঠিক। তাছাড়া এতবড় চাকরির খবর পরীকেও দিতে পারছি না—খুবই সুখবর। পরী বাড়ি গেলে জেনে ফেলতে পারে। বাড়ির কেউ বলে দিতেই পারে। আর কেউ না বললেও পিলু বাহবা নিতে ছাড়বে কেন!

পরেশচন্দ্রের বাংলোর কাছে এসে পরী বলল, ধুস যত সব। চল তো!

—কোথায়?

—চলই না।

ভাবলাম তবে পরী কালীবাড়ি যাবে। বললাম, পরেশচন্দ্রের সঙ্গে দরকার ছিল!

—কিসের দরকার?

—না মানে......এই যে এলে, এসে ফিরে যাচ্ছ।

—কোনো দরকার নেই। ওর বোঝা উচিত, আমি কী চাই।

—তুমি কী সত্যি চাও কেউ জানে না।

—জানে না তো বেশ।

তারপর পরী কেমন অকপটে বলে গেল, বিলু আমার বিয়ে হলে তোমার কষ্ট হবে না?

—হ্যাঁ, তা একটু হবে।

—একটু হবে?

—বেশি হলে তোমার ভাল লাগবে?

পরী জবাব দিল না। সে সাইকেল ঘুরিয়ে দিল—কালীবাড়ির কাছে এসে বলল, সত্যি বেচারা লক্ষ্মী!

কালীবাড়ি এলেই আমার কাছে লক্ষ্মীর স্মৃতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ভেবেই, কেমন ভয় ছিল, কালীবাড়ি আর আসা হয়নি। লক্ষ্মীর আত্মহত্যার পর এখান থেকে চলে গেছি—এই আত্মহত্যার মূলে আমি আর পরী। সেদিন জ্যোৎস্না রাতে পরীকে বাগানের মধ্যে আমার সঙ্গে ঘুরতে না দেখলে মেয়েটা হয়তো নিজেকে বিনাশ করত না। এসব মনে পড়লে বিষণ্ণ হয়ে যাই। মন্দিরের দরজায় লক্ষ্মীর সেই আমার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকা, কলেজ থেকে ফিরলে হাতমুখ ধোওয়ার জল, পাজামা গেঞ্জি এগিয়ে দেওয়া—এসবই ছিল তার কাজ। কথায় কথায় বলত, দেবস্থানে মিছা কথা বলতে নাই। তা'হলে মা-কালীর অভিশাপে জিব খসে পড়বে।

লক্ষ্মীর ধারণা সে যাকে ভালবাসে, তার পরমায়ু কমে যায়। দেড়-দু বছর একজন সমবয়সী শ্যামলা মেয়ে কাছাকাছি থাকলে টান ধরেই যায়—লক্ষ্মীই প্রথম খবর দিয়েছিল, বাড়ির নতুন মাস্টারের। পরী সেই খবর পেয়ে চিড়িয়াটিকে দেখার জন্য বাইরের ঘরে হাজির সেদিন। সেই থেকে আজ আমরা সেখানেই যাচ্ছি যেখানে পরী আছে আমি আছি, বাবাঠাকুর, বদরিদা, বউদি সবাই আছেন—নেই শুধু লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মরার আগে নিজেকে নববধূর মতো সাজিয়েছিল। কপালে সিঁদুরের টিপ, লালপেড়ে শাড়ি, পায়ে আলতা। সিঁথিতে সূর্যাস্তের শেষ আলো—এক লম্বা লাল সড়ক—আমরা দুজনে এখন তার উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি।

দশ

পরী কালীবাড়ি যাবার রাস্তাটায় ঢুকে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। আমরা পাশাপাশি দু'জন সাইকেল চালিয়ে এসেছি। দু'জনের মধ্যে একটা কথাও হয় নি। হবার কথাও নয়।

শহরটা কেমন ক্রমেই ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। শহরের ভেতর নিরিবিলি সাইকেল চালিয়ে আসা কঠিন। সরকারি খামারের পাশে এসে পড়লে দু-পাশে মাঠ দেখা যায়। রিকশা কিংবা মানুষের চলাচল কম বলে, খামারের পাশ দিয়ে আসার সময় ইচ্ছে করলে আমরা দু'জনে দু-একটা কথা যে বলতে পারতাম না তা নয়। তবু কেমন আমরা দু'জনেই নিজের মধ্যে ডুবে ছিলাম।

ডুবে ছিলাম বললে ঠিক হবে না। আসলে পরীর কথা আমি ভাবছিলাম। আমার কথা পরী ভাবছিল।

পরী এ-ভাবে অকপটে কথাটা বলতে পারবে ভাবিনি। ও যত অকপটে বলেছিল, আমি তার চেয়ে আরও সহজে জবাব দিতে পেরেছি। এটা কী করে বুঝি না! আমার তো জ্বালা হবার কথা। কিন্তু আশ্চর্য যেন এমন কোনো ঘটনাই নয় এটা। আর দশটা স্বাভাবিক ঘটনার মতোই পরীর বিয়ে হবে। এতে অবাক হবার কী আছে!

আমার মধ্যে আসলে ঘটনার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় অনেক পরে। এই যে সাইকেল চালিয়ে পাশাপাশি এসেছি, পরী একটা কথা বলেনি আমি একটা কথা বলিনি, দেখলে মনে হবে কেউ কাউকে আমরা চিনি না। এখন বুঝতে পারছি পরীর কথাগুলিই আমাকে এতক্ষণ ভাবিয়েছে।

শুধু পরী কেন, তার দাদুর কথাও।

যেন একটা সামান্য কথা জীবনে এমন মারাত্মক আলোড়ন তুলবে তখন যেন টেরই পাইনি। কত অনায়াসে বলতে পেরেছিলাম, হ্যাঁ, তা একটু হবে।

পরী কেমন বিস্ময়ে চোখ তুলে দেখছিল। অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে ছিল আমার মুখের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে বলেছিল—একটু হবে?

আমি হেসে ফেলেছিলাম। এখন ভাবছি, এমন কথা শোনার পর কেউ হাসতে পারে! আমি মানুষ! অথচ কত অনায়াসে বলেছি, বেশি হলে তোমার ভাল লাগবে?

কালী বাড়ির রাস্তায় ঢুকেও আমরা কথা বলতে পারি নি। সাইকেল থেকে নেমে পরীর কথাও যেন আমার কানে যায় নি। কিংবা এতক্ষণে যেন মনে করতে পারছি পরী লক্ষ্মী সম্পর্কে কী একটা মন্তব্য করেছিল। কী বলেছিল পরী! আমার মাথায় কী কোন গন্ডগোল শুরু হয়ে গেছে! বেচারা লক্ষ্মী। এমন কিছু বলেছিল! যেন এক দূর অতীত থেকে কথা ভেসে আসছে।

এই পথটা আমার চেনা কত কালের। এই রাস্তায় কিছু ইতস্তত বাড়িঘর উঠেছে। শহর ছাড়িয়ে রেল-লাইনের পাশে বেশ নির্জন জায়গা। সকালের রোদ গাছের মাথায় উঠে এসেছে। পরী লাল রঙের সৌখিন লেডিজ সাইকেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার কালীবাড়িতে বাবাঠাকুরের কাছেও যাবার ইচ্ছে নেই। আমাকে তার একা পাওয়া দরকার। একা পাওয়া দরকার তাই বা মনে করছি কী করে। বললাম, কী হল! যাবে না!

—ভাবছি।

—ভাববার কি হল!

—ভাবছি আমি একাই যাব। দু'জনে গেলে ভাববে, তুমি আমার গেরো। তাই বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইছি, তিনি বুঝতে পারবেন।

—না গেলে বুঝি বুঝতে পারবেন না।

—কী করে বুঝবেন!

—কেন তোমাদের পরিবারে তিনি তো অন্তর্যামী। তোমার দাদু যে আমাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছেন, নিশ্চয়ই চোখ বুজলে টের পান বাবাঠাকুর—আমি গেলেও টের পাবেন, না গেলেও টের পাবেন।

হাওয়া দিচ্ছিল। শরৎকাল এসে গেছে, ঠান্ডা আমেজ। পরীর রেশমের মতো ববকরা চুল উড়ছিল। সাদা সিল্ক পরনে। আঁচল একটু হাওয়াতেই খসে পড়ছে। পরী শাড়ী ঠিকঠাক করতে করতে বলল, দাদুকে ঠেস দিয়ে কথা বলছ কেন? বয়স হলে হয়। বৈভব থাকলে এটা আরও বেশি হয়। আমার দাদুর দুটোই আছে। তার একজন বাবাঠাকুর না থাকলে নির্বিঘ্নে বাঁচবেন কী করে! বাবাঠাকুর যে অন্তর্যামী নন, সেটা তুমিও বোঝো আমিও বুঝি। তুমিও কম প্রিয় নও বাবাঠাকুরের। তুমি একা গেলেই হত। কত করে বলেছি, যাও নি। আসলে তুমি স্বার্থপর। পরের জন্য কিছু করার দায় তোমার থাকবে কেন!

আমি স্বার্থপর। পরী যেন ঠিকই বলেছে, স্বার্থপর না হলে কালীবাড়ি ছাড়ার পর একদিনও যাইনি কেন! কতবার বাবা বলেছেন যা একবার বাবাঠাকুরের কাছে। তাঁর অসীম করুণা না থাকলে চাকরিটা হত? মুকুলের জামাইবাবু উপলক্ষ্য মাত্র।

বাবাকেও দেখেছি, কালীবাড়ির সেই আধ ন্যাংটা সাধুর প্রতি একটা অসীম ভরসা আছে।

বাবা একদিন বলেছিলেন, বদরিই বা কী না ভাবছে। কালীবাড়িতে বদরি থাকতে না দিলে কী করে পড়তিস! বৌমাও তোকে পুত্রস্নেহে লালন করেছে। তোর ছাত্ররাই বা কী না ভাবছে। না বলে না কয়ে সেই যে চলে এলি, আর গেলি না। লক্ষ্মী অপঘাতে মারা গেল, এটা তার নিয়তি। তোর যে কী হয়! সংসারে নিজেকে নিয়ে কেবল ভাবলে চলে না। এতে জীবনের মন্দ দিকটাই ফুটে ওঠে।

আর পরী তো বলবেই, যে বার বার বলেছে, এ বিয়ে একমাত্র ভেঙে দিতে পারেন বাবাঠাকুর।

তুমি তো জান বিলু, দাদুর শেষ ভরসা বলতে তিনি। তিনি হ্যাঁ করলে হবে, না করলে হবে না। বাবাঠাকুর কত আক্ষেপ করেছে, বিলুটা সেই যে গেল আর এল না। ওর হয়েছেটা কী!

কী হয়েছে বোঝাই কী করে! কালীবাড়ির রাস্তাটা শহরে যেতে আসতে পড়ে। ভিতরে ঢুকে আধ মাইল খানেক রাস্তা পার হলে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে মন্দির, বটতলা, সেবাইত, বদরিদা'র ঘরবাড়ি। খুবই নির্জন। মন্দিরের পিছনে বিশাল ঝিল। ও-পারে যতদূর দেখা যায় শুধু বাঁশের জঙ্গ ল। মন্দিরের সামনে রেল-লাইন, দু-পাশে যতদূর দেখা যায় শুধু আমের বাগিচা। রোজ শহরে যাই আসি। অপরূপা কাগজ বের করি। ইস্কুল করি, মুকুল, নিখিল, নিরঞ্জনের সঙ্গে আড্ডা দিই।

রাস্তায় জড়বৎ দু'জন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকের চোখে পড়ারই কথা। কেউ আমরা কথা বলছি না। যেন কালীবাড়ির রাস্তায় ঢুকে আমাদের দু'জনেরই মনে হয়েছে, পথ ভুল করেছি।

শহরের লোকজন পরীকে চেনে না, এমন কেউ আছে আমি জানি না। এই সেই মেয়ে—এখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন যুবকের সামনে। দু'চারজন যুবক থাকবে, এটাও তাদের কল্পনার বাইরে নয়। দঙ্গল নিয়ে পরীর ঘোরার অভ্যাস। কারো হাতে ফেস্টুন, কারো হাতে পোস্টার। পরী দাঁড়িয়ে আছে, ওরা পোস্টার মারছে।

পরীর আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক না। অস্বাভাবিক আমার হাতে কোনো ফেস্টুন নেই, কোনো পোস্টার নেই। পরী যে আজ মাসখানেক হল বড়ই বিপাকে পড়েছে কেউ জানে না। এমন কী আমাদের অপরূপা কাগজের কবি লেখকরাও না। এজন্যে পরী আমাদের অস্থায়ী কাগজের অফিসে আসতে পারছে না কিংবা তাকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

আমার কিছুই ভাল লাগছে না।

পরী বলল, এস হাঁটি।

আমরা দু'জনে পাশাপাশি সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। মনে হয় পরী কোনো নির্জন জায়গায় আমাকে আজ নিয়ে যেতে চায়। পরীর দাদু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন জানতে চাইতে পারে। পরীর দাদু যে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে আমার খোঁজে, সেটা শুনলে আরও হতবাক হয়ে যাবে। পরী আর শ্রীময়ী থাকবে না। ওর লাবণ্য ঝরে পড়বে সহসা, সে কঠিন রুক্ষ গলায় বলবে, বিলু তোমার আত্মসম্মান বোধটুকুও গেছে। তুমি ফাঁদে পা দিলে। তোমার কাছে চাকরিটাই বড়। অপরূপার জন্য আমার এত খাটাখাটনি তুমি এক দণ্ডে বিসর্জন দিতে পারলে। তোমার কষ্ট হল না?

যেতে যেতে পরী বলল, কী, কথা বলছ না কেন?

—তুমিও তো কথা বলছ না।

—আমার আবার কথা কী।

—তোমারই তো কথা।

—না। আমার কোনো কথা নেই। তুমি জেনে রাখ আমি রাজি না হলে কারো ক্ষমতা নেই কিছু করে।

—তবে তুমি এত ভেঙে পড়েছ কেন?

—ভেঙে পড়েছি তোমার কথা ভেবে। দাদুকে আমি জানি। বলেই পরী কী বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—কী জান?

—দাদুর আত্মসম্মানে লেগেছে। একটা রিফুজি ছেলে তার বনেদি পরিবারে ঝড় তুলে দেবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। পরেশচন্দ্রকে আমি সোজা বলে আসতে পারি আমাদের বাড়ি ফের গেলে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।

—তা তুমি পার, বিশ্বাস করি। তবে আমি তা চাই না। পরেশচন্দ্র ভাল মানুষ। তোমার রূপে সে মজেছে। অপরূপার জন্য সেও কম করছে না।

—করছে, আমি আছি বলে।

—কেন ওর কবিতা!

—ও তো আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য! ওটা পরেশের ছলনা।

—আগে লিখত না?

—জানি না লিখত কি না।

আমি এবারে হেসে দিলাম। বললাম, সত্যি তোমাকে সে ভালবাসে পরী। দেখতেও খারাপ না। তাছাড়া শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাবার পর ক্লাশ করতে পারবে। পড়ায় বাধা দেবে না। ওর বাবা তোমার দাদুকে কথা দিয়ে গেছে।

—বিলু!

দেখলাম পরীর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওর ভেতর এতদিন অস্থিরতা কাজ করেছে, অর্থাৎ কী করবে ঠিক করতে পারছিল না, কারণ পরী তো তার দাদুকে নিজের চেয়ে বেশি ভালবাসে। তার বাবা কাকারাও কম না। সবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস যেন তার এতদিন ছিল না। আজ তাদের হলঘরে আমার হাহাকার হাসি শুনে সে ঠিক করে ফেলেছে সব। কেন যে মনে হল বাবাঠাকুরের কাছে যাবে বলে বাড়ি থেকে যে পরী বের হয়ে এল, এটা তার আর এক ছলনা।

বললাম, পরী অবুঝ হবে না। তোমার দাদু ভাল চান তোমার। তাকে আর যাই কর, ছলনা কর না। আমি তার কষ্ট বুঝি। আমি সত্যি দেখছি তোমার মাথাটি খেয়েছি।

পরী কিছু বলল না। আমার দিকে শুধু একবার আড়চোখে তাকাল। এই তাকানো আমাকে এত দুর্বল করে দেয় যে আমি আর নিজের মধ্যে ঠিক থাকি না। কেমন উতলা হয়ে পড়ি। পরীর চোখে এত ধার আছে, এর আগে যেন আর টের পাই নি।

পরী সামনের খোলা একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল। পাশের একটা আমগাছে সাইকেলটা তার দাঁড় করানো। পরী আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। এই রাস্তার পাশে খোলা মাঠে পরীকে নিয়ে বসে থাকতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। কারণ এই রাস্তায় রিকশার চলাচল আছে। মানুষজনেরও। দুপুর না হোক, শরতের এই না দুপুর না সকাল এমন একটা অসময়ে যে কোনো নারীকে সামনে নিয়ে বসে থাকতে অস্বস্তি হয়। পরীর না হতে পারে আমার হয়। আমি তো পার্টি করি না, যে গণসংযোগ করতে বের হয়ে পড়েছি, ক্লান্ত হয়ে পার্টির কোনো কর্মীকে নিয়ে গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়েই বললাম, কালীবাড়ি তা হলে যাচ্ছ না।

পরী জবাব দিল না।

পরীর এই একগুঁয়েমি বড় বেশি আমাকে রূঢ় করে তোলে। কিন্তু আজ কেন যে তাকে একটাও রূঢ় কথা বলতে পারছি না।

পরী বসে বসে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছে। কার জেদ কত প্রবল সে যেন এখন যাচাই করতে বসে গেছে। আমার না তার।

আমি আর পারলাম না। ওর পাশে গিয়ে সাইকেলে ভর করে দাঁড়ালাম। নিজেকে খুবই বুদ্ধু মনে হচ্ছে। কী বলব। তবু কথা না বললে, স্বাভাবিক না থাকলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে ভেবে বললাম, তোমার দাদুকে বললেই পারতে বিলুকে নিয়ে বের হচ্ছি। কালীবাড়ি যাবে বললে কেন। কালীবাড়ি যাবে তো এখানে বসে থাকলে কেন। গাড়ি বের করতে বললেন, বললে কেন, না সাইকেলে চলে যাব। এ-সময় আমাদের দু'জনকে এভাবে দেখলে লোকেই বা কী ভাববে! তোমার দাদুর কানে উঠলে তিনিই বা আমার সম্পর্কে কী ভাববেন। ফুসলে বের করে এনেছি এমনও ভাবতে পারেন।

পরী নির্বিকার। যেন আমি দাঁড়িয়ে যতক্ষণ কথা বলব, ততক্ষণ সে একটা কথারও জবাব দেবে না।

এবার বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বললাম, কী বলছি শুনতে পাচ্ছ।

পরীও পাগলের মত চিৎকার করে বলল, না, শুনতে পাচ্ছি না।

এরপর আর কী করা যায়! পরীকে ফেলে বাড়ি চলে যেতে পারি। কেন যে সকালে মরতে

পরীদের বাড়ি গেছিলাম! বাবা ঠিকই বলেন গ্রহ বিরূপ হলে এসব হয়। আমার গ্রহের অবস্থান ভাল না। বাবা আমাকে প্রায়ই বলেন, যেন সাবধানে চলাফেরা করি।

কিন্তু বাবাই তো ঠেলে পাঠালেন। রায়বাহাদুর নিজে এসেছিলেন, তোমার যাওয়া উচিত। তোমার সার্টিফিকেটগুলো নিতে ভুলো না। নারায়ণের কৃপায় রেলে কাজটা হয়ে গেলে গ্রহ শান্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বাবা গরীব বলেই ধর্মভীরু মানুষ। মানুষের সব কিছুতেই তিনি। তাঁর কৃপা না থাকলে কিছু হয় না। তাঁর কৃপা আছে বলেই শহরের এমন প্রভাবশালী মানুষ যেচে আমাদের বাড়িতে এসেছেন। আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পচে মরি, তিনি চান না।

তিনি কী চান, আমার চাইতে বাবা বেশি কী বুঝবেন! এ-সময় বাবার উপর ক্ষোভে দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল। বড় প্রলোভনে ফেলে তিনি যে আমাকে দেশছাড়া করতে চাইছেন, বাবা যদি বুঝতেন! পরী কী তবে সব টের পেয়েছে। টের পেয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে। আমার সব ক্ষোভ পরীর উপর নিমেষে জল হয়ে গেল। সাইকেলটা পাশে রেখে মুখোমুখি বসলাম। একজন এতবড় ঘরের নারীর যদি অসম্মান না হয় আমার মতো গরীব বামুনের অস্বস্তির কী কারণ থাকতে পারে!

বসে একবার আমিও আড়চোখে দেখলাম পরীকে। পরীর চোখে চোখ পড়ে গেল। পরীর দু চোখ জলে ভারী। পরী শুধু বলল, বিলু, তুমি আমার অহংকার। তুমি ভেঙ্গে পড়লে আমি দাঁড়াব কোথায়। বল দাদুর সঙ্গে তোমার কী কথা হয়েছে? কেন ডেকেছিলেন। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য তুমি হাত পেতে নিলে, আমার কষ্টের শেষ থাকবে না। বল, চুপ করে আছ কেন!

আমি মাথা নিচু করে বললাম, পরী, পাগলামি কর না। আবার বলছি, তিনি তোমার ভাল চান। তুমি তাঁর কাছে মানুষ! তোমার ভাল হয়, এমন করে আর কেউ চাইতে পারে না!

—বিলু!

আমি চ্প করে গেলাম।। পরী তার দাদুর কোনো প্রশংসাই শুনতে চাইছে না। জেদি বালিকার মতো গোঁ ধরে আছে।

আমরা দু'জনে আবার চ্পচাপ। স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে। তার শব্দ কানে আসছিল। কেমন এক দূরাতীত শব্দের মতো ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। ও-পাশের মাঠ পার হয়ে চলেও গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমরা দু'জনে গভীর কোনো নৈঃশব্দের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। আমার ভারি কষ্ট হচ্ছিল পরীর অসহায় মুখ দেখে। এক আশ্চর্য সুন্দর শ্রীভূমি যেন দৃশ্যের অন্তরালে উঁকি দিল। আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে এলাম। বললাম, আমি উঠি পরী। স্কুলে যেতে হবে।

উঠে পড়লে দেখলাম পরী একইভাবে মাথা গোঁজ করে বসে আছে। যেন আমার কথা তার কানে যায়নি। তার দাদু আমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কী এমন গুরুতর খবর যে সকালবেলায় তাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ির হলঘরে হাজির হতে বাধ্য হলাম, না জানা পর্যন্ত পরী স্বস্তি পাচ্ছে না।

কিন্তু বুড়ো মানুষটার আর্ত মুখ চোখে ভেসে উঠতেই কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। এমন অসহায় মুখ আমি জীবনেও দেখিনি। যেন আমি বিলু লম্ফের মতো এক ফুঁয়ে তার জীবনের রোশনাই নিভিয়ে দিতে পারি। এখন আমার দরকার পরীকে স্বাভাবিক করে তোলা। কারণ তার চোখ মুখ বড় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বললাম, পরী শুনেছ, চৈতালী কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

পরীর কোনো আগ্রহ নেই চৈতালী সম্পর্কে। চৈতালীর প্রতি মুকুলের দুর্বলতা আছে জানে। দু-একবার পরী নিজেও চৈতালীকে নিয়ে মুকুলের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করেছে। চৈতালী চলে গেলে মুকুল এই শহরে খুব একা হয়ে যাবে, এও জানে পরী। অথচ নির্বিকার।

আমাকেই কথা বলতে হবে। ওকে এখন অন্যমনস্ক না করতে পারলে, আমি চলে গেলে অপমান বোধ করবে। আমার সামান্য স্কুলের চাকরিটা এমনিতেই ওর পছন্দ নয়। এ-নিয়ে দু-পক্ষই আমরা লড়ালড়ি করছি। আমি অন্তত ডিগ্রিটা নিই পরী এটা চায়। যেন পরী চায়, ও যতদিন কলেজে পড়ছে, ততদিন অন্তত পড়াশোনা চালিয়ে যাই। পরীর সঙ্গে আর কোথাও না হোক কলেজে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য দু'জনের মেশার সুযোগ থাকবে। পরী আমাকে তার নিজের মতো করে বড় করে তুলতে চায়। নিজের মতো তৈরি করে কোনো নিরুপম পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চায়।

এবারে আর রায়বাহাদুরের মিনতির কথা মনে থাকল না। —বিলু, পরী যেন না জানে, আসলে পরী জানলে আমার আর কতটা ক্ষতি হবে। ক্ষতি হবে তার দাদুর। আমি জানি পরী আমার কোনো ক্ষতি করবে না। গেরো একটা, পরীর জেদ, না জেনে উঠবে না। এভাবে বসে থাকলে আমিই বা যাই কী করে। সব খুলে বললাম।

পরী শুনে কেমন হতবাক হয়ে গেছে। বিস্ময় ক্ষোভ সব মিলে পরীর চোখ এখন জ্বলছে।

—তুমি যাবে ঠিক করেছ? ঠোঁট চেপে পরী কথাটা বলল।

—এত ভাল চাকরি আমায় কে করে দেবে?

—আমাদের জন্য কষ্ট হবে না?

পরী আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছে।

—কষ্ট হলেই কী করা। রেলের চাকরি সোজা কথা।

—অপরূপার জন্য কষ্ট হবে না। তোমার কবিতার জন্য কষ্ট হবে না?

এবারে বললাম, ওগুলো শখ। বেকার থাকলে হয়।

—তাহলে সবটাই বেকার ছিলে বলে! কবিতা, অপরূপা, সব।

পরীকে বোঝাতে পারছি না আমি কত অবাঞ্ছিত পরীদের পরিবারে। আমার ভেতরে বড় অভিমান এবং জ্বালা। আমি থাকলে পরী যে-করেই হোক বিয়ে ভেঙ্গে দেবে। সে পারে। ওদের পরিবারের পক্ষে কত বেমানান আমি, নিজেও বুঝি। গোটা পরিবারে ঝড় উঠে গেছে। পরীর স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত রায়বাহাদুরের মর্যাদা রাস্তায় লোটাবে, তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। পরীর রুচি এমন নিম্নমানের হবে, তিনি চিন্তাই করতে পারেন না। এ-নিয়ে বাড়িতে বেশ লড়ালড়ি গেছে পরীর বিধ্বস্ত চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু কী যে থাকে, আমি যেন চোরের মতো ওদের বৈভবের মধ্যে ঢুকে গেছি। বেহায়ার মতো পরীর সঙ্গে মিশছি। কিংবা পরীকে গুণটুন করেছি, যে-জন্য পরী স্পষ্টই বলে দিয়েছে বোধহয়, আমি রাজি না। সে তোমরা যাই ভেবে থাক। আমি পড়ব।

না হলে পরীর দাদু আমার বাবার কাছে ছুটে যেতেন না। আমার ভাবনায় পরীর দাদুর ঘুম নেই, যেন আমাকে রেলে চাকরি দিয়ে আমার এবং বাবার দুজনেরই মর্যাদা রক্ষা করছেন। শত হলেও আমি তাঁর গুরুদেব বাবাঠাকুরের প্রিয়, পরীর সঙ্গে এক কলেজে পড়তাম—আমি প্রাথমিক স্কুলে চাকরি করলে সবার অসম্মান।

পরী এবার সাইকেল নিয়ে হাঁটতে থাকল। পরী ভিতরে ভিতরে যে ফুঁসছে ওর চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারছি। পরী রাস্তায় উঠে বলল, চাকরি ঠিক হয়ে গেছে?

—হয়নি। হবে।

—কোথায়? চোখ মুখ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। আমি চুপ করে আছি দেখে ফের পরী তিক্ত গলায় বলল, কোথায় হচ্ছে? কোথায় যাবে। বলো! বলো!

—বিলাসপুরে শুনছি। ওখানেই ট্রেনিং। সামনে নাকি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যত।

পরী এবারে হা হা করে হেসে উঠল। ঠিক আমি যেভাবে পরীদের বাড়িতে রায়বাহাদুর হাত ধরতেই হেসে উঠেছিলাম।

আমি এমন একজন জাঁদরেল মানুষের, যিনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, যিনি সকাল হলে শহরের শতেক সমস্যা নিয়ে মানুষের সঙ্গে দেখা করেন, মানুষজন লাইনবন্দী হয়ে তাঁদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, বাড়িতেই এই, অফিসে না জানি কত ইজ্জত,—সেই মানুষটা এত অসহায় তাঁর নাতনীকে নিয়ে ভাবতেই ভিতর থেকে জীবনের প্রবল তামাসার মতো হাহাকার হাসিতে ফেটে পড়েছিলাম। ওটা ছিল আমার জয়ের হাসি। বিশাল পরাজয়ে আমি যে কতটা ভেঙে পড়েছি তারও প্রকাশ।

পরী কেন হাসছে!

পরীকে বললাম, কী হয়েছে তোমার। এত হাসছ কেন!

—তোমার চাকরি হবে রেলে। হাসব না, কী আনন্দ।

—হবে বলেছেন। কাল সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে বলেছেন। এখনও হয়নি।

—আর কিছু নিয়ে যেতে বলেন নি?

—না।

—ঠিক আছে। বলেই সে সাইকেলে চড়ে সোজা চলে গেল। গাছের ছায়ার এবং ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। একবারও আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি, আমি যে দাঁড়িয়েই আছি, আমার এ-দাঁড়িয়ে থাকা যে পরীর জন্য অনন্তকালের। পরী আমাকে ফেলে চলে গেল,—এমন কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এ-আবার আমার কেমন অভিমান!

আমিই তো চাইছিলাম পরী চলে যাক। শহর ছাড়িয়ে জেলখানার মাঠ পার হয়ে রেললাইনের পাশে বসে থাকা কত অশোভন, এটাই কেবল মনে হচ্ছিল। পরী চলে যাওয়ায় কেমন একা হয়ে গেলাম। পরী চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

তখন গাছপালার ফাঁকে আমার মুখে রোদ পড়েছে। বনজঙ্গলের রাস্তাটা পার হয়ে গুমটি ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলাম। আমার ইস্কুল আছে, বাড়ির সবাই অপেক্ষা করছে।

এ সবই ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম।

আমার সঙ্গে সাইকেল আছে ভুলে গেছি। সাইকেল নিয়ে হাঁটছি। গুমটি পার হয়ে মনে হল, কী করব! পরী কেন যে আমার এত বড় সুখবরেও খুশি হল না! থার্ড ইয়ারে ভর্তি না হয়ে প্রাইমারী ইস্কুলে চাকরি নেওয়ায় পরীর ক্ষোভ আছে বুঝি, কিন্তু হাতের কাছে এত বড় চাকরির খবরেও পরী খুশি নয়। আমি না হয় বুঝতে পারি, কেন রায়বাহাদুর চান আমি এখান থেকে চলে যাই।—কিন্তু পরী, সেও কী টের পায় দাদুর আসল উদ্দেশ্য বিলুকে ঘরছাড়া করা। শহর ছাড়া করা।

কখন বাড়ির রাস্তায় ঢুকে গেছি টের পাই নি। পিলু দৌড়ে আসছে। এবং আমার বাবা-মাও খবরটা পাবার আশায় প্রতীক্ষা করছে বুঝতে পারছি।

পিলু এসেই বলল, দাদারে!

এই দাদারে বললেই বুঝি আমার জীবনে পরীর অস্তিত্ব যত ঝড়ই তুলুক, এরাও আমার কম নয়। একদিকে পরী, আর একদিকে অভাবের সংসার থেকে আমার বাবা-মার মুক্তি। ভাইবোনদের বড় করে তোলা,—কত কাজ আমার।

পিলু আমার খবর বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য দৌড়ে গেল। —দাদা আসছে।

এতটা রাস্তা সাইকেলে না এসে হেঁটেই চলে এসেছি টের পেতেই বুঝলাম পরী কতটা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পিলুর 'দাদারে' কথায় যেন আমি জেগে গেছি। সত্যি বেলা হয়ে গেছে। নতুন চাকরি। স্কুলে না গেলে বাবা মনে মনে ক্ষুব্ধ হবেন। বলবেন, বিলু কর্তব্যকর্মে অবহেলা ঠিক না। মানুষ কাজের মধ্যেই বাঁচে।

বাড়ি ঢুকে দেখলাম বাবা বাড়ি নেই।

মা'র পাশে খোঁড়া বাঁদরটা রান্নাঘরে বসে আছে। খোঁড়া বাঁদরটা মা'র ভারি ন্যাওটা। মায়া মাঠ থেকে ছাগল তাড়িয়ে আনছে। আমার ফিরে আসার অপেক্ষাতে হয়তো বাবা বসে আছেন এমন মনে হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে বাড়ি না দেখে মনে মনে খুশি হলাম। পিলু যে দাদারে বলেই চুপ মেরে গেছে, আর একটা কথাও বলেনি কেন, এখন বুঝেতে পারলাম। আমার চোখ মুখ দেখলে পিলুই আগে টের পায়, আমি ভাল নেই। দেখেই বুঝেছে, তার দাদাটির কিছু হয়েছে। চোখ মুখ ভাল ঠেকছে না।

পিলু তার দাদার বিষণ্ণ মুখ দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে। সে মাকে এসেও খুব একটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দাদা আসছে খবরটা বোধ হয় দিতে পারেনি। অথবা কিছুই বলেনি। সে তার নিজের কাজে মন দিয়েছে। এই সংসারে সে কিছু নিজের মতো কাজ, বাবার ঘরবাড়ি বানাবার সময়ই কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এখনও সেটা সে করে।

সাইকেলটা বারান্দায় ঠেস দিয়ে রাখার আগে বললাম, কীরে ইস্কুলে গেলি না?

মা টের পেয়ে আঁচলে হাত মুছে বের হয়ে এল। কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মা কেমন জলে পড়ে গেছে বলে মনে হল।

মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, চাকরিটা হবে। কাল সার্টিফিকেট মার্কসিট নিয়ে যেতে বলেছে।

মা কেমন ভাল বুঝল না। শুধু বলল, এত দেরি করলি কেন? কখন রান্না করে বসে আছি। তোর বাবা বলল, এত দেরি হবার তো কথা না। চাকরিটা কী তবে হচ্ছে না?

—না, হবে।

এতেও মা আশ্বস্ত না হলে বললাম, চাকরির জন্য ভেবো না। চাকরিটা হবেই। পরীর দাদু খুব উঠে পড়ে লেগেছে।

মা বলল, হলেই বাঁচি বাবা। রেলের চাকরি সোজা কথা। তোর বাবা তো বলল, চাকরিটা হলে তুই আমাদের যখন-তখন তীর্থ করাতে পারবি। রেলের পাশ পাবি। এক পয়সা ভাড়া লাগবে না।

আমি জোর করে হাসার চেষ্টা করলাম। মা'র এত আশা!

সেই মা সহসা কেমন কাতর চোখে আমাকে দেখে ঘাবড়ে গেল। বলল, কীরে মুখে তোর কালি পড়েছে কেন! এ কি চোখ মুখের চেহারা করেছিস?

রোদে হেঁটে এসেছি, চোখে ক্লান্তির ছাপ থাকতেই পারে। না কি মা বলেই টের পায়, ভিতরে আমার চরম সংকট। আমি অস্থির।

সাইকেল বারান্দায় তুলে স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমি তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে আসছি। ভাত বাড়। বলে আর দাঁড়ালাম না। মা সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে প্রায় তেড়ে এল। বলল, একটু ঠান্ডা হয়ে নে। এই মায়া। ছাগলগুলোকে জল দেখাস পরে। তোর দাদাকে তেল দে। গামছা বের করে দে। পিলু গেলি কোথায়। এখন ছাগলের জন্য তোমায় ঘাসপাতা কাটতে হবে না। স্কুলে যাবি না। দাদা ফিরছে না কেন! এখনও তো স্কুলের ঘন্টা পড়েনি। তুইও বসে যা।

খেতে খেতে বললাম, বাবাকে দেখছি না। কোথায় গেলেন। যজনযাজনে যাবার কথা নয়। কোথাও শ্রাদ্ধশান্তি আছে তাও জানি না।

মা বলল, আর বলিস না, নবমীর কাছে গেছে।

নবমী বুড়ি বিশাল জঙ্গলের কারবালার দিকটায় পরিত্যক্ত ইঁটের ভাটাতে এখনও বেঁচে আছে। নবমীর কাছে আমারও অনেক দিন যাওয়া হয়নি। আমাদের দু-বেলা অন্ন সংস্থানের সঙ্গে নবমীও লেপ্টে গেছে। নবমীর দা-ঠাকুরটি আমার পাশে বসে খাচ্ছে। নবমী সম্পর্কে একটিও কথা বলছে না। সকাল বিকাল সে-ই নবমীর জন্য কলাই করা টিনে ভাত ডাল শাক নিয়ে যায়। নবমীর জন্য দানের কোরা ধুতি,—যখন যা লাগে সেই দিয়ে আসে। বাড়িতে গরুবাছুর আছে। মাঠ থেকে নিয়ে আসা, জাবনা দেওয়া তার কাজ। এই কাজগুলির মতো নবমীর কাজটাও সে নিজ থেকেই কাঁধে তুলে নিয়েছে, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে'—পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরুণের মতো বসে আছে পারের অপেক্ষায়। তবে বনজঙ্গল সাফ করে স্রোতের মতো ছিন্নমূল মানুষ এসে যাওয়ায় বনটার সে আদি ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য আর নেই। কেবল নবমী বুড়ির ওদিকটায় এখনও কেউ ঢুকতে সাহস পায়নি। কারবালার কবরখানার পরেই জঙ্গলটা।

গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে নবমীর সাড়া পেতাম,—দাঠাকুর, ভয় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গভীর বনের মধ্যে আমরা দু-ভাই সাহস ফিরে পেতাম।

সেই নবমীর কাছে বাবা গেছেন।

খেয়ে উঠে সাইকেলে উঠতে যাব, হঠাৎ পিলু কাছে এসে বলল, দাদা আমাকে স্কুলে দিয়ে যাবি?

পিলুর দেরি হয়ে গেছে বুঝতে পারি। বললাম ওঠ।

সে রডে বসলে সাইকেলে বের হয়ে রাস্তায় পড়লাম।

পিলু বলল, জানিস দাদা, নবমী না জঙ্গলটায় আর থাকতে চাইছে না।

বললাম, কেন। বনটা ছেড়ে আসতে পারবে?

—কে নাকি আজকাল রাতে এসে শিয়রে তার বসে থাকে।

—কে বসে থাকে?

—বলে না। কিছু বলে না। কে বসে থাকে বলে না। গেলেই বলবে, কিগো দা-ঠাকুর বাবাঠাকুরকে পাঠালেন না! বাবাঠাকুরকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে!

বাবাঠাকুর মানে আমার বাবাকে। বাবা গেলেই নবমী গড় হবে। বনের ফল-পাকুড়, নারকেল, বেল, কয়েতবেল যখনকার যা পায়ের কাছে রাখবে। যেন বাবাকে গড় হয়ে এ-সব ফলমূল দেবার মধ্যে জীবনের অন্য এক অজ্ঞাত নক্ষত্রের খোঁজ পায়। বনটায় নবমী কতকাল ধরে পড়ে আছে। তার স্বামী ইঁটের ভাটার সর্দার ছিল। সেই কবেকার কথা। নবমী হিসেব জানে না। কেবল বলে,—এই যে যুদ্ধ হল নাগো, তখন আমার সোয়ামীটা মরে গেল। আসলে এখানে থাকতে থাকতে নবমী তার দিনকাল তিথি নক্ষত্রের হিসাব ভুলে গেছে। কখনও মনে হত স্মৃতি। তার মরদের স্মৃতি সে ভুলতে পারছে না। আমরা কতদিন বলেছি, তোমার ভয় করে না। সে কী মধুর হাসি!—ভয় পাব কেন? তেনার কথা আমি শুনতে পাই। গাছপালার ভেতর ঘুরে বেড়ালে সবাই আমার সঙ্গে কথা বলে। সবাই বলতে বুঝি, গাছপালা, বনের প্রাণীসকল এবং পাখপাখালি।

সেই নবমী নাকি রাতে একা থাকতে ভয় পায়। বাবা কী বিধান দেবেন কে জানে!

পিলু বলতে পারে, নবমীকে বাড়ি নিয়ে এস বাবা। নবমীর জন্য পিলুর চার পাঁচ বছরে এক আশ্চর্য মায়া গড়ে উঠেছে বুঝি।

বললাম, কে এসে বসে থাকে জিজ্ঞেস করলি না?

আমরা আচার্য পাড়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। নরেশ মামা এসে মাঠের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল খুলেছেন। এবারে সিক্স সেভেন এক সঙ্গে দুটি ক্লাশও খোলা হয়েছে। পিলু সেভেনে পড়ে। সে বলল, যাবি দাদা?

—কোথায়?

—নবমী বুড়ির কাছে। ও বেশিদিন আর বাঁচবে না।

তা নাই বাঁচতে পারে। এতদিন বেঁচে আছে ভাবতেই অবাক লাগে। আমার তো এক সময় মনে হত, পিলু যখন তখন ছুটে এসে খবর দেবে, জানিস দাদা নবমী না মরে গেছে। বাবাকেও দেবে। নবমীর সদ্‌গতি হয় এমন একটা বাসনা আগেই সে বাবার কাছে পেশ করে রেখেছে। যেন এই সদ্‌গতি না হলে নবমী পিলুর উপরই মরে গিয়ে আক্রোশে ফেটে পড়বে। সে আর একা সাঁজবেলায় কিংবা রাত করে বাড়ি ফিরতে পারবে না।

—একটা লাঠি নিয়ে দরজায় বসে থাকে নবমী।

—লাঠি কেন?

—লাঠি না হলে তাড়াবে কী করে!

—কাকে তাড়াবে।

—একটা সাপ! জানিস! আজ তো তাই বলে ফেলল।

—সাপ?

—হ্যাঁরে, আলিসান ভুজঙ্গ। ইন্দুরখোমা সাপ বলল, ওটা নাকি যখ।

ইন্দোরখোমা এক ধরনের গোখরো। পদ্মনাগ বলে কেউ। ফণায় খড়মের ছাপ। ইঁদুর খেতে ভালবাসে বলে আমরা ইন্দোরখোমা বলি। অমন একটা বিষধর সাপ তাড়াবার জন্য লাঠি নিয়ে বসে থাকে,—ভাবতেই অবাক হয়ে গেলাম! নবমী তো কুঁজো হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না। ভাল করে হাঁটতে পারে না। সাপখোপের মধ্যেই এতদিন বাস করে এসেছে। কিছু বললে, এক কথা, কারো অনিষ্ট না করলে আমার অনিষ্ট করবে কেন কন দাঠাকুর।

সেই নবমী এখন সাপের আতঙ্কে মুষড়ে পড়েছে। আতঙ্ক হবারই কথা। রাতে আবার কে এসে বসে থাকে শিয়রে। বসে থাকে, না যখটা ফণা তুলে দুলতে থাকে। কেমন একটা রহস্যের গন্ধ। বাবা গিয়ে কী করবেন! একমাত্র বাড়িতে নিয়ে আসতে পারেন। বাড়িটা চিড়িয়াখানা। এবারে তবে ষোলকলা পূর্ণ হবে। খোঁড়া বাঁদর, হাঁস, কবুতর, টিয়াপাখি, বিড়াল, কুকুর, গাই বাছুর সবই আছে। ছিল না বয়সে জরাগ্রস্ত কোনো রমণী। পরী এলে এবার বুঝতে পারবে, বাবার বাড়িঘরে আরও একটি বিচিত্র জীব হাজির হয়েছে। পরীর মজার শেষ থাকবে না। যা মেয়ে, এসেই না নবমীর সেবা শুশ্রূষায় লেগে যায়! মানুষের

সেবা বলে কথা! সে-জন্য তার পার্টি, মিছিল, ভোটের সময় গলা ছেড়ে হাঁক—ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। বাপ ঠাকুরদার প্রাসাদে, বাগানবাড়িতে সে লাল পতাকা তুলতে চায়।

স্কুলের সামনে পিলুকে নামিয়ে দিতেই বলল, দাদারে তোর কী হয়েছে!

এক ধমক লাগালাম, আমার কী হবে! যা দাঁড়িয়ে থাকিস না।

আসলে আমি ভাল নেই, পিলু টের পেয়ে গেছে। বাবার পরে পিলুরই আমাকে নিয়ে অহংকার বেশি।

বাবার অহংকার তার বাড়িতে পুত্রের সুবাদে এস ডি ও সাব পর্যন্ত ঘুরে গেছেন।

মা'র অহংকার তার পুত্রটি ভারি সুন্দর দেখতে।

আর পরীর অহংকার আমি কবিতা লিখি। আমি কবি। কবি ভাবলেই হাসি পায়। কবিতার যা ছিরি হাসি পেতেই পারে। আসলে নারীরা পুরুষের উপর জয়লাভ করতে চায়। পরী জয়লাভ করেছে। সে জোরজার না করলে এ-রাস্তায় কস্মিনকালেও হাঁটতাম না। রিফুজি বাবার ছেলের কবিতার বাই দুরারোগ্য ব্যাধির সামিল। বাবার আক্ষেপ, বিলুটার এই মতিচ্ছন্ন কেন। কিছু বলতেও পারেন না। মুকুল নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবুরা শহর থেকে আমার টানে যে কলোনিতে চলে আসে আমি কবিতা চর্চা করি বলেই। বাবা এটা ঠিক বোঝেন। মুকুলের সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মুকুলও কবিতা লেখে বলে। শহর থেকে সব কৃতী ছেলেরাই আসে এই টানে। পরী আসে। এস ডি ও আসেন। শেষ পর্যন্ত পরীর দাদু রায়বাহাদুর।

ফলে বাবা আমার কবিতা চর্চা সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। মুখ ফুটে কিছু বলেন না। শুধু মাকে নাকি একদিন বলেছিলেন, তোমার পুত্রটি মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। পার তো রক্ষা কর।

মা বুঝতে না পেরে বলেছিল, মহাব্যাধি! বলছ কী।

—ঠিকই বলছি। উনি রাত জেগে কী করেন বুঝতে পার না?

কবিতা বিষয়াটাই মা'র মাথায় নেই। মা, কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়তে পারে।

মা'র মুখে আতঙ্ক। মা বলেছিল, বিলুর কী হয়েছে!

—কী আবার হবে! কবিতা লেখেন। তুই গরীব বামুনের ছেলে, তোর এ-সব সাজে ! তুই তো আর জমিদার নস,—যে ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে কবিতা লিখবি!

পিলুই আমাকে এসব খবর দেয়। অসাক্ষাতে আমাকে নিয়ে মা'র সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলে পিলু গোপনে সব বলে দেয়। বাবা কাকে ঠেস দিয়ে বলেন সেও বুঝি। আমার তখন নিজেরই হাসি পায়।

পরীর সেই মহাকবি এখন যাচ্ছেন প্রাইমারী ইস্কুলে পড়াতে। ভাঙা লঝঝরে সাইকেলের ঝং ঝং শব্দে, দূর থেকেও মানুষজন টের পায়, আসছেন তিনি। আমাকে বেল বাজাতে হয় না। বেলটা খুলে রেখেছি অকেজো হয়ে যাওয়ায়। ব্রেক একদিকটা কোন রকমে ধরে, আর একদিকটা ধরেই না। কতবার যে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছি শুধু কপাল গুণে।

বাবা বলেছেন, এখন চালিয়ে নাও। দেখি শীত গেলে কিনে দিতে পারি কি না! অর্থাৎ শীত আসতে বাবার হাতে আমার মাইনের কিছুটা সঞ্চয় থেকে যেতে পারে,—সেই আশায় আছেন তিনি। পুরো মাইনেটাই বাবার হাতে তুলে দি। আট আনা এক টাকা চাইলেও প্রশ্ন, কী করবে?

আমি যে বড় হয়ে গেছি, আমার যে সামান্য হাত খরচের দরকার, আমার বাবা তা বুঝতেই পারেন না। ফলে দরকারে অদরকারে মা'র কাছেই হাত পাতি। মা গোপনে টাকাটা সিকিটা দিয়ে বলবেন, তোর বাবা যেন না জানে।

সুতরাং নিজেকেই বললাম, তাহলে বিলু তুমি চলে যাচ্ছ? তোমার কষ্ট হবে না সব ফেলে যেতে!

সব ফেলে চলে যাব। সব বলতে আমার কেন জানি এই রাস্তা, বিকেলের ব্যদশাহী সড়কে বন্ধুরা মিলে ঘুরে বেড়ানো, কখনও গাছের নিচে বসে কবিতা পাঠ, কে কি নতুন কবিতা লিখল জানার আগ্রহ এবং তখনই দূরে দেখতে পাই কেমন শাদা জ্যোৎস্নায় সে দাঁড়িয়ে আছে একা। পরীর দু-চোখে জল। তুমি চলে গেলে, বিলু, আমি একা হয়ে যাব।

ইস্কুলে কিছুতেই মন বসাতে পারলুম না। দু-পিরিয়ড করে চলে এলাম। হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরটায় ঢুকে গেলাম। আলগা ঘর, টালির চাল, বাঁশের বেড়া। একটা তক্তপোষ। মাদুর পাতা। মায়া এখন তার দাদার ঘর সাফসুতরো রাখে। একটা টেবিল। কোন ঢাকনা নেই। ঢাকনা লাগে এও মায়ার জানা নেই। দাদার এই ঘরটায় শহর থেকে ছিমছাম তরুণরা এসে বসে, এ জন্য মায়ার সব চেয়ে বেশি লক্ষ্য ঘরটার দিকে। রোজ সকালে গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে রাখে। টেবিলে আমার পিলুর বইপত্র এলোমেলো হয়ে থাকলে সাজিয়ে রাখে। জানালায় ছেঁড়া শাড়ি কেটে পর্দা করে দিয়েছে। টেবিলে কাচের গ্লাসে যে দিনের যে ফুল সাজিয়ে রাখে।

আজ ফিরে এসে কিছুই ভাল লাগছিল না। অসময়ে ফিরে আসায় বাবাও উদ্বেগে পড়ে গেছেন। আসতেই বললেন, স্কুলে কিসের ছুটি?

বললাম, ছুটি না।

—তাহলে শরীর খারাপ?

—না।

বাবা বারান্দায় বসে কথা বলে যাচ্ছেন। জলচৌকিতে বসে আছেন। আমি আমার ঘরে। সাইকেলটা তোলার সময়ই তিনি চোখ তুলে তাকালেন। কী দেখলেন জানি না। অবেলায় বাবাও আজ তাঁর নিজের পোঁটলা-পুঁটলি কেন খুলে বসেছেন জানি না।

আজ ঘরে ঢোকার সময় বুঝতে পারলাম, বাবার নতুন করে কিছু খোঁজার পালা শুরু হয়েছে। এক নম্বর খোঁজার বিষয় হতে পারে, আমার রেলের চাকরি শেষ পর্যন্ত হবে কিনা। কাল যে আমি সার্টিফিকেট নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে যাচ্ছি, তার যাত্রা নাস্তি লেখা আছে কিনা। কখন কোন্ সময়ে বাড়ি থেকে বের হলে যাত্রা শুভ এসব দেখতে পারেন। দ্বিতীয়, নবমী বুড়ির কাল সমাগত কিনা। তাকে তিনি কি আশ্বাস দিয়ে এসেছেন জানি না। তৃতীয়, পরীর বিয়ের কথাবার্তা চলছে, তা রাজযোটক কিনা। এসব কাজের দায় কেউ চাপিয়ে দেয় না বাবাকে। বাবা নিজেই এসব কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে ভালবাসেন।

কিছুক্ষণ পর আবার কী যেন বললেন। আমি শুনতে পাইনি। মা রান্নাঘরে খাচ্ছে। বাবার কথাবার্তা মা-ও যে আগ্রহ নিয়ে শুনছে, এ-ঘর থেকে বুঝতে পারছি। মা কি খবরটা দিয়েছে, বিলু গোমড়া মুখে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে তো বাবার সঙ্গে তার দেখা হয়নি।

আবার ডাক শোনা গেল, কী করছিস। শোন।

আমার এখন কিছু ভাল লাগছে না। তক্তপোষে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাবার এই ডাকাডাকি ভাল লাগছে না। বিরক্ত। কিন্তু বাবার ঐ এক স্বভাব, সাড়া না দিলে মানুষের কর্তব্য কী, কেন জন্ম, মানুষের সঙ্গে প্রাণীজগতের কী তফাৎ, তারপর অদৃষ্ট নিয়ে পড়বেন। বলবেন, এই আমার অদৃষ্ট। ছেলের এখন পাখা গজিয়েছে। আমাকে আর মানবে কেন।

আমার ঘরে বাবা এসে আবার হাজির না হন। এই ঘরটায় এখন যে তাঁর ছেলে নিষিদ্ধ বস্তু রাখে, বাবা জানে না। দু-একটা সিগারেট খাবার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। রাতে খাবার পর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, গোপনে সিগারেট ধরিয়ে কবিতা লিখি। আসলে আমার কেমন মনে হয়েছে,—নির্জনতার মধ্যে ডুবে না গেলে কবিতা লেখা যায় না। টেবিলের ড্রয়ারে তালাচাবি করে নিয়েছি। মা'র কাছ থেকে দু'-এক টাকা এজন্যই নিতে হয়। পিলু জানে। তবে পিলু দাদা লায়েক হয়ে গেছে ভেবেই খুশি। সে আর পাঁচ কান করেনি।

অগত্যা গেলাম।

বাবা বললেন, বোস।

তারপর তেমনি পুঁথির দিকে চোখ রেখে বললেন, শুনলাম কাল তোমাকে যেতে বলেছেন। সকাল পাঁচটার আগে রওনা হবে।

—এত সকালে গিয়ে কী করব!

—রাস্তায় বসে থাকবে।

বাবার এসব কথা মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত তুলে দেয়। বললাম, রাস্তায় বসে থাকব?

—পঞ্চাননতলায় গিয়ে বসে থাকবে রবির দোকানে।

বাবার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিশ্বাস মেলে না। বাবাকে জানি বলেই আর প্রশ্ন করিনি, কেন এত সকালে বের হব? এত সকালে আমি উঠতে পারব না। আমি তো বাইরে কোথাও যাচ্ছি না। শুভ সময়ে যাত্রা করতেই হবে! এসব বলা বৃথা জেনে উঠে পড়ব, ভাবছি, বাবার তখন প্রশ্ন, চাকরি কবে নাগাদ হচ্ছে কিছু বলেছেন মৃন্ময়ীর দাদু?

—না।

—তোমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তোমার আগ্রহ আছে—এটা তবে তিনি টের পেতেন। উদ্যমী হও। তোমরা মানুষের সঙ্গে দেখছি মিশতে জান না। তোমার স্বভাব দিনকে-দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে।

এ-সময়ে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যখন আরম্ভ করেছেন, শেষ না করে থামবেন না। আসল কথায় তাঁর আসতে অনেকটা ভূমিকার দরকার হয়। এখন বাবার ভূমিকা পর্ব চলছে।

—এত বেলা করে ফিরলে কেন? এত দেরি হবার তো কথা নয়।

—কাজ ছিল।

আমার গলায় দৃঢ়তার আভাস পেলেন। আমি যে রুষ্ট হয়ে উঠছি, তিনি বুঝতে পারছেন। আমি যে বড় হয়ে গেছি, আগেই টের পেয়ে গেছেন। কারণ, এখন আর বাবা যখন-তখন মানুষের সুখ্যাতি করতে গেলে দশবার ভাবেন। বাবার কাছে, পয়সাওয়ালা লোক মাত্রই উদ্যমী এবং উদ্যমী না হলে জীবনে বড় জায়গায় যাওয়া যায় না, এসব কথা তিনি বারবার শোনান। আমি জানি, আসলে মানুষগুলি চোর-বাটপাড়। লোককে না ঠকালে মানুষ এত বৈভবের অধিকারী হয় না।

তিনি খালি গায়ে বসে আছেন। গলায় শাদা উপবীত এবং বাবাকে এ-সময় খুবই ধার্মিক দেখাচ্ছে। তিনি বললেন, নিবারণ দাস তো বলল, এ আপনার পূর্বজন্মের পুণ্যফল। এত বড় একজন মানুষ বিলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করছে, বিলুর মত ছেলে প্রাইমারী ইস্কুলে পড়ে থাকলে মানাবে কেন।

আমি আর পারছিলাম না। বললাম, আগ্রহ না দেখালেও কাজটা হবে। আপনি ভাববেন না। মুখ প্রায় ফসকে বলে ফেলেছিলাম, পরীর দাদুর গলার কাঁটা আমি।

—পরীর দাদুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে না যাতে তিনি আঘাত পান। কত করে বললেন, বিলুকে আসতে বলবেন, তুমি গেলে না। বাধ্য হয়ে নিজেই এলেন। তোমার মা-তো রোজ ঠাকুরকে বলছেন, চাকরিটা যেন হয়। এতে বাড়িঘরের সম্মান বাড়ে,—বুঝতে শিখো।

সহসা কেন যেন মনে হল, এক অন্ধকার প্ল্যাটফরমে আমি লালবাতি দোলাচ্ছি। পরীর ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

বাবা পোঁটলা পুঁটলি বাঁধতে থাকলেন। কেমন নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো বলে যাচ্ছেন, মানুষই মানুষের আশ্রয়, গাছের দুটো বড় পাকা পেঁপে তোমার মা রেখে দিয়েছেন। থলেয় করে ও-দুটো নিয়ে যাবে। বলবে, বাবা দিয়েছেন। আমাদের গাছের পেঁপে। এতে সম্পর্ক তৈরি হয়।

আর সত্যি পারা গেল না। বললাম, কিছু আমি নিতে-টিতে পারব না।

—ঠিক আছে, পিলুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—না, পাঠাবেন না।

আমি খুবই রুষ্ট হয়ে উঠেছি। বাবা কেমন হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, তিনি এত করছেন, আর তাঁর জন্য দুটো গাছের পাকা পেঁপে নিয়ে যেতে পারবে না! তারপর একটু থেমে বললেন, তোমার মান-সম্মান বড় ঠুনকো। পরীর দাদু এতে বুঝতে পারবেন, বাড়ির ভালমন্দ তিনি খেলে আমরা খুশি হই।

—তিনি তা ভাববেন না।

—কী ভাববেন তবে।

—ভাববেন আমার চাকরিটার জন্য ঘুষ দিচ্ছেন। কিছুতেই পাঠাবেন না। যদি পাঠান, আমি ও-চাকরি করব না। আপনার রায়বাহাদুর এলে আমি তাঁকে অপমান করব।

—কী বললি!

আমি যে মাথা ঠিক রাখতে পারছি না বুঝতে পারছি। আমার এই রূঢ় আচরণে বাবা কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। যেন এই অপমান রায়বাহাদুরকে নয়, বাবাকে করছি। হাতের কাছে এত বড় স্বর্গের সন্ধান যিনি এনেছেন, তাঁর প্রতি আমি এত ক্ষুব্ধ কেন বাবা তার বিন্দুমাত্র যদি আঁচ করতে পারতেন। আমার বাবার জন্য কষ্টে চোখে জল এসে গেল।

বাবা এবার আমার দিকে তাকালেন। ভিতরে কতটা ভেঙ্গে পড়েছি বাবা টের পাবেন। বলবেন, তোমার কী হয়েছে। আমি মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। যেন বাড়ির গাছপালা দেখছি। শরৎকাল এসে গেছে। এটা আমার বড় প্রিয় কাল। পরীর সঙ্গে শরতের জ্যোৎস্নায় আমি রেল-লাইন ধরে কবে যেন হেঁটে গেছিলাম। কবে যেন পরী বলেছিল না না বিলু, তুমি পাগলামি কর না। আমি তবে মরে যাব। পরী অতটা আসকারা না দিলে বোধহয় আজ আমাকে এত বড় সংকটের মধ্যে পড়তে হত না।

বাবা আমার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। আমার রূঢ় ব্যবহারে তিনি বোধহয় ধরতে পেরেছেন, পেঁপে পাঠানো ঠিক হবে না। আমি পছন্দ করছি না। ঘুষ ভেবেছি। তিনি আমাকে শান্ত করার জন্য বললেন, ঘুষ মনে করছ কেন বুঝি না। আগেই বলেছি এতে সম্পর্ক তৈরি হয়। এই যে নবমীকে বাড়ি নিয়ে আসছি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে। ভেবে দেখ আমরা আসার আগে পৃথিবীর কেউ জানতই না, এই বনের মধ্যে নবমী বুড়ি একলা থাকে। পিলুই এসে খবর দিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে।

আমি কথা বলছি না। বাবা অজস্র কথা বলে যাবেন, শুনে যেতে হবে। আমাদের বাড়িতে বাবা কখনও তুইতুকারি করেন স্বাভাবিক কথা বলার সময়। আবার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলার সময় তুমি সম্বোধন করেন। তেমনি আমরাও বাবাকে আপনি বলি আবার তুমিও বলি। সবটাই নির্ভর করে কোন কথার কতটুকু গুরুত্ব আছে তার উপর।

—মনে রাখবে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে মানুষ বাঁচতে পারে না। আমার মতো গরীব বামুনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে না উঠলে আসবেন কেন। পরী যে আসে, সেও কোনো সম্পর্ক থেকে। শুনেছি পরী বাড়ি এলে পর্যন্ত তুমি অখুশি হও।

আমি বোঝাই কী করে, পরী আমাদের দারিদ্র্য উপভোগ করতে আসে। আমি চাই না, আমাদের দুরবস্থা দেখে কেউ মজা পাক!

বাবা রামায়ণ পাঠের মতো বলে যাচ্ছেন, নবমীর স্বামী, তুমি জানো, ইঁটের ভাটায় সর্দার ছিল। পশ্চিমে কোথায় দেশ ছিল তাদের। স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে। বলতে পারে না। তার স্বামী ইঁটের ভাটাতেই দেহরক্ষা করেছে। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে নবমী তার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে ছিল। স্মৃতির সম্পর্ক। তারপর তাও তার হারিয়ে গেল। জঙ্গলের গাছপালা কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল। ভাটা উঠে গেল, নবমী গেল না। সে বনজঙ্গলের মধ্যে স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকল।

ভাবলাম হতেই পারে। নবমীর যৌবন বয়সের স্মৃতি, কত রাতে, লণ্ঠনের আলোর মুখোমুখি বসে, দু'জনের গভীর প্রেম, অথবা আকাশের নিচে বসে থাকতে থাকতে এক উষ্ণ জীবন দু'জনের—এবং নক্ষত্রমালার গভীরে টের পায় নবমী তার মানুষটি সেখানে কোথাও আছে। একজনের স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাকতেই পারে। একজনের পেট চালাবার আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা এই বনজঙ্গলই করেছে। শহরে নিয়ে গিয়ে কাঠ বিক্রি করতে পারে, কিংবা গাছের ফলমূলই ছিল তার বেঁচে থাকার উপায়।

বাবা বলে যাচ্ছেন—পিলুকে দা'ঠাকুর ডাকে। পিলু গেলে কী খুশি হয়, পিলুকে একটা ছাগলের বাচ্চাও দিয়েছে। এই দেওয়াটা ঘুষ ভাবলে দোষের। সম্পর্ক গড়ে তুলেছে নবমী। পিলু গেলে, নারকেল, বেল কতকিছু দিয়েছে। যেন সারাদিন সে বনজঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কী পড়ে আছে খোঁজার জন্য। তার দা'ঠাকুরের মুখে তবে হাসি ফুটে উঠবে। এই হাসিটুকু দেখার জন্য শরীরের জরাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে। তুমি তো দেখেছ, নবমীকে যখন পিলু আবিষ্কার করে তখনই জরা

৩।.৮ গ্রাস করেছে। নবমীর জন্য পিলু রোজ খাবার নিয়ে যায় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলেই। —কোথাকার কে, এখন বায়না সে জঙ্গলে থাকবে না। একা ভয় পায়। তার ঘরে নাকি যখ ঢুকতে চায়। যে কটা দিন বাঁচবে, সে তার দা-ঠাকুরের কাছে থাকতে চায়। পিলুও দেখছি নবমীকে নিয়ে আসার জন্য পাগল। সম্পর্ক গড়ে না উঠলে এসব হয় কী করে!

আমার বাবা এ-রকমেরই। তিনি যা বুঝবেন, তা থেকে নিবৃত্ত করা কঠিন। কেবল তিনি আমার মা'কেই সমীহ করেন, কিছুটা ভয়ও করেন।

মা'র খাওয়া হয়ে গেছে। হাতে এঁটো থালা নিয়ে বাবার সামনে দাঁড়াল। খেতে খেতে পিতা-পুত্রের বিরোধ কী নিয়ে টের পেয়েছে। মা এবার আমার পক্ষ নিয়েই বলল, দরকার নেই পেঁপে পাঠাবার। চাকরিটা হয়ে যাক, তুমি নিজে গিয়েই একদিন বড় দুটো পেঁপে দিয়ে এস। তোমার গাছ লাগাবার হাত যশ তবে মৃন্ময়ীর দাদু টের পাবেন।

কেউ এলে একটাই প্রশ্ন। —কত বড় বেল!

একটাই প্রশ্ন, কী মিষ্টি আপনার গাছের আম!

প্রশ্ন, কত বড় পেঁপে! কী সুস্বাদু। বীজ রাখবেন। নেব।

বাবা হাসবেন তখন। আশ্চর্য তৃপ্তির হাসি। মুখে কিছু বলবেন না।

আমরা বুঝি বাবা কী বলতে চান। আজ যেন সেটা আরও বেশি বুঝেছি, —সম্পর্ক। গাছের সঙ্গে মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক। এরই খাতিরে তল্লাটের সবচেয়ে বড় পেঁপে আমাদের গাছে জন্মায়। বাবা পেঁপে পাঠিয়ে যেন বলতে চান, আপনি ধনবান, গুণবান, রাজধর্ম আপনার আয়ত্তে। আমার সম্পর্ক—মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে গাছপালার প্রাণীজগতের। কোন অংশে আমি খাটো নই।

বাবা এবার সহসা উঠে দাঁড়ালেন। সামনে এসে দেখলেন আমাকে। আমার ভেতরে কষ্ট আবার না টের পেয়ে যান। —আমার বিয়ে হলে বিলু তোমার কষ্ট হবে না! সকাল থেকে বিচ্ছেদের এই বেদনা আমাকে কাতর করে রেখেছে। সকাল থেকে আমার বনবাসের খবর পেয়ে মুখে উদ্বেগের ছায়া। সকাল থেকে পরী আমাকে 'ঠিক আছে' এই বলে চলে গেছে। দুশ্চিন্তা। পরী কিছু না আবার করে বসে।

আমিও বাবার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এখন উঠে পালাব ভাবছি, তখনই বাবা কী বুঝে বললেন—আসক্তি, মোহ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও। পরমবুদ্ধি লাভ কর।

অগাধ জলে পড়ে না গেলে বাবা আমার এ হেন সাধুভাষার প্রয়োগ করেন না। যে জন্য বাবার কাছ থেকে সারা দুপুর পালিয়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত তা আর রক্ষা করা গেল না। বোধহয় লক্ষ্মীর আত্মহত্যার পর বাবা আমার এমন থমথমে মুখ দেখেছিলেন। শুকনো মুখ দেখেছিলেন।

আমি যে কী করি!

কাল আমার যাবার কথা।

বাবা মা'র স্বপ্ন এক রকমের, পরীর স্বপ্ন এক রকমের।

রায়বাহাদুর আমাকে দুঃস্বপ্নের শরীক ভাবছেন।

এ-হেন অবস্থায় যখন তক্তপোষে আশ্রয় নিয়েছি, তখনই টের পেলাম বাবা উঠোনে নেমে এসেছেন। গাছপালার ছায়া পড়েছে উঠোনে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলছেন, মনে রেখ মানুষের শেকড় এক জায়গায় লেগে যায় না। সে যাযাবর। আজ এখানে আছে, কাল আর এক জায়গায়। বুঝতে পারি দেশবাড়ি ছেড়ে যেতে কষ্ট। ভাই বোন ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। পরে আর তা থাকবে না। ছুটি-ছাটায় বাড়ি আসবে। এই আসার প্রতীক্ষা কত মধুর, তখন টের পাবে। জীবনে প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি আছে। আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রতীক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকি। এটা না থাকলে জীবনে বেঁচে থাকার মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায় বিলু।

সহসা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, আপনি থামবেন কিনা? কিন্তু পারলাম না।

আসলে চিৎকার করলেই আমি আমার আবেগ সামলাতে পারব না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলব। আমি ধরা পড়ে যাব।

কারণ পরীর আভিজাত্য, পরীর লম্বা ঋজু অবয়ব, শরীরের সুঘ্রাণ, উলের মতো নরম উষ্ণ চুল এবং সারা শরীরের লাবণ্য আমাকে সেই কবে থেকে পাগল করে দিয়েছে। আজ এটা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। অথচ পরীর সঙ্গে আমার দুর্ব্যবহারের অন্ত ছিল না। পরীর বাড়ি আসা নিয়ে আমি কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। পরীকে কতভাবে না মানসিক পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। এখন বুঝতে পারছি আমার হীনমন্যতা থেকেই পরীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার। যত ভাবছি তত কষ্ট পাচ্ছি। কাল গিয়ে কী দেখব কে জানে।

রাতে আমার ভাল ঘুম হল না।

এ-পাশ ও-পাশ করলেই জানি পিলু বলবে, ও দাদা তোর কী হয়েছে রে।

পিলুকে নিয়ে আর এক জ্বালা। শুয়ে ঘুমের অভিনয় করলাম কিছুক্ষণ।

অন্য রাতে জেগে বসে থাকি।

এখন বুঝতে পারি আমার এই কবিতা লেখা পৃথিবীর একজন নারীকে শুধু অবাক করে দেবার জন্য।

আজ একবারও কোন একটা শব্দ কবিতার শরীরে আশ্রয় পাবার জন্য মাথায় আগুন জ্বালায়নি। মগজে কোন রক্তক্ষরণ হয়নি। কী যে হয়েছে।

চোখ জ্বালা করছে। দেখছি কেবল সামনে দাঁড়িয়ে আছে পরী। আর অনেক দূর দিয়ে কোনো নির্জন প্রান্তর ধরে হেঁটে যাচ্ছে লক্ষ্মী। দুই ভালবাসার পৃথিবীর মধ্যে পড়ে আমি হাঁসফাঁস করছি।

লক্ষ্মীর কথা ভাবতেই কেমন ভয়ের সঞ্চার হল। আমার শেষ দেখার দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠল। পায়ে আলতা, হাতে শাঁখা, কপালে বড় ধরনের সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে লাল দগদগে একটা রেখা। এ সব সে পেল কোথায়। রান্নাবাড়িতে পড়ে থাকত। থান পরত। কখনও কালো পাড়ের ধুতি। বিধবা সে। নিজেকে বিনাশ করার আগে নববধূর এই বেশটাই আমাকে কাতর করে রেখেছিল। এখন দেখছি লক্ষ্মী আবার আমার কাছে স্বপ্নে, সেই বেশেই দেখা দিচ্ছে। আসলে আর একটা আতঙ্ক থেকেই এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি। সারাটা রাত এভাবে কখনও লক্ষ্মী, কখনও পরী স্বপ্নে হাজির হতে থাকলে অসহায়বোধ করতে থাকলাম।

রাত থাকতেই বাবা এসে ডেকে দিলেন। শুভ কাজে যাচ্ছি। বাবা বললেন, তুমি মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বোস। আকাশ ফর্সা হলে রওনা হবে।

যাবার সময় বাবা ঠাকুরের ফুল বেলপাতা দিলেন সঙ্গে। যাতে কোনো কারণে ত্রুটি না থাকে, —বাবার সব দিকে নজর। ঈশ্বর না আবার তাঁর রুষ্ট হন।

আমি কিছু বলতেও পারি না।

কারণ বাবার ধারণা দৈবই সব। তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে শুধু দায়িত্ব পালন করে যাবে।

বাবার এই ঈশ্বর বিশ্বাসই মাঝে মাঝে এত বিরক্তিকর, যে কখনও চটে গিয়ে রাস্তায় ফুল বেলপাতা সব ফেলে দিই। পরীক্ষা দিতে যাবার সময়, ইস্কুলের চাকরিতে যোগদানের সময় এই সব অবলম্বন আমার পকেটে ভরে দেন। আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

সড়কের দু-ধারে বড় বড় সব গাছের ছায়া। সূর্য উঠে গেছে। পরীর দাদু সকাল আটটার আগে নিচে নামেন না। একবার ভাবলাম মুকুলের বাসায় চলে যাই। কিন্তু এত সকালে দেখলে সে অবাক হবে।

আমার মনে সব হিজিবিজি ভাবনা। মাথামুণ্ডু কিছুরই ঠিক থাকছে না। পঞ্চাননতলায় এসে সাইকেল রাখলাম গাছের ছায়ায়। তারপর বাবার চেনা দোকানে গিয়ে টুলে বসলাম। বাবার সে যজমান। গেলে আদর-যত্ন সে একটু বেশিই করে। অত সকালে দেখে সে অবাকই হল। উনুনে তার আঁচ দেওয়া হয়েছে। এদিকটায় এখন লোকালয় বাড়ছে। মানুষজন দেশ ছাড়া হয়ে যে-যেখানে পারছে বসে যাচ্ছে।

এতটা সময় কী করে কাটাই।

কতক্ষণে বেলা বাড়বে, সেই প্রতীক্ষায় ভিতরে ছটফট করছি। এবং এক সময় যখন শহরে ঢুকে গেলাম, —দেখলাম সবই ঠিকঠাক আছে। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে টের পেলাম না। পরী যে লক্ষ্মীর মতো ছেলেমানুষী করে বসতে পারে না, এটাও মনে হল এক সময়। সে আমার উপর বদলা নিতে পারে। সেটা কীভাবে!

এই ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই পরীদের সদর গেটে হাজির। দারোয়ান অন্যদিন আমাকে দেখলে উঠে দাঁড়ায়। সামনের লনে কাকাতুয়া পাখীটা দুবার পাখা ঝাপটাল। আমি যে হাজির পাখিটাও টের পেয়েছে। দারোয়ান বসেই বলল, ভিতরে গিয়ে বসুন। আমি দূর থেকেই লক্ষ্য রাখছি পরী দোতলার বারান্দায় আমার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা। কারণ পরী তো জানে আমি সকালে আসব। পরী শুধু বারান্দায় অপেক্ষা করে না, রাস্তায় দূর থেকে দেখলেই হাত নাড়ায়।

বারান্দায় পরী নেই।

বুকটা ধক করে উঠল।

দারোয়ান কেমন গম্ভীর মুখে আমাকে বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। আমি এলে এ-বাড়িতে সাড়া পড়ে যায়। আমি তো শুধু বিলু না। এই বাড়ির একমাত্র অবলম্বন বাবাঠাকুরের প্রিয়জন। আমার খাতিরই আলাদা।

কিন্তু আজ মনে হল কোথাও কোনো বড় রকমের অঘটন ঘটেছে। খাতির করা দূরে থাকুক আমি যে এত বড় বাড়িতে এসেছি সেটাই যে বেমানান।

এই প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ঢুকলেই ঠাকুর-চাকরের কোলাহল শোনা যায়। লোকজন রায়বাহাদুরের অনুগ্রহের অপেক্ষায় নিচে লোহার বেঞ্চিতে কখন তাঁর দর্শন পাবে সেই আশায় বসে থাকে। আজও তারা বসে আছে। জমিদারি গেলেও প্রভাব প্রতিপত্তির খামতি নেই। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, —প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র পরীদের ক্ষুণ্ণ হয়নি। পরীর বাবা কাকারা বড় পদে দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। রেলের বড়কর্তা পরীর পিতাঠাকুর। এত সব বৈভবের মধ্যে পরী বড় হতে হতে কেন যে ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় শিখে গেল। পরীর এটাই হয়েছে কাল। দাদু বোধহয় ভেবেছিলেন ছেলেমানুষ, বাড়িতে রাজনীতির আবহাওয়া, দলছুট হতেই পারে। অবুঝ।

পরীদের বাড়ি ঢুকলে আমার এ সবই মনে হয়।

বারান্দায় এখন দুটো জালালি কবুতর কার্নিসে উড়ে এসে বসেছে। বক বকম করছিল। আমাকে দেখেও কেউ বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করছে না।

ভিতরে ঢকতে যাব, একজন ষণ্ডামার্কা লোক বলল, কাকে চান?

পরীর দাদুর নাম বললাম।

বলল, বসুন। নামতে দেরি হবে।

আজ আমারও কেন যে এত দুর্বলতা বুঝি না। এই বাড়িতে আর যে-কবার এসেছি, নিজেকে এত অনুগ্রহভাজন মনে হয়নি। ছোট মনে হয়নি।

বললাম, মিমিকে ডেকে দিন।

লোকটি আমার অচেনা। নতুন আমদানি হতে পারে। মিমিকে ডেকে দেবার কথায় বেয়াদপির আভাস পেয়ে লোকটা ত্যারচা চোখে আমাকে দেখতে থাকল।

ধুস, এমন জড়তায় আমাকে পেয়ে বসল কেন! স্বাভাবিক থাকতে পারছি না। আমি তো হলঘরটায় ঢুকে যেতে পারি। কোনোদিন অনুমতির দরকার হয়নি। আজ দেখছি সব অন্য রকম। আসলে কৃপাপ্রার্থী বলেই হয়তো স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি আমার আজ কাজ করছে না। মনে মনে বেপরোয়া হয়ে উঠছি। আর তখনই মনে হল কেউ নামছে।

ভিতরে ঢুকে গেলাম।

পরীর দাদু আমাকে দেখেও দেখলেন না। আর এই লোকটাই কাল সকালে হাত ঝাঁকিয়ে বলেছিল,

দোহাই বিলু তোমার চাকরিটার কথা মিমি যেন টের না পায়। আজ সেই মানুষটা কেমন ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বারান্দায় গিয়ে বস। ডেকে পাঠাব।

মগজে মনে হল কেউ ঠুক করে একটা পেরেক গুঁজে দিল। এক অসহ্য পীড়ন কিংবা অপমানের জ্বালা দগদগ করে ফুটে উঠছে সারা মুখে।

আমিও পাগলের মতো বললাম, উপরে যাচ্ছি। পরীর সঙ্গে দরকার আছে।

—পরী? সে কে?

আমার হুঁশ ফিরে এল। মিমিকে আমি পরী বলে ডাকি। মিমি কলেজের প্রথম দিন থেকেই যে আমার কাছে পরী, সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।

হুঁশ ফিরে এলে বললাম, মিমির কাছে যাচ্ছি।

—ও তো এখন কোথায় বের হবে।

যাক পরী ভাল আছে। পরী শেষে লক্ষ্মীর মতো কিছু একটা না করে বসে। সেই আতঙ্কে রাতে ঘুম হয় নি। পরী বের হতেই পারে। সে পার্টি অফিসে যেতে পারে, কিংবা পার্টির হয়ে লড়ে যেতে পারে, কোনো নাটক থাকতে পারে পার্টির, তার রিহার্সেলে যেতে পারে—কিংবা প্রেসে খোঁজ নিতে যেতে পারে কভারের ব্লক হয়ে এসেছে কি না! পরী বসে থাকার মেয়ে নয়। কখন যে পড়ে আর এত ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করে আমরা ধরতেই পারতাম না।

পরী তার ঘরেও আমায় নিয়ে বসিয়েছে। ঘরটা সাদামাটা। একটা তক্তপোষ। আর একটা টেবিল। পরীর বেশবাসও সাধারণ। ওর পছন্দের মতো লতাপাতা আঁকা সাদা সিল্ক। খুব সাজগোজ করলে সে লাল রঙের ব্লাউজ, লাল পাড়ের শাড়ি পরে। ঘরে লেনিনের একটা বড় ফটো। আর কিছু নেই। এমন কি একটা বড় আয়নাও না। এই কৃচ্ছ্রতা বাড়ির আর দশজন পরীর ফ্যাসন ভেবে বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে। কাঠের চেয়ারে কোনো কভার পর্যন্ত নেই। একজন সাধারণ পার্টি কর্মির মতোই তার ঘরটা। আমার ভাল লাগত না। আসলে মনে হত পরীর এটাও এক ধরনের বিলাস।

পরীর দাদু কী দেখছিলেন আমার মুখে জানি না—তিনি বেশ শান্ত গলায় বললেন, পরেশ এসেছে।

পরেশচন্দ্র! সে কেন?

পরীর দাদু আবার বললেন, পরেশের সঙ্গে কোথায় যেন যাবে। তুমি বরং আর একদিন এসে দেখা কর।

আমার সারা শরীরে মনে হল কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আমার তো পরীর সঙ্গে দেখা করার কথা না। পরীর দাদুর সঙ্গে দেখা করার কথা। তিনিই তো অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনিই তো ছুটে আমাদের বাড়ি গেছেন। বাবাকে রেলের চাকরির লোভ দেখিয়ে এসেছেন। এক রাতের মধ্যে এত বড় গন্ডগোল হয়ে গেল! তিনি ভুলে গেলেন! আজ আমায় তিনি আসতে বলেছিলেন। সে কী করে হয়! পরী, পরেশচন্দ্র, তুমি আর একদিন এস—এ সবের মানে কী!

মনে হচ্ছিল লাথি মেরে সামনের সিঁড়ির রেলিং ভেঙে দি। কিংবা দেয়ালের সব বড় তৈলচিত্রে থুথু ছেটাই। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ থাকে। আমার বাবাকে এত বড় কুহকে ফেলে দেবার কী দরকার ছিল! সরল সাদাসিধে মানুষটা গেলেই বলবেন,—দিয়ে এলি। কবে আবার যেতে বললেন! বাবাকে আমি কী বলব! বাবার বিশ্বাস এত বড় মানুষেরা কখনও ঠকায় না।

মাথা নিচু করে বের হয়ে যাবার মুখেই মনে হল সিঁড়ি ধরে কারা নামছে। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। উঁচুতে তাকিয়ে দেখলাম পরী, পাশে পরেশচন্দ্র, ওর সাদা ভুটিয়া কুকুরের চেন হাতে। পরী লাফিয়ে নামছে। উর্বশীর চেয়েও আজ বেশি সেজেছে। এমন কী দূর থেকেও মনে হল পরী আজ চোখে কাজল দিয়েছে। ঠোঁটে লিপস্টিক। পরীর এ-সাজ আমি দেখিনি। পরী কতটা আগুন হয়ে জ্বলতে পারে আজ যেন আমাকে দেখাল। লক্ষ্মীর আত্মহত্যার মতো আক্রোশে পরী আজ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। পরী নামছে অথচ আমাকে যেন দেখতে পাচ্ছে না। দুজনেই কথায় কথায় হাসছে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে। নিচে নেমে হঠাৎ যেন পরী আমাকে আবিষ্কার করে ফেলল, আরে বিলু। কী ব্যাপার। দাদুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসে কাজটা কিন্তু করিয়ে নিও। রেলের চাকরি, সোজা কথা!

আমার কী হল জানি না। আমি নিজের মধ্যে ছিলাম না। ঠাস করে পরীর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে সবাই ছুটে আসছে। ওর দাদু চিৎকার করে বলছে, গেট-আউট স্কাউন্ড্রেল। গেট-আউট। এত বড় আস্পর্ধা! এই কে আছিস! দাঁড়িয়ে কী তামাশা দেখছিস! সবাই ছুটে আসছে আমাকে ধরার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে পরী আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল। —তোমরা ওর গায়ে হাত দেবে না। পরীর চোখ জ্বলছে।

আমার কাছে সবটাই নাটক মনে হচ্ছে। সবাই আমাকে মারুক, আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক চাইছিলাম। নিজেকে নির্যাতন করার মধ্যে অপমানিত হবার মধ্যে পরীর উপর আক্রোশ মেটাবার এটাই যেন শেষ উপায়!

পরী আমার হাত ধরে বলল, আমার ঘরে এস।

আমার স্নায়ুতে তরল সিসে ঢেলে দিচ্ছে পরী। জোর করে হাত ছাড়িয়ে বললাম, আর নাটক করতে হবে না। ছাড় বলছি। তারপর এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পাগলের মতো বের হয়ে আসার মুখে শুনতে পেলাম, এ যে তোমার কত বড় অধিকার, বিলু তুমি জান না। একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে দেখেছিলাম। পরী সারা মুখ আঁচলে ঢেকে দিয়েছে। পরী ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বাইরে বের হয়ে রাস্তায় নেমে মনে হল, ছিঃ ছিঃ, এটা আমি কী করলাম। পরীকে মেরেছি, পরীকে মারতে পারলাম?

হাতে জ্বালা বোধ করছি।

সাইকেলের হ্যান্ডেল পর্যন্ত তাপে যেন গলে যাবে।

নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি, বিলু তুমি অমানুষ।

প্রবল নিশ্বাস পড়ছে। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে পুলিশ প্যারেডের মাঠ পার হয়ে গেলাম।

চোখে কিছু যেন দেখতে পাচ্ছি না।

হয়তো কোনো অঘটন ঘটে যাবে।

সামনেই সেই ধোবিখালের মাঠ। শহরের নির্জনতা আরম্ভ। মানুষজন কোর্ট কাছারিতে যাচ্ছে। রিক্সা, গরুর গাড়ির ভিড়। আমি মাঠের মধ্যে সাইকেল ছুঁড়ে ফেলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। মনেই থাকল না আমার পিলুর মতো ভাই আছে। আমার অস্তিত্ব জুড়ে শুধু পরী। পরীকে আমি মেরেছি। ডান হাতটা কেমন অবশ ঠেকছে। পরীর সেই শঙ্খের মতো সাদা রঙের গালে পাঁচটা আঙ্গুলের ছাপ লাল হয়ে ভেসে আছে। বললাম, পরী, আমি সত্যি অমানুষ। জীবনেও আর তোমাকে মুখ দেখাতে পারব না।

ঘাসের মধ্যে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলাম, বসে থাকলাম। কী করব কোথায় যাব বুঝতে পারছি না। বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গেছি। এখানে বসে থাকাটাও নিরাপদ নয়। লালদীঘির ধার ধরে চেনা জানা কেউ আসতেই পারে। দেখে ফেলতে পারে। চুপচাপ এখানটায় বসে থাকলে তারা বিস্মিত হতে পারে। কিছুটা সাইকেল চালিয়ে গেলে চৈতালিদের বাড়ি। ওর দিদিরা আমাকে চেনে। লালদীঘির ধারে আমরা বিকালে অনেক দিন বেড়াই। পাশের বাড়িঘরের তরুণীরাও চেনে। নাম জানে না হয়ত, কিন্তু চেনে। যেমন আমরা শহরে সব সুন্দরী তরুণীদের চিনি, তারাও যে চেনে না সেটা অবিশ্বাস করি কী করে। দু-পক্ষই খবর রাখে আমরা কারা, তারা কারা।

এখানে বসে থাকাটা নিরাপদ ঠেকল না। উঠে পড়লাম। পরীকে আর জীবনেও মুখ দেখাতে পারব না। কে যেন ভিড়ের মধ্যে চিৎকার করে উঠেছিল, গুন্ডা বদমাসদের কে ঢুকতে দিল! পুলিশে দিন স্যার।

এখন সব মনে পড়ছে।

পুলিশে দিলেই ভাল হয়। আমি যেন তাই চাইছিলাম। পরী আমাকে নিয়ে তা হলে আর মজা করতে পারবে না। পরী ইচ্ছে করেই পরেশকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমাকে চূড়ান্ত অপমান করার জন্য পরী আগুনের মতো সেজেছে। পরী তার দাদুকে দিয়ে অপমান করিয়েছে, পরীর জেদ আমি জানি। আমি সত্যি বলছি এত অপমান সহ্য করতে পারিনি। পরীকে আমার সহসা বেশ্যা নারীর চেয়েও

অধম মনে হয়েছিল। —পরী বিশ্বাস কর ইচ্ছে করে মারিনি। আমি তোমার হাতের খেলার পুতুল হতে চাই না। আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করবে! আমি নিজেকে সামলাতে পারিনি।

তারপরই মনে হল, পরী চড় খেয়ে বলছে, এ তোমার কত বড় অধিকার বিলু তুমি জান না। আর সঙ্গে সঙ্গে পরীর জন্য ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকল। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমাকে আড়াল করে দাঁড়ালো, শাসালো কেউ ওর গায়ে হাত দেবে না—সব মনে পড়তেই অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি যেন এখানে থাকলে আরও ভেঙে পড়ব। যত দূরে এখন চলে যাওয়া যায়—সাইকেলে চেপে উন্মাদের মতো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইলাম। বড় বিপন্ন বোধ করছি।

কোথায় যাব, কার কাছে যাব। যেখানেই যাই না কেন আমি ধরা পড়ে যাব। মুকুলের কাছে গেলে আমি ভেঙ্গে পড়ব। মুকুল এত বেশি আমাকে টের পায় যে তার কাছে কিছুই গোপন করতে পারব না। মুকুল খোলা আকাশের মতো উদার। সে টের পাবে, পরীকে তবে যে আমি সহ্য করতে পারি না, এই কারণ। তুমি বিলু মরেছ। এ-মরণ ঠেকাবার যে কেউ নেই। মরণ তোমার হাতে। তুমিই গলায় নিজের অজ্ঞাতে ফাঁসের দড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছ। শান্ত হয়ে বোস। তারপরই ডাকবে বৌদি, বিলু এয়েচে, দু-কাপ চা। বিলু মরেছে, জান? আর বৌদি সব শুনে বলবে, তুমি পরীকে মেরেছ? ছিঃ ছিঃ, পরী এত ভাবে তোমার জন্য। পরী কত দুঃখ করেছে, বিলুটা বৌদি কলেজ ছেড়ে দিল। প্রাইমারী ইস্কুলে মাষ্টারি নিল! আচ্ছা বল বৌদি, ওর মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারলে, সে পুড়বে আর পুড়বে। যত পুড়বে তত সে খাঁটি মানুষ হবে। বড় কবি হতে গেলে যে নিজেকে পোড়াতে হয় বৌদি। তারপরই মনে হল কী আজে বাজে ভাবাবেগে ভুগছি।

আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছি। যে কোন দিকে এখন আমার চলে যাওয়া দরকার। মানুষের এই বিপন্ন বিস্ময় বড় আচমকা সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়।

এখন শুধু এক অন্তর্গত খেলা।

আমার এই অন্তর্গত খেলা কোন নদীর পাড়ে নিয়ে যাবে জানি না।

ভাঁকুড়ির রাস্তায় পড়ে আরও গভীর নির্জনতা টের পেলাম। কত বেলা হয়ে গেছে। চারপাশে ধানের মাঠ। সরু পথ ধরে কিছুটা গেলে রেশম গুটির গভীর জঙ্গল। নিজেকে আড়াল করার এর চেয়ে নিভৃত জায়গা যেন পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

মানুষের সাড়া শব্দ নেই। শুধু কীটপতঙ্গের শব্দ পাচ্ছি। কিছু গাংশালিখ উড়ে এল। ডালে পাখি। কিচিরমিচির করছে। ওরা দেখছে গাছের নিচে বসে আছে এক প্রাণ, নাম যার বিলু, যে নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে,—যেন এই পালানো, কোনো গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসে। গভীরতায় তার নকল রহস্য ছুঁয়ে যায়। ছুঁয়ে যায় তার তীব্র রক্তক্ষরণ। পরিণাম গলায় কোনো রজ্জুর ফাঁস,—এই পর্যন্ত ভেবে মনে হল, না, ঠিক হয়নি। বুঝি এগুলো সব এলোমেলো ভাবনা—'শুয়ে থাকা আকাশ/আপন মনে উদার হয়ে/উড়ে যায় যাক পাখিরা/ মেঘেরা উড়ে আসবে/ কোনো ফুলের উপত্যকা পার হয়ে/ঢেকে যাক সুন্দর শ্যামল পৃথিবী/নিচে আছে সবুজ ধানের মাঠ/গাঙ ফড়িং লাফায়, এক গিরিগিটি হাঁটে/বড় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, ক্ষুধা তার একমাত্র বৃত্তি/আহার তার একমাত্র অহঙ্কার/সে জানে না মেঘেরা উড়ে আসে/যায় যাক পাখিরা উড়ে/

আমি বিড় বিড় করে বকছিলাম।

মনে হল, 'নিরন্তর শুয়ে থাকি সবুজ মাঠ হয়ে/আলে পায়ের ছাপ, ছোপানো আলতার দাগ/ঘুমে দূরে সরে যায় সে/তার আঁচল ওড়ে হাওয়ায়/স্তনে ধানের সবুজ শিষ উষ্ণতা ছড়ায়/ সে হেঁটে যায়, আলে পায়ের ছাপ/ছোপানো আলতার দাগ ঠোঁটে।

বললাম, পরী আমি চলে যাব বহুদূরে।

আমি উবু হয়ে শুয়ে থাকলাম। মাথার মধ্যে শব্দগুলি খেলা করছে।

পাখিরা আমার চারপাশে খেলা করে যাচ্ছে।

পাখিরা আমাকে ভয় পাচ্ছে না। কারণ তারা জানে পাখির সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই। আমার সব শত্রুতা পরীর সঙ্গে।

একটা খরগোস কোথা থেকে লাফিয়ে আমার সামনে বসল। আমি কত নিথর হয়ে আছি, টের পেলাম। নড়লেই ছুটে পালাবে। নড়ছি না। কিন্তু চোখ দেখে কী টের পায়, আমার মধ্যে কোনো আত্মহননের প্রবণতা জেগে উঠছে। এই প্রথম নিজেকে আমি ভয় পেতে শুরু করলাম।

বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। খরগোসটা চলে যাবার সময় যেন শুধু বলে গেল—বেঁচে থাক। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই।

আমি কখনও বসে আছি, কখনও জঙ্গলে হেঁটে বেড়াচ্ছি। পলাতক আসামী। কে জানে সবাই জেনেও ফেলেছে কিনা। বাড়িতে বাবা অস্থির হয়ে পড়বেন জানি। বাবা মা পিলু সবাই। পিলু সাইকেলে যদি খুঁজতে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কত বড় আহাম্মক আমি টের পেলাম। পিলু গেলেই শুনতে পাবে— আমি ওখানে কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়ে পালিয়েছি। পিলুকে দারোয়ান, পরীর দাদু, ঠাকুর, চাকর, সবাই চেনে।

আকাশের রং পাল্টাচ্ছে। গভীর অন্ধকার হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সাইকেলটা নিয়ে হাঁটছি। সাপ খোপের ভয় আছে। এখন বড় রাস্তায় উঠে যাওয়া দরকার। সারাক্ষণ জঙ্গলটার মধ্যে ঘুরে টের পেলাম প্রকৃতির এক কথা—বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। মাথার মধ্যে রক্তক্ষরণ থেমে গেছে। অন্ধকারে বাড়ি ফিরলে চোখ মুখ দেখে কেউ টের পাবে না, এমন অশোভন আচরণের পর নিজের কাছেই ছোট হয়ে গেছি। পিলু খবর নিয়ে ফিরতে পারে,—দাদা পরীদিকে মেরেছে।

বাড়ি ঢুকতে সংকোচ হচ্ছিল।

দেখছি প্রতিবেশীরা বাড়িতে এসে জড় হয়েছে। বাড়িতে না ফেরায় বাবা মা কতটা উদ্বেগের মধ্যে ছিল, টের পেলাম। কেবল পিলু কিছু বলল না।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদছে। কোথায় ছিলি? কী হয়েছে তোর?

বললাম, কী হবে আবার।

কিছু না হলে তুই ফিরলি না কেন? সারাদিন কোথায় ছিলি।

বাবা বললেন, সব অদৃষ্ট।

এই প্রথম বাবা খুঁটিয়ে কিছু জানতে চাইলেন না। শুধু বললেন, তোমাকে তো বলেছি ধনবৌ, ঠিক ফিরে আসবে। বয়সটারই দোষ।

এমন কি বাবা রায়বাহাদুর সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন করলেন না। পরীদের বাড়ি গেছিলাম কিনা তাও জানতে চাইলেন না। পিলু এসে সাইকেলটা ঘরে তুলে রাখল। মায়া এক বালতি-জল রাখল হাত মুখ ধোয়ার জন্য।

খেতে বসে ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম।

মা বলল, কী হল, কিছুই মুখে দিলি না।

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

আমার মধ্যে পলাতক মানুষের বসবাস আছে, বাবা জানেন। এর আগেও সেটা টের পেয়েছেন বলে, আজ বাবা ঠাকুরঘরে ঢুকে যাবার সময় বললেন, যাও শুয়ে পড়গে। সবই ভবিতব্য।

আমার বাবা জীবনের সব সংকটকে সহজেই ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

ছেড়ে দিতে পারেন বলেই, আমি না ফিরলেও বাবা থানা-পুলিশ করতেন না। থানা-পুলিশের নামে বাবার আতঙ্ক আছে জানি। আমার পরিচিত সবার বাড়ি যেতেন, যেমন আমি জানি মুকুলের বাসায় খোঁজখবর নিতেন,—আমি কোনো চিঠি দিয়েছি কিনা। সাইকেলটার খোঁজ করতেন, কার কাছে রেখে গেলাম। আমার মধ্যে নাকি একজন বিবাগী মানুষের বাস আছে। সেই যে একবার গ্যারেজে কাজ করার সময় পালিয়েছিলাম, তখনও বাবা থানা-পুলিশ করেন নি। —গেছে আবার চলে আসবে। চঞ্চল মন।

বাবা মা-কে প্রবোধ দিতেন, অদৃষ্ট, বুঝলে ধনবৌ। তা না হলে দেশ ভাগ হবে কেন, আমরা ছিন্নমূল হব কেন! দু'বেলা খেতে দিতে পারি না, পড়াতে পারি না, ছেলের কী দোষ। বাবার আর একটা আপ্তবাক্য, আমি তো কোনো পাপ করিনি আমার কোনো সর্বনাশ হতে পারে না।

সর্বনাশ হয়নি।

ছোড়দি একটা চিঠি লিখেছিল, বিলু এখানে আছে। কতদিন পর আবার ছোড়দির কথা মনে হল। আমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে। ছোড়দি লিখেছিল, বিলু রহমানের কাছে থাকে।

পিলু আমার পাশে শুয়ে উসখুস করছে। আমি মটকা মেরে আছি। এ-পাশ ও-পাশ করলে পিলু দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে। বাড়ি ফেরাতক পিলু একটা কথাও বলেনি। শুয়ে পড়লে সে দরজা বন্ধ করেছে। হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে দিয়ে পাশে এসে শুয়েছে। ভাদ্র মাসের গরম। আমার কষ্ট হয় ভেবে সে হাত-পাখায় হাওয়া করছে। এমনভাবে করছে যেন গরমটা তারই বেশি। গরমে ঘুমোতে পারছে না। বাঁশের বেড়ার ঝাঁপ তোলা। বাইরে থেকে এক-আধটু যা হাওয়া ঢুকছে, আমার গায়ে লাগছে। সে বোধহয় চায়, আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। সে জানে ঘুম থেকে উঠলে, মনের অনেকটা ক্লেদ কেটে যায়। সেভেনে পড়লে কী হবে, দাদাকে সে সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারে। কথা বলছে না। আমারও কিছু ভাল লাগছে না। যতই ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি না কেন, ওর বুঝতে কষ্ট হয় না, অনিদ্রার শিকার আমি। আমি ভালো নেই।

সে যখন বুঝল, তার দাদাটির সহজে ঘুম আসবে না, তখনই ডাকল, দাদারে!

পাশ ফিরে শুলাম।

সে আবার ডাকল, দাদারে।

—বল।

—তুই পরীদিকে মারতে পারলি!

—কে বলল তোকে, পরীকে আমি মেরেছি! কে বলল!

—তুই মেরেছিস দাদা।

আমার কেমন ভয় ধরে গেল। বাবা জানতে পারলে আমায় অমানুষ ভাববে। বাবা এখ নারীজাতিকে শক্তিরূপেন সংস্থিতা ভাবেন। মেয়েছেলের গায়ে হাত! এ যে গো-বধের সামিল। কি বাবা যে আমাকে কোনো প্রশ্নই করেননি। পরীকে মেরেছি জানলে, বাবা স্থির থাকতে পারতেন না।— তুমি আমার কুপুত্র। বংশের কুলাঙ্গার। তোমার মুখ দর্শন করলে পাপ। নারী হল'গে দেবী। পৃথিবীর বীজ বপন করার ভার তোমার, বহন করার ভার তার। পৃথিবীর সৃষ্টি স্থিতি লয় তার করতলে। তুমি পরীর গায়ে হাত তুলতে পারলে। তোমার সম্ভ্রমে বাধল না।

আমি কিছুই পিলুকে বলছি না। মনে হচ্ছে, কথাটা পিলুর কাছে স্বীকার করতেও কষ্ট। আমি তো সত্যি পরীকে মারিনি। অপমানের জ্বালায় মাথা ঠিক ছিল না, বলি কী করে! কেবল বলতে চাইছিলাম, আমি সত্যি মারিনি পিলু। সত্যি বলছি।

—জানিস দাদা, আমাকে না হরি সিং বেঁধে রাখবে বলে ধরে নিয়ে গেছিল।

—তোকে? তুই গেছিলি কেন।

—বাবা যে পাঠাল। এত বেলা হয়েছে, তুই ফিরছিস না, আমাদের চিন্তা হয় না!

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। আবার পাশ ফিরে শুলাম। যেন বাকিটা শুনলে আমার আবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমার জের পিলুর উপর দিয়ে গেছে তবে! আমার মাথায় আবার টের পেলাম, কে পেরেক পুঁতে দিচ্ছে।

—ভাগ্যিস পরীদি ছিল। কী চেঁচামেচি জানিস,—এসেছে। ওটা তো পালিয়েছে! একে ধরে রাখুন। আমাকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। জানিস, আমার না কী ভয় ধরে গেছিল! কী হয়েছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোকে ওরা কত খাতির করে। একটা লোক বলছে, এত বড় সাহস বাড়িতে ঢুকে দিদিমণির গায়ে হাত তোলে।

—আমি তো জানি নারে দাদা, কেবল চারপাশে তাকাচ্ছি। বলছি, আমার কী দোষ! আমার দাদা মারবে কেন?

—ওরা কেমন পাগলের মতো আমাকে টেনে-হিঁচড়ে নিচ্ছিল। আমি আর না পেরে চিৎকার করছিলাম, পরীদি, আমাকে মেরে ফেলল।

আমি শক্ত হয়ে আছি। শুনে যাচ্ছি।

—আর দেখি পরীদি নেমে আসছে। —তুই! এই তোমরা ওকে কী করছ! তোর দাদা তো কখন চলে গেছে! আয়, উপরে আয়। ও বাড়ি যায়নি?

পরীদি তার ঘরে নিয়ে গেল, দেখলাম, বাড়ির সবাই কেমন গুম মেরে গেছে। কেউ টুঁ শব্দ আর করছে না।

বললাম, পরীদি, দাদা তোমাকে মেরেছে?

পরীদি বলল, তোকে কে বলল!

—সবাই।

—ধুস, তোর দাদা মারতে যাবে কেন। অত সাহস আছে ওর! তোর দাদাটা এত ভীতু জানিস জানতাম না! আর জানিস দাদা, পরীদির এক কথা, তোর দাদা বাড়ি ফেরেনি?

—না পরীদি।

—কোথায় গেল তবে! মুকুলের ওখানে খোঁজ নিয়েছিস?

—যাইনি।

—যা একবার। কোথায় গেল খুঁজে দেখ।

—জানিস দাদা, পরীদির মুখটা না কী কালো হয়ে গেছে বলতে বলতে। মুখে একটা দিক আঁচলে ঢেকে কেবল কথা বলছিল। বলল, বোস। তারপর ফোন করল কাকে। বলল, সুধীনদা আছে। সুধীনদাকে কী বলল। ঘরে ঢোকার সময় দেখলাম, পরীদির গাল ফুলে আছে। পরীদি কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে ঢুকল।

—পরীদি বলে ডাকতেই জানিস দাদা, আমার দিকে তাকাল। আমি পরীদির মুখ দেখছি। পরীদি না তাড়াতাড়ি আবার আঁচল দিয়ে গাল ঢেকে ফেলল। তুই পরীদিকে মারতে পারলি দাদা!

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। হ্যাঁ মেরেছি, বেশ করেছি। থামবি কিনা বল। বাড়িতে এসে সাতকাহন করে বাবা মাকে বলেছিস বুঝতে পারছি।

—বলব কেন! পরীদি বলতে বারণ করে দিয়েছে। পরীদি আমাকে মাথায় হাত দিয়ে বলল, মাসিমা-মেসোমশাইকে কিন্তু বলতে যাস না! কীরে, বলবি না তো! আমার গা ছুঁয়ে তিন সত্যি কর। পরীদির গা ছুঁয়ে আমি তিন সত্যি করে এসেছি। কাউকে বললে আমার পাপ হবে না!

পিলু এত সরল সহজ, বাবা আমার এক ধর্মপ্রাণ মানুষ, মায়া, ছোট ভাইটা, মা সবাই পরীর ব্যবহারে এত মুগ্ধ, আর আমি এমন অমানুষ! যত শুনছি, তত চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে উঠছে।

—পরীদি ভিতরে ঢুকে পাথরের থালা গ্লাসে খেতে দিল। বলল, রোদে মুখ পুড়ে গেছে তোর দেখছি। খা। খিদে পেয়েছে। আর তারপরই নিচে নেমে সবাইকে কী হম্বিতম্বি। —তোমাদের কাঁধে ঢাক নিতে কে বলেছে! যে আসছে, তাকেই যা-তা বলছ! দাদুর না হয় বয়স হয়েছে। বয়স হলে মাথা ঠিক থাকে না। পরীদিকে না সবাই বাঘের মতো ভয় পায় জানিস। পরীদির দাদুকে দেখলাম না। উনি নাকি ঠাকুরদালানে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন।

হত্যে দিয়েছেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বললাম, কে বলল তোকে?

—কে বলবে, পরীদির পিসি এসে উঁকি দিল। বলল, তুই যা একবার। দেখ তুলতে পারিস কি না!

পরীদের পরিবারে আমার হঠকারিতা কত বড় বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে টের পেলাম। নিজের উপর আমার এত ক্ষোভ জন্মাল যে শুয়ে থাকতে পারলাম না। যেন শুয়ে থাকলে আমি হাঁসফাস করব। নিশ্বাস নিতে পারব না। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

আর তখনই পিলু বলল, জানিস দাদা, পরীদি বিকেলেই এসে হাজির। সঙ্গে মুকুলদা, সুধীনদারা সবাই। পরীদি বাবাকে বলল, বিলু ফেরেনি মেসোমশাই? বাবা গুম মেরে বসে ছিলেন। বাবা পরীদিকে দেখে কী বুঝল, জানি না, শুধু বলল, ও তো মা ওরকমই। চাপা স্বভাবের ছেলে। কী যে হল বুঝি না। তবে ও ফিরে আসবে। আমার মনে হয় রেলের চাকরিটা ওর পছন্দ নয়। তা তুই যদি যেতে না চাস, আমরা জোর করব কেন! তুমিই বল মা, বুঝি তোর বাড়িঘর ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। কিন্তু

মানুষের ঠিকানা তো এক থাকে না। বদলায়। ও সেটাই বুঝতে চায় না। তুমি ভেবো না। বাড়িঘর ছেড়ে ও কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না। সেই যে একবার রাগ করে বর্ধমান চলে গেল, থাকতে পারল? পারল না। কালীবাড়ি এত কাছে, সেখানেও মন টিকল না। চলে এল। গেছে রাগ করে, আবার রাগ পড়লেই ফিরে আসবে।

—জানিস দাদা, পরীদি গেল না। বলল, দেখি একটু। আমি সকালেই চলে যাব পরীদিকে খবর দিতে।

আমার অবর্তমানে বাড়িতে এত ঘটনা ঘটে গেছে! পরী আমার ফেরার জন্য ছটফট করছে। বলতে পারলাম না, না যাবি না। পরী আমাদের কে? আমি মশারির বাইরে নেমে হ্যারিকেন উসকে দিলাম। জল খেলাম। দরজা খুলে বাইরের খোলা হাওয়ায় গাছের নিচে কিছুক্ষণ বসে থাকব ভাবলাম। কিন্তু পিলু দেখছি সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছে। —কোথায় যাচ্ছিস দাদা। দাদারে!

আমাদের দু'জনের স্বভাব দু'রকমের। পিলু বাবার স্বভাব পেয়েছে। সংসারের সব মানুষই তার আত্মীয়। বাবার স্বভাবও তাই। মা আমার সবাইকে বিশ্বাস করে না। মা'র এক কথা, বল বল বাহুবল! জল জল রিদ্রের (হৃদয়ের) জল। কেউ কারো না। আমি বোধ হয় মা'র স্বভাব পেয়েছি। মা আমার সহসা ক্ষেপে যায়,—অভাবের সংসারে এক এক সময় মা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। সারাদিন বাবার পেছনে টিক টিক করত। বাবার সেখানেও এক আপ্তবাক্য,—আরম্ভ হয়ে গেল চণ্ডীপাঠ। অভাব কোন মানুষের সংসারে না আছে। অভাব ভাবলেই অভাব। তেনার মাপ মতো সব হচ্ছে। তুমি মাপামাপি করতে বসলে মানছে কে!

আমার আর দরজা খুলে বের হওয়া হল না। পিলু ত্রাসের মধ্যে আছে। আমি একা চুপচাপ কোথাও বসে থাকলে সে ভয় পায়। দাদাটার মাথায় কীসের পোকা ঢুকে গেছে। বাবা মা'র দুঃখ বোঝে না। সবাই যে তার দাদাটাকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে আছে, সেটা ভেবে দেখে না। বের হলে, ঠিক চিৎকার করে উঠবে, বাবা বাবা, দেখ দাদা এত রাতে কোথায় চলে যাচ্ছে। আর একটা নাটক। অগত্যা শুয়ে পড়তে হল। পিলু বলল, কাল জানিস দাদা, আমাদের আর একটা ঘর উঠবে।

বললাম, কার জন্য।

—নবমী বুড়ির জন্য।

এটা বাড়াবাড়ি মনে হয়। নবমী বুড়ি তার জরা নিয়ে আমাদের বাড়িটায় এসে উঠতে চায়। ওর ঘরে যখ নাকি ঢুকতে চায়। যখের ভয়ে কাবু। আমার হাসি পেল। আসলে বুড়ির যাবার সময় হয়ে গেছে। একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। দাদাঠাকুরকে দিয়ে বাবার কাছে খবর পাঠিয়েছে। বাবাও আজ সকালে গেছিলেন। বাবার এক কথা, বন বাদাড়ে মরে পড়ে থাকবে। শেয়ালে শকুনে খাবে—ঠিক না। নিদানকালে মানুষই মানুষের ভরসা। ছ' ছ'টা পেট চললে, আরও একটা চলে যাবে।

পিলু কথা শুরু করলে থামতে চায় না। বলল, জানিস দাদা, নবমীর শেষ ইচ্ছে, মরার সময় আমি যেন ওর মুখে গঙ্গাজল দিই।

মানুষের তা হলে শেষ পর্যন্ত ঐ একটা ইচ্ছেই টিকে থাকে। আর সব ইচ্ছে উবে যায়। এ-সব ভাবতে ভাবতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি।

সকালে ঘুম ভাঙলে টের পেলাম, বেলা হয়ে গেছে। আমাকে কেউ ডাকেনি। গায়ে কেউ চাদর জড়িয়ে দিয়েছে। ভোর-রাতের দিকে সামান্য ঠান্ডা পড়ে। ঋতু বদলের সময়। চট করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, পিলু সব বোঝে। পিলুর একটাই অভিযোগ তার দাদাটি সম্পর্কে, দাদা বড় তার স্বার্থপর। কেবল নিজের কথা ছাড়া ভাবে না।

আমি নিজেও এটা বুঝি। তা না হলে কাল আমার এত মাথা গরম হবার কথা নয়। পরীর দাদু বলতেই পারেন, বসগে, পরে ডেকে পাঠাব। একজন প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক, একজন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে এর বেশি কী আশা করতে পারে! পরী, পরেশচন্দ্রের সঙ্গে কোথাও বের হতেই পারে। কথাবার্তা চলছে, পরী রাজি হচ্ছে না, এক সঙ্গে দুজনে যদি কোথাও বের হয়—পরীদের আভিজাত্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। পরী তো আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অথচ কাল কেন যে সহসা

রায়বাহাদুরের ব্যবহারে এত অপমান বোধ করলাম, পরীর উল্লাস দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়লাম, তারপর বিশ্রি কান্ড বাধিয়ে সারাদিন নিখোঁজ হয়ে থাকলাম,—বাড়ি ঘরের কথা ভাবলাম না,—এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কী থাকতে পারে। সকালে সবাইকে মুখ দেখাতেই এখন লজ্জা করছে। দিনের আলোয় শ্রীমানকে এবারে তোমরা সবাই দেখ,—বাবা হয়ত মনে মনে তাই ভাববেন। সবার সামনে দাঁড়াবার মতো আমার সাহসই যেন হারিয়ে গেছে। সংকোচে কেমন গুটিয়ে গেছি।

অথচ শুয়ে থেকেই টের পাচ্ছিলাম, মায়া ঠাকুরঘর থেকে পূজার থালা বাসন বের করে নিয়ে যাচ্ছে। পিলু, গরু বাছুর মাঠে দিয়ে আসছে। বাবার গলা পাচ্ছি। বোধ হয় ঝিঙে, কুমড়োর ফুল, ডগা, বেগুন সবজির জমি থেকে তুলে আনতে গেছেন। মা বাসি বাসনকোসন পুকুরে ধুতে গেছে। রোদ উঠে যাওয়ার এক আশ্চর্য স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে সারা বাড়িটায়। নিখোঁজ পুত্রটি ফিরে এসেছে। আর কোনো দুঃখ নেই সংসারে।

তখনই পিলুর গলা পেলাম, দাদা শিগগির ওঠ। মুকুলদারা আসছে।

এই রে! ওরা সবাই খবর নিতে আসছে, বিলু ফিরল কি না। সঙ্গে পরী নেই তো!

ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। জামা গায়ে দিলাম। রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বেল বেজে উঠল। বাবা তার আগেই ওদের কাছে হাজির। এস, ভিতরে এস। ফিরেছে।

—কোথায় গেছিল?

আমি ঘরের ভিতর থেকেই শুনতে পাচ্ছি। জানালায় চুপি দিয়ে দেখছি, মকুল নিখিল নিরঞ্জন সুধীনবাবু এসেছে। পরী নেই। পরী না থাকায় অনেকটা অস্বস্তি কেটে গেল। পরীদের বাড়িতে বিলু বিশ্রী কান্ড বাধিয়ে উধাও হয়েছিল, ওরা নিশ্চয়ই জানে না। পিলুর কথা থেকেই বুঝেছি পরীদের আভিজাত্যই আমাকে এ-যাত্রা রক্ষা করেছে। ওরা পারিবারিক স্ক্যান্ডাল গোপন রাখতে হয় কী করে জানে।

আমার ঘরেই এসে ওরা বসবে। আমার এই তক্তপোষ ওদের বসার জায়গা। বর্ষায় চারপাশে ঝোপ জঙ্গল গজিয়ে উঠছে। এখন আর গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে বসা যায় না। আমার এই ঘরের চেয়ে গাছের ছায়ায় মাদুরে বসে গল্প করতে বেশি ভালবাসে মুকুল। মুকুলের এক কথা, গ্রীষ্মের দুপুরে এমন আরামদায়ক ছায়া নাকি পৃথিবীর আর কোথাও গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

—বিলু কোথায়! বিলু!

—ঘরে আছে। যাও!

বাবা কি টের পান, তাঁর পুত্রটি এখন নিজেই বুঝতে পেরেছে, কোনো বড় গর্হিত কাজ করেছে। না হলে বাবা আজ ডাকলেন না কেন? এই বিলু ওঠ! কত বেলা হয়েছে। কত ঘুমাবি। সূর্যোদয়ের আগে বিছানা না ছাড়লে আয়ুক্ষয় হয়। বাবার এ-ধরনের অজস্র আপ্তবাক্য আছে, যা এখন আমরা শুনতে অভ্যস্ত।

ওরা রে রে করে ভিতরে ঢুকে বলল, কী ব্যাপার। কোথায় গেছিলে না বলে না কয়ে। পরী সকালে এসে হাজির। বিলুটার তোমরা খবর নেবে না? কোথায় গেল!

পরীই তাহলে এদের তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে।

সুধীনবাবু বলল, রাতে ফোন করে জানাল সুধীনদা কাল সকালে একবার যাও। বিলুটার যা স্বভাব, আমার ভয় করে।

পিলু এখন হাজির। সে বলল, দাদা সাইলেকটা নিয়ে যাচ্ছি। এক্ষুনি চলে আসব।

—কোথায় যাবি?

—এই আসব। বেশিক্ষণ লাগবে না। তারপর সে আর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল।

আমি কারো সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারছিলাম না। ওরাই বেশী কথা বলছিল। আমাদের কবিতার রোগ আছে। মুকুল বলল, কোথায় গেছিলে কবিতার খোঁজে। জায়গাটা কেমন।

অবশ্য এটা আমাদের হয়। জীবনের সব রোমান্টিক দিকগুলি আমাদের ভারি কাতর করে রাখে।

হোঁতার সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না রাতে বিলের জল দেখতে দেখতে প্রকৃতির কত রকমের রহস্য আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে। কোনো ধুলিওড়ির মাঠে ঝড়ে পড়ে গেলেও অবিরল জলের ধারার মতো রক্তে এক রণতরী ঢুকে যায়। হৃদয় নামক বস্তুটিতে সে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘন্টার পর ঘন্টা, এমন কী সারা রাত জিয়াগঞ্জের শীতের গঙ্গায় ধূ ধূ বালিয়াড়িতে হেঁটে যাবার সময় টের পেয়েছি, কেউ আমাদের অপেক্ষায় থাকে। বালির চড়ায় আমি মুকুল নিখিল শুয়ে থেকেছি জ্যোৎস্নায়। নদীর পাড়ে শ্মশানের সেই মানুষের দাহকার্য দেখতে দেখতে আকাশ নক্ষত্র এবং ঝিঁঝি পোকার ডাকে টের পেয়েছি,—কিছুই শেষ হয়ে যায় না,—'এই বনজঙ্গল, কিংবা শেষ অবশেষে / যেখানে যে প্রাণ বিচরণ করে / শুধু বিচরণ করে আর ধেয়ে যায় / কারণ অমোঘ নিয়তি তার পাখা মেলে থাকে/ তবু থাকে সে অনন্ত অক্লেশে। / ভ্রূণে, গভীর গোপন কোষে/ জীবনের বার্তা বার বার বহন করে/ কিছুই শেষ হয়ে যায় না/ সে থাকে অন্ধকারে নিমজ্জমান/ উষ্ণতায় কোনো শীতের সকালে / সে জেগে ওঠে/ কারণ, পিন্ডদানের আগে কিংবা পরে/ গোপন কোষে নিয়ত জাহাজের সাইরেন বেজে যায়।

মুকুল বলল, কিছু পেলে? এত চুপচাপ। কী ভাবছ?

বললাম, পেয়েছি।

—একলা গেলে কেন! কতদূর গেলে? আমরা তোমার এ-যাত্রার সঙ্গী হতে পারলাম না।

—অনেক দূর। অতদূর তোমাদের যেতে সাহস হত না! তাই কাউকে নিলাম না।

মুকুল বিখ্যাত এক কবির দুটো কবিতার বই নিয়ে এসেছে। সে-ই হাল আমলের কবিতার সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করে। অনেক প্রিয় কবির কবিতা আমাদের মুখস্থ এখন। আমরা মাঝে মাঝেই প্রিয় কবিতার দু-এক লাইন কথায় কথায় উচ্চারণ করি। আর একটাই আকাঙ্ক্ষা আমরা কবে এমন কবিতা লিখতে পারব। ছন্দের প্রতি অনুরাগ আমার কম। ছন্দের ব্যাকরণও ভাল বুঝি না। কিন্তু গদ্য কবিতার সুষমা সহজেই ধরে ফেলতে পারি। যেন নাড়ী ধরে টান দেয়।

সুধীনবাবুর স্মৃতিশক্তি প্রবল। মুকুলেরও। ওরা সহজেই অনেক কবিতা মুখস্থ বলে যেতে পারে। আমি পারি না। দু-একটা পংক্তি মনে থাকে, সবটা মনে থাকে না।

আমরা ক্রমেই এক সময় দেখলাম, কবিতার আলোচনাতেই মগ্ন হয়ে গেছি।

সুধীনবাবু বললেন, কলকাতায় যাচ্ছি। সবার কবিতা নিয়ে যাব। তোমার দু-একটা কবিতা দাও তো ভাল হয়।

—কী যে বলেন! আমার দেবার মতো কবিতাই নেই। আসলে মুখচোরা মানুষের যা হয়। আমার কবিতা পরীর দয়ায় অপরূপায় ছাপা চলে। কলকাতার কাগজে কবিতা। ভাবা যায় না। চরম আহাম্মক মনে হয় নিজেকে। কিংবা আস্পর্ধা। বললাম, না, আমার সত্যি কিছু নেই।

মুকুল কেমন ক্ষেপে গেল।—তুমি না বিলু, শামুকের মতো স্বভাব তোমার। কবিতার প্রকাশ না হলে লিখে কী লাভ।

—লাভ অলাভ বুঝি না। আমার লিখতে ইচ্ছে করে না। তোমরা পীড়াপীড়ি কর বলে লিখি।

মুকুলও ছাড়বার পাত্র নয়। টেবিল থেকে খাতাটি খুঁজে বের করল। পর পর কটা পড়ে, —নিজেই দুটো কবিতা টুকে নিল। বলল, ঠিক আছে, এবারে খাতাটা যত্ন করে রেখে দাও।

এ-সময় মা থালায় করে মোয়া নাড়, তিলের তক্তি, দুধ কলা মুড়ি রেখে গেল। গরুর দুধ। পেঁপে কেটে একটা থালায় রেখে গেল। কৃতী সন্তানের বন্ধুরা এলে, বাবা তাঁর যথাসাধ্য সৎকার করতে ত্রুটি রাখেন না।

বাবা তাঁর কৃতী সন্তানের বন্ধুদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি রাখতে রাজি না। এতে তাঁর বাড়িঘরের মর্যাদা বাড়ে। মুকুল তো মাসিমা, মেসোমশাইর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এক একটা নাড় মুখে দেবে, চেঁচিয়ে বলবে, দারুণ মাসিমা। বাবা শুনতে পান, মাও। আমি বুঝি এটা বাবার পক্ষে বড়ই সুখবর। ওরা চলে গেলে বাবা বলবেন, খাঁটি গরুর দুধ শহরে পাবে কোথায়? বাবার খুব ইচ্ছে একদিন সবাইকে খেতে বলেন। খাঁটি গাওয়া ঘি ঘরে হয়। মা সর তুলে জমিয়ে সপ্তাহে একদিন ঘি জ্বাল দেয়। সর বেটে জ্বাল দেবার সময় সত্যি সুঘ্রাণে বাড়িটা ভরে যায়। গাওয়া ঘি পাতে, খেতের

বেগুন, মোচার ঘন্ট, লাউ দিয়ে মুগের ডাল এবং মাছ আর দই। মাছ বাদে প্রায় সবই এখন আমাদের বাড়িতেই মেলে। এটা একজন সংসারী মানুষের পক্ষে কত বড় সাফল্য, তাদের না খাওয়াতে পারলে সেটা যেন বোঝানো যাচ্ছে না।

ওরা চলে গেলেই পিলু হাজির।

সে হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে। কোথায় গেছিল জানি না। বাড়িতে বলেও যায়নি। সাইকেল থেকে নেমে দেখল তার দাদাটি ঘরের বাইরে বের হয়েছে। আমাকে পিলু চুরি করে দেখছে। কেন দেখছে বুঝতে পারছি না। ও কী টের পায়, আমি এখনও স্বাভাবিক নয়।

দেখলাম সাইলেকটা রেখে আমার দিকেই আসছে।

বললাম কোথায় গেছিলি!

সে খুব কাছে এসে বলল, পরীদিকে বলে এলাম।

পরীদির জন্য পিলুরও একটা কষ্ট আছে। তার দাদাটিকে নিয়ে পরীদি যে বিপাকে পড়েছে, সে সেটা বুঝতে পেরেই চলে গেছে। সে জানে, দাদার ফেরার খবর সবার আগে যদি কাউকে দিতে হয় তবে সে পরীদি। সে স্থির থাকতে পারেনি।

পিলু ফের বলল, পরীদির এক রাতে কী চেহারা হয়েছে তাকানো যায় না।

আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কাল পরী যথার্থই বিদ্রোহ করেছে হয়ত। এমন একটা বিশ্রী কান্ড ঘটার পর পরী আমাদের বাড়িতে না হলে আসে কী করে! বাপ-ঠাকুরদার কাছে আমরা এখনও সবাই ছেলেমানুষ। আঠারো উনিশ বয়সে কত আর আমাদের সাংসারিক বুদ্ধি হতে পারে। পরীদের পরিবারও তাই ভেবে থাকতে পারে। বয়সের দোষে হচ্ছে। জীবনকে বোঝার বয়সই আমাদের হয় নি এমন ভাবতে পারে। পরীর উপর সতর্ক পাহারা যে ছিল না কে বলবে! না পরেশচন্দ্রের সঙ্গে বের হয়ে এসেছিল বিকালে। মানুষটি যথার্থই ভাল মানুষ। পরীর কথায় ওঠে বসে। পরী যদি পরেশচন্দ্রকে ডেকে পাঠায়, যতই গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য থাকুক, ফেলে ছুটে যাবেই। কে জানে, পরেশচন্দ্রের জিপে বের হয়ে বড় রাস্তায় নেমে বলেছিল কি না, তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বিলুর খোঁজ নিয়ে আসছি। পরী কাল সাইকেলে এসেছিল কিনা জানি না। পরেশচন্দ্র আমাদের চেয়ে কয়েক বছর বেশি আগে পৃথিবীতে এসেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা তার আমাদের চেয়ে বেশি। পরীর সাময়িক দুর্বলতা ভেবে লেগে রয়েছে। কোনো কারণই থাকতে পারে না—পরীর মতো মেয়ের গরীব বামুনের পুত্রের জন্য এত দুর্বলতা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। পরীর চোখে মুখে আশ্চর্য এক দেবীমহিমা আছে সে টের পেয়েছে। পরীর শরীরের সবটাই যেন মা জগদ্ধাত্রীর জীবন্ত রূপ। এত রূপ যার তার আগুনে কোন্ পতঙ্গ পুড়ে মরতে না ভালবাসে।

পিলুকে বললাম, শোন পিলু।

পিলু কাছে এলে দু'ভাই বাবার ফুলের বাগান পার হয়ে রাস্তার ধারে আমগাছটার নিচে এসে দাঁড়ালাম। শোন বললে, পিলু বুঝতে পারে দাদার কোনো গোপন কথা আছে। সে-কথা দাদা তাকেই বলতে পারে। আর কাউকে না।

খুব সতর্ক গলায় বললাম, পরী সাইকেলে এসেছিল?

—না তো।

—কার সঙ্গে এল? সুধীনবাবুদের সঙ্গে?

—না তো।

—তবে।

—পরীদি একাই এসেছিল। পরে মুকুলদারা।

আমার দুশ্চিন্তা, পরীর গালে আমার হাতের ছাপ থাকলে বাবা ঠিক টের পাবে। বাবা কেন, মা, মায়া সবাই।—ওমা পরী তোমার গালে কালসিটে দাগ কেন, কী হয়েছিল?

পরী যে এল, কালসিটে দাগ ছিল না? পিলুকে বললাম।

পরীদি খুব সেজে এসেছিল।

—সেজে এসেছিল?

--হ্যাঁরে দাদা। কপালে বড় আলতার টিপ। মুখ ঝকমক করছিল।

আসলে পরী কাল মুখোস পরেছিল। পরেশচন্দ্রের সঙ্গে এত সেজে বের হয়েছিল যে প্রসাধনের নিচে তার কালসিটে দাগ ঢাকা পড়ে গেছিল। এই দাগ আড়াল করার জন্য পরী তবে এত সেজেছে। দু-দিকই রক্ষা করেছে পরী। দাদুর দিক। দাদু দেখে বুঝেছে হয় তো, পরীর মোহ কেটে গেছে। না হলে পরেশচন্দ্রকে নিয়ে বিকেলে বের হবে কেন, এত প্রসাধন করবে কেন। আর বাবাকে ধোঁকা দেবার জন্য, গালের কালসিটে দাগ দেখলে বাবা প্রশ্ন না করে পারবেন না—মিথ্যা কথা বলতে পরীরও কেন জানি সংকোচ হয়,—বাবার সঙ্গে মিছে কথা বলতে পারে না। বাবা মা মায়া কেউ টের না পায়, পরীর গালে কালসিটে দাগ পড়েছে। এমন সুন্দর মুখে সে দাগ কত বড় কলঙ্কের! কলঙ্কের না গৌরবের ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। পরী আমাকে নির্ঘাৎ ডোবাবে। কেমন ভয় ধরে গেল। এমন জেদি মেয়েকে আমি কেন, কারও যেন সামলাবার ক্ষমতা নেই। পরী কী ভাবে, আমি তার হাতের খেলনা?

এ-সব জটিল চিন্তা ভাবনায় আমার মাথাটা কেমন ধরে গেল। পিলুকে বললাম, ঠিক আছে যা।

আর তখনই দেখি বাবা কোত্থেকে দু-জন ঘরামিকে ডেকে এনেছেন। বাবা বললেন, স্কুল থেকে ফিরে কোথাও আজ আর বের হবে না।

তারপর যেন আমার অনুমতির জন্য বলা, নবমীর ঘরটা ঠাকুরঘরের পাশেই তুলছি। কী বলিস! কাছে হবে। এই বয়সে তো তাঁর যত কাছাকাছি থাকা যায়।

পিলু ঘরামি দুজনের সঙ্গে ছুটে গেছে বাঁশ-ঝাড়ের দিকটায়। বড় বড় কটা বাঁশের খুঁটি লাগবে। বাঁশ কাটার শব্দ কানে আসছিল।

আমি কিছুতেই কালকের দুর্ব্যবহার ভুলতে পারছি না। পরী আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, না পরী যাচাই করে দেখল ওর প্রতি আমার সত্যি দুর্বলতা আছে কি না। একবার দুর্বলতা প্রকাশ করতে গিয়ে যে-ভাবে পরী নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল, তারপর থেকে ওকে যতটা সম্ভব পরিহার করে চলেছি। তবে আমি পরিহার করে চললেও সে বার বার বেহায়ার মতো আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ি ঘুরে গেছে। এতে আমার ক্ষোভ হত, সে টের পেত। কিন্তু পরী জানত না, তাকে আমি নিজের মনে করি কিনা! গতকালের দুর্ব্যবহারে টের পাইয়ে দিয়েছি, আমার সত্যি অধিকার জন্মে গেছে। না হলে আমি তাকে এমনভাবে অপমান করতে পারি না। কানের কাছে কে যেন একই সুরে কেবল ছড় টেনে যাচ্ছে,—এ-যে তোমার কত বড় অধিকার বিলু তুমি জান না। কিছুতেই এই কথাগুলি ভুলতে পারছি না। চোখ মুখে বিষণ্ণতা ফুটে উঠছে। বাবা বাড়িতে গাছপালা লাগাবার মতো যেন টের পান, তাঁর এই ঔরসজাত গাছটিতে পোকা লেগেছে।

গাছপালা তার ঠিকমতো মাটিতে শেকড় চালিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত বাবা বড় সতর্ক থাকেন। একজন মানুষের এই কাজ। তার উত্তরপুরুষকে ঠিকমতো রোপণ করে যাওয়া। না করতে পারলে অসফল মানুষ, কিংবা কোনো উদ্ভিদ রোপণে তাঁর যে মহিমা থাকে—নিজের সন্তানের বেলায় তা ব্যর্থ হয়েছে। লক্ষ্মীর অপমৃত্যুর পর আমার মুখে ঠিক এমনি হয়তো বিষণ্ণতা টের পেয়েছিলেন। না হলে বলতেন না, তোমাকে এক খন্ড জমি দিলাম, জমিতে তোমার খুশিমতো শাকসব্জি লাগাও। বলতে চেয়েছিলেন, মৃত্যুই শেষ কথা নয়, জীবনে বেঁচে থাকাই বড় কথা। আসলে বাবা আমাকে জীবনের অন্য এক আকর্ষণে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। এখন সেটা বুঝি। আজও যে বললেন, স্কুল থেকে ফিরে কোথাও বের হবে না, সেই একই কারণে।

স্কুল থেকে ফিরলে বাবা বললেন, খাওয়া হলে আমার সঙ্গে যাবে।

সামান্য অপ্রসন্ন গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে আমি কোথায় যাব?

বাবা জানেন, আমি তাঁর সঙ্গে কোথাও যাওয়া আজকাল পছন্দ করি না। যজমানদের শ্রাদ্ধ শান্তিতে, বিয়ে উপলক্ষে, কখনও ন'জন, কখনও দ্বাদশ ব্রাহ্মণের দরকার হয়। বাবাই সব ঠিক করে

দেন। মূল কথা বাড়িতেই আমাকে নিয়ে তিনজন সৎ ব্রাহ্মণ আছেন। এই তিনজন আমি, পিলু, বাবা। এখন আমি এ-সব নিমন্ত্রণে কিছুতেই যেতে চাই না। বাবা যেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, তাঁর যজমানদের দেখাবার জন্য,—দেখ, আমার পুত্র কেমন লায়েক। কেমন সুপুরুষ। ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কলেজের একটা পাশ দিয়েছে।

এ-ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার যজন-যাজন আমার আদৌ মনঃপূত নয়। আমি পিলু দাঁড়িয়ে গেলে বাবাকে আর এ-কাজ করতে দেব না, এমনও মনে মনে কতবার ভেবেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে, বাবার সম্ভ্রম-বোধ আর আমার সম্ভ্রম-বোধ যেন আলাদা। নিমন্ত্রণে গেলে নিজেকে পেটুক বামুন ছাড়া ভাবতে পারতাম না। কলেজে পড়ার সময়ই বাবাকে সাফ বলে দিয়েছিলাম, এবার থেকে বাড়ির একজন বামুন বাদ দিয়ে লিস্ট করবেন। আমি কারো বাড়িতে কোনো আত্মার সদ্গতি করতে রাজি না।

বাবা শুনে অবাক হয়ে গেছিলেন। ছেলে কী তাঁর ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে! মানুষের সদ্গতি বলে কথা। একে তো সৎ ব্রাহ্মণ আজকাল পাওয়া কঠিন। আচার নিয়ম মানে না। গলায় পৈতা থাকলেই বামুন হয়, তিনি মানেন না। তাঁর চেনা জানা কিছু ব্রাহ্মণ শহরে আছেন, কিন্তু আজকাল এতদূর হেঁটে কোনো সৎ ব্রাহ্মণই কারো সদ্গতির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে না। এ-হেন অসময়ে তাঁর নিজের পুত্রটি পর্যন্ত বেঁকে বসবে, তিনি বোধহয় অনুমানও করতে পারেন নি। এবং এক সকালে বাবা যখন আমাকে তার সঙ্গে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারলেন না, ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, তোমার আজকাল কী হয়েছে বুঝি না। মানুষের অসময় বুঝতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে আছে, সৎ ব্রাহ্মণ ভোজনে আত্মার সদ্গতি হয়। মানুষের কাজে কর্মে আমি কোথায় যাব।

বলেছিলাম, সে আপনি বুঝবেন। আমার যেতে ভাল লাগে না। আসলে ভাল না লাগারই কথা। বাবা তো সকালে প্রাতঃস্নান সেরে নামাবলী গায়ে খড়ম পায়ে ঠক ঠক শব্দ তুলে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন। বাবার বেলায় বের হওয়া কথাটা যেন মানায় না। নিষ্ক্রান্ত হলেন, এমনই মানায়। এত বেশি আচার বিচার, যেন মনে হবে বাবা বড়ই পুণ্য কাজ করতে যাচ্ছেন। তীর্থ করার সামিল। অথবা মনে করেন তাঁর মন্ত্রপাঠে সংসারী মানুষের আপদবিপদ কেটে যায়। অশুভ আত্মার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়। মানুষের এটা কত বড় দায়, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি যদি তা বুঝত। বাবার ক্ষোভের কারণ বুঝি। আমি বাবাকে, শুধু বাবাকে কেন, পরিবারের সবার কাছ থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছি বাবাও এটা বোধ হয় খুব দোষের মনে করেন না। গাছ যখন বাড়ে,—তখন সে দূরত্ব বজায় রাখতেই চায়, নইলে গাছটা তার নিজের ডালপালা মেলবার জায়গা পাবে কোথায়। বীজ-তলা থেকে গাছ তুলে সময়কালে রোপণ করতে না পারলে গাছে ফসল ফলবে কেন। আম জামের কলম কেটে রোপণ করতে হয়। গাছ থেকে গাছ আলাদা হয়ে নিজের মতো বাড়ে। আমিও বাড়ছি। আমার আলাদা অস্তিত্ব এ-সংসারে বীজতলা থেকে চারা গাছ তুলে নেবার মতো। এতে মা আমার যতটা কাতর, বাবা তত নন।

পিলুই একদিন বলেছে, জানিস মা না কাঁদছিল!

—কেন রে!

—তুই নাকি কেমন হয়ে যাচ্ছিস।

—আমি আবার কী হলাম!

—সংসারে তোর টান নেই। মন উড়ো উড়ো। বাবা মা'র কান্না দেখে ঘাবড়ে গেছিল। বলল, বয়সের দোষ। পাখা গজাচ্ছে। উড়তে শিখেছে। জীবের ধর্মই নাকি এমন।

আমাকে নিয়ে বাড়িতে যে অশান্তি চলছে, পিলুর কথায় ধরতে পারি। আমি নাকি বাড়িতে এক দন্ড থাকতে চাই না। বাইরে আমার এত কী রাজকার্য থাকে মা নাকি বুঝতে পারে না। বেশি রাত না হলে ফিরি না। সবাই বারান্দায় আমার অপেক্ষায় বসে থাকে—বাবা ক্ষোভ সামলাতে না পারলে আক্ষেপ করে বলবেন, খুবই কান্ডজ্ঞানের অভাব।

কান্ডজ্ঞানের কত বড় অভাব কালকের ঘটনার পর এটা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি। সে জন্য বাবা

যখন বললেন, নবমী বুড়ীর জঙ্গলে যাব। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। আমি না করতে পারলাম না।

ঘরামি দু'জন, ছোট্ট কুঁড়েঘরটা আজই বানিয়ে ফেলেছে। মাথায় তালপাতার ছাউনি। চারপাশে পাটকাঠির বেড়া। ঝাঁপের দরজা একটা। মুগুর দিয়ে মাটি বসিয়ে ভিটে তৈরি করে ফেলেছে। বাবা নিজেও সারাদিন তাদের সঙ্গে খেটেছেন। পিলুকে স্কুলে যেতে দেন নি। ঘরটা তোলার ব্যাপারে পিলুর আগ্রহই বেশি। মা নিমরাজি হয়ে আছে। তবে সবাই চাইলে মা না করে কী করে। বিশেষ করে মেজ পুত্রটি কবে থেকে নবমীকে বাড়ি নিয়ে আসার জন্য বায়না ধরেছে। রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে জীবন্ত একটা মানুষকে নিয়ে শেয়াল কুকুরে টানাটানি করবে ভেবেই সে অস্থির ছিল। কার জন্য কীভাবে যে মানুষের টান ধরে যায়, পরীর জন্য না হলে আমার এমন নাড়ির টান জন্মায় কী করে! দু-বছর আগেও সে জানত না পরী বলে এক নারী পৃথিবীতে বড় হচ্ছে। এখন তো সব এক দিকে, পরী একদিকে। সে পরীর ভালোর জন্য জীবনের সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে। আর দিতে পারে বলেই, সে সহজে পরীর কাছে ধরা দিতে চায় না। পরী ঘনিষ্ঠ হতে চাইলেই ক্ষেপে যায়। পরীকে এমন বাড়িঘরে মানাবে কেন!

পরীর ছলনায় শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হল।

এমন যখন ভাবছিলাম, বাবা বললেন, চল। পিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দৌড়ে যাও। খবর দাওগে আমরা যাচ্ছি। কী যে বায়না বুড়ির, সবাই গিয়ে নিয়ে আসতে হবে তাকে। আসলে নবমী তার প্রিয় বনজঙ্গল ছেড়ে চলে আসবে। আসার আগে সবাই সামনে না থাকলে যেন জোর পাবে না। দাঠাকুর, বড় দাঠাকুর, বাবাঠাকুর, সবাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছে। যেন সেই জঙ্গলের প্রতিটি গাছপালা, কীটপতঙ্গ, প্রাণীকুলের কাছে বলতে পারবে, তোমরা আমায় এতদিন খাইয়েছ পরিয়েছ, এখন আমি ঠিকমতো হাঁটাহাঁটি করতে পারি না,—মরে থাকলে আমার আত্মার সদ্‌গতি কে করবে! তেনারা তিন বামুন ঠাকুর এসেছেন, শেষ বয়সের সম্বল তেনারা। তাঁরা আমাকে ভালই রাখবেন। দেখছ না সবাই নিতে এসেছেন।

নবমীর এত আবদার পিলুর জন্য সহ্য করা হচ্ছে। পিলুকে আমরা জানি এ-রকমেরই।

মা বলেছিল, বুড়ি কাঁথা কাপড়ে হেগে মুতে রাখলে কে পরিষ্কার করবে!

পিলু বলেছিল, আমি করব মা! তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি সব করব।

পিলুর কী আগ্রহ বুঝতে বাবার আর কষ্ট হয়নি। বাবা বলেছিলেন, ধনবৌ, যে যার ভাগ্যে খায়। নবমী পিলুকে শেষ আশ্রয় ভেবেছে। ক'দিন আর বাঁচবে। যে ক'টা দিন বাঁচে, মানুষের কাছে থাকুক। এতে ঘরবাড়ির পুণ্যই অর্জন হবে। এর সঙ্গে তোমার ছেলেমেয়েদের শুভাশুভও জড়িয়ে আছে। যদি কুকুর-শেয়ালে খায়, তবে মানুষের কত বড় অপমান হবে বল।

এরপর আর মা কী বলবে!

কেবল বলেছে, যা ভাল বোঝ কর।

সেই ভাল বোঝাটা মা'র নিমরাজি হওয়া। আসলে এ-পরিবারে কার ঠাঁই হবে না হবে, তার শেষ অনুমতি দেবার দায়িত্ব আমার মা'র।

আমি ও বাবা যাচ্ছি। সূর্য নেমে গেছে। বাবা, পাঁজি দেখে বলেছেন সাঁঝবেলার পর যাত্রা শুভ। পিলু আগেই দৌড়ে গেছে। বেশ খানিকটা দূরত্বে বনজঙ্গলের শুরু। এদিকটায় আরও বাড়িঘর উঠেছে। কেউ বারান্দায় বসে পিতা-পুত্রকে জঙ্গলের দিকে অসময়ে যেতে দেখে, প্রশ্ন করেছে, কোথায় যাচ্ছেন কর্তা। বাবা বলেছেন, এই কারবালায় যাচ্ছি। একটু কাজ আছে। নবমীকে আনতে যাচ্ছেন ঘুণাক্ষরেও বলছেন না। বললেই তিনি যেন আবার তামাসার পাত্র হয়ে যাবেন। কর্তার চিড়িয়াখানায় আর একটি জীবের আমদানি হচ্ছে, এমন ভাবতে পারে। কেউ কেউ বুড়িকে জঙ্গলের ডাইনি বলতেও দ্বিধা করে নি। অন্যের কী দোষ, যেদিন আমি নবমীকে প্রথম দেখি, সেদিন আমারও এমন মনে হয়েছিল।

বনজঙ্গলে ঢোকার আগে কিছু খানাখন্দ পার হতে হয়। বাবার হাতে হ্যারিকেন। পকেটে দেশলাই।

বর্ষাকাল বলে বনজঙ্গল গভীর ঘন। কোথাও বড় বড় গাছ কিংবা পরিত্যক্ত ইঁটের ভাটার গভীর গর্তে জলাশয়। কত রকমের সব পাখি ওড়াউড়ি করছে। নির্জন নীল ধূসর বর্ণের পৃথিবীর মধ্যে আমরা ক্রমে ঢুকে যাচ্ছি। কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না এদিকটায়। একটা সরু পথ বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কারবালার লাল সড়কে গিয়ে পড়েছে। দিনের বেলাতেই আমার আর পিলুর শহর থেকে ফেরার রাস্তা শর্টকাট করতে গেলে গা ছমছম করত। কোথাও এতটুকু রোদ ঢোকে না। ডাহুক, বনমুরগি, কখনও ঘুঘুপাখির, ডাক শোনা যায়। আর সাঁঝবেলায় শেয়ালের দল কবরের গর্ত থেকে উঠে আসে। বোধহয় অন্ধকারকে তারাও ভয় পায়। যখন রাতে শেয়ালেরা চিৎকার করতে থাকে, তখন মনে হয়, এক আদিম ঘোর অরণ্যের পাশে আমরা বসবাস করি।

বাবা বললেন, দেখে হাঁটবে।

তাই হাঁটতে হয়। সাপখোপের উপদ্রব বড় বেশি। জঙ্গলটার একটা দিক সাফ হয়ে যাওয়ায় মানুষের তাড়া খেয়ে বিশাল সব গোখরা, চন্দ্রবোড়া, ডাঁড়াস এসে এখন এই জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। জঙ্গলটার মধ্যে খুঁজলে এখনও দু-একটা নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। পোড়ো বাড়ি চোখে পড়ে। এক সময় ইংরাজরা এ-তল্লাটেই তাদের ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে তুলেছিল। লাল সড়ক ধরে গেলে, বিশাল রাজবাড়ির পাঁচিল, কাশিমবাজারের নীল মাঠ, দূরে একটা খালের মতো আদি গঙ্গায় জলজ ঘাস, এবং তারপর কী আছে আমরা জানি না। আমি আর পিলু একবার গঙ্গার ধার ধরে এগোতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, ও-পার দেখা যায় না এমন মস্ত বড় ঝিল। নবাবের আসল প্রাসাদ ঝিলের তলায়। জগৎ শেঠের প্রাসাদ ঝিলের তলায়। কাশিমবাজারে ঢুকলেই মনে হত পরিত্যক্ত শহর। ইঁটের দালান, দাঁত বের করা, প্রতি বছরই কালে কাউকে না কাউকে খায়। এজন্য বাবা আমি খুবই সন্তর্পণে হাঁটছি। পিলুর এই বনজঙ্গলের ঘোরা খুব প্রিয় কাজ বলে, সে গন্ধ শুঁকে টের পায় কোথায় কী পড়ে আছে। পিলু যা টের পায়, আমরা পাই না।

আমাদের সতর্ক থাকতেই হয়।

বাবার সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমার এখন আর হয় না। বাবার ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার বছর থেকেই। আজ যে যাচ্ছি, সে নিতান্ত দায়ে পড়ে। দায়টা বর্তেছে অনুতাপ থেকে বুঝি। পরীকে মেরে ভাল নেই, মনের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে, মানুষ কুকাজ করলে যা হয়, আমারও তাই হয়েছে। বাবার কথা ফেলতে পারিনি। সুবোধ বালক হয়ে গেছি।

বাবা অনেকদিন পর তাঁর বড় পুত্রকে নিয়ে আকাশের নিচ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

জঙ্গলটায় ঢুকে বাবা বললেন, নবমীকে নিয়ে যেতে বেশ রাত হবে দেখছি।

বললাম, কাল সকালে গেলেই হত। রাত করে!

—নবমী নাকি দিনের বেলায় আসতে রাজি না। তা ছাড়া সময়টা খুব শুভ।

হতেই পারে। ওকে দিনের বেলায় হাঁটিয়ে নিয়ে এলে পাড়ার ছেলেরাই পিছু নেবে। সবাই বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আমাদের মাথা খারাপ আছে ভাবতে পারে। পিলু পর্যন্ত তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলেনি, জঙ্গলের বুড়িটাকে বাবা বাড়ি নিয়ে আসবে। এমনকি পিলু একাই যায় রোজ। কারণ, দু-একজন সঙ্গে গেলে সে বুঝেছে বুড়ি ক্ষেপে যায়। বুড়িরও দোষ নেই। এমন প্রেতের মতো বুড়িকে দেখলে ভয় হবার কথা। নবমী বয়সকালে খুবই রূপবতী ছিল, বিশ্বাস করা কঠিন। ছেলে-ছোকরারা জঙ্গলে ঢুকে বুড়িকে ঢিলটিলও মেরেছে। পিলু নালিশ পাবার পরই শাসিয়ে দিয়েছে সবাইকে। এক পিলু গেলেই বুড়ি শান্ত থাকে। গড় হয়। আর কেউ গেলেই এমন শাপশাপান্ত শুরু করবে যে, ছেলেছোকরাদের রাগ বেড়ে যায়।

সাঁঝ লাগতেই আমরা নবমীর জঙ্গলে হাজির। পিলু চিৎকার করে বলছে, নবমী, বাবা আসছে। দাদা আসছে। বের হয়ে দেখ।

নবমী বের হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। বেঁকে গেছে নবমী। দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ল নবমী। অনেক দূরে আছি। দূর থেকেই দেখলাম, সে মাটিতে মাথা ঠুকে তার বাবাঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

কাছে গেলে দেখলাম, নবমী আজ কেমন চুপচাপ। পিলুই নবমীর হয়ে কথা বলছে। কি কি করতে হবে সেই কথা। নবমী শুধু বড় বড় চোখে আমাকে বাবাকে দেখছে। ভাগ্য তার এত সুপ্রসন্ন হবে জীবনেও হয়ত ভাবতে পারেনি। কেউ তাকে শেষ সময়ে বাড়ি তুলে নিয়ে যেতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি। পিলু যে মাঝে মাঝে বলত, নবমী তুমি আমাদের বাড়ি যাবে? ছেলেমানুষের কথা, সে বলত, আমার কপালে সইবে না দাদাঠাকুর। সেই দাদাঠাকুর শেষ পর্যন্ত সবাইকে রাজি করাতে পারবে, এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। বাবা তার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করেছেন, খবরটাও কেমন দাদাঠাকুরের ছেলেমানুষী বলেই এতক্ষণ হয়ত ভেবেছে। বাবা গতকাল এসে কী জেনে গেছিলেন, তাও জানি না।

কিন্তু পিলুর কথায় বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

পিলু বলল, নবমী বলছে, ওর ঘরের কোণায় একটা কাঠের বাক্স আছে। ওটা নিতে হবে। কী ভারি! দেখ। বলে সে কিছু খড়কুটো সরিয়ে বাক্সটা দেখাল। কবেকার একটা কাঠের পেটি। কিন্তু উই কিংবা অন্য কোনো পোকামাকড়ের উপদ্রবে পড়েনি।

বাবা বললেন, ওতে কী আছে তোমার?

নবমী হাতজোড় করল শুধু।

যেন নবমী বলতে চায়, কী আছে বাবাঠাকুর শুধাবেন না। নিয়ে যেতে হবে, এইটুকু সে শুধু বলতে পারে।

বাবা বললেন, দেখি পেটিতে কী আছে? এত ভারি!

আর পেটি খুলে আমরা অবাক। ক'খানা আস্ত ইঁট। ইঁটের ভাটায় কাজ করত নবমীর মরদ। তারই স্মৃতি।

বাবা হেসে ফেললেন, ওগুলো নিয়ে কী হবে?

নবমী ফের হাতজোড় করল। যেন এগুলি সঙ্গে না নিলে নবমী তার ইঁটের ভাটার পোড়ো বাড়ি ছেড়ে নড়বে না। ছেঁড়া কাঁথা-বালিশ, এমনকি সে তার পোঁটলা-পুঁটলি সম্পর্কেও কিছু বলছে না।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মানুষটার শেষ স্মৃতি। এই নিয়ে সে বেঁচেছিল তবে। কী করবি, নিতেই হবে।

—স্মৃতি যখন একটা-দুটো নিয়ে গেলেই হয়। সবকটা নেবার কী দরকার! আমি না বলে পারলাম না।

বাবা উবু হয়ে তখন হ্যারিকেন ধরাচ্ছেন। গাছপালার আবছা অন্ধকারে সাঁঝবেলার আঁধার ঘন হয়ে উঠছে। ঘরের সবকিছু অস্পষ্ট। ভ্যাপসা স্যাঁতসেতে ঘর। নোনায় ইঁট-বালি খেয়ে গেছে। একটা দিক ধসে পড়েছে। ভাটা পরিত্যক্ত হলেও, সবাই চলে গেলেও, নবমী স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে এখানটায় সেই কোন্ অতীতকাল থেকে পড়ে আছে ভাবতে অবাক লাগে। বিশ্রী গন্ধ। কাঁথা-বালিশ এত নোংরা যে, তার থেকেই ভ্যাপসা গন্ধটা উঠতে পারে। নবমীর নিজেরও ভারি জীর্ণ বাস পরনে। এককালে ত্যানাকানি পরে থাকতে দেখেছি। পিলুই বাবার কাছ থেকে চেয়ে বছরে আজকাল দুটো-একটা দানের কাপড় দিয়ে যায়। একটা ছাগল আর তার গোটা তিনেক বাচ্চা গুড়ি মেরে অন্ধকার কোণে শুয়ে আছে। ঘরেই রাম-ছাগলের নাদি জমা করে রেখেছে বুড়ি। দুটি মাটির মালসা ছাড়া আর কিছু বুড়ির সম্বল নেই।

বাবা এবার হ্যারিকেনটা তুলে কাঠের পেটিটা টেনে বললেন, পিলু তুই একটা ইঁট নে। না নিলে যখন যাবে না কী করা!

নবমী ফের বাবার দু'পায়ে গড় হয়ে পড়ল।

পিলু নবমীর আচরণ দেখে সব বুঝতে পারে। নবমী কৃতজ্ঞতায় এতই অধীর যে, চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পিলু বলল, ও রাজি না বাবা।

—তোকে কে বলল?

—নবমী।

—দাঠাকুর। বলে নবমী পিলুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। হাড় ক'খানা সম্বল করে নবমী বেঁচে আছে। চোখ কোটরাগত। চোখের ভাষা বোঝার উপায় নেই।

পিলু বলল, তোমার সবক'টা ইঁট কে নেবে। বুঝতে পারছ না, কতটা রাস্তা যেতে হবে। হেঁটে যেতে পারবে ত?

—পারব দাঠাকুর।

—তোমার ছাগলটাকেও নিয়ে যেতে হবে।

—হ্যাঁ দাঠাকুর।

—তোমাকে আমি ধরে নিয়ে যাব।

—হ্যাঁ দাঠাকুর।

—কেবল হ্যাঁ দাঠাকুর, হ্যাঁ দাঠাকুর। পিলু কিছুটা যেন ক্ষেপেই গেছে। তোমার এত আবদার, সবকটা ইঁট নিয়ে যেতে হবে! কে নেবে এত!

—আমি যে সবক'টা ইঁট পাহারা দিতেছি। আমার আর কোনো সম্বল নেই। বলে কী! এই ক'টা ইঁট পাহারা দিতেছি!

বাবা বললেন, কেন? পাহারা দিতেছ কেন? তোমার যখের এত ভয় কেন?

নবমী বোধহয় আর পারল না। কেবল কাঁদতে থাকল।

পিলু ধমকে উঠল, আচ্ছা ফ্যাসাদ হল। দেব সবক'টা ইঁট জলে ফেলে। বাবা কত কষ্ট করে নিতে এসেছে, আর তেনার আবদারের শেষ নেই।

বাবা বললেন, বকিস না। ওর মাথা ঠিক নেই। বনজঙ্গলে থেকে ও তো একটা গাছ হয়ে গেছে। গাছটাকে নিয়ে কোথাও লাগালেও বসবে না। যা বলছে তাই কর। কী বলছে ছাই তাও বুঝতে পারছি না।

বাবা হ্যারিকেনটা আরও উস্কে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, ছাগলটা সঙ্গে নিচ্ছি। পিলু কাল এসে তোমার কাঠের পেটি থেকে ইঁট ক'খানা নিয়ে যাবে। সঙ্গে বনমালী আসবে। মাথায় বয়ে নিতে ওর কষ্ট হবে না। বলে একটা ইঁট বের করে ওজন দেখলেন! যেমন ইঁটের ওজন হয় তেমনি। খুব ভারি। বহু বছর আগে তৈরি ইঁট,—অথচ এতটুকু ক্ষয়ের চিহ্ন নেই।

বাবা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইঁটের ভেতর সাপের আস্তানা গড়ে ওঠে। ইঁটের ডাঁই যেখানে পড়ে থাকে, সাপ সেখানে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। বুড়ির মনে হয়েছে, পেটির মধ্যে সাপ ঢুকে বাসা বানাবে। ওর মরদের স্মৃতি সাপের বাসা হবে, ভেবেই হয়তো আকুল। দরজায় লাঠি নিয়ে বসে থাকে, পাহারা দেয়। সত্যি দেখছি নবমীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

নবমী বোধহয় আর পারল না। সে দাঠাকুরের রাগ দেখেছে, দাঠাকুরকে ভয়ও পায়! দাঠাকুর মালসায় ভাত বেড়ে দেয়। তরকারি ভাজা সব। খাওয়া হলে ডোবার জল থেকে ধুয়ে রেখে যায়। ঘটি করে খাবার জল রেখে যায়। ভয় পেতেই পারে। সেই ভয় থেকেই যেন বলা, যেন দাঠাকুর রেগে গেলে রক্ষা থাকবে না, সবক'টা ইঁট ডোবার জলে ফেলে দেবে। বলবে, এবার হল! চল এবার!

সে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল, তার কিছু থেকে বুঝতে পারলাম, ওর মরদ ছিল লুটেরা। সেই কোন্ অতীতে পুলিশের তাড়া খেয়ে বাংলা মুলুকে চলে আসে। সেই কোন্ অতীতে নবমী নামে গাঁয়ের এক স্বাস্থ্যবতী তরুণীকে ভালবেসে ফেলে। তারপর থেকে পুরুলিয়ায় ইঁটের ভাটায় কাজ। নবমীর এক কথা ছিল, লুটেরার কাজ করলে জলে ডুবে মরবে। মানুষটা একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল! এক রাতে চলে গেল কোথায়। হপ্তা পার করে ফিরল। কাঠের পেটি আর দুটো মুরগি সঙ্গে ফিরে এল। নবমী বলল, লুটেরার সব ইঁটের ভেতরে আছে গো বাবু। আমারে দিয়ে গেছে। আমি দাঠাকুরে দিয়ে যেতে চাই।

আমাদের কারো মুখে্ রা নেই।

পিলু বলল, ইঁট ক'খানায় কী আছে তোমার। ওতে আমার কোঠাবাড়ি হবে?

—ভেঙে দেখেন না। কোঠাবাড়ি হবে না কেন দাঠাকুর!

একটা ভাঙতেই আমাদের চক্ষু স্থির। সোনার একটি ছোট পিন্ড। পাঁচ-সাত ভরি ওজনের কম হবে না।

পিলু কেমন ঘাবড়ে গেল, নবমী তুমি ডাকাতের বৌ ছিলে?

—না দাঠাকুর। আমার কাছে মানুষটা সাচ্চা মানুষ। খেটে খেয়েছে। শেষ লুটের মাল বিচে খায়নি। বুলেছে, আমি না থাকলে, তুই বিচে খাবি। আমি খাইনি। পাহারা দিচ্ছি। বনজঙ্গল ছেইড়ে যেতে পারিনি।

বাবা আমার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পিলু আমি সবাই এই গভীর বনজঙ্গলের অন্ধকারে মানুষের আর এক মহিমা আবিষ্কার করে মুহ্যমান। ভালবাসলে ডাকাতও মানুষ হয়ে যায়। ভালবাসলে মেঘ হয়, বৃষ্টি হয়।

বাবা কিছুটা যেন অস্বস্তি কাটিয়ে উঠেছেন। —তোমার মরদের পাপ দাঠাকুরের মাথায় চাপাতে চাইছ!

—না, বাবাঠাকুর। সব পাপ তেনার। বাবাঠাকুর আপনার আলয়ে বিগ্রহ সেবা হইয়ে থাকে! তার সেবায় এসব লাগলে আমার মরেও শান্তি বাবাঠাকুর।

নবমী বাবার ইতস্তত ভাব দেখে বলল, দাঠাকুর আমার জীবন্ত বিগ্রহ। তার সেবায় লাগুক। সব পাপ আমার। সব পাপ লুটেরার। আপনি বাবাঠাকুর অন্যমত করবেন না গো।

আমিই বাবাকে সাহস দিলাম, মানুষের সেবায় লাগলে দোষের কী!

তবু বাবা যেন কিছু ঠিক করতে পারছেন না। আসলে আমার মা শেষ পর্যন্ত যদি রাজি না হয়। পাপের ধন ছুঁতে নেই। তবে বাবা জানেন, মা বৈষয়িক বুদ্ধি বেশি ধরেন।

বললাম, সঙ্গে নিন। মা কী বলে দেখুন।

বাবা যেন এতক্ষণে তাঁর সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলেন। ধনবৌ কী বলে! বিষয় আশয় নিয়ে মাকে বাবা যখন কথা বলেন তখনই ধনবৌ এই সম্বোধনে ডাকেন।

বিলু ইঁটগুলি ভেঙ্গে সাত আটটা স্বর্ণপিন্ডের পুঁটুলি বেঁধে ফেলেছে ততক্ষণে। সেও মা'র মতো বিষয় আশয়ে আমার কিংবা ব্যবার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে। সে তাড়া লাগাল, ওঠো, আমার হাত ধর।

বাবা ছাগলের দড়িটা হাতে নিলেন।

আমার হাতে হ্যারিকেন। আমি সবাইকে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিচ্ছি। আমাদের দারিদ্র্য শেষ পর্যন্ত এভাবে দূর হবে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।

বাবা বাড়ি ফিরে চুপি চুপি সব মাকে বললেন, দেখলাম মা যেন আকাশ থেকে পড়েছে।—বল কী। কৈ দেখি! দেখে বলল, এগুলি সোনা তো! এত এত! মা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, পুলিশে ধরবে না।

বাবা বলল, তাই তো।

পিলু বলল, ধুস তুমি যে কী না মা।

তারপরই বাবার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল যেন। বলল, বিক্রি করে জমিজমা কিনে ফেলা ভাল। ঠাকুরের নামে সব জমিজমা কেনা হবে। পিলুকে, সেবাইত করে দিলে নবমীর আত্মা শান্তি পাবে। নবমী না হলে মরে গিয়েও শান্তি পাবে না। ওর জন্য না হয় আমরা কিছুটা পাপের ভাগী থাকলামই। সবাই স্বার্থপর হলে জীবন চলবে কেন?

মা বলল, বিক্রিটা করবে কী করে। তোমার মতো লোক বেনের দোকানে নিয়ে গেলে সন্দেহ করবে না!

পিলু বলল, কেন নিবারণ জ্যেঠা আছে।

নিবারণ দাসের পাটের আড়ত আছে। বাবার যজমান। সব কাজ বাবার বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে করে। শুভ দিনক্ষণ সব। বাবার উপর নির্ভর করে ব্যবসায় বুঁদ হয়ে থাকে। নিবারণ দাসের জামাতারা এলেই বাবার কাছে আসে গড় হয়। বাবার আশীর্বাদ নেয়। নিবারণ দাস, কোনো কাজে কোথাও যাবার আগে বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে যায়। যেন সব আপদ থেকে তবে সে রক্ষা পেয়ে যাবে। এ হেন মানুষটার নাম উঠতেই বাবা আমার স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বললেন, তাইতো। দাসমশাই থাকতে ভয় কি। দাসমশাই আমাকে ঠকাবে না। ঠকালে তার ঘরের লক্ষ্মী উধাও হবে ভাববেন।

অবশ্য সে রাতে আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি। নবমীকে মা নতুন কোরা কাপড় দিল বের করে। পরদিন পিলু নবমীকে পুকুরঘাটে টেনে নিয়ে সাবান দিয়ে শরীর রগড়ে দিলে চিৎকার করতে থাকল, ও বাবাঠাকুর আমারে মেরে ফেলছে গো!

পিলুর এক কথা, চউপ। কী করে রেখেছ শরীরটা। কী দুর্গন্ধ রে বাবা।

বাবা বারান্দায় বসে তামাক সাজতে সাজতে বলেছিলেন, একদিনে তুই অত ময়লা সাফ করবি কী করে। আজ এই পর্যন্ত থাক। পিলু ভাল করে গা মুছিয়ে আর একটা কোরা কাপড় গায়ে পেঁচিয়ে বলল, একদম চিল্লাবে না। রান্না হলেই খেতে দেওয়া হবে।

নবমীর আজকাল খাই খাই ভাব হয়েছে। পিলু এটা জানে বোঝে। মা নবমীর জন্য একখানা কালো পাথরের থালা বের করে দিল। পাথরের গ্লাস। বাবা তক্তপোষ বানিয়ে দিল। মশারি তোষক। ঘরে হ্যারিকেন জ্বালা থাকে রাতে। বাড়িতে আর দশটা জীবের যত্ন আত্তির মতো নবমীরও যত্ন আত্তি একটু বেশিই শুরু হল।

বাবা নবমীর শিয়রে একখানা গীতা কিনে এনে রেখে দিলেন। দুদিন চন্ডীপাঠ করলেন নবমীর ঘরে। নবমী নিচে মেঝেয় হাত জোড় করে বসে থাকে। বাবা যখন বিগ্রহের পূজা শেষ করে বের হন, দেখতে পান নবমী লাঠি ঠুকে ঠুকে ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে বসে আছে। বাবা চরণামৃত দিলে মাথায় ঠেকিয়ে ঠোঁটে এবং বাকিটা বুকে মেখে নেয়। আমি বিকেলে নবমীকে রামায়ণ পাঠ করে শোনাই। রামের বনবাস পড়লে বুড়ির দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

একদিন মুকুল এসে হাজির। নবমীকে দেখে ভেবেছিলাম অবাক হবে। সে বলল, মেসোমশাইর কান্ড। আমি বললাম, না, পিলুর।

এ-কথা সে-কথার পর মনে হল মুকুল আমার জন্য কোনো দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে। সে বলতে ইতস্তত করছে। এ-কদিন বাবা আমাকে নবমীর কিছু কাজ হাতে তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, এই বাড়িঘরে নবমী আছে। বড় একা। তোমার মা না পারেন, তুমি অন্তত তাকে কোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শুনিও। রামায়ণ মহাভারত ঘরেই ছিল। পরীকে ভুলে থাকার মতো একটা কাজ পাওয়া গেছে। নবমী তার জীবনের বিচিত্র ঘটনা বলতো, আমরা মন দিয়ে শুনতাম।

নবমী বাড়িতে কিছুটা পিতামহীর ভূমিকা গ্রহণ করে ফেলল। সে যে কত সুন্দরী ছিল, কাপড় পেঁচিয়ে লাঠিতে ভর করে নেচে দেখাত। আমরা সবাই হাসতাম। সেই বীরপুরুষের কথা বলার সময় তার চোখ থেকে জল গড়াত। আসলে নবমীর যৌবনকাল থাকতেই মানুষটা ভেদবমি করে দু-দিনের মধ্যে চলে গেল। সেই অসহায় জীবনের কথা ভাবলে আমার কেন জানি বার বার লক্ষ্মীর কথা মনে হয়। পরীর কথা মনে হয়। যেন কতদিন পরীকে দেখি না। অপরূপার খবর রাখি না। সব বাবা নবমীকে বাড়িতে তুলে ভুলিয়ে রাখতে চাইছেন। বুঝলাম, মানুষ একসঙ্গে থাকলেই মায়া জন্মায়। নবমীর প্রতি আমাদের সবারই কেমন একটা টান জন্মে গেছে। আমি শহরে যাই না বলে মুকুল অনুযোগ করল প্রথম। তারপর বলল, কথা ছিল, বের হবে নাকি।

মুকুলকে বললাম, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আসলে শহরে গেলেই মন খারাপ হয়ে যাবে জানি। মন একবার খারাপ হলে সহজে তা কাটাতে পারি না।

মুকুলের সঙ্গে সেদিন সারা সন্ধ্যা নদীর ধারে ঘুরে বেড়ালাম। অথচ মুকুল কী কথা বলতে ডেকে আনল বোঝা গেল না। পরীর কী কিছু হয়েছে! বললাম, অপরূপার লেখা প্রেসে গেছে? আসলে অপরূপা ছাড়া আমি পরীর প্রসঙ্গে আসতে সাহস পাই না। পরীর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা

নেই এটাই যেন সবাইকে বোঝাতে চাই। দুর্বলতা যদি কিছু থাকে তা পরীর। পরীর প্রতি আমার দুর্বলতা যে কত হাস্যকর বাবার ঘরবাড়িতে এলেই টের পাওয়া যায়। আমার দুর্বলতা টের পেলে যে আমাদের বাড়িঘরেরই অসম্মান, সেটা বুঝি। বামন হয়ে চাঁদ ধরার বাসনা। আহাম্মক আর কাকে বলে! আমার জন্য গোটা পরিবারের মর্যাদা নষ্ট হোক, আমি চাই না। পরীকে পরিহার করে চলার এটাও একটা বড় কারণ। পরীর জন্য মনটা আবার এত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠবে বুঝতে পারিনি। ভুলতে চেষ্টা করছি। মুকুলের সঙ্গে শহরে আসাটাই যে, আমার ঠিক হয়নি। পরী সম্পর্কে মুকুল কোনো কথাই বলল না। চৈতালী কলকাতায় চলে যাবে, কবে যাবে, কোথায় থাকবে সব খবর দিল—কিন্তু পরীর সম্পর্কে কোনো কথা নেই। কেবল ফেরার সময় মুকুল বলল, কলেজে মর্নিং ক্লাস হবে। তুমি বি-কমে ভর্তি হয়ে যাও। মেসোমশাইকে বলে এসেছি। তিনি রাজি।

আমার পড়াশোনা নিয়ে জানতাম পরীরই মাথাব্যথা ছিল। এখন দেখছি মুকুলের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়েছে। বাবাকে বলে এসেছে। বাবা রাজি হতেই পারেন। সকালে কলেজ, দুপুরে স্কুল, সন্ধ্যায় অপরূপা মন্দ কী। নবমীর গুপ্তধনে কী হবে না হবে, নিবারণ দাস একদিন বাড়িতে এসে হিসাব করে গেছে। সবটা দিয়ে বিঘে ত্রিশেক ধানের জমি কেনা যেতে পারে। বাবা রাজি না। বাবার এক কথা, নবমী গতায়ু হলে তার কাজ, বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করার বাসনা, বিগ্রহের জন্য ছোট্ট কোঠাঘর ঠিক হয়েছে, তারকপুরের মাঠে এক লপ্তে বিঘে দশেক ধানি জমি যদি পাওয়া যায়। বাবা নিবারণ দাসকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত এক লপ্তে না হোক, রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি বিঘে দশেক পেয়ে গেছেন। দর দাম ঠিক করা, রেজিস্ট্রি করা, নিয়ে বাবা ক'দিন ব্যস্ত থাকলেন। এই জমিতে মোটামুটি ভাত-কাপড়ের সুরাহা হয়ে যাবে, বাবার ধারণা। বড়টির কখন কী মর্জি বোঝা ভার। তাকে নিয়ে তিনি কম উদ্বেগের মধ্যে যে নেই, আড়ালে বাবার কথাবার্তা থেকে তা ধরতে পারি।

বাবা নিবারণ দাসকে বলেছিলেন, দাসমশাই, আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র। তাঁরই ইচ্ছে। জমিজমা সব তাঁর নামেই কেনা হবে। বড় বিপাকে পড়েছিলাম, আমি গতায়ু হলে গৃহদেবতার কী হবে! বড়টি তো এমনিতেই ঘোর নাস্তিক। মেজটি এখন একরকমের বড় হয়ে কী হবেন জানি না। ছোটটির অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে, শেষ পর্যন্ত ডালপালা মেলবে কিনা তাই সংশয়। আমার ব্রাহ্মণীর যা জেদ,—তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কেউ করে সাধ্যি কী! কন্যার বিবাহ, কম দায় তো নয়। ঠাকুরের ভরসায় দেশ ছেড়েছি। এক সময় ভেবেছিলাম, জলে পড়ে যাব। ব্রাহ্মণীর চোপার-ভয়ে কতবার নিজেই উধাও হয়েছি।—এখন দেখছি, বাপের দোষ পুত্রে বর্তেছে। ঠাকুরই সব করান,—এজন্য ভাবি না। একটাই ভয়, আমার পুত্র-কন্যার কাজে অন্যের মনে যেন আঘাত না লাগে।

বাবার ভয়টা যে কী বুঝি। বাবা কী টের পেয়েছেন, পরীকে নিয়ে রায়বাহাদুর বিপাকে পড়েছেন! আমি যার হেতু! পরী এলে তো বাবা শুনেছি খুব খুশি হন। সারাক্ষণ মা মৃন্ময়ী বলতে অজ্ঞান। সেই পরী কী তবে বাবার মনে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। রায়বাহাদুরের নিজ থেকে আসা, আমাকে চাকরির লোভ দেখিয়ে দেশান্তরী করা,—আমি অবাঞ্ছিত, বাবা কী টের পেয়ে গেছেন!

স্কুল থেকে ফিরে খেতে বসেছি, মা ভাতের থালা এগিয়ে দেবার সময় বলল, মৃন্ময়ীর দাদু গাড়ি পাঠিয়েছে।

—গাড়ি?

—হ্যাঁ, গাড়ি করে তোর বাবাকে নিয়ে গেল!

মা'র মুখ ভারি প্রসন্ন। বাবা এক জীবনে বিনা টিকিটে আমাদের নিয়ে আস্তানার খোঁজে রেল-ভ্রমণে বের হত, সেই বাবাকে বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে গেছে, ভাবাই যায় না। এ হেন বিস্ময় মা'র জীবনে কখনও ঘটবে মায়া ভাবতেই পারে না। মায়া লাফাতে লাফাতে কোত্থেকে ছুটে এল, জানিস বাবা না, পরীদিদের বাড়ি গেছে। পরীদির দাদু বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে। পিলু স্কুল থেকে ফিরে খবরটা পেয়ে খুশি হল না। আমার ঘরে ঢুকে একবার চুরি করে আমাকে দেখল। তার দাদাটি এই খবর পেয়ে যে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে যেন তার জানাই ছিল।

সে বলল, কীরে দাদা, প্যাঁচার মতো মুখ করে রেখেছিস কেন?

সহসা চিৎকার করে উঠলাম, তোরা কী আমাকে শান্তিতে শুতেও দিবি না।

পিলু বলল, না! তুই শুয়ে আছিস কেন?

অবেলায় শুয়ে থাকাটা পিলুর পছন্দ না বুঝি। আমি গুম মেরে গেলে পিলু অস্থির হয়ে পড়ে। বাবার পরীদিদের বাড়ি যাওয়াটা যে ঠিক কাজ হয়নি, পিলু সেটা বোঝে।

—জানিস দাদা, তারপর কাছে এসে ফিসফিস গলায় বলল, পরীদি এসেছিল। বাবাকে বলে গেছে তুই যেন মর্নিং কলেজে ভর্তি হয়ে যাস। নতুন ক্লাশ খুলেছে। বাবা দুঃখ করে বলেছেন, ওর কী মর্জি জানি না মা। কী যে ছাই ভস্ম ভাবে, খাতায় লেখে, মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়। তার ওপর পড়াশোনা করলে, মাথা তো একটা,—এত ধরবে কেন? তবু তুমি যখন বলছ বলব।

—আমি যে বলেছি, বলতে যাবেন না কিন্তু মেসোমশাই।

—কী হবে বললে?

—আমাকে ও দু চোখে দেখতে পারে না।

—তা আচরণেই টের পাই। তুমি আমাদের বাড়িতে এলেই ক্ষেপে যায়। বল, বোঝাই কি করে, মানুষই মানুষের বাড়িতে আসে। শুধু মানুষ কেন, কীটপতঙ্গ পাখি সব মানুষের চারপাশে বড় হয়। তুমি কাউকেই উপেক্ষা করতে পার না।

তখনই পরীদি কী ভেবে বলল, ঠিক আছে মেসোমশাই, ওকে আপনি বলতে যাবেন না। আমি দেখি কাউকে দিয়ে খবরটা দিতে পারি কিনা!

তারপর থেমে পিলু কি যেন ভাবল। সে তার দাদার পাশে বসল। জামা খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখার সময় বলল, বাবা কেন গেল জানিস?

—কী করে বলব।

—মা, মা!

—ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছ কেন! তোমার ভাত নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকব।

নবমী খোনা গলায় তার ঘর থেকে বলছে, দা-ঠাকুর, খেয়ে নেন গো। সেই কখন চাট্টি মুখে দিয়ে গেছেন।

পিলু বলল, নবমী আসায় বাড়িটা কেমন ভরে গেছে, নারে দাদা।

পিলু আবার চিৎকার করছে, মা মা, পরীদির দাদু বাবাকে নিয়ে গেল কেন জান?

রান্নাঘর থেকে মা বলল, কী করে জানব? তোমার বাবা জানে আর পরীর দাদু জানে।

আমি ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছি। কী করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। বাড়িতে থাকলে আরও যেন অস্থির হয়ে পড়ব। জামা গায়ে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। এই উধাও হয়ে যাওয়ার মধ্যে এক গভীর আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। মাথার মধ্যে গিজগিজ করে পরীর ভালবাসার পোকা।

পরী আমার সর্বনাশ / পরী আমার আকাশ বাতাস / গভীর রাতে নির্জনে একা হাঁটি / দেখি নক্ষত্র হয়ে সে আছে / মাথার উপরে / তার দিগন্ত প্রসারিত ডানার ঝাপটায় / ধুলো ওড়ে / ওড়ে কাঙ্গালের বসন / উলঙ্গ করে দেয় অজ্ঞাতে /—পরী আমার সর্বনাশ / জীবনে / বীজ-বপনে / বিসর্জনে।

পরী আমার সর্বনাশ,—বাড়ি এসে টের পাই।

পিলু এসে বলল, দাদা রে ঘোর বিপদ।

বললাম, কী হয়েছে?

—বাবা শুয়ে পড়েছে।

—কেন?

—দুদিন উপবাস করবেন স্থির করেছেন।

—উপবাস।

—হ্যাঁ। সব জেনে গেছে। তুই পরীদিকে মেরেছিস!

—কে বলল?

—পরীদির দাদুর খুব অসুখ। বাবাকে ডেকে বলেছেন, শেষ জীবনে এত বড় অপমান বাড়ি বয়ে করে যাবে ভাবতে পারিনি বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমার সব শেষ। আমার সব অহং ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। আমার একমাত্র অবলম্বন নাতনিটাকে মেরেছে। তারপর থেকেই শয্যা নিয়েছি। আর বাঁচার আকাঙক্ষা নেই। আপনি ধার্মিক মানুষ। আপনাকে না বলতে পারলে আমার মরেও শান্তি নেই। আপনার ছেলের জন্য পরীকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ-সব সাময়িক দুর্বলতা। দূরে গেলেই সেরে উঠবে।

আমি শুনে যাচ্ছি। কথা বলছি না। হাত পা কাঁপছে।

—জানিস দাদা, বাবার সে কী রুদ্রমূর্তি। আক্ষেপ, শেষে এই ছিল কপালে। নারী হল'গে শক্তিরূপিণী দেবী। সে-ই মানুষের শক্তির উৎস। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। তার গায়ে হাত! এ যে ধনবৌ মহাপাপ! এ-পাপের যে ক্ষমা নেই। আমি কী করব। এমন নিরপরাধ মেয়েটাকে বিলু চড় মেরেছে। এ-পাপের হাত থেকে তোমার ঘরবাড়ি রক্ষা পাবে কী করে! প্রায়শ্চিত্তের বিধান কী আছে জানি না। স্থির করেছি, দু-দিন উপবাস। স্থির করেছি দু-দিন অহোরাত্র চন্ডীপাঠ। তবে দেবী যদি প্রসন্না হন। তারপরই বাবা, মা মা বলে কেঁদে উঠলেন। আমার কোন্ পাপে বিলু এত বড় সর্বনাশ করল ধনবৌ।

গোটা বাড়িটা নিঝুম। কারো ঘরে কেউ আলো জ্বেলে দেয় নি। নিঃশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায় কান পাতলে। মা, বাবার শিয়রে বসে আছে। মায়া ছোট ভাইটা বাবার পায়ের কাছে। নবমী ঠাকুর-ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরুগুলো গোয়ালে তোলা হয়নি। বাবা দেশভাগের দিনও এত ভেঙ্গে পড়েন নি। কেবল ভাবছি সকালে আমার এমন ভালমানুষ বাবাকে মুখ দেখাব কী করে। রাতে আমাকে ডেকে মা সাড়া পেল না। ঘরে ঢুকে বলল, ওঠ খাবি।

—বাবা খাবে না?

—তোর বাবার গোঁ তো জানিস।

আমার চোখ আবার জলে ভেসে যাচ্ছে কেন? বললাম, মা আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তুমি বিশ্বাস কর পরীকে আমি মারিনি। আমি সত্যি মারিনি মা। পরীকে আমি কোনদিনই মারতে পারি না। তারপর বললে যেন এমন শোনাত, পরীকে কষ্ট দিলে যে আমার কষ্ট তোমরা কেউ সেটা জান না।

বাবাকে আর যেন কোনোদিন মুখ দেখাতে পারব না। আমি পরীদের বাড়িতে অবাঞ্ছিত। আজ নিজের বাড়িতেও। গভীর রাতে উঠে একটা চিরকুট লিখলাম, বাবা আপনার কু-পুত্রের মুখ দর্শন করে কষ্ট পান, সেটা আর চাই না। আমি চলে যাচ্ছি। ভাল হয়ে ফিরব। জানবেন, এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আপনার কোনো পাপ নেই বাবা। পিলুকে লিখলাম, দাদা ফিরবে বলে তুই স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। তোর দাদা একদিন না একদিন আবার ঠিক ফিরবে। মা বাবাকে দেখিস। তারপর পিলুকে লিখলাম, পরীকে বলিস, আমার জন্যে সে তার প্রিয় শহর ছেড়ে যেন চলে না যায়। আমিই চলে গেলাম। পরীকে বলিস সে চলে গেলে, কখনও যদি ফিরে আসি, শহরটাকে আমি আর ঠিক ঠিক চিনতে পারব না। শহরটাকে আগের মতো আর ভালবাসতে পারব না। ইতি তোর দাদা।

সুন্দর অপমান

সে মাঝে মাঝে আজকাল একজন বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখে।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। নদী পার হবে। অথচ সামনে যেন এক পারাপার-শূন্য নদী। নদী যতদূর দেখা যায় জলে থৈ থৈ করছে। চড়ায় ইতস্তত কাশবন—হাওয়ায় কাশফুল উড়ছে। সাদা ফুল এবং মাথার উপর বুড়ো মানুষটার শরতের আকাশ—যেন নির্জন অস্তিত্ব বুড়ো মানুষটাকে গ্রাস করছে।

সে জানে জানালায় এ-সময় দুটো পাখি উড়ে আসবে। কিচির-মিচির শুরু করল বলে। সকালে ঘুম ভাঙলে এ-দৃশ্যটা তার চোখে পড়বেই।

তারপর ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হয় না। শরীরে রাজ্যের আলস্য। কেন যে স্বপ্নে বুড়োমানুষের মুখ দেখতে পায় সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। সে কি ঘুমায় না অবচেতনে এ-সব দেখতে পায় বুঝে উঠতে পারে না।

মাঝে মাঝে সে একজন চাষী মানুষের মুখও দেখতে পায়। চাষী মানুষটি নিশিদিন জমিতে হাল চাষ করছে। ক্লান্ত অবসন্ন। আলে দাঁড়িয়ে চাষী মানুষটি জল খায়। আবার চাষে মন দেয়। দিন যত যায় চাষী মানুষটির বয়স বাড়ে। কিন্তু হালের খুঁটি হাত থেকে সে ছাড়ে না। ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারে না।

দুটো দু-রকমের স্বপ্ন।

একটায় যেন যাবার কথা কোথাও। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। বুড়োমানুষের কথা। আর একটায় চাষের কথা। ঘরের কথা। খালপাড়ে পেয়ারা গাছের নিচে চাষীবৌর ডাক খোঁজের কথা।

এই শুনছ! দু কাহন বিছন দিয়ে গেছে নাড়ুর বাবা। দাম পরে দিলেও চলবে। জলে ফেলে রেখেছি।

কোথায় রেখেছিস?

জলে।

কই দেখি।

এস না। আমি ঠিকই রেখেছি। জলেই তো গোড়াগুলো ভিজিয়ে রাখতে হয়। হাসছ কেন! না আমার ভাল লাগে না। বল না হাসছ কেন!

কে শিখিয়েছে পরিপাটি করে সংসার গোছানোর কথা! নতুন বৌ তুই, কোথায় একটু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবি, তা না, কাদা ঘাঁটাঘাঁটি শুরু। দয়াল বোঝো রে মন—হাসব না, রাতে কি হয়েছিল তোর!

মারব।

চাষীবৌর মিষ্টিমুখ, নাকে নথ, কানে ইয়ারিঙ, আর যেন পায়ে মল বাজে—ঝুমঝুম করে বাজে। স্বপ্নটা এত কাছের যে হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। পারে না। জেগে যায়। তখন এত খারাপ লাগে—কোনো গ্রাম্যকুঠীর, দুটো আম জাম গাছ, দিগন্ত প্রসারিত মাঠ এবং মাথায় ভাতের থালা নিয়ে যে হেঁটে যায় তার নাম কুসুম। জমিতে চাষ, খর রোদ আর বাতাস গরম—কুসুম স্বামীর জন্য জমিতে ভাত নিয়ে যায়।

এই দৃশ্যটা বড় মনোরম।

স্বপ্নটা কেন শেষ পর্যন্ত থাকে না। তার খুব কষ্ট হয়।

কুসুম নামটা সে নিজেই দিয়েছে। কুসুম ছাড়া এত সুন্দর করে কেউ জমির আলে হাঁটতে পারে না। এত সুন্দর করে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। আর বড় দুষ্টু হাসি তার মুখে।

সে বোধহয় এমনটাই চেয়েছিল। কুসুমের মত বৌ। বৌ তো কুসুমের মত হয় না। কুসুম স্বপ্নের সে বোঝে।

মাঝে মাঝে স্বপ্নে সে কুসুমের সঙ্গে কথাও বলে।

এই কুসুম, শোনো। কাছে এসো।

না। আমার কাজ আছে।

কি কাজ।

কাজের কি শেষ আছে! মানুষটা খেটেখুটে আসবে। তাকে খুশি রাখতে হবে না!

তাই বলে অবেলায় চান। খালের জলে চান করলে ঠাণ্ডা লাগবে জানো।

আমার ঠাণ্ডা লাগে না। গরুর জাবনা দিলাম, হাতে-পায়ে পচা খোলের গন্ধ। মানুষটা এলে গরু তুলে দিতে হবে গোয়ালে। লম্ফ জ্বালতে হবে। উনুনে কাঠকুটো ফেলে গরম ভাত, আলু পোস্ত। তারপর মানুষটা খাবে। খেতে খেতে ফসলের গল্প করবে। বিছন রোয়ার কথা বলবে। ধান হলে গোলা ভরবে, কত স্বপ্ন জানো!

তারপর?

তারপর আবার কি!

কুসুমের মুখে ভারি সুন্দর কপট হাসি। ছলাৎ করে জল ছিটিয়ে কুসুম নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সে ঘুম ভেঙে গেলে বোঝে কুসুম তার স্বপ্ন।

কুসুম যেন তার পাশেই শুয়েছিল। পিঠে মুখ গুঁজে শুয়েছিল। হাত দিলেই নাগাল পেত। কুসুমের কি দুঃখ! রাতে স্বপ্নে সে দেখা দেয়।

ঘুম ভেঙে গেলে বোঝে, আসলে সে খুব একা। একা থাকলে ভয় লাগে। দিনের বেলাটা তবু কেটে যায়। অফিসে সে পাগলের মতো কাজ করতে ভালবাসে। পাগলের মতো কাজ না করেও তো উপায় নেই। কাজ ছেড়ে বের হলেই টের পায় তার মন কেমন ভার হয়ে গেছে। বাসায় ফিরে সে দেখবে কেউ নেই ঘরে। অথচ লতাপাতা আঁকা পর্দা জানালায় ওড়ে। বসার ঘরে কাজের ছেলেটা এক কাপ চা রেখে যায়। বোঝে, বাবুর মর্জি হলে খাবে, না হলে চুপচাপ বাবু জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সিগারেট খাবে। কাজের ছেলেটা কিছুটা বেকুফ। কথাবার্তায় সে টের পায়। নতুন আমদানী। শ্যামলদা তার দেশ থেকে এনে দিয়েছে। সে একেবারে নাকি লক্ষ্মীছাড়া—নির্বোধ বলেও তাকে গাল দেয়। অন্তত পাহারা দেবার জন্যও একজন লোকের দরকার। তাকে না হোক বাড়িটার পাহারা খুবই দরকার।

বাড়ি না ফ্ল্যাট, না বাসা! যে কোনো নামে সে তার আস্তানাতে ফিরে আসতে পছন্দ করে।

কিরে কেউ এসেছিল?

কে আসবে?

আমার কি কেউ নেই ভেবেছিস? কে আসবে বলছিস? দ্যাখ অমর, তোকে একটা কথা বলে রাখি, তিনি যে কোনোদিন চলে আসতে পারেন। এসে যদি দ্যাখেন ঘরদোর পরিষ্কার নেই, টেবিলে ধুলো পড়ে আছে, খুব কিন্তু রাগ করবেন।

আমি তো বসে থাকি না দাদা।

বসে থাকিস না শুয়ে থাকিস, আমি দেখতে যাই না। সারাটা দিন কি করিস! টি. ভি খুলে বসে থাকিস, টিভির ঢাকনা টেনে দিতে মনে থাকে না। তিনি এলোমেলো স্বভাবের লোক একদম পছন্দ করেন না বুঝলি!

অমর জানে দাদার এটা অসুখ। বাড়ি ফিরেই দাদার এক কথা—কিরে কেউ এসেছিল? কোন ফোন!

মাসখানেক ধরে অমর আছে। দাদা খুব খেয়ালী মানুষ। খুব গম্ভীর তাও না। দাদার চরিত্র বুঝতে তার সময় লাগেনি।

এই তো যেদিন এল সে।

তোকে শ্যামলদা পাঠিয়েছে? দাদাবাবুর এমন প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।

বাবু না, বাবু না। বাবু বলে ডাকলে সম্পর্ক হয় না। কোনো চিঠি আছে? যা দিনকাল—

আছে।

আছে তো দেখাসনি কেন? নাম কি?

অমর।

খুব ভাল নাম। অমর। তা তুই থাকতে পারবি একা? বাসায় কিন্তু কেউ আর থাকে না। একা সারাদিন বাসায় ভাল লাগবে তোর? আমার তো ভাল লাগে না। রাত করে ফিরি। ঘুম থেকে বেলায় উঠি। কি রে ভাল লাগবে তো?

লাগবে।

অবশ্য টিভি আছে। ওটা খুলে বসে থাকতে পারিস্। সময় কেটে যাবে।

কোনো কাজের কথা না। তাকে কি কাজ করতে হবে তার কথাও না। সে থাকতে পারবে কিনা এই নিয়েই দাদার সংশয়।

তুই খুবই ছেলেমানুষ। মা-বাবার জন্য মন খারাপ করবে না তো আবার। শ্যামলদার যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে। আরে আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। সকালে চা জলখাবার। অফিসে লাঞ্চ। রাতে, তা একরকমের কিছু হলেই হয়ে যায়। তা তুই থাকতে পারবি তো?

পারব।

পারবি বলছিস, পরে ভেগে গেলে জেলে দেব বুঝলি!

অমর খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল, জেল হাজতের কথা আসে কেন! সে পালিয়ে যাবেই বা কেন! বাল না লাগলে সে তো বলেই যাবে। না দাদা বাড়ির জন্য মন খারাপ, আমার মন টিকছে না। আমাকে ছুটি দিন।

অমর বোঝে শ্যামলবাবুর কথাই ঠিক। বদ্ধ উন্মাদ। কথার কোনো ছিরিছাঁদ নেই। কাজের লোকের সঙ্গে এভাবে কেউ কথাও বলে না। লোকে ভাল কাজের লোক যখন তখন পাবে কোথায়! কতরকমের ভুজুং ভাজুং দিয়ে কাজের লোক রাখার চেষ্টা হয় তাও সে জনে। আর এ-বাবু যেন তাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। সে বাবুর কথাবার্তা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল। বদ্ধ উন্মাদ না হোক, খুব একটা স্বাভাবিক না। তবে শ্যামলবাবু বলেছে, সোজা সরল মানুষরা সংসারে বাতিল হয়ে পড়ে। তথাগত এই একটা গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে বুঝলি! ওকে দেখে শুনে ঠিকঠাক না রাখতে পারলে তোকে আমিই তাড়াব। কি করে না করে ফোনে আমাকে জানাবি। রাতে ফিরে না এলে খবর দিবি।

শোন অমর, আমাকে দাদা বলে ডাকবি। ছোট ভাইটির মতো থাকবি। সুবিধা অসুবিধা বলবি। বাড়িটা আসলে তোরই বুঝলি। আর তিনি এলে তাঁর। নিজের বাড়ি বুঝলি—কোনো কুণ্ঠা রাখবি না। কি খেতে তোর ভাল লাগে বলবি, সেইমতো বাজার করব। তোর যা পছন্দ, আমারও তাই পছন্দ। চিঠিটা রেখে দে। পড়া হয়ে গেছে।

কোথায় রাখব?

রাখ না, কত জায়গা, যেখানে খুশি রেখে দে। শ্যামলদা এসে যদি বলে, চিঠিটা তার দরকার, ফেরত দিতে হবে না!

অমর নিজেই চিঠিটা টেবিলে রেখে দিল। ফ্যানের হাওয়ায় ওড়াউড়ি, তারপর চিঠিটা সে দাদার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে। শ্যামলবাবু পরের রবিবারেই হাজির। কাজকর্ম ঠিক করতে পারছে কিনা দেখতে এসে অবাক। দাদা চা করে তাকে দিচ্ছে শ্যামলবাবুকে দিচ্ছে।

কি রে পাঁপড় ভাজা খাবি! করে দিচ্ছি।

এই শোন।

আমাকে ডাকছেন শ্যামলদা? দাদা কিচেন থেকে উঁকি দিয়েছিল।

তোর কাছে এলাম, আর কিচেনে ঢুকে আমার চা জলখাবার করে দিয়ে যাচ্ছিস! তুই কিরে? অমর, অমর! অমর আছে কি করতে!

আজ্ঞে যাই বাবু।

তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাবু করে দিচ্ছে, আর তুই বাড়ির কর্তার মতো গিলছিস!

আমি কি করব, দাদা না দিলে! কিছু করতে দেয় না। এক কথা, আগে দ্যাখ অমর। দেখে শেখ। তোকে তো শেষে করতেই হবে। তিনি এলে একদণ্ড তোকে ফুরসত দেবেন না।

তিনি আর আসেছন! বুরবক। শ্যামলবাবু গজগজ করছিল।

বুরবক কাকে বলেছিল, তাকে না দাদাকে অমর বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটা বুঝেছিল, শ্যামলবাবুর কথায় দাদার মুখ শুকনো দেখাচ্ছিল। চোরের মতো মনে হচ্ছিল। ছিঁচকে চোর ধরা পড়লে যেমনটা হয় আর কি! ভিতরে দাদার বড় কষ্ট, এও টের পেয়েছিল। কারণ দাদা কেমন কথাটা শুনে জুবুথুবু হয়ে গেল। কিচেনে আর গেল না। শ্যামলবাবুর পাশে সোফায় বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

অমরের খারাপ লাগছিল। তার চা জলখাবার দিয়েছে দাদা, শ্যামলবাবুরটাও দিয়েছে। যেন অমর মেঝেতে বসে না থাকলে কে মনিব বলা খুবই মুশকিল। সে শ্যামলবাবু এসেছে বলেই মেঝেতে বসেছে। না এলে পাশাপাশি সোফায় বসে একসঙ্গে খেত। তবে দাদার সতর্ক কথাবার্তারও শেষ ছিল না।

সুখ করার যা করে নে। তিনি কাজের লোকদের আস্পর্ধা একদম পছন্দ করেন না। খবরদার তিনি এলে তুই কখনও আমার পাশে বসবি না। মেঝেতে না হয় টুলে বসবি। কি খেয়াল থাকবে তো? তিনি যা পছন্দ করেন তাই করবি কেমন। কিভাবে কাপ্ প্লেট ধুতে হয়, প্লেটে যেন চা না পড়ে। প্লেটে চা থাকলে মেজাজ গরম, বুঝলি। দেখে শেখ। আমি করছি সব। পাশে থাকবি। দেখে সব শিখে রাখবি।

আসলে অমর এমন ল্যালা ক্ষ্যাপা মনিব পেয়ে খুশি। সে যতটা পারে, কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। কারণ কোনো কাজই দাদার পছন্দ না।

না না, ওখানে ফুলদানি রাখবি না। এই দ্যাখ, বলে একটা সাদা গোল মতো প্লাসটিকের রেকাবি বের করে দিল। এটার ওপর রাখবি। দেখছিস না, জলের দাগ লেগে যায় চাদরে। জলের দাগ একদম পছন্দ করেন না তিনি।

অমর বোঝে এই বাড়িতে কেউ একজন ছিলেন যাঁর জন্য দাদার দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। দুশ্চিন্তায় এখনও ভুগছে। তবে সে জানে না সে কে! তিনি যে কে এটাই সে বুঝতে পারে না। বৌদিমণি হলেও তিনি কেন এখানে নেই, বুঝতে পারে না। দাদার শিয়রের টেবিলটায় ফুলদানি রাখার জায়গা, দাদা অফিসফেরত রজনীগন্ধার ঝাড় নিয়ে আসে। ফুলদানিতে যত্ন করে রাখে। পাশে সুন্দর এক যুবতীর ফটো। ইনিই যে বাড়ির সেই গৌরব বুঝতে অসুবিধা হয় না। সম্পর্কটা কি সঠিক জানে না। দাদাকে বলতেও সাহস পায় না। শ্যামলবাবু শুনলে ক্ষেপে যেতে পারে। চাকরিটা খেতে পারে। যদি কোনো কেচ্ছা হয়, তবে তো কথাই নেই।

দাদা, কার ফটো?

কেউ হবে। চিনে নিতে পারিস কিনা দ্যাখ।

অমর বোঝে তার কৌতূহল শেষে বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়।

না চিনতে পারছি না। বলুন না কে হন আপনার?

যখন চিনতেই পারছিস না, কে হন আমার জেনে কি হবে?

অমর দাদাকে ভয় পায় না, শ্যামলবাবুকে ভয় পায়। কে হন, বলে বোধহয় ঠিক কাজ করেনি। বোকার মতো চুপচাপ থাকাই শ্রেয় ছিল। তবু সে বোঝে দাদাবাবু মানুষটি কখনও বলতে পারে না, তোর এত জানার আগ্রহ কেন? দাদাবাবুর আপত্তি থাকলে জবাবই দিত না। সে কিঞ্চিত সাহস পেয়ে গেল।

বৌদিমণি?

ধুস, বৌদিমণি তোর আরও সুন্দর। দেখিস্নি! দেখলে চোখ ফেরাতে পারবি না, বুঝলি!

এমন কথাবার্তা যে মনিব বলতে পারে, তার কাছে নানা অসশকারা আশা করাও অন্যায় নয়। এই আশকারা পেয়েই সে বসার ঘরে শ্যামলবাবুর পাশে বসে থাকতে সাহস পেয়েছে। শ্যামলবাবু চা জলখাবার খাবে, না খাবে না, সে দাদার কাছে জানতেও চায়নি। দাদা এর ফাঁকে, তোরা বোস বলে, কিচেনে ঢুকে এত সব করে নিজ হাতে নিয়ে আসবে সে ভাবতেই পারেনি। শ্যামলবাবু ক্ষুব্ধ হতেই পারে।

কিন্তু আশ্চর্য শ্যামলবাবু তাকে বিন্দুমাত্র অনুযোগ করার সাহস পায়নি। হয়তো দাদা পছন্দ করে না, তার বাড়ির কাজের লোক কি করছে না করছে তা নিয়ে অন্য কেউ মাথা ঘামাক।

শ্যামলবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাদাকে দেখছিল। দাদা চা কিংবা খাবার কিছুই মুখে তুলছে না। বসেই আছে।

শ্যামলবাবু কি ভেবে শুধু বললে, তোর মাত্রাজ্ঞান এত কম জানতাম না। রূপার কোনো দোষ নেই। এমন মানুষকে নিয়ে ঘর করা প্রকৃতই মুশকিল।

বৌদিমণির নাম রূপা সেই থেকে টের পেয়েছিল।

আর আশ্চর্য শ্যামলবাবু তার সম্পর্কে দাদাকে সেদিন কোনো প্রশ্নই করেনি, সে কাজ ঠিকমতো করতে পারছে কিনা—কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কোনো প্রশ্নই না।

ওঠার সময় শুধু দাদাকে বলেছিল, চল ভিতরে। কথা আছে।

দাদার ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল শ্যামলবাবু। কি কথা বলবে, তার সম্পর্কে কোনো কথা, অর্থাৎ চোখের উপর কাজের লোকের এতটা আস্পর্ধা শ্যামলবাবু সহ্য করতে নাও পারে।

বাড়িটা একতলা। বাড়িটায় এমন সব জায়গা আছে যেখানে দাঁড়ালে যে কোনো ঘরের কথা যত আস্তেই হোক শোনা যায়।

সে কদিনেই তা টের পেয়েছে। সে জানে, চাতালে দাঁড়ালে, দাদা এবং শ্যামলবাবুর কথা শুনতে পাবে। চাতালের পাশে সজীব শিউলিগাছ। শরৎকাল এসে গেছে। নীল আকাশ এবং কিছুদিন পর ঢাকের বাদ্য বাজবে। অথচ এ-বাড়ির একটা গোপন দুঃখ আছে, সেটা যে কি, এই দুঃখ টের পাবার জন্য কিংবা তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের সংশয়ে সে শিউলিগাছটার আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

গাছে ফুল এসেছে।

দুটো একটা ফুল সকালের হাওয়ায় দাদার বিছানায় এসেও উড়ে পড়ে। সে বিছানা তোলার সময় দেখেছে, ফুলগুলি ফেলে দিলে দাদা খুব রাগ করে। ফুলগুলি তুলে একটা সাদা রেকাবিতে দাদা রেখে দেয় এবং ফটোর কাছাকাছি থাকে ফুলগুলি। চাতালে উড়ে এসে পড়ে কিছু ফুল। কেমন এক বর্ণময় হয়ে থাকে চাতালটা সারা সকাল। ফুলগুলি ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিলেও দাদা রাগ করে। সাঁঝবেলায় দাদা অফিস থেকে ফিরে এসে বাসি বিবর্ণ শুকনো ফুলগুলি জড় করে তুলে রাখে। তারপর বাইরের রাস্তায় না ফেলে, ফুলগুলি গাছের গোড়ায় ঢেলে দেয়।

শিউলি গাছটার আড়ালে দাঁড়াবার সময় এ-সব মনে পড়ল। গাছটা দাদার জানালার দিকে ঝুঁকে আছে. চাতালের উপর কিছু ডালপালা মেলা। এই ফুল তুলে নিয়ে যায় সকালে চম্পাবতী নামে একজন কিশোরী। পাশে ঠিক বাগান পার হয়ে চম্পাবতীর বাড়ি।

শিউলি গাছের ফুল যে কেউ খুব সকালে চুরি করে নিয়ে যায় দাদা জানে না। উঠতে বেলা হয়। সে ডেকে চা না দিলে দরজা খোলে না। সকালে এই একটা বিড়ম্বনা আছে বাড়িতে, সে টের পেয়েছিল পা দিয়েই।

ডাকাডাকি করতেই দাদা তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। দাদা রাগ করতে জানে না। বেশ অমায়িক গলায় বলেছিল, অমর, দরজা না খুললে আমায় চা দিবি না। সুন্দর স্বপ্নটা দিলি তো নষ্ট করে!

কি স্বপ্ন, দাদা কী স্বপ্ন দেখে সে জানে না। দাদার চোখ মুখে সুন্দর স্বপ্নের রেশ লেগে আছে সেদিনই টের পেয়েছিল—না হলে একজন মনিবের মুখ সকালে এত প্রসন্ন থাকার কথা না। ঘুম ভাঙিয়ে দিলে কার না রাগ হয়! সেদিনই টের পেয়েছিল, দাদার ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। ঘুম ভাঙার আগে দাদা সুন্দর স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। স্বপ্নটা যে কী সে জানে না। আর একই স্বপ্ন কে রোজ রোজ দেখে! দাদাও নিশ্চয় দেখে না। এক একদিন এক একটা স্বপ্ন দেখে বোধ হয়। স্বপ্ন সেও দেখে মাঝে মাঝে। তবে তার স্বপ্ন দেখার বিলাস নেই। গরীব মা-বাবা ভাই-বোনের দুঃখ সহ্য হচ্ছিল না। শহরে যে কোনো কাজ নিয়ে আসতে পারলে শেষ পর্যন্ত ঠিক কিছু একটা হয়ে যাবে। দাদার কাছে এসে সে যে ভুল করেনি, তাও তার মনে হয়েছে। তবে বৌদিমণি এলে কপালে কি আছে জানে না।

শ্যামলবাবুর কথাবার্তা সে অবশ্য কিছুই শুনতে পায়নি। যাবার সময় বলেছিল, দাদা তোর খুব

ভাল মানুষ। ভাল মানুষকে জলে ডোবাস না। পাপ হবে।

শ্যামলবাবু কেন যে পাপের কথা বলে গেল সে বোঝেনি সেদিন। সকালে উঠে সে ফ্রিজ থেকে দুধ বের করে রেখেছে। মাছ বের করে রেখেছে। বাজার সপ্তাহে দু-দিন করলেই হয়। ডিমসেদ্ধ ভাত আর সামান্য মাছের ঝোল করে দিলে দাদার অমৃতভোজন। কিন্তু সকালের চা দেওয়া গেল না। বেলা কতটা হয়েছে দেখা দরকার। সে দরজা খুলে করিডোর পার হয়ে বাড়ির বাইরে নেমে গেল। বসার ঘরের টেবিল ঘড়িটা কতদিন থেকে চলছে না কে জানে! দেয়ালঘড়িতে ব্যাটারি শেষ। ঘণ্টা মিনিটের কাঁটা থেমে আছে। দাদার হাতঘড়িটা ছাড়া সচল ঘড়ি বলতে, শিউলি গাছ পার হয়ে বাগানের ওপারে পাঁচিল এবং রেললাইনের মাথায় সিগনেলিং, সাতটার ট্রেন ঢোকেনি তবে! সিগনাল ডাউন হয়নি। বেলা খুব একটা হয়নি—আসলে খুবই সকালে ওঠার অভ্যেস তার। বসে বসে হাতে পায়ে খিল ধরে যায় যেন।

আজ কি স্বপ্ন দেখছে? বৌদিমণির সঙ্গে কি পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অথবা নদীর পাড়ে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। নানা বর্ণের ফড়িং প্রজাপতিরও ওড়াউড়ি থাকতে পারে। অথবা যদি দ্যাখে বৌদিমণি কোনো বনভূমিতে হারিয়ে গেছে। পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি—স্বপ্নে কত কিছুই দেখা যায়। তার আর ডাকাডাকি করতে স্পৃহা হয় না। তার হাই উঠছে। নিজের চা-টা করে খেয়ে নিলে হয়। তাই করা ভাল। দাদা অন্তত নিশ্চিন্তে স্বপ্ন দেখাটা শেষ করুক। ডাকাডাকি করে জাগিয়ে দিয়ে নিজের আর পাপ বাড়িয়ে লাভ নেই।

তারপর তথাগত আর কিছুই দেখতে পায় না।

ঘুমোর ঘোরে সে চাদরটা শরীরে টেনে দেয়।

দু'জনের কেউ আর স্বপ্নে নেই। না বুড়োমানুষ, না চাষ-আবাদের মানুষ। সে কুসুমকে খোঁজাখুঁজি করছে। কুসুম গেল কোথায়! সব ঠিকঠাক আছে। গোয়ালে গরু, ধানের বিছন, ছোট টালির ঘর, এমনকি একটা নারকেল গাছ, কুল গাছ সব আছে। ঝোপ-জঙ্গল বাড়িটার পেছনে। জঙ্গলে ঢুকলে হয়। যদি কুসুম জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

না কুসুম কোথাও নেই।

স্বপ্নে মানুষজন থাকলে ভয় থাকে না। নদীর পাড় থাকলেও মন্দ না, কিন্তু একা কেন সে!

তথাগত চোখ মেলে তাকাচ্ছে আবার ঘুমের ঘোরে চোখ বুজে ফেলছে। আসলে স্বপ্নটা জড়িয়ে আছে বলেই তার ঘুম ভাঙবে না। স্বপ্ন না থাকলে তার যে কি একা লাগে! বাড়িটায় সে থাকতে ভয় পায়। এত একা থাকতে তার ভালও লাগে না।

তখনই মনে হলো সে আছে নিজেই একা। একাকীত্ব নিয়ে সে কি করবে! বালকের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কবে যে কে কখন এই বাড়িটায় তাকে তুলে আনল সে যেন জানেই না।

কারো মুখ মনে পড়ছে না।

না মার, না বাবার।

তারা কোথায়! সে সত্যি এবার হয়তো কেঁদে ফেলত, আর তখনই দরজার ওপাশ থেকে কেউ ডাকছে।

দাদা উঠুন। অফিসে যাবেন না।

এত বেলা হয়ে গেল!

তথাগত ধড়ফড় করে উঠে বসল। টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে। হাতঘড়িটা তুলে দেখল।

ইস কত বেলা হয়ে গেছে!

সে সোজা বাথরুমে ঢুকে যাবার আগে বলল, অমর, তুই আগে ডাকবি তো! এখন কোনদিকে কি সামলাই বলতো!

আপনি যে রাগ করেন দাদা!

আমি আবার কখন রাগ করি!

স্বপ্নটা মাটি করে দিলি, বলেন না!

তুই স্বপ্ন দেখিস না? সুন্দর স্বপ্ন ভেঙে গেলে কার না ক্ষোভ হয়!

দেখি তবে ভুলে যাই।

আমি যে ভুলে যেতে পারি না। ভাত হয়ে গেছে?

আপনি চানে যান দাদা। আপনার কিছুই খেয়াল থাকে না। শিউলি গাছটায় ফুল ফুটেছে, ঝরে পড়ছে, আকাশ মেঘলা নেই—শরৎকাল এসে গেছে। আপনি বুঝতে পারেন না কিছু। ফুল চুরি যায় তাও জানেন না।

কে চুরি করে?

চম্পাবতী।

ও চাঁপার কথা বলছিস! ও ফুল কখন নেয়? কখনও তো দেখি না, ওকে কতদিন দেখি না। ও তো মামারবাড়িতে আছে। এল কবে?

আপনি কিছু মনে রাখতে পারেন না, সেদিন যে চাঁপার সঙ্গে কথা বললেন! স্কুলে যাচ্ছিল, ডাকলেন, না, এই চাঁপা—তোমার খবর কি? কবে এলে? এখন বাড়ি থেকেই পড়বে? কোথায় ভর্তি হচ্ছ? মাধ্যমিকে নাকি দারুণ নম্বর। খাওয়াবে না! কত কথা বললেন, আর বলছেন কি না, কতদিন দেখি না।

তথাগত খুবই অপ্রস্তুত। তার ধীরে ধীরে মনে পড়ছে সব। সত্যি তো সে এত ভুলে যায় কেন। রূপা চলে গিয়ে তাকে খুবই বেকুফ বানিয়ে দিয়েছে। সে তো কিছুদিন দরজা জানালাও বন্ধ করে বসে থাকত। দিদিরা এসেছিল তখন। দুই দিদি পালা করে থেকেছে। বড় জামাইবাবু তাকে নিয়ে ঘোরাঘুরিও করেছে। সে যত বলে, তার কিছু হয়নি, সত্যি তো তার কিছু হয়নি—কোনো অস্বস্তিই নেই তার শরীরে। তবে কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ বোধ করত না। কেমন জরদগব হয়ে যাচ্ছিল। ওষুধ খেয়ে ভাল আছে। অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, বাড়িতে সারাদিন বসে থেকে কেমন ভীতু হয়ে যাচ্ছিল—বাইরে বের হতে ভয় পেত। কেবল মনে হতো, কোথাও গেলে সে হারিয়ে যাবে। পথ চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। ফিরতে পারলে রূপার সঙ্গেও আর দেখা হবে না। এই এক পীড়নবোধ থেকে সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতেই চাইত না।

অবশ্য ওষুধ খেয়ে সে ভাল আছে। তার আগে চোখে ঘুম ছিল না, ঘুম কি বস্তু ভুলে গিয়েছিল।

এখন সে শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। ইদানিং একজন বুড়োমানুষ এবং কুসুম তাকে শুধু স্বপ্নে তাড়া করছে। বুড়োমানুষের স্বপ্ন দেখলে, বেঁচে থাকার আগ্রহ থাকে না, সে বোঝে তাই বোধহয় সে একজন চাষীবৌর স্বপ্নও দেখে। কুসুম তার নাম।

সে বাথরুমে ঢুকে বুঝল, আজেবাজে চিন্তা না করে, এবার খোঁজাখুঁজি করাই ভাল। ক'দিন ছুটি নিলে কেমন হয়।

সে মগে করে জল ঢালছিল মাথায়। তার স্নান আহার দ্রুত সেরে ফেলা দরকার। গা মুছে, কাঁধে তোয়ালে ফেলে বের হয়ে বলল, শোন অমর, আমার ফিরতে দেরি হতে পারে। অফিস থেকে বের হয়ে এক জায়গায় যাব।

কোথায় যাবেন?

তথাগতর রাগ হয়। বাড়ির কাজের লোকের এত আস্পর্ধা ভাল না—রূপা থাকলে ঠিক একথা বলত। সে কোথায় যাবে, না যাবে জানার সাহস হয় বেশি আসকারা দিয়েছে বলে।

সে তাড়াতাড়ি টেবিলে খেতে বসে গেল। সে কোথায় যাবে অমরের কাছে শেষে কৈফিয়ত দিতে হবে! কিন্তু অমর যদি রাগ করে। বাড়িটা তো এখন অমরই আগলায়। তাকে ভাত জল দেয়। তার জামাকাপড় কাচাকাচি করে। ঘর মোছে, টেবিল সাফসুতরো রাখার বিষয়ও অমর কম যত্নবান নয়। এই যে গরম ভাত, মুগের ডাল, আলু ডিম সিদ্ধ, মাখন, কাঁচালঙ্কা এবং পারশে মাছ ভাজা সাজিয়ে দিয়েছে, অমর না থাকলে কে দিত?

অমর ফের বল, কোথায় যাবেন বললেন না তো!

নাছোড়বান্দা। অমর বোঝে না, সব কথা সবাইকে বলা যায় না। রূপার খোঁজে যাবে। রূপা যে

তার বিয়ে করা স্ত্রী অমর জানে না। এ বাড়ির আসল মালিক রূপা। রাগ করে চলে গেছে। রাগ না অভিমান—যাই হোক সে খোঁজাখুঁজি করলে রূপা ঠিক বুঝবে এতদিন পরও সে আশা করছে রূপা ফিরবে। কোনো মেয়েকে যদি তার স্বামী খুঁজে বেড়ায়, তার মন একদিন না একদিন নরম হবেই। যুবক-যুবতীরা তো বিছানায় একসঙ্গে সবসময় শুতে ভালবাসে। রূপা ভালবাসবে না, হয় না। আর শোয়াটাই যখন বড় কথা, তখন ভালবাসার দাম কতটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। ভাল না বাসলে শোওয়া যায় না, সে এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারে না। ভালবাসা যদি শোওয়ার প্রাথমিক শর্ত হয় তবে তার দিক থেকে কোনো অপরাধই নেই। সে রূপাকে পাগলের মতো ভালবাসে। তার ভালবাসার পরিমাণ খুবই বেশি—এতটা ভালবাসা নাকি মেয়েরা সহ্য করতে পারে না।

শ্যামলদা একদিন ক্ষেপে লাল।

কি ভেবেছিস? এ-ভাবে কাউকে রাখা যায় না। উড়ে যাবে যখন যাক। শক্ত হ।

কি শক্ত হতে বলছ বুঝছি না।

শোন তথাগত, লেবু বেশি টিপলে তিতো হয়ে যায়।

আরে আমি বেশি টিপলাম কই! টিপিই না। টেপাটেপি করলে ও ব্যথা পাবে না!

সে বোকার মতো শ্যামলদার দিকে তাকিয়ে থাকলে, শ্যামলদা হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছিল না বোধহয়। তারপর কেন যে হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল ; তোর কি হবে রে বাঞ্ছারাম। তোর বাগান যে শুকিয়ে যাচ্ছে। এত সরল সহজ হলে সংসার চলে! জানিস তো ঠাকুর বলেছে, রসে বশে রাখিস মা। তুই রসে বশে থাকতে নিজেও জানিস না, বৌকেও রাখতে পারিস না। বৌর কাছে জী হুজুর হয়ে থাকলে চলে?

ও যে চলে যাবে বলছে।

চলে যাবে কেন?

ওর ভাল লাগছে না।

ভাল না লাগে বাপের বাড়ি ঘুরে আসুক।

বাপের বাড়ি যেতেও চায় না।

কোথায় যাবে তবে ঠিক করেছে?

কোথায় যাবে জানি না। তবে প্রায়ই বলে, চলে যাব। তুমি কেন আমাকে বিয়ে করলে বল। কেন কেন!

তুই কি ওকে খুশি করতে পারিস না।

কি যে বল শ্যামলদা। এই তো সেদিন অফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই বলল, চল বের হব। ওকে নিয়ে এস্টারে গেলাম। ও যা যা খেতে চাইল খাওয়ালাম।

ধুস গাধা। খুশি মেয়েরা বিছানায় হয় বুঝলি। বিছানা ঠিক না থাকলে, কোন বউ কার ঘরে থাকে! এস্টারে খাওয়ালেও থাকে না।

সে শ্যামলদার কথায় ভারি লজ্জায় পড়ে গেছিল।

বলেছিল, যাও,—কি যে বল না। ও-সব কিছু না। আসলে ও আমাকে ভালবাসতে পারেনি। ভালবাসতে না পারলে থাকে কি করে! শরীরের সঙ্গে মন থাকে বোঝা। ওর শরীর ছিল মন ছিল না। আমি ওকে দোষ দিই না।

দ্যাখ বাঞ্ছারাম, যে তোকে চায় না, তাকে তোরও চাওয়া উচিত নয়।

শ্যামলদা তার উপর বিরক্ত কিংবা করুণা বোধ করলে বাঞ্ছারাম ছাড়া সম্ভাষণ করে না। তার যে বাগান ছাড়া অবলম্বন নেই বুঝলেই খাপ্পা। তার দিদিরা বুঝিয়েছে, শ্যামলদা বুঝিয়েছে, যে গেছে তাকে যেতে দেওয়াই ভাল।

দিদিরা বলেছে, মন থেকে মুছে ফেল। তুই রাজী হ, কত মেয়ে তোর পায়ের কাছে গড়াগড়ি খায় দ্যাখ!

দিদিরা আরও বলেছে, আরে মেয়েদেরও হাঁচি কাশি থাকে। অসুখ থাকে। তুই তোর বউকে যে

দেবী ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলি। বিয়ে করলে স্ত্রীর প্রতি কার না টান হয়। তাই বলে একেবারে ছেলেমানুষের মতে বউপাগলা হয়ে গেলি।

শ্যামলদা বলতেন, এত বউপাগলা হলে আর রূপারই বা দোষ দিই কি করে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ আত্মসচেতন পুরুষকেই মেয়েরা পছন্দ করে। এমন ফ্যাকলু পার্টি হলে ছেড়ে যাবে না তো পায়ে তোমার ফুল বেলপাতা দেবে!

দাদা রূপা আমার স্ত্রী।

তাতে কি হয়েছে!

ওর সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেছি।

সে কি তোর সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গাধা কোথাকার!

দাদা, একটা কথা বলব।

বল।

রূপা কিন্তু আমাকে সব খুলে বলেছে। ওকে তোমরা অযথা দোষ দিও না।

কি বলেছে?

বললে ওকে ছোট করা হবে। ওর আত্মীয়স্বজনেরা জানত। জেনেও কেন এমন একটা বিশ্রী সর্বনাশ করল তার বুঝি না।

আত্মীয়স্বজন বলতে কি বুঝছিস—কারা তারা?

ওর বাবা-মা।

কি জানত?

ও একজনকে ভালবাসে।

ও-রকম ভালবাসা সব মেয়েদেরই থাকে। পুরুষেরও থাকে। বিয়ে হলে ছেঁড়া ঘুড়ির মতো কেটে যায়। বাতাসে লটরপটর করতে করতে উড়ে যায়। তারপর দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। মেয়েরা বড় হবে, কাউকে ভালবাসবে না, হয়? ওটা কোনো কথাই নয়। অজুহাত। আসলে তুই নিজের দিকটা ভাবিস না—আসকারা দিলে কার মাথা ঠিক থাকে! বিগড়ে যেতেই পারে। তোর শক্ত হওয়া উচিত ছিল।

ওর দিকটা বুঝবে না।

আমার বোঝার দরকার নেই। তোর বৌদি বলতে সাহস পাবে, সে একজনকে ভালবাসত! তুলকালাম ঘটে যেত না।

তুমি জানো না দাদা, ও কতটা ভেঙে পড়েছিল। কখন যে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে যেত নিজেও বুঝতে পারত না। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত। যেন সে কোন সুদূরে চলে গেছে—ডেকেও সাড়া পেতাম না। টেবিলে খেতে বসে খেতে পারত না। অরুচিতে ভুগত। আমার কষ্ট হতো।

বেকুফ। কষ্ট তোর হত, তার হতে পারত না। তার হল না কেন! সে চলে গেলে, তুই জলে পড়ে যাবি সে কি বুঝত না মনে করিস। তারও কি ভাবা উচিত ছিল না, যা হয়ে গেছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সংসারে মন বসাতে মেয়েদের মতো এত ক্ষমতা পুরুষেরও নেই। পারল না কেন?

তথাগত চুপচাপ থাকলে বলত, পারল না তার মানে, তুই আসকারা দিয়েছিস। বিয়ে এবং তার পরবর্তী জীবন মানুষের একটি যুদ্ধক্ষেত্র। হরেদরে দু-পক্ষেরই হারজিত থাকে। হেরে গেলেও আনন্দ, জিতে গেলেও আনন্দ। মানুষের পারিবারিক জীবন এই রকমেরই। কোন পুরুষ সারাজীবন এক নারীর ঘর করে—কোন মেয়েই বা এক পুরুষকে নিয়ে খুশি হয়! সব মেয়ে পুরুষেরই দ্বিতীয় নারী কিংবা পুরুষ থাকে। অথচ তাতে সংসার আটকায় না। মনের মানুষ না স্বামী, না স্ত্রী—অথচ স্বামী-স্ত্রী ছাড়া সংসার অচল বুঝিস!

তুমি বলছ ভালবেসেও স্বামী-স্ত্রী হতে আটকায় না। রূপা অন্য কাউকে ভালবেসেও আমার কাছে থাকা উচিত ছিল—তার চলে যাওয়া উচিত হয়নি।

না। উচিত হয়নি।

আমি তো বুঝিয়েছি। কত বলেছি, কে সে? তাকে একদিন বল না, আমার এখানে খেতে। আলাপ

করি। চুপ করে থাকত। একদিন চেপে ধরায় বলেছিল, তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেও নাকি হারিয়ে গেছে।

কি করে ছেলেটা!

তা জানি না।

ওরা বাবা-মার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বল। তাঁরা কি বলেন!

বলেছি তো। তাঁরা তো বলেছেন, তাঁরাও দেখেনি। কে সে তাঁরাও জানে না। নিখোঁজ হবার পরও দেখছি, ওঁদের কোনো হায় আফসোস নেই। থানা পুলিশ করলাম না। রূপাকে খুঁজে বের করবে পুলিশ ভাবতেই খারাপ লাগে। রূপা তো ভাবতে পারে, শেষে পুলিশ লেলিয়ে দিলে...তুমি এত অমানুষ!

না, বুঝছি না কিছু। চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল, মেয়েটার পাত্তা নেই—এটা কেমন কথা! ওর বাবা-মা ঠিক খবর রাখে। মান-মর্যাদা বুঝিস! মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ওঁরা হয়তো ভাবেন। নষ্ট মেয়ের খোঁজ করতে চান না। কারণ তাঁরা তো জানেন সে ভালই আছে। এটা ভেবে পাই না, রূপা তার অমতে আগুনের সামনে বসে গেল কেন! সে তো কচি খুকি নয়! বিয়ের গুরুত্ব কত বুঝবে না! বাবা-মার মনে কষ্ট দিতে চায় না। সুবোধ বালিকা সেজে পিঁড়িতে বসে গেল—আশ্চর্য। ভাল না, ভাল না। একদম ভাল না। তোর জীবন নষ্ট করে দিয়ে রূপা ফূর্তি লুটছে।

না দাদা, প্লিজ, রূপা ওরকমের হতেই পারে না। ওকে খারাপ ভেব না। ওকে খারাপ ভাবলে আমিও খারাপ হয়ে যাই। আমার কষ্ট হয়।

থাক তোর কষ্ট নিয়ে। আসলে মাথাটা তোর বিগড়ে গেছে। রূপা ক'মাসেই তোর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে। কী যে ইচ্ছে করছে না। থানা পুলিশ তুই না করিস, আমি করব। মেয়েদের এত স্বাধীনতা ভাল না বুঝলি। আসলে লিভিং টুগেদার করছে। ও করতে পারে, তুই পারিস না। তোর এত মিনমিনে স্বভাব হলে বাঁচবি কি করে!

দুটো চিঠি পড়ে আছে। মনে হয় হাত চিঠি। ঠিকানা নেই।

চিঠির কথা তো বলিসনি? এতদিন পর মুখ খুললি?

স্ত্রীর চিঠি গোপন রাখতে হয় জান!

আকে হতভাগা, চিঠি তো তোর স্ত্রীর নয়, তার প্রেমিকের।

তুমি যে কি বল না দাদা। চিঠিটার কথা বললে রূপা ছোট হয়ে যেত না? ওর অপমান হতো না? চিঠির কথা প্রকাশ করে দিয়ে ওকে অপমান করতে পারি না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তবে নষ্ট হয়ে যায় না? ওর ভুলভ্রান্তি সামলে নিতে না পারলে ওকে আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করলাম কেন?

শ্যামলদা কেন যে রূপার কথা শুনলেই ক্ষেপে যায়। একদম তাকে সহ্য করতে পারে না। রেগে গিয়ে কেন যে বলল, শোন হতভাগা, রূপা উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। আমি ওকে ছাড়ছি না। ওর বাবা মাকেও না।

প্লিজ দাদা, তুমি এ-নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যেও না। ও ঠিক ফিরে আসবে। কোনো পুরুষই নারীর কাছে অপরিহার্য নয়। থাকতে থাকতে ঠিক একঘেয়ে লাগবে। একঘেয়ে লাগলেই আমার কথা মনে পড়ে যাবে। তখন ফিরে এলে বলতেই পারে, তোমার এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব, শ্যামলদাকে লেলিয়ে দিলে!

তোর মাথাটা গেছে। হাতের সিগারেটের প্যাকটটা রাগে তার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল।

তারপর বলেছিল, আমি উঠছি। তোর দিদিদের খবর পাঠাচ্ছি। কোথাও কোনো রহস্য আছে। রহস্য বুঝিস?

কিসের রহস্য?

আচ্ছা তোর বাড়িতে ফোনে কেউ কথা বলত ওর সঙ্গে?

মনে করতে পারি না। করত, তবে হয় ওর দাদা, না হয়-কাকা। ও রোজই একবার তার মার সঙ্গে ফোনে কথা বলত।

নষ্টের গোড়া ঐ মহিলা। দ্যাখ আমি পারি কিনা কিছু করতে। আমাদের শ্যামদুলালকে চিনিস?

কে শ্যামদুলাল?

আরে ওর বাবার শ্রাদ্ধে তুই আমি গেলাম না। পাইকপাড়ায় থাকে। ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। ওর বাবা মেসোমশাইর খুব প্রিয়জন ছিলেন।

ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কোন কাগজের রিপোর্টার। রিপোর্টারকে আমার বউয়ের নিখোঁজ হওয়ার খবর দেওয়া কি ভাল হবে? ওরা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করে আনে।

সাপটা বের হয়ে আসুক। সাপটাকে বের করে আনতেই হবে। জঙ্গলে, বাদাড়ে, কোনো নদীর চড়ায় যত বড় গর্তেই ঢুকে বসে থাকুক না, তাকে খুঁজে বের করব। দ্যাখ আমি কি করি। ওরা হাঁটে ডালে ডালে, আমি হাঁটব পাতায় পাতায়।

আসল স্বপ্নটা এভাবে তাকে কাবু করবে সে বুঝবে কি করে? ভোর রাতের স্বপ্ন খুব সুন্দর হয়। সুন্দর কুসুম থাকে। কুসুমকে সে যেন কোথায় দেখেছে! কিশোরী মেয়ের বিয়ে হলে যা হয়, লাজুক এবং চঞ্চল। চোখে তার সব সময় সন্ধ্যাতারা ভাসে।

রূপার চোখে কখনই এই সন্ধ্যাতারার আভাস সে পায়নি। কুসুমকে স্বপ্নে দেখলেই তার মোহ সৃষ্টি হয়। এমনভাবে তাকায় যে সেও কেমন তরলমতি বালকের মতো সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ঢেউ দেয়। জলের ঝাপটা দেয়। নদীর জলে কেন যে ভেসে থাকতে ভালবাসে কুসুম। নদীর জলে ডুব দিতেও ভালবাসে। কুসুম ভয় পায় সে ডুব দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরলে। ভয়ে কুসুমের মুখ শুকিয়ে যায়। সে ভেসে উঠে তখন হা হা করে হাসে। কুসুমের কি কপট রাগ! কলসি ভাসিয়ে সে জল থেকে পাড়ে উঠে আসে।

তার যে কি খারাপ লাগে!

কুসুম রাগ করেছে।

কুসুম বোধহয় অভিমান করেছে।

সে সাঁতরে কলসি ধরে ফেলে। তারপর কলসিতে জল নিয়ে মাথায় করে হাঁটে। আগে কুসুম। সে পিছনে। ভিজা শাড়িতে কুসুমের শরীর টগবগ করে ফুটতে থাকে—নিতম্ব এত ভারি হয় মেয়েদের, কুসুমকে ভিজা শাড়িতে না দেখলে টেরই পেত না। পায়ে রূপোর মল, শাড়ি সামান্য উঠে গেছে। সাদা ডিমের মতো উরুর কাছাকাছি সব সৌন্দর্য তাকে বিভোর করে দেয়।

এই কুসুম।

সাড়া দেয় না।

এই কুসুম, আর তোমাকে ভয় দেখাব না।

কুসুম সাড়া দেয় না।

আচ্ছা কুসুম আমি কখনও তোমার অনিষ্ট করতে পারি! তুমি এত সুন্দর, কেউ কখনও তোমার অনিষ্ট করতে পারে। মায়া হবে না! তোমার জন্য মায়া না হলে, পুরুষের যে মান থাকে না। তুমি এতটুকু কষ্ট পেলে, আমার কষ্ট বোঝো না!

কুসুম ফিরে তাকায়। কপট চোখে শাসন করতে গিয়ে শরীরের লজ্জাস্থানগুলো আরও ভাল করে ঢেকে দেয়।

তারপর কুসুমের এক কথা, তুমি এত সুন্দর স্বপ্ন দ্যাখ কেন গো!

কেন দেখি তা তুমিই বলতে পারবে। তোমার কাছে আমার স্বপ্ন গচ্ছিত আছে, বোঝ না? স্বপ্নটাকে ভেঙে দিয়ে তুমি আমাকে চুরমার করে দিতে পার না।

দাদা, ফোন।

অমর দরজায় ধাক্কা মারছে।

স্বপ্নটা চটকে গেল। সে ধড়ফড় করে ছুটে গেল দরজার দিকে। অমরের কাছ থেকে প্রায় কেড়েই নিল ফোনটা।

কে? কে?

কোনো সাড়া নেই।

কে আপনি? কাকে চান? কথা বলছেন না কেন?

না, একেবারে ডেড।

সে ফোনটা হাতে নিয়ে সোফায় বসে পড়ল। কেমন নিস্পৃহ চোখ। তার মনে হলো, ঠিক রূপা ফোন করেছিল। যতবার ফোন কেটে যায় তার মনে হয়, রূপার ফোন। রূপা আসলে এ-বাড়িতে অন্য কারোর কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। যদি আর কেউ থাকে—না, আর কেউ এ-বাড়িতে নেই। অমর কিংবা যে কোন পুরুষ কণ্ঠই তার বোধহয় চেনা। নারীকণ্ঠ নয়, ব্যস আর সে কিছু চায় না। শ্যামলদা এটা জানেই না, সে ফিরে আসবে বলেই ফোন করে। জায়গা বেদখল হয়ে যায়নি, তার জোর আছে। এই জোরের অধিকারে রূপা ফোন করতেই পারে।

সে যেন অনেকক্ষণ পর নিজের মধ্যে ফিরে এল।

অমর, কে ফোন করেছিল!

নাম বলেনি।

কাকে চাইছিল?

আপনাকে।

কি বলল?

তথাগতবাবু কি করছেন?

কি বললি?

বললাম, স্বপ্ন দেখছেন। ডাকব?

আমি স্বপ্ন দেখছি! বললি ফোনে!

বারে আমার কি দোষ, এত সকালে তো আপনি রোজই স্বপ্ন দেখেন। বললেই দোষ।

তা অবশ্য ঠিক। অমরকে দোষ দিতে পারে না। এত সকালে তার স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কাজ থাকে না। কিন্তু এত সকালে কে ফোন করতে পারে! সে তো কতদিন ধরে ভেবেছে, ঠিক রূপা তাকে ফোন করে বলবে, জানো, আমি কাউকে বেশিদিন সহ্য করতে পারি না। আমার এখানে ভাল লাগছে না। কবে আসবে তুমি?

নিশ্চয় কোন মেয়ে ফোন করেছিল।

না দাদা, মেয়ে নয় ভদ্রলোকের গলা।

ভদ্রলোকের গলা! কুসুমের বাবা নয় তো! কুসুমের বাবা যদি মেয়ের খোঁজ পান, তবে তাকে ফোন করতে পারে। শোনো তথাগত, কুসুম বাড়ি ফিরে এসেছে। অনুশোচনায় জ্বলছে। তুমি জলদি চলে এস। অনুশোচনায় কিছু একটা করে বসতে পারে। তুমি ক্ষমা করেছ জানলে তার আর অনুশোচনা থাকবে না। কুসুমকে দেখলে তোমারও কষ্ট হবে। বড়ই বিপর্যস্ত।

কুসুম তো স্বপ্নে। কুসুমের বাবাও কি স্বপ্নে থাকতে পারে! সে কুসুম আর রূপাকে গুলিয়ে ফেলছে। স্বপ্ন এত সত্য হয় সে জানত না। কুসুম যেন তার জীবনে সত্যি আছে। রূপার মতো সে দেখতে সুন্দর। তবে রূপার মতো বিষণ্ণ থাকে না। রূপার মতো জানালায় দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয় না। সে তার নিজের মানুষকে ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে থাকে না। আসলে রূপার মতো কুসুম নয়। কুসুমের মতো রূপাও নয়। আচ্ছা কুসুমকে একদিন জিজ্ঞেস করলে হয় না, ও কুসুম তোমার বাপের বাড়ির ভালবাসার মানুষ কেউ ছিল? তুমি অকপটে বলো কেউ ছিল কি না। বাপের বাড়ির ভালবাসার মানুষ সব মেয়েদেরই থাকে। শ্যামলদা তো বলল, মেয়েরা বড় হতে থাকলেই ভালবাসতে শুরু করে। ভালবাসা ছাড়া কোনো মেয়ে বাপের বাড়িতে বড় হয়! ওখানে জানালা থাকে, রাস্তা থাকে, পড়শি-আত্মীয়স্বজন—কেউ থাকেই। মেয়েরা লতার মতো। ভালবাসা ছাড়া বড় হতে পারে না। বিয়ে হলে তারপরে সব ঠিক হয়ে যায়। লতা ডাল পেলেই হলো। জাম, জামরুল কামরাঙ্গা মানে না।

দাদা বাথরুমে যাবেন না!

ফোনের কাছ থেকে তথাগত নড়তে চাইছে না। যদি আবার ফোন আসে। অমর খুবই আহম্মক। আহম্মক না হলে বলতে পারে, বাবু এখন স্বপ্ন দেখছেন! অমর তোর এত আস্পর্ধা কি ভাল! আমি স্বপ্ন

দেখছি বলতে পারলি! লোকে শুনলে হাসবে না! এমনিতেই সবাই ভাবছে আমার মাথা গড়বড়, বউ পালিয়ে গেলে, সবারই এটা হয়। খুব দোষের না, তাই বলে যখন তখন স্বপ্ন দেখা চলে না। কী না ভাবল ভদ্রলোক! রূপার বাবা হলে অবশ্য বুঝবেন, জামাইটির মাথার দোষ, স্বপ্ন ছাড়া আর কি তার অবলম্বন! দ্যাখ ব্যাটা শুয়ে শুয়ে স্বপ্নই দ্যাখ। লোকে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, আর সে দেখে, একজন বুড়োমানুষের। কুসুমের স্বপ্নটা সে যদিও গোপন করতে চায়। কুসুম আর তার ঘরবাড়িও বার বার স্বপ্নের মধ্যে উঠে আসে।

এটা তো কেউ বোঝে না, তার ঘরবাড়ি আছে, ভাল উপার্জন আছে, দেখতে সে খারাপ নয়। তার চুল ঘন, সবল পুরুষ—চোখ বড় বড় এবং শরীরে একটা শালগাছের শেকড় পর্যন্ত আছে, যতটা খুশি নারীর গভীরে সে শেকড় রোপণ করে দিতে পারে—রূপা যদি লাগে বলে চিৎকার করে ওঠে—না এতটা অশ্লীলতা রূপা সহ্য করতে নাও পারে। রূপা তাকে খারাপ ভাবলে, সে যাবে কোথাও! অথচ কেন যে পালাল!

দাদা কাল গেছিলেন?

কোথায়!

দেরি হবে ফিরতে বলে গেলেন না!

দেরি হলেই লোকে কোথাও যায়! অফিসে কাজ থাকতে পারে না!

দাদা একটা কথা বলব?

তোর আবার কি কথা! বাড়ি যাবি? যা না। আবার আসিস কিন্তু।

না না। বাড়ি যাব না। বলছিলাম—

ধুস। আরে মাথা চুলকাচ্ছিস কেন? বাথরুমে যাচ্ছি। তুই এখান থেকে নড়বি না। ফোন এলে ধরবি।

ফোন আসবে না দাদা, রান্নাঘরে যাই। গরম ভাত খেতে পারেন না। ঠাণ্ডা করতে দিই।

না, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি। কাজের গুরুত্ব বুঝবি। ফোন আমার আসবেই। তোকে বার বার বলেছি,এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ছাড়। ঠিক কেউ ফোন করে। সারাদিন বাড়ি থাকিস বলেও তো মনে হয় না। আমার ফোন আসে, কেউ ধরে না।

আপনি তো দাদা আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন না। মাঝে মাঝে অফিস ডুব মেরে বাড়িতেই থেকে যান। কি যে জরুরী ফোন আসার কথা বুঝি না।

তথাগত বুঝল, দিন দিন অমর বেশ ত্যাঁদড় হয়ে উঠছে। শাসন করা দরকার।

অমরকে কি ভাবে শাসন করা যায়। ধমক দিলে রেগেমেগে উধাও হয়ে গেলে আর এক বিপত্তি। খালি বাড়িতে তার নিজেরই ভাল লাগে না। অমরের ভাল লাগবে কেন! হৃদয়বান বলেই অমর তাকে ফেলে যেতে পারছে না।

কি আর করা। তথাগত পেস্ট ব্রাশে লাগিয়ে মুখে দেবার আগে, বলল, আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই যা। ভাত বেড়ে চলে যায়। তুই দাঁড়াবি, আমি চান করে নেব। চান করে এ-ঘরেই খেয়ে নেব। ফোনটা বেইমানি করছে। একবার দু-বার বেজেই থেমে যায়। দৌড়ে এসে ধরেও দেখেছি, না কেউ না। ফোন কেটে গেছে। কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে খপ করে তুলে ফেলতে পারব। চালাকি একদম করতে পারবে না।

দাদার দিকে তাকিয়ে অমরের কেন যে কষ্ট হলো। মানুষটা সোজা সরল, আবার বাতিকগ্রস্তও কিছুটা। সে বলল, ঠিক আছে, আপনি চানে যান, আমি ফোনের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকছি।

অমর জেনে ফেলেছে, দাদার বৌ পালিয়ে গেছে। চম্পাবতীই খবরটা দিয়েছিল।

রুণ্টুদার বৌ যেদিন পালাল, সেদিন নাকি ভারি বিবস্ত্র অবস্থা। বউ পালালে মানুষ কতটা জলে পড়ে যায় চম্পাবতী তার সাক্ষী। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ছোটাছুটি। কাউকে বলেও না—বৌ পালিয়েছে। পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে অপমানের বিষয় আর কি থাকতে পারে! চম্পাবতী নিজে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে এসেছে। ওর বাবার সঙ্গে। চম্পাবতীর বাবা দেখেশুনে সব কাজ করেছে। কিন্তু রুণ্টুর কি হয়েছে তা তারা জানে না।

রণ্টুদা কেবল বলছে, না এটা ঠিক না। তুমি ভাল করলে না।
ভাল-মন্দ আসে কোত্থেকে। বউমা কোথায়?
জানি না।
বউমা কোথায় জানিস না মানে!
জানলে বলতাম না?
তোকে কিছু বলে যায়নি?
না।
এ আবার কি রকম মেয়ে। কোথাও গেলে বলে যেতে হয় জানে না!
মনে হয় জানে না।
হিন্দমোটরে ফোন করেছিলি?
করেছি।
কি বলল?
ওখানে যায়নি।
তবে কোথায় গেল খোঁজ নিবি না?
খোঁজ নিয়েছি।
নেই?
না।
মান অভিমান নয়তো! চম্পাবতীর বাবা বলেছিল, তোর ডাইরিটা দে।

ডাইরি দেখে সব জায়গায় ফোন। তারপর সব জায়গা থেকে একই উত্তর পেয়ে বলেছিল, দু-দিন ধরে মুখ শুকনো করে বসে আছিস, একবার খবর দিতে পারলি না? চাঁপা না বললে জানতেই পারতাম না। জানো রুণ্টুদা না বাড়িতে কেবল পায়চারি করছে। চোখ জবাফুলের মতো লাল। কিছু খাচ্ছে না। কাজের মেয়েটা বলল, তোমার বাবাকে খবর দাও। রুণ্টুবাবু ভাত মুখে তুলছে না। সারাদিন ফোনের কাছে বসে আছে। কিছুতেই উঠছে না। কি যে হলো! বৌদিমণিও বাড়ি নেই। কোথায় গেছে কিছুই বলছে না। বসে বসে প্যাকটের পর প্যাকেট সাফ করে দিচ্ছে। পাগল হয়ে যায়নি তো! আমি থাকতে আর সাহস পাচ্ছি না।

বাবা খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন। মা—পাড়ার সবাই। কেউ ঢুকতে গেলেই এক কথা ঢুকবেন না। আমার বাড়ি—আমার ঘর। কে ঢুকবে, কে ঢুকবে না আমি ঠিক করব। বাবাকেও ঢুকতে দেয়নি। শেষে বাবা কি করেন—বললেন চম্পা মা, চল তো তুই সঙ্গে। তোর মাকে বল, কিছু খাবার করে দিতে। ওর দিদিদের ফোনে জানিয়ে দিয়েছি—কিন্তু যতক্ষণ না আসে চোখের সামনে এমন ভাল ছেলেটা মরে যাবে না খেয়ে—

চম্পাবতী অমরকে সব খুলে বলেছে। চম্পাবতী আসতেই দাদা আর দরজা বন্ধ করে রাখেনি। চম্পাবতী আর তারা বাবা সাধ্য-সাধনা করে খাইয়েছে। চম্পাবতী ঘরদোর সাফ করেছে। দিদিরা না আসা পর্যন্ত চম্পাবতীর কাজই ছিল, ঠেলেঠুলে অফিস পাঠানো। ঘরদোর সাজিয়ে রাখা। এবং রুণ্টুদা একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন বুঝতে চম্পাবতীর কষ্ট হয়নি। সে এমনভাবে ক'দিন সেবা-শুশ্রুষা করেছে বুঝতেই দেয়নি, বাড়িতে দাদার কেউ নেই।

আমার তোয়ালে কোথায়?

আমার রেজার কোথায় রেখেছ রূপা?

আরে রূপা, শোনো, আমি অফিস চলে গেলে দরজা বন্ধ করে দিও।

চম্পা ফিক ফিক করে হেসেছে। আবার ভিতরে তার কষ্টও কম ছিল না। সে এবারে কলেজে পড়বে। মাধ্যমিক পাশ করলে মেয়েরা সব বোঝে। চম্পাবতী সব বুঝত। পুরুষ মানুষ বউ ছাড়া থাকে কি করে! ভয়ও ছিল কি করতে কি করে বসে। রূপা বলে জড়িয়ে ধরলেও বিপদ। কাজেই চম্পা বলেছে, রুণ্টুদা আমি বৌদি না। আমি চম্পা। সে সবসময় সতর্ক পায়ে হাঁটা চলা করেছে।

তথাগত তখন চম্পার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলত। আমি জানি, তুমি চম্পা। চাঁপা। গাছে ফুটে থাকতে ভালবাস।

দাদা ফোন।

তথাগত ঘরেই পায়চারি করছিল। ঘর ছেড়ে বের হয় না। কখন ফোন আসবে এই আশায় বাজারেও সে যায় না। আজকাল কোনরকমে অফিসটাইম কাটিয়ে দিতে পারলেই বাড়ি আর নিজের বিছানা। কখনও টেবিলে চুপচাপ বসে থাকে। পাখি প্রজাপতি দেখে। আজ স্বপ্নে কুসুমকে দেখতে পায়নি। সেই বুড়োমানুষটা আবার হাজির।

রবিবার। ছুটির সকাল। চম্পাবতী শিউলি গাছের নিচে বসে ফুল তুলছিল। দৃশ্যটা বড় মনোরম। এমন দৃশ্য এত সকালে চোখে পড়তেই স্বপ্নের কথা ভুলে যেতে পারে। এবং যখন চম্পা শিউলি তলা থেকে চলে গেল, কেমন ফাঁকা অর্থহীন হয়ে গেছে জায়গাটা। এই গাছ, এই ফুল আর চম্পাবতী নিজে মিলে এক অখণ্ড পৃথিবী। সে জানালায় বসে দেখতে দেখতে পাখি প্রজপতির মতো জীবনটা হলে মন্দ হতো না, ভাবতেই স্বপ্নে বুড়োমানুষটা এসে গেল। অথর্ব। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নামলেই ডুবে যাবে ভয়।

আর তখনই ফোন।

সে পড়িমড়ি করে দরজা খুলে বের হয়ে বসার ঘরে ঢুকে গেল। ফোন তুলে বলল, কাকে চান।

ওরে বাঞ্ছারাম, আমি। আর কে তোকে ফোন করবে এত সকালে!

ও দাদা তুমি!

কি করছিলি?

কিছু করছি না তো?

স্বপ্ন দেখছিস না? সকালে স্বপ্ন না দেখলে তো তোর ভাত হজম হয় না।

কি যে বল না।

খেয়েছিস?

না খাইনি।

নটা বাজে, জলখাবার এখনও খাসনি? কখন খাবি।

জলখাবার? তা খেয়েছি। দাঁড়াও। এই অমর অমর।

অমর কাছে গেলে বলল, জলখাবার খেয়েছি কি না শ্যামলদা জিজ্ঞেস করছে। খেয়েছি তাই না!

কখন খেলেন?

এই যে চাউমিন করে দিলি।

ও তো কাল সকালে।

দ্যাখো, একদম ভুলে গেছি। শোনো শ্যামলদা, খেয়েছি ঠিক, তবে গতকাল। আমার ধারণা, এখুনি খেলাম। কি যে হয় না!

এটা ছাড় বাঞ্ছারাম। চাঁপা বলল, তুই নাকি চাঁপাকে ডেকে বলেছিস, কতদিন তাকে দেখিস না! তুই কিরে, চাঁপা এত করল, আর তার কথা তোর একদম মনে নেই। ওর মা পারে না, সংসারে সবারই কাজ থাকে। তোমার পিছনে কে লেগে থাকে। চাঁপার কলেজ আছে, পড়া আছে। অমরকে গরু খোঁজা করে তুলে এনেছি! চাঁপা না থাকলে, সে করত। কে তোকে জলভাত দিত। তার মা মানে আমাদের সনাতন বৌদি এক হাতে পারবে কেন? চাঁপার এক কথা, রণ্টুদা কেমন হয়ে গেছে, কিছু মনে রাখতে পারে না।

চাঁপা তো খুব ফাজিল মেয়ে দেখছি। আমি মনে রাখতে পারি না, ও পারে। চাঁপা রোজ আমার গাছের ফুল চুরি করে নেয় জানো?

বাধা দিস্ না কেন?

আমি তো তখন ঘুমোই।

ফুল চুরি করছে জানিস কি করে!

অমর বলল।

নিজের চোখে দেখিসনি!

আজ দেখলাম।

আজই দেখলি?

হ্যাঁ, খুব সকালে ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্ন দেখলাম না। চাঁপা শিউলিতলায় ফুল তুলছে। সুন্দর ফ্রক গায়। চুলে এলো খোঁপা। দু একটা চুল ওর গালে এসে উড়ে পড়ছে। দূরে রেললাইনের সিগনালের বাতি, বিনুবাবুদের মাঠ পার হয়ে স্টেশনে একটা ট্রেনও ঢুকে যেতে দেখলাম। সবাই উড়ছে। পাখপাখালি, প্রজাপতি, ফুল সব। পৃথিবীটা কি সুন্দর। রূপার কোনো খোঁজ পেলে?

তোমার রূপা বাজে মেয়ে।

একদম মন্দ কথা বলবে না। রূপা কখনও বাজে মেয়ে হতে পারে না।

আজ কত তারিখ?

দাঁড়াও।

তথাগত ক্যালেণ্ডারের পাতা ওল্টাচ্ছে।

আজ সতেরো তারিখ। সতের জুন। পুরো ছ'মাস হয়ে গেল। রূপার পাত্তা নেই। কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে তোর বাড়ি। আর কলকাতা শহরে মেলা জায়গা গা ঢাকা দিয়ে থাকার। সে মরে যায়নি।

কি যে অলুক্ষণে কথা বলছ না!

মরে গেলেও তো তোর মুখ রক্ষা হতো!

দাদা।

রাখ তোর দাদা। অলকেন্দুবাবুকে জানিস?

না।

খুব জানিস। তোর দেশের লোক। পাটের আড়ত আছে। তোর বাবার বন্ধু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, অলকেন্দু কাকা। কোথায় আছে?

নেই। বেঁচে নেই। তার অনেক সম্পত্তি।

হবে না। কত বড় পাটের আড়ত! কত লোক আর কাকা একা মানুষ। বিয়েই করলেন না। মেয়েদের উপর খুব রাগ।

যাক, মনে করতে পারছিস! অলকেন্দুবাবু রূপার কেমন মামা হন।

মামা!

হ্যাঁ মামা। সম্পর্কের জোর নেই। তবে মেয়েটার মুখ কিছুটা অলকেন্দুবাবুর মতো দেখতে। রূপাকে দেখেছি, অলকেন্দুবাবুর ফটোও দেখাল শ্যামদুলাল।

শ্যামদুলাল, মানে ঠিক বুঝতে পারছি না।

আরে কাগজের রিপোর্টার।

অহ, রূপাকে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

তোমার তো ক্ষমতা নেই। বসে আছো ঘরে—তিনি আসবেন। কিন্তু তিনি আসছেন না। তাঁর কাজ হাসিল হয়ে গেছে। তাঁর দরকার ছিল তোমার মতো একজন বুরবক স্বামী।

রূপা কিন্তু কখনও আমাকে বুরবক স্বামী বলেনি। তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ। রূপাকে ছোট করছ।

ঠিক আছে তুই খুব অনুগত স্বামী। হয়েছে! খুশি। ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছিস তো? অমরকে দে।

এই অমর, শ্যামলদা তোর সঙ্গে কথা বলবে।

হ্যাঁ বাবু।

বাবুকে ওষুধ মনে করে দিচ্ছিস তো।

দাদা ওষুধ খেতে চায় না। বলে, তার নাকি কিছু হয়নি। ওষুধ খেলে ঘুম পায়। অফিসে কাজ করতে পারে না।

দে বাবুকে।

দাদা, আমার সঙ্গে আরও কথা আছে তোমার?

আছে। শোন, তুই নাকি ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছিস না।

খাইতো। দিলেই খাই। তোমার কথা আমি কখনও অমান্য করি বল? ওষুধ না খেলে সবাই রাগ করে। না খেয়ে পারি! সবাই মুখ ব্যাজার করে থাকে—না খেলে চলে? চম্পাবতী জানালায় এসেও খোঁজখবর নেয়। কেন নেয় বল তো! ওষুধ না খেলে ওর মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। আচ্ছা মেয়েরা ব্যাজার মুখে থাকলে খারাপ লাগে না! আমি না খেয়ে পারি। সব সহ্য হয় জানো, মেয়েদের ব্যাজার মুখ একদম সহ্য হয় না।

এত সুন্দর কথা বলতে পারিস, এত দুঃখ মেয়েদের জন্য কোথায় রাখবি? তোর রূপার কাছে যাবি?

ও রাগ করবে না তো। ওর খোঁজ পেয়েছ? ঠিক আছে। ও ভালো আছে তো। ভাল থাকলে, একদিন ঠিক চলে আসবে।

তোর দেখতে ইচ্ছে হয় না?

খুব হয়। কিন্তু রূপা যদি পছন্দ না করে? ও কোথায় আছে? আমাকে নিয়ে যাবে? দূর থেকে দেখে চলে আসব। আমি গেলে ও যদি রুষ্ট হয়—যাওয়া কি ঠিক হবে! বরং চুরি করে গোপনে দেখে আসতে পারি।

আহম্মক।

তুমি আমাকে আহম্মক বলছ কেন?

আহম্মক বলি সাধে! যে বৌ পালায়, তাকে আর দেখার কিছু থাকে না। সংসারে সব মেয়েরই প্রেমিক থাকে, পুরুষেরও থাকে প্রেমিকা। সে বড় হয়, আর প্রেম তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। রূপা ইচ্ছে করলে তোর ঘর নাই করতে পারে। সে তার পছন্দের লোকের কাছে চলে যেতেই পারে। এটা দোষের না। সব পুরুষের সঙ্গে সব মেয়ের অ্যাডজাস্ট হবে ভাবাও ঠিক না। কিন্তু মুশকিল কি জানিস?

মুশকিলের কথা বলছ কেন?

মুশকিল হলো, যে নারী সম্পত্তির লোভে বিয়ের পিঁড়িতে বসে সে আর যাই হোক ভাল মেয়ে কখনই হতে পারে না। বিয়েটা লোক দেখানো। বিয়ে না হলে, অলকেন্দুবাবুর বিষয় সম্পত্তির অধিকার সে পেত না। তোদের রেজিস্ট্রির দিন আমি ছিলাম, তখন কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। এর পেছনে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র কাজ করছে বিশ্বাসই করতে পারিনি।

কিছু বুঝছি না দাদা। রূপা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে যাবে কেন? ওরতো কোনো অনিষ্ট করিনি। ও তো আমার কাছে ছিল, তাকে কষ্ট দিয়েছি বলেও মনে পড়ছে না। তুমি অকারণ রূপাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছ। ওর প্রতি আমি বিন্দুমাত্র অশালীন ব্যবহার করিনি।

গাধা আর কাকে বলে। ঠিক আছে, সামনের শনিবার যাচ্ছি। শনিবার বিশ্বকর্মার ছুটি। তোর কাছে চলে যাব। আজ যেতে পারলে ভাল হত—তবে বড়দা দিল্লি থেকে আসছেন। স্টেশনে গাড়ি নিয়ে থাকতে হবে। একটু ব্যস্ত আছি। তাড়াহুড়োরও কিছু নেই। যা হবার হয়ে গেছে। তোর মাথায় বউ নামক ভূতটি চেপে বসে আছে। এক দু-দিনে সেটা মাথা থেকে নামবে বলে মন হয় না। এখনও কি স্বপ্ন দেখছিস?

না আজ দেখিনি।

একটা কথা বলব?

বল।

স্বপ্নে কি দেখিস কাউকে বলিস না কেন?

মনে থাকে না।

মারব থাপ্পড়। রোজ রোজ এক স্বপ্ন কেউ দেখে?

এক স্বপ্ন দেখি কে বলল তোমাকে? আমি দুটো স্বপ্ন দেখি।

যাক একটা নয়, দুটো। ভাল। কিন্তু কি দেখিস কাউকে বলিস না। বউ চলে যাবার পরই তোর স্বপ্ন দেখা শুরু। মাথাটা যে ঠিক নেই বুঝিস! ডাক্তার রায় কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, কি স্বপ্ন দেখিস। কিছু বললেই তোর এক কথা, মনে করতে পারিস না। এখন বলতে কি দোষ আছে?

এখন! মানে এখন বলছ কেন?

আজতো স্বপ্ন দেখিসনি বললি না?

কখন বললাম।

তা হলে স্বপ্ন দেখেছিস?

না তো!

বেশ, যখন দেখিসনি, তখন বলতে বাধা কোথায় স্বপ্নটা কি? কেউ তোকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে?

না। কেউ আমাকে স্বপ্নে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেয় না।

কুয়াশায় রাস্তা দেখতে পাচ্ছিস না এমন কি কোনো স্বপ্ন?

না। কুয়াশা স্বপ্নে আমার থাকেই না।

অন্ধকারে কোনো লণ্ঠন দুলছে?

না। অন্ধকার দেখি না।

দুটো পাখা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে যাচ্ছিস—এমন কিছু?

না না। আমি দেখি একজন বুড়োমানুষ। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দেখি একজন চাষী মানুষ—তার বউ কুসুম, তার ঘরবাড়ি, ধানের বিছন, আবাদের মরসুমে কুসুম ভাতের থালা মাথায় করে মাঠে যাচ্ছে। ডাল আর আলুপোস্ত—একটা আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ, আলে বসে কুসুম তার স্বামীর খাওয়া দেখছে। কি সুন্দর দৃশ্য। স্বপ্নটা আছে বলেই বেঁচে আছি। বুড়োমানুষের স্বপ্ন দেখলে মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। কুসুমকে দেখলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয়।

যাচ্ছি।

পর পর ডোরবেল বাজিয়ে যাচ্ছে কেউ। আচ্ছা অসভ্য তো! এক দুবার টুংটাং, না, একেবারে পর পর টুংটাং—যেন হারমোনিয়ামের রিডে হাত চেপে বসে আছে। লোকটা কি বোকা! শ্যামল উঠতেও পারছে না। সে অফিসের কিছু কাজকর্ম নিয়ে বসেছে। আলগা পাতা পাখার হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে। সব সামলে-সুমলে টেবিল ছেড়ে ওঠারও হ্যাপা থাকে।

ফের বলল, যাচ্ছি।

কিছুই গ্রাহ্য করছে না।

অগত্যা শ্যামল স্ত্রীকে ডাকল।

লতিকা দ্যাখ তো কে এল! দরজা খুলে দিও না। অসভ্যের মতো ডোরবেল টিপেই চলেছে।

তুমি যেতে পারছ না। আমার হাতজোড়া।

ইস, না, আর পারা যায় না।

যাচ্ছি। বলছি না যাচ্ছি।

এবং গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক। সাত সকালে তথাগত এসে হাজির।

তুই!

চলে এলাম দাদা।

কস্মিনকালেও যে জোরজার করে ধরে নিয়ে না এলে আসে না, বিয়ের পর তো আসা ছেড়েই দিয়েছিল, বাড়ি ছেড়ে যার কোথাও যেতে ভাল লাগে না, সে এই সকালে এতদূরে চলে এসেছে ভাবতেই পারছে না। সকালে ফাস্ট লোকাল না ধরলে আসা সম্ভব নয়। সে তথাগতকে দেখে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে গেছে। একেবারে উন্মাদ হয়ে গেল না তো! তার বাড়ি আসার কোনো কারণই থাকতে পারে না। কারণ কোনো বিপদ আপদে সে কারো সাহায্য চাইতেই জানে না। এমনকি তথাগতর মায়ের

মৃত্যুর খবরও লোক মারফত পেয়েছিল। একটা ফোন করলেই যে কাজ হয়ে যায়, সেই ফোনটা করতেও তার এত দ্বিধা কেন বোঝে না।

তাই বলে খবরটা দিবি না। একটা রিং করতে পারলি না।

তুমি দাদা ব্যস্ত মানুষ। অকারণ আমার হ্যাপা সামলাতে আসবে কেন? সনাতনদাই সব করেছেন। চাঁপাই সনতানদাকে গিয়ে খবর দিয়েছে। আমি কাকে গিয়ে কি বলতে হবে ঠিক বুঝতে পারি না দাদা। মা মরে গেছে বলতেও খারাপ লাগছিল।

তোর শোক-তাপের এক্সপ্রেশান পর্যন্ত নেই? মাসিমার অসুখ, সেই খবরটা পর্যন্ত দিসনি। তুই কিরে! একটা রিং করতে তোর কি অসুবিধা ছিল!

আরে বোঝো না রঙ নাম্বার হলে কি হয়! তোমার ফোন, ধরল আর কেউ! ধমক খাই যদি। ধুস বলে ছেড়ে দেয় যদি! মেজাজ ঠিক থাকে?

তথাগতর মধ্যে কোনো উন্মাদ কি ঘাপটি মেরে মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই বসেছিল! চিরদিনই স্বভাব-লাজুক সে। যেচে কথা বলতে জানে না। দশটা প্রশ্নের একটা জবাব। বৌ না পালালে এটা বোধহয় ধরাই যেত না। ওকে কিভাবে যে স্বাভাবিক করে তোলা যায় তাই সে বুঝতে পারছিল না।

আয়।

তথাগতর মুখ শুকনো। সারারাত ঘুমায়নি। চোখ জবাফুলের মতো লাল। শ্যামলের কেন যে কষ্ট হচ্ছিল এতো বুঝতে পারছে না। সে তবু ডাকল, লতিকা, দ্যাখ কে এসেছে!

লতিকা বাইরের বারান্দায় ঢুকেই তাজ্জব।

কি ব্যাপার! এত সকালে?

তথাগতর মুখে কোনো এক্সপ্রেশান নেই। সে শুধু লতিকা বৌদির দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

কখন বের হয়েছিস? শ্যামল না বলে পারল না।

কখন? তারপর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে কি দেখল। বলল, রাতে।

রাতে! কোথায় ছিলি?

স্টেশনে।

কেন?

ট্রেন যদি মিস করি। তোমাকে খবরটা দেওয়া দরকার ভাবলাম।

কি এত জরুরী খবর? ফোন করলেই হতো!

কেউ যদি আড়ি পেতে থাকে!

তোর ফোনে কে আড়ি পাতবে!

তথাগত চুপচাপ সোফায় বসে পড়ল। কোনো উত্তর দিল না।

রাতে খাসনি কিছু?

না, খেয়েই বের হয়েছি। অমরকে বললাম, বের হচ্ছি। শ্যামলদার বাড়ি যাচ্ছি।

রাতে চলে এলি না কেন?

তোমাদের যদি অসুবিধা হয়। তাই প্ল্যাটফরমের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকলাম। সকালের ট্রেন ধরে চলে এসেছি।

ও কি ফিরে এসেছে?

না। আমি তো তোমাকে নিয়ে ওর কাছে যাব ঠিক করেছি।

শ্যামল কি বলবে ভেবে পেল না। বউ ফিরে আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ খবর দিতেই সে একমাত্র এত সকালে চলে আসতে পারে। এ ছাড়া তার জীবনে বলতে গেলে কোনো খবরই নেই। রূপা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না আসলে। শ্যামদুলাল বলেছে, ওরা কালীঘাটের দিকে আছে। ফ্ল্যাট নিয়েছে। বিয়ে ভেঙে গেলে তবে যাবে। শুধু এ জন্যই গা ঢাকা দেওয়া। মেয়েটা বজ্জাত। চতুর এবং ধূর্ত। ছ'মাসেই তথাগতর ভীতু স্বভাব টের পেয়ে গেছে। ওখানে গেলে তথাগত কষ্ট পাবে। অথবা তথাগত কি করে বসবে কে জানে!

তুই যে বললি, যাবি না। সে নিজেই চলে আসবে!

আসবে! ঠিক আসবে। তবে কবে আসবে জানি না। ওকে না দেখলে আমি বাঁচব না দাদা। ও ভাল আছে দেখলেই আমার শান্তি।

শান্তির আর দরকার নেই। শোন তথাগত—বলেই কি ভাবল তারপর বলল, ঠিক আছে, হাতমুখ ধুয়ে নে। এই লতিকা, আমাদের কিছু খেতে দাও।

খাওয়ার চেয়েও যাওয়াটা জরুরী।

ঠিক আছে, খা আগে। তারপর দেখছি।

আমার কিছু ভাল লাগছে না। খেতেও ভাল লাগছে না। কাল যে কি গেছে তোমাকে কি বলব। রাতে খেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। অমর জোরজার করে খাইয়েছে।

শ্যামলের কেন যে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। একই পাড়ায় তারা বড় হয়েছে। ওর বাবা পাশের বণিকবাবুদের বাড়িতে ভাড়া ছিল। মুখচোরা স্বভাবের ছেলেটিকে সে কখন আপন করে নিয়েছিল, নিজেও জানে না। কৈশোর বয়সে মানুষের হৃদয় বড় গভীর হয়। ওরা চলে যাচ্ছে বাড়ি করে, এই খবরও ছিল তার কাছে মর্মান্তিক। চলে যাবার দিন, সে পালিয়ে থেকেছে—তথাগত ডেকে ডেকেও তার সাড়া পায়নি।

মেসোমশায় মাসিমা মরে গিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। চোখের সামনে পুত্রের এতবড় হেনস্থা কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না।

তথাগত খুবই উসখুস করছিল। এমন কি বসতেও পারছে না। দেখলেই বোঝা যায় সে খুবই অস্থির হয়ে পড়েছে।

শ্যামল ফের বলল, বোস। ঠাণ্ডা হয়ে বোস। এত চঞ্চল হয়ে পড়লে চলবে কেন! তুই বোকার মতো কাজ করিস না। তোর যাওয়া উচিত নয়। মন থেকে মুছে ফেল সব। মুশকিল কি জানিস, বিয়ের আগে মেয়েদের সম্পর্কে তোর হাতেখড়ি হয়নি। হলে পলাতক স্ত্রীর জন্য এত উতলা হতিস না।

তথাগত কিছুটা মিইয়ে গেল।

আমার যাওয়া উচিত হবে না বলছ?

আমার তো তাই মনে হয়।

শ্যামল জানে মেন্টাল পেশান্টদের কিছুতেই হতাশ করতে নেই। এমন কিছু বলতে নেই, যাতে সে আরও বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

শ্যামল জানে, মেয়েটি আসলে ধোঁকা দিয়েছে।

শ্যামল জানে, মেয়েটি উইলের প্রবেট পাবার জন্য তথাগতকে বিয়ে করেছে। অলকেন্দুবাবুর উইলে একটা শর্তই ছিল, বিয়ে হবে তার বন্ধুপুত্র তথাগতর সঙ্গে। তারপরেই মেয়েটি অলকেন্দুবাবুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে।

নারীচরিত্র সম্পর্কে তারও ভাল ধারণা নেই—তথাগতর থাকবে কোথা থেকে। মনে হয় না তথাগত কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের আগে কথা বলেছে। কোনো মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও ছিল না। এত লাজুক, যুবতী কিংবা কিশোরী মেয়ে দেখলেই দূরে সরে যেত। চোখ তুলে তাকাত না।

কি করে যে রক্ষা করে!

বিয়ে অগ্নিসাক্ষী রেখে।

বিয়ে রেজিস্ট্রিও হয়েছে।

কোন ফাঁক রাখেনি। ঘরও করেছে কিছুদিন। এমনভাবে সটকে পড়েছে যাতে তথাগত বুঝতে না পারে। সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য বিয়ে নামক একটা মিথ্যা আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্য মেয়েটি নিয়েছে। তার অমতে বাবা মা বিয়ে দিয়েছেন, সে এই বিয়ে চায়নি। তথাগত আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাকে সুখী রাখতে।

শ্যামদুলাল তাকে কাগজপত্রের জেরক্সও দিয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে তথাগতকে দেখাতে পারে। আজ তার নিজেরই যাবার কথা ছিল তথাগতের কাছে। ভেবেছিল সব দেখাবে। বলবে মন শক্ত কর।

এ-ভাবে ভেঙে পড়িস না। আমরা অন্য চিন্তা করছি। ওর দিদিদেরও খবরটা দেওয়া দরকার ভেবেছিল। দিদিদের ঠিকানা জানে না। ফোন নম্বরও তার জানা নেই। তথাগতর কাছ থেকে জেনে নেওয়া দরকার। বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখলে আরও খারাপ হতে পারে। এখন তথাগত দুটো স্বপ্ন দেখে। পরে আরও সব স্বপ্নের ভিতর ডুবে গেলে অফিস কামাই করতে পারে। জীবনের সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেলে যা হয়। সে বুঝতেই পারছে না, এত সব কেলেঙ্কারী হওয়ার পরও আশা করে বসে থাকে কি করে, তার স্ত্রী ফিরে আসবে? এই অলীক বাসনা থেকে মুক্ত করা দরকার—কিন্তু কি ভাবে বুঝতে পারছে না। একসময় কেন জানি মনে হলো, নারীর প্রতি নীরব মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিই বাঞ্ছারামকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

কি রে খেলি না?

খেতে ইচ্ছে করছে না দাদা। বমি পাচ্ছে।

তোমার বমি বের করে দেব! খা বলছি। এই লতিকা শোনো।

লতিকা রান্নাঘর থেকে উঁকি দিতেই বলল, বাবুর বমি পাচ্ছে। তুমি সামনে বসো।

লতিকা আগের মতো সহজভাবে মিশতে ভয় পায়। কে জানে, হুট করে যদি চলে আসে, তার মানুষটি বাসায় নেই, এটা যে কি এক ধরণের পারভাসান—এমনও মনে হয় তার। সে তথাগতকে ভয় পায়। যেন এই মানুষ, যে কোনো কেলেঙ্কারি করে ফেললেও বুঝতে পারবে না, কত বড় অপরাধ।

সে তবু পাশে বসে বলল, খান। না খেলে কষ্ট পাব।

শ্যামলদা, তুমি আমাকে নিয়ে যাবে তো!

অগত্যা কি করা। শ্যামল বলল, যাব। আগে খা। তারপর শ্যামদুলালকে ফোন করি। সে আসুক। সবাই বুদ্ধি পরামর্শ করে যা হয় কিছু করা যাবে।

তথাগত খুবই যেন হালকা হয়ে গেল। চোখে মুখে উত্তেজনা। সে যাবে। শ্যামলদা সঙ্গে থাকবে। তার ভয় পাওয়ার মতো আর কোনো হেতুই থাকবে না। কারণ সে জানে শ্যামলদা সঙ্গে না গেলে রূপার কাছে তার একা যাওয়ারও সাহস নেই। সংকোচ, এবং কোথায় যে তার অপরাধবোধ লুকিয়ে আছে সে নিজেও তা জানে না।

শ্যামল হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোর মিনমিনে স্বভাবটা ছাড়। না হলে মরবি বলে দিলাম। ডাক্তার তো বললেন, তোর কিচ্ছু হয়নি। তুই ঠিকই আছিস। মোহ আর ভালবাসা এক নয় বুঝলি। ভালবাসা এটাকে বলে না। কত আর বোঝাব। তুই তোর স্ত্রীর মোহ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখ। নিজে না পারলে, আমরা শত চেষ্টা করেও পারব না। সব তোর নিজের হাতে।

তথাগত কোনো জবাব দিল না। উঠে গেল ধীরে ধীরে। হাঁটা চলায় কেমন শ্লথগতি। যেন শরীরে তার বিন্দুমাত্র বল নেই। ক্ষীণ গলায় কথা বলে। বেসিনে মুখ ধোবার সময়ও মনে হলো বড় আলতো করে মুখে জল দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে, অথচ সামনে আয়না—নিজের মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না বোধহয়। এই ঘোর বড় সাংঘাতিক।

সে বলল, তোকে একটা গল্প বলি শোন।

ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেন্ড। বলেছিলেন শেলি। শব্দটি হলো প্রেম। কথাটি, আমি তোমায় ভালবাসি। ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে রক্তাল্পতায় জীর্ণ , পাংশু, রুগ্ন, অকর্মণ্য এই অনিবার্য বিকল্পহীন, আকস্মিক কিংবা প্রত্যাশিত উচ্চারণে। তাহলে কেউ কাউকে ভালবাসলে কী বলবে?

বুঝলি কিছু?

শ্যামল চেয়ে থাকল তথাগতর দিকে।

তগাগত অচঞ্চল। চুপচাপ এবং বড়ই নিঃস্ব যেন।

এগুলো আমার কথা নয় বাঞ্ছারাম। হুবহু এই উক্তি কোনো কবির, কাগজের পাতা থেকে তুলে ধরলাম। কথাগুলো মনে রেখেছি আমার সামনে নির্দিষ্ট একটি উদাহরণ আছে বলে। আর সেই উদাহরণ তুই।

ভালবাসা উচ্চারিত হবে সংলাপের উদ্ভাসে। স্বাভাবিক, পরিচিত, দৈনন্দিন ব্যবহারের, আদানপ্রদানের,

সঙ্গ-নিঃসঙ্গতার আড়ালেও লুকোচুরি খেলতে ভালবাসে। এটা তোর মধ্যে নেই, তার মধ্যে ছিলই না। পারবি এই অমোঘ উক্তির যথার্থতা রক্ষা করতে—তুই পারলেও সে কী পারবে। তাই বলছিলাম, এটা ভালবাসা না —মোহ। অধিকারের মোহ। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে তোকে মাঝে মাঝে গল্প শোনাব। এখানেই খাবি। আজ এক নম্বর গল্প। গল্পগুলি শোনার পর তুই যদি যেতে চাস, নিয়ে যাব।

খাওয়াদাওয়ার পর শ্যামল তথাগতকে নিয়ে একই খাটে শুল। ভিতরের দিকে দরজা খুললে ডাইনিং স্পেস। তার পাশের দরজা দিয়ে ঢুকলে শ্যামলের বেডরুম। লতিকা খেয়েদেয়ে দিবানিদ্রা দেবে ও-ঘরে। দুই বন্ধু মিলে গল্পগুজব করা যায়—তবে তথাগত কথা বলতেই জানে না। গল্পগুজব করতে হলেও কিছুটা খোলামেলা স্বভাব দরকার। তথাগত বউ ছাড়া পৃথিবী অন্ধকার দেখ। ওর বউকে নিয়ে কথা বললে সে খুবই আগ্রহের সঙ্গে শোনে। পৃথিবীতে নারী ছাড়াও জীবনে অজস্র সুতো টানাটানি হয় তথাগত যেন জানেই না। আসলে গল্প করেও সুখ নেই।

তারা দুজনই সিগারেট খেল চিত হয়ে। পাশ ফিরে শুল। তাকে আজ একটা গল্প বলার কথা। গল্পটা কিভাবে আরম্ভ করবে বুঝতে পারছে না।

এরই মধ্যে তথাগত তাগাদা দিয়েছে, আমরা যাব না দাদা? কেমন বালকের মতো প্রশ্ন।

যাব।

সম্প্রতি সে স্টার টিভির লাইন নিয়েছে। সাড়ে তিনটা থেকে এম টিভির কাউন্টডাউন প্রোগ্রাম শুরু হবে। ছুটির দিনে শ্যামল এবং লতিকা পাশাপাশি বসে প্রোগ্রামটা বেশ এনজয় করে। এন্ডি লিউ, আই লাভ ইউ যখন গায়, আশ্চর্য এক শিহরণ জেগে ওঠে। ভিতরে—হলুদ সবুজ পাহাড়ের বনভূমি, অথবা দিগন্ত প্রসারিত মাঠ—লিউ গায়, ঈগল পাখিটা ঢেউ খেলার মতো উড়ে বেড়ায় আকাশে—গানের সুরের সঙ্গে পাখির এই আকাশে বিচরণ কখনও এক নীল সমুদ্রের হাতছানি দেয়। লিউ পাখির মতো ডানা মেলে যেন উড়তে চায়, সারা শরীর আকাশের নিচে ভাসিয়ে দেয়। এমন উন্মাদনা গানে থাকতে পারে, লিউর গান না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। খারাপ লাগে ভাবলে—তথাগত কোনো উন্মাদনারই খবর রাখে না।

শ্যামল উঠে বসল।

এই তথাগত ওঠ। পেছন ফিরে শুয়ে আছিস কেন? কাউন্টডাউন টুয়েন্টি শুরু হবে। দ্যাখ, ভাল লাগবে। বলেই সে টিভির কাছে গিয়ে বলল, এটা স্টার প্লাস। এই চ্যানেলটা এম টিভির। পাঁচটা চ্যানেল বুঝলি। এটা প্রাইম স্পোর্টস। আর একটা নব টিপে বলল, এটা বি বি সি—এশিয়া।

তথাগত পাশ ফিরে টিভির দিকে মুখ করে সিগারেটে টান দিল। পাশে সেন্টার টেবিল ; একগুচ্ছ কামিনী ফুলের ডাল—ফুল নেই। সারা বাড়িতে শ্যামল আর লতিকা নানা জাতের ফুলের গাছ বসিয়ে দিয়েছে। এই সব ফুল এবং গাছ শহর জীবনে খুব দরকার। ইদানিং লতিকাও এটা বুঝে ফেলেছে। মাঝে মাঝে একা একা হাঁপিয়ে উঠলে গাছগুলির পরিচর্যা করে আনন্দ পায়। একটা মানুষ তো সব সময় তার সব কিছু ভরিয়ে দিতে পারে না। তারা নিঃসন্তান, আর হবে বলেও মনে হয় না। চেষ্টা চরিত্র নানাভাবে করেছে। শ্যামলের শারীরিক খুঁতের জন্যই এটা হয়েছে, জানে। তবে এই নিয়ে দু'জনের এখন কোনো ক্ষোভ দুঃখ আছে বলেও মনে হয় না। মানিয়ে নিতে পারলে সবই হয়। লতিকা এটা বোঝে, তথাগতকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। একজন যদি চলেই যায়—জীবন থেমে থাকে না।

ফুলবিহীন কামিনী ফুলের ডালও তো কম সুন্দর নয়! তথাগত সহসা এটা ভাবতেই উঠে বসল। আসলে সৌন্দর্যভোগের ইচ্ছে নিজের মনের মধ্যেই তৈরি করে নিতে হয়। কেন যে মনে হলো, ফুল যে নিয়ে যায় সকালে, সেও কম সুন্দর নয়।

গাছ থেকে হাওয়ায় ফুল ঝরছে।

ফুল মাটিতে পড়ছে।

গাছের নিচটা আশ্চর্য সাদা ফুলের নকসীকাঁথার মাঠ হয়ে যায়।

চাঁপা বসে থাকে গাছের নিচে, সেও অমূল্য হয়ে উঠতে পারে দেখার চোখ থাকলে।

তথাগত বলল, দাদা গল্প বলবে বলছিলে?

যাক তোর আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

শোন বাঞ্ছারাম, আমরা জানি, প্রেম কাউকে শেখাতে হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রেম তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বেছে নেয়। এটা কিন্তু আমাদের ঠিক ধারণা নয়। ভাল করে প্রেম করার রীতিনীতি না জানার কারণে অসংখ্য প্রেম শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। প্রেমের জোর থাকলে, যতই সে নষ্ট চরিত্রের হোক তাকে আটকে যেতেই হবে। সব পুরুষই চায় বিছানায় কোন নারী থাকুক সব নারীও চায়। চাইলেই কি, নারী যে কোনো পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শুতে পারে! আসলে প্রেম হচ্ছে মিলনের প্রাথমিক শর্ত। ঠিক মতো প্রেম না করতে পারায় কত প্রেম কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে তার হিসাবও আমরা দিতে পারি না।

একটু থেমে শ্যামল টিভির কাছে চলে গেল—এম টিভির কাউন্টডাউন টুয়েন্টি শুরু হয়ে গেছে। গান শোনা আর গল্প করার মধ্যে মজা আছে। শ্যামল একটি পাশ বালিশে কনুই রেখে বলল, প্রেম যতদিন থাকবে, ততদিন প্রত্যাখ্যানও থাকবে। প্রেম করাটাও শিখতে হয়।

কিভাবে?

বই পড়ে। অসংখ্য বই আছে বাজারে। প্রেম এবং প্রত্যাখ্যান কেন হয় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ আছে। এদেশেও তার কিছু কিছু বই নানা সময়ে বিক্রি হতে দেখেছি। আর তা যে কতটা দরকার, বোঝা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিদের অসফল প্রেম দেখে।

তা হলে বলছ রূপার সঙ্গে ঠিক মতো প্রেম করতে পারলে সে ফিরে আসবে।

ধুস। প্রেম পরস্পরের হাতছানি—তোর থাকলেও রূপার অন্তত তোর জন্য নেই। জোর করে কি কোনো নারীর উপর প্রেম চাপিয়ে দেওয়া যায়? আর রূপা তো প্রেমের যোগ্যই নয়। সে লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক—বুঝলি কিছু? একদম নষ্ট মেয়েটার কথা তুলবি না। আর যদি তুলিস, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। প্রেমের জন্য প্রথম প্রয়োজন মাত্রাবোধ। এসমস্ত বইপত্র পড়লে নিশ্চয় রবার্ট ব্রাউনিং শেষ পর্যন্ত এলিজাবেথকে নয়, তুষা রিশকভকেই স্ত্রী হিসাবে পেতে পারতেন।

রবার্ট ব্রাউনিং মানে কবি!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্রাউনিং তরুণ বয়স থেকে কবিতা পাগল, আর গভীর প্রেমের কারবারি হতে চেয়েছিলেন। কবিতা যেমন তাঁকে পাগল করে তুলত, প্রেমও। যে কবিতা পড়ে এলিজাবেথ প্রেমে পড়েছিলেন সেই 'পলিন' কবিতাটি তখনও লেখা হয়নি। বুঝতেই পারছিস এলিজাবেথের খোঁপায় তখনও ফুল গোঁজা নেই। কে এলিজাবেথ কবি জানেনেই না। কোথায় থাকে, কি করে—সে নদীর পাড়ে হাঁটছে, না পাহাড়ের কোলে পাইনের জঙ্গলে পাতা ঝরার শব্দ শুনছে তাও কবি জানেন না। অজ্ঞাত সেই মেয়েটি পরে প্রেমে পড়ল ঠিক—কবিও প্রেমে পড়লেন—তবে যাকে পেলে জীবন পূর্ণ হয় এমন ভাবতেন, তার নাম তুষা। ভারি সুন্দর নাম। প্রায় তরুণী, আশ্চর্য রূপসী এবং নীল গাউন আর সোনালী মোজা পরার বিলাস তার। রাশিয়ার এই মেয়েটিকে দেখে কবি হতবাক হয়ে গেছিলেন।

টিভিতে তখন বুম সাকা লাক।

আপাচে ইন্ডিয়ান বলেই খ্যাত এই গায়ক ভারতীয়। গল্প থামিয়ে বুম সাকা লাক গানের সঙ্গে শ্যামল তুড়ি দিতে থাকল। ওঠ। দাঁড়া।

সে টিভির ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে তথাগতকে বিছানা থেকে তুলল। নাচ ব্যাটা।

আমি পারি না।

খুব পারিস। গানটার সঙ্গে গলা মেলা। কত মুখ দেখছিস, পাগলের মতো গায়ককে ছুঁতে চাইছে। কাউন্টডাউন এ কে? মাইকেল জ্যাকসন—জানিস তো জ্যাকসনকে দেখার জন্য কোটি কোটি যুবক যুবতী পাগল।

আরে দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। গা। বুম সাকা লাক। বুম সাকা লাক।

শ্যামল দাঁড়িয়ে কোমর দোলাচ্ছে। আঙুলে তুড়ি মারছে। আর গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছে—

জানিস মাইকেল জ্যাকসন হাসলে মানিক ঝরে। কাঁদলে হীরার পাহাড়। ছুঁয়ে দিলে নারী পবিত্র হয়ে যায়। তার দেখা যে পায় সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সফল মানুষ। কিছুই দেখলি না। বাঞ্ছারাম, তুই দুটো

স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছিস। মানুষের থাকে অজস্র স্বপ্ন। মুহূর্তে তা পাল্টায়। তুই বাঞ্ছারাম সারাজীবন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করিস না। রোদ বৃষ্টি ঝড় না থাকলে জীব জীবনই না।

সহসা চিৎকার করে উঠল শ্যামল।

লতিকা, লতিকা।

লতিকার সাড়া পাওয়া গেল না। বোধহয় ওঘরে দরজা বন্ধ করে বেশ দিবানিদ্রাটি সারছে।

কাউন্টডাউন টুয়েন্টি শুরুতে সে নেই—তথাগত থেকে যাওয়ায় অন্য যুবকের সামনে কাউন্টডাউন ভোগের কিছুটা সংকোচ থেকে বলেছে, না আমি বসব না। আসলে লজ্জা। গানগুলি মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টে খুবই বেশি সুড়সুড়ি দেয়—অথচ জীবনের আসল মজাই এইখানে। লতিকাকে সে বলেছে, তথাগত আছে তো কি হয়েছে? ও কি কিছু জানে না। তুমি এতটা শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে পড়বে জানলে ওকে থাকতে বলতাম না। আসলে ও তো মানুষ নেই। ওর ধারণা বাগানে একটা ফুলই ফোটে। বাগানে যে ঋতুর সমাগম হয়, ফুলের অজস্র বাহার থাকে বিশ্বাসই করাতে পারছি না। তুমি থাকলে, ওর নিরাময়ের পক্ষে বেশি সুযোগ সৃষ্টি করা যাবে মনে হয়।

তবু সে আসেনি।

কিন্তু লতিকা জানেই না আজ পি এম ডনের ক্যাসেট দেবে।

সেই হলুদ ফুলের দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। ডন বসে আছে। গানের রিদম বড় সুন্দর। কালো মানুষটির মুখ চোখ বিষাদে ভরা। আর দূরে, কোনো অন্য পৃথিবীতে এক নারী হাতকাটা সোনালী সেমিজ গায় সমুদ্রের বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে। কি দুঃখ তার যেন—এই সমুদ্র এবং শরীর অহরহ এক ব্যাঞ্জোবাদক। ভিতরে আশ্চর্য নীরব শব্দমালা কাজ করে যায়। অগভীর এবং উষ্ণ অন্তরালে থাকে নারী এবং পুরুষের শরীর মেশামেশির অকুণ্ঠ আর্তি।

ডন নারীর সেই সুন্দর অপমান তার গানে ফুটিয়ে তুলছে।

ঝড়ো হাওয়া বইছে। সিল্কের সেমিজ হাওয়ায় নিতম্বের ভাঁজে ঢুকে নারীকে আশ্চর্য মোহময়ী করে দিচ্ছে। নারী ছুটছে। শস্যক্ষেত্র ছাড়িয়ে আরও দূরে, কোনো বনাঞ্চলে কিংবা মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে সে যেন নিঃশেষ হয়ে যেতে চায়।

লতিকা কি করছে!

সে চুপি দিল ডাইনিং প্লেসে। ঠিক দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। যা ভেবেছিল তাই। দরজা ঠেলে বলল, এই ওঠো। ডনের মিউজিক বাজছে বুঝতে পারছ না। এস, জলদি। প্রায় হাত ধরে টেনে তুলেছে লতিকাকে। লতিকা লজ্জায় কাতর কেন এত, সে বুঝছে না।

এই।

না আমার ভাল লাগছে না।

আরে তুমি কি!

এস না!

না।

প্লিজ সুন্দরী।

আমার পাশে শোও।

এই যা। তথাগত এদিকে চলে আসতে পারে

আমি আর পারছি না।

খুট করে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল শ্যামল।

মিউজিক এতটা পাগল করে দেয় নারীকে সে আগে যে টের না পেয়েছে তা নয়, কিন্তু তথাগত থেকে যাওয়ায়, মিউজিক আজ বড় বেশি জোর বাজছে।

কিছুক্ষণ।

তারপর নিবিড় সুষমা।

তারপর গভীর অবসাদ।

গান এবং মিউজিক মিলে নারীর এই আশ্চর্য অবগাহন মধুর স্বপ্নের মতো।

এবং শ্যামল তারপর কিছুটা তাড়াহুড়োই করে ফেলল। ওকে চাদরে ঢেকে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। চোখে-মুখে জল দিল। ছুটির দিনে এই গান এবং মিউজিকের মধ্যে তারা বড় বেশি উষ্ণতা বোধ করে। ডন লতিকার প্রিয় গাইয়ে।

কেন জ্যাকসন এত প্রিয় মানুষের সে বোঝে। তথাগতকে আজ যে ভাবেই হোক উষ্ণ করে তুলতে হবে। ওর মাথায় পোকা নষ্ট করে না দিতে পারলে ঋতু সমাগমে বাগানে অজস্র ফুল ফোটে বোঝানো যাবে না। ফুল যে ঝরে যায় আবার—তাও বোঝানো যাবে না।

তথাগত তুড়ি দিচ্ছিল!

ম্যাডোনা গাইছে।

দ্য রেইন।

বৃষ্টির গান।

শ্যামল বলল, এ গানটা ম্যাডোনার এরোটিক সিরিজের গান।

গানের সুর গমগম করছে।

ডিপার ডিপার।

কিরে বাঞ্ছারাম বুঝতে পারছিস, নারী কি চায়।

তথাগতর মুখ রক্তাভ হয়ে গেল।

সে সত্যি যেন এক অন্য পৃথিবীর যাদুতে পড়ে গেছে। কত রকমের বিজ্ঞাপন এবং শরীরের নানা কারসাজি বিজ্ঞাপনে, আবার গান, আবার এক নারী গাড়িতে, বিশাল সেতুর উপরে গাড়ির ভিতর পুরুষ চাইছে সে-নারীকে পেতে। জড়িয়ে ধরল।

আরে মেয়েটা করছে কি?

ঠেলে ফেলে দিচ্ছে গাড়ি থেকে। মেয়েটি রাজী না। হুস করে গাড়িটা সেতু পার হয়ে নদীর ধারে, কখনও শহরের ভেতরে যেন সেই গাড়ি এবং নারী আরও দূরে যেতে চায়।

তথাগত গানের শব্দমালা ধরতে পারছে না—কিন্তু মিউজিক তাকে নতুন নতুন স্বপ্নের ভিতর ডুবিয়ে দিচ্ছে। দৈত্যের মুখোস পরে কোথা থেকে কে হাজির। আবার মুহূর্তে হারিয়ে যায়—সব যেন পলকে দেখা যায়। আশ্চর্য, ভাল করে দেখতে না দেখতেই ছবি পর্দায় মিলিয়ে যায়। কোমর বাঁকিয়ে হেলে দুলে বিষধর সাপের মতো ফণা তুলে দুলছে জ্যানেট। হাতে ব্যাঞ্জো। অদ্ভুত মাদকতা।

জ্যানেট জ্যাকসন গাইছে। জ্যাকসনের বোন। ঠোঁট দুটো দ্যাখ বাঞ্ছারাম। কামনার কী উজ্জ্বল রঙ দ্যাখ। ভাল করে দ্যাখ। 'ইফ' মানে 'যদি' গাইছে।

'যদি' সে নদী হতে পারত।

'যদি' সে অনন্ত আকাশ হতে পারত।

কিংবা নক্ষত্র।

'যদি সে শস্যক্ষেত্রে ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারত, সারারাত হিমে ভিজে যেতে পারত।

কিংবা 'যদি' সে পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে পারত।

তার কত 'যদি'র শখ সবার। আমার তোর সবার। কত 'যদি' মানুষের জন্য অপেক্ষা করে তাকে। বাঞ্ছারাম তোর জীবনে কোনো 'যদি' নেই। ইফ কথাটা কত মারাত্মক বুঝতে পারিস।

'যদি' সে সারারাত নগ্ন হয়ে পাশে শুয়ে থাকত।

লাবণ্য তার 'যদি' কোমল ধানের শিসের মতো হতো।

অনন্ত সুঠাম স্তন, এবং গ্রীবার নাভিমূলে হাত রেখে 'যদি' সারাজীবন কেটে যেত।

তথাগত শ্যামলের কথা কিছুই শুনছে না। সে এতক্ষণ বসে ছিল। হাতে তুড়ি দিচ্ছিল। তারপর শিস দিচ্ছিল। তারপর তার কেন যে সত্যি পা এগিয়ে পিছিয়ে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

হাতে 'যদি' একটা ব্যাঞ্জো থাকত।

সে বাজাত, আর সেই কুসুম, স্বপ্নের কুসম এসে হাজির হত। এবং সেই স্বপ্নের কুসুম তার হাত ধরে মাঠের আলে কিংবা গাছের ছায়ায় নাচত। জীবনে যে একজন কুসুমের বড় দরকার।

কুসুম কুসুম, ফুটে উঠুক কুসুম। ঘাসের ঘ্রাণে ফুটে উঠুক।

কুসুম কুসুম, তোমার হাতে ফুলের সাজি। ফুল তুলছ কুসুম! কেন এত ব্যবহার কুসুম, তবু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না।

কার জন্য।

মালার সৌন্দর্য কি দেবতার ভোগে লাগে? দেবতা বড়ই নিষ্ঠুর। তার যে দেখা পাওয়া যায় না কুসুম।

কুসুম কুসুম।

শ্যামল বুঝতে পারছে না তথাগত বিড়বিড় করে কি বকছে। দু'জনেই কিছুটা বুঁদ হয়ে আছে। ঝপ করে কাউন্টডাউন টুয়েন্টি বন্ধ হয়ে গেল। অন্য প্রোগ্রাম।

তথাগত যেন জলে পড়ে গেল।

বলল, যাঃ কি হলো!

শ্যামল বলল, সব মাটি। এরা যে কি করে! এমন হাইটে কেউ প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে দেয়।

দরজায় তখন লতিার আবির্ভাব।

তথাগত দেখল লতিকা বউদিকে। বড়ই পবিত্র নারী। এইমাত্র প্রসাধন সেরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কানে বড় ইয়ারিঙ। ভরা মুখ। সদ্য ঘুমভাঙা নারীর মাধুর্য কত বিস্ময়কর হয় তথাগত লতিকা বউদিকে দেখে প্রথম যেন টের পেল।

শ্যামলও দেখছে লতিকাকে। কিছুক্ষণ আগে সেই আশ্চর্য অবগাহনের কথা মনে হলো তার। কেমন ঘোরে পড়ে যায় তখন লতিকা। হুঁশ থাকে না। আর এখন সারা শরীর ঢেকে সে দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অচেনা মানুষের মতো দেখছে।

কিছু বলবে?

টিভিতে মজে থাকলেই হবে।

কিছু করতে হবে?

আরে না। চা-টা খাবে না!

শ্যামলের মনেই ছিল না, এসময়ে তারা দু'জনেই বসে চা খায়। টি টাইম। কিন্তু চা দেবে কি দেবে না এই নিয়ে লতিতার মনে কি সংশয় ছিল! সে তো সোজা চা নিয়ে চলে এলেই ভাল দেখাত।

লতিকা বলল, দুই বন্ধুতে কত মজে গেছ দেখলাম। চা এলে ডিস্টার্বড না হও আবার।

তথাগত তাকিয়েই আছে।

সেই চাষী বউটি যেন। কুসুম তার নাম। সে তো বড় হয়ে এমন একটা স্বপ্নই দেখেছে। সারাদিন খাটাখাটনি। বাড়ি ফিরে দেখবে কেউ তার অপেক্ষায় জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। এই অপেক্ষা কত যে দরকার জীবনে যে জানে, সে জানে। স্বপ্নটা এই করে তাকে পাগলও করে দিচ্ছে। আসলে রূপা নয়। যে কোনো নারীই তার জানালায় দাঁড়িয়ে থাকলে মায়া পড়ে যাবে। লতিকা বউদি দাঁড়িয়ে থাকলেও।

লতিকা কিছুটা লজ্জায় পড়ে গিয়ে বলল, কি দেখছেন!

লতিকা বউদি তুমি বড় সুন্দর। তোমার সব কিছুই খুব সুন্দর, তাই না!

কথাগুলোর মধ্যে অশ্লীলতার আঁশটে গন্ধ আছে তথাগত হয়তো জানেই না। শ্যামলের চোখে মুখে কিছুটা অস্বস্তি ফুটে উঠছে।

তুমি কী সুন্দর! তোমার সব কিছুই না জানি কত সুন্দর—এটা কত অশ্লীল ইঙ্গিত তথাগত বুঝতে পারলে তার সামনে লতিকাকে এমন কথা কখনোই বলতে সাহস পেত না। শ্যামল ধমকও দিতে পারল না। সরল বালকের মতো তথাগতর কথাবার্তা। কাকে ধমক দেবে! এমন একটা শিশুর মতো সরল মানুষকে যে নারী ধোঁকা দেয়, তার কি সামান্য পাপবোধও নেই? ব্যবহৃত হতে হতে, ব্যবহৃত হতে হতে, একদিন সব উষ্ণতা ছাই হয়ে যাবে, নারী কি বোঝে না!

লতিকা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকাও বিড়ম্বনার সামিল ভাবতে পারে। সে চলে গেছে।

রান্নাঘরে খুটখাট আওয়াজ।

শ্যামল একবার উঠে যাবে ভাবল। কিছু যদি সত্যি ভেবে থাকে। এ কি অসভ্য কথাবার্তা। মাথার সত্যি ঠিক নেই, হুট করে চলে এসেছে, তার তো আসার কথা নয়। সাহস পেলে আরও কিছু যে করে বসবে না কে জানে। লতিকার সুন্দর জিনিসগুলি নেড়েচেড়ে দেখলে তার খুব ভাল লাগবে এমনও বায়না করতে পারে। লতিকার অভিযোগ থাকতেই পারে। তোমার বন্ধুটি অবোধ ভাবার কারণ নেই। যথেষ্ট সেয়ানা। এমনও ভাবতে পারে। তথাগতর হয়ে সাফাই গাইতেই সে ভাবল একবার উঠে যাওয়া দরকার। এবং সে যখন কিচেনে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল, দেখছে লতিকা ট্রেতে চা নিয়ে আসছে। চোখে মুখে তার আশ্চর্য সুষমা।

শ্যামল কিছুটা যেন অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। সে ট্রেটা লতিকার হাত থেকে নিয়ে কাজে সাহায্য করল যেন।

নে বাঞ্ছারাম।

তথাগত বলল, বউদি আজ আমি থাকলে তুমি রাগ করবে?

শ্যামল কিছু বলতে যাচ্ছিল, আর তখনই লতিকা বলল, থাকুন না। আপনি তো আসতেই চান না। থাকলে আপনাকে আমরা খেয়ে ফেলব না। কথা দিচ্ছি।

লতিকা এত সহজ হয়ে যাবে শ্যামল আশাই করতে পারেনি।

লতিকা ফের বলল, আজ কেন, যতদিন খুশি থাকুন। তবে আপনার দাদা কি পছন্দ করবে?

লতিকা নিজের চা-এর কাপ হাতে নিয়ে ট্যারচা চোখে তাকাল শ্যামলের দিকে।

ডিশে ডালমুট।

লতিকা আলগা করে দু' এক কণা ডালমুট জিভে ফেলে কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। চিবোচ্ছে না। শ্যামলের মনে হলো, ডালমুট লতিকা দাঁতে কাটছে। দাঁতগুলোর এই অভ্যাস যেন লতিকা নিজেই দারুণ রেলিশ করছে। লতিকা কি নিজেকে এভাবে বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়।

তখনই শ্যামল বলল, বাঞ্ছারাম তুষার গল্পটা কিন্তু শেষ হয়নি!

তাইতো। তথাগত নড়েচেড়ে বসল।

বুঝলি প্রাণের মানুষকে পাওয়ার স্বপ্ন রোমান্টিক বিলাস। মানুষ সেই তাড়নার বশেই প্রাণের মানুষ খুঁজে ফেরে। তাকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকে অহরহ। কখন যেতে যেতে কে যে কোন গাছের নিচে তাকে খুঁজে পায়, কখন যেতে যেতে কে যে দূর ওয়াগনে মাল বহনের শব্দ শোনে, আবার পতনেরও শব্দ হয়। আশঙ্কা আতঙ্ক কত—পুরুষকে সব জয় করতে হয়। জয় করতে না পারলে সে রাস্তার ধারে পড়ে থাকে।

আসলে তোকে আগেও বলেছি, মাত্রাবোধ। ব্রাউনিংএর সেটাই ছিল না। তুষাকে কি বললে খুশি হবে, তুষা ভাববে কবির সঙ্গে তার প্রেম অনিবার্য, কবি তাই জানত না। রাশিয়া থেকে আসা একদল আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তুষা এসেছে লন্ডনে। মিউজিয়ামের ভাস্কর্য গ্যালারিতে দুজনের দেখা। আলাপ এবং পরিচয়। তুষার ইংরাজী উচ্চারণ খুবই ভোঁতা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেই ইংরাজী বলতে পারে। তুষার সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ। চোখ দুটো গভীর নীল এবং সোনালী কেশে রূপোর মতো ঝকঝক করছে তুষারকণা। বরফের নদীতে তারা হেঁটে গেছে। গীর্জার দেয়ালে হেলান দিয়ে ঈশ্বরের মতো কথা বলতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু কিশোরী তুষার যেন কোথায় একটা খামতি আছে। তিনি যে কত বড় কবি তুষা হয়তো বুঝতেই পারছে না। তা না হলে তার সঙ্গে আর দশটা বন্ধুর মতোই বা ব্যবহার করতে চাইবে কেন? অথচ তুষার মধ্যে প্রেমের কোনো খামতি নেই। তুষা তাঁকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ছে, তিনিও তুষা কাছে না থাকলে অস্থির হয়ে পড়ছেন।

তথাগত চেয়ে আছে। কোনো শীতের শহরে তুষা হেঁটে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে সে।

মুশকিল কি জানিস বাঞ্ছারাম, কত বড় কবি ব্রাউনিং আর কতটা যোগ্যতাসম্পন্ন বোঝাতে গিয়েই ঠেলা খেলেন তুষার কাছে।

তুষা কেন তোয়াক্কা করবে কবিতার। সে তো যুবক ব্রাউনিং-এর প্রেমে পড়েছে। তার কবিতার প্রেমে পড়েনি। কবি তা বুঝলেনই না।

কবি নাছোড়বান্দা।

আগে তাঁর কবিতা বুঝতে হবে।

এক বিকেলে তুষা এল। পাশাপাশি বসার ঘরে বসল। গরম কফি খেতে খেতে কবি ঢাউস একটা খাতা বের করে পর পর কবিতা পড়ে গেলেন।

তুষা শুনছে কি শুনছে না বুঝতে চাইছেন না।

এই আর একটা কবিতা। এটা লিখেছি এক গভীর রাতে। স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া, শব্দসমূহ দেখ আশ্চর্য এক মুগ্ধতা তৈরি করছে।

কবিতাটি এত প্রিয় কবির যে আগাগোড়া না দেখে চোখ বুজে পড়ে গেলেন।

শীতেও কবিতা শুনতে শুনতে তুষার ঘাম হচ্ছিল।

বোঝো কবির নির্বুদ্ধিতা।

তিনি তো থামলেনই না, বরং অতি উৎসাহে তিনি কবিতা পড়েন আর তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি যে কত বড় কবি, এতেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে কবিতার সমকালীনতা বিষয়ে দীর্ঘ ভাষণ।

তুষার আগ্রহ ভাস্কর্যে। সে বিষয়ে কবি একটা কথাও বললেন না। টানা কয়েক ঘণ্টা চলল এই ভাষণ, ব্যাখ্যা, কবিতা পাঠ। শেষে তুষার দিকে তাকিয়ে ব্রাউনিং জানতে চাইলেন কী রাজী? তুষা স্থিরভাবে বলল, না। আমি কোনো কবিকে বিয়ে বা প্রেম করতে পারব না। আপনি পথ দেখতে পারেন।

ফোন।

কে?

আমি শ্যামদুলাল।

আরে কেমন আছিস? সেই যে খবর দিলি, আরও কি সূত্রের খোঁজে আছিস তার কি হলো? বাঞ্ছারাম আমার বাড়ি চলে এসেছে। বউর কাছে যাবে বলছে।

একটু ধৈর্য ধরতে বল। তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। ও তো আর দেখাই করছে না।

ও মানে?

আরে রূপা। সিঁড়ি ধরে উঠে গেলাম। দরজায় নক করলাম। বুড়ো মতো একটা চাকর দরজা খুলে দিল। বসতে বলল। রূপার কথা বলতেই জানাল, তিনি তো বাসায় নেই। বের হয়ে গেছেন।

আমার যে খুব দরকার।

কি দরকার বলে যান, এলে দিদিমণিকে বলে দেব।

তোমাকে ভাই বলা চলবে না। জরুরী কথা আছে। ওকেই বলতে পারি।

শ্যামল বলল, তাহলে বামালসহ ধরা দেবে না বলছে।

অন্যপ্রান্ত থেকে শ্যামদুলাল বলল, কেস জটিল। বুড়ো লোকটা ছাড়া কাউকে দেখতে পাই না কেন বুঝছি না। ওর এক বান্ধবীর খোঁজে আছি। দেখি কি করতে পারি।

ওর আর খোঁজ করার কি দরকার আছে? ডিভোর্স পেলেই বাঞ্ছারাম বেঁচে যায়।

বাঞ্ছারামকে তুই এখনও চিনলি না। বউকে দেখার জন্য সে পাগল, সে ডিভোর্সের কথা বললে যে ভিরমি খাবে।

তা জানি। তবে বাঞ্ছারাম আজকাল নাকি স্বপ্ন দেখে না। সকালে শিউলিতলায় যে ফুল তোলে তাকে দেখে।

বাঞ্ছারাম স্বপ্ন দেখে না, বলিস কি! দুটো স্বপ্নের একটাও না!

তাইতো বলল।

তথাগত কেবল বলছে, আমাকে দাও। কি আজেবাজে বকছ। শ্যামদুলালবাবুর সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

শ্যামদুলাল, তোর সঙ্গে তথাগত কথা বলতে চায়। ধর।

তথাগত বলছি।

বলুন।

ওর কাছে যদি যাই রাগ করবে?

খুবই রাগ করবে। আপনার আসা উচিত হবে না। আপনি এত বড় ধোঁকা খাবার পরও দেখা করতে চান।

কি করব বলুন। মন মানছে না। ওর প্রেমিকের খোঁজ পেলেন? ছেলেটির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?

না।

একবারও দেখা হয়নি?

না। দেখা হলে আপনার কি লাভ?

লাভ যে কি! ও কেমন দেখতে জানতে ইচ্ছে করে। রোগাপটকা?

দেখাই হয়নি।

রূপা কিছু বলেনি?

না, কিছু বলেনি।

তাহলে বলছেন, আমার যাওয়া উচিত হবে না।

আপাতত তাই মনে হচ্ছে।

দেখা হলে কিন্তু বলবেন, ও যখনই ডাকবে চলে যাব। আমি এখন আর স্বপ্ন দেখছি না সকালে।

কবে থেকে?

এক হপ্তা হয়ে গেল।

এক হপ্তা দেখেননি, আবার যে দেখবেন না তার ঠিক কি! হয়তো কাল ভোর রাতেই আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পেয়েছি। একটা স্বপ্নে প্রতীক্ষার কথা আছে, আর একটা স্বপ্নে আত্মহত্যার ইঙ্গিত আছে। আপনার এক নম্বর স্বপ্নটা ঐ যে চাষীবৌ, আর কি যেন, ভুলে গেছি, যাকগে আপনার পৃথিবীতে সবই ঠিক আছে। তবে বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখা ঠিক না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক না। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই ভয়ের।

তাহলে বলছেন বুড়ো মানুষের স্বপ্নটা আর দেখব না!

না দেখলে ভাল হয়।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

করুন। আর সময় হলে দেখা হবে ঠিকই। আপনার স্ত্রী খুবই বড়লোক হয়ে গেছে। সাকসেসান সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। কাজেই খুব ব্যস্ত। তার মামার কোথায় কি আছে, কি রেখে গেছে, স্থাবর অস্থাবর সব সে বুঝে নিচ্ছে। আপনার কথা ভাববার সময় পাচ্ছে না। ভাবলেই আপনাকে দেখার ইচ্ছে হবে। তখন দেখা করলে নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

ওকে বলবেন, ও ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকব।

শ্যামলের কেন যে চোখে জল চলে এল। আশ্চর্য প্রেম। কি যে হবে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারছে না। দুষ্ট নারীর সংসর্গ থেকে তথাগতকে রক্ষা করাও কঠিন। শ্যামদুলাল কিছু চেপে যাচ্ছে না তো? সব খুলে বলছে না। শ্যামদুলাল নিজেই জড়িয়ে পড়েনি তো? নষ্ট মেয়েরা সম্পত্তির লোভে সব করতে পারে। মামার সম্পত্তি হস্তগত করা গেল, তারপর তথাগতর সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য সত্যি যদি ফিরে আসে এবং স্ত্রীর অভিনয় করে মজিয়ে দেয়, তারপর সে তার নামে সব লিখিয়ে নেয়, এবং এসব নষ্ট মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই। এক সকালে খবরও আসতে পারে—তথাগত আর নেই।

ওর বুকটা কেঁপে উঠল।

রূপার একার বুদ্ধিতে এতটা হতে পারে না। পেছনে আরওকোনো ধূর্ত লোকের হাত থাকতে পারে। তথাগতর চরিত্র বুঝে ফেলেছে। দুর্বলতাও। দুর্বলতার উপর ভর করেই নষ্ট মেয়েটা যা খুশি

তাই করে বেড়াচ্ছে। অথচ সে যতবার গেছে, রূপা তাকে না খাইয়ে ছাড়েনি। দাদা দাদা বলে একেবারে নিজের বোনের মতো জোর খাটিয়েছে।

না, এবেলা যাবেন না।

না, আজ দুপুরে খেয়ে তবে যাবেন।

এবারে যখন আসবেন বউদিকে নিয়ে আসবেন। বউদি কেন আসে না। বউদিকে ফেলে কোথাও একা যেতে আপনার খারাপ লাগে না?

আশ্চর্য সেই মেয়েটাই কিনা এমন একটা অসহায় মানুষকে ফেলে গা ঢাকা দিয়ে আছে।

আসলে কি রূপা সব খবরই রাখে। তথাগত রোজ অফিসে যাচ্ছে কিনা, ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে কিনা, এবং রাতে ঘুমাচ্ছে কিনা, এমন সব খবর সে রাখতেই পারে। সনাতন বউদির সঙ্গে বেশ ভাব ছিল। সনাতন বউদিও কিছু বলছে না। একেবারে সবাই চুপ মেরে গেল, অন্তত আভাসে ইঙ্গিতে সনাতন বউদি তথাগতকে আশ্বস্ত করতে পারত। করেনি যে কে বলবে। তা না হলে বলতে পারে, ও ঠিক ফিরে আসবে। ও ঠিক ফোন করবে।

শ্যামদুলাল তখন ফোনে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে—কি বলছে কেন বলছে বুঝতে পারছে না। বান্ধবীর খোঁজ পেলে কি সীতাহরণ পালার যবনিকা টানা যাবে। যাই হোক শ্যামদুলালই বলল, ঠিক আছে ছাড়ছি। পরে কথা হবে।

পরে কথা হবে। পরে কথা হবার আর কি আছে! আর খোঁজারই বা কি দরকার! শ্যামল খুবই ক্ষেপে গেল।

কোনোরকমে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তোলা গেলে ভাল হয়। বিবাহবিচ্ছেদের মামলার আইন-কানুন সে কিছুই জানে না। শুনেছে, দুবছর না একবছর দু-জনকেই আলাদা থাকতে হয়। বিচ্ছেদের মামলা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সবচেয়ে ভাল হতো, যদি রূপা মামলাটা তুলত। ওর পক্ষে খুবই সহজ হতো ডিভোর্স পাওয়া। তার পর শিউলি ফুলের জন্য সকালে যে জেগে যায়, তারসঙ্গে কথাবার্তা বলে বোঝা যেতে পারত। পাত্র হিসাবে তথাগত লুফে নেবার মতো। তবে তার এই এক দোষ, বড্ড লাজুক, স্পর্শকাতর আর চাপা। হাসতে জানে না। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারে না। শোক-তাপ কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না।

তখনই ফোন ছেড়ে দিয়ে শ্যামল বলল, শোন বাঞ্ছারাম, আর একটা গল্প বলছি শোন। আজ না হয় থেকেই যা। তোর বউদিরও ইচ্ছে, তুই থেকে যাস। মেয়েদের কিছুই বোঝার উপায় থাকে না। তুই কত নিরুপায়, তুই কেন, আমরা সব স্বামীরাই হাড়ে হাড়ে এটা টের পাই। গল্পটা শুনেই যা। গল্পটাও শোনা হবে, তোর বৌদিকেও খুশি করা যাবে।

বলেই শ্যামল লতিকার দিকে তাকাল। লতিকা শ্যামলের কথা আদৌ ভ্রূক্ষেপ করল না। যা খুশি বলুক এমন ভাব। পুরুষদেরও চিনতে বাকি নেই। কে কত সাধু লতিকা যেন ভালই জানে। আসলে খোঁটা। তথাগত যে কোনো দিন আসতে পারে। তথাগতকে একটু চা-টা খাইয়ে বিদায় করে দিও। মাথার ঠিক নেই। কী করতে কী করে বসবে ঠিক কি! শ্যামল এমন না বললে লতিকা ঘাবড়াত না। এখন তিনিই বলছেন, মেয়েদের কিছুই বোঝার উপায় থাকে না।

লতিকাও বলল, থেকেই যান। কাল সকালে খাওয়াদাওয়া করে দুই বন্ধুতে একসঙ্গে অফিসে চলে যাবেন। তারপর উঠে যাবার সময় লতিকা বলল, গল্প শেষ হলে বসে যেও না। ফ্রিজ কিন্তু খালি। বাজারে যেতে হবে।

লক্ষ্মী তুমিই যাও। আমার আর বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নরম দেখে পাঁঠার মাংস কিনে এনো। বাঞ্ছারাম কচি পাঁঠার মাংস পছন্দ করে। কালীর দোকানে খুঁজলে মনে হয় পাবে।

দুই বন্ধুতে বের হলো সিগারেট কিনতে। রাস্তায় নেমেই শ্যামল বলল, দ্যাখ বেচারা তরুণ ব্রাউনিং যদি জানতেন প্রেমের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে নেই, তবে হয়তো 'পথ দেখতে পারেন' শুনতে হতো না। আর জানিস অজ্ঞাতে সবচেয়ে প্রিয়জনের সঙ্গেই আমরা সবচেয়ে খারাপ ব্যবহার করি। আমরা

টেরই পাই না কতটা সে খারাপ ব্যবহার, কতটা সে আঘাত পেতে পারে। প্রিয়জনকে আঘাত করে রক্ষা পেয়ে যাওয়া সহজ।

আমি তাকে কিছুই করিনি দাদা। বিশ্বাস কর। তাকে আমি আঘাত করতে পারি!

যাকগে। যেজন্য বলছিলাম—রূপার আশা তুই ছেড়ে দে। আর ও মেয়েটা তোর কাছে ফিরে এলে কি যে হবে বুঝতে পারছি না। তুই তো জীবনের ভালমন্দ বুঝিস না। সে আসবে না। আসতে পারে না। তবে প্রেম তো থেমে থাকে না। কাউকে তোর ভাল লেগে যেতেই পারে। নিজের দোষে সেটা না আবার ডোবে তাই তোকে বলছি।

শোন বাঞ্ছারাম, প্রেমের যথার্থ কোনো সংজ্ঞা নাই। কার প্রেম কিভাবে দেখা দেয় কেউ বলতে পারে না। প্রেম খুব দীর্ঘায়ু হয় না। তাকে লালন করে যেতে হয়। আমি কি বলতে চাই বোঝার চেষ্টা করবি। তুই যদি তুখোড় প্রেমিক হতিস, রূপা যাকেই ভালবাসুক না কেন, তাকে তুই জয় করতে পারতিস। সে কিছুতেই তোকে ছেড়ে যেতে না। তুখোড় কেন, তুই প্রেমের অ আ ক খ কিছুই বুঝিস না। তার সঙ্গে তুই খুবই ভাল আচরণ করেছিস—এটা ধরে নিয়েও বলতে পারি, তোর ভাল আচরণের কোনো দামই ছিল না তার কাছে। সে তোর কাছে অন্যরকমের আচরণ আশা করত।

ওকে তো কম তোষামোদ করিনি দাদা!

ভাল আচরণ মানেই যে সবসময় তোষামোদ করা কিংবা কথায় কর্মে মুখরিত করে রাখা তা কিন্তু নয়। হয়তো সামান্য হাসিই প্রেমের অধিক বস্তু। হয়তো অনেক বড় হয়ে প্রেমিকার কাছে তার অর্থ বহন করে নিয়ে যায়। বিশেষভাবে প্রিয়তম প্রিয়তমার কাছে। দু প্যাকেট সিগারেট দাওতো রফিক ভাই।

রফিক ভাই দু প্যাকেট সিগারেট দিলে, তথাগত বলল, আমি দিচ্ছি।

তুই দিবি কেন? আমার কি পকেট খালি!

প্যাকেট দুটো পকেটে ভরে বলল, রফিক চিনতে পারছ মক্কেলকে? আমাদের তথাগত। একসঙ্গে মাঠে ফুটবল খেলতাম! বণিকবাবুদের বাসায় ভাড়া থাকত।

রফিক বলল, মুখটা তাই খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। এখন কোথায় আছেন?

শ্যামলই বলল, টিটাগড়ে থাকে। আমরা একই অফিসে আছি। তারপর শ্যামল হাঁটা দিল—পিছু পিছু যাচ্ছে তথাগত। একটা সিগারেট ধরিয়ে চারপাশের বাড়িগুলো দেখল। শৈশব কৈশরের কত স্মৃতি এইসব বাড়ির দরজা জানালায় ভেসে আছে—ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল তথাগত।

এই পেছনে পড়ে থাকলি কেন! আয়।

তথাগত চারপাশ দেখছে। এই সেই মেহেদির বেড়া, বেড়া ডিঙিয়ে সে কতবার গেছে ঘুড়ি ধরতে। শ্যামল দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এলে বলল, যা বলছিলাম—যিনি হাসলেন তাঁর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হলো না, অথচ যার জন্য হাসলেন, সে অনেকটা আশ্বাস, ভালবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ, সাহস আর মাধুর্য লাভ করল। প্রেম করতে গিয়ে যাঁরা অকারণে হাসেন না, তাঁদের তো প্রিয়সঙ্গ সুখেরই হতে পারে না। চম্পাবতী যে ফুল তুলে নিয়ে যায়, তাকে ডেকে একবার কথা বলেছিস? হেসেছিস? মেয়েটার তোর প্রতি দুর্বলতা আছে টের পাস? তোর ঘোরের সময় সে যা করেছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

জানো চম্পাবতী সব ফুল তুলে নিয়ে যায়—একবার আমাকে বলে না, রণ্টুদা ফুল নিচ্ছি, কিছু মনে করছ না তো!

তুই বলতে পারিস না, এই ফুল তুলছ কেন?

আমার তো ফুলের দরকার হয় না। অকারণে ওর সঙ্গে কথা বলতে যাব কেন!

আচ্ছা ছেলে মাইরি তুই! ফুল নিলে কষ্ট হয়। তোর গাছের ফুল নিলে, অধিকার খর্ব হচ্ছে ভাবতেই পারিস। অকারণ হবে কেন? শোন প্রেমের যাবতীয় আচরণ অধিকাংশই যে অকারণ। অকারণ আচারণ প্রেমের সম্পদ। অকারণ হাসিও প্রিয়তমার কাছে মণিমুক্তোর মতো। জানিস সামান্য একটুকু হাসির জন্য রিচার্ড বার্টনের মতো অভিনেতাকেও কাত করে দিয়েছিল।

বলছ কি দাদা! বার্টন প্রেমে পড়ে গাড্ডু খেয়েছে!

হ্যাঁ খেয়েছে। বই পড়ে জেনেছি। বইটা পড়লে তোর উপকার হতো বাঞ্ছারাম।

ওরা বাড়ির কাছে এসে গেছে। দুটো কুকুর তাড়া করছিল একটা বেড়ালকে। তারা রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামল সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দেবার সময় বলল, পর্দায় যতই হাসুন, ব্যক্তি জীবনে বার্টন বেশ রাশভারি লোক। বার্টন রোজ একটু করে হাসতে পারলে, এত বড় ভরাডুবি হতো না।

বুঝলি বাঞ্ছারাম তখন বার্টনের অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা হয়নি। গম্ভীর প্রকৃতির সৌম্যদর্শন সদ্য যুবক বার্টনের মনে একসময় প্রেম এল। নাম তার এমিলি, সদ্যযৌবনা এক কিশোরী। অসাধারণ দেখতে। বার্টন তাকে দেখে খুবই মুগ্ধ। কিন্তু বাহ্যিক প্রকাশ বড্ড কম।

বুঝলি বাঞ্ছারাম বার্টন অবশ্য তাকে দামি দামি উপহার দিতে ভুলতেন না। নিজে দুর্লভ বনবিড়াল শিকার করতে গেছেন। মুচিকে দিয়ে বিড়ালের চামড়ার জুতো বানিয়ে দিয়েছেন। জুতো নিয়ে সরাসরি হাজির হয়েছেন এমিলির বাড়িতে। জুতো ঠিকমতো পায়ে ফিট না করলে সারাদিন নিজে বসে মুচিকে দিয়ে এমিলির পায়ের উপযুক্ত জুতো বানিয়ে দিয়েছেন। বার্টনকে নিয়ে নৌকাভ্রমণ থেকে রেলভ্রমণ এবং কখনও পাহাড়ে অথবা নদীর চড়ায়—সর্বত্রই ঘুরে বেড়াতে গেছে এমিলি, কিন্তু বার্টন হেসে কথা বলেন না। এমিলি কত সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতে দেরি করেছে বার্টনের একটুকু হাসির জন্য। বার্টন সাড়া দেননি

আচ্ছা দাদা তুমি সবই বলছ ঠিক, কিন্তু বার্টনের হাসি না পেলে হাসবে কি করে! নকল হাসি কি খুব ভাল?

প্রেমের ব্যাপারে নকল হাসির খুব দরকার। না হলে এমিলি সেই নাটকীয় ঘটনাটা ঘটাতে পারে? বার্টনকে বুঝিয়ে দিতে এমিলি একজন বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, ভায়া তোমার হাসির কত দাম!

বেয়ারা বলল, ওটা ফ্রি।

এমিলি হতবাক। বলল, হাসি ফ্রি দিলে ক্ষতি হয় না?

বেয়ারা বলল, না হাসলেই ক্রেতা পালায়। তারা ভিড় করে হাসির মোহে। হাসির মতো সহজ অথচ সুন্দর উপহার আর কি আছে ম্যাডাম।

এমিলির পরের প্রশ্ন। হাসির সময় পাও কি করে?

একগাল হেসে বেয়ারা লাজুক মুখে কি বলল বল তো?

তথাগত ঘরে ঢুকে খাটে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। লাজুক মুখে বেয়ারা কি বলতে পারে সে ভেবে পাচ্ছে না।

কি পারলি না তো! সোজা বলল, হাসির কি আর সময় অসময় আছে!

কী বলতে চায় বেয়ারা? অর্থটা ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে এমিলিও জোরে হেসে উঠল। বার্টন ক্ষেপে বোম। তাঁকে পরিহাস করা হচ্ছে। তিনি উঠে দাঁড়ালেন টেবিল থেকে।

এমিলিও কম যান না। তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। গলার টাই ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন বার্টনকে। চিৎকার করে বললেন, বিদায় জানানোরও একটা ভাষা আছে। তাও দেখছি ভুলে বসে আছ। আমি আর সম্পর্ক রাখতে চাই না তোমার সঙ্গে। বিদায়।

আর তখনই লতিকা বলল, কী গল্প হচ্ছে!

আরে সেই গল্পগুলি শোনালাম। কাগজে পড়লে না! রিচার্ড বার্টন, ব্রাউনিং।

লতিকা বলল, গল্পগুলি সবার ক্ষেত্রে সত্য নাও হতে পারে। সব মানুষ তো একরকমের না! ঠিক আছে বাজারে যাচ্ছি। তথাগত আমার সঙ্গে বাজারে যেতে আপত্তি আছে? না থাকলে চলুন।

সাঁজ লেগে গেছে। রাস্তার আলো, ঘরের আলো জ্বলে উঠেছে সব। সামনে পার্ক। দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ হল বলে। দরজা খুললেই কাজের মেয়েটা ঢুকে যাবে। কাজটাজ সেরে চলে যাবে।

শোন মণি, পেঁয়াজ আদা রসুন কেটে রাখবি। দুটো গ্লাস ধুয়ে রাখ। তারা বাজারে বের হয়ে গেলেই বাবুর ফরমাসের বহর শুরু হবে

তখন এক কথা মণির রাখছি। তবে রাতে মসলা বাটতে হয় না। এটা বাড়তি কাজ। দাদাবাবু পুষিয়ে দেয়। রানীটুনির সংসার—টাকা খাবে কে! সে সব কথায়, হ্যাঁ যাই দাদাবাবু, আর কি লাগবে।

শসা কেটে রাখ, আদা কুচিয়ে রাখ—এখন আর বলতে হয়না। সে সবই ডিসে ডিসে সাজিয়ে দেয়। আলুসেদ্ধ ডুমো ডুমো সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। চাকা চাকা পেঁয়াজ। আর কিছুক্ষণ বাদেই হাবুলবাবু আসবেন। দুজনই দাবা খেলায় মত্ত থাকেন। টিভি চলে—তবে তখন বাবু টিভি দেখেন না। ঐ কাঠের গুঁটিগুলির মধ্যে এত কি মজা আছে ললিতা বোঝে না। কাঁচা ছোলা আলাদা রাখতে হয়। কুট কুট করে দু'জনেই খায়। আর মাঝে মাঝে কিস্তি মাত বলে চিৎকার করে ওঠে। তার হাসি পায় শ্যামলের ছেলেমানুষী দেখে।

একটা সেন্টার টেবিল, দু'পাশে দুটো চেয়ার। শ্যামল টেবিলের উপর থেকে মাসিক-পাক্ষিক কাগজগুলি তুলে দেয়ালের র‍্যাকে রেখে দিল। কাঠের বাক্সটা খুলে গুটি সাজাল। যতক্ষণ না হাবুলবাবু আসবেন একা একা খেলারও তার নেশা আছে। মণি এসেই ঠাণ্ডা জলের বোতল রেখে দেবে। একটা ডিসও রেখে দেবে। কিছু কাজুবাদম আর কাঁচা ছোলা।

তথাগত কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। লতিকা বৌদির সঙ্গে বাজারে যেতে পারে, কিন্তু তার যে ইচ্ছেই হচ্ছে না বাজারে যেতে। যাওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতেও পারছে না। শ্যামলদা না বললে সে যায় কি করে! এই ভেবে একবার শ্যামলদার দিকে তাকাল, একবার দরজার দিকে।

এমন ভীরু স্বভাবের বলেই শ্যামলের যত রাগ তথাগতের উপর। আরে ছোঁড়াটা কি! বুদ্ধিসুদ্ধি এত কম! লতিকার কথায় কোনো সাড়াই দিল না। চুপচাপ বসে আছে!

কি রে, তোর কি বাজারে যেতে আপত্তি আছে?

না তো।

তবে বসে থাকলি কেন, যা!

যেতে বলছ!

না, বসে থাকতে বলছি! ওঠ বলছি। যা বাজারে।

শ্যামদুলাল যদি ফোন করে?

করলে করবে।

আচ্ছা দাদা, শ্যামদুলালবাবু ফোনে যদি বলে, এখুনি তথাগতকে নিয়ে চলে আয়। রূপার খোঁজ পাওয়া গেছে। তখন তো আমি কাছে থাকব না। বাজারে থাকব। সঙ্গে সঙ্গে না গেলে রাগ করতে পারে।

শোন বাঞ্ছারাম, শ্যামদুলাল তোমার মত বউপাগল নয়। তোমার বুউকে খোঁজার তার দায়ও নেই। ওর আরও অনেক কাজ আছে। তুই কি করে ভাবলি, শ্যামদুলাল তোর বউএর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে! কাগজের লোক, সব শুনে বলল, দেখছি কি করা যায়। পুলিশের উপরয়ালাদের সঙ্গে তার দহরম মহরম আছে। নানা লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা আছে। কাগজের রিপোর্টার বলে যে কোনো জায়গায় ঢুকতেও পারে। আটকায় না। তোর বেচারা মুখ দেখে নিজ থেকেই সুযোগ সুবিধে মতো খোঁজ-খবর করছে। খোঁজ পেলেই তোকে নিয়ে চলে যেতে বলবে, এমন ধারণা তোর হয় কি করে বুঝি না। তোর এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব বাঞ্ছারাম! যা ওঠ। বউ পালালে একটা মানুষ আস্ত বুদ্ধির ঢেঁকি হয়ে যায়, তোকে না দেখলে বুঝতেও পারতাম না।

লতিকা দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল, তথাগত সোফায় বসেই আছে।

কি হল? চলুন?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি না। উঠুন বলছি।

নিমরাজি গোছের মুখ করে সে উঠে পড়ল। তার কেন যে মনে হচ্ছিল, যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কারণ শ্যামদুলালবাবু রূপার ফ্ল্যাট খুঁজে পেয়েছে। সে একজন বুড়োমানুষকেও দেখেছে। সেখানে বুড়োমানুষ যখন আছে, তখন কুসুমও থাকতে পারে। কুসুম না থাকলে বুড়োমানুষ থাকতে পারে না।

শ্যামদুলালবাবু একবার গিয়ে শুধু বুড়োমানুষটার খোঁজ পেয়েছে, এবারে গেলে বুড়োমানুষ এবং কুসুম দু'জনকেই দেখতে পাবে। স্বপ্নের কুসুম যে রূপা ছাড়া কেউ না, তাও সে টের পেয়েছে।

সে ওঠার সময় বলল, তা হলে যাই দাদা?

যাও। বউদির সঙ্গে দয়া করে বাজারটি সেরে এস। তোমার তাতে ক্ষতি হবে না। আমি বসে যাব। হাবুলবাবু আসবেন। দাবা নিয়ে বসব। পাশে বসে থাকলে গুটির চাল দেখে বুঝতে পারবি, কি ভাবে কাকে উৎখাত করা যায়। খেলাটা শিখতে পারলে মানুষের নিঃসঙ্গতা থাকে না বাঞ্ছারাম। এটা বোঝার চেষ্টা কর। আখেরে উপকার পাবি।

লতিকা বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

সে কাছে গেলে দারুণ পারফিউমের গন্ধ পেল শরীরে। এই গন্ধটা যেন কতকাল তার হারিয়ে গেছে। গন্ধটা এমন এক আশ্চর্য পৃথিবীর খবর বয়ে আনে, যার সুবাদে যে কোনো নারীর অস্তিত্ব বুকের মধ্যে টের পায়। চম্পাবতীও থাকে তার মধ্যে। এখন তো সে স্বপ্ন দেখে না। সকালে জানালা খুলে চম্পাবতীর শিউলি ফুল তোলা দেখে। সাঁজি ভরে গেলেও বসে থাকে কেন গাছের নিচে চম্পাবতী সে বুঝতে পারত না। জানালায় এসে তাকে ডেকেও তোলে কোনোদিন।

এই রন্টুদা, ওঠো। আর কত ঘুমাবে।

তার কেন যে মনে হল, কতকাল থেকে চম্পাবতীরা তার জানালায় উঁকি দিচ্ছে, ডাকছে, অথচ সে কিছুই দেখতে পায়নি, শুনতে পায়নি। চম্পাবতী ফুলও চুরি করে না। তার মনে হয়েছে তবু চম্পাবতী ফুল চুরি করতে আসে রোজ সকালে। কাজের লোক অমর না বললে জানতেও পারত না, চম্পাবতী ফুল চুরি করে নিয়ে যায় সকালে। সেই থেকেই তার মনে চম্পবতীকে নিয়ে ফুল চুরির সংশয়।

চম্পাবতী ফুল চুরি করবে কার জন্য।

দেবতার জন্য, না হয় মালা গাঁথার জন্য।

এমনও তো হতে পারে, চম্পাবতী এটাকে চুরি ভাবেই না। সে ফুল তুলে নিয়ে যায়। ফুল গাছের নিচে ঝরে থাকে, পড়ে থাকে কেউ তাকে তুলে নেবে বলে। ফুলের ইচ্ছেকে সে সম্মান দেয়। ফুল পড়ে থাকলে, শুকিয়ে যায়, পচে যায়, সে বোঝে। বোঝে বলেই ফুল তুল নিয়ে যায় সযত্নে। ফুলের সৌন্দর্য না হলে যে থাকে না। চম্পাবতী ফুল তুলে নেয় বলেই তো ফুলের এই সৌন্দর্য। ভাবলেই তার মনে হয়, চম্পাবতী শুধু ফুলকেই ভালবাসে না, গাছটাকেও ভালবাসে।

গাছের পাশে জানালায় যে শুয়ে থাকে তাকেও ভালবাসে। সকালে বোধ হয় একবার গাছটার নিচে এসে বসে না থাকলেও চম্পাবতীর ভাল লাগে না। সে তো কবে থেকে তার বাড়ি এবং গাছের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

নাহলে সুযোগ পেলেই চম্পাবতী তার বাড়ি চলে আসবে কেন!

সে কখন ভাবেও না, এটা রন্টুদাদের ফুলের গাছ। রন্টুদার বউ পালিয়েছে।

সে তো জানে, রন্টুদা তাদের নিজের মানুষ। সনাতন বৌদি নাহলে মেয়েকে এত রাতে পাঠিয়ে দিতে পারত—কি খাচ্ছে কি করছে কে জানে, যা দেখে আয়।

রন্টুদা। দরজা খোলো।

কে?

আমি চম্পাবতী।

ও চাঁপা, তুমি!

হাতে বড় টিফিনক্যারিয়ার নিয়ে চম্পা দরজায় দাঁড়িয়ে। অমর জানেই না, চম্পা কত যত্ন নিয়ে একসময় তাকে খাওয়াতো।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না চম্পা।

ইচ্ছে করবে। খাও। আমি বসে আছি। তোমার কোনো ভয় নেই। খাও। বৌদির খোঁজ ঠিক একদিন পাবে।

আমাকে খেতে বলছ?

চম্পাবতী অবাক চোখে তাকাতো। টলটল করত চোখ দুটো—সে সেখানে সমুদ্র দেখতে পেত। নীল জল, জলরাশি, অসংখ্য ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঢেউ পাড়ে এসে ভেঙে যায়। পাড়ে এসে বাধা পায়। গর্জে ওঠে ঢেউ।

সেই ঢেউ সে একমাত্র চম্পাবতীর চোখেই যেন দেখেছে।

আরে বসে থাকলে কেন? খাও। চম্পাবতীর কপট রাগ চোখে।

হাতটা ধুয়ে আসি।

হাত ধুয়েছ। সব এত ভুলে যাও কেন বল তো!

সব কটা ভাত মাখি। একসঙ্গে সাপ্টে খেয়ে নেই। দেরি হলে ফিরতে রাত হবে তোমার।

হোক। নাও সুকতোনি। মাখ।

বা সজনে ডাঁটা, বেশ তো। সজনে ডাঁটা আমার খুব পছন্দ। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে? সনাতনদার?

না, খাওয়া হয়নি। আমি গেলে একসঙ্গে খাব।

রেখে যাও না। কাল সকালে টিফিনক্যারিয়ার দিয়ে আসব। দাদা বসে আছেন, তুমি গেলে খাবেন। বলেই সে তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বিষম খেলেই চম্পাবতী খেপে যেত।

কে বলেছে, হাভাতের মতো গলিতে। আস্তে খাও। জল খাও। জল খাও না। কি কাশছে দ্যাখ! না, আর পারি না। চম্পাবতী তার মাথায় ফুঁ দিত। নাকে, শ্বাসনালিতে খাবার ঢুকে গেলে বড় কষ্ট। তার চোখ জবাফুলের মতো হয়ে যাচ্ছে—খক খক করে কাশছে। জল খেয়ে গলা খাঁকারি দিচ্ছে—চম্পাবতী পড়ে গেছে মহাফাঁপড়ে। পাগলের মতো তার মাথায় ফুঁ দিচ্ছে। সে স্বাভাবিক হয়ে গেলে চম্পাবতী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। তার পাশে বসে বলত, রন্টুদা আমি তো আছি, এত তাড়াতাড়ি করার কি আছে। আস্তে আস্তে খাও।

আমি তো আছি কথাটা শুনলেই সে তার সাহস ফিরে পেত। তারপর সে বেশ আয়াস করে আরাম করে খেত। বাটি সাজিয়ে ডাল, ফুলকপির ডালনা, জিরেবাটা দিয়ে হালকা মাছের ঝোল, চাটনি—কত কি। বেগুনভাজা সে খুব পছন্দ করে বলে রোজ বেগুন ভাজা পাতে সাজিয়ে দিত চম্পাবতী।

সকালে অফিস বের হবার সময় চম্পাবতী হাজির।

চাবিটা দাও।

কি করবে?

দরকার আছে। দাও তো। অত কৈফিয়ত দিতে পারব না। কলেজের সময় হয়ে গেছে। মেলা কাজ বাকি।

চম্পাবতী চাইলে সে না দিয়ে পারে, এমন কিছু আছে বলে জানে না। খালি বাড়িতে চম্পাবতী একা থাকতে হয়তো বেশি পছন্দ করে। সে চাবিটা দেবার সময় অস্বস্তি বোধ করে। রূপা ফিরে এসে চম্পাবতীকে দেখলে রাগ করতে পারে।

কি করবে চাবি দিয়ে!

সব তোমার চুরি করে নিয়ে যাব।

তুমি চুরি করতে পার না। মেয়েরা জান তো কখনও খারাপ কাজ করে না।

খুব করে। তারপরই চম্পাবতী প্রায় জোর করেই যেন ছিনিয়ে নিত চাবিটা। বলত, বৌদি চলে গেল বলে সব কিছু তোমার তছনছ করে দেব না। বাড়িটা তোমার আস্তই থাকবে। খেয়ে ফেলব না। মা বলল, তাই নিতে এলাম। ঘরদোরের যা ছিরি করে রেখেছ—দেখা যায় না। এভাবে মানুষ বাঁচে না রন্টুদা। বৌদি চলে যাওয়ায় তুমি খুবই জলে পড়ে গেছ। মা ঠিক বলে, রন্টুটা মানুষ না। অপদেবতা। একটা মেয়ে চলে গেল বলে চোখে অন্ধকার দেখছে। দাড়ি কামাচ্ছে না। চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। আরে খুঁজে দেখবি না। খোঁজারই বা কি আছে। যে পালায় সে কি ফিরে আসে! তার জন্য তুই পাগল হয়ে যাবি!

চম্পাবতীর গায়ে ফ্রক। লতাপাতা আঁকা ফ্রক। পায়ে জরির চটি। পাতলা শাল গায়ে। উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। কি সুন্দর চোখ মুখ! হাসলে গালে টোল পড়ে! গজদাঁত আছে বলে ঠোঁটের দিকটা আরও সুন্দর। মেয়েদের গজদাঁত থাকলে বড় লক্ষ্মীশ্রী থাকে মুখে। চম্পাবতী চাবিটা নিয়ে শিউলি গাছটার নিচ দিয়ে চলে যাবার সময় তাকে একবার মুখ ফিরিয়ে কেন যে দেখত! তার তখন কেন যে মনে হত রূপা হলেও চলে চম্পাবতী হলেও চলে! ঘরে কোনো নারী না থাকলে সব কত অর্থহীন।

চম্পাবতী তার বাড়িটাকেও নিজের বাড়ি মনে করত। নিজের মতো ঘরদোর সাফ করে যেখানকার যা সাজিয়ে রাখত। সোফার ঢাকনা ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখত। ঢাকনা পালটাত। তার জামাকাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখত। সে ফিরে এলেও বাড়ি যেত না।

এই নাও, চা!

এই নাও চাউমিন।

এই নাও, পাজামা পাঞ্জাবি।

সে বাড়ি ফিরেই সোফায় শরীর এলিয়ে দিত। এটাচি পড়ে থাকত পায়ের কাছে। সে ঘরে ফিরে এসেছে ঠিক—যেন অভ্যাসের বশে ঘরে ফেরা, অভ্যাসের বশে সোফায় বসে থাকা।

চাঁপা, কোনো ফোন এসেছিল?

না তো। কে ফোন করবে। কার ফোন করার কথা ছিল।

কার যে করার কথা ছিল মনে করতে পারছি না। তোমার বৌদি যদি করে। আর কে করবে! শ্যামলদা করতে পারে।

না, ফোন টোন আসেনি।

দরজা দিয়ে বের হবার সময় চম্পাবতী বলত, ভাবছি তোমাকে একটা ফোন করব রণ্টুদা। ফোনের জন্য যখন এত অপেক্ষা, আমি না হয় করব। ফোন খুব সুদূরের কথা বলে, না রণ্টুদা! ফোন ধরবে তো?

তুমি এমনি এমনি ফোন করবে!

কে বলল তোমাকে, এমনি এমনি ফোন করব। আমার বুঝি কোনো কথা থাকতে পারে না তোমার সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। ফোন নাই করলে।

দেখা হলে বুঝি ফোনে কথা বলা যায় না। আমি ঠিক ফোন করব। দেখা হলেও, না হলেও।

মেয়েটা কি বোকা! সত্যি ফোন করল।

কোত্থেকে করছ?

বাড়ি থেকে। আমি যতক্ষণ কথা বলব, ততক্ষণ—সারাদিনও হতে পারে। ফোন কিন্তু ছাড়বে না। দিব্যি থাকল আমার।

আজ বুঝি আসতে পারবে না! ঠিক আছে। রাতে কোথাও খেয়ে নেব।

রণ্টুদা, তোমার আসতে পারব না বের করছি। এক্ষুনি যাচ্ছি। বাইরে খাওয়া বের করছি। বললাম ফোন ধরে রাখতে, আর উনি রাতে বাইরে খেতে বের হবেন!

আসলে চম্পাবতী বোঝে, রাতে সে বাইরে গিয়ে খাবে দূরে থাক, বাড়ি থেকেই বের হবে না। এক বেলা না খেলে মহাভারত অশুদ্ধও হয় না। বরং সে বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেয়ালে রূপার দু-চারটে কপালের টিপ এখনও আছে। যত দিন যাচ্ছিল টিপগুলো তার প্রিয় হয়ে উঠছিল। রূপা না থাক, তার কপালের টিপ বাথরুমের দেয়ালে এখনও আছে! কোনোটা খয়েরি কোনোটা সবুজ রঙের! সবুজ রঙের টিপই রূপা বেশি পরত। ওর চুলের টাসেলও বাথরুমের হ্যাঙারে ঝুলছে। আজ পর্যন্ত সে তাও ধরেনি। যেমন বাঁধা ছিল তেমনি আছে।

রূপার কপালের টিপ, চুলের টাসেল সবই তার এত প্রিয় হয়ে গেছে, বাথরুমে ঢুকলে বেরই হতে ইচ্ছে হয় না। রূপা তার কাছেই আছে। দাঁড়িয়ে আছে কপালে সবুজ টিপ পরে। মাথার চুলের টাসেল থেকে গন্ধতেলের সুবাস। সে আস্তে বড় আস্তে মুখ টাসেলের কাছে যখন নিয়ে যায়—ভয় হয়, এই

বুঝি টাসেলে আর সেই চুলের গন্ধটা নেই। নারীর চুলের গন্ধ টাসলে লেগে থাকে, সে ছাড়া এমন একটা খবরও বোধ হয় কারও জানা নেই।

চম্পাবতীর কি হয়েছিল কে জানে। একদিন একটু বেশি রাত করেই এল। সে বিছানায় শুয়েছিল চোখ বুজে। তার তো চোখে ঘুম নেই। ঘুম নেই বললে ঠিক বলা হবে না—ভোররাতের দিকে নিশ্চয় সে ঘুমায়। না ঘুমালে স্বপ্নও দেখা যায় না। স্বপ্ন দেখে বলেই সে ধরে নেয় শেষ রাতের দিকে তার চোখ লেগে আসে।

তখনই দরজায় খুট খুট আওয়াজ। চম্পাবতী এল। এত রাত! চম্পাবতী হয়তো ভুলেই গেছে, তাকে খাইয়ে না গেলে সে অভুক্ত থাকবে। চম্পাবতীরও আর দোষ নেই। কাহাতক আর সামলানো যায়। সে ধরেই নিয়েছিল, আজ চম্পাবতী আর আসছে না। সেই চম্পাবতী এল এত রাতে!

তখনই লতিকা বৌদি বলল, কি হল, আসুন! এত কি ভাবছেন! রাতে পাঁঠার মাংস ভাত—খারাপ লাগবে না।

এভাবে সে বিচিত্র এক পৃথিবীর মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। বাবা মার কথা আর মনে পড়ে না। শৈশব তার মনে পড়ে না। বন্ধুদের কথা ভুলে গেল। সে বুঝল খুবই সে একা।

এমনকি একদিন দেখল কাজের মেয়েটাও আর আসেছ না। সে তো কাউকে কিছু বলে না। কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করে না। নিজেই চা বানিয়ে খায়। ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে যায়। রাতের খাবার হোটেলে খেয়ে নেয়। ভালবাসা না থাকলে ছন্নছাড়া জীবন এও সে বোঝে।

এবং এভাবে একদিন পৃথিবীর ক্লান্ত মানুষটি রাতে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। কিছু খেল না। খাওয়ার কথা মনেও থাকল না।

আর হঠাৎ মনে হল দরজায় কেউ টোকা মারছে।

সে ধরফর করে বিছানা থেকে উঠে বসল।

কখন সকাল হয়ে গেছে টের পায়নি। দরজার দিকে ছুটে গেল, কে এল এত সকালে?

দেখল সনাতনদার কিশোরী মেয়ে চম্পাবতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

রণ্টুদা সব ফুল উড়ে এসে ঝরে পড়েছে তোমার বারান্দায়। এত বেলা কেউ ঘুমায়?

জানালার পাশে তার প্রিয় শিউলি গাছ। হাওয়া থাকলে বারান্দায় সব ফুল এসে উড়ে পড়তেই পারে। ফুলের খোঁজে এসেছে তবে চম্পাবতী।

চম্পাবতীর গায়ে ফ্রক। হাতে ফুলের সাজি।

সে চম্পাবতীকে তার বারান্দায় ঢুকতে দিল।

চম্পাবতী হাঁটুতে ফ্রক টেনে বসে গেল ফুল তুলতে। ফুল তুলছে। সে দেখল চার পাশের পৃথিবী তাজা এবং ফের ভুবনমোহিনী। আনন্দে সেও চম্পাবতীর পাশে বসে গেল। সাজিতে ফুল তুলে দিল। চম্পাবতী দারুণ খুশি। সেও কেন যে খুশি হয়ে উঠল বুঝল না। বলল, সকালে এসে ডাকবে। দরজা খুলে দেব। তুমি ফুল তুলবে, আমিও ফুল তুলব। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই!

সে ভাবল, ফুলতো কোনও পাপের কথা জানে না। কিন্তু চম্পাবতী মানে চাঁপা শেষে এত বড় হয়ে গেল! ফুল কি পাপের কথাই বলে। রাতের বেলা খুট খুট আওয়াজ। যেন আকাশ বাতাস ঘিরে চম্পাবতী হাঁকছে—দরজা খোলো। দরজা খোলো।

দরজা খুলে দিলে সে অবাক। চম্পাবতী শাড়ি পরে এসেছে। শাড়ি পড়লে মেয়েরা বড় হয়ে যায় সে বোঝে। শাড়ি পরায় চম্পাবতী যেন আর বালিকা নেই। চম্পাবতী শাড়ি পরায় সেও খুব খুশি। রূপা শালোয়ার কামিজ পরত না। এমন কি বাড়িতেও না। ম্যাকসিও না। রূপা শাড়ি ছাড়া কিছুই পরত না। শাড়ি না পরলে মেয়েদের মধ্যে কোনো নারীর গাম্ভীর্যই সৃষ্টি হয় না। চম্পাবতী শাড়ি পরে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, রণ্টুদা আমি আর ছোট নেই। বড় হয়ে গেছি। তুমি আমাকে আর বালিকা ভেব না।

দরজায় সে দাঁড়িয়েই ছিল। চম্পাবতীকে ঢুকতে দেওয়া উচিত তাও যেন মনে নেই।

এই কিরে বাবা, হাবার মতো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে সর। ঢুকব কি করে!

দরজা থেকে সে সরে দাঁড়ালে দেখল, চম্পাবতীর কপালে সবুজ টিপ। বাথরুম থেকে কি চুরি করে

নিয়ে গেছে! সে দরজা খোলা রেখেই সবুজ টিপের খোঁজে বাথরুমের দিকে হাঁটা দিলে চম্পা আর না বলে পারে নি—দরজা বন্ধ করে দাও।

তুমিতো ফিরে যাবে। দরজা খোলাই থাক চাঁপা।

না যাব না। দরজা তুমি বন্ধ না কর, আমি করছি।

তুমি আজ থাকবে আমার কাছে!

থাকি না! রোজ রোজ তো ফিরে যাই।

সে একেবারে জলে পড়ে গেল।

না চাঁপা, সনাতনদা রাগ করবে।

রাগ করুক।

চাঁপা ছেলেমানুষী কর না। এটা খুব খারাপ। খারাপ কাজ করলেমেয়েরা সুন্দর থাকে না।

সুন্দর থাকতে চাই না। হলতো। এস। দরজা বন্ধ কর। বাবা মা রাণাঘাটে গেছে। ট্রেনের কি গোলমাল। বাবা মা কেউ ফিরতে পারছে না। ফোন করে জানাল। একা বাড়িতে থাকতে ভয় করছে।

ট্রেনের গোলমাল কেন?

আমি কি করে জানব! এস আজ দু'জনে একসঙ্গে খাব।

এত রাতে আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না চাঁপা।

আমি খাইনি জানো? একসঙ্গে খাব বলে সব নিয়ে এসেছি। বাবা মা না ফিরলে চিন্তা হয়না বল! ঘর বার করছি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। একবার ভাবলাম, যাই তোমাকে খবরটা দিই। তারপর ভাবলাম, তোমাকে খবর দিয়েই কি লাভ। তুমিতো নিজের খবরই রাখ না। তারপর ফোনটা পেতেই মনটা হালকা হয়ে গেল। জানো মা আমাকে বকাবকি করেছে।

কি দোষ করলে!

তোমার খাবার দেওয়া হয়নি, এত রাত হয়ে গেল—রণ্টু না খেয়ে আছে। মা বাবার দু'জনেরই মাথা গরম।

ওরা বুঝবে না, না ফিরলে কত চিন্তা হয়! তখন কে খেল না খেল মনে থাকে! সনাতনদার এই একটা দোষ বুঝলে চাঁপা। আমাকে নিয়ে বড্ড ভাবেন। কি যে দরকার ছিল দিদিদের ফোন করার। আমার কিছুই হয়নি, তবু দুশ্চিন্তা তার। অষ্টপ্রহর চোখে চোখে রাখা—অফিসে ঠিক সময় যাচ্ছি কি না, ফিরছি কি না, ঘরে বসে বসে কি করছি শেষে তোমাকে ভিড়িয়ে দিল। এটা কি ঠিক কাজ বল! তোমার সুবিধে অসুবিধে বুঝবে না।

চম্পাবতী কিছু যেন শুনছিলই না। তার এত অভিযোগের যেন কোনো গুরুত্বই নেই। চম্পাবতী তার মতো কাজ করে যাচ্ছিল। চিনেমাটির প্লেট ধুয়ে সাদা ন্যাপকিনে মুছে টেবিল সাজাচ্ছিল। জল, জলের গ্লাস, নুনের জার, সাজিয়ে রাখছে সব। তার ডাইনিং প্লেসে আলো জ্বলছিল বেশ জোর। সব কটা আলোই জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফুলদানিতে সে ফুলের ডালও গুঁজে দিয়েছে। জানালা দিয়ে হাত বাড়ালেই শিউলি ফুলের ডাল। ডাল ফুল পাতা সহ সাদা চাদরের উপর মিনা করা পিতলের ফুলদানিটি বসিয়ে দিতে, ঘরের চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। ঠিক রূপার মতো সৌন্দর্যবোধ আছে মেয়েটার। তার খিদেও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

চম্পাবতীর চুল উড়ছিল পাখার হাওয়ায়। কী তরতাজা যুবতী দেখাচ্ছে চম্পাবতীকে। নাকের নিচে সামান্য ঘামও জমেছে। সে শুধু দেখছিল। এমন সুন্দর একটা পৃথিবীরই স্বপ্ন দেখছে সে সারাজীবন। শুধু একটা খুঁত চোখে পড়েছে চম্পাবতীর।

এত রাতে ফুল পাতাসহ গাছের ডাল ভেঙে ঠিক কাজ করেনি চম্পাবতী। অকারণ গাছের ডাল পাতা ভাঙতে নেই। রাতে ভাঙলে আরও বারণ। তখন তো গাছেরা ঘুমায়। জেগে থাকলে তাও না হয় কথা ছিল। ঘুমিয়ে থাকলে চুরি করে ডালপালা ভাঙলে গাছও রাগ করবে।

কি হল [illegible]

ডাল ভাঙলে কেন?

কিসের ডাল!

আরে শিউলি গাছটাতো আমাদের কোনো ক্ষতি করে নি—তুমি তার ক্ষতি করলে কেন! জানো এতে ভাল হয় না। জানো একবার রাতে দেবদারু গাছের ডাল কেটেছিলাম বলে, মার কি ক্ষোভ। রাত করে গাছের ডাল কাটতে গেলে! এতে নাকি অমঙ্গল হয় মানুষের।

হোক। তুমি খাবে কি না বল!

আমিতো বলছি খাব। খাব না বলিনি তো।

আর বক বক ভাল লাগছে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ব। কত রাত—এগারোটা বেজে গেল।

ইস আমার মনেই নেই। ঠিক আছে আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

চম্পাবতী শুধু বলেছিল, আর একটা মাছ নাও।

আমাদের তাড়াতাড়ি খাওয়া দরকার চম্পাবতী।

আর একটু পায়েশ নাও।

বাসুনগুলো আমি ধুয়ে রাখব। চল তোমাকে দিয়ে আসি।

চম্পাবতী এত একগুঁয়ে, কোনো কথাই গ্রাহ্য করছে না। নিজের মতো কাজ করে যাচ্ছে। সব এঁটো বাসন বেসিনে রেখে দিল। কল খুলে কিছু সাবানের গুঁড়ো মিশিয়ে দিল। দু-হাত এঁটো বলে, হাতের পিঠ দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে।

মেয়েরা কাজে মগ্ন থাকলে কি দারুণ হয়ে যায় চাঁপাকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ন্যাপকিন দিয়ে চিনেমাটির বাসনের জল মুছে সাজিয়ে রাখছে কাচের আলমারির ভিতর। রান্নাঘরে জল ঢেলে ঝাট দিচ্ছে। এটোকাঁটা তুলে একটা বাটিতে রেখে দিল। প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখার আগে জল ঢেলে দিল। বিড়ালের উপদ্রব আছে। জানালা বন্ধ করে বাথরুমে ঢুকে গেল।

সে বসেই ছিল।

সে সিগারেট খাচ্ছে পায়ের উপর পা তুলে।

বাড়িটা তার না চাঁপার বুঝতে পারছিল না।

ঘড়ি দেখল।

বারেটা বাজে।

এই চাঁপা। চল, আর কত দেরি করবে।

কোথায়?

কেন তোমাদের বাসায়।

না বাবা, ও পারবনা। একা থাকতে পারব না। ঘুমই হবে না।

এখানে থাকলে খারাপ দেখাবে না! দাদা কিছু ভাবতে পারেন।

তোমাকে নিয়ে কেউ কিছু ভাবে না। তুমি থাকলেও যা, না থাকলেও তা। তুমিতো গাছের মতো।

রণ্টু কথাটা শুনে ঢোক গিলল। মানুষ কখনও গাছের মতো হয়। তার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে না! সে যদি কিছু করে বসে। তাঁর তো ইচ্ছে হচ্ছে চাঁপাকে ছুঁয়ে দেখতে।

একটা কথা বলব চাঁপা?

বল।

চাঁপা আয়নার সামনে। প্রসাধনে ব্যস্ত! বড় করে খোঁপা ঘাড়ের কাছে। চুল কপালের কাছে কিছু উড়ছে। চাঁপা তার বউদির শাড়ি শায়া ব্লাউজ বের করে গায়ের রঙের সঙ্গে কোনটা মানায় দেখছে। বাড়ির চাবি যার কাছে থাকে সে তো জানতেই পারে কোথায় কি আছে। লকার খুলেও সে দেখেছে। রুপার কোনো গয়নাই পড়ে নেই। যাবার সময় সব নিয়ে গেছে। কিছু শাড়ি সায়া ব্লাউজ ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি।

পরিত্যক্ত শায়া শাড়ি মনে করতেই পারে চাঁপা। অপছন্দের সবই রেখে গেছে। পছন্দের সব কিছু নিয়ে গেছে। অপছন্দের সায়া শাড়ি চাঁপা যদি পরে রুপা বুঝতেও পারবে না, তার সায়া শাড়ি কেউ পরেছে।

তারপর কেন যে মনে হয়েছিল, রূপা চুপি চুপি কোথাও লুকিয়ে নেইত! কেন যে এমন মনে হয় সে বোঝে না। ছ'মাসের উপর যে নিখোঁজ সে চুপি চুপি কতটা কোথায় থাকতে পারে। এত রাতে রূপা যদি দরজায় এসে খট খট করে—নিখোঁজ হওয়ার মতো তার আবির্ভাবও কোনো আকস্মিক ঘটনা যদি হয়ে যায়—তখন সে কি কৈফিয়ত দেবে রূপাকে।

চোখ লাল করে বলতেই পারে এত রাতে চাঁপা তোমার বাসায় কি করছে!

এত সব ধন্দ থেকেই তার যত অস্বস্তি। চাঁপা তাকে আদৌ গ্রাহ্যও করছে না। চাঁপার এত সাহস হয় কি করে! জানাজানি হলে কেলেঙ্কারীর এক শেষ। রূপা নেই, চাঁপাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা—

সে ফের বলল, তুমি খুব সুন্দর। তুমি তো ভাল মেয়ে। ভাল মেয়েরা গুরুজনের অবাধ্য হয় না। রাতে একা থাকতে ভয় কি! অসুবিধা হলে বুনিকে না হয় বলি। বুনিতো তোমার বন্ধু। একই সঙ্গে কত জায়গায় বেড়াতে যাও। ঘরে বসে ক্যারাম খেল, ওকে বললে হয় না!

এত রাতে কাউকে আমি ডাকতে পারব না।

তুমি না পার, আমি যাচ্ছি। বুনির বাবাকে বললেই হবে। একটাতো রাত, দু'জনে বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকবে। পূবের জানালা তোমার খুলে দিলে জ্যোৎস্না ঢুকবে। ও কি মজা, দুই বন্ধু আর জ্যোৎস্না। রাতে জানো পাখিরা ঘুমায় বন্ধু পাখির সঙ্গে। একই ডালে জোড়ায় জোড়ায়। রাতের জ্যোৎস্না কত মনোরম বল। তোমরা বড় হয়ে গেছ রাত তার সাক্ষী থাকুক না।

কি যে আবোল তাবোল বকছ বুঝি না।

চাঁপা বিছানার চাদর পাল্টে দিচ্ছে। বালিশ, পাশ বালিশ এনে সে ফেলছে। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রতিবিম্ব ভাসছে। একেবারে সব কিছু রূপার মতো। কাচের গ্লাসে জল রেখেছে। পাশাপাশি দুটো বালিশ। মাঝখানে পাশবালিশ। চাঁপা করছেটা কি! তাই বলে এক বিছানায়, হয়!

সে আর পারল না। উঠে গেল। তার জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে জলের গ্লাসটা হাতে নিতেই ছোঁ মেরে গ্লাসটা সরিয়ে নিল চাঁপা।

জল খাবে, বললেই হয়।

দৌড়ে গিয়ে সে জলের জগ নিয়ে এল, গ্লাস নিয়ে এল।

নাও ধরো। এত যার তেষ্টা সে গাছ হয়ে থাকে কি করে বুঝি না বাপু। নাও এবারে শুয়ে পড়, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

কারুকাজ করা কাচের গ্লাস টিপয়ে। কারুকাজ করা ঢাকনা দিয়ে ঢাকা কাচের গ্লাস। বিশাল সাদা ধব ধবে বিছানা। চাঁপাফুলের মহিমা নিয়ে একটা মেয়ে বড় হবার সুখে তার সঙ্গে শুতে চায়। চাঁপা সারারাত তার পাশে শুয়ে থাকতে সাহস পায় কি করে! সে তো জানে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলে ফুলের আর বাহার কি থাকে! সে এই আতঙ্কেই শুতে চায় না।

কি হল! দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। আমি বাবা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ছি। তোমার যা খুসি কর। কিচ্ছু বলব না।

চাঁপা সুইচ অফ করে দিল ঠিক, তবে নীলাভ মৃদু আলোটি জ্বেলে রাখল।

চাঁপা খাটের উপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেল। এদিকটায় সে শোবে না বোঝাই যায়। এদিকটায় তাকে জায়গা করে দিয়েছে। মাথার কাছে টিপয়, টিপয়ে জলের গ্লাস। রূপাও রোজ তাই করত। আর সকাল হলে দেখেছে, তিক্ত এবং হতাশা মুখে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে গেছে রূপা। এক সকালে কি হল কে জানে, গ্লাসটা ছুঁড়েই মারল জানালায়। তার যে কি তখন অবস্থা! সে কিছুটা বালকের মতো ছুটে গিয়ে অপরাধী গলায় বলেছিল, আমিতো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি রূপা। আমি তো আলগা হয়ে শুয়েছি। শরীরে তোমার যদি হাত লেগে থাকে তবে তা ঘুমের ঘোরে। আমি তো বেশি হলে তোমার পাশে বসে থাকি। তুমি ঘুমিয়ে আছ। কী সুন্দর হাত পা। জানুদেশ দেখতে দেখতে কেন যে মুগ্ধ হয়ে যাই। শাড়ি সায়া উঠে থাকে। আলতো করে ছুঁয়ে দেখি—তুমি জেগে গেলে, আমাকে আবার না অসভ্য ভাবো। কোনো অসভ্যতাই আমি করিনি। করলেও ইচ্ছাকৃত নয়। ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে যদি ধরেই থাকি, আমার সত্যি অনুশোচনা হচ্ছে।

তুমি মানুষ নও।

আমি কি!

তুমি একটা কুমড়ো।

দ্যাখ আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে।

হোক কুমড়োকে কি বলব!

আমি কুমড়ো তবে তুমি লাউ।

তুমি একটা সজনে ডাঁটা।

তুমি তবে চালতে গাছ।

চালতে গাছ ছায়া দেয় জানো। চালতের আচার কে না খেতে ভালবাসে। তুমি খাও জান না। বুদ্ধু।

তবে তুমি পেপের ডাল। আমার ভীষণ মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে রূপা। আমি যা তা বলে দেব তোমাকে।

বল না। তুমি বললে, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব ভাবছ!

খুব মজা। আমি বলি, আর তুমি আমাকে অসভ্য ভাবো। জানো অনেক খারাপ কথা ইচ্ছে করলে বলতে পারি।

কি খারাপ কথা! কতটা খারাপ কথা, তুমি কিছু জান না। খারাপ কথা বলবে। তা হলেই হয়েছে। লাউ ছাড়া কি খারাপ কথা তুমি বলতে পার বলই না। শুনি।

শুনতে তোমার ভাল লাগবে রূপা! আমাকে খারাপ ভাববে না! আমি তোমার কাছে খারাপ লোক হয়ে গেলে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হবে না জানো।

মরে যাও না। তোমার মরে যাওয়াই উচিত। বিয়ে করেছিলে কেন! বিয়ের পর মেয়েরা এ-ভাবে বাঁচতে পারে!

তোমার ক্ষতি করেছি আমি রূপা।

না উপকার করেছ। তোমার উপকার আর চাই না। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তোমার কি কোনো ইচ্ছে হয় না। তুমি চুরি করে দ্যাখো কেন? তুমি একটা ছিঁচকে চোর।

তুমি একটা ছিঁদেল চোর রূপা।

তুমি একটা আহম্মক। নির্বোধ। তোমাকে আমি সব খুলে দেখাতে পারি। দেখবে। লজ্জা করে না, টর্চ মেরে দেখতে!

তথাগত বুঝল, সত্যি সে ধরা পড়ে গেছে।

কী, দেখবে?

না রূপা।

দেখতে হবে। দ্যাখো। বলেই রূপা সায়া শাড়ি এক হ্যাঁচকায় খুলে ফেলতে গেলে প্রায় ঘর থেকে ছুটে পালিয়েছিল। রূপা তোমার লজ্জা নেই, তোমার ইজ্জত নেই। কেউ এ-ভাবে পুরুষের সামনে উলঙ্গ হতে পারে! সে বসার ঘরে ছুটে এসে বসে পড়েছিল। রূপা দিন দিন কেমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে।

রূপাও প্রায় অর্ধ উন্মাদিনীর মতো তার দরজার সামনে ছুটে এসে তাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছিল। চোখ জ্বলছে, গরম নিঃশ্বাস পড়ছে, যেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে কপালে হাত দিয়ে কেন যে দেখতে গেছিল, রূপার যদি সত্যি জ্বর হয়ে থাকে। রূপা এক হ্যাঁচকায় হাত সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। মেয়েরা আর কত বেহায়া নির্লজ্জ হতে পারে বল! তার চেয়ে তুমি আমাকে মেরে ফেল। আমাকে মেরে ফেল তুমি। তারপর হাত পা ছড়িয়ে বালিকার মতো কাঁদতে বসে গেল।

কারোঁ কান্নাকাটি সে সহ্য করতে পারে না। মেয়েরা হলে তার আরও খারাপ লাগে। সে তো রূপার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কখনও করতে পারে সে তাও ভাবে না। সেই রূপা যদি মেঝেতে বসে হাত পা ছুঁড়ে বালিকার মতো কাঁদতে বসে তবে সে যায় কোথায়! কাছে যেতেও সাহস পাচ্ছিল না।

অনেকক্ষণ রূপা তারপর বিছানায় শুয়ে ছিল। পায়ের শাড়ি উঠে গেছে হাঁটুর উপর। সে শাড়ি টেনে পা ঢেকে দিতে গেলে আবার ক্ষেপে গেল। উঠে বসল। ফুঁসছে। তারপর ফের গালাগাল, তুমি একটা অপদেবতা। তুমি একটা উচ্চিংরে। তুমি পাগল।

আমি পাগল হলে, তুমি একটা ফড়িং। কেবল উড়তে চাও। হাওয়ায় ভেসে যেতে চাও।

তুমি একটা মরা হরিণের শিং। গুঁতাবারও মুরদ নেই।

গুঁতোলে তোমার লাগবে না। তুমি কষ্ট পাবে না। আমি মরা হরিণের শিং তো বেশ করেছি।

রূপার সঙ্গে তাঁর এই সব মনোমালিন্যের কথা মনে আসায় তার কিছু ভাল লাগছিল না। শেষে চাঁপা আর এক ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে আছে। সে শুয়ে আছে তার বিছানায়। মৃদু নীলাভ আলোতে অপসরা হয়ে আছে। ঠিক রূপার মতো শাড়ি সায়া আলগা করে শুয়েছে। মেয়েরা কেন যে এমন স্বভাবের হয় বোঝে না। শৈশব থেকে যৌবনে মেয়েরা ফুলের মতো ফুটে থাকবে সে এমনই আশা করেছে। চাঁপা এভাবে শুয়ে থাকায় তার ভালও লাগছে। তবে সে হাত দিয়ে দেখতে পারবে কি না জানে না। যদি অসভ্য বলে চিৎকার করে ওঠে। রূপাতো বিয়ের ফুলশয্যাতেই তাকে কেন যে অসভ্য বলেছিল বোঝে না। সে রূপার বুকে হাত দিতেই কি ক্ষোভ! হাত সরিয়ে দিয়েছে। বলেছিল তুমি খুব অসভ্য। আমার লজ্জা করে। তারপর থেকে সে আর কোনদিন জোর খাটায়নি। আর তারপর তার সাহস থাকে! সে পারে! রূপার যখন পছন্দ নয় অসভ্যতা, তখন সে ভাল ছেলে হয়েই থাকবে। সে কোনদিন আর রূপাকে ঘাটাতে সাহস পায়নি। অবশ্য রূপা মাঝে মাঝে নিজেই তার গায়ে ঘুমের ঘারে পা তুলে দিয়েছে। ঘুমের ঘোরে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ঘুমের মধ্যে কোনো হুঁশ থাকে না সে জানে। সে বেশিদূর যেতে আর সাহস পায়নি। আলগা করে শরীর থেকে পা নামিয়ে রেখেছে। বুকের উপর থেকে হাত সরিয়ে দিয়েছে এত সন্তর্পণে যে, কোনো কারণেই রূপার ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

ঘুমালে মানুষ মরা। মরা মানুষের কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকে না। বুক থেকে হাত নামিয়ে রাখাই ভাল। শরীর থেকে পা নামিয়ে রাখা অথবা সামান্য সরে শুলে ভাল। এ কি জ্বালা, আবার কখন পা তুলে দিয়েছে রূপা তার কোমরে। কি যে করে। ছ'টা মাস তার এ-ভাবেই কেটে গেছে। অবশ্য চাঁপা এখন বিছানায়। চাঁপা কি ঘুমিয়ে পড়েছে! সে কিছুতেই পাশে শুতে পারছে না। সনাতনদার মেয়ের পাশে শুয়ে থাকা শোভনও নয়। ঘুমের ঘোরে তারও তো হাত পা চাঁপার শরীরে লেগে যেতে পারে। চাঁপা খারাপ কিছু যদি ভাবে। সে খুব আলগা হয়ে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে সারা রাত শুয়েছিল। শরীরে শরীর লেগে না যায় ভেবে, রাতে ঘুমাতেও পারেনি। শুধু বার বার উঠে জল খেয়েছে।

চাঁপার কি ইচ্ছে?

ইচ্ছে হলে ঠিক বলত, জানো রণ্টুদা আজ না আমি তোমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকব। কিছুই তো বলল না। সায়া শাড়ি আলগা করে শুয়েছে আর এপাশ ওপাশ করেছে। রূপার মতো পাও তুলে দিয়েছে ঘুমের ঘোরে। ঘুমালে তো মানুষ মরা। সে খপ করে ধরে ফেলে কি করে। তার সেই সাহসও নেই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ক্ষোভ চাঁপার!

রণ্টুদা সত্যি তুমি একটা গাছ। তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না হচ্ছে।

যা বাবা! যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! তার অবশ্য মুখ ফোটেনি, কোনো কথা সে প্রকাশ করেনি। প্রকাশ করেও না। চুপচাপ দরজায় দাঁড়িয়েছিল। কেমন কান্না কান্না মুখ চাঁপার। তার কি অপরাধ তাও সে বুঝল না। সে কেন যে গাছ তাও বুঝল না। চাঁপা তার নিজের সায়া শাড়ি পরতে বাথরুমে ঢুকে গেল। তারপর কি করছিল বাথরুমে সে জানে না। বেশ ফ্রেস হয়ে বের হয়ে শিউলিতলায় ঢুকে গেল ফুল তুলতে। জানালায় বসে দেখছিল, চাঁপা আপন মনে ফুল তুলে কি সব করছে।

যাবার সময় দরজায় মুখ বাড়িয়ে তাকে সতর্কও করে গেল।

খবরদার কাউকে বলবে না রাতে তোমার বাড়িতে ছিলাম। বললে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। বউদি গিয়ে বেঁচেছে। তুমি মানুষ না। সত্যি অপদেবতা। তোমার কিছু নেই। কিছু না থাকলে কাছে কেউ থাকে না।

আর সে বোকার মতো চাঁপার পেছনে ছুটেছিল।

বললে কি হবে?

আমার মরা মুখ দেখবে।

ফেরার সময় কেন যে চাঁপা শিউলি গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানে না। সকালের রোদ গাছের মাথায়। নরম রোদে, মনোরম হয়ে আছে গাছটা। তার শাখা প্রশাখা থেকে টুপটাপ শিশিরের ফোটার মতো ফুল ঝরে পড়ছে। আর নিচে সে দেখল ফুলের পর ফুল সাজিয়ে চাঁপা লিখে রেখে গেছে, ভগবান রণ্টুদাকে আর গাছ বানিয়ে রেখো না, ওকে মানুষ করে দ'ও।

নিচে আবার লিখেছে, রণ্টুদা তুমি ভাল হয়ে যাও। ভাল হয়ে গেলে দ্যাখো তোমার বউ আবার ফিরে আসবে।

মানুষটার বোধ হয় আবার ঘোর উপস্থিত হয়েছে।

এই শুনছেন। লতিকা ডাকল। কিন্তু রণ্টু কোনো সাড়া দিল না। সে একা আলগা হয়ে হাঁটছে।

রণ্টু হেঁটেই যাচ্ছে। শিউলি গাছ, তার নিচে চাঁপা ছাড়া আর কেউ বসে থাকতে পারে না। লতিকা বৌদি তাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে সে বিশ্বাসই করতে পারছে না।

চাঁপা ছাড়া ফুল সাজিয়ে আর কেউ লিখতেও পারে না, ভগবান রণ্টুদাকে ভাল করে দাও। ওকে গাছ বানিয়ে রেখ না। কে তাকে যেন ডাকল।

আরে কোথায় যাচ্ছেন। কি মুসকিল, ওদিকে না। আসুন। সারাটা রাস্তায় এ-ভাবে উজবুকের মতো লোকে হাঁটে। আমরা বাজার করতে যাচ্ছি, ভুলে গেলেন!

ঘোর উপস্থিত হলে যা হয়। এমন উড়ো কথা তার কানে কতই আসে। সে যেখানই যায় তারমনে হয় লোকে শুধু তাকে নিয়ে কথা বলছে। তার কথা ভাবছে। তাকে ডাকছে। কেউ ডাকতেই পারে—সে তো সাড়া দিতে পারে না। তাকে ডাকছে না অন্য কাউকে ডাকছে—সাড়া দিলে বেকুফ হয়ে যাবে। এমন ভুল ভাল কত কথাই কানে আসে তার। এই তো যেতে যেতে ফের চাঁপা মানে সনাতনদার কিশোরী মেয়ে চম্পাবতীর কথাই মনে পড়ছে। চাঁপা সত্যি এসেছিল রাতে না—এটা একটা তাজা স্বপ্ন তার বুড়ো মানুষটার মতো, চাষী বউ কুসুমের মতো—যদি তাই হয়, সে তবে গাছের নিচে বসে থাকবে কেন, ফুল সাজিয়ে লিখবে কেন, ভগবান রণ্টুদাকে ভাল করে দাও, তাকে আর গাছ বানিয়ে রেখ না, সে গাছই বা হতে যাবে কেন...

লতিকা ধমক না দিয়ে পারল না। আচ্ছা মানুষ তো আপনি। ডাকছি শুনতে পাচ্ছেন না। কি এত ভাবেন বলুন তো। বাজারের রাস্তা পার হয়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন!

সে অবাক। তার হাত ধরে আছে লতিকা বউদি। তাইতো সে ভুলেই গেছে, লতিকা বউদি তাকে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে পাঁঠার মাংস কিনতে। লতিকা বউদি টমেটো শসা কিনবে। একা বাজারে যেতে বোধ হয় লতিকা বউদির ভাল লাগছিল না, তাকে নিয়ে বের হয়েছে। না, শ্যামলদাই জোর-জার করে পাঠিয়েছে! সে সব ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না। হুট করে চাঁপা এ-ভাবে মাথায়ই বা চেপে বসল কেন। বাড়ি থেকে নেমেই সে কেমন চাঁপা সর্বস্ব হয়েছিল; শ্যামলদা আর লতিকা বউদি, পাঁঠার মাংস আর ভাত—এই দুই জোড়া শব্দ তাকে কাবু করে ফেলত—কিন্তু লতিকা বউদি তাকে ঝাঁকিয়ে দিতেই হুঁস ফিরে এল। যাক বাঁচা গেল। পাঁঠার মাংস আর ভাত লতিকা বউদি আর শ্যামলদা তাকে আর তাড়া করবে না।

লতিকা বলল, এখানে এতকাল ছিলেন, বাজারের রাস্তা গোলমাল করে ফেললেন। আসুন।

হুঁস ফিরে আসায় রণ্টু বলল, একটুও আর ফাঁকা জায়গা নেই। চোখের সামনে কি হয়ে গেল সব। গীর্জাটা এখন দেখছি দোকানগুলির আড়ালে পড়ে গেছে। আগে আমাদের সময় লোক কত কম ছিল, দোকান কত কম ছিল—বাজার তো রাস্তায় এসে ঢুকেছে দেখছি।

লতিকা বউদির হাতে নাইলনের কারুকাজ করা ব্যাগ। খোপায় লাল গোলাপ। টান টান শরীর। শরীরে ভাঁজ খুবই প্রকট। সে লতিকা বউদির শরীর বাঁচিয়ে হাঁটছে। বাজারে ঢুকতে বেশ ভিড়।

পাশাপাশি হাঁটা যাচ্ছে না। আগু পিছু না হাঁটলে শরীরে শরীর লেগে যাবে। সে পেছনে পড়ে গেলেই ধমক—কি হচ্ছে, আসুন।

আমি তো যাচ্ছি।

এ-ভাবে মানুষ হাঁটে!

ভিড়ের লোকগুলি তাকে দেখছে। এমন দামড়া ছেলেকে চোখ রাঙাতে পারে কেউ ওরা বোধ হয় বিশ্বাসই করে না। বউদি কাউকেই তোয়াক্কা করছে না। সে বোধ হয় হারিয়ে যেতে পারে—না হলে এত সন্তর্পণে কেউ নজর রাখে তার উপর!

সে হারিয়ে গিয়ে কোথায়ই বা যাবে। ইচ্ছে হচ্ছিল, জোরে হেঁটে ইস্টিশনের দিকে চলে যায়—তারপর ট্রেন ধরে বাড়ি। কে জানে রূপা যদি এসে দেখে দরজা বন্ধ, বাড়ি না থাকলে অমরের তো পাখা গজায়। দরজায় তালা মেরে রাস্তায় ঘোরার স্বভাব। চায়ের দোকানে আড্ডা মারার স্বভাব। সে বাড়ি নেই, শ্যামলদার বাড়ি এসেছে, শ্যামলদা সহজে ছাড়বে না ভাবতেই পারে। রূপা যদি ফিরে যায়।—কোথায় যাই, দরজা বন্ধ দেখে চলে এলাম—এ সব চিন্তা মাথায় উঁকি ঝুঁকি মারলেই, সে কেমন ভিতরে হাস-ফাঁস করতে থাকে।

রন্টু কি ভেবে যে বলল, বউদি, দাদা পাঁঠার মাংস পছন্দ করে খুব, তাই না।

আপনি করেন না?

বউদি একটা কথা বলব।

বলুন। তবে পাঁঠার মাংস পছন্দ করেন কি করেন না আগে বলতে হবে।

আমি পাঁঠার মাংস খাই।

পছন্দ অপছন্দ নেই।

না, আছে তবে নিজে কিনতে পারি না।

নিজে কিনলে কি হয়।

রাং কিংবা পাঁঠার ঠ্যাং বলে যখন ঘ্যাচাং করে কাটে তখন ওক ওঠে আসে। আস্ত একটা প্রাণীকে কিভাবে কচুকাটা করা যায়, আচ্ছা খারাপ লাগে না, আমি নিজে কিনলে খেতে পারি না। রূপার খুব পছন্দ পাঁঠার মাংস। কিনতে গেলেই বিপাকে পড়তাম।

তা হলে ভিতরে ঢুকে কাজ নেই। ব্যাগটা ধরুন। আলু পেঁয়াজ আদা রসুন কিনতে হবে। আপনি দাঁড়ান। আমি আসছি।

লতিকা বউদি হন হন করে ভিড়ের ভিতর মিশে গেল। কত সহজে ঢুকে গেল, পুরুষ মানুষকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করল না। প্রায় ঠেলে ঠুলে, কখনও পাশ কাটিয়ে একেবারে অদৃশ্য। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয় একবার এপাশ থেকে ঠ্যালা খাচ্ছে আবার ওপাশ থেকে। বাজারের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে এমন হবেই। সে পাশে সামান্য সরে দাঁড়াল। হাতে তার ব্যাগ। আলু পেঁয়াজ রসুন আদা কিনে নিলে বউদির কাজে সাহায্য হবে। বাড়ি তাড়াতাড়ি ফেরা যাবে। যদি শ্যামদুলাল বাবুর ফোন আসে—তার কাছে থাকা দরকার।

বউ তার বড়ই অভিমানীনি।

কখন কি মর্জি হবে!

সে তাড়াতাড়ি আলুর দোকানের দিকে হাঁটা দিতেই মনে হল, বউদি এসে যদি তাকে দেখতে না পায়, তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে—তার তো কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সারা বাজারে তখন তাকে খুঁজে মরতে হবে। বোধ হয় তার দাঁড়িয়ে থাকাই উচিত।

সে আবার নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকল।

এদিকটায় এ-সময় অফিসযাত্রীদের ভিড় বাড়ে। ট্রেন ধরার আগে বাজার থেকে শাক-সবজি মাছ সবই কিনে ট্রেনে উঠে পড়ার অভ্যাস। রাস্তায়ও ভিড় বাঁচিয়ে বাস ট্রাম ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

সে দাঁড়িয়েই থাকল।

বউদি ফিরছে না কেন!

আধঘণ্টার উপর হয়ে গেল। পাঁঠার মাংস কিনতে এত দেরি হবার তো কথা নয়।

কি করছে!

সে যতটা চোখ যায় দেখছে। এত সেজে গুঁজে কেউ পাঁঠার মাংস কিনতে আসে!

রক্ত লাগলেই গেল। মাংস কিনতে গিয়ে শাড়ি নোংরা হতে পারে তাও জানে না। প্রায় উর্বশী সেজে মাংসের বাজারে ঢুকে গেল। লোকেই বা কি ভাববে!

সে দাঁড়িয়েই আছে।

সে কিছু করতে পারছে না। সে যে বাজারে এসে বউদিকে সাহায্য করতে পারে আলু পেঁয়াজ আদা রসুন কিনে তারও প্রমাণ দিতে পারল না।

আরে মশাই সরে দাঁড়ান না।

রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে থাকা তার ঠিক হচ্ছে না। সেই কখন থেকে একটা লোক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে অফিস যাত্রীদের রাগ হতে পারে। কত তাড়া, তার বোঝা দরকার। হুড়মুড় করে ট্রেনে ওঠা, ট্রেন থেকে নামা, বাড়ি ফেরা, বাড়ি ফিরে জানালায় বউর মুখ দেখার আগ্রহ সবার। এ-ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার অসুবিধা। দেরি করে বাড়ি ফিরে বউর মুখ ঝামটা কে সহ্য করে!

সে সরে একপাশে একটু এগিয়ে গেল।

আর তখনই সে কুনুই-এর গুঁতো খেল।

ধরুন। কি দেখছেন!

তা আপনি! এত দেরি!

দেরি কোথায়। কি ভিড় দোকানে, যান না নিজে। বুঝতে পারবেন। মাংসের দোকানে কি লম্বা লাইন!

এবারে তা হলে বউদি আপনি দাঁড়ান, বাকি বাজারটা আমি সেরে ফেলি।

টমেটো নিতে হবে। শসা নিতে হবে।

শসা কি কেউ মাংসে খায়।

স্যালাড না হলে আপনার দাদা খুশি হয় না। চলুন আমার সঙ্গে।

এত ভিড়ে গা ঘসাঘসি তার ভাল লাগে না। ফাঁকা জায়গায় দোকান থাকলে কত ভাল হত। কিন্তু বউদি তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না। তার শরীর ঘেসে হাঁটছে। মাঝে মাঝে শরীরে হাত-টাত লেগে যাচ্ছে।

আচ্ছা আপনি দাড়ি কামাননি কেন?

দাড়ি! রণ্টু গালে হাত বুলাল।

তারপর সে অবাক চোখে বউদিকে দেখল। সে দাড়ি না কামানোয় বউদি কষ্ট পাচ্ছে। গালে হাত দিয়ে বুঝল খুবই খস খস করছে দাড়ি। গতকাল থেকে তার যা চলছে। তার সসেমির অবস্থা। বউ নিখোঁজ হয়ে থাকলে, কি কষ্ট লতিকা বউদি জানবেন কি করে!

সে বলল, কাল ঘুম থেকে উঠে কামাব। তারপরই বলল, একটা কথা বলব।

একশটা বলুন। এই যে ভাই এক কেজি আলু, পাঁচশ পেঁয়াজ, একশ আদা, পঞ্চাশ রসুন।

এই যে ভাই পাঁচশ টমেটো, পাঁচশ শসা। লেবু চারটে। গন্ধ হবে তো। দেখি।

দোকানি লেবু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একেবারে আজই গাছ থেকে তুলে আনা। দেখছেন না পাতা! পাতার বাহার দেখুন।

সে দেখল লতিকা বউদি নিজে শুঁকছে তারপর তার দিকে বাড়িয়ে বলছে, কেমন হবে দেখুন তো?

একটা কথা বলব!

বলুন না।

দাড়ি আমি না কামালে আপনার কি কোনো অসুবিধা হবে?

অসুবিধা না হলে বলতে যাব কেন। একই রিকসায় ফিরব। লোকে দেখলে কি ভাববে। দাড়ি কামাননি, চুল আঁচড়াননি, জামা জুতোর ছিরি কি হয়েছে দেখছেন।

হেঁটে গেলে হত না? এতটুকু রাস্তা রিকসা নেবেন! আসার সময় হেঁটে এলাম না।

আসার সময় হালকা ছিলাম। যাওয়ার সময় কত ভারি ব্যাগ সঙ্গে। সব নিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়!

ব্যাগ আমার হাতে দিন না।

এই রিকস, দাঁড়াও। উঠে পড়ুন।

সে ইতস্তত করছিল। নারী মাত্রই বড় পবিত্র কিছু এমন তার মনে হয়। তা ছাড়া চুল দাড়ি তার কিছুই ঠিকঠাক নেই। জামা জুতোর ছিরিও ভাল না। কাল রাতে ইস্টিশনে এসে শুয়েছিল। সকালের ট্রেন মিস না হয়—কত তার দুশ্চিন্তা। শ্যামলদা জামা পাজামা স্নানের আগে বের করে দিতে গেলে, তার ভিতর কেন যে এত অস্বস্তি দেখা দিয়েছিল—হুট করে চলে এসে ঠিক কাজ করেনি, তার উপর পাট ভাঙ্গা জামা পাজামা পরলে বৌদি রাগ করতে পারেন—কোথাকার উটকো লোক এসে সংসারে ঝামেলা সৃষ্টি করছে। সে শুধু বলেছিল, না দাদা, ওতে হবে না। আমার গায়ে লাগবে না।

আমার গায়ে লাগবে না বলে আবার শ্যামলদাকে খাটো করে ফেলল না তো। মানুষটা তার চেয়ে খুবই বেটে এবং কিছুটা রোগাও। তার দশাসই চেহারা—একটা আস্ত দামড়া, জামা পাজামা গায়ে লাগবে কেন! লতিকা বউদির পাশে শ্যামলদা খুবই বেমানান এটাও—প্রমাণ হয়ে যেতে পারে। বউদি বড়ই জবরদস্ত রমণী। শ্যামলদাকে কোলে কাঁখে করে ইচ্ছে করলে বেড়াতে পারে। তার উপর শ্যামলদার পাজামা পাঞ্জাবি পরলে সে যে জোকার হয়ে যাবে—এই সব নানা কারণেই—তার জামা পাজামার বিচ্ছিরি অবস্থা। শ্যামলদা না বললে সে আজ থেকে যেতেও সাহস পেত না। তার তো শ্যামলদাই সম্বল।

এই ওদিকে না। সামনের গলিতে। তারপর লতিকা বৌদি কেমন আবিষ্ট হয়ে যেন বলল, আপনার স্বপ্নের খবর কি?

স্বপ্ন!

এই যে আপনি রোজ একটা স্বপ্ন দেখেন শুনেছি।

আমি একটা স্বপ্ন দেখি—না না একটা না তিনটে। আগে দুটো ছিল। ইদানিং তিনটে হয়ে গেছে। চাঁপাকে চেনেন?

চিনবনা কেন? সনাতনদার মেয়ে তো!

ইস, যা কি যে হবে!

কি হবে আবার!

চাঁপা জানতে পারলে আমাকে খারাপ ভাববে। বলবে রণ্টুদা তুমি শেষে তোমার স্বপ্নের কথা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে!

চাঁপাকে স্বপ্ন দেখেন।

আপনি কিন্তু বলবেনই না বউদি। কাউকে বলবেন না। স্বপ্ন? বিশ্রি রকমের খারাপ। আমার কি দোষ বলুন। চাঁপা আমার ঘরে রাতে শুয়ে থাকতে চায়। চাঁপার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি ওর সঙ্গে শুতে ভয় পাই। চাঁপা লুকিয়ে এলেই শুতে হবে তার কি কোনো কথা আছে।

ওকি এসেছিল আপনার কাছে!

যেন ললিতা বৌদি ভারি মজা পেয়ে গেছে। তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে।

হ্যাঁ। কি করি বলুনতো। ও কিছুতেই বুঝতে চায় না এতে কত নিন্দে মন্দ হতে পারে। বোকার মতো কেবল বলে, আমি থাকব। আমি শোব।

সনাতন বউদি কোথায় তখন।

ঐ কোথায় ওরা রানাঘাটে না কোথায় গিয়ে আটকে পড়েছিল। ট্রেনের গোলমাল। ফিরতে পারবে না। চাঁপা একা বাড়িটায় থাকে কি করে! চলে এল। ভয় পায় একা থাকতে!

স্বপ্নে কিছু হল না।

না।

চাঁপা থাকল।

হ্যাঁ থাকল।

কিছুই হল না!

কি হবে বউদি!

একা একটা মেয়েকে নিয়ে সারারাত স্বপ্নে কাটালেন, অথচ কিছুই হল না। স্বপ্নেই সম্ভব।

না বউদি। স্বপ্নে শুধু কেন, সে যদি আসেই সে যদি থাকতেই চায়, আমার কি উচিত তাকে বিব্রত করা! বলুন, আমার তো ইচ্ছে হয়—কিন্তু কি যে করতে হবে, কি করলে যে মেয়েরা খুশি হবে বুঝতে পারি না। আমি খুব খারাপ যদি ভাবে।

লতিকা বউদি কেমন থম মেরে গেল। তারপর কি ভেবে যে বলল, তারা যা চায়, তাই করছেন না কেন?

তারা কি চায়!

ললিতা বউদি কটমট করে তাকাল তার দিকে।

তারা অনেককিছু চায়। চলুন বাড়িতে তারা কি চায় আপনাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেব। তারা কি চায়! বোকার মতো কথা একদম বলবেন না। পারতে দাদা আপনাকে বাঞ্ছারাম বলে!

সাঁজ লেগে গেছে। লতিকা কিংবা বাঞ্ছারামের পাত্তা নেই। লতিকা তা হলে বাঞ্ছারামকে আজকাল পছন্দই করছে। তা না হলে বলত না, তথাগত, আমার সঙ্গে বাজারে যেতে আপত্তি আছে? না থাকলে চলুন। শ্যামল একবার জানালায় উঠে গেল—না সত্যি কারো পাত্তা নেই।

মাথা খারাপ মানুষকে ভয় পাবারই কথা। বউ পালালে কার মাথা আর ঠিক থাকে! বাঞ্ছারামেরও নেই। সরল সহজ এবং লাজুক স্বভাবের হলে যা হয়। মেয়েরা এক দরজা দিয়ে ঢুকলে বাঞ্ছারাম অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। তা লতিকার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেছে। পরস্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কার না ইচ্ছে হয়। ব্যাটা দেখছি আগেই ফিরে আসেনি। বউদির সঙ্গে সত্যি তবে বাজার করছে!

কিন্তু তার বাথরুমে যাবার সময় অথচ দরজা খোলা রেখে বাথরুম যেতে পারছে না। এখুনি ঠিকে কাজের মেয়েটা চলে আসবে। দরজা খুলে দিতে হবে। বাজার করে লতিকাও ফিরতে পারে। বাথরুম থেকে বের হয়ে দরজা খুলে দিলে তার মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। কাজের মেয়েটা এলেও সে ঢুকে যেতে পারত বাথরুমে। বেশ সময় লাগে সাফসোফ হতে।

কারো পাত্তা নেই।

বারান্দা থেকে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ব্রাসে পেস্ট লাগাল। আলো জ্বেলে দিল। সেন্টার টেবিলের ঢাকনা এলোমেলো হয়ে আছে। সে টেনে টুনে টেবিল ঢেকে দিল। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বসে আছে, সে নিজের তোয়ালে ছাড়া গা মুছতে তৃপ্তি পায় না। কাচা তোয়ালে, পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি বের করে রেখেছে। কেউ এলেই সে বাথরুমে ঢুকে যাবে। লতিকা এলে কিংবা মণি এলে, যেই আসুক, দরজা খোলার দায় তার। কলিং বেলটাও ভাল কাজ করছে না। কেউ না এলে সে কিছুতেই বাথরুমে ঢুকতে পারছে না।

আর তখনই দরজায় খুট খুট শব্দ।

লতিকা বোধ হয় এল।

তারপরই মনে হল, না লতিকা না। লতিকা কখনও দরজার কড়া নাড়ে না। মণির স্বভাব উল্টো। সে কিছুতেই বেল টেপে না। কড়া নাড়ে। সুইচে হাত দিতে কেন যে মেয়েটা এত ভয় পায়। কোথায় কোন বাড়িতে একবার শক খেয়ে মণির এটা হয়েছে। তার তখন খুবই রাগ হয়। দরজায় এত জোরে কড়া নাড়ে যে কানে বড্ড লাগে।

আরে খুলছি। থাম।

শ্যামল দরজা খুলে দিতেই মণি ভিতরে ঢুকে গেল। কাজটাজ সেরে চলে যাবে।

সে ডাকল, শোন মণি।

মণি বসার ঘরে ঢুকলে বলল, তোর বউদি বাজারে গেছে। বাথরুমে যাচ্ছি। বউদি না এলে যাবি না।

মণি বুঝতে পারে, বাবুর এই এক আয়েস—বাথরুমে ঢুকলে তাকে ডাকা যায় না। ডাকলে বিরক্ত হন। কিছুটা মেয়েলি স্বভাবের মনে হয় তার। স্নান টান সেরে গায়ে পাউডার দিয়ে শরীরে গন্ধ মেখে বসে যাবেন। সৌখিন একটু বেশিই। বাড়িতে বসেই নেশা টেশা করার স্বভাব। রাতে কি হয় সে জানে না। তবে সারা বাড়িটা কেমন তছনছ হয়ে থাকে। সকালে এলে টের পায় কিছুটা যেন দক্ষযজ্ঞ গোছের ব্যাপার। অথচ লতিকা বউদি হাসি খুশিই থাকে। দাদাবাবুর সেবায় কোন অযত্ন না হয়, সকালে স্নান টান সেরে, বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে—কেমন সতী সাধ্বীর মতো দাদার চা রেখে বিছানার পাশে নিজে এক কাপ চা নিয়ে বসবে। দাদাবাবুর ঘুম ভাঙতে বেলা আটটা হয়ে যায় সে দেখেছে। ঘুম থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতেও দেখেছে। ইস কত বেলা হয়ে গেল, ইস কি যে করি—এই লতিকা আমাকে ডাকতে পারলে না।

লতিকা বউদি কেন যে দাদাবাবুকে ডেকে তোলে না তাও বোঝে না।

রোজই সে এটা দেখে।

যেন উচিত ছিল. লতিকা বউদির ডেকে দেওয়া।

তারপরই মণির ঠোঁটে মুচকি হাসি। ঠোঁট টিপে হাসে। খুব ধকল গেছে—ঘুমোক। বেলা করে উঠলে শরীর বেশি তাজা থাকে দাদাবাবুর এমনও মনে হয় তার। একটু বেশি বিশ্রাম হয়, তাড়াতাড়ি ডেকে দিলে, গা ম্যাজ ম্যাজ করতে পারে—তা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক—অফিসে খাটা খাটনি—রাতে খাটা খাটনি—এতটা শরীর দিতে নাও পারে। বউদি সে-জন্য যে ডাকে না এটাও সে টের পায়।

তা এত ধকল বাবুর। কিন্তু কোলে তো কেউ এল না। বাজা মেয়ের শরীরে গরম বেশি না কম সে জানে না, তবে দাদাবাবু যে কাহিল হয়ে পড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। বউদির যা শরীর, দাদাবাবুর পক্ষে সামলানোই দায়। বউদির পাশে দাদাবাবুকে বড় বেক্ষাপ্পা লাগে।

আজ অবেলাতেই সে এসেছে। নুন শো মেরে এসেছে। সকালেই বৌদিকে বলে গেছে, ওবেলা আসতে দেরি হবে। দাদাবাবুও জানে। না বলে গেলে বউদির মুখ গোমড়া—এত দেরি, তুই কিরে। সাঁজ বেলায় ঘর দোর কেউ ঝাঁট দেয়। বাড়ির অমঙ্গল হয় না। কত অভিযোগ যে তখন তার বিরুদ্ধে। বলে গেলে সাতখুন মাপ। তা ছেলেমানুষ—এদিক ওদিক মনতো টো টো করবেই।

কিন্তু অবেলায় বউদিকে না দেখে বলল, দাদাবাবু বউদি কোথাও গেছে!

বাজারে গেছে। এসে যাবে। কাজ হয়ে গেলেও যাবি না।

শোন মণি পেঁয়াজ আদা রসুন বেটে রাখতে হবে। ঘরে কিচ্ছু নেই। কে যায় বাজারে! ভাবলাম কাল বাজার করব। একটা দিন চলে যাবে। তিনি এসে হাজির। একটা ফোন পর্যন্ত করে না আসার আগে।

তিনিটা কে মণি বুঝল না। কোনো আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই হবে। তা রানীটুনির সংসারে আগাম খবর না থাকলে মুশকিল হবেই। তিনদিনের বাজার একদিনে করে আনে দাদাবাবু। কাল বাজার যাবে এও সে জানে। মসলা একদিন করে রাখলেই হয়। ঠাণ্ডা ম্যাসিনে ঢুকিয়ে দিলে কোনো আর বাড়তি হ্যাপা থাকে না।

কেউ এসেছেন, যার জন্য বাজার না করলেই নয়।

তবে তিনি কোথায় সে বুঝতে পারছে না।

সে হাতে কাজ সেরে রাখছিল। টাইম কলের জল কেউ খায় না। আন্ত্রিক হচ্ছে খুব। টিউকল থেকে দু-বালতি জল ধরে দিয়ে যায়। বউদি বাজার করে না ফিরলে সে জলও আনতে পারবে না। দরজা খোলা রেখে গেলে দাদাবাবু রাগ করবে। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজার উপরে বাথরুম থেকে অল্প আলো চুইয়ে পড়ছে। বসার ঘর পার হয়ে খাওয়ার ঘর। ঘরের সঙ্গে রান্নাঘর। পাশে বাথরুম। তার রান্নাঘরে কাজ বলে দাদাবাবু খাবার ঘরের আলো জ্বালেনি। বাথরুম থেকে বের হয়ে আলো জ্বেলে দিলে ঘর ঝাঁট

দিতে পারবে, মুছতে পারবে। সে নিজেতো সুইচে হাত দিতে পারে না। একবার কি হয়েছিল কে জানে সুইচ টিপতে গিয়ে এমন ঝাঁকুনি খেল যে সে আর আতঙ্কে সুইচ টেপে না। সে খুব তাড়াতাড়ি কাজসেরে যদি বলে ফেলে, আমার হয়ে গেছে, দরজা বন্ধ করে দিন, আমি যাচ্ছি—যাতে যাচ্ছি বলতে না পারে সেজন্যই বোধ হয় আলো না জ্বেলে বাথরুম ঢুকে গেল। কি করে আর। সে রান্নাঘরের কাপ প্লেট ডিস ধুয়ে রাখল। চাল থালায় বেছে রাখল। ঝুড়ি খুঁজে দেখল, আদা পেঁয়াজ কিচ্ছু নেই। শো দেখে মেজাজ প্রসন্ন ছিল, ঝুড়িতে কিছু নেই দেখে মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে গেল। কখন আসবে, কখন সব করবে, তারপর বাড়ি ফিরবে ভাবতেই মেজাজ টং।

তার কাজ সারতে সারতে কখনও যে রাত হয়ে যায় না তার না। তবে আজ সে নিজেই খুব গরম হয়ে আছে। বই দেখলে এটা তার হয়। বই দেখতেও যায়। সাহরুখ খান যা একখানা অ্যাকটিং করল। গরীবের মেয়ে পূজা। বাপ ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যায়। আসে সাঁজ লাগলে। সাহরুখ দিনের বেলাটায় লুকিয়ে থাকে পূজার বাড়িতে। কি সুন্দর বাড়ি! মাটির ঘর, দাওয়া, সামনে ছোট ফুলের বাগান—তারপর চিনার গাছের জঙ্গল। সাহরুখ যে একজন পলাতক আসামী জানবে কি করে! কি আশনাই চোখে মুখে। আর কি গান—মহব্বত কা দিল টুট গ্যায়। সেই জঙ্গলে পূজাকে যেন জড়িয়ে ধরছে না—বই দেখতে দেখতে কখন সে নিজেই হিরোইন হয়ে গেছে জানে না—জঙ্গলের গাছে গাছে নাম না জানা ফুল, একেবারে ছবির মতো সাজানো পাহাড়, পাথর—এবং পাথরে লাফিয়ে সে যেন নিজেই ছুটছিল—বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল—কি যে মোহ সৃষ্টি হয়—সে বুঁদ হয়ে ছিল। ভিতরে গুন গুন করে গানটাও সে গেয়েছে কতবার—তার ঝুপড়িতে ফিরেই দেখতে পাবে সাহরুখ বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে।

কাজ করে রাজমিস্ত্রির। সারাদিন খাটুনির পর তাগড়াই বুকে যখন টেনে নেয়—তখন সে ভাবেই না, সে কারো বাড়িতে কাজ করে খায়। আজ দুটো সেদ্ধ ভাত করে ইচ্ছে ছিল মানুষটাকে বসে সিনেমার গল্পটা বলবে, তারপর তাতিয়ে দিলে যা করে না!

দাদাবাবুরা তাদের সখ আহ্লাদ একদম বুঝতে চায় না। সে চাল ধুয়ে রাখল। কতক্ষণে ছাড়া পাবে কে জানে। সব সখ আহ্লাদ শেষে যে বিছানাটি সম্বল এটা বাবুরা বুঝতেই চায় না। সে শো মেরে সোজা এখানে চলে এসেছে—ধস্টা ধস্টি তার ঘরে গেলেই হবে। আর এ-জন্য সে কলের জলে গা ধোবে। পাউডার মাখবে গায়ে, ভাঙা আয়নায় চুল বাঁধবে। বড় করে টিপ পরবে—মানুষটা সাজলে গুজলেই বুঝতে পারে—আজ খুব ভাল খাবে।

সে মুখ ব্যাজার করে রেখেছে। আর কোনো কাজও নেই যে সেরে রাখবে। রান্নাঘর ধুতে এঁটো কাঁটা ফেলতে আর কতক্ষণ। এসে দেখল, দাদাবাবু বাথরুম থেকে বের হয়েছেন। একেবারে তাজা যুবক। গাল সাফ সোফ। রাতে বাবুরা দাড়ি কামায়, সকালেও কামায়, তার মানুষটা হপ্তায়ে কামায় না—লতিকা বউদি বোধ হয় গালে দাড়ি খস খস করলে আরাম পায় না।

তোর বউদি আসেনি?

আজ্ঞে না।

এত দেরি!

আমি কখন যাব বলুনতো!

তুই এক কাজ কর। একটা ঠাণ্ডা বোতল বের করে টিপয়ে রেখে আয়।

মণি-ঠাণ্ডা ম্যাসিন থেকে এক বোতল জল বের করে বসার ঘরে রেখে এসে ঘর ঝাঁট দিতে থাকল।

দ্যাখত কাচা ছোলা ভিজিয়ে রেখেছে কি না।

মণি জানে দাদাবাবু নেশা করতে বসলে কাচা ছোলা খায়। নুন আদা খায়। টমাটো, শশা, পেয়াজ চাক চাক করে কেটে রাখতে হয়। হাতে কাজ সেরে যাবার আগে এই কাজগুলোও সে করে দিয়ে যায়। অথচ আজ ঠাণ্ডা ম্যাসিন খুলে দেখল কিছু নেই। বউদি ফিরে না এলে সে কিছু করতে পারবে না।

অবশ্য এ-সব বাড়তি কাজের জন্য বউদি তাকে এটা ওটা দিয়ে পুষিয়ে দেয়।

বউদি কাল রাতে আমায় ঘুম হয়নি।

কেন রে?

মশার কামড়।

কেন মশারি নেই।

টুটাফাটা। তালি দেবারও জায়গা নেই।

বের করে রাখব। কাল নিয়ে যাস।

প্রায় নতুন সায়া শাড়ি ব্লাউজও কম সে বাগায় না। কিছুই সে চায় না। কখনও চায় না। কিন্তু বেশ গুছিয়ে সে তার চাওয়াটাকে তুলে ধরতে পারে।

কি যে করি বউদি।

কেন কি হয়েছে!

যজনের বউর একটা বাচ্চা হয়েছে। ক্ষুধায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। খেতে দেবে কোত্থেকে। যজন তো বউটাকে বাপ মার ঘাড়ে ফেলে রেখে হাওয়া।

কোথায় গেল!

একটা ছুঁড়িকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

অমানুষ।

পাশের ঘরে কেউ না খেয়ে থাকলে কষ্ট হয় না।

নিয়ে যা। যজনের মাকে দিস।

সে কিছুটা দেয়। কিছুটা নিজে রাখে। এই করে বাবুদের ঘরবাড়ি থেকে বের হবার সময় হাতে তার কিছু না কিছু থাকে। পুরানো জুতা, দুধের কৌটা, বাদাম তেলের বোতল—হরলিকসের কৌটা—যা পায় সে তাই খুশি মুখে হাতে তুলে নেয়।

আজ কি বাগানো যায় ভাবছিল। এতটা সময় সে আটকে আছে—বাড়তি কিছু না পেলে পোষাবে কেন। অনেক দিনের সখ একটা প্লাস্টিকের জগ। বউদির নানা ডিজাইনের জগ—কোনোটা বসার ঘরে, কোনোটা শোবার ঘরে। খাবার টেবিলের জগও ফুল তোলা। পুরানো জিনিসে আর বাহার থাকে না। বউদি এক জিনিস বেশিদিন ব্যবহার করতেও পছন্দ করে না। নিত্য নতুন ফ্যাসনের দিকে খুব ঝোঁক। খাটের নিচে জগটা পড়ে আছে কবে থেকে। বেশি হলে আবর্জনা হয়ে যায় তাও সে বোঝে। পুরানো জগটা খাটের নিচ থেকে বের না করে আরও ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে রাখল। জগটার কথা বউদির আর খেয়ালই থাকবে না। বাতিল হয়ে গেলেও, কেউ কিছু যে আগ বাড়িয়ে দেয় না, সংসারের কুটো গাছটির জন্যও মায়া জড়িয়ে থাকে—সে নানা ভাবেই তা টের পায়।

এই মণি!

আজ্ঞে যাই।

দাদাবাবু গ্লাসে ঢালছে।

সে তাকিয়ে থাকলে বলল, নিয়ে আয় গ্লাস।

এটা তার লোভ। বাড়তি লাভও। দিলে সে খায়। সে চায় না। খেলে মেজাজ ফুর ফুর করে। রান্নাঘরে ঢুকে একটা কাচের গ্লাস বের করে নিল। বউদি আসার আগে—ও কি মশা! আজ দাদাবাবু এত প্রসন্ন কেন সে বুঝছে না। বাড়িতে মায়ফেল হলে, রাতে তার খাবার কথা থাকে। বাবুর বন্ধু বান্ধব আর বউদি কষা মাংস এক দু টুকরো, দাদাবাবু ভিতরে ঢুকে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে যায়। খুবই পরিমিত মাপ। বউদিও খায়। এবং সে একদিন শুধু বলেছিল, কি রকম লাগে খেতে বউদি!

বিস্বাদ।

তবে খাও কেন?

খেলে উড়তে ইচ্ছে হয়। কাজ করতে ইচ্ছে হয়—এক আধটু খেলে ভালই লাগে।

বউদিকে বেশি খেতে দেখেনি। এক আধটু খেতেই দেখেছে। বউদির গ্লাস থেকেই একদিন চুরি করে সবার অলক্ষে সে এক ঢোক মেরে দিয়েছিল।

থু থু! কিন্তু সবটা পেটে কি করে যে ঢুকে গেল—এসব ছাইপাশ কেন যে খায়! তারপর তার

কেন যে মনে হয়েছিল, অসুরের মতো সে বল পেয়েছে। খাটা খাটনি গায়েই লাগেনি। সে একদিন কেন যে বলেও ফেলেছিল—আমার খুব ইচ্ছে করে—খেয়ে দেখি।

বউদির কি রাগ! কপাল কুঁচকে ফেলেছিল।

কি বললি!

কেন তুমিতো খাও।

একেবারে চুপসে গেল। সে এ-বাড়িতে অনেকদিন আছে। ফ্রক গায়ে কাজ করেছে। ম্যাকসি পরেও কাজ করেছে। এখন শাড়ি পরে কাজ করে। আবদার আপত্তি সবই চলে।

দাদাবাবুই বলেছিল, খেলে কি তুমি ধরে রাখতে পারবে লতিকা। দাও। খেতে চায় যখন খাক। মজা পেলে কাজেও মজা পাবে।

তা সে মজা পায়। সে ঘোরের মধ্যে অসুরের মতো খাটতেও পারে। এই সুবিধাটুকু বুঝেই বউদির কাজের চাপ থাকলে, নিজেও ঢেলে নেয়। তাকেও দেয়।

না আর না।

কেন বউদি!

মাথা ঘুরে পড়ে থাকবি।

তবে থাক।

দাদাবাবুর কাছ থেকে গ্লাস নেবার সাহস নেই তার। দাদাবাবু নিজেই খাবার টেবিলে গ্লাস রেখে গেল। দাদাবাবু কাচা মেরে দেয় প্রথমটায়। সে তা পারে না। সে তো আর রোজ খায় না। মাসে এক আধবার। যতটা সম্ভব জল দাদাবাবুই মিশিয়ে দিয়েছে।

তারপরই কেন যে মনে হল, দাদাবাবুটি চতুর। তাকে আটকে রাখার এই একটা কল আবিষ্কার করেছে দাদাবাবু। দু ঢোক খেয়ে মেজাজও শরিফ। বাড়িতে গন্ধ না পায়, পাড়ার দোকান থেকে এক খিলি জর্দা পান কিনে মুখে পুরে চলে যায়।

সে বিছানা ঝাড়তে থাকল। জানালার গ্রিল মুছতে থাকল। কাজ বেশি করলে খুশি হয়ে ফের ডাকতেও পারে—কিরে তোর শেষ! এই নে। আর একটু দিলাম।

তার এখন সাহসও বেড়ে গেছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, দাদাবাবু, কাকে নিয়ে বউদি বাজারে গেল। এখনও ফিরছে না।

দাদাবাবু দুটো কাচা ছোলা মুখে পুরে দিয়ে বলল, সেইতো! বাঞ্ছারামকে নিয়ে বাজারে গেছে।

বাঞ্ছারাম কে বাবু?

তুই চিনবি না। ও এদিকটায় বড় আসে না।

সে দাবার ছক বিছাল। গুটি সাজাতে থাকল। হাবুলবাবু সাতটা সাড়ে সাতটায় এসে পড়েন। তিনিও খান। তবে কম। এবং খুবই পরিমিত।

সেই হাবুলবাবুরও পাত্তা নেই।

মণি মাঝে মাঝে চুপি দিয়ে দেখছে। বাড়িতে একটা মানুষ খাবে, থাকবে—বউ তাকে নিয়ে বাজারে গেছে—এবং বাবু এ-সময় বেশ রসে বসে থাকে। তার শরীরে গরম ধরে গেল কেন এও সে বুঝছে না। তারপরই মনে হল, শো দেখার পরই তার এটা শুরু। বাড়ি ফিরেই পাতে বসে যাবে ভেবেছিল, এখনও বাজার করছে বউদি, গোটা বাজার কি তুলে আনবে!

তখনই জোরে বেল বাজল।

সে ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল, প্রায় সেই নায়ক তার সামনে। তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

লতিকা বলল, দেরি হয়ে গেল। যা মাংসটা নিয়ে ধুয়ে রাখ। কাপড় ছেড়ে আমি যাচ্ছি।

তারপরই ছুটে গেল টেবিলে।

তুমি বসে পড়লে!

কি করব!

এই মণি, দাদাবাবুর শসা টমোটো কেটে দে। উনি গেলেন কোথায় আবার!

দ্যাখ পালালো কি না!

তা পালাতে পারে। যা মানুষ। বলে কি জানো পাঁঠার মাংস রেঁধে বেড়ে সাজিয়ে দিলে খেতে পারে। কিন্তু বাজার থেকে মাংস কিনে আনতে পারে না। কিনে আনলে মাংস খেতে পারে না। বমি পায়।

তা হলে সাজিয়ে দাও। খাবে।

জানো মাংসের দোকানে ঢুকলই না। বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। কাটাকুটি নাকি একদম সহ্য করতে পারে না।

ও কি পারে একবার জিজ্ঞেস করলে পারতে। আমার তো মনে হয় কিছুই পারে না। একটা আস্ত শাক- আলু।

বাবুর গায়ে গা লাগলেও যেন তার ইজ্জত যায়। রিকসায় যা করল! একেবারে সোজা সটান বসে থাকল।

কিছু করবে আশা করেছিলে নাকি!

তোমাকে না কিছু বলা যায় না। সব তাতেই ইয়ারকি। চোরের মতো মুখ করে রেখেছে। চোরের মতো রাস্তায় হাঁটল। পাশাপাশি হাঁটলে, গা লেগে গেলে আতঙ্ক। চোরের মতো নিজেকে এত আড়ালে রাখতে চায় কেন বলতো। বললাম, ঠিক হয়ে বসুন, পড়ে যাবেন। কে শোনে কার কথা!

কিছুতেই বসল না?

না।

ওর স্বভাবই এরকম। লাজুক। মেয়েদের দেখলে কেমন ভয় পায়।

ভয় পায়! মেয়েদের দেখলে ভয় পাবে কেন! ওকে কি খেয়ে ফেলবে!

খেয়ে ফেলতে পারে। মেয়েদের যা রাক্ষুসে স্বভাব।

রাখ! সব পুরুষরা ধোওয়া তুলসিপাতা। কিছু জানে না। যত দোষ মেয়েদের। তোমার বন্ধুকে বল, মেনি বেড়ালের স্বভাব কোনো মেয়েই পছন্দ করে না। পুরুষ পুরুষের মতো হবে। এই কিরে বাবা—যেন ঘোরে হাঁটছে ঘোরে কথা বলছে। বউ পাগল না মাথা খারাপ কিছু বোঝার উপায় নেই।

মণি শসা টমেটো কেটে প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এলে শ্যামল বলল, রাখ। দ্যাখতো বাবু আবার কোথায় গেল।

বাঞ্ছারাম বাবু!

এটা যে মণির অস্পর্ধা বুঝতে অসুবিধা হয় না শ্যামলের। ধমক দিতে পারত। সে বাঞ্ছারাম বলতে পারে। তাই বলে মণি বলবে—এতটা বাড়াবাড়ি শ্যামলের ভাল লাগল না। সে দু কুচি শসা মুখে ফেলে দিয়ে বলল, বাঞ্ছারামবাবু না। তথাগতবাবু। দ্যাখ বাবু কোথায়।

বউদি!

লতিকা মণির দিকে তাকাল!

পেঁয়াজ আদা বের করে দাও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাবু আবার কোথায় যে গেল!

লতিকা বাজার করে খুবই যেন ক্লান্ত। গরমে কেমন হাঁফ ধরে গেছে। সামনের সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়েছে। রান্নাঘরে ঢুকতে তার যে ভাল লাগছে না মুখ দেখেই বোঝা যায়। মণিকে দিয়ে কিছু কাজ এগিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। খেয়ে যাবি বললেই হল—থেকে যাবে। যাবার সময় তার বরের জন্য মাংস ভাত দিলে আরও খুশি। যত রাতই হোক গাঁই গুই করবে না। হয়তো গোপাল একবার খবর নিতে আসতে পারে। মণির রান্নার হাতও বেশ। রান্নার যশ আছে। যশের লোভেও মণি সময়ে অসময়ে সে রান্নাঘর যে না সামলায় তা নয়। সে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেলে—কিংবা অসুখে বিসুখে দু-হাতে মণি সংসারের সব কাজ সামলায়। বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেছে।

মণি ছুটে এসে বলল, বাবু বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে আছে। আকাশ দেখছে। হাতে সিগারেট পুড়ছে। হুঁস নেই।

লতিকা সোফা থেকে তড়াক করে উঠে বসল। ছুটে যেতে পারত কিন্তু গেল না। সকাল থেকে

যা চলছে। উটকো ঝামেলা। যার বাঞ্ছারাম সে বুঝবে। কি দরকার ছিল এত দরদ দেখানোর। বউ যার পালিয়েছে সে বুঝবে। না শ্যামদুলাল খবরাখবর নিতে পারে। পুলিশ থানা পর্যন্ত করেনি। রূপার বাবাও রা করছে না। নিজের মেয়ে, কোথায় আছে জানবে না হয়! খুলে বললেই হয়—না বাপু, আমার মেয়ে তোমার ঘর করবে না। ঠিক সে তার কোনো আত্মীয়ের বাড়ি আছে। এই কি সসেমির অবস্থা মানুষটার!

শ্যামল হাই তুলে বলল, হুঁস নেই বলছিস।

হ্যাঁ। ডাকলাম, সাড়া দিল না।

বলেছিলি, দাদা ডাকছে।

না।

যা বলগে দাদা ডাকছে। লাফিয়ে ছুটে আসবে।

শ্যামলের এ-ধারণের ব্যাবহারও লতিকার কেন যে ভাল লাগল না। মজা লুটছে মনে হল। তথাগতবাবু এত সরল, ভাবতেই অবাক লাগে। শ্যামল সেই সুযোগ নিচ্ছে। দাদা ডাকলেই কোনো খবর টবর এসে গেছে এমন যে ভাবে তাকে নিয়ে বেশি দূরে যেন যাওয়াও যায় না। খবরের আশায় চলে এসেছে সেই সকালে। শ্যামদুলালবাবু যদি কোনো খবর দেয়।

লতিকার মনে হল দুই বন্ধু মিলেই তামাশা করছে তথাগতবাবুর সঙ্গে। তাকে আশা দিচ্ছে। সে আশায় আশায় নাকাল হয়ে গেছে। কি দরকার ছিল বলার, শ্যামদুলাল ঠিক পারবে। থানা পুলিশও হল না, থানা পুলিশ করলে রূপার ইজ্জত থাকবে না, তার ইজ্জত থাকবে না, এমন যে ভাবে তাকে নিয়ে ন্যাজে খেলাতে এদের কষ্ট হয় না।

রূপা কোথাও না কোথাও ঠিক আছে। পাঁচ ছ মাস হয়ে গেল কোনো খবর নেই। কবে থেকেই স্যামল বলছে, কি যে করা যায়। আশায় আছে বলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়নি। মেয়েটা যে ভাল না তাই বা বলি কি করে। গেলে ছাড়তেই চাইত না। শেষে মেয়েটার কি যে ভীমরতিতে পেল বুঝি না। এমন আপশোষের কথা লতিকা কতবার শুনেছে, তবে সে মাথা গলায়নি। মাঝে মাঝে বলেছে, খবর পেলে!

না।

আবার না এখানে ছুটে আসে। তুমি বাড়ি থাকো না, আমার ভয়ই করে। কি করতে কি করে বসবে কে জানে! কিন্তু আজ বাজারে গিয়ে বুঝছে, এমন কি সারাদিন দেখেও বুঝেছে, মাথায় মানুষটার রূপা ছাড়া আর কিছু নেই। এমন যে সুন্দর ভালবাসা তাকে ফেলে কেউ চলে যেতে পারে!

মণি আসার আগেই তথাগত ছুটে এসেছে।

দাদা আমাকে তুমি ডাকছিলে!

বোস। ঘাসে শুয়ে থাকলে পোকামাকড়ে কামড়াতে পারে।

জানো দারুণ জ্যোৎস্না উঠেছে। ঘরে বসে থাকতে তোমার ভাল লাগে!

বাইরে যেতে পারছি না। শ্যামদুলাল ফোন করতে পারে।

তথাগতর মনে হল, তাই তো। সে ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকল। একটা ফোন পৃথিবীতে মানুষের জন্য এত অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে তথাগতকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। লতিকার চোখে কেন যে জল এসে গেল। নিজেকে সামলাবার জন্য পাশের ঘরে ছুটে গেল। মণিকে ডেকে বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না রে। খেয়ে যাস। সব বের করে নে। মাংসটা বসিয়ে দে কুকারে। চাটনি করিস। চাল বেশি নিস। গোপালের ভাত নিয়ে যাবি।

তারপর লতিকা কেন যে খাটে বসে গেল। তারপর শুয়ে পড়ল। কেন একা মনে হচ্ছে নিজেকে। এই সংসার তার নিজের। শ্যামল তার সব। একটি শিশু এ-বাড়িতে খেলা করে বেড়ালে ভরে থাকত সংসার। আজ কেন যে তার এত একা মনে হচ্ছে। সব কিছু তার কাছ বিশ্বাদ ঠেকছে। এই মানুষটা মাংসের দোকানে যেতে পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। অথচ সে পাঠার মাংস খুবই ভালবাসে। শুধু সাজিয়ে দিতে হয় বাটি ভরে। এই কাজটা রূপা হয়তো ঠিক মতো করতে পারেনি। অন্য কাউকে ভালবাসা যে না যায় তাও না। সেও তো তার এক দূর আত্মীয়কে কম ভালবাসত না। বিয়ের আগে শরীরও দিয়েছে।

এতে তার শুচিতা নষ্ট হয়েছে, এমন আদৌ ভাবে না। এখনতো খবরই রাখ না তার। শরীর যা চায় তা পেলে, ভালবাসা কত মিথ্যে হয় বিয়ের পর সে ভালই বুঝেছে।

আরও কত কথা মনে হয়। সংসারে একজন পুরুষ দিন দিন বিবাগি হয়ে যাচ্ছে একজন নারীর জন্য ভাবতেই তার শরীরে কাঁটা দিল। সে বাথরুমে ঢুকে গেল। শরীরে জল ঢালল। শাড়ি শায়া খুলে ফেলে অনেকক্ষণ কেন যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল নিজেও বুঝল না। গা ধুয়ে নিজেকে বড় ফ্রেস লাগল। বাইরে বের হয়ে বারান্দায় সায়া শাড়ি মেলে, রান্নাঘরে উঁকি দিল।

আর উঁকি দিতেই মাংসের সুবাস পেল।

মণি বলল, গরম মসলা, ঘি বের করে দাওনি বউদি। ভাত বসিয়ে দিলেই হবে। নতুন দাদাবাবুকে চা দিলাম। খাচ্ছে না। বসে আছে চুপচাপ। হাবুলবাবু দাদাবাবু মাথা গোঁজ করে বসে আছে। যুদ্ধ। জানো বউদি আমার না দেখলে কি হাসি পায়! কটা কাঠের গুঁটিতে এতে কি মজা আছে ছাই মাথায় ঢোকে না।

মাথায় আর ঢুকিয়ে কাজ নেই। আমি দেখছি কেন চা খাচ্ছে না। লতিকা নিজের ঘরে ঢুকে আয়নায় ফের নিজেকে দেখল। সামান্য পারফিউম স্প্রে করল শরীরে। মুখে স্নো এবং পাউডার ঘসে কপালের কিছুটা চুল দু আঙ্গুলে ঘসে ঘসে আলগা করে দিল। এতে কপালের চুল কিছুটা ফেঁপে গেল। কেমন নায়িকা এবং লাস্যময়ী দেখায় এতে। ঠোঁটে হালকা করে তামাটে রঙের লিপস্টিক ঘসে দিল। পায়ের পাতা দিয়ে শাড়ির কিছুটা শরীর থেকে ছাড়িয়ে আরও যেন হাল্কা হয়ে গেল। দেরি করল না আর। পাফ এবং পাউডার খোলাই পড়ে থাকল। মানুষটা এ-ভাবে একা বসে আছে—তার কিছুটা যেন টান ধরে গেছে। দরজা খুলে বারান্দায় ঢুকে অবাক। অন্ধকার বারান্দা। মানুষটা নেই।

কোথায় গেল।

আলো কে নেভাল!

নাকি আলো বারান্দায় জ্বালানোই হয়নি।

মণি কি অন্ধকারেই চা রেখে গেছে। আলো জ্বেলে দেখল, চা পড়ে আছে টিপয়ে।

লনে নেমে হিস হিস করে ডাকল, আপনি কোথায়?

বের হয়ে গেল না তো। ট্রেনে বেশি সময়ও লাগে না। স্টেশনে চলে যেতে পারে। লতিকা এবার নিজের মানুষটার উপরই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। খেলার নেশা মদের নেশা যার এত তার উচিত হয়নি তথাগত বাবুকে আটকে রাখা। মানুষটা স্বাভাবিক থাকলে অপমান বোধ করত। স্বাভাবিক নেই বলেই কিছু মনে করছে না হয়তো। তথাগতবাবু যে এ-বাড়ির অতিথি এটা বোঝা দরকার। হাবলুবাবুটাও হয়েছে, বিনা পয়সায় মদ গেলার মৌকা ছাড়তে রাজি না।

আরে তুমি বুঝবে না, বাড়িতে গেস্ট। গেস্ট এখন বেপাত্তা। বুঝবে না কত নিঃসঙ্গ তথাগতবাবু। খেলায় মজে আছ!

সে ডাকল, শুনছেন। বাগানের গেট খুলে রাস্তায় উঁকি দিল। রিকসা, ভ্যান, দোকান মানুষজন সবই ঠিকঠাক আছে কেবল তথাগতবাবু নেই।

কোথায় গেল!

সে ছুটে গিয়ে বলতে পারত, তোমার কি কোন বোধ বুদ্ধি নেই! মানুষটা হাওয়া জানো! কিন্তু শ্যামল ভাবতে পারে, এত দরদ তোমার হঠাৎ! আগে তো তথাগতর নাম শুনলেই চটে যেতে।—পাগল না ছাই। আসলে সেয়ানা। এখানে যেন আবার পাগলামি করতে না চলে আসে। পাগলামিটা আসলে কি শ্যামল বোঝে বলেই তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে পারছে না।

ঘাড়ে কার নিঃশ্বাস পড়ছে। পেছনে তাকাতেই দেখল তথাগত দাঁড়িয়ে আছে পেছনে।

চোর কোথাকার'! মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল আর কি।

কোথায় গেছিলেন! চা খেলেন না যে!

ভাল লাগছে না।

চলুন বারান্দায় বসবেন!

আপনি যান। বারান্দায় যেতে ভাল লাগছে না।

বারান্দার অন্ধকারে একা বুঝি ভয় লাগে?

তথাগত কোনো উত্তর দিল না।

আসুন বলছি! কপট ধমক লতিকার।

তারপর লতিকা হাত ধরে টানতেই তথাগত কেমন বালকের মতো হয়ে গেল।

জানেন, এই সব ঘর বাড়ি আমার এতচেনা, অথচ আজ কেন যে মনে হচ্ছে, আমি কিছুই চিনি না। সব বাড়িতেই দুঃখ থাকে, এটা আমার তখন মনেই হয়নি। দাসবাবুকে চিনতেন। ঐ যে দেবদারু গাছটা আছে, তার পেছনের বাড়িটা। দাসবাবু স্ত্রীর মৃত্যুর পর এক মাসও পার করেন নি। বিয়ে করে আর একটা নতুন বউ নিয়ে এলেন। সে বউ টিকল না। পালাল। দাসবাবু আর ঘর থেকে বের হতেন না। একদিন চেঁচামেচি শুনে ছুটে গেলাম। দাসবাবু ঝুলছে। তার আগের বউটা মরেই-বা গেল কেন, দাসবাবু আবার বিয়েই করলেন কেন, আর তারপর ঝুলেই বা পড়লেন কেন? বাড়িটা দেখে এলাম।

কি দেখে এলেন?

কারা আছে দেখে এলাম।

ওখানে তো বিশুবাবু তার বউ মেয়ে নিয়ে থাকে। আট দশ বছর হল ভাড়া আছে।

বাড়িটা কত পুরানো জানেন।

না তা জানি না।

বাড়িটার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আমি শুনতে পাই জানেন।

এই আবার বুঝি পাগলামি শুরু হল।

চলুনতো, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আর শুনতে হবে না। আসুন। তথাগতর কোনো কথাই আর স্বাভাবিক ভাবা যায় না। মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে গেলে নিজের মনে কথা বলে, তথাগত হয় তো তার সঙ্গে কথাই বলছে না। যা বলছে নিজের সঙ্গে। সে উপলক্ষ মাত্র। প্রায় হাত ধরেই বারান্দায় তুলে এনে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

চা-এর কাপ তুলে নিয়ে বলল, বসুন আসছি। চা খেতে হবে না।

শুনুন।

লতিকা পেছন ফিরে তাকাল।

দাদাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার কোনো ফোন এসেছে কি না!

কে করবে?

কেন শ্যামদুলালবাবু! রূপার খোঁজ তিনি পেয়েছেন। আমাকে কিছু বলছেন না। সময় হলেই সব বলবেন বলেছেন। আমিতো এজন্যই এত সকালে চলে এলাম। দাদাকে নিয়ে শ্যামদুলাল বাবুর খোঁজে যাব—শ্যামদুলাল বাবুকে নিয় রূপার খোঁজে যাব। যতই খুঁজে পাক, আমি না গেলে রূপা ফিরবে না। কেন যে এটা দাদা বুঝছে না, বুঝি না।

ভিতরে যান না। জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।

দাদা যদি রাগ করে।

রাগ করে করবে। জরুরী ফোন যখন আপনার জিজ্ঞেস করাই ভাল। যান।

না থাক।

কষ্টটা কেন যে বাড়ছে লতিকার।

এখন আর চা খেতে হবে না। মাংসটা টেস্ট করে দেখুন। দেখবেন আবার রাস্তায় পালাবেন না। দাদা আপনার জানতে পারলে খুব রাগ করবে।

না না। আমি পালাচ্ছি না।

লতিকা যত দ্রুত সম্ভব রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। দু টুকরো মাংস, এক পিস আলু প্লেটে তুলে নিয়ে এসে দেখল, তথাগত বসেই আছে।

দেখুন তো নুন ঝাল ঠিক আছে কি না।

আমাকে দেখতে বলছেন?

তবে কাকে।

নুন ঝালের কিছু বুঝি আমি।

খুব বোঝেন।

চামচে করে এক টুকরো মাংস মুখে আলাগা করে ফেলে দিল তথাগত। অনেকক্ষণ ধরে চিবোল। তারপর কেমন উৎফুল্ল হয়ে বলল, দারুণ।

দারুণ দিয়ে আমার কাজ নেই। নুন ঝাল মিষ্টি ঠিক আছে কি না বলুন।

এসবের আমি কিছু বুঝি না বউদি!

ওটা বুঝতে হবে। ওটা না বুঝলে বউ ঘরে থাকবে কেন?

তথাগত ভেবে পেল না, নুন ঝাল মিষ্টি বোঝার সঙ্গে বউ থাকা না থাকার প্রশ্ন আসছে কি করে? সে ফের বলল, দারুণ।

লতিকা আর কিছু বলল না। সে খুব রেলিশ করে খাচ্ছে। চেটেপুটে খাচ্ছে।

লতিকা না বলে পারল না, খেতে শিখেছেন শুধু। ঝাল নুন মিষ্টি ঠিক আছে কি না বুঝতে শেখেন নি। এ লোকের কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কি থাকতে পারে! আর একটু দিই।

লতিকা মাংসের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে এল। টিপয়ে রেখে বলল, খান।

তথাগতর কোনো দ্বিধা নেই। অবলীলায় বাটি তুলে নিল হাতে। খেতে থাকল। আরও এনে দিলে যেন খাবে।

লতিকা অবশ্য আর দিল না। কারণ পাঁঠার মাংস ভাত খাওয়া বেশি জরুরী মানুষটার। সে এক ফাঁকে শ্যামলকে ডেকে বলল, হাবুলবাবু কখন যাবে।

মনে তো হয় নটায় উঠে পড়বে।

নটা ফটা বুঝি না। এক্ষুনি খেলা বন্ধ কর। কখন যাবে? বল, আমার শরীর ভাল নেই। গেস্টকে নিয়ে তাড়া আছে বলে দাও।

লতিকাকেক কি করে চাঙ্গা করতে হয় শ্যামল জানে। সে গ্লাসে ঢেলে দিয়ে গেল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, উনি কি করছেন।

পাঁঠার মাংস খাচ্ছেন।

এত তাড়িতাড়ি শুরু করে দিল। আমাদের দু প্লেট দাও না। গ্লাসে আছে। জল ঢেলে নিও।

হাবলু বাবুকে আগে ফুটিয়ে দাও। তারপর দেখছি।

শ্যামল সোফায় বসে বলল, আজ থাক। আমাকে একটু উঠতে হবে।

তা আপনার গেস্ট এসেছে বললেন কই দেখলাম না তো!

ওকে আপনি দেখেছেন। আমাদের তথাগত। ওর বাবা বণিকবাবুদের বাড়ি ভাড়া থাকতেন।

যার বউ পালিয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি দিনকাল হল বলুনতো। আমাদের সময়ে ও-সব ভাবা যেত! মেয়েগুলো সব বেশ্যা হয়ে যাচ্ছে।

তা ঠিক।

শ্যামলের আর কথা বলারও আগ্রহ নেই। নেশা জমে গেলে তার বড় ত্রুটি কথা শুরু করলে শেষ করতে পারে না। সে মাতাল এমন প্রমাণ দেবার ইচ্ছেও তার থাকে না। সোজা সুজি কথা বলতে পারছে এখনও। কথা বিন্দুমাত্র জড়ায়নি। হাবুলবাবু বলল, তা হলে এই চালটাই থাকল। কাল দেখা যাবে কি করা যায়। উঠছি।

শ্যামল হাবুলবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে তথাগতকে দেখতে পেল। সে বাটি থেকে চেটেপুটে ঝোল খাচ্ছে।

কি রে চিনিস? হাবুলবাবু। রমেনের বাবা।

হাবুলবাবু বলল, এতদিন পর মনে আছে কি!

তথাগত বলল, একবার আপনি কি একটা কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলেন না। বাড়ির ঝি আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল গায়ে। মেয়েটার কি নাম যেন। ধুস আমার কিছুই মনে পড়ছে না। গর্ভবতী ছিল।

হাবুলবাবু পালাতে পারলে বাঁচেন। যত পাগল ছাগল নিয়ে শ্যামলের কারবার।

আমি যাই।

প্রায় ছুটে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলেন।

আরে পালাচ্ছেন কেন। তথাগত যেন উঠে গিয়ে লোকটাকে ধরেই ফেলবে।

হাবুলবাবুর ছুটে যাওয়া দেখে তথাগত হা হা করে হেসে উঠল। তথাগত কখনও হাসে না। বউ ফেরার হবার পর শ্যামল কখনও তাকে হাসতে দেখেনি। শ্যামদুলালের ফোনের আশায় আছে। রাতে ফোন করার কথা ছিল। রাত তো কম হল না। নটা বাজে। সে ঘড়ি দেখল। হাতে গ্লাস। গ্লাস শেষ করে দিল এক চুমুকে। বারান্দায় দাঁড়িয়েই তথাগতকে দেখল।

তথাগত বাটি চাটছে।

এবারে রেখে দে। আয় খেতে বসি।

দাদা শ্যামলদুলাল বাবু আজ ফোন করবে না?

করবে। ভিতরে আয়। একটু খেয়ে দ্যাখ না।

না তুমি খাও। আমিতো জানো খাই না।

খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। বউ-এর নেশাটা অন্তত কাটবে।

লতিকাও বলল, একটু খান। খিদে হবে।

আমার এমনিতেই খুব খিদে হয়।

রিচ খাবেন। একটু খেলে ভাল লাগবে।

লতিকা গ্লাস নিয়ে ঢেলে দিল।

তথাগত প্রায় যেন ভয়ে পালাতে চাইছে।

এই দেখুন না, আমি খাচ্ছি। একটা মেয়ে যা পারে আপনি তাও পারেন না!

তথাগত কেমন করুন চোখে বলল, খেতে বলছেন! খেলে ভাল লাগবে বলছেন। আপনার ভাল লাগে খেলে?

খুব ভাল লাগে। খাওয়ার আগে আমরা রোজই খাই। ভাল ঘুম হয়। স্বপ্ন দেখতে হয় না।

আমি যে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি।

তাই বলে একটা স্বপ্ন রোজ কেউ দেখে।

না, এখন আরও একটা স্বপ্ন দেখি।

সে কে?

ও, ও মানে, না বলা ঠিক হবে না।

আপনিতো একজন বুড়ো মানুষের স্বপ্ন দেখেন। ওটা না দেখাই ভাল। খান। বসে থাকলেন কেন? হাতে নিয়ে বসে আছেন। এখুনি খেতে দেওয়া হবে।

তথাগত গ্লাসটা তুলে দেখল। ওষুধ গেলার মতো সবটাই এক ঢোকে মেরে দিতে গিয়ে বিষম খেল।

কি যে করেন না।

লতিকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এ ভাবে খায়!

শ্যামল বলল খাক, খেয়ে মরুক। ওর মরাই ভাল।

কি যে বল না তুমি। আস্তে খান।

তথাগত কেমন হাঁপাচ্ছে। তার খাওয়া ঠিক হয়নি। খাওয়াটাই সে শেখেনি। সে খুব আস্তে এক ঢোক খেল। বিস্বাদ। ওষুধের গন্ধ। কিন্তু কি হল, কেন যে মেজাজ পাচ্ছে। উত্তেজনা হচ্ছে। সে নিজেরটা

শেষ করে ফের গ্লাস বাড়িয়ে দিল। শ্যামল ঢালল কিছুটা। উপরে তুলে দেখল। তারপর জল ঢেলে বলল, শসা আদা নুন মুখে দে। এইটুকুই বরাদ্দ আজ। আর পাবে না মনে রেখ।

আমার জানো নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে দাদা।

নেচে আর কাজ নেই, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো। সকালে দুগগা দুগগা করে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বাঁচি।

তখনই ফোন।

হ্যালো কে?

আমি অমর দাদাবাবু। কাল রাত থেকে বাবুর পাত্তা নেই। কোথায় যে গেল! বলেতো গেল আপনার কাছে যাবে। কিন্তু সকালে ফিরল না, দুপুরেও না। এত রাত হয়ে গেল।

ফিরবে। কাল সকালে ট্রেনে তুলে দেব। স্টেশনে থাকিস। মাথাটা সত্যি গেছে।

তথাগত বোকার মতো তাকিয়ে আছে।

কার ফোন দাদা!

অমর, তুই ফিরে যাসনি। ওর চিন্তা হচ্ছে।

ফোন রেখে সবাই খাবার ঘরে ঢুকবে ভাবছে। মণি টেবিল সাজিয়ে বসে আছে। বাবুদের খাওয়া হলে সে নিজের খাবারটা সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবছে। তার নিজেরও তর সইছে না। গোপাল ঠিক তার অপেক্ষাতে বারান্দায় বসে দাঁত খুঁটছে। একটু পেটে পড়ায় কতক্ষণে গোপালের কাছে যাবে সেই অপেক্ষাতে অধীর হয়ে আছে।

আবার ফোন।

যে যার জায়গায় বসে আছে।

কে আবার ফোন করল।

লতিকা তার এবং তথাগতর গ্লাস তুলে বেসিনে ধুয়ে তুলে রাখবে ভাবছিল আর তখনই ফোন।

শ্যামদুলালের ফোন।

রিসিভারের মুখ চেপে তথাগতকে কথাটা বলল।

সঙ্গে সঙ্গে তথাগতর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গেল। তার মুখ কিছুটা শুকিয়ে গেছে। শ্যামদুলালবাবু কি খবর দেবে কে জানে।

কি সব শুনছে দাদা। খুব মনোযোগ দিয়ে যেন শুনছে। হাতে দাবার একটি গুটি। হাতির দাঁতের বাকসে তুলে রেখে শেষ করতে পারেনি। ফোন। হাতে সে গুটিটা নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খেলা করছে। লতিকাও উঠতে পারছে না। যদি সত্যি রূপার খবর পায় শ্যামদুলাল। বিছানায় একজন পুরুষের কত দরকার রাত বাড়লেই সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। পুরুষেরও চাই একজন নারী। সংসার সমাজ সব এই এক আকর্ষণে। তথাগত বাঘের মতো হয়ে আছে তাও সে বোঝে। অথচ কি এমন জটিলতার সৃষ্টি হল, রূপা ঘর ছেড়ে পালাল! এটাই রহস্য।

এই রহস্য তাকে উঠতে দিচ্ছে না।

মণিও দরজার কাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! বাবুরা খেয়ে নিলে তার ছুটি। বুঝবে কি করে ছবিটা দেখার পরই সে বড় গোপালের জন্য কাতর হয়ে আছে।

শ্যামল বলল, হ্যাঁ বল। শুনছি।

তোর বাঞ্ছারাম অমানুষ। কি যে করতে ইচ্ছে হচ্ছে না! মেয়েটাকে ওই ধোঁকা দিয়েছে। ওকে ঠাঙাতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাছে পেলে কী যে করতাম না! ব্যাটা্ তুই কিছু জানিস না বিয়ের—বিয়ের পিঁড়িতে বসে গেলি! ওর ফাঁসি হওয়া উচিত।

শ্যামল খুবই গম্ভীর। একবার চোখ তুলে তথাগতকেও দেখল।

তথাগত সেই আগের মতো—যেন একেবারে নাবালক কি বলছে দাদা, রূপা আসবে বলছে।

তোর মুণ্ডু বলছে। একদম কোনো কথা না। চুপ করে বসে থাক।

তবু শ্যামল তথাগতর বেচারা মুখ দেখে কিছুটা আত্মপক্ষ সমর্থনের গলায় বলল, ওর কি দোষ! পালাল বউ, দোষ হল ওর। একদম আজেবাজে বকবি না।

একদম আজেবাজে বকছি না। ওকে তোরও ঘেন্না করা উচিত। কোনো সম্পর্কই আর রাখা উচিত না।

কেন ঘেন্না করব, কেন কোনো সম্পর্ক রাখব না বলবি তো!

মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিল। পাজি হতভাগা। রূপার বান্ধবীর দেখা না পেলে কিছুই জানতে পারতাম না। মেয়েরা জানিস মিছে কথা বলে না।

মেয়েরা মিছে কথা বলে কি বলে না ঠিক জানি না। আমার কেমন রহস্য ঠেকছে।

লতিকা কেমন তেড়িয়া হয়ে বলল, তোমার বন্ধুকে বলে দাও মেয়েরা খুব মিছে কথা বলে। অকারণে মিছে কথা বলা তাদের অভ্যাস। মেয়েরা পারে না হেন কাজ নেই।

আস্তে।

রিসিভারের মুখ চেপে শ্যামল লতিকাকে ধমক দিল।

রূপা তার বান্ধবীকে সব বলেছে। ওর বাবা মাও জানে।

আরে জানেটা কি বলবিতো।

উনি একটা আস্ত ধ্বজভঙ্গ। মানে ইম্পোটেন্ট, মানে পুরুত্বহীন।

শ্যামল কথাটাতে ঘাবড়ে গেল। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে—তথাগত এত মিন মিনে শয়তান। ছিঃ ছিঃ!

ইম্পোটেন্ট! তাহলে তুই যে বললি তার মামার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি—আমি কিছু সত্যি বুঝছি না।

ওসব ঠিকই আছে। তবে মেয়েটা আর বাড়ি থেকে বের হয় না। ওর বাবা মা খুব মুষড়ে পড়েছে। এত ঘটা করে বিয়ে, জুয়েল ছেলে, এখন কি করুণ অবস্থা বল। সবারই একটা সামাজিক অবস্থান আছে।

শ্যামল কি ভাবল। দঁতে দাঁত চাপল। এ যেন শেষ লড়ালড়ি। সে হারবার পাত্র নয়। বেশ চিৎকার করেই বলল, শোন রূপা বজ্জাত মেয়ে। ডির্ভোস পাবার জন্য এসব বলে। আমি বিশ্বাস করি না বাঞ্ছারাম ইম্পোটেন্ট।

তোর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু হবে না। যা খবর সংগ্রহ করেছি, তাতে এটাই প্রমাণ হয় বাঞ্ছারাম ইম্পোটেন্ট।

শোন শ্যামদুলাল, কেস জোরালো করার জন্য অকারণ স্বামীর বিরুদ্ধে মার ধোর, নির্যাতন, ইম্পোটেন্ট, অন্য নারীর প্রতি আসক্ত এমন অনেক অভিযোগই তুলতে পারে। আমিতো চাই ডিভোর্স হয়ে যাক। রূপা যদি এই গ্রাউন্ডে স্বেচ্ছায় রাজি হয় তবে কোনো ঝামেলাই থাকে না। তথাগতকে দিয়ে কোনো দিন ডিভোর্সের মামলা তোলা যাবে না। বউ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। তাকে দিয়ে আমরা কতটা আর কি করতে পারি। ভালই হল! রূপার প্রেমিকের খবর কি!

লতিকা আর বসতে পারছিল না। এমন যে সুপুরুষ, যে কিনা পুরুষত্বহীন। তার কিছুটা ঘৃণারও উদ্রেক হচ্ছে। তুই বুঝবি না, তোর শরীরে কি আছে না আছে। একটা মেয়ের এত বড় সর্বনাশ কেউ করে! বিয়ের পর পুরুষের শরীর ছাড়া একজন নারী বাঁচতে পারে!

লতিকা প্রায় তথাগতর উপর ক্ষেপে গিয়েই যেন উঠে পড়ল। তাড়াতে পারলে বাঁচে। গ্লাস দুটো হাতের আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেলতে ইচ্ছে হল। আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললে আর এক নাটক, এতটা নাটকে ভাল দেখায়না। মণির হাতে গ্লাস দুটো তুলে দিতে গেলে, সে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে বলল, মিছে কথা বউদি। বাবু পুরুত্বহীন হতেই পারে না। নতুন বাবুর চোখে আগুন আছে আমি দেখেছি।

আগুনের তুই কি বুঝিস?

আমি বুঝি না! নতুন বাবু যে শাহরুখ খানের মতো দেখতে।

তারপরই কেন যে মনে হল মণির, এই আগুন বুঝি বলেই তো অধীর হয়ে থাকি বউদি। ঝুপড়ি ঘরে ঢুকলেই শান্তি। মানুষটা আমাকে কামড়ে খায়। কামড়ে না খেলে মেয়েরা যে সুখ পায় না। তারপর

কি ভেবে ফের বলল, আমি বলছি বউদি নতুনবাবুর চোখে আগুন আছে। চোখে এমন আগুন যার সে কখনও পুরুষত্বহীন হয়!

বলছিস হয় না!

না।

তোর এত বিশ্বাস বাবুর উপর! থেকে যাবি নাকি।

মারব বৌদি।

লতিকা যেন ভরসা পেল। দরজার আড়াল থেকেই দেখল, তথাগতর মুখ কালো হয়ে গেছে। ইস কিছু না আবার করে বসে। এমনিতেই মাথার ঠিক নেই, তার উপর এত বড় অপমানের বোঝা রূপা কত সহজে তুলে দিচ্ছে।

শ্যামল তখনও ফোন ধরে বসে আছে।

না বলছিলাম রূপা তার প্রেমিকের কাছেই আছে কি না!

না। ওর বাবা মার কাছে আছে।

তথাগত যে বলত, ওর বাবা মা জানে না রূপা কোথায় আছে?

বাবা মা কি করে বলে বল! বললেই তথাগত গিয়ে যদি হামলা করে। এ-জন্য রূপার কোনো খবরই রাখে না বলেছে। ফোন করলেই রূপার বাবা বিরক্ত গলায় না বলে পারে নি কোথায় আছে জানি না। ওর কোনো খবর রাখি না। কিছু জানি না। একদম বিরক্ত করবে না। মানসিক চাপে ভদ্রলোকেরও মাথার ঠিক নেই।

তুই যে বললি, এই যে সকালে ফোনে বললি, রূপা কোথায় ফ্ল্যাট নিয়ে আছে, দিদিমণি বাসায় নেই, কোন এক বুড়ো তোকে বলল, দিদিমণি বেরিয়েছে, তবে এ-সব কি?

ওটা ওর মামার ফ্ল্যাট। বাড়িতে ভাল না লাগলে, দুই বান্ধবীতে ওখানে থাকে। বাড়ির বুড়ো চাকর সঙ্গে যায়।

দুই বান্ধবীতে ওখানে থাকে—এই থাকাটা কি খুব ভাল! আজকাল নারী পুরুষের সম্পর্ক ভেঙ্গে যাচ্ছে। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের নারী পুরুষ ভেবে নিচ্ছে। রূপাকে এত ধোওয়া তুলসিপাতা কেন ভাবছিস বুঝছি না।

রূপার সব জানি না। তবে ম্যাড়াটাকে বলবি ও-ভাবে নারী সংসর্গ হয় না। দুজনেই রাতের পর রাত এক খাটে শুয়েছে—অথচ পুরুষটি নির্বিকার। বোঝো এবার।

মেয়েটি? মানে রূপা—সে নির্বিকার থাকবে কেন। বাঞ্ছারামের না লাজ লজ্জা বেশি, মেয়েরা যে বিছানায় ক্ষত বিক্ষত হতে ভালবাসে সেটা হয়তো জানেই না। ওর বাবা মা যে ভাবে গার্ড দিয়ে মানুষ করেছে! তাতে ওরকমেরই হয়। চোখ তুলে তাকানোও অসভ্যতা। সে নির্বিকার, এক বিছানায় এটা কি ভাবা যায়! রূপা সাড়া দেবে না!

রূপা পারে?

কেন পারবে না? মেয়েরা সব পারে।

জানিসই তো মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। কি করবে, বেচারা পাশ ফিরে শুয়ে থাকত। ঘুমিয়ে পড়ত। জঘন্য ঘটনা—বুঝলি, ঘুমিয়ে থাকলে শাড়ি তুলে টর্চ মেরে রূপার সব দেখত। কয়েকবারই ধরা পড়েছে।

যা বাজে কথা।

বাজে কথা না সোজা কথা। ওর বান্ধবী আকারে ইঙ্গিতে যা বললে জানতেই পারতাম না বাঞ্ছারাম এত বড় মিন মিনে শয়তান। রূপার ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাড়াতাড়ি উঠে শায়া শাড়ি টেনে দিত। পুরুষের এই অসভ্যতা কোনো নারী সহ্য করে বল! আর ম্যাড়াটা বুঝলি পাশ ফিরে ঘাপটি মেরে থাকত। কোনো গণ্ডগোল না থাকলে এ-সব হয়!

গণ্ডগোল একটা নিশ্চয় আছে। কিন্তু বুঝছি না, ইম্পোটেন্ট ধরে নিলি কেন। রূপাই বা ওকে ইম্পোটেন্ট ভাবল কেন। এতে কি প্রমাণ হয় তথাগতর স্ত্রী সংসর্গ করার ক্ষমতা নেই!

হয় না! রূপা মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরেছে, চুমু খেয়েছে। সে চুমু খায় নি। কেবল রূপার সৌন্দর্য কেমন বিভোর হয়ে দেখেছে। আরে ওর রূপ দেখলে কি রূপার পেট ভরবে। পেট না ভরলে রূপা এক খাটে শোবে কেন? রূপা কপট নিদ্রার মধ্যে ওর শরীরে পা তুলে দিয়েছে, ম্যাড়াটা সন্তর্পণে পা নামিয়ে দিয়েছে কোমর থেকে। হারামজাদা রূপার শরীরে টর্চ মেরে সব দেখার এত লোভ আর কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ইম্পোটেন্ট না হলে কখনও কোনো পুরুষ পারে! বল পারে কি না?

তা অবশ্য ঠিক। তবে যে রূপা বলত, ওর প্রেমিক আছে।

ওর প্রেমিক আছে কে বলল তোকে।

আর কে বলবে। বাঞ্ছারামই বলেছে। বিয়ের আগে থেকেই আছে। তার কাছে চলে যাবে বলত। সে কে? তার খোঁজ পেলি?

শোন শ্যামল সব মেয়েরই একজন প্রেমিক থাকে। মেয়েরা একজন প্রেমিকের কথা ভেবেই বড় হয়। আর এতো কথাবার্তা দেওয়া বিয়ে। বিয়ের আগে তথাগতর সঙ্গে রূপার দু একবার দেখাও হয়েছে। আমার মনে হয় তথাগতর মধ্যে নিজের প্রেমিককে আবিষ্কার করে ছিল। হায় বিয়ের পর দেখল, তথাগতর সব আছে। নেই সহবাসের ক্ষমতা। রূপা বলতেই পারে সে তার প্রেমিকের কাছে চলে যাবে, সব মেয়েই তো বড় হয় একজন পুরুষকে বিছানায় নিয়ে শোবে বলে। সেই বিছানাই যদি অর্থহীন হয়ে যায়, তবে তার আর থাকে কি? পুরুষ তাকে ক্ষত বিক্ষত করলে সে যে আরাম বোধ করবে তাও সে বোঝে। তা না থাকলে তো তার শরীর অর্থহীন হয়ে যায় না! সে তার নিজের সেই স্বপ্নের কথা হয়তো বলতো তথাগতকে।

বিরক্ত হয়ে শ্যামল এবারে না বলে পারল না, কি বলব বল, আমার মাথায় কিছু আসছে না। তবে তথাগত পুরুষত্বহীন ভাবতে পারছি না। মাসিমা মেসোমশাই ছেলে একা কোথাও গেলেই জলে পড়ে যেত। মা বাবা ছাড়া বাঞ্ছারাম কিছু বুঝতও না। এত গার্ড দিয়ে বড় করলে কী হয় ওঁরা বেঁচে থাকলে বুঝতে পারতেন। মেয়েদের সম্পর্কে তথাগতর সব সময় দেবী দেবী ভাব।

শ্যামল দেখল কখন যে তথাগত উঠে গেছে, লতিকা নেই, সে ঘরে একা।

সে বলল, দেবী দেবী ভাব হলে যা হয়। নারীর এমন সুন্দর শরীর ক্ষত বিক্ষত করলে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, নারীকে অপমান করা হয়—নিজেকে বেহায়া নির্লজ্জ ভাবতে হয়—কিংবা খুবই অশ্লীল ব্যাপার—নারী পুরুষের একশ রকমের জটিলতা বুঝলি—আমি তুই আর কি করতে পারি। এও হতে পারে তথাগতর নারী সংসর্গ করার সত্যি ক্ষমতা নেই। রূপাই বা মিছে কথা বলবে কেন? মেয়েটাকে এত ছোট ভাবা তার ঠিক হয়নি। তথাগতর উপর তার নিজেরও ঘেন্না ধরে গেল। এতই ক্ষুব্ধ বোধ করল যে সে আরও কিছুটা গ্লাসে ঢেলে নিল।

যদি সত্যি বাঞ্ছারাম পুরুষত্বহীন হয় তবে চম্পাবতী কেন কোনো অমরাবতীই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। একা একা এত দীর্ঘজীবন তথাগত কাটাবে কি করে! পৃথিবীর সব মায়া, ভালবাসা, স্নেহ সব যে মেয়েদের কাছে গচ্ছিত। তারা অকৃপণ হাতে ভোগ করতে না দিলে পুরুষ যে ভিখারী।

তারপরই শ্যামলদুলাল বলল, যাই হোক ওকে আর কিছু বলতে যাস না। কষ্ট পাবে। আমরা সবাই ওর দুর্বলতা জেনে ফেললে সে নিজের কাছে আরও ছোট হয়ে যাবে। তা হলে পরে দেখা হচ্ছে ছাড়ছি।

শ্যামল উঠে পড়ল। হাতে গ্লাস নিয়ে তথাগতকে খুঁজল। মাথাটা খুবই ধরেছে। লতিকা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লতিকাকে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে।

ও কে দেখছি না।

খাওয়ার টেবিলে বসে আছে।

তারপর সে শ্যামদুলালের সব কথা খুলে বলল।

লতিকার মুখ ব্যাজার। সব শুনে আরও ব্যাজার হয়ে গেল কেন লতিকার মুখ শ্যামল বুঝতে পারল না। তথাগতর সুন্দর চোখ, তাকানো এত স্বাভাবিক, নতুন বাবুর চোখে আগুন আছে—কত সব কথা সহসা লতিকাকে কাবু করে দিল।

খেতে বসে শ্যামল দেখল, তথাগত উঠে যাচ্ছে।

কি হল?

তথাগত উত্তর করল না।

লতিকা বলল, খাবেন না?

তথাগত বলল, আমি বাড়ি যাব।

এখন বাড়ি যাবেন?

হ্যাঁ। লাস্ট ট্রেন পেয়ে যাব।

শ্যামল বলল, ঠিক আছে খেয়ে যা। আমি যেতে পারব না। লতিকা তোকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে।

কাউকে যেতে হবে না।

কেমন একগুঁয়ে জেদি দেখাল তথাগতকে। এত বড় অপমান নিয়ে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাও কঠিন। লতিকা বলল, যাবেন ঠিক আছে, খেয়ে নিন। না খেলে আমরা দুঃখ পাব।

তথাগত বলল, বাড়ি গিয়ে খাব।

যদি কিছু একটা করে বসে! শ্যামল জোরজার করতেও সাহস পাচ্ছে না। তার বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, কেলেঙ্কারির এক শেষ।

সে যেন তথাগতকে মানে মানে ট্রেনে তুলে দিতে পারলে বাঁচে। ওর সামনে শ্যামদুলালের সঙ্গে ফোনে কথা বলাও যেন ঠিক হয় নি। এতদিন যা ছিল গোপন—তা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল।

প্লিজ খেয়ে যা তথাগত।

তথাগত বের হয়ে যাচ্ছে।

আরে কি হচ্ছে!

তথাগত শুনছে না।

যাও, দাঁড়িয়ে দ্যাখছ কি! ওকে স্টেশনে তুলি দিয়ে চলে এস।—শ্যামল ঠিক দাঁড়াতে পারছে না। কেমন হতাশ মুখে টেবিল থেকে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। শরীর টলছে।

লতিকা বলল, দাঁড়ান তথাগত বাবু। সে ছুটে কাছে চলে গেল। পুরুষের শরীরেও থাকে সুঘ্রাণ। তথাগতর পাশে দাঁড়াতেই এমন মনে হল তার।

তথাগত না বলে পারল না, আপনার আসতে হবে না। ঠিক চলে যাব।

ঠিক আছে চলুন না।

রিকসা ডেকে লতিকা তথাগতকে উঠে বসতে বলল।

আপনি কেন মিছিমিছি আমার সঙ্গে যাচ্ছেন বুঝি না।

লতিকা সরে বসে বলল, ঠিক হয়ে বসুন। গায়ে গা লাগলে নুন নয়, সমুদ্রে গলে যাবেন। ভয় নেই।

ঠিকঠাক হয়ে বসতেই ফের সেই মনের গভীরে গোপন কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। আপনি কত সুন্দর, আপনার সব কিছুই না জানি আরও কত সুন্দর। পুরুষের কাছে নারীর উপমা লতিকাকে বড় কাতর করে ফেলছে।

তথগত স্টেশনে এসে ঘাবড়ে গেল।

তাড়াতাড়ি লতিকা বউদি কিছুটা বাজার করে নিয়েছে। বাজার বন্ধের মুখে। তবু ব্যস্ত স্টেশন বলে এত রাতেও আলু পটল মাংস সবই পাওয়া যায়। খুব ছোটাছুটি করছে বউদি। তাকে কোনো কথাই বলতে দিচ্ছে না। কিছু বললেই এক কথা, আপনি চুপ করুন তো। তারপর ট্রেনে তাকে তুলে দিতে এসে ব্যাগ হাতে নিজেই উঠে পড়ল।

আরে করছেন কি!

চুপ করুন তো।

দাদা ভাববে।

ভাবুক।

তারপর বলেছে, জীবনের ভাল মন্দ আপনি কিছু বোঝেন না। তারপর বলেছে, এ-ভাবে কেন সে পরাজিত হবে! সে কেন মিথ্যা কলঙ্ক নিয়ে বাঁচবে? কলঙ্কটা যে কি তাই সে নাকি বুঝতে পারছে না। শ্যামলদা তার প্রায় কিছুটা অভিভাবকের মতো—তিনি শাসন করতেই পারেন, তাই বলে বৌদিকে তার ভালমন্দ বোঝার দায়িত্ব কে চাপিয়ে দিল বুঝছে না।

না বৌদি, দাদা না ফিরলে চিন্তা করবে। আপনি প্লিজ বাড়ি যান।

চিন্তা করবে না। আপনি উঠুন!

দাদা বসে আছে পাঁঠার মাংস খাবে বলে। আমার উপর আবার হম্বিতম্বি করবে। তোর বৌদি বলল বলেই তাকে নিয়ে চলে যাবি। সময়ে না ফিরলে চিন্তা হয় না। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না! কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল না। কে কখন ভোগে লেগে যাবে—দাদা চিন্তা করবে।

রাখুন চিন্তা। আচ্ছা আপনার লজ্জা করে না এভাবে বউ-পাগল হয়ে থাকতে। কোনো ক্ষমতাই নেই বলছে! বউ থাকবে কেন!

আমার ওখানে গিয়ে কি করবেন?

সে দেখা যাবে।

দাদা ভাববে না?

ভাবুক না।

অশান্তি করতে পারে।

করুক।

বৌদি কেন যাচ্ছে তার সঙ্গে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ এত সদয় তার উপর কেন তাও বুঝতে পারছে না। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আধঘণ্টার মতো পথ। ছুটির দিন বলে, কামরা ফাঁকা। সে এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে। বড় একটা গণ্ডগোলে সে পড়ে যাবে—ভয়ে বেচারা গোছের মুখ। নেমেও যেতে পারছে না। বাধ্য দিতেও পারছে না। কিছু বললেই এক কথা, চুপ করুন তো। বাড়িতে অমর আছে। আপনি তো একা না! দাদাকে আপনার একটা ফোন করে দিলেই হবে। হুঁশ থাকে না রাতে।

স্টেশনে নেমে সে ফের একটা রিকশা নিল।

সে আশ্চর্য হয়ে গেছে, লতিকা বউদির বিন্দুমাত্র দ্বিধা না দেখে। এটা যে কত বড় দুর্ঘটনা, বউদি যদি বুঝত। দাদা দেরি দেখলে রাস্তায় খুঁজতে বের হতে পারে। থানা পুলিশ করতে পারে। সে মরমে মরে আছে।

অমর দরজা খুলে দিলে, তথাগত ঘড়ি দেখল। রাত এগারোটা। তারা কখন বের হয়েছে ঘড়িতে লক্ষ্য করেনি। সাড়ে নটা হবে। তার আগেও হতে পারে। পরেও হতে পারে। ট্রেনে আধঘণ্টা, বাজার, স্টেশনে এসে টিকিট কাটা—সাড়ে দশটার রানাঘাট লোকাল পেয়ে গেছে। আসতে রাস্তায় মোটেই অসুবিধা হয়নি। কোনো কথা বলতে গেলেই বলেছে, চুপ করুন তো। লোকে শুনছে।

অমর লতিকা বউদিকে ভালই চেনে।

আপনি!

চলে এলাম। তোমার বাবু রাস্তা ভুল না করেন, তাই চলে এলাম।

লতিকা ব্যাগটা অমরের হাতে দিয়ে বলল, কিচেনে রেখে দাও। আমি একটা ফোন করে আসছি।

বসার ঘরে লতিকা ঢুকে ফোন তুলে নিল।

হ্যাঁ, আমি বলছি। তথাগত রাস্তায় যা পাগলামি শুরু করল একা ছাড়তে সাহস পেলাম না।

আবার বলল, না অসুবিধা হবে না। অমর তো আছে।

সে কি পাগলামি করেছে কিছুই বুঝতে পারছে না। কত সহজে বলে দিতে পারল সে রাস্তায় পাগলামি করছিল—কত সহজে বলতে পারল অমর তো আছে। অমর থাকলেই কি, কোনো মহিলা তার বাড়িতে রাত কাটাতে পারে! সে ভেবে পাচ্ছে না কি করবে।

আরে না না, সে সাহস আছে। ক্ষমতা আছে। আর শোনো বেশি নেশা কর না। আজকাল যে তোমার কি হয়েছে বুঝি না—প্রায় রাতেই আউট হয়ে যাও। কোনো হুঁস থাকে না। দুশ্চিন্তা হয়।

তথাগত ভাবল, নারী পুরুষকে কত সহজে বশ করতে পারে।

আরে না না। সকালের ট্রেনেই চলে যাব। তুমি তালা দিয়ে মণির কাছে চাবি রেখে যেও। মণি এলে দুটো সেদ্ধভাত করে যেন দেয়। না না, বলছি তো কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার বন্ধুটি তো ভয়ে পোকা হয়ে আছে—তুমি যদি রাগ কর—দাদা জানে না, আপনি চলে এলেন—আমার মাঝে মাঝে এমন হয়—মাথাটা কেমন করে। একা ছেড়ে দিলেই দেখতেন ঠিক হয়ে যেত। ও আমার অনেকবার হয়েছে। কিন্তু ছাড়া যায় বল!

হ্যাঁ সকালে তথাগতই ট্রেনে তুলে দেবে। ভেব না। ছাড়ছি লক্ষ্মীটি।

লতিকা রাতে থেকে গেল।

লতিকা রাতে কি করছিল—কিংবা তথাগত, আমরা, পাঠকরা কিছুই জানি না। হতে পারে লতিকা তার সুন্দর জিনিসগুলি তথাগতকে দেখিয়ে বলেছিল, ও শুধু দেখার জন্য নয়। কঠিন ব্যবহারও চাই তার। ফুল ফোটে। ঝরে যায়—সে ফুলের দাম কি, ফুল যদি ফুটলই, তাকে ক্ষতবিক্ষত করার মধ্যেই আছে জীবনের মূল রহস্য।

তথাগত ফুল তুলতে জানত না। গাছের ফুল গাছেই থাকুক চাইত। ফুল পেড়ে গন্ধ নিতে হয় জানত না—অন্তত তার চরিত্র দেখে আমরা পাঠকরা এটুকু বুঝেছি। অন্তত একটা রাত তথাগত তাকে ভোগ করুক এমনও চাইতে পারে লতিকা। তবে বছরখানেকের মধ্যে দুই পরিবারেই বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। রূপা ফিরে এল তথাগতর কাছে। রূপার কাছে লতিকাই গিয়েছিল। তথাগতর দুর্বলতা কোথায়—কীভাবে তথাগতকে উজ্জীবিত করা যায় তাও হয়তো বুঝিয়ে বলেছে। এবং লতিকা মা হয়েছে। এটা কোনো দুশ্চরিত্রার গল্প নয়। সরল সহজভাবে ভাবলে এটা একজন পরোপকারী নারীর গল্প আমরা বলতে পারি। সমাজের রুক্ষ অনুশাসনকে এ-গল্পে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে ভাল হয়।

আমিনুল একটু ভেবে বলল, ও-পারের রায় মশাইরা যদি থাকে।

—থাকবে না কেন? আবেদালি প্রশ্ন করল।

—গ্রাম ছেড়ে সবাই পালাচ্ছে। ওরাও চলে যেতে পারে বর্ডারের দিকে।

সমসের, মিনু, মেহের, ফিরোজ, আবেদালি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এমন সব কথা ফিস্‌ফিস্ করে বলছে।

সমসের বলল, এখন আপাতত মজুমপুরেই আমরা যাব।

আমিনুল বলল, নানুমিঞার কুটিরে ফিরে গেলে হয় না?

সে কাল হবে। তুমি মিনুকে নিয়ে চলে যাবে। আমার সঙ্গে থাকবে আবুল। আবুলকে আমাদের অনেক কাজে লাগবে। তাছাড়া আমরা এক সঙ্গে আর ফিরে যেতে পারি না। সব রুট ওদের জানা হয়ে গেছে। আমাদের সব কুটিরগুলোর খবর পেয়ে গেছে ওরা। নতুন নতুন কুটির তৈরি করতে না পারলে আমাদের আর রক্ষা নেই। আমাদের এখন শুধু তৈরি হওয়া। ওরা একটা নষ্ট করবে আমরা দশটা নতুন তৈরি করব। যত ওরা ভাঙবে তত আমরা মরিয়া হয়ে উঠব। আমাদের এ লড়াই দীর্ঘদিনের। সমসের ভাঙা গলায় কথা বলতে গিয়ে উপরের দিকে তাকাল। কিছু বোমারু বিমান উড়ছে। সে বলল, দেখছ, কেমন মহড়া দিচ্ছে! সকাল হলে এ-অঞ্চলটা কি যে হবে! সকাল হবার আগে আমাদের সবাইকে মজুমপুরে যেতে হবে। বরং আমিনুল তুই এক কাজ কর — বলে সে কি ভাবল কিছুক্ষণ। বস্তুত এমন একটা সময় সে কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না। —হাসিম ভাইয়ের আরও শক্ত হওয়া উচিত ছিল। কে কুটিরের সব খবর যে পৌঁছে দিয়েছে! সবটাই রহস্য মনে হয়। সে আর ভাবতে পারছে না। তবু এ-সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। সে তারপর বলল, তুই আর মেহের নৌকা ঠেলে মজুমপুরে নিয়ে আয়। আমরা হেঁটে চলে যাচ্ছি।

আবুল বলল, আব্বা আমি ওদের সঙ্গে নৌকায় যাব?

তোর নৌকায় গিয়ে কি হবে?

মিনু বলল, তুমি বরং আমাদের সঙ্গে এস।

আবুল কেমন দুঃখী মানুষের মত মুখ করে রাখল। বলল, পায়ে আমার লাগছে। হাঁটতে পারছি না। পায়ে ফোসকা।

মিনু জানে ওরা অনেকখানি রাস্তা হেঁটেছে চষা জমির ওপর দিয়ে। সে সমসেরকে বলল, আবুল নৌকাতেই থাক।

—তবে যা।

আবেদালি বলল, আয় আমি তোকে কাঁধে নিচ্ছি।

সমসের বলল, কি দরকার কতটুকু আর পথ। ওরা নৌকায় গেলে হয়তো আমাদের আগে চলে যাবে।

এখন দুটো দল দুভাগে যাচ্ছে। ক্লান্ত অবসন্ন ভগ্নপ্রায় মিছিলের মত ওরা হেঁটে যাচ্ছে।

চারপাশটা ফাঁকা, মাঠে চষা সব জমি। এবং পাশে নদীর জল, রুপোলি রেখার মতো। মাঠে ওরা দীর্ঘ যাত্রায় এসময় বের হয়ে পড়েছে। কবে ওরা বড় মাঠ পার হয়ে নির্দিষ্ট কুটিরে পৌঁছে যাবে জানে না।

এভাবে তারপর চারিদিকে গাছপালা পাখির ভিতর, শুধু দুঃখিনী বর্ণমালা মা আমার। গাছপালার ভিতর দিয়ে মায়ের জন্য ওরা ফের নতুন কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করছে। ওদের রাইফেলের বেয়নেটগুলো সূর্যের আলোতে চক চক করছিল। কি মহিমময় আকাশ, আর নক্ষত্র! দূরে হয়তো কোনও গাছের নিচে ময়না এখন পোশাক পাল্টে নিচ্ছে। গাছের উপর উঠে গেছে হামিদ। সে ডালে, শাখা-প্রশাখায় বৃহন্নলার মত সব তূণ তুলে রাখছে। সময় এলেই নামিয়ে দেবে।

ওরা তখনও হাঁটছিল। আশায় আশায় হাঁটছিল। ওরা এ-ভাবে আশায় আশায় হাঁটবে। ওরা এ-ভাবে হাঁটতে হাঁটতে একদিন ঠিক নদী পার হয়ে যাবে।

সব ফুল কিনে নাও

এক

এই, আমার ভয় লাগছে!

—ভয়!

—ভয় করবে না! আমি তোমার বৌ না, অথচ...।

—বৌ না, বৌ হবে।

—এখনও তো হইনি। লোকে কি ভাববে!

—কি ভাববে আবার! বিয়ের আগে হনিমুন। ওঃ কি গ্র্যাণ্ড!

—দাদাকে চিঠি লিখে দেব। দেখে যান, কি হচ্ছে এখানে! বলে ইরা হাসল।

—এই, এ-সব লিখতে যেও না। দাদা ভীষণ সিরিয়াস মাইরি। কিছু লিখলেই ছুটে আসবে।

—কে লিখতে যাচ্ছে! বলে ইরা স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল।

—আমরা ঠিক চিনে আসতে পেরেছি তো?

—কি জানি! টিপু যেন কিছু জানে না সেই মতো কথা বলল।

একেবারে নির্জন পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে একটা দুটো গাড়ি, পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে আশ্চর্যভাবে মোড় নিতে হয়। এবং ভয় করে ইরার, এবং এমন বাঁক নিতে হবে জানলেই, সে গাড়ি টিপুকে ছেড়ে দেয়। সোজা গাড়ি চালিয়ে এসেছে। একদিনের হল্ট আসানসোল। সেখানে টিপু ওর মামার গ্যারেজে গাড়ি রেখেছে। ইরার মেসো থাকে কুলটিতে। কুলটির গেটে ইরাকে নামিয়ে দিয়ে সে আবার আসানসোলে ফিরে এসেছে। এবং বাজারের দিকটায় মামার বিরাট বাড়ি। রেল-কলোনী পার হয়ে গেলেই বাড়িটা। সে একেবারে একা মামার গ্যারেজে গাড়ি রেখে সোজা উঠে গেল। মামী অবাক, কিরে! কেউ আসেনি! জামাইবাবু, দিদি কেউ আসেনি?

টিপু বলেছিল, না। কেউ আসেনি। আমরা তিন-চারজন বন্ধুতে বের হয়েছি, একটু ঘুরব। ওরা হোটেলে উঠেছে।

—এসব কেন যে তোরা করিস। এখানে উঠলে কি ক্ষতি ছিল!

—বলেছিলাম, কিন্তু ওরা রাজি হয়নি। আসলে মামী, তোমার বাড়িতে এলে কেউ হুল্লোড় করতে পারবে না। এসব বলে টিপু আসলে কথাটা ভাল ছেলের মতো লুকিয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ দেখে কে বলবে সে বের হয়েছে ইরাকে নিয়ে। এখানে একদিনের হল্ট নিতে বাধ্য হয়েছে। অতদূর এক নাগাড়ে সে গাড়ি চালিয়ে যেতে সাহস পায়নি। তাকে যেতে হবে রামগড়ের দিকে, হাজারিবাগ থেকে সে সোজা বের হয়ে যাবে। ঠিক রামগড়েও সে যাচ্ছে না, যাচ্ছে শিরকা। শিরকাতে ওর বন্ধু অমিতাভ থাকে। অমিতাভ কিছুদিনের ছুটিতে বৌকে নিয়ে দক্ষিণভারত ঘুরে বেড়াবে। অমিতাভর কোয়ার্টার এক-মাসের জন্য ইরা আর টিপুর। এমনকি অমিতাভ ওর বাবুর্চিকে রেখে গেছে। যেন ওর শৈশবের বন্ধু টিপুর কিছু অসুবিধা না হয়। টিপু সোজাসুজি লিখে জানিয়েছিল, ভাই, তোর ওখানে ইরাকে নিয়ে উঠব। ইরা আমার হবু বৌ। কোনো ভাবনা নেই।

ইরা বলল, কি সুন্দর পাহাড় চারপাশে, নয়!

—খুব সুন্দর পাহাড়।

—আমাদের দেশেও অনেক পাহাড় আছে তুমি তো গেলে না।

—যাব। ঠিক সময় করে যাব। তাছাড়া যেতে তো হবেই। শাশুড়ি ঠাকুরাণীকে প্রণাম করতে যেতে হবে না।

—খুব ফাজলামো হচ্ছে।

—বারে, ফাজলামোর কি!

—এই, এই—বলেই ইরা গাড়ি থামিয়ে দিল। কি হচ্ছে? এমন করলে কিন্তু আমি নেমে যাব। এ্যাকসিডেন্ট ফ্যাকসিডেন্ট হলে আমি কিন্তু কিছু জানি না বাপু।

টিপু বলল, একটা বড় রকমের এ্যাকসিডেন্ট ঘটবে জেনেই তো আমরা পালিয়ে এসেছি ইরা।

—তুমি কি যে অসভ্য না!

—তোমার ভাল লাগে না ইরা!

—খুব ভাল লাগে। 'খুব' কথাটা ইরা ধীরে ধীরে টেনে টেনে বলল।

—তবে তুমি অমন কর কেন?

—কি করি!

—এই চুমো খেতে গেলে মুখ ফিরিয়ে নাও। কিছু করতে গেলে দুহাতে সরিয়ে দাও।

—ইরা বলল, লোকে দেখে ফেলবে না!

—এখানে এমন সব রাস্তায় গণ্ডায় গণ্ডায় লোক থাকে না। কিছু আদিবাসী অথবা গাঁয়ের মানুষ, তাছাড়া ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে একেবারে নিরিবিলি। তোমার যে কি ভয় বুঝি না!

ইরা বলল, আমার খোলামেলা আকাশের নিচে কিছু করতে কেমন লাগে!

—তুমি খুব সেকেলে ইরা।

তখন গাড়ি চলছিল। ইরা টিপুর কাছেই গাড়ি চালাতে শিখেছে। টিপুর গাড়ি সে চালিয়ে বেশ হাত পাকা করে ফেলেছে। এমন কঠিন বাঁকের মুখে এতটুকু হাত কাঁপে না। আর নিচে এমন সবুজ সমলতভূমি। বৃষ্টি হয়ে গেছে এদিকটাতে। বৈশাখের শেষ। বেশ গরম এবং এসব অঞ্চলে নানারকমের পাখিও দেখা যায়। ওরা গাড়ি ঠিক নিয়ে যাচ্ছে কি না মাঝে মাঝে গাইডবুক থেকে দেখে নিচ্ছিল। আর আকাশে অথবা গাছপালার ভেতর দিয়ে পাখি উড়ে যেতে দেখছিল। শিরকা কোথায়, ঠিক কোন্ জায়গাটায় ওরা জানে না। তবে মোটামুটি অনুমান আছে। রামগড় পর্যন্ত যেতে হবে না। তার আগেই, ডানদিকে শিরকার পথ পড়বে। রেললাইন ক্রস্ করে তিন-চার মাইল পশ্চিমে, এবং পশ্চিমে গিয়ে সোজা বাঁয়ে বেঁকে কিছুটা দক্ষিণে, ফের পুবে সোজা গাড়ি চালালে, প্রায় সেই রেললাইনের ওপর বাড়ি। ঠিক পাহাড় বলা চলে না, কিছুটা উঁচু টিলার মতো। সাদা রঙের বাড়ি, বার্ড কোম্পানীর জোনাল অফিস। সামনে নতুন ক্লাবঘর হবে বলে ইট রয়েছে। নিচে তাকালে মনে হবে ক্রমে টানাসিঁড়ির মতো জমি নামতে নামতে দিগন্তে মিশে গেছে। আর ঠিক যেখানে মিশে গেছে, তার বরাবর উঁচু দেয়ালের মতো পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়! ঘন সবুজ রঙের পাহাড় বনজঙ্গল নিয়ে আকাশের নিচে অতিকায় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আর তার নিচে উপত্যকার মতো জায়গা, সেখানে সব কয়লাখনি, পর পর, কোনোটা পুকুর কেটে নেবার মতো, অর্থাৎ ওপেন পিট। আর আছে পাশাপাশি অনেক নিচে খাদ, খাদের চিমনি গুনলে বোঝা যায় প্রকৃতি অপরিমিত কয়লা এইসব পাহাড়শ্রেণীর নিচে রেখে দিয়েছে। এবং দূরে দূরে ছোট ছোট শহর। দিনেরবেলা কিছু বোঝা যায় না, রাত হলে আলো জ্বললে বোঝা যায়, যেন পাহাড়শ্রেণীর কোলে অজস্র মণি-মানিক্য জ্বলছে। এবং সারি সারি আলোর মালা। আরও গভীর রাতে এইসব বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেনে গেলে গুম গুম শব্দ এক আশ্চর্য খবর বয়ে আনে। এখানে যে সব মানুষ আছে, এবং যারা শিক্ষিত, অধিক টাকার মাইনের মানুষ, তাদের কাছে সেই শব্দ অর্থহীন। প্রকৃতির ভিতর তারা বোধহয় কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পায় না। সন্ধ্যা হলেই সেই ছিমছাম ক্লাবঘরে আড্ডা, এবং কিছু পানীয় সামনে, কখনও নাচের আসর বসে। এইসব খবর অমিতাভ টিপুকে চিঠিতে লিখে জানিয়েছিল।

ইরা শিরকার পথে গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাবার মুখে বলল, যাই বল, আমার কিন্তু ভীষণ ভয় লাগছে!

—ভয় কেন!

—কি পরিচয় দেবে?

—বহু বোলেগা।

—ওখানে যদি বাঙালী পরিবার থাকে তবে ঠিক বুঝতে পারবে।

—কিছু পারবে না। আর বাঙালী বলতে অমিতাভ আর তার বৌ। ওদের অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট ভদ্রলোক উৎকল প্রদেশের লোক। অন্য সাহেব সুবোরা এসেছে গুজরাট মহীশূর থে। ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। অমিতাভ বলেছে ওরা খুব ব্রড-মাইণ্ডের, এ-সব ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামায়

না। বলেই টিপু কি দেখল ইরার মুখে, ইরার কপাল ঘামছে, মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিচ্ছে। এত কথার পরও যেন ইরা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ভীষণ একটা অপরাধবোধ ভিতরে ভিতরে কাজ করছে। সে এখন ভাবছে, এত ডেয়ারিং না হলেও চলত। সে যে ঝোঁকের মাথায় কি করে বসল।

টিপু ফোনে বলেছিল, ইরা আর ভাল লাগছে না!

—কি করব।

—কোথাও গিয়ে কিছুদিন থেকে এলে হয় না!

—তোমার তো ভীষণ সাহস টিপু!

—সাহসের কি! নিজের মানুষ কাছে থাকবে তাতে আবার সাহস অ-সাহসের কি আছে!

—আছে না! লোকে জানতে পারলে কি বলবে!

—বয়েই গেল! আমার বৌ, তাকে নিয়ে আমি যা খুশি করব।

—এখনও তো রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত হল না!

—ওটাই কি শেষ কথা। টিপু বলেছিল, যদি কিছুই না হয়, তবু কি মনে হয় তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি!

আসলে ইরা জানে টিপু আর কিছু পারবে না। সে টিপুকে সহজেই সব দিয়ে দিতে পারে। সেই কবে থেকে যে টিপুর সঙ্গে আলাপ। টিপু ওদের হোস্টেলে মীরাদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মীরাদি ওর কেমন দিদি হয়। মীরাদির এখন টার্মস শেষ হয়ে আসছে। ইরা তখন জুনিয়র হাউস সার্জেন, মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ওর অধিকাংশ সময় ডিউটি। মীরাদির কাছে টিপু এসেছিল, ওর বৌদিকে নিয়ে। মীরাদি ছুটিতে যাচ্ছেন বলে টিপুর সামনে ইরাকে ডেকে বলেছিলেন তিনি, এই হচ্ছে ইরা, খুব ভাল মেয়ে। কলেজে ওর ভীষণ সুনাম ভাল ছাত্রী হিসাবে। আমার বোনের মতো।

টিপু বলেছিল, মীরাদি, ইরা নামটিতে বোনের গন্ধ আছে। বলেই সে ইরাকে দেখেছিল চোখ তুলে। কোনো কোনো সময়ে মানুষের কি যে হয়ে যায়! ইরা ভেবেছিল, একেবারে ডাক্তারী চোখে দেখবে টিপুকে, খুব গম্ভীর থাকবে, মনোযোগ দিয়ে রুগী সম্পর্কে শুনবে, সুবিধা-অসুবিধা বুঝবে, তা না, সে কেমন চোখ তুলেই অবাক, টিপু ভীষণ সরল বালকের মতো যেন খুব দূর থেকে অবাক চোখে দেখছে।

ইরা কেমন প্রথম হকচকিয়ে গেছিল। সে খুব দ্রুত নিজেকে সামলে বলেছিল, নার্সিংহোমে রাখলে পারতেন। বৌদিকে যা ভালবাসেন দেখছি।

মীরাদি একটু অবাক হয়ে গেছলেন। সাধারণত ইরা এভাবে কথা বলে না। কিন্তু মীরাদি তো জানে না, ইরা এই প্রথম একজন মানুষের পায়ের কাছে সামান্য সময়ের জন্য বসে পড়তে চেয়েছিল, এবং মনের এমন একটা সাংঘাতিক অসুখের জন্য সে কেমন বিব্রত বোধ করছিল। আর টিপু ওর বৌদি সম্পর্কে যা উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছিল না, তাতেও ভাল লাগছিল না। কিন্তু টিপু এতটুকু রাগ করেনি। সে বলেছিল, তাই তো ঠিক ছিল, কিন্তু মীরাদি আমাদের নিজের লোক। এমনভাবে তো অন্য কেউ দেখবে না।

ইরা কি যে ছেলেমানুষের মতো বলে ফেলেছিল, আমিও কম নিজের নই। রেখে দেখুন না।

টিপু যথাসময়ে কেবিন বুক করেছিল। আসলে টিপুকে কিছুই করতে হয়নি। ইরাই টিপুর হয়ে সব করেছে। সে মাঝে মাঝে ইরার ঘরে গেছে। দোতলার শেষ দিকে ঘর। লম্বা করিডোর। করিডোরে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে কথা বলে চলে যাবে ভেবেছিল, পারেনি। একা, এভাবে মেয়েদের হোস্টেলে সে কখনও যায়নি। তাছাড়া সব লেডিরা থাকেন। লেডি বলতে, সিনিয়র, জুনিয়র হাউস সার্জেন, এবং যারা হাসপাতালে কাজ করেন, তেমন সব লেডি ডাক্তার। সে দ্বিতীয় দিন এসে প্রথমে নিচে প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়েছিল, তারপর কে একজন নেমে যেতেই বলেছিল, ডাক্তার ইরা গাঙ্গুলীকে আমার খুব দরকার। একটু ডেকে দেবেন।

—যান না। ওপরে সোজা চলে যান। ডানদিকের করিডোরে হেঁটে যান। শেষ ঘরটাতে ডাক্তার ইরা থাকে।

টিপু মীরাদির কাছে যখন এসেছিল, এত ঘেমে যায়নি। মীরাদির ঘরে ইরা এসেছিল। ওর সংকোচ ছিল না। কিন্তু সেদিন মীরাদি নেই—ইরাই সব। অথচ একদিনের পরিচয়ে সে সোজা উঠে যায় কি করে। সে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সময়-অসময় নেই, কোথাকার একটা উজবুক ঘরের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়েরা থাকে বলেই টিপু বুঝতে পেরেছিল, যখন তখন ঢোকা ঠিক না। অসম্মান করতে পারে। সে হয়তো চলেই যেত, কিন্তু সেদিনেই কিছু না করে গেলে অসুবিধা। মীরাদি ডেট ঠিক করে গিয়েছিল। সুতরাং সে খুব সাহস করে পা টিপে টিপে প্রায় চোরের মতো সিঁড়ি ভেঙে দোতলার শেষ ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছিল দরজা বন্ধ। সন্ধ্যা হয়ে যাবে কিছুক্ষণের ভেতর, অথচ ইরা দরজা বন্ধ করে রেখেছে। ইরা ভেতরেই আছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অসময়ে ইরাকে ঘুমোতে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। আসলে ইরা ঘুমোচ্ছে, না অন্য কিছু করছে বুঝতে পারছে না। সে যে কি করবে বুঝতে পারছে না অথচ বেশী সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিক না। কে কি ভাববে! সে যে কি বলে ডাকবে! ইরা দেবী, মিস ইরা, ডাঃ ইরা দেখুন, এই মানে, মীরাদির কথাটা তো,...তার তো এভাবে কথা জড়িয়ে যায় না, আসলে সে এসব ডাক্তারদের ভয় পায়। কারণ ডাক্তার বলতেই তাঁরা রাশভারি হন, হাসেন, তবে খুব ভারি হাসি। কথা বলেন সামান্য। আর টিপু একটা কারখানা চালায়, কলেজে পড়াশোনা শেষ করেই বাপ পিতামহের কারখানায় ঢুকে গেছে। সে কি কখনও এভাবে আসতে পারে একজন লেডি ডাক্তারের কাছে? তখনই ইরা দরজা খোলে, এবং ইরার পোশাক দেখে মনে হয়, সে দরজা ভেজিয়ে পোশাক পরছিল, বাইরে কোথাও যাবে বোধহয়। কিন্তু এভাবে টিপুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, ইরা বলল, এত দেরি? আপনার তো চারটের সময় আসার কথা। ভাবলাম আসবেন না। একটা শো দেখতে যাব বলে বের হচ্ছিলাম।

—আমার তো দু-চারটে কথা। ওটা সেরেই চলে যাব। বেশী দেরি হবে না।—টিপু বাইরে দাঁড়িয়ে কথা সারবে ভাবছিল। তারপর কি ভেবে বলল, কি বই দেখতে যাচ্ছেন?

—মাই ফেয়ার লেডি। আপনি দেখেছেন?

—না। বলেই টিপু বলেছিল, আপনার তো দেরি হয়ে যাবে। ট্যাক্সি না পেলে বোধহয় ঠিকমতো হাজির হতে পারবেন না। গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি।

ইরা হেসে বলেছিল, দরকার হবে না। আপনি ভেতরে এসে বসুন। ইরা ভেতরে ঢুকে ওর অগোছালো ঘর, যেমন শাড়ি সায়া ব্লাউজ অথবা এক কোনায় সব ডাঁই করা কাপড় টিনের চেয়ারে প্রথমে তুলে রাখল। একটা ছোট মতো ওয়ার্ড্রোব, ওপরে প্লাস্টিকের ফুল, ঘরে হলুদ রঙের ক্যালেণ্ডার এবং সুন্দর একটা বাচ্চা, নীল রঙের বেলুন ধরতে যাচ্ছে। ইরা বোধহয় কখনও কখনও এই বাচ্চাটার মুখ, দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। টিপু চেয়ারে বসতে বসতে এমন ভেবেছিল।

আর ইরা খুব ব্যস্ত। দু-মিনিটে সে ঘর গুছিয়ে ফেলেছে। ওর এটাচ বাথরুম, বাথরুমে সব ঢুকিয়ে সে যেন টিপুকে ছোট ভাই-এর মতো দেখছে। অথবা টিপু মীরাদির ভাই, তারও ভাই হতে পারে, তবে টিপুর বয়স ওর চেয়ে খুব বেশী না বরং ওরা সমান সমানই হবে, এবং টিপুর চোখে খুব যে একটা সাহসিকতা নেই সে এটা দেখেই টের পেয়েছিল, কারণ টিপু তো ঘরে ঢুকেই জানলা দিয়ে হাসপাতালের বড় লাল ইটের দালান, অথবা দূরে যেসব নার্সদের কোয়ার্টার আছে সেদিকে কিছু দেখছে। আসলে সে এঘরে সহজভাবে বসে থাকতে পারছে না ইরা তা বুঝতে পারছিল। কেমন যেন ভীতু মুখ নিয়ে বসে আছে সে। বেশ লাগে ইরার। ইরার কাছে তো অনেক যুবকই আসে, কারোর ভীতু মুখ, কেউ খুব স্মার্ট—এই স্মার্ট যুবকেরা যেন ইরারই উপকার করতে এসেছে। এসব যখন হয় তখন ইরার মুখে ভীষণ গাম্ভীর্য। সে তখন সেই সমবয়সী যুবকদের দিকে একেবারেই তাকায় না, অথবা তাকায় সোজাসুজি, একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার মতো মুখ, টিপুকে সে দেখছিল, সব কিছুতেই একরকম, তবু কোথায় যেন টিপুর মুখে ছেলেমানুষী ভয় আছে।

ইরা বলেছিল, রিপোর্ট সব এনেছেন?

সে রিপোর্টগুলো দেখালে, ইরা একনজর দেখেই বলেছিল, আজকে সোমবার?

টিপু বলেছিল, সোমবার।

ইরা বলেছিল, মঙ্গলবার হবে না, বুধবার ওটিতে ডিউটি! হবে না। বৃহস্পতিবার আসুন।

—দেরি হয়ে যাচ্ছে না!

—না। কোনো ভয় নেই। আপনি বৌদিকে খুব ভালবাসেন!

—তা বাসি!

—আপনার বাড়িতে কে কে আছে?

—আমার মা বাবা। আমি। আমিই এখন ছোটছেলে। আমাকে বাড়ির কেউ বড় হতে দিচ্ছে না। এখন যদি বৌদির ছেলেপুলে হয় তবে রক্ষা পাই।

—তার মানে?

—তবে আমাকে আর ছোট ভেবে বেশী অত্যাচার করবে না। কোথায় যাচ্ছ, এখন বের হবে না, অফিস থেকে সোজা বাড়ি। ছুটির দিনে কোথায় বের হব, সব জানিয়ে বের হতে হবে। একটু দেরি করে ফিরলেই সবার মুখ কাঠ। একটি ছেলে-টেলে হলে বেঁচে যাই। মা বাবা দাদা বৌদি সবার হাত থেকে অন্তত বেঁচে যাই।

ইরা হেসে বলেছিল, খুব কষ্ট। আর এজন্য এত আপনার ছুটোছুটি

—তা বলতে পারেন। সে এলে সব দায়-দায়িত্ব তার। আমার ছুটি।

ইরা পরেছে বোম্বে ডাইং-এর গোলাপী ফুল ফল আঁকা শাড়ি। ইরা খুব লম্বা, কিন্তু ইরার সবচেয়ে সুন্দর হল চিবুক, আর ওর গলায় রয়েছে যেন সুন্দর সুদৃশ্য জলের রেখা, চুল খুব বড় নয়, অথচ ঘন, ইরা বোধহয় হলুদ রংটা বেশী পছন্দ করে। সে দেখেছিল, ইরার ঘরের দেয়াল হলুদ রঙের, বিছানার বেডকভার হলুদ রঙের এবং খাটের পাশে যে ওয়ার্ড্রোব তার ঢাকানা হলুদ রঙের। আর সে যে ফুলটা রেখেছিল প্লাস্টিকের, সেটি হয়তো সত্যি প্লাস্টিকের না। তাজা ফুল। তাজা একজোড়া গোলাপ। এমন সুন্দর গোলাপ সে কি রোজ রোজ এখানে রেখে দেয়? টিপু বলেছিল, আপনি এমন সুন্দর গোলাপ কোত্থেকে নিয়ে আসেন?

—সকালে একটি ছেলে দিয়ে যায়।

টিপুর বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। বলেছিল, আপনি খুব ভাগ্যবান।

ইরা বলেছিল, কেন এ-কথা বলছেন।

—সকাল হলেই কেউ পৃথিবীতে কাউকে ফুল দিয়ে যায় জানতাম না।

—না দিলে ছেলেটা যে খেতে পাবে না।

টিপু বুঝতে পেরেছিল ওর অনুমান ভুল। সে বলেছিল, আপনি ফুল খুব ভালবাসেন!

—ঐ একটা জিনিসই আছে। ঘরে ফুল না থাকলে আমার ঘুম আসে না।

টিপুর তারপর অনেক কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। ঘরে কোনো দামী সুগন্ধী এসেন্সের গন্ধ, অথবা আশ্চর্য সৌরভ ঘরে, বোধহয় ইরা খুব দামী সুগন্ধী ব্যবহার করতে ভালবাসে। ঘরে নীল রঙের লোহার খাট, বড় লম্বা বিছানা, বোধহয় ইরার শোওয়া ভাল না, এত বড় বিছনা না হলে সে ধপাস করে পড়ে যেতে পারে নিচে, আর মেয়েদের শোওয়া ভাল না হলে কি যে হয়, সায়া শাড়ি ঠিক থাকে না, ইরা কি তেমনভাবে শুয়ে থাকে, আর এভাবে মেয়েদের কাছে এলেই টিপু কি যে মনে মনে অসভ্য হয়ে যায়, সে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল, এ-ভাবে বেশী সময় ঠিক বসে থাকা উচিত নয়, সে একজন যুবতীর ঘরে বসে রয়েছে, হোক সে ডাক্তার, সে তাড়াতাড়ি বলেছিল, আচ্ছা উঠি, বৃহস্পতিবার সকাল সকাল আসছি।

—খবু সকালে না এলেও চলবে। টিকিট করিয়ে রাখব। কোনো অসুবিধা হবে না।

টিপু এবার যথার্থই উঠে পড়লে, ইরা বলল, চা আসছে।

টিপুর বলতে ইচ্ছে হল, আপনার এমন সুন্দর বিকেলটা নষ্ট হল। কিন্তু সে নাটকীয় ভাবে কিছু বলতে পারে না। সে বলেছিল, এসব হাঙ্গামা না করলেও পারতেন।

ইরা কোনো কথা বলেনি। সে স্টোভ জ্বেলে ডিম ভাজছিল। ঘরে ইরা নিজের মতো সব ঠিক করে রাখে। সময়ে অসময়ে ক্যান্টিনে খুশিমতো অর্ডার দিলে পাওয়া যায় না। আর যখন কারোকে কখনও মনে হয় নিজের মতো মানুষ, তখন তাকে ভালভাবে একটু ডিমের ওমলেট খাওয়াতে এবং মুখোমুখি বসে সামান্য সময় গল্প করতে কার না ইচ্ছা করে। ইরারও বোধহয় সেদিন মনের ভিতর এমন সামান্য

ইচ্ছে হয়েছিল। যে মানুষটা সাধারণ ভাবে বসে রয়েছে, পা হাত মুখ এবং পোশাক মিলে সে জানে না কিছুক্ষণের জন্য সে কি মহার্ঘ ইরার কাছে।

তারপর ইরা ওকে সিঁড়ির কাছে এসে বলেছিল, ভাগ্যিস চলে যাইনি, চলে গেলে মীরাদি আমাকে যা বকাবকি করতেন না!

টিপু নামতে নামতে বলেছিল, আপনার কি দোষ, দোষ তো আমার। আসার কথা চারটায়, এলাম সাড়ে পাঁচটায়।

ইরা বলেছিল, বোধহয় তাই হবে। ইরা যেন কেমন অন্যমনস্ক। পাশাপাশি নামার সময় কি যেন মাধুর্য, এমন মাধুর্য সে জীবনেও অনুভব করেনি। সে মানুষ কাটা-ছেঁড়া করে, এবং সে জন্মরহস্য মানুষের এত বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে ভিতরে ভিতরে পুরুষের প্রতি এক ধরনের ক্রোধ, অথবা বলা যায় উন্নাসিকতা কাজ করলে যা হয়, ওর খুব ভাল লাগত না কাউকে। ইরা বলেছিল, আসবেন আবার। যেন কথার কথা। আসতে তো হবেই, তবু টিপুকে বলতে হয় বলে যেন বলা।

একসময় টিপু বলল, আমরা এসে গেছি ইরা।

ইরা চারপাশটা দেখতে দেখতে ফের বলল, ভারি সুন্দর জায়গা তো।

—সত্যি ভারি সুন্দর।

বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি, ঠিক পাহাড়ের মাথায়। এবং পাহাড় কেটে সমতল করা হলে যেমন দেখা যায়। নতুন সব বাড়িঘর উঠছে। সাত-আটটি পরিবারের থাকার মতো জায়গা। সবচেয়ে বড় বাংলো সুপারিনটেনডেনটের। তারপরই এই বাংলো। সুন্দর সবুজ মসৃণ ঘাস লনে, দু-পাশে ক্যাক্টাস আর ঠিক মাথার ওপরে বড় এক অশোকগাছ। কালো গাভীর মতো কুচকুচে রঙ পাতার। আর বাড়ির রঙ সাদা। বোধহয় এমন একটা গাছ না থাকলে, এত সুন্দর দেখাত না বাড়িটা। এবং নিচে তাকালে সেই ধানসিঁড়ির মতো জমি, ছোট্ট খোয়াই, জল আসছে পাহাড়ের বুক ফেটে, এ-সব যদিও দেখা যায় না, কিন্তু চিঠিতে টিপুকে ওর বন্ধু সব জানিয়েছিল। ইরা গাড়িতে বসেই প্রথমে সেই খোয়াই, পরে কোলিয়ারির চিমনি অথবা দূরে দূরে আবছা মেঘের মতো যেসব পাহাড়শীর্ষ রোদে ঝলমল করছে, দেখতে দেখতে বলল, কাউকে তো দেখছি না। দরজা বন্ধ যে।

টিপু গেটের মুখে দুবার হর্ন বাজাতেই কোত্থেকে একজন উর্দি পরা বয় ছুটে এসে বলল, আপ তো টিপু সাব।

টিপু বলল, হ্যাঁ।

—মেমসাব!

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—সাব সব বোল দিয়া। ইস লিয়ে চাবি। সে গেট খুলেই চাবিটা হাতে তুলে দিল।

ইরা কথা শুনে টিপুর দিকে তাকাল এবং দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরে গেল। আর টিপুও ইরার দিকে তাকিয়ে কেমন মজার হাসি হাসল, যেন ভুবনপারে শুধু এবার খেলা আর খেলা! মনে মনে সে বললে, ইরা আমার কি হচ্ছে! কতদিনের ইচ্ছে, সেই শৈশব থেকে, যখন আমি নিতান্ত বালক, তখন থেকে, কতভাবে তোমাদের সম্পর্কে ভেবে আসছি। যত বড় হয়েছি, এক অসীম রহস্য তোমাদের চারপাশে যখন খেলা করে বেড়ায় আমার তখন কাছাকাছি যেতে ভীষণ ভয় হয়েছে। সত্যি ইরা তুমিই আমাকে সাহস জুগিয়েছ। আমার কি যে ভাল লাগছে! ইরা যেন টিপুর মনের কথাটা বুঝতে পারল। এখন টিপু শিস দিতে দিতে গাড়ির বনেট তুলে দিচ্ছে, তোয়ালেটা কাঁধে জড়িয়ে একজন মিস্ত্রির মতো কি সব দেখছে, ভিতরে যে তোলপাড় হচ্ছে সেটা একেবারেই বুঝতে দিচ্ছে না ইরাকে। গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিতে হবে, এবং স্যুটকেস ফ্লাস্ক বেতের ঝুড়ি সব যে নিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তাও যেন টিপুর খেয়াল নেই। বনেটের নিচে কান পেতে কি শুনছে!

ইরা বলল, এই!

—কি! মুখ না তুলেই টিপু বলল।

—কি দেখছ!

—তুমি ভেতরে যাও না!

—আমার ভীষণ লজ্জা ক

—লজ্জার কি! মেমসাবের লজ্জা থাকে না।

—কি যে বলছ না! তুমি চল।

—দরজা দিয়ে কে প্রথম ঢোকে দেখার ইচ্ছে।

—তাই।

—চল।

টিপু মাথায় একটা ফেল্টক্যাপ পরেছিল। সেটা খুলে চারপাশটা দেখতে লাগল, যেন ইরা যে পাশে আছে, এমনিতেই আছে, তাতে কিছু আসে যায় না। সে যে ওর বৌ অথচ বিয়ে হয়নি! সে যে পালিয়ে এখানে ইরাকে নিয়ে ক'দিন হনিমুন করতে এসেছে একমাত্র পৃথিবীর দু'জন জানে। অমিতাভ আর তার বৌ। তার কাছে এখন গোটা ব্যাপারটা রহস্য রোমাঞ্চের মতো। যেন এই যে আসা, এখন কে কিভাবে এগোয় এটা দেখার ব্যাপার। আসলে ওরা দুজনই নানাভাবে সিনেমায় রেস্তোরাঁতে অথবা গাড়ি করে এই দশ বিশ মাইল শহর ছেড়ে গেলেও খুব কিছু একটা করতে সাহস পায়নি। ইরা সাহস না জোগালে টিপু যে পারে না, সেটা ইরা বুঝতে পারে। এখানেও যে এসেছে, সে যেন ইরার বিশেষ অনুরোধে। ওর খুব একটা যেন ইচ্ছা নেই। ইচ্ছে চোদ্দ আনা, তবু মুখ ফুটে বলার স্বভাব তার নয়। কিন্তু রাস্তায় একেবারে উল্টো। দেখে মনে হবে, টিপুই যেন ফুসলিয়ে ওকে ঘর থেকে বের করে এনেছে। এখন এই যে সব দরজা খুলে যাচ্ছে, কি ঝকঝকে ঘর দোর, মার্বেল পাথরের সাদা মেঝে, এসব দেখে টিপুর মনে হল অমিতাভ খুব বড় কাজ করে, এবং একপাশে একটা ঘরে বড় টেবিল, নানারকম কাচের আলমারি, আর কত রকমের যে কাচের গ্লাস। আর দেয়ালে ডিনার টেবিলের ছবি, মাতাল মানুষের ছবি। এবং সুন্দর গানের সব রেকর্ড সাজানো। পর পর দুটো রেকর্ড-প্লেয়ারের সব চাবি একটা রিঙের ভেতর। ডানদিকে পর পর দুটো বড় ঘর। এবং বড় বড় খাট, এত বড় খাট এখানে রেখে কি যে হয়! টিপুর মনে হল, ইরার ভালই হল, ওর শোওয়া ভাল না, পড়ে যেতে পারে, বড় খাট যখন পড়ে যেতে পারবে না। তারপর এটাচড্ বাথরুম, নীল মোজাইক, আর সব লাল বর্ণের আলোর মালা। বড় আয়না খাটের পাশে। সব কিছু দেখার জন্য অমিতাভ রেখে দিয়েছে। অমিতাভর চোখ মুখ মনে পড়ল এ-সময়। বিয়ের বরযাত্রী সে গিয়েছিল, বিরাট বাড়ির মেয়ে। খাসা একেবারে তরমুজ যেন চৈত্র মাসের। খুলে ফেললেই ভেতরটা একেবারে লাল। মিছরির দানার মতো। অমিতাভর বৌ এসব পছন্দ করে থাকে। এমন বনবাসে এ-সব না হলে চলে না, টিপু চারপাশটা দেখতে দেখতে এসব ভাবছিল, তখন ইরা জামরুলগাছের নিচে। ভিতর বাড়ির দিকে এত বড় একটা জামরুলগাছ, আর কি জামরুল! সে কোঁচড়ে ফুল তোলার মতো কুড়িয়ে এনে বলল, খাও।

টিপু বলল, খাব!

—খাও।

—কেউ দেখে ফেলবে না তো!

—না।

টিপু চারপাশটা দেখল। লোকটা বোধহয় এখানে নেই। এমন ঢাকা জায়গা আর গোপন জায়গা কোথাও নেই। টিপু ইরাকে জড়িয়ে চুমু খেল—কি গ্র্যাণ্ড জায়গা—না?

—ভীষণ।

—আমরা এখন চান করে নেব।

ইরা ডাকল, রামলাল!

—জী মেমসাব।

—ইধার আও।

লোকটার নাম রামলাল। মধ্যবয়সী মানুষ অমিতাভ তাকে কি কি বলে গেছে এক প্রস্থ ওদের শুনিয়ে দিয়েছে। অমিতাভ একটা চিঠিতেও সব লিখে রেখে গেছে। অর্থাৎ এখানে কি কি প্লেজার আছে তার একটি মোটামুটি লিস্ট। যেন অমিতাভ চায়, টিপু দেখে যাক, সে কত বড় এখানে। ওর বাংলোতে

থাকলেই সেসব টিপু টের পেয়ে যাবে। পাশেই ছোট্ট বাগানবাড়ি, জনহীন এসব জায়গায় যে-যার মতো সব করে নিয়েছে. টিপু সেখানে একটা সুন্দর পোলট্রি পর্যন্ত দেখতে পেল। সাদা ডিম, কাঠের গুঁড়োর ওপর ডিম পেড়ে রেখেছে সব লাল মুরগিরা। ইরা চুল আঁচড়াচ্ছে, পেছন থেকে মনেই হয় না চুরি করে চলে এসেছে। এ যেন নিজের বাড়ির মতো, নিজের মানুষের মতো। নির্ভাবনায় সে আছে এখানে। ওর সুন্দর শরীর টিপুকে সারারাত, অথবা সময় পার হলে এই যেমন জানলায় ইরা দাঁড়িয়ে থাকলে, সে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরবে। জড়িয়ে ধরতে কি যে ভাল লাগবে। ও কেন জানি একেবারেই ধৈর্য ধরতে পারছে না। রামলাল ভেতরে মুরগির মাংস রান্না করছে, এবং এখন রাত বলে, দুটো একটি নক্ষত্র, জানলায় অথবা বারান্দায় বসলে দেখা যায়, এ-সব কিছুই দেখতে ভাল লাগছে না। ওর শরীরে ক্রমে জ্বর চলে আসছে। সে আর পারছে না। ভীষণ ভাবে টিপু কাতর হয়ে পড়েছে।

দুই

টিপু ওর বৌদির সামনে বলেছিল, এই ইরা। মীরাদি ওকে দেখা শোনার ভার তোমার ওপর দিয়ে গেছে।

আর ইরা যে কি, যেন কতকালের আত্মীয়তা, অথবা নিজের দিদির মতো টুক করে প্রণাম করে ফেলেছিল। গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, গাড়ি আসছে যাচ্ছে। কেউ ধরে ধরে রুগী নামিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমেই বৌদি ইরাকে দেখে যখন বেশ খুশি তখন ইরা টুক করে প্রণাম করে আত্মীয়তা আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর ইরা সাদা লম্বা ইউনিফর্ম পরেছে। গলায় স্টেথিস্কোপ, খোঁপায় সেই দুটো গোলাপের একটা গোলাপ। টিপু দেখেছিল, ইরা চুলে সাদা গোলাপ গুঁজে রেখেছে, ডাক্তার মানুষেরা এমন নুয়ে প্রণাম করলে কেন জানি টিপুর হাসি পায়। আর দশজনের মতো মনে হয়। ইরা যে আলাদা আর দশজনের চেয়ে, সেটা আর মনে থাকে না।

ইরাই বৌদিকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বৌদিকে বিশ্রী দেখাচ্ছিল। এবং ওর নিজেরই কেমন কি ভেবে ভীষণ লজ্জা লাগছিল। গর্ভবতী মেয়েরাই শেষপর্যন্ত দেখতে এমনি হয়ে যায়। বৌদি কি সুন্দর আর হাসিখুসি, কিন্তু সন্তান পেটে আসার পরেই কেমন গুম মেরে থাকত। বৌদিকে আর তেমন হাসিখুসি দেখাত না। আর সেই বৌদিকে যখন ইরা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন টিপু বলেছিল, আমি যাই।

ইরা তখন কেমন সহজভাবে বলেছিল, যাবেন না। এই যে নিন চাবি। আমার ঘরে গিয়ে বসুন। কথা আছে।

টিপু ইরার কথা শুনে সামান্য অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল।

কথা আবার কিসের। বৌদিই বা কি ভাববে! সে বৌদিকে খুব সম্মান করে থাকে। বৌদির সামনে এমন সব কথা। তারপরই মনে হল, বৌদি সম্পর্কে হয়তো কথা থাকতে পারে। আবার মনে হল, ইরা তো ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারত। কেন যে ইরা একা একা ওয়ার্ডের ভিতর ঢুকে গেল! এবং ভিতরে যে লিফ্‌ট আছে সেখানে, এক সময় সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল!

অগত্যা আর কি করা। সকাল দশটা বেজে গেছে। সে ড্রাইভারকে বলল, গাড়িটা নার্সদের হোস্টেলের পাশে পার্ক করে রাখতে। একটু সে ঘুরে আসছে। আসলে সে ইরার ঘরে গিয়ে বসবে তা পর্যন্ত বলতে সংকোচ হয়েছিল। ড্রাইভার ভাবতেই পারে না দাদাবাবু এমন লাজুক মানুষ, সে একটা জ্যান্ত মেয়ের ঘরে বসে থাকবে।

এমনই স্বভাব টিপুর যে সব সময় কে কি বলবে এই কেবল তার চিন্তা। ইরা এভাবে ওর ঘরে গিয়ে বসতে না বললেই পারত। বৌদি শুনে কি ভাবল কে জানে! বৌদিকে নিয়ে আসতেও ওর ভীষণ লজ্জা। কিন্তু দাদার ওপর খুব একটা কথা বলতে পারে না। দাদা ওর চেয়ে অনেক বড়। বৌদির ছেলেপুলে হবে না ঠিক ছিল। বেশী বয়সে কি অপারেশন করে তারপর এ-সব শেষপর্যন্ত হলে সে ভেবেছিল, যাক্ বাঁচা গেল, অর্থাৎ যেই আসুক, তার আদরের সীমা থাকবে না, তখন সে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। এবং বোধহয় সে দাদার যতটা না বাধ্যের, এ-বেলায় তার চেয়ে বেশি বাধ্যের। মা সঙ্গে

আসতে চেয়েছিল, সে আনেনি। ইরা যে এখন একটা কিছু করে ফেলতে পারে তার এ-ভয়টা বোধহয় ছিল। কারণ সে প্রথম দিনই ইরার চোখে মুখে সামান্য অন্যমনস্কতা দেখেছিল।

আর এভাবে যখন সে অন্যমনস্ক হয়ে চাবি নিয়ে হাঁটছে, তখন দেখল চারপাশে সব লম্বা উঁচু লাল ইটের বাড়ি। পাঁচলতা ছ'তলা এইসব বাড়ির ছায়ায় সে খুব সামান্য একজন মানুষ, এবং সে এখানে এলেই টের পায়, ওয়ার্ডের পাশে বাঁশের খাটিয়া, দুঃখী মুখ, আত্মীয় স্বজনের চোখে মুখে এক ভীষণ আতঙ্ক, কেমন একটা মৃত্যু মৃত্যু গন্ধ নিয়ে রুগীর রাত্রি যাপন—এসব টিপুর ভাল লাগে না। দেখতে দেখতে মনে হয় যেন তার চারপাশে মৃত্যুর ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ইরা নির্বিকার, ইরা তার কাছে হাসপাতালের কত গল্প করে, কিন্তু টিপুর মতো তার কোনো দুঃখের বা বিষণ্ণতার অনুভূতি জাগে না বলেই মনে হয়। সে যেন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে এ-সবে। টিপু কিন্তু হাসপাতাল আর তার পরিবেশকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। আর বার বার মনে হয় হাসপাতালে এলেই যেন করুণ কিছু দৃশ্য চোখে পড়বেই। এসব ভাবতে ভাবতে টিপু ইরার হোস্টেলের দিকে এগোতে লাগল।

ইরা যখন ফিরে এল, তখন প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল। সে দেখল, টিপু হোস্টেলের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ইরা বলেছিল, কি ব্যাপার তালা খুলতে পারলেন না।

টিপু মিথ্যা কথা বলেছিল, না। আসলে সে ভেবেছিল, একা একজন মেয়ের ঘরে তালা খুলে ঢুকে পড়া ঠিক সমীচীন হবে না। সে যতটা সহজে চাবি নিয়ে চলে এসেছিল, সিঁড়ির মুখে এসে তত সহজে সিঁড়ি আর ভাঙতে পারেনি। ওর মনে হয়েছিল, সে কোথায় যাচ্ছে! কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছেন, এটা মেয়ে ডাক্তারের হোস্টেল, এখানে হুটহাট ঢোকা যায় না, তখন সে কি উত্তর দেবে। কারণ সে তো সত্যি আর ইরার কেউ হয় না। যদি প্রশ্ন করে ইরা আপনার কে হয়? তখন সে কি জবাব দেবে? বলতে পারবে না, কেউ হয় না। আবার এও বলতে পারবে না, কেউ হয়। সুতরাং এমন একটা ফ্যাসাদে না গিয়ে বরং হোস্টেলের সদর দরজায় অপেক্ষা করা অনেক ভাল। কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। ভাবটা এই সে যেন কারো অপেক্ষায় আছে, কারণ এখানে সে দেখেছে কেউ কেউ কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এলেই বের হয়ে যায়। ভিতরে যায় না। অথবা নিয়ে যেতে সাহস পায় না। কিন্তু ইরা অন্যরকমের। ইরা বোধহয় ওর পরিচয় আত্মীয় বলে দিয়েছে। প্রেমিক ট্রেমিক কেউ ঠাট্টা করে বললে সে হয়তো বলেছে, ধুস্ একটা নাবালকের সঙ্গে প্রেম করে মরি আর কি! তোমরা যে কি না!

সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় ইরা বলেছিল, আপনি এখানেও বসতে পারেন।

টিপু দেখেছিল, ঠিক সিঁড়ির মুখে বাঁদিকে বসার ঘর। সে ভেবেছিল, সেই ভাল, ঘরের শিলিঙে ফ্যান ঘুরছে। সবসময় বোধহয় ঘোরে। কার কখন মানুষ আসছে, কে কখন চলে যাচ্ছে ঠিক থাকে না। সুতরাং বোধহয় সকালেই কেউ ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে যায়, আর কেউ বন্ধ করে না। না কি দেখা শোনার লোক নেই বলে চব্বিশ ঘণ্টা ফ্যান চলছে—কে জানে, ওর মনে হয় এখানে সবাই কেমন অন্যরকম ভাবে বেঁচে আছে। যদিও ভিতরে মেয়েদের চেঁচামেচি এবং গলা পাওয়া যাচ্ছে, সিঁড়িতে উঠে যেতে সে সব টের পাচ্ছিল, ইরা হাতের আঙুলে চাবির রিঙ ঘোরাচ্ছে, এবং টিপুবাবুর কি ইচ্ছা, অর্থাৎ এই ভিজিটিং-রুমে বসবে, না ওপরে বসতে ভাল লাগবে, তা দেখার ভারি ইচ্ছা, কিন্তু আশ্চর্য টিপু হুঁ হাঁ কিছুই বলছে না। সে চুপচাপ সিঁড়ি ভাঙছে। এবং ইরা যে সুন্দর গাউন পরেছে, সাদা গাউনই বলতে পারে টিপু, এই লম্বা সাদা ডাক্তারী পোশাক, গলায় সাপের মতো স্টেথিস্কোপ ইত্যাদি সব মিলে ইরা কেমন দুর্লভ। সে বলল, সেই ভাল।

ইরা বলল, তাহলে বসুন।

টিপু বলল, সেই ভাল।

ইরা হেসে ফেলেছিল, আচ্ছা, আপনি কি! চাবি দিলাম ঘরে গিয়ে বসার জন্য, আপনি রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—কে কি বলবে!

—কেউ কিছু বললে, চাবি আপনার হাতে দিতাম না।

—কেউ তো চেনে না!

—কে বলেছে! সবাই আপনাকে চেনে। সবাই আপনার মুখ চিনে রেখেছে।

—কি যে বলেন!

টিপু আর কথা না বলে ভিজিটিং-রুমে ঢুকতে চাইলে ইরা বলল, আপনি মীরাদির ভাই। এখানে বসেছেন শুনলে মীরাদি ভীষণ রাগ করবে। আসুন।

টিপু বুঝতে পারছিল না, কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ঠিক নয়। সেও বলেছিল, সেই ভাল। সবাই যখন চিনে রেখেছে, আমার আর ভয় নেই। আসলে সে এটুকু বলে একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করছিল। আর ওতেই ইরা বলেছিল, আপনি কখনও হোস্টেলে থাকেননি!

টিপু বলেছিল, না।

এই জন্যে এত সব কথা বলতে হচ্ছে।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। ঘরে তেমনি দুটো লাল রঙের গোলাপ, কিছু রজনীগন্ধা, মেয়েটা বোধহয় মানুষের রোগ শোক জরা দেখতে দেখতে কখনও কখনও ভীষণ অস্থির হয়ে যায়। টিপু বুঝতে পারে, এইসব ফুলের ভিতর ইরা জীবনকে খুঁজে পায়। জীবনে যে এক অতীব ভালবাসা আছে, অর্থাৎ যাকে জীবনের সৌরভ বলা যায়, এইসব ফুলেরা ফুটে থাকলে ইরা তা টের পায়। সে বলল, এত কথা মানে!

—আরে মশাই হোস্টেলে কি হয়?

—কি হয়, জানি না।

—হোস্টেলের ছেলেরা কোনো বন্ধুর বান্ধবী এলে ভীষণ প্রেমিক হয়ে যায় না!

—তাই বুঝি!

—আপনি কে, কেন আসেন, একদিনেই সবাই জেনে ফেলেছে। আপনি আমার ঘরে সারাদিন বসে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না।

—আপনারা এত ভাল। বলেই টিপু কেমন বোকার মতো মুখ করে ফেলেছিল। প্রচ্ছন্ন যে একটা রসিকতা আছে সে কিছুতেই বুঝতে দিল না, অথবা সে এমন মুখ করে রেখেছিল, যেন না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছে।

ইরা বলেছিল, বসুন। পাশের চেয়ারে টিপু বসলে বলেছিল, যাবার সময় বৌদির সঙ্গে দেখা করবেন?

—একবার দেখা করলে ভাল হত।

—না করলেও ক্ষতি নেই। যা যা লাগে হাসপাতাল থেকেই দেবে।

—বৌদি হাসপাতালের খাবার খেতে পারবে না।

—কি বা খাবে। এসময় খেতে ভাল লাগে না। অতদূর থেকে নাই আনলেন। আমরা তো দুটো খাই!

—না না তা বলছি না।

—তবে কি বলছেন। বলেই ইরা কেমন ঝগড়া করার মতো সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।—আপনি গেছেন!

—মানে!

—মানে আদরে আদরে গেছেন।

টিপু বলেছিল, তা হবে।

তারপরেই ইরা বলেছিল, কফি খান। নেসকাফে। রোদে দাঁড়িয়ে মুখের কি রং হয়েছে দেখুন। বলে সে তার ছোট আয়নাটা ওর সামনে ঠেলে দিয়েছিল।

—আমি রোদে দাঁড়িয়েছিলাম! কি জানি!

—তাও খেয়াল নেই। কি ভাবছিলেন!

এভাবে প্রথমে ইরা এইসব কথা বলে, যেন কতকালের চেনা, যেন কতকাল থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছে, এবং ইরার সহজ স্বভাবের জন্য, আসলে সহজ স্বভাব তো সহজে হয় না, কে কখন কার কাছে সহজ স্বভাবের মানুষ হয়ে যায় সে নিজেও জানে না। না হলে ইরার হোস্টেলে কি ভীষণ বদনাম!

দাম্ভিক, রাশভারি, কথা কম বলে, এবং সহজে কারু সঙ্গে মিশতে চায় না, ভাল ছাত্রী বলে প্রফেসারদের ভীষণ ভালবাসার পাত্রী, সেই গুমরেই গেল, আর সেই মেয়ে টিপুর সঙ্গে এমন সব কথাবার্তা বলেছিল যে, পৃথিবীতে কে আর আছে এমন বিশ্বাস করতে পারে যে, কখনও ইরা এভাবে কথা বলতে পারে! বান্ধবীরা তো মরে গেলেও বিশ্বাস করবে না।

টিপু কিছু ফুল নাকের কাছে ধরে অন্যমনস্কভাবে বসেছিল, সেই ফাঁকে ইরা ওকে দেখে নিচ্ছিল চুরি করে।

—কি করেন?

—কারখানায় কাজ করি। এই একটা বাপ পিতামহের ব্যাপার। দাদা চাকরি-বাকরি করতে দিল না।

—ভাল করেছেন!

—কিছু হলে খবর দিতে হবে তো। ফোন নাম্বার দেবেন?

টিপু ওর ফোন নাম্বার দিয়েছিল, মিঃ জুনিয়র চৌধুরী।

—তার মানে!

—মানে জুনিয়র হলেই আমি, সিনিয়র হলে দাদা। বলে সে তার একটা কার্ড দিল। ছোট কার্ড, সুন্দর ছাপা, ওর নাম এবং কারখানার নাম। আর কিছু নেই।

টিপু পরদিন ঠিক একই সময় ফোন পেয়েছিল, এই!

—কে!

বোধহয় ইরা ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা জুনিয়র চৌধুরী আছেন!

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি!

—গলা মোটা করে কথা বলছিলেন কেন?

—গলা মোটা করে ফেলেছিলাম, বুঝতে পারিনি!

—মাইগড, আমার গলার স্বর বুঝতে পারেননি!

—সত্যি না। সত্যি বলছি।

—আচ্ছা শুনুন, গুড নিউজ। ছেলে হয়েছে। ওজন ন'পাউণ্ড। এগারোটা তেত্রিশ মিনিটে। আপনার বৌদি ভাল আছেন। বলেই যেন ফোন ছেড়ে দিয়েছিল ইরা। ইরার কথা বলতে কেমন সংকোচ হচ্ছিল যেন। ইরা এ-নিয়ে বেশী কথা বলতে পারেনি।

ছেলেপিলে হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ওর কখনও সংকোচ হবার কথা নয়। সে তো কত যুবক অথবা যাঁরা প্রথম বাবা হতে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে রুগীর সব কিছু, এমনকি মাসিক লাস্ট কবে হয়েছে, অর্থাৎ বাছা তুমি কবে ওকে ঠিক জব্দ করেছিলে, সেই সব দিনক্ষণ অনায়াসে বলে যায়, এবং আরও কত কিছু, সবই অনায়সে বলে গেছে। কখনও এ-বিষয়ে তার সংকোচ হয়নি। অথচ সেদিন প্রথম টিপুকে, 'আপনার বৌদির ছেলে হয়েছে' বলতে গিয়ে ঢোক গিলে ফেলেছিল। আর কি কথা থাকতে পারে মনে ছিল না। যেন একজন একান্তই অপরিচিত লোককে প্রয়োজনীয় খবরটা দিয়ে ফোন ছেড়ে দিয়েছিল সে। তারপর হোস্টেলে ফিরে কি যে হয়েছিল ইরার, একেবারে চুপচাপ, স্নান করতে, খেতে ভাল লাগছিল না। উপুড় হয়ে পা শূন্যে দুলিয়ে কত রকমের যে ভাবনা ভাবতে ভাল লাগছিল তার।

চারটের আগেই টিপু তার মা বাবাকে নিয়ে এসেছিল। এবং ইরা সম্পর্কে এমন সব খবর আগেই বাড়িতে রটিয়ে দিয়েছিল যে, সবাই ইরাকে দেখতেও উৎসাহী ছিল। মীরাদি নেই, কিন্তু ইরা নিজের লোকের চেয়েও বেশী করেছে। যেন নিজের বৌদি অথবা বোন। এত যত্ন নিয়ে কে করে! এমনকি টিপু বলেছে, এতদূর থেকে খাবার এনে কি হবে। দু'তিন দিনের তো ব্যাপার। ভাবটা যেন এই, ইরা তো আছে, যার সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টির আওতায় কোনো বিচ্যুতি ঘটার উপায় নেই। কিন্তু টিপুর মা বাবা শেষপর্যন্ত রাজি হননি। বহুদিনের পর এক নবজাতকের আগমন হল বাড়িতে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগে টিপুকে পেয়েছিলেন তাঁরা। পঁচিশটা বছর কেটে গেছে শিশুহীন বাড়িতে। একজন শিশু বাড়িতে না থাকলে কেমন সবকিছু ফাঁকা লাগে। আর একজন শিশু থাকলে কি যে ভীষণ পবিত্র ব্যাপার! সবাই তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কেউ আদর করে, কেউ পোশাক পাল্টে দেয়, কেউ গাল টিপে দেয়। এতটুকু এই স্বর্গীয় সুষমাকে নিয়ে উদ্বেল হয়ে ওঠে সবাই। ইরা ভাবে, সবচেয়ে বেশী যে উদ্বেল হবে, সে তো

টিপু। অদূর ভবিষ্যতে এক শিশুর সঙ্গে খেলা করতে করতে শিশু-হয়ে-যাওয়া টিপুর সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি স্মরণ করে একটা খুশির শিহরণ বয়ে যায় ইরার হৃদয়ে। টিপুকে এবং টিপুর আত্মীয়-জনকে মুহূর্তেই নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে তার। বার বার সে কথা বলার ফাঁকে টিপুকে দেখেছে। যত দেখেছে, ততই সুন্দর ভেবেছে। এই যেমন টিপু যখন গাড়ি চালিয়ে দ্রুত যায়, সে মাঝে বসে থাকে, অথবা কোনো গাছের নিচে—যখন যেভাবে সে গেছে, টিপু থেকেছে যেন ওর পাশে রাজার মতো। টিপুর লম্বা শরীর, গভীর চোখ, আর কি যে তার শরীরে আছে, সবসময় ইরার কেন যে মনে হয়েছে একটুখানি ছুঁয়ে দিতে পারলেই হয়ে যাবে, আর কিছু লাগবে না, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য এর চেয়ে বেশী সামগ্রী ইরার আর কিছু লাগে না।

সেই ইরা এই নির্জন বাংলোয় চুপচাপ জানলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল, সে কি করবে! টিপুর অসহায় চোখ দেখলে মায়া হয়। কিন্তু তার এমন দামী মহার্ঘ গোপন পৃথিবী বিয়ের আগে টিপুকে তুলে দিতে সংস্কারে ভীষণ বাধছিল। হাত পা কাঁপছে, কপাল ঘামছে। সে খুব অসহায় বোধ করছিল।

টিপু এমন একটা সুন্দর সময়ে নিজেও ঘামছিল। সে ঘন ঘন সিগারেট খাচ্ছিল। যত সহজ মনে হয়েছিল, এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। সে কি বলে যে ইরাকে কাছে ডাকবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাইরে সেই জামরুলগাছ, এবং পাশে সেই সুন্দর গাছপালা, ভিতরে নানারকম খাঁচার ভিতর সব মুরগিদের ঘর। এবং সেখানে হয়তো এখন কোনো লাল মুরগি ডিমের ওপর বসে রয়েছে, তা দিচ্ছে! নতুন ছানার জন্যে কি আকুল আগ্রহ এইসব পাখিদের। ওর ভিতরেও এমন একটা ইচ্ছা। কিন্তু সে ইরাকে এখনও কিছু বলতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে বলে ; ইরা এবার আমরা বাড়ি ফিরেই সব চুকিয়ে ফেলব। এভাবে আর থাকতে পারছি না। তোমার কবে যে টার্মস শেষ হবে।

টিপু বলল, ইরা এদিকে এস।

ইরা জানলা থেকে সরে দাঁড়াল। এবং চুপচাপ এসে পাশে বসল।

টিপু ইরার হাত নিয়ে খেলা করতে থাকল। কিছু বলতে পারল না। ইরা খুব সুন্দর সেজেছে। সে বলল, ইরা তুমি ঘোমটা দাও। তোমার ঘোমটা-ঢাকা সুন্দর মুখটা দেখি।

ইরা কিছু করল না।

টিপু নিজের হাতে ইরার মাথায় আঁচল তুলে দিল। তারপর পায়ের কাছে নেমে ওর দু-হাঁটুতে মাথা গুঁজে বলল, এই বেশ। কি বল। এবার গিয়ে আমরা অন্তত লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেলব। তারপর তোমার যখন সময় হবে বলবে। বাবা মাকে বলব, দাদাকে বলব। ওরা অমত করবে না!

ইরা কিছু বলল না। কেবল সে একটা আশ্চর্য উষ্ণতা খুঁজে পাচ্ছে টিপুর ঘন চুলে। সে ছোট্ট ছেলের মতো টিপুর ঘন চুলে নরম আঙুলে চাপ দিতে লাগল। ভিতরে কি হচ্ছে। টিপু আমি পারব না। এভাবে এমন রাতে তোমাকে সব না দিয়ে থাকতে পারব না। তুমি জোরজার করে না নিলে আমি নিজে কিছু করতে পারব না। এখন বুঝেছি, আমি কত ভীরু। কত সব সংস্কার আমার শরীরে দীর্ঘদিন থেকে বাসা বেঁধে আছে। সব নিজের জেনেও তোমায় দিতে কেমন সংকোচ হচ্ছে।

টিপু বলল, চল বারান্দায় একটু বসি।

টিপু এখন যা যা বলবে ইরা যেন সব করে যাবে। নিজে থেকে কিছু করতে পারবে না।

ওরা এসে বারান্দায় বসতে দেখল, শান্ত নিরীহ বাতাস গাছের ডালপালায় খেলা করে বেড়াচ্ছে। এবং জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল, ফুল ফুটেছে। টিপু ইরাকে জড়িয়ে ভীষণ ভাবে চুমু খেল। বলল, ফুল ফুটতে ভালবাসে ইরা। এস আমরা ফুল ফোটা দেখি।

তিন

সকালে ওদের ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। এত বেলায় কেউ ওরা ওঠে না। ইরা উঠেই টিপুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, এই ওঠো। কি বেলা হয়ে গেছে।

টিপু উঠে দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, সত্যি খুব বেলা হয়েছে। রামলাল কত কি না ভাবছে!

ইরা হাসল। কারণ ইরা টিপুর দুঃখটা ধরতে পারে। টিপুর ভাল ঘুম হয়নি। চোখমুখ দেখে ইরা

এটা বুঝতে পারল। অথবা টিপু সারারাত হালকা একটা স্বপ্নের ভিতর ছিল। ওর ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে টিপু কাল তুমি কি কি স্বপ্ন দেখেছিলে। স্বপ্নে আমি কোথাও কি ছিলাম না!

টিপু বলল, আমার সিগারেট প্যাকেটটা দেখেছ!

—আমার ঘরে।

ইরা ওর ঘর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দিলে টিপু বলেছিল, কি পবিত্র লাগছে না!

ইরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে টিপু দুষ্টুমি করতে পারে, সে একটু সরে দাঁড়াল। খুব বেশীদূর টিপু এগোতে পারছে না, এবং বোধহয় সেজন্য টিপু সারারাত কাল ঘুমোতে পারেনি, এবং নিজেও ইরা আয়নায় চোখ দেখেছে, ওরও কাল ঘুম হয়নি। এভাবে ঘুম হবার কথা নয়। যতটা সহজ ভেবেছিল, এখন দেখছে, ততটা সহজ নয়। মনের দিক থেকে সায় থাকছে না। সে ইচ্ছে করলেই সব দিয়ে থুয়ে সন্ন্যাসিনী হতে পারে, কিন্তু যে মানুষটাকে ভেবে রেখেছে তার ভীষণ নিজের, যাকে সে ইচ্ছে করলেই যেকোন সময় নিজের করে নিতে পারে, তার সঙ্গে এমন পালিয়ে পালিয়ে গাছপালা খুঁজে বেড়ানো কেমন অবিশ্বাসের। সে বলল, রামলাল দরজা জানলা খুলে দিচ্ছে।

দরজা জানলা খুলে দিলে ওরা দেখল, সেইসব কোলিয়ারির চিমনি, অথবা ধাওড়া এবং কুলিকামিনদের নেমে যাওয়া, সকাল থেকেই ওরা কাজের জন্য নিচে নেমে যাচ্ছে। ঠিক পিপীলিকার মতো মনে হচ্ছে, আবার কখনও সকালের ঠাণ্ডা বাতাস, কোথাও ধানের চাষ, নিচে সবুজ ধানের চারা রোপণ করে চলেছে কেউ। এখনই রামলাল চা দেবে। কাল কেউ আসেনি আলাপ করতে। সকালের দিকে কেউ কেউ আসতে পারে। আজ রবিবার বলে ছুটির দিন। টিপু তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর রঙবেরঙের জামা, ঢিলে-ঢালা ট্রাউজার পরে বারান্দায় এসে বসল। সে জানে ইরা এখন বাথরুমে যাবে। ওর দেরি হবে। রামলাল ইতিমধ্যেই এক কাপ চা রেখে গেছে। বেশ পরিপাটি মনে হচ্ছে নিজেকে, শান্ত-ধীর বাতাস, লম্বা লাল নীল পাথরের প্রশস্ত বারান্দা, নানারকম সোফা সেট এবং যাবতীয় আরাম এই অমিতাভর বাংলোতে, আর সেই রমণীয় ফুল সব বাগানে ক্রমান্বয়ে ফুটে চলছে ঝরে পড়ছে। সে চা খেতে খেতে কেমন সুন্দর একটা ফুলের গন্ধ পেয়েছিল।

কি ফুল ফুটছে এখন! সে তো এমন সুন্দর গন্ধ কখনও পায়নি। যেন সে চারপাশে সেই ফুলের সৌরভ খোঁজার জন্য তাকাতে লাগল। এটা কি মাস, এ-মাসে কি কি ফুল ফোটে, ভুঁইচাঁপার এমন সুন্দর গন্ধ হতে পারে, সে এমনভাবে ভেবে যখন পাশে তাকাল তখন আশ্চর্য। ইরা পাশে খুব সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সাজতে সে ইরাকে কখনও দেখেনি। এই অসময়ে সে কেন যে এমন সেজে এল।

কেন যে ইরার শরীর থেকে এমন অপূর্ব সৌরভ উত্থিত হচ্ছে। টিপু শুনেছে, ঋতুমতী হলে মেয়েরা গায়ে নানারকম সৌরভ মাখতে ভালবাসে। ইরার এই সাজ আর সৌরভ টিপুকে বিহ্বল করে দিচ্ছে। টিপু দেখছে ইরাকে দু'চোখ ভরে। সে ভেবে পায় না, এই অসময়ে ইরার এমন সাজগোজ কেন!

সে বলল, ইরা এভাবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে মরে যাব।

—যাঃ কি যে বলছ!

—তুমি এত সুন্দর ইরা!

মেয়েরা প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। টিপুর তেমন মেয়ে-ভুলানো কথা আসে না। আসলে ওর যা মনে হয় তাই বলে ফেলে। ইরাকে সে কতবার যে বলেছে, তুমি এত সুন্দর ইরা। ইরা ঠিক সাজগোজ করলেই এটা মনে হয় টিপুর। বড় খোঁপা বাঁধলে, রঙিন ছাপা শাড়ি পরলে এবং পায়ে আলতা দিলে, সত্যি আর ইরার দিকে তাকানো যায় না। যেন সব দিয়ে-থুয়ে বনবাসে চলে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সেই বনবাসে থাকবে এক তপোবনের মতো আশ্রম, ইরা সীতা সেজে থাকবে, সে রামচন্দ্র। এবং এসব মনে হলেই সে বলবে, আমি কিন্তু রামচন্দ্রের পর্ব এখনও ভাল চালিয়ে যাচ্ছি ইরা।

ইরা বলল, সীতার পার্ট আমারও খারাপ যাচ্ছে না।

—দেখি কে কতদিন এভাবে থাকতে পারে। টিপু বলেই চোখ তুলে ইরাকে দেখল, কে কত বড় সতী সাধ্বী দেখব।

—আমিও দেখব কে কত বড় যুধিষ্ঠির!

—দেখবে!

ইরা বলল, সকালেই দুঃখের কথা আরম্ভ করলে।

—জান ইরা, আমার রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

—ঘুম হয়নি, ডাকলে না কেন?

—ডাকলে কি হত!

—ডাকলে কি হত আবার! বলে মুখ নিচু করে হাসল।

তখন আর টিপুর অভিমান থাকে না। কিছুক্ষণ আগের কথা ওরা একেবারে ভুলে যায়। ওরা যে জেদ ধরে আছে এ-কথা ভুলে যায়। টিপু তবু চায় ইরা নিজে না এলে সে কিছু করবে না। জানলায় গতরাতে সে ইরাকে কাঁদতে দেখেছে, ইরা বোধহয় সত্যি ভয় পেয়েছিল।

অথচ ইরার তো ভয় পাওয়ার কথা না। ইরা এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ। ওর শিক্ষা-দীক্ষা সব একেই কেন্দ্র করে, কিসে কি হয় সে জানে, কিসে কত কষ্ট তাও সে নিশ্চয়ই জানে। এবং কতটা সুখ তার অভিজ্ঞতায় না থাকলেও সে টের পায় মনে মনে। আর ইরা নাবালিকা নয়, যে কিছু বোঝে না জানে না তা নয় অথচ নাবালিকার প্রেম হরণে যে ভয় ভীতি ঠিক তা রাতে ইরার চোখেমুখে ধরা পড়েছিল। এবং এমন দেখে মনে মনে টিপু বরং হেসেইছিল। ইরা এ-বয়সেও ভীষণ ছেলেমানুষ, মেয়েদের বয়স বোধহয় কখনও বাড়ে না। এবং এভাবেই সে ভেবে নিয়েছিল, ইরাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ইরার যখন ইচ্ছা হবে, তখনই সে তাকে কাছে টেনে নেবে। জোর-জার করে কিছু করবে না। অথবা নিজে থেকে সে আর ইরাকে বলবে না, আর পারছি না ইরা, আমার কষ্টের শেষ নেই। তুমি পাশে রাত কাটালে সব কষ্ট আমার নিঃশেষে মুছে যা ়। যদিও সে জানে, ইরা না এলেও সে তার কষ্ট নিয়ে রাত যাপন করবে না, সে হয়তো ইরা অথবা তার সংগোপনে এক প্রেম প্রেম খেলা আরম্ভ করে দিলে, এক সময় দেখতে পায়, তার কষ্ট লাঘব হচ্ছে, বিন্দু বিন্দু মুক্তারাজি সারা আকাশময় অথবা ভুবনময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং এভাবে কি যে মনোহারি শরীরের সব ক্রিয়াকলাপ সে ভেবে পায় না। এর পরে সে যখন শান্ত হয়ে যায় তখন চোখে ঘুম চলে আসে। ইরাকে সে বুঝতেই দেয় না, সংগোপনে এক প্রেম প্রেম খেলায় সারারাত ধরে সে ইরার শরীর মনে মনে উপভোগ করেছে।

ইরা এখন তার সামনে বসে রয়েছে। কফি দিয়ে গেছে রামলাল। কিছু ক্রিমক্রেকার মচ মচ করে ইরা ভাঙছে। এবং মুখে একটু একটু করে আলতোভাবে ফেলে দিচ্ছে আর চোখে মুখে ভীষণ দুষ্টুমিভরা চাপা হাসি। যেন টিপু বেশ জব্দ হয়েছে কাল। ওর শাড়ির ভিতর থেকে আশ্চর্য সুন্দর কোমল দেহলতার খানিকটা নিচু জায়গায় কি যে থরে থরে সাজানো। এবং মনে হয়, ওর সেই কোমল শরীরে হাত রাখলে ভীষণ ঠাণ্ডা এক ভাব, সে ইরাকে শেষপর্যন্ত না বলে পারল না, আচ্ছা ইরা, একটা কথা বলব?

—কি!

—কাল তুমি জানলায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে কেন?

—কখন কাঁদলাম।

—ভুলে গেছ!

—কি জানি, মনে পড়ে না তো!

—তুমি ইরা আমার সঙ্গে তো ছল কর না কখনও।

—তা তো করি না।

—তবে যে বলছ, কখন কেঁদেছি!

—কেন যে এভাবে কান্না গলায় উঠে এল বুঝতে পারিনি।

—সত্যি বুঝতে পারনি? একটু থেমে বলল, বিয়ের আগে এভাবে সত্যি আমাদের আসা উচিত হয়নি।

—আমি ভাবলাম আবার, তোমায় জোরজার করে কিছু করে ফেলব এই ভয়ে কাঁদছ।

—না, কাঁদব কেন! আমার তো খুব ইচ্ছে করে। অমিতাভবাবুর এমন সুন্দর বাংলো।

—তবে কাল এলে না কেন!

—কি জানি। কি একটা ভিতরে যে হয়ে গেল। মনে হল, এতদিনের এমন সংগোপনে রাখা সামগ্রী

তোমাকে পালিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলে যেন তুমি আমি দুজনেই ছোট হয়ে যাব। তুমি যদি আমার কাছে ছোট হয়ে যাও, তবে আমার কি থাকল! আমি যদি তোমার কাছে ছোট হয়ে যাই, তবে তোমার কি থাকল! কিছু হলে, তুমি আমি ছোট হয়ে যাব মনে হয়েছিল আমার। আর তার জন্য ভয়ে ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

—এখন ভয় পাচ্ছো না তো!

—না।

—তবে চল না আমরা বরং কলকাতায় চলে যাই। যেজন্যে আসা, সেটা যখন হচ্ছে না।

—হবে।

—কবে!

—হবে তো বলছি। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না তো!

—আমি এভাবে কিন্তু রাতের পর রাত একা শুয়ে থাকতে পারব না। নিজের ওপর বিশ্বাস কম। কিছু হয়ে গেলে তুমি আমাকে ভীষণ খারাপ ভাববে।

—খারাপ ভাবব না।

—তবে কাল যে ভেবেছিলে। আজ অথবা যেদিন কিছু হয়ে যাবে, এমন ফের মনে হবে না কে বলতে পারে।

—যখন হবে তখন দেখা যাবে। বলেই ইরা উঠে দাঁড়াল। ইরা খুব সুন্দর করে শাড়ি পরতে জানে। ভারি অহমিকায় সে নাভির নিচে শাড়ি পরে কাছে এলে টিপুর যে কি হয়ে যায়। মাথার ভিতর তখন মনে হয় কিছু থাকে না। নিবিড় এক সুষমা ইরার শরীরে। ইরাকে তখন আলতোভাবে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়। চুমু খেতে ইচ্ছে হয়, এবং এই সকালের নীল রোদে ওকে নিয়ে গাছপালার ভিতর হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

ইরা বলল, যাবে?

—কোথায়?

—খোয়াইর ধারে। আমরা জল নিয়ে খেলা করব।

—বেলা হবে না! চল। এই রামলাল, আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি। আমাদের ফ্লাস্কে সামান্য কফি করে দাও। বেশী কিছু রান্না করবে না। মুরগির মাংস, ভাত। আর কিছু না।

ওরা নুড়ি-বিছানো জলে নেমে গেল। রেখে গেল দুপাশে সব ছোট ছোট ফুলের গাছ, নানারকমের সবুজ অথবা হলুদ রঙের ক্যাক্টাস, পাঁচিলের পাশে সেই বড় অশোকগাছ, যার ছায়ায় গভীর শান্তির প্রবাহ। যেন সব মিলে নিচে, আরও নিচে ওদের নিয়ে যাচ্ছে। এবং ওপরে যেসব বাংলো বাড়ির জানলা, ফুল ফলের গাছ, ছায়ায় যেসব ঝুল-বারান্দা অথবা ছোট্ট এক উপত্যকা, সেখানে যেন গভীর মমতার স্পর্শ ওরা দেখতে পাচ্ছে, একাউন্টস অফিসার অমিতাভবাবুর বন্ধু এবং বন্ধু-স্ত্রী নিচে কেমন ছেলেমানুষের মতো ছুটে ছুটে হেঁটে যাচ্ছে। বয়সে এমন হয়, যাদের বয়স আছে, ওরা ভাবল, সময় হলে তারাও যাবে কোথাও এবং এভাবে নেমে যাবে, আর যাদের বয়স গেছে, তারা আর এভাবে কোনোদিন নামতে পারবে না।

ইরা ডাকল, হেই। ওরা আমাদের দেখছে। ওরা কিন্তু সত্যি ভাবছে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

টিপু বলল, এই থামো। আমার হবু বৌ বড় ছুটছে!

—তুমি কি!

—আমি কি!

—আমার সঙ্গে পারছ না!

টিপু বলল, পেছনে সবাই দেখছে।

—দেখুক।

টিপু বলল, আমরা আর ফিরে যাব না।

ইরা বলল, আমিও না।

—কোথায় থাকব?

—কোনো বনের ভিতর।

—কি খাব?

—ফল-মূল।

—কোথায় শোব?

—গাছের ছায়ায়, পাথরের ওপর। অথবা কোনো গুহা পেয়ে যাব ঠিক।

—সত্যি কি সুন্দর সব পাহাড় সামনে। যাবে একদিন?

—কবে?

—যেদিন খুশি।

ওরা এভাবে সামনে নেমে যাচ্ছিল। ক্রমে ধাপে ধাপে জমি নেমে গেছে। কোথাও আল বেঁধে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির জল জমানো হয়েছে। চাষআবাদের কাজ আরম্ভ হবে, কোথাও আরম্ভ হয়ে গেছে। কোথাও নানারকম সব্জি, যেমন পটলের লতা, খরমুজের লতা আর নীল রঙের পটল দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইরা বলল, পটল ভাজা খাব।

টিপু ছুটে নেমে গেল আর বলল, যাবার সময় তুলে নিয়ে যাব।

ইরা ঠিক খোয়াইর পাশে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তারপর হেঁকে বলল, লোকে জানতে পারলে মারবে।

—মারবে কেন?

—চুরি করলে মারবে না!

—অঃ। ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হলে কোনো আর অশ্লীলতা থাকে না, আসলে এই হয় বুঝি। টিপুর মনে হয়, কেউ নেই, এমনকি খোদ সেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরও সাধ্য নেই সামান্য অশালীন না হয়ে, দ্রোপদীর গোটা ব্যাপারটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। সে বলল, আচ্ছা ইরা, তোমার যদি পঞ্চপাণ্ডব থাকে, পারবে তুমি?

—পারব না কেন!

—পারবে বলছ!

—খু-উ-ব। বলেই হা হা করে হেসে দাঁতে ঘাস কাটতে থাকল। ইরা যে বাইরে এসে এমন হালকা এবং সুগন্ধী হয়ে যাবে, এবং চঞ্চল হবে ভাবতেই পারেনি। সে তো দেখেছে ইরা গম্ভীর, গম্ভীর থাকলে ইরাকে ডাক্তার বাদে আর কিছু ভাবা যায় না। এবং ইরার পক্ষে এমন একটি প্রফেশানই যেন মানিয়েছে। অথচ এখানে ইরা নাবালিকার মতো উচ্ছল। টিপু ঘাসের ভিতর চিৎকার করে বলল, আমি মরে যাব ইরা।

—আমিও মরে যাব টিপু। তারপরই ইরা ঘাসের ভিতর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পা দুটো ঝুলিয়ে দিল নিচে। একটু চেষ্টা করলেই পায়ের আঙুলে জল লেগে যাচ্ছে। আর কি অনন্ত আকাশ। এবং রোদ বলতে তেমন কিছু নেই। খণ্ড খণ্ড মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে। বোধহয় রাতে অথবা কখনও কোথাও ভীষণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস, রোদ ভীষণ ভাল লাগছে। মনে হয় না জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের রোদ। ইরা এভাবে যখন আকাশ দেখছিল, পায়ে খোয়াইর জল লাগছিল আর উঁচুতে সেই সব পাহাড়শৃঙ্গে সারি সারি এবং আরও নিচে তাকালে একটা সমান্তরাল রেখা, শাড়ির পাড়ের মতো হুবহু এই উপত্যকাকে মনোহারিণী করে রেখেছে, তখন চোখ বুজে আসছিল ইরার। টিপু চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে। পায়ের কাছে খোয়াইর জল, নির্মল জলের রেখা এঁকে-বেঁকে ক্রমে উপত্যকার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কি যে সুন্দর দৃশ্য চারপাশে, ইরা জলে কিছুটা পা ডুবিয়ে রেখেছে, সে জলে পা দোলাচ্ছে, আর জলে কখনও ওদের প্রতিবিম্ব, ভেঙে ভেঙে জলের ছায়ায়, নিচে আরও নিচে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেসে যাচ্ছে। ইরা এবং টিপু দেখল, জলে পা ডোবালে প্রতিবিম্ব ভেঙ্গে যায়, ভেসে যায়। ওরা চটুচাপ উপত্যকার এই ধানসিঁড়ি জমিতে বসে কত কিছু ভাবল। এমন উদার আকাশের নিচে সারাজীবন যেন এভাবে বসে থাকা যায়। ভাবল, এভাবে পৃথিবী কেন সবার কাছে শেষ হয়ে যায় না। ইরা বলল, কি ভাবছ?

টিপু বলল, কিছু না।

—না, কিছু ঠিক ভাবছ।

—সত্যি বলছি কিছু না।

—এখানে মিথ্যা কথা বললে পাপ হবে।

—কেন পাপ হবে।

—আমরা তো আর কখনও এভাবে আসতে পারব না।

—কি যে বল।

—সত্যি বলছি। এবারে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলব। অনেকদিন তোমাকে অপেক্ষায় রেখেছি। আমিও এভাবে আর বেশীদিন থাকতে পারছি না।

—কি মজা হবে!

—সত্যি বলছ মজা হবে?

—হবে না।

—কি হবে?

—আমি তো ভাবতেই পারি না। একটা আস্ত মেয়ে আমার পাশে আমাকে জড়িয়ে রাতে, সারারাত, সারাজীবন...না না ভাবতে পারছি না।

—সত্যি ভাবতে পারছ না।

—সত্যি পারছি না। স্বপ্নের মতো।

—সত্য বলে মনে হয় না!

—না।

ইরা টিপুর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বলল, আমার আর আপত্তি নেই।

—সত্যি।

—সত্যি।

সরল বালকের মতো টিপু ঘাসের ভিতর তখন টুপ করে ডুবে গেল। ইরা, পৃথিবীর শব্দ গন্ধ সব তোমার আঁচলে বাঁধা। আমাকে দাও। তারপর সে, সব শব্দ গন্ধ ইরার শরীরে ঘাসের সবুজ আভায় খোয়াইর নির্মল জলে সন্ধান করে বেড়াতে থাকল। আর তার শরীরে টিপু টের পাচ্ছে এক মহামহিম ইচ্ছা, আহা কি যে গোপন আর নিজস্ব। লজ্জায় ইরা মুখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। টিপু সবুজ ঘাসে অলৌকিক দ্বীপের মতো কোনো ভূখণ্ড কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যেন নাগাল পাচ্ছে না। এবং একমাত্র ঈশ্বর তার প্রতিদ্বন্দ্বী এমন ভাবছে! সে বলল, ইরা ঈশ্বর আমাকে হিংসা করছেন। আমি পাচ্ছি না। সময়ে বুঝি ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী।

তখন ইরার কি যে হয়ে যায়, গভীরে কি যে থাকে এবং কেমন ঘাস মাটির মতো এক সুনিবিড় ইচ্ছায় ডুবে গিয়ে বলে, টিপু আমার টিপু, আমি এখানে। বলে সে টিপুর কাছে শান্ত ধরণীর মতো নিজেকে খুলে দিল। আজীবন প্রোথিত হবার বাসনা বীজের। ঘাসেরা এমন আমূল প্রোথিত হতে হতে আপন মহিমায় পৃথিবীকে কি যে আশ্চর্য সুন্দর করে ফেলছে।

চার

তারপর কি যে হয়ে যায়, ইরা আর টিপুর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। সে শাড়ি ঠিকঠাক করে বসে থাকে। দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে বসে থাকে। এমন সুন্দর মেয়েটা মাথা গুঁজে বসে থাকলে ভীষণ খারাপ লাগে টিপুর। সে বুঝতে পারে, ইরা এতক্ষণ যে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল, অথবা আশ্চর্য এক নিরিবিলি খেলার জন্য নিজের ভিতর নিজেকে আটকে রেখেছিল, এখন সব খোলামেলা হয়ে যাওয়ায়, যেন সে হেরে গেছে, অথবা মনে হয়, সে বুঝি টিপুর কাছে হেরে গেছে। টিপুরও ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। সে যে কি সুন্দর মহিমময় জগতে এতক্ষণ ছিল। কারণ সে জানত না মেয়েদের জংঘার ভিতরে এভাবে এক মায়াবী দ্বীপ কখনও অবস্থান করে থাকে, সবুজ সমারোহে যেন সেই অকথিত এক দ্বীপের মতো কেবল বৃষ্টিপাতে নিবিড় সুষমামণ্ডিত বনভূমিতে কারো আসার কথা, সবুজ ঘাসে নতুন দ্বীপে কারো হেঁটে যাবার কথা। হাত দিতে টিপুর তাই মনে হয়েছিল, সে ভিতরে ভিতরে কি

যে হয়ে গেছিল, আর ইরাও পাগলের মতো কি যে করে ফেলল। এ-সব হয়ে যাওয়ার পর যা হয়, কেউ আর সহজে কথা বলতে পারে না, এক পাপবোধ মনে লেগে থাকে কেমন দুঃখী রাজার বনবাসী পুত্রের মতো, সুতরাং ওরা দুজনই খুঁটে খুঁটে ঘাস তুলছিল, ছিঁড়ছিল, কিছু পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছিল। অথবা খোয়াইর জল নেমে যাচ্ছে বলে তার শব্দ, অথবা ওরা আদৌ কিছু শুনছিল না, ওরা নিজেরা নিজেদের চুরি করে দেখছিল।

টিপু না তাকিয়েই বলেছিল, আমরা এভাবে না এলেই পারতাম।

ইরার চুল এলোমেলো। ওর চুল খুলে গেছে। সে বসে এখন খোঁপা বাঁধছে। ক্লিপ এঁটে দিচ্ছে। ওর নরম শাড়ির আশেপাশে কোথাও মনে হয় শিশির ভেজা ঘাসের স্নিগ্ধতা এবং বিন্দু বিন্দু ঘাসের মতো কি সব এখনও লেগে রয়েছে। ইরা কিছু না বলে খোয়াইর জলে নেমে গেল, আর আশ্চর্য টিপু দেখল ইরা জলে নেমে কেমন সাঁতার কাটার মতো ভেসে থাকার চেষ্টা করল।

টিপু বলল, ইরা ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

ইরা কিছু বলল না। সে দু'হাতের অঞ্জলিতে জল তুলে মুখে, এবং ঘাড়ে দিতে থাকল। দূরে সেই পাহাড়ী উপত্যকা , অথবা শীর্ষে কেউ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সূর্য এবার মাথার ওপর উঠে আসবে। শীত শীত ভাবটা কেটে গেছে এবং এমন সময়ে জলে বোধহয় গা ডুবিয়ে রাখতে ইরার ভাল লাগছে।

খোয়াইর জল খুব সামান্য। পায়ের পাতা ডোবে না। নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে জল নেমে যাচ্ছে। স্ফটিক জল। নিচের সব নুড়ি পাথর স্পষ্ট। এমন আয়নার মতো জলে এখন ইরা গা ভাসিয়ে দিতে পারে। ইরা নুড়ি পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল। জল শরীরের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে মাথা তুলে দিচ্ছে, কারণ প্রবহমান জলের জন্য শ্বাস নিতে কষ্ট হলে ইরা মুখ তুলে আকাশ দেখছে।

তখন টিপু পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, ওঠো ইরা, যাবে না।

—আমার যেতে ইচ্ছে করছে না টিপু। তুমি আমার পাশে শুয়ে থাক না!

টিপু বলল, কেউ চলে আসবে।

—কেউ আসবে না। কি ঠাণ্ডা জল। শরীর জলে ডুবিয়ে রাখতে ভীষণ ভাল লাগছে।

কিন্তু জল তো প্রবহমান, স্বচ্ছ জলে ইরার শাড়ি কেমন উলটে পালটে যাচ্ছে, দু-হাতে চেষ্টা করেও সামলাতে পারছে না।

টিপু বলল, তোমার কি হয়েছে ইরা?

—কি আবার হবে?

—কেমন কথাবার্তা বলছ না।

—যাঃ কথাবার্তা বলব না কেন!

—লোকটা হয়তো ফিরতে না দেখে ভাববে।

—লোকটা কে আবার?

—আমাদের রামলাল।

—ভাবুক

সে পাশে বসল। ওর জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে, বেশ জল জল খেলা। এমন উদার আকাশের নিচে স্বচ্ছ খোয়াইর জল পৃথিবীর কোথায় আছে কে জানে। আর খোয়াইর পাড়ে পাড়ে সবুজ ঘাস। নির্জন। পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাঁচীগামী ট্রেনটা গুম গুম করে বের হয়ে যাচ্ছে।

ইরা বলল, এই টিপু প্লিজ!

টিপু বুঝতে পারল না।

—তাড়াতাড়ি। বলে ইরা টিপুকে যেন জোরজার করে শুইয়ে দিল। নুড়ি পাথরের ওপর শুইয়ে দিয়ে বলল, শুনতে পাচ্ছ?

—কি?

—জলের নিচে মুখ ডুবিয়ে দাও।

টিপু জলের নিচে মুখ ডুবিয়ে কিছু যেন বুঝতে পারল না। সে বলল, কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—ভাল করে শুয়ে নাও। ইরা টিপুকে একেবারে শুইয়ে দিল। জল প্রবহমান, জলের এক আশ্চর্য শব্দ আছে।

ইরা বলল, জলের নিচে মাথাটা পুরো ডুবিয়ে দাও। শুনতে পাবে, অনেক দূরে যেন কারা, হাজার হাজার হবে, পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছে, অথবা মনে হবে, হাজার হাজার হরিণেরা ওপর দিয়ে ছুটছে, কখনও মনে হতে পারে, অনেক অশ্বারোহী পুরুষ যুদ্ধ জয় করে ফিরছে। টিপু, সবার আগে মনে হয় তুমি আছ। তুমি মুখ ডুবিয়ে কি শুনতে পাও, দ্যাখো না।

টিপু চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথাটা সামান্য তোলা। মাথাটা এগিয়ে দিলে জলে মুখ চোখ ভেসে যাবে, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, সে দম বন্ধ করে একেবারে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ল। আর জলের রেখা এবং আশ্চর্য শব্দ শুনতে না পেলেও ওর মনে হয় কোথাও প্রচণ্ড ভূমিকম্প হচ্ছে, তার ভীষণ শব্দ। যেন পাহাড় ধ্বসে যাচ্ছে, মাটি ধ্বসে যাচ্ছে, সব ভেঙে চুরে পৃথিবীতে প্রলয় চলে আসছে। সে কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকল, এবং উঠে বসে বলল, কি ভীষণ মনে হয়!

—ভীষণ মনে হয়? ইরাও উঠে বসল।

—ট্রেনের শব্দটা মনে হচ্ছে ভূমিকম্পের শব্দ।

—যাঃ।

—হ্যাঁ, তুমি মুখ ডুবিয়ে শোন না।

ইরা বলল, না তারপর থেমে বলল, তুমি ভীতু মানুষ।

টিপু কিছু বলল না।

ওরা দুজনই খোয়াইর ওপর বসে। জল এখন চারপাশে নেমে যাচ্ছে। ওরা বসে রয়েছে বলে, জল চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এবং বৃত্তের মতো কখনও জলের স্রোত ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে। বেশ মজা লাগল ইরার। টিপুরও ভাল লাগছে। সামান্য বাতাস আছে বনে। কেউ কেউ খোয়াইর জল পার হবার সময় দেখল দুজন বাবু বিবি আসনপিঁড়ি করে বসে রয়েছে। ওরা খোয়াইর জলে অথবা এমন সবুজ মাঠে বাবু বিবিদের এমন রঙ্গ তামাসা দেখলে হাসে। যেমন এখনও হাসতে পারে। কিন্তু ওরা দেখে না। মানুষের নানাভাবে বাঁচতে ইচ্ছে হয়। ওরা এটা বোধহয় বুঝতে পারে।

আর ইরা মানুষজন দেখলেই চমকে ওঠে, যদিও দুজন মানুষ খুবই কম, এতক্ষণে ওরা মাত্র দুজন দেহাতী মানুষকে দেখতে পেল, ওরা খোয়াইর জল দু'লাফে পার হয়ে গেল। ইরার মুখে মাথায় এবং শরীরে দু-হাতে জল তুলে মেখে নিচ্ছে, কখনও টিপুর মাথায় দিয়ে যাচ্ছে, যেন এখানে এসে ইরা সব ভুলে গেছে, মান-সম্ভ্রম এবং কোনো ঘটনা ঘটলে কষ্ট হতে পারে, তাও। ঘটনা ঘটে যাবার পর ইরা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছিল, এখন সে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। ওর ভীষণ কষ্ট হয়েছিল, আবার কি যে ইচ্ছে হয়, যেন আপন মহিমায় এক জগতের ভিতর ডুবে যাওয়া, অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে যেতে যেমন মজা লাগে এও তেমনি।

ইরা বলল, কাল রাতে তুমি আমাকে ডাকলে না কেন? তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

—ঠিক আছে আজ ডাকব।

—ডাকবার জন্য আমি বসে থাকব ভাবছ। আমার তো ভয় নেই, সব ভয় কেটে গেছে। আজ একসঙ্গে শোব কেমন!

—আচ্ছা!

—কিন্তু তুমি দুষ্টুমি করতে পারবে না।

—আচ্ছা করব না।

—আমি খুব সুন্দর করে সেজে নেব।

—নিও।

—তোমাকেও নিতে হবে।

—আমাকে আবার কেন?

—আমি সাজিয়ে দেব।

—আমার খুব হাসি পাবে ইরা।

—কেন?

—খুব ছেলেমানুষী হবে না!

—না। আমার বুঝি ইচ্ছে হয় না, তুমি রাজার মতো আমার পাশে শুয়ে থাক?

—খুব ইচ্ছে হয়।

—খু-উ-ব!

—তুমি আমার পাশে কেমনভাবে শুয়ে থাকবে?

—যেমনভাবে বলবে।

টিপু বলল, এবারে উঠবে না!

—উঠব।

—আচ্ছা তুমি আমাকে খুব ভালবাস!

—খু-উ-ব।

—যদি আমাদের কিছু হয়ে যায়।

—কি হবে?

—এই তুমি যদি আমাকে পরে না ভালবাস? খারাপ মেয়ে ভেবে ফেলো! তবে আমার, আমার আর কিছু থাকবে না।

টিপু বলল, তোমার মাথায় আসেও। বলে জড়িয়ে ধরে দুলে দুলে গাইতে থাকল, অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে......

আসলে এভাবেই জীবন আরম্ভ হয়ে যায়, সুন্দর সব দৃশ্যের ভিতর ভেসে বেড়াতে ভাললাগে। দুঃখ তাদের এখন অনেক দূরের ছবি। কিন্তু অনেক সুখের পর অনেক দুঃখ। ইরা কেমন ভয় পেয়ে যায়। ইরা যখন সব দিয়ে থুয়ে চুপচাপ বসেছিল, কেমন ছোট হয়ে গেল ভাবছিল, তখন একমাত্র ভাবনা, টিপু তাকে হয়তো আর কুমারী মেয়ে ভাববে না। টিপু আর দশটা বিবাহিত মেয়ের মতো তাকে ভাববে, সে যে কোনো সময় টিপুকে নিয়ে সব কিছু করতে পারে ভাববে, টিপু এ-নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, এবং সস্তা হয়ে গেলে যা হয়, ইরার ভীষণ ভয়, টিপুর কাছে আর তার বুঝি দাম থাকল না। সে যে মহার্ঘ, সে যে দীর্ঘদিন এক স্ফটিকস্তম্ভ শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কেউ আসবে বলে, কেউ রাজপুত্রের মতো দীঘির জলে ডুবে সেই অলৌকিক ভ্রমরের সন্ধানে কেবল জলে, ঠাণ্ডা জলে ডুবে যাবে, এবং সন্ধান পেলেই আশ্চর্য অনুভূতি, ইরা সেইসব কেমন হেলায় ফেলায় মাঠে ঘাটে টিপুকে দিয়ে দিল। টিপু ইরার এতদিনের পবিত্র স্তম্ভ কেমন লাঠি মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। এবং কেন জানি মনে হয়েছে, টিপু তার সেই যে অলৌকিক ভ্রমরটি নিয়ে গেল তা আর হয়তো ফিরবে না। সে ভয়ে ভয়ে বলল, টিপু আমার কিছু ভাল লাগছে না।

টিপু ছেলেমানুষের মতো বলল, আমার ভীষণ ভাল লাগছে। এবং সেই জলে ফের ইরাকে জড়িয়ে ধরে জলের ভেতরে, কি যে ইচ্ছে, হায় কেন যে ঘুরে ফিরে স্বপ্নের মতো শরীরে নেমে আসে সবুজ ঘাসের সমারোহ, সে ভেবে পায় না, কি যে অমূল্য, এবং এক অপার্থিব সুখ, সে বলল, ইরা চল, চল আমরা উঠি। যেন বলার ইচ্ছা, আমি জানি না, এমন সব অমূল্য সুখ ঈশ্বর আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন, আমরা এখন বিনিময়ে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আর কিছু চাই না, ইরা ওঠো, ঘরে তুমি আর আমি, আর কেউ নেই, এখানে ভয়ে ভয়ে ভাল লাগছে না। এবং ইরার দিকে তাকালে কেন যে টিপু ভয় পেয়ে গেল। বলল, ইরা তোমার কিছু হয়েছে!

—না।

জল তেমনি চারপাশে ঘূর্ণিপাকের মতো। মাথার ওপর তেমনি নির্মল আকাশ। আর দূরে তেমনি চুপচাপ পাহাড়শ্রেণী, এবং কোথাও কোনো পাখির ডাক. অথবা হাওয়ায় উড়ছে পাখিরা। ওরা দেখল, কত ওপরে সব পাখিরা উঠে গেছে, পৃথিবীর বুক থেকে অনেক ওপরে উঠে ওরা সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখছে। ওরা ক্রমান্বয়ে আকাশের বুকে ঘুড়ির মতো কখনও যেন স্থির, কখনও যেন বেগে নেমে আসছে, কখনও গ্লাইড করছে আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথায়। টিপু এ-সব দেখতে দেখতে বলল, ইরা, ওঠো, লক্ষ্মী। তোমার কি যে হয়েছে!

ইরা উঠে দাঁড়াল। ওর শাড়ি সায়া ব্লাউজ ভিজে সপ সপ করছে। সে নানাভাবে ঢেকে দেখল, ঠিক মতো ঢাকতে পারছে না। এবং ওর কেন যেন এখন খুব লজ্জা করছিল। সে এভাবে মাঠের ওপর দিয়ে যাবে কি করে! কেউ দেখে ফেললে, কি যে হবে না! সে নিজের এমন লেপ্টে থাকা সায়া শাড়ি টেনে টুনে ঠিক করেও অস্বস্তি কাটাতে পারল না। পাশে টিপু চুপচাপ হাঁটছে। টিপু কোনো কথা বলছে না আর। কারণ সে টিপুর কোনো কথার জবাব দেয়নি। বলেনি, তুমি দস্যু টিপু, তুমি আমার সব হরণ করে নিয়ে মজা দেখছ। আসলে বোধহয় ইরাও জানে না, কেন সে এমন ভাবছে। সে কি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না টিপুকে? এতদিন পর কেন এমন মনে হচ্ছে! এখন কেন তার এসব মনে হচ্ছে, এবং মনে হলে যা হয়, ভীষণ সংশয় এবং সোজাসুজি কথাবার্তা বলতে সংকোচ, সে টিপুর দিকে এমনকি তাকাল না পর্যন্ত। টিপু অন্য মানুষ, টিপুর সঙ্গে ওর কখনও দেখা হয়েছে এমন পর্যন্ত মনে হয় না!

ইরা অবশ্য এমন একটা সংশয় যাতে মনে বাসা বেঁধে না থাকে তার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। সে বাংলোতে ফিরে এসে স্নান করল। সে চেষ্টা করল গান গাইবে গুন গুন করে এবং সহজ হতে চাইল। সে গান গাইলে, টিপু বুঝবে ওর মনে আর কোনো দুঃখ নেই। আর সে ভেবে পাচ্ছে না এমন কেন হয়, মনে হয় টিপুর চেয়ে ওর বেশী ইচ্ছে, মনে হয় সে-ই টিপুকে নষ্ট করে দিল, আবার মনে হয়, না, টিপু সারাক্ষণ কিভাবে তাকে শিকার করা যায়, বোধহয় ভেবেছে। এবং যে যেভাবে দাঁড়ালে সে উচ্চতায় ডুবে যাবে তার চেষ্টা টিপুর। টিপুকে এখন ভীষণ সেয়ানা মনে হয়, এবং এভাবে ভাবলেই টিপুকে ইরার ভাল লাগে না। টিপুকে স্বার্থপর এবং কৌশলী মনে হয়।

টিপু তখন চুপচাপ সিগারেট খাচ্ছিল, ইরার শেষ হলে সে বাথরুমে যাবে। অবশ্য ও-ঘরে আর একটা এটাচড্ বাথরুম আছে, কিন্তু কি কারণে যে সে ভিজে জামা প্যান্ট নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যাচ্ছে না। এবং দেখলেই মনে হয় কোথায় যেন এক ভীষণ অভিমান টিপুর, ইরা ওকে অবিশ্বাস করছে, অবিশ্বাস করলে ঠিক টের পাওয়া যায়। সে ইরার চোখ মুখ দেখে এটা বুঝতে পেরেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তার মনেই নেই, সে ভিজে জামা প্যান্টে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাথরুমে জল পড়ার শব্দ শুনছে।

ইরা বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখল, টিপু ঘরে নেই, পাশের ঘরেও নেই। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখে কিছু টের পেল না, ওর জীবনে জন্ম-মৃত্যুর মতো এক অতীব অপরিহার্য ঘটনা ঘটে গেছে, মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছে না। অন্য সময়ে সে স্নান করে ফিরে এলে যেমন মুখের রেখা আয়নায় ভেসে ওঠে, এও তেমনি। সে টিপুকে খুঁজছে। এখন এভাবে আয়নায় দাঁড়িয়ে মুখ দেখা ঠিক না। টিপুর খুব খিদে পেয়েছে। ওরও পেয়েছে। অথচ টিপু বাথরুমে নেই, সে এবার বের হয়ে দেখল টিপু বারান্দায় একপাশে একটা খাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন চুপচাপ দূরের পাহাড়শ্রেণী অথবা আরও কি যেন দেখছে। আদৌ কিছু দেখছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। সে এভাবে কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি টিপুকে। যেন সে কঠিন কিছু দেখে বিস্ময়ে থমকে গেছে। ওর মুখ দেখে এমন মনে হচ্ছিল। আর এমন মুখ দেখে সে যে বিশ্বাসই করতে পারে না, টিপু সেয়ানা, টিপুর জন্য ভীষণ কষ্ট হয়। নিজের ভিতর নিজেই ইরা দুঃখে ডুবে যায়। এভাবে উচিত হয়নি টিপুর কথার জবাব না দেওয়া। সে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, এই!

—কি!

—এভাবে কি দেখছ! স্নান করবে না! খিদে পায় না!

টিপু ইরাকে দেখল। কথা বলল না। যেমন মাঠ-ঘাট দেখছিল আবার তাই দেখছে।

—এই, তুমি রাগ করেছ! বলে ইরা টিপুর জামার বোতাম খুলে দিতে লাগল। তারপর মা যেমন ছেলেকে টেনে নিয়ে যায়, জামা খুলে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয়, তেমনি এক স্নেহ মমতায় ইরা টিপুকে তেল মাখিয়ে বাথরুমে পাঠিয়ে দিল।

তারপরই ইরার চোখ কেমন চিক্‌চিক্ করছিল। সে আর ঠিক থাকতে পারল না। সে কেন যে আবার এক মহাশূন্যে ঝুলে পড়ে, কি মহিমময় ইচ্ছে শরীরে, শেষ হয়েও শেষ হয় না, বার বার ঝরা পাতার মতো চৈত্রের বাতাসে উড়তে চায়। এবং এভাবে আবার টিপু আর ইরা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী খেলায় মেতে যায়। ইরা টিপুকে সব দিয়ে থুয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সে তো এতদিন এভাবেই টিপুকে পাশাপাশি

দেখে এসেছে। তবে এত অবিশ্বাস কেন। সে টিপুর কাছে ঘন হয়ে এলেই টের পায়, শরীরে সৌরভ থাকে পুরুষের। কাছে গেলে আর ঠিক থাকা যায় না। এবং মনে হয় আসলে সে-ই টিপুকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। টিপুর যা কিছু দামী, যা কিছু সুন্দর, সে নিজের করে ফেলেছে। ইরা বলল, টিপু আর আমি কখনও তোমাকে ভুল বুঝব না।

পাঁচ

বৌদি বলল, খুব বেড়ানো হল বাবুর।

টিপু বৌদির দিকে তাকাল না। কেমন সংকোচ হচ্ছে তাকাতে। সে যেন কোনো একটা অকাজ করে বাড়ি ফিরে এসেছে। কিছু বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। গাড়ি থেকে গোপাল তখন ওর স্যুটকেস রেডিও নামাচ্ছে। এবং গাড়িটা পাশে গ্যারেজ করবে বলে নিয়ে যাচ্ছে। বৌদি ওর গলা শুনেই টের পায় বাবুর সময় হয়েছে ফেরার। তার চেয়েও বেশী চন্দন, ছোট চন্দন, দু'হাত তুলে ছুটে আসছিল, যেন বাড়ির সবচেয়ে দামী মানুষটি, তার সুন্দর কাকু, অর্থাৎ সেই ছোট্ট ছেলে বলে সুন্দর কাকু না থাকলে ভীষণ সে একা, দাদু দিদা খুব বেশী তাকে নিয়ে বেড়ালে তা বাগান পর্যন্ত, কাকু অনেক দূরে নিয়ে যায় গাড়ি করে, সে থাকে তখন কাকুর কাছে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে, কত সুন্দর সুন্দর কথা ওরা দুজন অসমবয়সী মানুষ তখন বলে যায়, কেউ টের পায় না, চন্দনের সঙ্গে টিপুর আশ্চর্য এক বন্ধুত্ব। এবং এই যে টিপু ফিরে এল, সে এসেই চন্দনকে কোলে তুলে ফেলেছে, সে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বলল, চন্দনবাবু কেমন ছিলেন!

চন্দন হাতে চুল টানছে টিপুর। টিপু বুঝতে পারে যে, চন্দন ভীষণ রাগ করেছে অথবা অভিমান। কেন এতদিন সে ছিল না, কোথায় ছিল, এবং ম্রিয়মাণ এক মুখ দেখে টিপু বুঝতে পারে, সে ভেবেছে কে এমন পৃথিবীতে তোমার প্রিয়জন আছে, যার জন্য আমার কথা মনে থাকে না। অথবা এই শিশু কি টের পেয়ে গেছে যে সে পালিয়ে দুষ্টুমি করে এসেছে, এবং বুঝে ফেলেছে, চন্দনকে আর আগের মতো ভালবাসতে পারছে না।

টিপু চুল থেকে হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, চন্দনবাবু, আমার ভীষণ লাগছে। তুমি ছাড়ো।

আর চন্দন তখন টিপুর নাক খামচে ধরেছে।

টিপু নিজের ঘরে গিয়ে ওকে টেবিলের ওপর বসাল, দুরন্ত ছেলে বসবে কেন! সে টেবিলে উঠে দাঁড়িয়ে গেল, এবং আবার চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে থাকল।

টিপু বলল, অপরাধ হয়েছে চন্দনবাবু। আর যাব না।

একটা কথাও বলছে না চন্দন। যেন বলতে চায় এই এতদিন তুমি কোথায় ছিলে, বল, কেন এভাবে আমাকে ফেলে পালিয়ে থাকলে বল, এবং টিপু, টিপু না বলে পারে না, যেন সে নিজেই কৈফিয়ত দিতে চায়, চন্দনবাবু, সে এক মজার ঘটনা, তুমি বোসো। তোমাকে সব বলছি। আমাকে জামা প্যান্ট ছাড়তে দাও। আমার যে খুব গরম লাগছে। দাঁড়াও একটু প্লিজ, চন্দনবাবু। গায়ের সঙ্গে এভাবে সেঁটে থাকলে কি করে চলবে! আঃ লাগছে। এবার কিন্তু মারব, দ্যাখো তো রক্ত বের করে দিলে!

টিপু আয়নায় মুখ দেখল, গাল বেশ খামচে দিয়েছে। খুব সেয়ানা, বুঝে ফেলেছে। সে বকেছিল বলে চন্দন ঠোঁট উল্টে দিচ্ছে এবং এমন দেখেই টিপু বলল, না বাবু, তোমাকে আমি আর কিছু বলব না। চন্দনের বয়স কত হবে! দু'বছরের ওপর। সে রাগ করে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ টিপুর ওপর রাগ করে টেবিল থেকে নেমে যাচ্ছে। টিপু ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল, এবং বুকের কাছে নিয়ে বলল, চন্দনবাবুর খুব রাগ! বলেই গালে কপালে চুমো খেতে থাকল।

তারপর যা হয়ে থাকে, চন্দন এবং টিপু কাছাকাছি এসে গেলে প্রায় দুই বন্ধুর মতো। টিপু সব আনন্দের কথা একমাত্র চন্দনকেই বলতে পারে। চন্দন, কাকার কথা শুনলে বুঝতে পারে না, তবু কি যে হয়েছে, চন্দন হাসতে হাসতে কাকার গালে গাল লাগিয়ে গলা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তখন টিপুর কথাবার্তা শুনলে চন্দন খুব গভীর আর নিবিষ্ট হয়ে যায়। যেন সত্যি চন্দন কাকার সব দুঃখ বুঝতে পারে।

সুতরাং টিপু বলল, চন্দনবাবু, শিরকা যাবে?

চন্দন বলল, তুমি ভাল না। ওর অস্পষ্ট কথা কেবল টিপু আর নমিতা বুঝতে পারে। 'তুমি ভাল না' কথাটা এত অস্পষ্ট যে ভাষা বিশারদ না হলে বোঝা যাবে না। টিপু বলল, আমি খুব ভাল। খুব সুন্দর ইরা। ইরা তোমার কাকিমা হবে, তুমি কিন্তু কাকিমাকে ভালবাসবে।

বোধহয় শেষ কথা 'ভালবাসবে' ধরতে পেরে চন্দন বলল, ভালবাসব না।

—কেন ভালবাসবে না!

—তুমি দুষ্টু।

অর্থাৎ টিপু বুঝতে পারে চন্দন ওকে ধমক দিল।

টিপু বলল, চন্দনবাবু, তুমি ধমক দেবে না, আমার ভীষণ ভয় করে। এবং ভয় করলে যেমন মুখের ভাব করা দরকার, খুব ঘাবড়ে যাবার মতো, সে তেমনি মুখ করে বলল, চন্দনবাবু, কি যে ভাল লেগেছে না, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। তুমি বড় হলে বুঝতে পারবে। কি যে সুন্দর হয়ে যায়, স্বপ্নের মতো, তোমাকে ছাড়া আর কাকে বলব।

নমিতা তখন খুঁজতে এসে দেখে বাথরুমের দরজা বন্ধ। এসেই স্নান করে নিচ্ছে টিপু। দোতলায় একদিকে এই ঘর। সে যখন দেখল, বাথরুমের দরজা বন্ধ, তখন দু'ঠোঁটে হাসি। কাকা ভাইপো ঠিক সাওয়ারের জলে স্নান করছে। দশটা বেজে গেছে। সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে একটা দুটো কথা যা হয়েছে, মা বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি, কেবল মা বাবা তাদের ঘর থেকে বলেছে, টিপু এল?

নমিতা বলেছে, এসেছে।

আর কিছু কথা হয়নি। টিপুর দাদা, নটা না বাজতেই গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যায়। দুপুরে লাঞ্চ খায়। নিয়ে যায় গোপাল। এখন এত বড় বাড়িটাতে নমিতা, টিপু, চন্দন, মা, বাবা। চন্দন আর টিপু বাথরুমে। মা পূজার ঘরে। বাবা দশটা কেন, এই বারোটায় খেতে না বসা পর্যন্ত কাগজটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বেন। বাবা বোধহয় বিজ্ঞাপন পড়তে ভালবাসেন। কোথায় কি টেণ্ডার দিতে হবে, এখনও যেন ছেলেদের মনে করিয়ে দেন। দু-তিনটে কাগজ, এবং তখন বাবার ওটা একটা কাজ, কোন্ টেণ্ডারে কি লাভজনক ব্যাপার আছে বাবার চাইতে কেউ বোধহয় বেশী এখনও জানে না।

নমিতা মুখ টিপে হাসল। সে বলল, টিপু তোমার হয়েছে!

—একটু দেরি হবে বৌদি।

—টুক্ করে কোথাও আবার বের হয়ে পড়বে না।

—না বৌদি।

চন্দন বলছে, না মা আমি চান করছি, কাকা করছে। নমিতা চলে যেতে যেতে ভাবে, চন্দনের সঙ্গে কি যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে টিপুর, টিপুই যেন চন্দনকে গড়ে তুলতে চায় তার নিজের মতো করে, তার আর কিছু বলার জো নেই। আর নমিতা ভাবতেই পারেনি, টিপু চন্দনকে ছেড়ে এতদিন এক নাগাড়ে থাকতে পারবে। টিপু যখন বলেছিল, ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, নমিতা বলেছিল, ক'দিন!

—মাসখানেকের মতো।

—হয়েছে!

—হয়েছে মানে?

—একমাস তুমি থাকতেই পার না।

—দেখি কি হয়!

অথচ ঠিক একমাস থেকে এসেছে। নমিতার কখনও বিশ্বাস হয়নি, টিপু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে এতদিন সত্যি চন্দনকে ফেলে থাকতে পারে। কারণ চন্দনকে ছাড়া টিপু এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। এমনকি সে অফিস থেকে এসেও চন্দনকে নিয়ে বের হয়ে যায় বেড়াতে। ওকে নিয়ে যায় কোনো পার্কে, অথবা নমিতা দেখেছে, এ-বাড়িতে চন্দন কোথায় আছে সবার জানা। কাকার ঘরে। টিপু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে চন্দন কেবল কাকার পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করতে ভালবাসে। সে কখনও কাকাকে ফেলে অন্য ঘরে যায় না। এই কাকার ঘরে, কাকা যখন স্টিরিও চালিয়ে গান শুনতে ভালবাসে, তখন

চন্দন ভারি মজা পায়, আর টেবিলের ওপর দাঁড়ালে , সে দেখতে পায় সামনে কি সুন্দর মাঠ, কত দূরে চলে গেছে। আর এই সল্টলেকের অঞ্চল ভারি নির্জন। সামনের মাঠ দেখতে দেখতে সে যেন বুঝে ফেলে, সে তার কাকা এ-বাড়িতে একটা ভিন্ন জগৎ তৈরি করে ফেলেছে।

সাওয়ারের জল অনবরত পড়ছে। টিপু সাবান মাখিয়ে দিচ্ছে চন্দনকে। নমিতা জলের শব্দ শুনতে শুনতে মনে মনে হাসে। কিন্তু কিছু বলে না। এমনকি নমিতার স্বভাব হয়ে গেছে তার খোঁজে গিয়ে সে যুগ্মভাবে ডাকে, অথবা বহুবচনে।

—বাবুদের কি স্নান হল?

যেমন নমিতা বলে, সময় হল তবে বাবুদের।

যেমন নমিতা এমনও বলে থাকে, বাবুদের খাবার রেডি।

ওই বহুবচনেই ওরা যখন দুজন এ-সংসারে বেঁচে আছে তখন বোঝাই যায় টিপুর পক্ষে চন্দনকে ছেড়ে থাকা বেশীদিন সম্ভব না, কিন্তু টিপু একমাস বাইরে থেকে এসেছে। এটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। দুটো চিঠি এসেছিল কেবল। চন্দনের কথা তাতে খুব একটা বেশী লেখাও ছিল না। পৃথিবীতে বন্ধু-বান্ধবেরা চন্দনের চেয়ে টিপুর আপন এটা ভাবতে নমিতার সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। আর ছেলেরও হয়েছে, টিপু নেই, যেন ওর কেউ নেই। টিপু এসেছে, এখন চন্দনের [illegible] কাকা ভাইপোর গলা এই বাড়ির সর্বত্র, এমনকি সামনে সুন্দর সবুজ ঘাসে নীল রঙের বেতের চেয়া[illegible]ন বসে থাকে টিপু এবং চন্দন হেঁটে বেড়ায় অথবা দুজনে ছুটোছুটি করে তখন ভারি সুন্দর লাগে দেখ[illegible]ন চুপচাপ জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দন এবং টিপুর ছুটোছুটি চলে সবুজ ঘাসে। সে আশ্চর্য হয়ে [illegible] দুই শিশুর দুরন্তপনা আর উদ্দামতা। সেসব ছবি সে ভুলতে পারে না। চন্দন বাদে টিপু, টিপু বাদে চন্দন, এ-পৃথিবীতে ভাবা যায় না।

চন্দন, হা হা হি হি হাসে। ছুটতে ছুটতে পড়ে যায়। যতক্ষণ গিয়ে টিপু তুলে না দেবে ততক্ষণ সে এভাবে পড়ে থাকবে। দুহাতে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলেই সে আবার ছুটবে। অথবা মালি রঘুময় যখন বাগানে কাজ করে তখন চন্দন বেড়ার পাশে দাঁড়ালে একটা গোলাপ অথবা রজনীগন্ধা যখনকার যা ফুল চন্দনবাবুর হাতে দেবে। চন্দন ফুলটা পেলেই দৌড়ে আসবে টিপুর কাছে। ফুলটা নিয়ে টিপু চন্দনের বড় বড় চুলে গুঁজে দেবে, সেজন্য চুল ইচ্ছে করেই বড় বড় রাখা হয়েছে। বিকেলে মাথায় ঝুঁটি, কিছুটা গোপাল ঠাকুরের মতো, টিপুর দেবদেবীতে আদৌ বিশ্বাস নেই, তবু চন্দন যখন এভাবে লম্বা রঙ-বেরঙের সিল্কের জামা গায়, মাথায় বড় ঝুঁটি বেঁধে আসে, তখন ফুল মাথায় গুঁজে দিলে—জানলায় নমিতা, বেতের মোড়ায় টিপু, দূরে বাবা, সব মিলে বাগানে ছোট ছোট ঘাসের ছায়ায় বড় সুন্দর দৃশ্য তৈরি করে ফেলে।

টিপু স্নান করে টেবিলে খেতে বসলে নমিতা বলল, ওকে সঙ্গে নিলে কেন! ও তোমাকে খেতে দেবে না, খিদের সময়!

—খুব দেবে, দাও তো।

এ-সংসারে কিছু এমন নিয়ম আছে, নমিতাই সবাইকে খেতে দেয় নিজের হাতে। বাবা মা এবং টিপুর একসঙ্গে বসার কথা। কিন্তু টিপু এসেই বলেছিল ভীষণ খিদে পেয়েছে, সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে, ঘুমোবে, কোথাও বের হবে না, সে সারা বিকেল এবং রাত্রিরে, কারণ সে তো একমাস ভাল করে ঘুমোয়নি, সে যে কিছু একটা করে ফেলেছে, এবং এজন্য একটা যে সংকোচ রয়েছে, ওর মুখ দেখলে তা ধরা যায়। সে বৌদির সঙ্গে ভাল করে কথাও বলছে না। হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে। খাচ্ছে।

নমিতা বলল, চোখ মুখের চেহারা কি হয়েছে!

—কি হয়েছে!

—চোখের নিচে এমন কালি পড়েছে কেন!

—কত ঘুরেছি, দিন নেই, রাত নেই, ঘুরেছি। চোখে তো কালি পড়বেই। আজকে জসিডি, কালকে দেওঘর, আবার ফিরে এসে পালামৌ, হাজারিবাগ। কেবল ঘুরেছি আর ঘুরেছি।

—তোমার বন্ধুদের নিয়ে এলে না কেন?

টিপু বৌদির দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসার চেষ্টা করল। বলল, তুমিও যেমন। ওরা কতক্ষণে

সবাই যে যার বাড়ি যাবে।—ও কি হচ্ছে। টিপু চন্দনের দিকে তাকিয়ে শাসনের গলায় কথা বলল। চন্দন খুব ভাত ছিটাচ্ছে। খাচ্ছে না। যা খাচ্ছে তার চেয়ে বেশী ফেলছে।

নমিতার দিকে কেন যে টিপু সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। বৌদি কি টের পাচ্ছে, সে কলম্বাসের মতো ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে ফিরে এসেছে, সে জানত না, কারণ তার জানা ছিল না, মেয়েরা রহস্য শরীরে আজীবন রেখে দেয়। ভেবে পায় না, কি যে মহিমময় ব্যাপার, এবং সে এখন যেন বলতে পারে, বৌদি আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। এতদিন বেশ ছিলাম। দূরের মানুষ এমন কাছের হয়ে যায় কি করে। এমন কে আর আছে, যার প্রাপ্য ইরার চেয়ে বেশী। আমার মা, বাবা, দাদা, তুমি, খোকন—কে! পরক্ষণেই মনে হয় তার, হ্যাঁ খোকন, খোকনই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

সে বলল, চন্দন এবার ওঠো। সে খুব একটা ভাত খেতে পারল না। কি যে ঘুম পাচ্ছে। চন্দনকে নিয়ে সে সোজা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেল। সে এখন চন্দনকে নিয়ে শুয়ে পড়বে। এবং চন্দন আর সে প্রায় দুই নাবালক কেবল শিশুর মতো ঘুমোবে। পৃথিবীতে ইরা বলে কোনো মেয়ে আছে, অথবা ঘাসের ভেতর কখনও এক দারুচিনি দ্বীপের সন্ধান পেলে ঈশ্বরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায়, মনে থাকবে না।

ছয়

ইরা বাথরুমে তখন গুন গুন করে গান গাইছে। সে সাওয়ারের জল ছেড়ে নিয়ন আলো জ্বালিয়ে পরীর মতো দাড়িয়ে আছে। জল পড়ছে। মাথায় মুখে স্তনে, জংঘায় এবং পায়ের মসৃণ ত্বক বেয়েও জল নেমে যাচ্ছে।

ইরা নিজের মনেই বলল, টিপু কি মজা! টিপু, এখন আর আমার পুরুষের ওপর রাগ হয় না। হাসপাতালের সব রুগীদের জন্য মায়া হয়।

জল পড়ছে। ইরা ভাবছে। কত ভাবনা যে মাথায় আসে। সে সুন্দর করে সাবান মাখে গায়ে। নরম চুলে শ্যাম্পু। রাস্তার ধুলো বালিতে চুল ময়লা হয়ে গেছে। সাবানের ফেনার ভিতর ইরা চুপচাপ জলের ফোঁটা শুনতে ভালবাসে। অথবা বেতের মোড়াতে বসে সে তার পুষ্ট বাহুতে, পুষ্ট নাভির চারপাশে ঠাণ্ডা জল রেখে এক খেলা, অনবরত এক খেলা যেন টিপুকে এই নিয়ে এই সাওয়ারের নিচে খেলছে। সে বলল, টিপু আমি আর পারছি না, যেন বলার ইচ্ছা অনন্তকাল তুমি আমি আর এই পৃথিবী—ভাবতে মজা লাগে। আমাদের এ-ভাললাগার বুঝি শেষ নেই টিপু। তুমি কিন্তু খুব ঘুমোবে। আমার জন্য ভাববে না। আমিও এখন ঘুমোব। এই যে স্নান করছি, কি এক পবিত্রতা স্নানের শেষে, মনে হয় বিশুদ্ধ শরীর আমার, কোথাও এতটুকু অপবিত্র ব্যাপার নেই, আচ্ছা টিপু, সবার সঙ্গে কথা বলতে কেমন একটা সংকোচ হচ্ছে, ছিঃ ছিঃ পালিয়ে আমরা এটা কি করে ফেললাম, তারপরেই সে মনে মনে হাসল।—না আমি রাগ করিনি টিপু। আমি দাম বাড়াতাম টিপু। তখন তোমার দুঃখী মুখ দেখলে কি যে খারাপ লাগত। এখন ভাবছি, এভাবে তোমাকে কষ্ট না দিলেও পারতাম।

ইরা এমনভাবে কত কথা ভেবে ফেলে, নিজে নিজে টিপুর সঙ্গে অজস্র কথা বলে যায়। এতদিন যেভাবে পৃথিবীর মানেটা তার জানা ছিল, এখন যেন অনেক পাল্টে গেছে। বেঁচে থাকা কি সুখের। সে সাওয়ারের জল এখন যেন মুখের ওপর রেখে দু-হাতে নিজের সুন্দর চিবুক তুলে ধরেছে। ধীরে ধীরে চিবুকের দু-পাশ থেকে চাঁপাফুলের মতো নরম আঙ্গুলগুলো মনোরম কুয়াশার জলে যেন ভেসে উঠছে। সুন্দর সুদৃশ্য বাথরুম থেকে সহজে বের হতে ইচ্ছে হয় না। কেবল এক আজগুবি স্বপ্নের ভিতর ডুবে থাকতে ভালবাসে, কারণ এটা আজগুবি মনে হয়, সে তো এমন ভাবে ভাবেনি বিয়ের আগেই পালিয়ে হনিমুন সেরে ফেলেবে—আর মাঝে মাঝে এসব মনে হলে একটা কাঁটা খচখচ করে বুকের ভেতর ঢুকে যায়। মনে হয় টিপু তার শরীরের রহস্য সব জেনে গেছে, বিয়ের পর সে আর তো নতুন রহস্য খুঁজে পাবে না।

আসলে সব মানুষের ভিতরেই থাকে এক রহস্য। কিন্তু তবু মনে হয়, প্রতিটি যুবক-যুবতী নিজের প্যাটেন্ট করা রহস্য নিয়ে বেঁচে থাকে। একজনের সঙ্গে আর একজনের মেলে না।

এসব ভাবলেই ইরার বুকটা কাঁপে। ওর প্যাটেন্ট জানা হয়ে গেছে টিপুর। এত বেশী জেনে ফেলেছে যে যেন টিপু বলে দিতে পারে দ্বীপে ক'টা দারুচিনিগাছ আছে।

দারুচিনিগাছ কথাটা ভাবতে ইরার খুব ভাল লাগে। টিপুই দুষ্টুমি করে বলেছিল, একেবারে সবুজ ঘাসে দারুচিনি দ্বীপের মতো। টিপু বলেছিল, কেমন জীবনানন্দ জীবনানন্দ ব্যাপার তোমার গোটা দ্বীপটাতে। ভারি রোমান্টিক। এসময় পৃথিবীতে আর কোনো কবিকে আমার মনে করতে ইচ্ছে হয় না ইরা।—ওর সুন্দর কথাগুলো আমার ভাল লাগে।

ইরা বলেছিল, আমারও।

টিপু ফের ওপরে এনে উল্টেপাল্টে ধরে বলেছিল, তোমারও! কি যে ভাল লাগছে না!

—কোন্টা?

—কোন্টা আবার! টিপু ইরার শরীরে ডুবে যেতে যেতে বলেছিল।

ইরা চোখ বুজে বলেছিল, কবিতা না আমি!

—তুমি!

—সত্যি!

—সত্যি ইরা।

—আমার আর কিছু লাগে না। গলা বুজে আসছে ইরার, চোখ বুজতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঘুম ঘুম ভাবের ভিতরে কি যে মহিমা। সুষমায় ভরা স্বপ্নের মতো টিপু তখন কি কেবল করে যাচ্ছিল।

সুতরাং ইরা স্নান সেরেও কবিতার মতো এই একমাসের স্বপ্ন ভুলতে পারছিল না।

সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে ডাকল, কে আছিস!

ক্যান্টিন থেকে একটা মুখ জানলায় ঝুঁকে বলল, আমাকে?

—তোদের কি আছে?

—মাংস আছে। মেটের ঝোল আছে। ডাল, আলু পটলের ডালনা।

মেটের ঝোল ভাত। আর কিছু না।

টেবিলে খেতে বসে তার কেমন একা একা লাগল। পাশের ঘরে থাকে রমা, নীলু। ওরা বলল, কিরে ইরা, মেসোর বাড়িতে কেমন কাটল।

—খুব ভাল।

—তোকে খুব রোগা লাগছে।

—রোগা লাগবে কেন?

—মনে হয় অনেকদিন না ঘুমিয়ে আছিস!

—নিজের জায়গা ছেড়ে কোথায় কার ভাল ঘুম হয় বল!

ওরা পাশে বসেছিল। গল্প করছিল। ইরা একেবারে যেন সত্যি মেসোর বাড়ি বেড়িয়ে এসেছে। কথাবার্তায় এত বেশী ঠিকঠাক যে ওরা বুঝতেই পারল না, ইরা জীবনের একটা বড় কাজ সেরে এসেছে। যা এতদিন স্বপ্ন ছিল, একেবারে তা সত্য হয়ে গেছে।

রমা বলল, তোর মাসি তোকে খুব আদর যত্ন করল।

—খু-উ-ব।

—আমাদের নিয়ে গেলে পারতিস। মুখ বদলে আসতে পারতাম। একঘেয়ে কাজ, কোথাও যাবার জায়গা নেই।

—যাবার জায়গা করে নিলেই হয়!

—হ্যাঁরে তোর সেই ভালবাসার মানুষটির খবর কি রে?

—কি করে জানব? একমাস কোনো খোঁজ নেই। ফোন টোন করেছিল!

—না তো। নীলুর দিকে তাকিয়ে রমা বলল, করেছিল নাকি রে?

—না তো। করলে কেউ না কেউ বলত।

ওরা হয়তো আরও কিছুক্ষণ গল্প করত। কোথায় কি সে দেখল, রাস্তায় ট্রেনে ভিড় কেমন, কোনো রোমান্টিক ঘটনা যদি থাকে—না, এসব কিছুই ওরা বলল না। আসলে ইরা উৎসাহ পাচ্ছিল না।

কারণ ইরা এখন ঘুমোবে। হাতে আর একদিন ছুটি আছে। আজ বিকেলে, রাতে, কাল সারাদিন, এবং রাতে কেবল ঘুমোবে।

সে খেয়ে উঠে মুখে সামান্য সুপুরির কুচি ফেলে, একটা গল্পের বই নিয়ে শোবে ভাবল। বই পড়লে তাড়াতাড়ি ঘুম চলে আসে। ঘরের চারপাশে ধুলো এবং টেবিলে দেখল, দুটো শুকনো গোলাপ। সে ভাবল, ঘুমিয়ে নেবে, তারপর হাত লাগাবে। যে মেয়েটা কাজ করে, সে আসবে সকালে। ইচ্ছে করলে চাবি দিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওর ইচ্ছে নয়, ও না থাকলে ওর ঘরে কেউ ঢুকুক। টিপু মাঝে মাঝে সুন্দর চিঠি লিখত। চিঠিগুলো সে বার বার পড়তে ভালবাসে। চিঠিগুলো অনেক সময় সে বালিশের নিচেই রেখে দেয়। হাত দিলেই যেন পাওয়া যায় এমনভাবে রেখে দেয়। তারপর অনেক সময় তার ঠিকঠাক থাকে না, চিঠিগুলো সে একে একে কোথায় যে রেখে দেয়, এখানে সেখানে, এ-ছাড়া তার কিছু ছবি দু'জনে তোলা। ঐসবও খুব ভালভাবে রাখা হয় না। তোষকের নিচে সে রেখে দেয়। সে চায় না, তার এমন সুন্দর প্রেম অন্য কেউ জেনে ফেলুক। দশজন জেনে ফেললেই কেমন ব্যাপারটা ভীষণ হালকা হয়ে যায়। সে সেজন্য চাবি দিয়ে যায়নি। তাছাড়া ওর সায়া ব্লাউজের হিসাবও ঠিক থাকে না। একটা দুটো কমে গেলে সে তখুনি বুঝতে পারে না। একেবারে নাও বুঝতে পারে। নানা কারণেই সে তার ঘরের চাবি ওকে দিয়ে যেতে পারেনি। বন্ধুদেরও না, কারণ ওদের স্বভাব খুব খারাপ। ওর সব গোপন খবর বের করে ফেলে—নানাভাবে ঠাট্টা তামাসা করতে পারে। বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাসা ওর ঠিক সহ্য হয় না। এমনিতেই টিপু ওর সমবয়সী বলে, একটা চালু ঠাট্টা ওরা জিইয়ে রেখেছে। টিপুকে ওরা সব সময় খুব নাবালক ভেবে থাকে। তা নাবালকই বটে। কিছুই বুঝতে চায় না। সময় অসময় বোঝে না। এমন নাবালকের পাল্লায় পড়লে তোমরা যে কি করতে!

সে ঘুমোবে বলে, একটা হালকা চাদর কোমর পর্যন্ত টেনে দিল। ফ্যান ফুল স্পিডে চালিয়ে দিল। কারণ মাথার কাছে জানলা খোলা। সে ঘুমিয়ে পড়লে সায়া শাড়ি ঠিক থাকে না। তখন চাদরটাই সবরকমের লজ্জা নিবারণের কাজ করে।

ইরা এবার পাশ ফিরে শুল। ঘুমোবার চেষ্টা করল।

টিপু দেখল, চন্দন ঘুমোচ্ছে না। সে দরজা বন্ধ করে রেখেছে। চন্দনকে বার বার পাশে শুইয়ে গল্প শুনিয়েছে, তবু কি যে ছেলেটা ঘুমোতে চায় না। এমন কোনোদিন করে না, অনেকদিন পর ওকে পেয়ে ঘুমোতে চাইছে না। ওর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে এবং এক সময় সত্যি সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর চন্দনের তখন দুষ্টুমি বেড়ে যায়। সে খাট থেকে নেমে জানলায়, কাকার টেবিলে নানারকমের বই অথবা যেখানে যা কিছু আছে, হাঁটকাতে ভালবাসে। ঘুম ভেঙে গেলে টিপু দেখল, চন্দন ওর পাশে ঘুমিয়ে আছে। জামায়, হাতে মুখে বিচিত্র ছবি। কালি মেখে ছেলেটা ভূত সেজে আছে। মেঝেতে কি সব কাণ্ড ফাণ্ড করেছে। এবং এক সময় ক্লান্ত হলে ওর পাশে শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে।

সে দরজা খুলে ডাকল, বৌদি দ্যাখো তোমার ছেলে কি করেছে।

নমিতা এসে দেখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না।

টিপু বলল, ক'দিন ছিলাম না এতেই বাবু ফায়ার।

—তাই দেখছি।

তখন চন্দন ঘুমোচ্ছে, ওর চুল বড়, চোখ বড় বড়, মায়াবী মুখ। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, বয়সানুযায়ী লম্বা হয়েছে। দু-বছরের ছেলেকে চার বছরের মনে হয়। এবং ঘুমিয়ে থাকলে মায়াবী মুখে কোনো দুষ্টুমি ধরা যায় না।

রাতে খেতে বসে দাদা বলল, তোরা কোথায় কোথায় গেলি!

টিপুর অনেক জায়গা ঘোরা আছে। সে বলল, সে অনেক জায়গা। ওদিকে নেতারহাট পর্যন্ত। হুড্রোতেও গেছি। রাঁচিতে ছিলাম তিন-চারদিন। রামগড়ে আমার এক বন্ধুর মামা থাকে। রামগড় ক্যান্টনমেন্টে ভদ্রলোক থাকেন। মিলিটারির বড় অফিসার। ওদের সঙ্গেই আমরা শিকারে গেলাম। কাছেই তোমার একটা বড় পাহাড় আছে। কিছু কোলিয়ারি। আমরা গেছিলাম নেকড়ে শিকার করতে।

—ওদিকটায় নেকড়ে কোথায়!

—মাঝে মাঝে আসে। টিপু নেকড়ের কথা না বললেই পারত। এত চটপট মিথ্যা কথা বললে যা হয়। শিগ্‌গিরই তাকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হবে। না হলে শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারি। বুঝলে দাদা, রাস্তায় এই হাজারিবাগের ন্যাশনেল ফরেস্টে ঢোকার মুখে, কি যে হয়ে গেছিল না। ভাগ্যিস পাশের জমিতে গাড়ি নামিয়ে দিয়েছিলাম। একটা ট্রাক আসছে, দুটো লোককে চাপা দিয়ে সব উড়িয়ে-টুড়িয়ে নিয়ে যাবে যেন।

বাবা বললেন, রাস্তাঘাটে চলা যায় না আজকাল।

একটা লম্বা টেবিল। তিনজন ওরা খেতে বসেছে। বাবা এবং সে আর দাদা। আর সে মুখোমুখি। বাবা একপাশে তার, উল্টোদিকে মা বসে আছে। কার কি দরকার, অথবা কি করে ছেলেদের এবং বুড়ো মানুষটিকে আরও একটু বেশী খাওয়ানো যায়। এই যে এদিকে বৌমা। তখন টিপুর দাদা অরূপ বলল, চিফ্ ইনসপেক্টর অফিস থেকে একটা কড়া নোটিশ এসেছে। তুই নেই বলে জবাব দিইনি।

টিপু জানে দাদা বেশীক্ষণ ওর সঙ্গে বেড়ানোর গল্প করবে না। বরং দাদা এই যে একটু করেছে এতেই সে অবাক। সে জানত, সে না থাকলে তার দাদার কি কি অসুবিধা হয়েছে সব খেতে বসে বলবে। সেও একটু সিরিয়াস কথাবার্তা বলতে চাইল, যেন সবাইকে দেখাতে চায়, বেড়ালে কি হবে, সবসময় মাথার ভিতর কারখানা, এবং যতটা না আগ্রহ দেখায় সাধারণ সময়ে সে তার চেয়ে অনেক বেশী আগ্রহ দেখাল। কারণ দাদাকে বাবাকে সে বুঝতে দিতে চায় না, সে খারাপ ছেলে, সে চুরি করে এমন একটা কাজ করে ফেলেছে যে, কেউ করে না যেন। এখন সে ভাল ছেলের মতো, খুব বিনয়ী, এবং বেড়িয়ে এসে আরও বিনয়ী হয়ে গেছে, যেন এক্ষুনি যদি বৌদি বলে, এই টিপু যাবে একটু আমাদের বাড়ি, আমাকে নিয়ে যাবে, টিপু রাজি হয়ে যাবে। গাড়িতে নিয়ে যেতে হবে, নিয়ে আসতে হবে। অন্য সময় হলে টিপু খেঁকিয়ে উঠত, কি দরকার এই রাতে, তোমাদের সারাদিন মনে পড়ে না! টিপু বলল, দাদা ইণ্ডিয়া মেডিসিনের নতুন প্লেটটা হয়ে গেছে!

অরূপ ঠিক বলতে পারল না—তোর কি ডিরেকসান ছিল?

—আমি তো চন্দ্রবাবুকে বলেছি ওদের কনটেনারের খুব ক্রাইসিস। তার ওপর নতুন প্রডাক্ট বাজারে ছাড়ছে। ফিরে এসে যেন দেখি প্লেট রেডি।

—তা করে রেখেছে মনে হয়।

—তোমার সঙ্গে অবিনাশবাবু দেখা করেছিল?

—দেখা করেছে! কিন্তু খুব সেয়ানা! একটা পয়সাও ঠেকায়নি।

—অবিনাশবাবু কিন্তু মেটাল কনটেনার থেকে মাল নিচ্ছে জানি।

—ঐটাই তো ভয়ের। এবং এমন সব কথাবার্তা, যেমন, বোনাসের দাবিতে ইউনিয়ন থেকে ওদের সেক্রেটারী এসেছিল কি না। যেমন, সেকেণ্ড কোয়ার্টারের সেলস্ ট্যাকস্ জমা গেছে কি না! এ-সব কথাবার্তায় টিপু এমন একটা ভাব দেখাল যেন বেড়াতে গিয়েও তার চোখে কারখানার চিন্তায় ঘুম ছিল না।

টিপুর বাবা মোহনবাবুর কাছে ছেলেদের এমন আগ্রহ এবং চিন্তা দুই বড় সুখের। তিনি এমন চেয়েছিলেন। তিনি মাথায় করে টিন প্লেট নিয়ে যেতেন কালার প্রিন্টিং-এ, সেখান থেকে ছেপে আনতেন এবং ব্যানার্জিবাবু তাঁকে ছেপে দিত, তারপর যুদ্ধ, তারপর টিনের দাম রাতারাতি আকাশছোঁয়া, তখন কোটা মিলে গেছে তাঁর। নিজের পরিশ্রমে তিনি এই বিরাট বাড়ি এবং কারখানা ছেলেদের জন্য করেছেন। খুব সৎভাবে যে কাজটা করেছেন তা ঠিক না, কিছুটা এদিকে ওদিক ছিল, ব্যবসায় এটা হয়, এটাতে কোনো পাপ নেই। এবং এভাবে মোহনবাবু দুই ছেলের জন্য যেন কোনো ভাবনা রেখে গেলেন না। ছেলেটা এ-কদিন বাইরে ছিল, এটাই ছিল ভাবনার কারণ। আজ আসায় খুব যেন নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সংসারে কোথাও দুঃখ নেই। তিনি নিজেও ধর্মাধর্মে এখন মেতে আছেন। যেমন তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ বিকেলে শুনতে যান। সকালে চণ্ডীপাঠ করেন স্নান করে। তাঁর ধারণা, সংসারকে তিনি এ-ভাবে নিষ্পাপের ভিতর রেখে যাচ্ছেন। তাঁর ঈশ্বর এদের জন্য ভাববেন। খেয়ে ওঠার সময় তিনি বললেন, ধার বাকির কারবারে যাবে না। আমি অনেক ঠকেছি।

এসব কথাবার্তা, সবটাই বাইরের মক্কেলের মতো। তিনি কিছুই দেখেন না। আগে লাভ-লোকসান দেখতেন। দু'বছর হল তাও দেখেন না। বাড়িতে ব্যালেন্স সীট এনে অরূপ প্রথমে বাবাকেই দেখাবে—কিন্তু বাবা যেন কেমন উদাসীন, সবই রেখে গেছেন, এখন তাঁর এ-সবে কাজ নেই, তিনি মুখের ওপর অরূপকে বলেন না কিছু, রেখে দাও দেখব। পরে ব্যালেন্স সীট প্রসঙ্গ এলে শুধু বলা, ভালই হয়েছে। কি বল! অথচ আজ খেয়ে ওঠার সময় তাঁর কেন যেন ভাবনা হল। তবু সবকিছু সাময়িক ভেবে তিনি উঠে যাবার সময় বললেন, টিপু তুমি অফিস থেকে কাল একটু তাড়াতাড়ি আসবে। বারাসতে যাব ভাবছি। তোমার মাও যাবে।

—কখন ফিরবে?

—সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসব।

—আর একটু সকালে ফিরতে পার না।

—তুই অফিস থেকে যদি দুটোয় কি তিনটেয় আসিস তবে হয়ে যেতে পারে।

টিপু তো বলতে পারে না, কাল বিকেলে ইরা এবং সে, সুন্দর এক পৃথিবীর মানুষ তারা, কাল সন্ধ্যায় ইরা সেজেগুজে থাকবে, টিপু গেলে সেই নিরিবিলি কোয়ার্টারে কিছুক্ষণ, তারপর থিয়েটার দেখা, রাত করে ফেরা, পাশাপাশি বসে থাকলে কি যে লাগে! সে বলল, আমি কিন্তু বেশী দেরি করতে পারব না। সন্ধ্যায় খুব জরুরী কাজ আছে।

খেয়ে দেয়ে ঘরে ঢুকে যাবার আগে নিচে বসেই ফোন করল টিপু, হ্যালো!

—কে?

—একটু ইরাকে দেবেন?

ইরা ফোন ধরলে বলল, এই।

ইরা বলল, এই।

—কি করছ!

—ঘুমোচ্ছিলাম।

—খাওয়া হয়ে গেছে?

—না।

—ঘুমোচ্ছ যে।

—বিকেল থেকেই ঘুমোচ্ছি। কি ঘুম!

—কাল সন্ধ্যায় যাব।

—এত দেরি করে?

—বাবা মাকে একটু বারাসতে নিয়ে যেতে হবে।

—আমি কি একা একা বসে থাকব?

—খুব তাড়াতাড়ি ফিরব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

—তুমি না গেলে হয় না!

—অসুবিধা আছে।

—বলেছ?

—কি?

—আমাদের কথা?

—বলব। তুমি চিঠি লিখেছ!

—কাল লিখব।

—তোমার বাবা মার অমত হবে না তো?

—কেন হবে!

—আমাকে তোমার বাবা মার পছন্দ নাও হতে পারে।

—খুব বেশী হবে। ওঁরা খুশি হবেন।

—কি মজা হবে না।

—খু-উ-ব। রাতে আমার ভাল ঘুম হবে না।
—খু-উ-ব হবে।
—স্বপ্নে বোধহয় সারারাত তোমাকেই দেখব।
—আমিও স্বপ্নে...।

সাত

টিপু ফেরার পথে বলল, তোমাদের নিয়ে আর আসছি তো আমার নাম টিপু না। বাবা হেসে বললেন, কেন কি হয়েছে?

—কি আবার হবে! আমার কত কাজ! তোমরা এখানেই ছ'টা বাজিয়ে দিলে। টিপু ঘড়িতে সময় দেখে মুখ গোমড়া করে ফেলল।

মা আর বাবা পেছনের সিটে। চন্দন গাড়িতে চড়লেই দু'হাত ঘুরিয়ে রাস্তার দু-পাশে যা কিছু আছে সবার সঙ্গে খেলা, কথা বলা, এবং সে এভাবে যখন নিজের জগৎ তৈরি করে ফেলে তখন টিপু কেবল গজ গজ করছিল। বাবা জানেন, ওর এই স্বভাব। সে কিছুতেই রাগ ভিতরে পুষে রাখতে পারে না। কিন্তু ওঁর বড় ছেলে ঠিক অন্য রকমের। সে যতই রাগ করুক, কিছুতেই বোঝা যাবে না। রাগ হলে বড় ছেলে শুধু কথা কম বলবে।

মা বললেন, তোর যে কি এত কাজ বুঝি না।

—তোমরা কি বুঝবে! তোমাদের তো ভাবতে হয় না কিছু। সে খুব গম্ভীর গলায় কথা বলে যাচ্ছিল। আর গাড়ি চালাচ্ছিল।

টিপু খুব আদরে আদরে মানুষ বলে সে এভাবেই কথা বলে থাকে। সে খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছে। সে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই সেখানে চলে যাবে। কি জানি ভাবছে ইরা। একটা ফোন পর্যন্ত করতে পারল না। ওখান থেকে সে যদি বলতে পারত, ইরা আমার সামান্য দেরি হবে, তুমি কিছু ভেব না। ওর মেসোরা বেশ বড় মানুষ বারাসতে অথচ বাড়িতে ফোন নেই। যে-সব মানুষদের ফোন থাকে না, সে তাদের কেমন রাম, শ্যাম, যদু, মধু ভেবে ফেলে। সে নিজের ওপরেও কম বিরক্ত হচ্ছিল না। সে যদি বলত, যেতে পারবে না, বাবা তবে ঠিক অন্য ব্যবস্থা করে নিতেন। তাকে বাবা বলতেন দুবার, তিনবার, তারপর তিনি বড় ছেলেকেই বলতেন। বড় নিজে না আসতে পারলেও অফিস থেকে মাধবকে পাঠিয়ে দিত। আসলে সে মনে মনে কিছু একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে ভাবে। ভিতরে ভিতরে সামান্য অপরাধবোধ কাজ করছিল। সে যেন বাবা মার একান্ত বাধ্যের সন্তান। কিছুটা সে হয়তো আনন্দে অথবা এতদিন ইরাকে সময় দেওয়া গেল এই ভেবে এবার বাবা মার সুবোধ ছেলে হয়ে থাকা কিছুদিন। আর সেজন্যই সে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গেছিল।

তখনই বাবা বললেন, কিরে গাড়ি এত জোরে চালাচ্ছিস কেন!

টিপু স্পিডোমিটারের কাঁটা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। আসলে সে মনে মনে এখন ইরার কাছে উড়ে যেতে চাইছে। ওর হাত পা যেন পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছে। এবং গাড়িটাকে সে নিজের আত্মার মতো ভেবে নিয়েছে। সে তার দুই হাত, স্টিয়ারিং এবং গাড়িটা, সব মিলে এক কঠিন যাত্রা। সে পারলে এখন হাওয়ার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়—ভয় পাচ্ছে পাক। কেবল চন্দন কাকার এমন জোরে গাড়ি চালানো দেখে চারপাশের সব কিছু, যেমন গাছপালা, সবুজ মাঠ, এবং পাখিদের উড়ে যাওয়া দেখতে দেখতে হাত ঘোরাচ্ছে তেমনি—এই আছে এই নেই খেলা, ঘুরে ঘুরে কখনও কাচে মুখ লাগিয়ে এই আছে এই নেই খেলা—এভাবে এক খেলা জমে গেলে কথা থাকে না আর। চন্দন যে কি সুন্দর জামা গায়ে দিয়েছে এবং বাবা জানেন, টিপু রেগে গেলে একমাত্র চন্দনই টিপুকে ঠাণ্ডা করতে পারে। তিনি চন্দনকে টিপুর পাশে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলে বসবে কেন, সে কাকার গলা জড়িয়ে নীল ল্যাম্প-পোস্ট, লাল কুঠি, রঙ-বেরঙের বাড়ি দু'পাশে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখছে। ক্রমে কেমন সব দু-পাশে ঝিক্ ঝিক্, ক্রমে কেমন দু-পাশে অবিরল ধারায় প্রপাতের জল নেমে যাবার মতো ক্রমশ সব কিছু দৃশ্যমান হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ আর অজস্র কথা কাকার সঙ্গে। টিপু কোনোটার জবাব দিচ্ছে, কোনোটার দিচ্ছে না, বেশী বিরক্ত করলে ধমক

দিচ্ছে আর এইভাবে যেতে যেতে আঁধার রাতের ভিতর অর্থাৎ ওরা বুঝতে পারছে না, সাদা রঙের সব নিয়ন আলো মাথার ওপর, কি যে হয়ে যায়, বড় রাস্তা দু-পাশে আপ-ডাউন, মাঝখানে সুন্দর সব ফুলের বাগান, লম্বা শাড়ির পাড়ের মতো সবুজ ঘাসের মাঠ অবিরল নেমে যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, তারপরই জোরে সোঁ করে টিপু স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতেই সামনে একটা সাইকেল, আর মুহূর্তের ভিতর কি যে হয়ে যায়, সাইকেলটা মনে হল একটা গোত্তা খেয়ে কোনোদিকে ছিটকে পড়েছে, আরও জোরে ব্রেক কষতে কষতে তার মাথটা কেমন করে উঠছে, আর দুধারে সেই প্রপাতের জলের মতো কেবল নেমে যাচ্ছে, যাচ্ছে—সে আর পারছে না,বাবা চিৎকার করে উঠলেন, মা চিৎকার করে উঠলেন, চন্দন কাকার গলা আরও জড়িয়ে ধরল—এবং ক্রমে এক খেলা, এই আছে এই নেই খেলা , তারপর কাত হয়ে পড়ে একটা বিকট চিৎকার, যেন হাজার হাজার মোষের শব্দের মতো। মাথার ভিতরে টিপুর কি হচ্ছে, টিপু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

ইরার মনে হল, ওর তো আসার সময় পার হয়ে গেছে। সে যে এত সেজেগুজে বসে থাকল, সেই বিকেল থেকে সে যেন নিজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেজে গেছে, কারণ টিপু সন্ধ্যার আগেই আসবে। টিপুর জন্য কেন যে ভিতরে এমন হয়—কিছুদিন আগেও টিপু বলে পৃথিবীতে কেউ আছে বলে তার জানা ছিল না। এবং তার তখন মনে হত, তার শৈশবে টিপু কোথায় ছিল, সে তখন ফ্রক গায়ে দিয়ে তিস্তার পাড়ে পাড়ে হেঁটে যেত, তখন টিপু কোথায় ছিল, এবং সে নানাভাবে প্রশ্ন করে জেনেছে টিপু তখন খেলার মাঠে নীল রঙের জার্সি গায়। বলেছে তুমি যখন ইরা, সেজে দু বেণী বেঁধে, হলুদ রঙের প্রজাপতি আঁকা ফ্রক গায়ে নদীর পাড়ে হেঁটে বেড়াও, তখন আমার পায়ের বল কত উঁচুতে! ইরা, অনেক উঁচুতে উঠে উঠে আর যেন পড়তে চাইত না! বাতাসে স্থির হয়ে থাকত। আমি তখন টিপু, বালক সংঘের সবচেয়ে জাঁদরেল ফুটবলার।

ইরা যে কি করবে ভেবে পেল না। আসলে এই হয়, কথা ঠিক থাকে না। ইরা আবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পাফে পাউডার বুলাল। সে পরেছে নতুন মীনাকরা জর্জেট। সোনালী রুপোলী চাঁদমালা চারপাশে ছড়িয়ে আছে। সে সেই বিকেল থেকে সাজছিল, আর গুন গুন করে গান গাইছিল।

যা হয়ে থাকে, গান গাইছিল আর মাঝে মাঝে জানলায় এসে দাঁড়াচ্ছিল, সে যদি চলে আসে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসার কথা। তবু কেন সেই চারটা থেকে, ঠিক চারটা বলা যাবে না, যেন সেই সকাল থেকে এবং সব সময়ে মনে হয়েছে, টিপুর কোনো ঠিকঠাক নেই, সে বলবে একরকম, কাজ করবে অন্যরকম। সে হয়তো সকালেই চলে আসবে, ইরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই জানলায় দাঁড়ালে টের পেয়েছিল, কার যেন আসার কথা আছে, সে আসবে, সে আসবে বলেই এত বেশী জানলায় দাঁড়িয়ে থাকা, অথচ কিছুদিন আগেও এ-জানলাটা ছিল তার কাছে অর্থহীন। মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয়েছে, সে শাড়ি পাল্টাচ্ছে, ঘরে সে একা থাকে, শাড়ি পাল্টাতে ক্ষতি কি, কিন্তু তখনই দেখেছে ওর জানলার একটা পাট খোলা, পথের ও-পাশ থেকে কেউ যেন ওকে দেখছে, এবং তার মনে হয়েছে তাকে বিরক্ত করছে, প্রায় সময় সে-জন্য সে জানলা বন্ধ রাখত। কিন্তু এখন সেই যে সকালে হাট করে খুলে রাখে, এবং পর্দা একপাশে সরিয়ে রাখে, যেন পর্দা থাকলে ওর চোখ সবসময় ততদূর যায় না—সে তো অনেক দূর থেকে টিপু আসছে দেখতে চায়, আর তার জন্য সে যেন ভিতরে ভিতরে এক মায়াবী সৌন্দর্যে ডুবে যায়, টিপুর গাড়ি বড় ধীরে ধীরে এ-পথটা ধরে আসে। ওর এই দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে টিপু হাসপাতালে ঢুকেই স্পীড একেবারে কমিয়ে দেয়, পাশেই মেডিসিন-ওয়ার্ড। ইরা দূর থেকেও ধরতে পারে, রোগশয্যায় শায়িত অসুস্থ রুগ্ন মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে টিপুর উজ্জ্বল সুন্দর হাসি খুশি মুখ কেমন নিমেষে দুঃখী মুখ হয়ে যায়।

ইরা জানে, টিপু হাসপাতালে আসতে বেশী পছন্দ করে না। টিপু বলে কেমন একটা ডেটল ডেটল গন্ধ চারপাশে, কেবল চারপাশে দুঃখী মানুষের ভিড়, সে যেন এখানে না এলে বুঝতে পারত না, মানুষেরা এত বেশী সংখ্যায় অসুস্থ। টিপুর মনে হত, হাসপাতালে এলেই মনে হত, পৃথিবীতে সুস্থ মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ওর কেবল ইচ্ছে হত কবে সে ইরাকে এমন একটা অসুস্থ জায়গা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবে।

ইরা কখনও হাসত ওর কথা শুনে, কখনও চুপচাপ থাকত। আবার হয়তো বলত ইরা, তুমি তো জান না টিপু, এমন পবিত্র জায়গা আর কোথায় আছে! দুঃখী মানুষেরা এখানে এলেই ভাবে ভাল হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, কত স্বপ্ন ওদের। মরে যাবে তবু স্বপ্ন দেখার শেষ নেই। ভাল হয়ে ফিরে গেলেই সে আবার ফুলের বাগান করবে ভাবছে।

ওর দুটো গোলাপ থাকে, গোলাপ দুটো ফুলদানিতে কি সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে! ঘরের কোথাও এতটুকু আজকে অযত্নের ছাপ নেই। বান্ধবীরা এসে কেউ ডেকে গেছে, ইরা বাইরে যাবে কি না, সে বলেছে, না! কেউ বলেছে, কেন রে? বেড়িয়ে এসে তোর মেজাজ দেখছি কেমন বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। ঘর থেকে একেবারেই বের হতে চাস না।

ইরা তো বলতে পারে না, তার আসার কথা আছে। ওর আসার কথা শুনলেই কেউ কেউ আর বেড়াতে বের হতে নাও পারে। একটু দুষ্টুমি করতে পারে ওদের সঙ্গে। টিপু এতে ভারি লজ্জা পায়। এখন তো টিপু ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। সে এসেই কি জানি না করে ফেলে। পর্দা ফেলে দিলে, এদিকের ঘরটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। কেউ এলে তখন টের পাওয়া যায়, করিডোরে পায়ের শব্দে টের পাওয়া যায় সব। এবং টিপু তখন নিশ্চয়ই সুবোধ বালক হয়ে যাবে। দুষ্টুমি করবে না। সে যে কত ভাবে সেই সকাল থেকে টিপুকে ভেবে আসছে। বৌদি আবার টের পায়নি তো! হয়তো ভাবছে কি ব্যাপার, তোমার কোনো পাত্তা নেই, টিপুবাবু বেড়াতে গেল, তুমিও আর খোঁজ খবর করলে না। ভাগ্যিস বুদ্ধিমতীর মতো ওর হোস্টেলে ফোন করেনি। করলে তো বলত বান্ধবীরা, ইরা বেড়াতে গেছে! বৌদি হয়তো বুঝতে পারত সব।

সারাটাদিন এভাবেই গেছে। নানারকম ভাবনা। কাল থেকে আবার ওয়ার্ডে ডিউটি। প্রফেসার দত্ত কাল এগারোটায় ওটিতে আসছেন। ওঁর সঙ্গে ওটিতে থাকতে হবে। এবং সে চার্জ কাল বুঝে নেবে। যদিও সে এসব ভাবনা খুব একটা ভাবেনি, তবু মাঝে মাঝেই এমন যেন মনে হয়েছে, টিপু আসলে তার শরীরের রহস্য ভালভাবে জেনে ফেলেছে। সে যদিও নাও আসে আর কিছু করতে পারে না ইরা। ইরার কেমন এসময় অভিমান হয়।

সে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল মেটারনিটির বড় বাড়িটার মাথায় দুটো একটা নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। সে ঘরে তার সবুজ আলোটি জ্বালিয়ে বসে রয়েছে। সে তার সবচেয়ে দামী শাড়ি পরে বসে আছে। বিছানায় বড় চাদর পেতেছে। কি সাদা আর নরম বিছানা। সে অজ্ঞাতেই হাত বুলিয়ে যাচ্ছে বিছানাতে। সে কেমন বালিকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, ক্রমে ওর যেন দু-ঠোঁট ভেঙ্গে আসছে। বালিকার মতো কান্না পাচ্ছে। টিপু এল না। সন্ধ্যা হয়ে গেল টিপু এল না। সে ফোন করে জানতে পারে, ফোন করলেই বৌদি অথবা বাবা ধরবেন, সে কি বলবে, সে কি বলতে পারে, টিপুর আসার কথা ছিল, আসেনি, সে কখন আসবে! সে তো বলতে পারে না, একটু টিপুকে দেবেন, আমি ইরা বলছি। ওদের সম্পর্কের কিছু কিছু কথা বাড়ির সবাই বোধহয় টের পেয়ে গেছে। সে টিপুকে ফোন করতে ভীষণ লজ্জা পায়। বরং ফোন যা করার টিপুই করে থাকে। সে কখনও করে না। করলেও শুধু বৌদিকে। বৌদি, আমি ইরা বলছি, কেমন আছেন। চন্দন কি করছে! আপনার দেওরটি তো এখানে এলে সারক্ষণ চন্দনের কথা। পৃথিবীতে ওর চন্দন বাদে আর কেউ নেই।

বৌদি হয়তো বুঝতে পারে আসলে এই যেসব কথা ইরা আরম্ভ করেছে, এসব কথা অর্থহীন। ইরা শুধু একজনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে তখন বলে, ও আসছে। তুমি ধরো। কি করে যে বৌদি সব টের পেয়ে যায়। ইরা তখন বলতে পারে না, না না বৌদি আমি আপনাকেই ফোন করেছিলাম। ওকে করিনি। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। কখন তার নিজের মানুষটি বলবে, এই!

—এই!

—কেমন আছ?

—ভাল না।

—কেন?

—কেন আবার কি। বুঝতে পারছ না।

—না, বুঝতে পারছি না।

—ঠিক আছে বুঝতে হবে না।

তারপর দুজনেই হা হা করে হেসে উঠবে।

তখন কে বলবে ইরা আর টিপু আত্মীয় নয়। এসব নিবিড় কথাবার্তা যেন ওদেরই মানায়। বৌদি হয়তো আধঘণ্টা পরে এসেও দেখতে পায় নিবিষ্ট মনে টিপু কথা বলে যাচ্ছে। বৌদি কিছু বলে না তখন।

এসব টিপুই ইরাকে বলেছে। বলেছে, বুঝলে ইরা, আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

ইরা চুপচাপ শুয়ে পড়ল। কিছু ভাল লাগছে না। সে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। ওর অভিমান ক্রমে বাড়ছে। সে দুবার ফোন করবে বলে করিডোরে গেছে। কিন্তু পারেনি। সে ভেবেছে একা আমারই সব ইচ্ছে, তোমার কিছু নেই? অথবা সে ভেবেছিল, ফোন করলে টিপুর কাছে ছোট হয়ে যাবে। তার দাম কমে যাবে। মনে মনে সে বলল, তুমি আমাকে অবহেলা করলে আমিও অবহেলা দেখাতে পারি। একা আমার চোখে ঘুম থাকবে না, এটা তুমি ভাববে না টিপু।

তবু কি যে হয়ে যায়। সে বেশীক্ষণ বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে না। ঘড়িতে এখন সাতটা বেজে ত্রিশ। হাসপাতালের চারপাশে অজস্র আলো, আরও সব নক্ষত্র ক্রমে ফুটে উঠেছে। ওর ভিতরে তখন কি যে জ্বালা, সে নিজের ভেতরে দুঃখ অভিমানে গুমরে গুমরে মরছে। তবু ছায়ার মতো জানলায় আবার দাঁড়িয়ে থাকল। চোখ টাটাচ্ছে। টিপু এ-ভাবে তাকে দুদিন যেতে না যেতেই ভুলে যাবে সে বিশ্বাস করতে পারল না। সে কেবল ভাবছে, এই এখুনি টিপুর সাদা রঙের হেরাল্ড গাড়িটা ধীরে ধীরে উঠে আসবে।

ওর জল তেষ্টা পাচ্ছে বার বার। অকারণ জল খাচ্ছে। রাতে কি খাবে, রুটি না ভাত, সে তাও বলে পাঠাচ্ছে না। একজন সময় মতো না এলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এভাবে যে মরে যায় সে এই প্রথম তা বুঝতে পারল। যে লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চেয়েছিল, রুটি না ভাত সে তাকে বলল, আমি রাতে কিছু খাব না অমূল্য। খেতে ইচ্ছে করছে না। রাতের মিল আমার বাদ যাবে।

আর, অকারণ সে যখন এভাবে অধীর আগ্রহে পায়চারি করছে তখন মনে হল, না, শেষবারের মতো হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।

সে করিডোরে হেঁটে গেল। কিছুটা অগোছালো দেখাচ্ছে ওকে। সে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে তার সুন্দর শাড়িটা লাট করে ফেলেছে। ওর শরীরে দামী আতরের গন্ধ তেমন ফুর ফুর করছে না। দিন শেষে উৎসবের বাড়ির মতো তার পোশাক।

সে চুপচাপ একটা মোড়াতে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তবে কি ফোন করবে? যদি সে না আসে? না, যার ইচ্ছে নেই, তাকে ইরা জোর করে ডেকে আনবে না। সে ঘামছে। সে নানাভাবে ভেবে বিপর্যস্ত। শেষপর্যন্ত এই করিডোর এবং ফোন, সে প্রায় কিছুক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকল। যেন ভেবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর প্রায় লজ্জার মাথা খেয়ে সে ডায়াল করে গেল। আরে একি, কেউ ফোন ধরছে না। এমনটা তো হয় না। কেবল রিং বেজে চলেছে। এমনটা তো হবার কথা না। কেউ না কেউ বাড়িতে থাকে। রিং-এর ভেতর সে বুঝতে পারছে বাড়িটা নিঝুম। কেউ নেই। রঙ নাম্বারে ডায়াল হতে পারে। সে ফের ফোন করে দেখল তেমনি। ওর হাত কাঁপছে, কেউ ফোন তুলছে না।

সে ছেড়ে দেবে ভাবল, আর তক্ষুনি গোপালের গলা।...গোপাল কিছু বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। দিদিমণি আমাদের সব শেষ। সবাই আর.জি.করে গেছে।

যদি এসময়ে এই বড় শহরের ছবি আঁকা যায় তবে দেখা যাবে, কোথাও একজন তরুণ হাঁটছে, অথবা একা একা পালাচ্ছে সবুজ বনভূমিতে—ওর চোখে স্বপ্ন, লঙ মার্চ, ফুটপাথে কোনো গাছের নিচে অথবা খোলা আকাশের নিচে মৃত ভিখারি, ট্রামবাসে ভিড়, এইমাত্র নীলরতন হাসপাতাল থেকে দুটো মৃতদেহ নিয়ে মিছিল—এবং যুগ যুগ জিও। আরও আছে, ট্রামে বাসে মানুষ যায়, পিপীলিকার মতো মানুষ যায়, গড়ের মাঠে প্রেমিক-প্রেমিকা চুমু খেতে খেতে নক্ষত্র গোনে আকাশের, একটা ছেলে দূরের র‍্যামপার্টে চ্যারিটি খেলা দেখার জন্য সারাদিন গাছের ডালে বসেছিল, পুলিশ এসে নামিয়ে দিয়েছে, সে খেলা দেখতে পায়নি—কি যে দুঃখ তার, সে অন্ধকারে বাড়ি ফিরছে, বাবা গেলেই মারবে, তবু কেন যে সে পালিয়ে খেলা দেখতে আসে। তখন নদীতে নানাবর্ণের জাহাজ—ব্যান্ড বাজছে, বড় বড় হোটেলে সব সুন্দরীরা নাচছে, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ম্যাড হাউজে গাইছে একজন, এ-জিন্দেগী। আসলে এইসব সৌর

আবর্তনের ভিতর চারপাশের জীবন ভীষণ ছেলেমানুষী। ইরা গাড়িতে বসে বসে ভাবছিল, কি হবে, সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। সে কাঁদতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে না, দুঃখটা কত গভীর—সে কেমন বোবা হয়ে গেছে। কিভাবে কি হয়েছে সে জানে না। এখন পৃথিবীতে কত দুর্ঘটনা ঘটেছে, এখন পৃথিবীতে কত মৃত্যু হয়েছে, তার কাছে যেন একটা হিসাব আছে। মিনিটে কত জন্মাচ্ছে, মিনিটে কত মরছে। কিন্তু সে তো সবই খুব সহজভাবে দেখে থাকে—এখন এ-সময়ে সে সহজ থাকতে পারছে না কেন! হাসপাতালে দিন রাত এই মৃত্যুর খেলা, খেলার মতো, পৃথিবী থেকে একটা মানুষ শেষ হয়ে গেল, যেন এই আছে এই নেই খেলায় ইরা নিজেও এক প্রতিপক্ষ, সে তো ভেঙে পড়তে পারে না। কারণ সে তো টিপুকে গোপনে ভালবেসে গেছে। সে বলল, ঈশ্বর আমি কি করব! আমার কি হবে!

ইরা হাসপাতালের গেটে দেখল প্রচণ্ড ভিড়। সে এগুতে পারছে না। সে বলতে চাইল, কি হয়েছে বলুন। কিন্তু গলা শুকনো কাঠ। সে একটা কথাও বলতে পারছে না। দাদা-বৌদি মাসিমাকে খুঁজছে, ওরা গেল কোথায়! ওরা গেল কোথায়! সে যেন ছুটে ছুটে আর পারছে না। ওর খোঁপা খুলে গেছে। ওর পোশাক ভীষণ এলোমেলো। সে বোধহয় নিজেও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। তারপরেই মনে হল, ওর তো এভাবে বিচলিত হওয়া ঠিক না। সে তো রোজ এমন কত মৃত্যু দেখে থাকে। সে খুব সহজ ভাবে দৃশ্যটা ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে দেখার চেষ্টা করল। দৃশ্যটা সত্যি দেখা যায় না।

আট

—হ্যালো!

ইরা! ক্লান্ত গলা বৌদির।

ইরা কি বলবে ভেবে পেল না। নমিতা বৌদি ফোন ধরলেই সে কেমন মনের জোর হারিয়ে ফেলে। সে বলল, আমি বৌদি। বৌদি কিছু বলল না। সে ফের বলল, টিপু ফিরেছে?

তারপর দুজনই চুপচাপ। দুর্ঘটনার পর চার মাস হবে, ইরা দেখেছে সবাই শোক সামলে উঠেছে, এমনকি নমিতা বৌদিও। কিন্তু টিপু দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ইরা এ-চার মাস সময় পেলেই ছুটে গেছে এবং দুর্ঘটনার দিনগুলোতে সে যা করেছে ধন্যবাদ দিয়ে তা শেষ করা যায় না। হাসপাতালের এমন হেভি ডিউটির পরও সে নিজের বোনের মতো এ-বাড়িতে এসে দাদা, বৌদি এবং টিপুর দেখাশোনা করেছে। এভাবে সে এ-বাড়ির নিজের লোকের মতো হয়ে গেছিল। এমন ভয়াবহ মৃত্যুর দৃশ্য কম দেখা যায়। বাড়িটার পাশ দিয়ে যারাই যায় এখনও দেখতে ভোলে না, এ-বাড়ির ছেলে টিপু, খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল। মোড়ের মাথায় গাড়ি ঘোরাবার সময় অ্যাকসিডেন্ট। একসঙ্গে তিনজন। টিপুর বেঁচে যাওয়া ভাগ্য ছাড়া কিছু না।

ইরা বলল, কখন বের হয়েছে?

—বিকেলে।

—অফিসে আজও যায়নি!

—না।

—সকালে ফোন করলাম। বলল, যে অফিস যাবে।

—যায়নি।

ইরা কি ভাবল। সকালে সে যখন ফোন করেছিল, তখন প্রায় একটা ঝড়ের মতো ব্যাপার। ইরা কথা বলতে বলতে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, মনেই হয় না তখন সে ফোনে কথা বলছে, যেন প্রতিপক্ষ সামনে দাঁড়িয়ে। সে ইচ্ছা করলেই হুটপাট বের হয়ে যেতে পারে না। হোস্টেল ছেড়ে যেতে হলে অনেক কিছু ঠিকঠাক করে যেতে হয়। না হলে, সে টিপুর কাছেই চলে যেত। সে কতবার বলেছে, তুমি অফিসে বের হও টিপু। দেখবে, তোমার দুঃখটা ক্রমে কমে আসবে। এবং এভাবে সে দেখেছে টিপুর ভিতর এক কঠিন অপরাধবোধ এই দুর্ঘটনার জন্য, সে নিজে দায়ী ভেবেছে নিজেকে এবং ইরার দায়িত্বও কম না, তখন থেকেই ইরার মনে হয়েছে ওর নিজের সরে যাওয়া ভাল। প্রথম প্রথম সংকোচে সে টিপুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। কেন যে সে তাকে বলতে গেল, তাড়াতাড়ি ফিরবে টিপু। আমি বিকেল থেকে সেজেগুজে বসে থাকব। তুমি এলে আমার কি যে ভাল লাগবে!

ইরা বলল, কোথায় গেছে?

—জানি না। বললাম, কোথায় যাচ্ছ। এমনভাবে তাকাল, যেন আমাকে খেয়ে ফেলবে। কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

ইরা কথা বলতে বলতে নখ দেখছিল। বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুলের নখ। সে এইসব নখ দেখার ভিতর কি যেন ভেবে যায়। ও-পাশে বৌদি ফোন ধরে রেখেছে, সে ভেবে ভেবে কথা বলছে, অবশ্য ইরা জানে, বৌদি ওর দুঃখটাও ধরতে পারে। এই সংসারে ইরা সবার কাছে অপরাধী, বৌদির কাছে কেবল কোনো সংকোচ নেই। বৌদি কেমন ওকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সে এখনও একমাত্র বৌদির সঙ্গেই অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে।

ইরা বলল, আমার এক বান্ধবী একদিন ওকে নদীর পাড়ে দেখেছে।

—ফোর্টের পাশে?

—হ্যাঁ।

—ও তো ওখানে চন্দনকে নিয়ে মাঝে মাঝে যেত। অফিস থেকে এসেই চলে যেত।

ইরা ভাবল, তবে কি টিপু এখন যে যে জায়গায় চন্দনকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে-সব জায়গায় যাচ্ছে! গিয়ে বসে থাকছে!

ইরা বলল, আর কোথায় ও যায় বলতে পারেন?

—যায়। যেমন মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেত। মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে ওকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ইরা বলল, গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে?

—হ্যাঁ গাড়ি নিয়ে।

ইরা আবার নিজের হাতের নখ দেখতে দেখতে, অবশ্য ইরার এটা অভ্যাস, কোনো কথায় খুব নিমগ্ন হয়ে গেলে সে নখ না দেখে পারে না। যেন ওর এই বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে যাবতীয় নিবিষ্টতা রয়ে গেছে। সে বলল, আমাকে কিন্তু বলেছে, আজ অফিসে যাবে। অফিস থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে। কোথাও যাবে না।

নমিতা বলল, আমার এখন ওকে নিয়ে ভয়! যারা গেছে তারা আর ফিরে আসবে না। কি যে করি! গলার স্বরে ভীষণ আশঙ্কা। এবং এভাবে ইরা টের পায়, টিপুকে খুব ছোটবেলায় বৌদি এ-বাড়িতে এসে দেখেছে। টিপুর দাদার সঙ্গে ওর বয়সের তফাৎ অনেক। বৌদি টিপুর কাছে মায়ের মতো। যতদিন এ-বাড়িতে চন্দনের জন্ম হয়নি, বৌদির কাছে টিপু ছিল ছোট ছেলের মতো। সন্তানের মতো।

ইরা বলল, দাদা কিছু বলছেন না?

—কি বলবে। কিছু বললে কোনো জবাব দেয় না।

ইরার ইচ্ছে হল, এক্ষুনি চলে যায়। একটা গাড়ি নিয়ে টিপুকে খুঁজতে বের হয়। ইরা নিজেও নানা ভাবে বুঝিয়েছে, তখন টিপু চুপচাপ ইরাকে দেখেছে। এবং বেশী সময় এভাবে তাকিয়ে থাকলে ইরার কেমন ভয় হয়। তখন ইরা আর কথা বলতে পারে না। কেমন তখন গলা ধরে আসে। যেন টিপু অবলীলায় তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে করিয়ে দেয়, ইরা আমার ভিতরে যে কি হয়েছিল। সব কিছু আমি ভুলে গেছিলাম, তোমার শরীর এবং সর্বস্ব আমাকে স্রোতের কুটোর মতো তাড়িয়ে নিচ্ছিল। তুমি না থাকলে আমার এমন সর্বনাশ হত না ইরা।

ইরা তখন নিজেই চোখ নামিয়ে দিয়েছে। সে তারপর কোনো কথা না বলে উঠে পড়েছে। কিছুক্ষণ হয়তো টিপুর জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছে, সুন্দর আকাশ, কিছু মেঘ, ভেড়ার পালের মতো সাদা মেঘ, এবং শীতকাল আসবে বলে চারপাশটা কেমন ছিমছাম পরিপাটি। হেমন্তের আকাশ দেখতে দেখতে সে নিজের জন্য যত না কষ্ট পেত, টিপুর জন্য এবং দাদার জন্য কষ্ট পেত বেশী। এমন একটা সুন্দর সুস্থ সংসারে কি হয়ে গেল! বাসি বিবর্ণ, ছন্নছাড়া, বিপর্যস্ত।

বৌদি বলল, টিপু এলে তোমায় ফোন করতে বলব।

—কি হবে বলে!

—তুমি কথা বলবে!

—বলব না।

—কেন বলবে না!

—তুমি জান না বৌদি, দিন দিন আমার ওপর ও প্রতিশোধ নিচ্ছে এসব করে।

—কি বলছ ইরা!

ইরা বলল, তোমরা সব জান না বৌদি।

—জানি।

—না, জান না। সব ব্যাপরাটার জন্য আমি দায়ী!

—কি যা তা বলছ!

—তুমি বিশ্বাস করবে না হয়তো।

—আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

—তবু এটা সত্যি। এর জন্য সারাজীবন আমার অনুতাপ। জীবনেও আমার সুখ হবে না।

নমিতা ভেবে পেল না, ইরা এসব বলছে কেন? নমিতা ভাবল, হয়তো ইরা অভিমান বশে এসব বলছে। চন্দনের মৃত্যুর জন্য ইরা দায়ী হবে কেন! নমিতা মনের ভিতর দুঃখ নিয়ে বেঁচে আছে, টিপু বাড়ি না থাকলে, দুঃখ আরও বাড়ে। ইরা দুঃখটাকে আবার জাগিয়ে দিচ্ছে কেন!

ইরা বলল, ওর যদি সেদিন আমার কাছে আসার কথা না থাকত!

নমিতা হাসল। বিষণ্ণ হাসি। ওর হাসি শুনে ওটা বুঝতে পেরেছে ইরা। সে বলল, নমিতা বৌদি, আমি কি করে জানব, সে আমার কাছে আসবে বলে, এত জোরে গাড়ি চালিয়ে আসবে। দেরি হলে আমি রাগ করব ভেবে...

নমিতা কিছু বলল না। বোধহয় সে আরও কিছু শুনতে চায়।

—এতদিন বলিনি। কিন্তু এখন দেখছি, না বললে আমার কোনোদিন শান্তি হবে না।

নমিতা বলল, তুমি অমন ভাববে না। যা হবার হয়েছে। এসব যদি তুমি আবার ভাবতে শুরু কর, তবে আমি কোথায় যাব।

ইরা বুঝতে পারল, এসব বলে নমিতা বৌদির কষ্ট সে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সে আর কিছু বলতে পারল না।

নমিতা বলল, তোমার ওপর তাই এখন সব নির্ভর করছে। টিপুকে তুমি ভুল বুঝো না। ভুল বুঝলে তার আর যাবার জায়গা নেই।

—আমি জানি বৌদি। ও না বাড়ি ফিরে আসা পর্যন্ত আমার যে কি দুশ্চিন্তা।

নমিতা বুঝতে পারল, ইরা আজ নিজের দুর্বলতার কথা তাকে বলছে। আগে না বললেও নমিতা বুঝতে পারত সব। এ-চার মাসে ওরা দুজনই কথা একেবারে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। আগে ওরা কত কথা বলত। ইরা এলে টিপু প্রাণ পেয়ে যেত। যেন সমবয়সী বন্ধু এসে গেছে। কত অযথা কথা নিয়ে তর্ক চলত ওদের এবং মাঝে মাঝে নমিতাও যোগ দিয়েছে। মাঝে মাঝে তর্কে ওকে পথে টানবার চেষ্টা দুজনেই করত। নমিতা বেশীর ভাগ ইরার পক্ষে কথা বলত, টিপু ভীষণ রেগে যেত ইরার পক্ষে কথা বললে। মেয়েরা একটা বিষয়ে ভীষণ স্বার্থপর—ওরা ওদের নিজেদের ব্যথা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না।

নমিতা বলল, ও এলেই আমি তোমাকে ফোনে জানিয়ে দেব।

ইরা এখন বৌদিকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবে! নমিতা বৌদি মানুষ হিসেবে এত ভাল, এত বড় শোক সামলে এখন যাতে সংসারে ফের দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য কি না করছে! টিপুকে দেখলে সে কিছুতেই মন খারাপ করে থাকে না। ভাবতেই দেয় না, শ্বশুর-শাশুড়ি অথবা চন্দন বেঁচে নেই। সে হেসে কথা বলে, যেন এ-সংসারে এতদিন এরা তিনজনই ছিল। চন্দন বলে কেউ ছিল না। বাবা মার বয়েস হয়েছে—ওঁরা কোথাও তীর্থবাসে গেছেন।

নমিতা বৌদি নিজের দুঃখ একেবারে চেপে গেছে। কখনও ইরা টের পায় ভেতরটা হাহাকার করে উঠলে নমিতা বৌদি আড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁদে। এবং এই হাহাকার যাতে টিপুর ভিতর নতুন করে সংক্রামক ব্যাধি না হয়ে যায়, সেজন্য সে নিজে বার বার বলে, এটা আমার কপালে ছিল টিপু। তুমি কি করবে!

ইরা বলল, দাদা ফিরেছেন?

—ফিরেছে।

ইরা বুঝতে পারে টিপুদের বাড়িটা কি নিঝুম! দাদা নিশ্চয়ই পার্লারে বসে আছেন, অথবা বারান্দায় পায়চারি করছেন। টিপু যখন ফিরবে, ফিরলে ওকে হাত মুখ ধুয়ে নিতে বলবেন তাড়াতাড়ি। আশেপাশে কি ঘটছে তেমন খবর নেবেন। একসঙ্গে খেতে বসে গল্প করবেন দাদা, কারখানার কথা, সাপ্লাই দিতে পারছেন না, এ-সব নিয়ে কথা কখনও, কখনও দেশের, নানা রকমের সমস্যার কথা, কাঁচামালের অভাব নিয়ে কথাবার্তা, টিপু শুনে যাবে শুধু, কথা বলবে না।

নমিতা বলল, তাহলে ছাড়ছি ইরা।

ইরা বলল, আচ্ছা।

ইরা ফোন ছেড়ে দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকল। সে কি করবে এখন বুঝতে পারছে না। সে এখন বের হয়ে, সারা কলকাতা টিপুকে খুঁজে বেড়াতে পারলে শান্তি পেত। ইরা কেমন নিজের ভিতর ক্রমে নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। ওর কিছু ভাল লাগছে না। সে কিছুটা উদাসীনভাবে হেঁটে গেল করিডোরে। তারপর বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়ল। খাবে না, খেতে ভাল লাগছে না। ওটা ইরার স্বভাব, ওর মন ভাল না থাকলে খেতে ইচ্ছে হয় না, অথবা অভিমান হলে সে না খেয়ে নিজেকে কষ্ট দিতে ভালবাসে।

যদিও এসব ঘটনা খুব মর্মান্তিক, দুঃখের, তবু ইরা ভেবে পায় না, মানুষের সব শোক ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হলে কেন কমে আসে না। সেই যে সে একবার, এখন তো স্বপ্নের মতো মনে হয়, টিপুকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছিল, তেমনি আবার বের হয়ে পড়লে কেমন হয়! সে তো সোজা বলতে পারে না নমিতা বৌদিকে, আমি টিপুকে নিয়ে যাচ্ছি, ওকে কোথাও নিয়ে গিয়ে নিরাময় করে তুলছি।

কি যে এভাবে সব মনে হয়। ইরার রাতে ঘুম আসে না। ভিতরে ভিতরে সে জ্বলতে থাকে এক জ্বালায়, অথবা মনে হয় কখনও এইসব শোকের ভিতর টিপু ওকে যদি সত্যি দোষী সাব্যস্ত করে থাকে, যদি টিপু ভেবে ফেলে, ইরা সংসারে এলে দুঃখ আরও বেড়ে যাবে, অশুভ ভেবে যদি টিপু ওকে দূরে সরিয়ে রাখে, আসলে টিপু কি এখন এসবই ভেবে বেড়াচ্ছে! যদি অপছন্দ ইরাকে, যদি মনে হয় ইরা সংসারে দুর্ভোগ, তবে সে নিজেই সরে দাঁড়াবে। কিন্তু এমন অবস্থায় সে কিছু বলতে পারে না। ভীষণ স্বার্থপরের মতো দেখাবে তবে।

ইরার ঘুম আসছিল না। নমিতা বৌদি ফোন করে যতক্ষণ না বলছে, সে ততক্ষণ ঘুমোতে পারছে না।

সে কেবল ভাবছিল, এখুনি ফোন বেজে উঠবে। ঠিক সে টিপুর গলা পাবে। বলবে, আমি ফিরেছি ইরা। এইমাত্র ফিরেছি।

সে এভাবে কতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিল মনে নেই, চোখে তন্দ্রার মতো ঘোর ক্রমশ নেমে আসছে। সে টের পাচ্ছে না। চোখের ওপর হাত চেপে সে শুয়ে আছে। স্বপ্নের মতো একটা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। এবং সে দেখতে পাচ্ছে, সেখানে টিপু খুব সুন্দর সাজ-পোশাক পরে সামনের এক সবুজ বনভূমিতে ঢুকে যাচ্ছে। আর ঢুকে যেতেই মনে হল ভীষণ দাবানল, সে দাবানলে ছারকার হয়ে যাচ্ছে, টিপুর মুখে ভীষণ বড় বড় ফোসকা। ক্রমে সেইসব ফোসকা এক-একটি বেলুনের মতো আকার নিচ্ছে, তারপর ফটাস করে ফেটে যাচ্ছে। টিপুর মুখ আর সুন্দর থাকছে না, সাদা সাদা বড় ঘা। ইরা চিৎকার করছে, টিপু তুমি পুড়ে যাচ্ছ, তোমার চারপাশে আগুন। টিপু তখন কেমন হা হা করে হাসছিল। আবার দেখল, একটা বড় নদী, সে নদীতে নামবেই, এমন সময় নৌকা কেমন করে চড়ায় ঠেকে গেল। জল শুকিয়ে গেল। শুকনো খটখটে বালিয়াড়ি শুধু। আবার সে দেখতে পেল, একটা সুন্দর ফুলের উপত্যকা, টিপু ওর হাত ধরে সেখানে নিয়ে যেতে সব ফুল ঝরে গেল, পাতা উড়ে গেল, এবং তুষারপাতের মতো এক ছবি। সব ফুলের উপত্যকা নিমেষে ঢেকে গেল বরফে। সে বরফের ওপর দিয়ে টিপুকে নিয়ে হাঁটছে। শীতে ওরা যেন দুজনই মরে যাবে। শীতে টিপু কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে বলল, টিপু, এমন হচ্ছে কেন! তোমাকে নিয়ে যেখানে যাচ্ছি দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে কেন! আমি তোমার কাছে এত অপয়া! আর তারপরই সে বুঝতে পারল তার ভীষণ তেষ্টা। সে কেমন ছটফট করছে। তখনই করিডোরে ফোন বাজছে। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল। ফোন। সে ছুটে বের হয়ে ফোন ধরতেই মনে হল, অন্য কার গলা। টিপু কথা বলছে না। সে হ্যালো হ্যালো করে গেল। কেউ কথা বলছে না, চুপচাপ,

আবার কার গলা। সে দুঃখের সঙ্গে বলল, আপনি কে বলছেন। এবং বুঝতে পারল, হাসপাতালের অন্য ওয়ার্ডের ফোন ভুল করে রঙ কানেকশন দিয়ে দিয়েছে। কেউ তার প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর নিতে গিয়ে ভেঙে পড়েছে, সে ফোন ছেড়ে ফের দাঁড়িয়ে থাকল। কেবল ঘামছে। সে শেষে ফোন তুলে আর ডায়াল না করে থাকতে পারল না। ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

ইরা বুঝতে পারল ফোন কেউ ধরছে না। তারপর কেমন অধৈর্য ইরা আবেগে বলে উঠল, এমন হচ্ছে কেন! আমি কি করব! বোধহয় তখনই নমিতা বৌদির গলা শোনা গেল।

ইরা বলল, ফিরেছে!

নমিতা বলল, ফিরেছে। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে টিপু।

ইরার কথা বলতে ইচ্ছা হল, আমাকে টিপু একটা ফোন করল না, কিন্তু তখন নমিতাই বলেছে, তোমার কথা বললাম ইরা। টিপু কেমন অবাক হয়ে শুনল, ইরা বলে কাউকে সে যেন চেনে না। রাতে তোমাকে আর কষ্ট দিতে ভাল লাগল না। এজন্য ফোন করিনি।

ইরা কিছু বলল না, ফোনে ওর কান্নার স্বর, কান্নায় ভেঙে পড়ার শব্দ কেবল ইথারে ভেসে যেতে থাকল।

নয়

সকালে বৌদি এসে টিপুর জানলা খুলে দিল। জানলা খুলে দিলেই সামান্য রোদ, সকালের রোদ, এবং ঠাণ্ডা বাতাস। শীতকাল এসে যাবে। শীতকাল এসে গেলে টিপুর সামনের ব্যালকনি বেশ মনোরম। উষ্ণতার জন্য এখানে বসে থাকলে মনে হয় চারপাশের নীল নীল বাড়িগুলো এক সুন্দর স্বপ্নের মতো। কত সব সুন্দর সুন্দর বাড়ি চারপাশে উঠছে। আর এভাবেই মানুষ তার মায়া পৃথিবী জন্য বাড়িয়ে যায়। সে চারপাশের সব কিছু নিয়ে বড় হতে হতে ভাবতেই পারে না, পৃথিবীতে কখনও মানুষ মরে যায়। টিপু তো সেদিনও মনে করতে পারেনি, পৃথিবীতে মানুষ চিরদিন থাকে না, এক সময় সে মরে যায়।

নমিতা বলল, ওঠো।

টিপু তাকাল না। সে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখতে পাচ্ছে। সে এখনও সোজা বৌদির দিকে তাকাতে পারে না। সারাজীবনেও বোধহয় তাকাতে পারবে না। টিপু না তাকিয়েই বলল, উঠছি।

সে একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। আগে এ-ঘরে দেখাশোনার ভার ছিল গোপালের। গোপাল যখন থাকে না, তখন সময়ে অসময়ে নমিতাই ভার নিয়েছে।

নমিতা যখন এ-বাড়িতে আসে টিপু তখন স্কুলের ছাত্র। স্কুলের ছাত্র হলে যা হয়, ভীষণ আবদার। সে তখনও মার ঘরে শুতো। বাবার ঘরে সে ঢুকতে সাহস পেত না। চন্দন পেটে আসার আগে পর্যন্ত নমিতা নিজেই এই ছোট্ট আদুরে বাবুটির জন্য সব করে যেত। অন্য লোকের কাজ টিপুর পছন্দ ছিল না। চন্দন হবার পর, টিপু তাকে বলেছে, বৌদি তুমি আর কতদিক সামলাবে? সংসারের বড় বড় কাজগুলো গোপাল করুক।

কিন্তু এখন, এইসব দুর্ঘটনার পর নমিতা আবার এই ঘরের কিছু কিছু কাজ হাতে নিয়েছে। মাইনে করা লোকেরা কিছু কিছু কাজ টিপুর মনের মতো করতে পারে না। নমিতা এসে সেসব কাজ করে। এই যেমন ওর টেবিলের কোন্‌দিকে ক্যালেণ্ডার থাকবে, কোন্‌দিকে ওর প্রিয় বইগুলো থাকবে, কারণ যখনই সময় হয় সে সেসব পড়তে ভালবাসে, বিছানার চাদর কি রঙের পছন্দ, বেড-কভার পাল্টে দেওয়া হবে কি হবে না, নমিতার চেয়ে কেউ বেশী ভাল জানে না।

নমিতা বলল, চা হয়ে গেছে উঠে পড়। বেশ বেলা হয়েছে।

টিপু উঠে বসল। কথা বলল না।

এখন এ-ঘরে বেড-টি গোপাল নিয়ে আসে না। সব নিজে করে নমিতা। বিশেষ করে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর নমিতার আবার একটা ভয়। প্রথম প্রথম গাড়ি নিয়ে বের হতে টিপু ভয় পেত। আজকাল আবার গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছে। গাড়ি নিয়ে যাক, এটা টিপুর দাদা চান। আত্মবিশ্বাস ফিরে আসুক। নমিতার কিন্তু ভারি ভয়, কি দরকার ছিল আবার গাড়ি দেওয়ার। কিন্তু সে এ-বাড়িতে সেকেলে ধরনের বৌ। যেন এ-বাড়ির সব কাজ নীরবে করে যাবে, মতামতের ব্যাপারে কেউ তাকে গ্রাহ্য করবে না। আসলে

নমিতা বুঝতে পারে, সে শুধু সুন্দরী বলে শ্বশুর মহাশয় তাকে এমন গরীব বাপের ঘর থেকে তুলে এনেছেন। এবং ওর হীনমন্যতা ওকে ছোট না করে বরং আরও সুন্দর করে রেখেছেন। বিনয়ী, নম্র স্বভাবের মেয়ে, সেবাপরায়ণা স্ত্রী, যা হলে ঘরের শ্রী বেড়ে যায় তেমনি নমিতা।

নমিতা বলল, চা নিয়ে আসছি।

টিপু বলল, আনো।

টিপু পরেছিল ডোরা কাটা পাজামা পাঞ্জাবী। চুল এলোমেলো। ঘুম ভাল হয়নি, চোখ দেখলেই বোঝা যায়। কেমন রুগ্ন লাগছে। সে জানলায় বসে সামনের সবুজ মাঠে দেখল শিশির-কণা—রোদে ঝলমল করছে। মাঠের পরে ক্যানেল, ক্যানেলের জলে কেউ জাল ফেলেছে, ডানদিকে বড় ট্যাঙ্ক, জলাধার বলা যেতে পারে। খুব বড় এই দীঘির মতো পুকুরের চারপাশে নানাবর্ণের গাছ, ইউক্যালিপটাসের গাছই বেশী। এইসব পথ ধরে সে কতদিন চন্দনকে নিয়ে হেঁটে এক আশ্চর্য দেশে চলে গেছে। সে আর চন্দনই একমাত্র জানে দেশটার খবর। চন্দন নেই। চন্দন নেই বলে আশ্চর্য দেশটায় সে আর যেতে পারবে না। চন্দন থাকলেই তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারত সেখানে। সে আর যেতে পারছে না বলে, কি যে কষ্ট। সে কাউকে তার এই কষ্টের কথা বলতে পারছে না। সে ক্রমে কেমন দুঃখী মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

নমিতা চা-এর কাপ রেখে বলল, কাল কোথায় গেছিলে!

বাস ট্রাম অথবা মিনিবাস, এবং এরোড্রাম থেকে বড় বড় বাস হুস হাস চলে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। কেমন ঘুরে ঘুরে এই ঘটনাটা ওর মাথার ভিতর যেন ঘুরে যায়। ঘুরে ঘুরে যেন চারপাশ থেকে এইসব চাকার গাড়ি ঘুরে ঘুরে বৃত্তের মতো মাথার ভিতরে একটা গাড়ির চলন্ত চাকা হয়ে যায়। সে তখন দেখতে পায়, চন্দন চিৎকার করছে, চন্দন ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে। মৃত্যুভয়ে চন্দনের সেই শূন্য দৃষ্টি কিছুতেই ভুলতে পারে না। কতদিন ভেবেছে, সে অফিস যাবে, বিকেল হলে যাবে সে, কোথায় যেন তার যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু তারপরই কি হয়ে যায়, একটা চাকা, মাথার ভিতর অনবরত দ্রুত ঘুরতে থাকলে, সে অস্থির হয়ে পড়ে। ওর দুঃখটা কেউ তখন ধরতে পারে না।

টিপু বলল, কোথায় যাই মনে থাকে না বৌদি। টিপু ইচ্ছা করেই বৌদির সামনে মিথ্যা কথা বলল। বড় বেশী সরল অনাড়ম্বর চোখ। ছেলেমানুষের মতো চোখে এখনও অভিমান ভেসে থাকে। সে কিছু বললেই, হয়তো টস টস করে চোখের জল নেমে আসবে। অথবা মুখ ঘুরিয়ে নেবে। বাইরের দিকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পৃথিবী, আকাশ, সূর্যাস্ত অথবা গাছগাছালি দেখতে দেখতে হয়তো ভাববে, চন্দন একদিন বড় হয়ে যেত, অথবা বিয়ের দিনে চন্দন, চন্দনের মুখ, মুখে সুন্দর করে সব চন্দনের ফোঁটা মেখে দিত, কত কথা না ভাবনায় চলে আসে। কত কথাই না মনে হবে সারাজীবনে। সারাজীবন, একটি শিশু এবাড়িতে শিশুর মুখ নিয়েই থাকবে, সে আর বড় হবে না। কোনোদিন বড় হবে না। দাদা, বৌদি, সে বুড়ো হয়ে যাবে একদিন, তবু চন্দন, সেই ছোট চন্দন থেকে যাবে।

নমিতা বলল, তুমি এমন করে ঘুরে বেড়ালে আমাদের খুব চিন্তা হয় টিপু।

—সব ঠিক হয়ে যাবে বৌদি। ভেব না।

—ইরা কাল রাতে ফোন করেছিল ফের।

—জানি।

—তখন তুমি ঘুমোওনি?

—ঘুমিয়েছিলাম হয়তো।

—তবে জানলে কি করে!

—জানব না! আমি না এলে ওর ঘুম আসবে না। ইরা ফোন করবেই।

নমিতা বলল, ইরা খুব ভাল মেয়ে।

টিপু বলল, জানি।

—কাল তুমি ওকে ফোন করতে পারতে।

—করব। আজই করব।

আসলে নমিতা জানে ঐটুকু। আর না। টিপু আবার ভুলে যাবে। নিজের মতো কি ভাববে, তারপর স্নান করবে। মনে হবে অফিস বের হবে। দাদা বলবেন, আজ যাবি ঠিক করেছিস।

—দেখি।

দাদা কথা বলবেন না। যেন ধরেই নিতে পারেন, টিপু যাবে না অফিসে। অনেক কাজ, কাজের চাপ ওর ওপর, সব দেখেশুনে নিতে হয়, টেণ্ডার রেট, নিজে দেখে না নিলে ভিতরে অনেক কারচুপি থাকে। পাশে টিপু থাকলে দাদা অনেক বেশী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

নমিতা বলল, টিপু, তোমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কোথাও থেকে ক'দিন বেড়িয়ে এস। চল আমরাও সঙ্গে যাই।

টিপু হাসল।

—আজ কোথাও যাবে না। ইরাকে আসতে বলেছি।

—টিপু বলল, আচ্ছা।

কিন্তু ইরা যখন এল, তখন টিপু নেই। সে গাড়ি নিয়ে বের হয়নি। নমিতা নিচে ছিল। সে বোধহয় নিজের ঘরে বসে টুকিটাকি কাজ করছিল। দুপুর গড়িয়ে গেছে। বিকেলের দিকে ওর মনে হয়, কেউ ডাকছে! নমিতা, নিজের খাটে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। ইরা ডেকে তুললে সে বলল, অমা! তুমি।

আসার কথা ইরার, অবাক হবার কিছু নেই, তবু নমিতার স্বভাব এমন ভাবে কথা বলা। ওরা দুজনেই যখন টিপুর ঘরে এল, দেখল খালি। দরজা খোলা। নিচে গোপালকে বলল, টিপু কোথায় রে!

গোপাল বলল, দাদাবাবু বের হয়েছেন।

নমিতা দেখল, গ্যারেজ বন্ধ। তালা দেওয়া। গাড়ি বের করে নিলে তালা ঝোলানো থাকে না, গ্যারেজ খোলা থাকে। গ্যারেজ বন্ধ দেখেই বুঝল, পায়ে হেঁটে টিপু বের হয়েছে। সে বলল, কোন্‌দিকে গেছে?

—বললেন একটু ঘুরে আসছি।

নমিতা ভাবল, একটু ঘুরে তাহলে চলে আসবে। সে আবার ইরাকে নিয়ে টিপুর ঘরে গিয়ে বসল। কথা বলল। নমিতা মুখ দেখেই বুঝতে পারছে, ভীষণ উদ্বিগ্ন ভিতরে ভিতরে। কেমন যেন মেয়েটা ভয় পেয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করছিল কিছু, পায়ের শব্দ সিঁড়িতে শুনতে পেলেই কেমন চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে ইরার। গোপাল অথবা রান্নার বামুনঠাকুর কিংবা গোপালের মা সিঁড়ি ধরে উঠে গেলে আবার আগের মতো বিমর্ষ হয়েছে ইরা। এ-সব কষ্ট নমিতা সহজেই ধরতে পারে। হাসপাতালে আর ইরা টিপুকে যেতে বলে না। মৃত্যুর দৃশ্য টিপু একেবারেই সহ্য করতে পারে না বোধহয়। দুদিন টিপু তাকে কথা দিয়েছিল যাবে, সে সেজেগুজে হাসপাতালের গেটের বাইরে বড় বোর্ডিং-এর নিচে এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে। টিপু যায়নি। অভিমানে অথবা রাগে সে ছটফট করত। সাজগোজ সব ছেড়ে কেমন নাবালিকার মতো বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। দারুণ অভিমানে মনে মনে বলত, তুমি টিপু আমার সব হরণ করে নিয়ে এখন ছল ছুতোর মজা করছ। তারপরই মনে হত এটা কি ভাবছে। স্বার্থপরের মতো সে টিপুর মনের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের কথাই ভাবছে! সে তারপর মুহূর্ত দেরি না করে ফোন করেছে। ফোন নমিতা বৌদি তুললে, বুঝতে পেরেছে টিপু বাড়ি নেই।

নমিতা তখন ভীষণ অবাক।—ও যে বলল, তোমার কাছে যাচ্ছে।

—আসেনি।

তখন দুজনই চুপচাপ ফোনের দু-প্রান্তে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

ক্রমে চারপাশে একসময় আলো জ্বলে উঠল। নমিতা বাড়ির ভিতর এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সর্বত্র আলোর মালা। বাগানে, গোলাপ গাছগুলোর পাশে ছোট ছোট আলোর ডুম। কেন জানি নমিতার মনে হল, এভাবে বাঁচা যায় না। শোক নিয়ে বসে থাকলে চলে না। সে ইরাকে নিয়ে বাগানে নেমে গেল। যেখানে ছুটির দিনে সবাই একত্রে গোল হয়ে বসত, গোপাল চা ডিমের ওমলেট অথবা কিছু নোনতা বিস্কুট সার্ভ করত এবং ওপরে থাকত নীল আকাশ, নিচে সবুজ ঘাসের বর্ণমালা, চন্দন আর টিপুর হুটোপুটি , সে ইরাকে নিয়ে সেখানে আজ বসল। সে উঠে গিয়ে একসময় গাছগুলোর পাশে পাশে

আলোর মালা জ্বেলে দিল। যেন নমিতা ইচ্ছে করেই এ-বাড়ি থেকে চেপে বসা অন্ধকার দূরে সরিয়ে দিতে চাইল।

নমিতার ইচ্ছা, টিপু ফিরে এলেই, ডাকবে। সে, টিপু আর ইরা এখানে বসে সেই আগের মতো চা নোনতা খেতে খেতে গল্প করবে। নানাভাবে সে নিজেই আজ এমন করে কথা বলবে, যেন, সে জানেই না, চন্দন বলে তার কেউ ছিল। একেবারে সরল সহজ ভূমিকা। সে কোনো সংকোচ করবে না আজ। হাসবে, জোরে জোরে হাসবে। চন্দন বেঁচে থাকতে সে যেভাবে হাসত, ঠিক সেভাবে সে হাসবে। এমন নীল আকাশের নিচে বুঝি দুঃখ নিয়ে বেশী সময় বাঁচা যায় না।

ইরা বলল, বেশ তো ছিল, আলো জ্বালতে গেলে কেন!

—আমরা সন্ধে হলে ছুটির দিনে এভাবে সবাই বসতাম ইরা।

ইরা হাসল। সে তো জানে, সে তো আলাদাভাবে নিজেকে আর ভাবতে পারে না। তবু এই যে বলা, যেন মনে করিয়ে দেওয়া ইরাকে, আমি সব ভুলে গেছি ইরা। বেশীদিন এক নাগাড়ে বাঁচা যায় না। আলো জ্বালতে পারলেই সব ভুলে যাবে।

ইরা দেখল তখন সামনের রাস্তায় সব সুন্দর মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্না রাতে বেশ লাগছিল ওদের। ছিমছাম চারপাশটা, এগিয়ে গেলেই পার্ক, হেমন্তের সবুজ ঘাসেরা কি যে মহিমময়, এবং নানাবর্ণের ফুলের গাছ, কত বিচিত্র ফুল, এত বড় যে-দুঃখ গেছে এই পরিবারে তবু ফুল ঠিক ফুটে যাচ্ছে। নমিতা ঘুরে ঘুরে যেন, কতকাল পর ইরাকে নিয়ে এইসব ফুলের গাছ আর তার বর্ণময় পাতার নিচে ঘুরে বেড়াতে থাকল।

ইরার বুকের ভেতরটা সহসা কেঁপে উঠল। ছায়ার মতো টিপু ঢুকে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে ডাকতে পারে না, টিপু আমি এখানে, সে কেমন নিঃশব্দে গাছপালার ভেতর থেকে তাকে কেবল দেখতে থাকল।

নমিতা বলল, কখন থেকে ইরা এসে বসে আছে।

সে কথা বলল না। নীরবে হেঁটে যাচ্ছে।

—কোথায় যাচ্ছ। এখানে এস। আমরা এখানে বসেছি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না।

টিপু বসলে, ইরা চোখ তুলে তাকাল। অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছে। সে একটা কথাও টিপুর সঙ্গে বলতে পারল না।

আর নমিতা যেন একেবারে সহজ, সেই আগের মতো হৈ চৈ, যেন সে হেঁকে ডেকে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, আবার ফুল ফুটছে। আর এ-ভাবে বেশ হৈ চৈ করে নমিতা ঘুরে বেড়ালে, টিপুর ভেতরটা কেমন হালকা হয়ে যায়। ভারি থাকে না। সে বলল, ইরা কেমন আছ?

—ভাল না।

—সেদিন যেতে পারলাম না।

—কেন?

কেন, সে কি বলবে! সে বলতে পারত, দিনটা ভারি মনোরম ছিল। সব সবুজ বাস রাস্তায়, নীল রঙের গাড়িগুলো চওড়া রাস্তায় কি যে বেগে বের হয়ে যাচ্ছে, আর চারপাশে মনে হয়েছিল উৎসবের মতো। উৎসবই হবে, যেন কোনো বড় উৎসব আমাদের! এই শহরে সবাই যে যার ঘরে থাকতে পারছিল না। কতক্ষণে রাস্তায় বের হবে, উল্লাসে ফেটে পড়বে, যেন চারপাশে কারা বলছে, আনন্দ করো, আনন্দ করো। সেদিন আমারও কেন যেন মনে হয়েছিল, তোমার ওখানে যাওয়ার দরকার। এমন দিনে যেতে না পারলে কখনও আমার যাওয়া হয়ে উঠবে না। আমি সেদিন উঠেই আমার সব জানলা খুলে দিয়েছিলাম। কি যে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরে মুখে চুলে বয়ে গেল। মনে হল, ভেতরের সেই আশ্চর্য দুঃখটা আবার জেগে উঠছে। আমি কতদিন যেন তোমাকে দেখিনি।

নমিতা বলল, কোথায় গেছিলে!

—এই একটু ঘুরে এলাম।

নমিতা বেশী কিছু আর জিজ্ঞাসা করল না। কারণ সে তো জানে টিপু কতদূরে কোথায় গেছে। নমিতা সব সময়ই যেন অজ্ঞ থাকতে চায়। সেজন্য বলল, ইরা তো চলেই যেত। আমি ধরে রাখলাম।

টিপু ইরার দিকে চেয়ে সামান্য হাসল।

ইরা হাসল না।

টিপু বলল, আমার মনে ছিল না, ইরা আসবে।

ইরার মনে হল, সে ক্রমে বেহায়া হয়ে যাচ্ছে। ওর আসা বুঝি উচিত না। টিপু তার কথা এখন আর মনে করতে পারে না।

দশ

এভাবে টিপুর দিন যায়। সময় পার হয়ে যায়। সে কখনও কথা রাখতে পারে, আবার কখনও কেন যে সব ভুলে যায়। সে বলতে চায়, ইরা আমার এমন স্বভাব নয়। আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না।

এভাবে আবার শরৎকাল চলে আসে পৃথিবীতে। শরৎকালে পৃথিবী কি সুন্দর হয়ে যায়। সে ঘরে বসে থাকতে পারে না। চারপাশের দরজা জানলা সব খুলে দিতে ইচ্ছে হয়। সে কেমন সেদিনও দরজা জানলা খুলে শরতের নীল আকাশ, গাছে গাছে সবুজের সমারোহ দেখে অবাক হয়ে যায়। নরম রোদ চারপাশে খেলা করে বেড়াচ্ছে। অথবা মনে হয় আকাশটা তার সবুজ মাঠে সাদা রঙের ভেড়ার পাল ছেড়ে দিয়েছে। সে এমন দিনে সব দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না।

ক'দিন থেকে কি ভীষণ বৃষ্টি গেছে। টুপটাপ বৃষ্টি, কখনও ঝোড়ো হাওয়া। জল অনবরত আকাশ ফুটো করে পড়ছে। অনবরত অথবা ক্রমান্বয়ে এই বৃষ্টিতে মাটি ঘাস আকাশ বাতাস সব যেন ভিজেছিল। অথচ সকালে সে জানলা খুলে দিতেই দেখতে পেল, আকাশ তরুতল শুকনো। রোদের মহিমময় ঘ্রাণ, সবুজ ঘাসের ভিতর অজস্র সোনালী পোকা। রাস্তায় জল জমে নেই। ক্রমে ঘাস মাটি ফুল ফল কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। মনে হল চারপাশে সবুজ এক তৃণভূমি। পাখিদের কলরব ভেসে আসছিল। দুটো একটা ফড়িং ফ্রেমে বাঁধা ছবির মতো কোথাও চুপচাপ বসে আছে। ওর মনে হল পৃথিবীতে অনেকদিন পর সুদিন ফিরে এসেছে। সে কতদিন ধরে ভাল করে ঘুমোয়নি। যেন, কোথাও যাবার কথা ছিল, যায়নি, তার দাড়ি কামাবার কথা, সে দাড়িও কামায়নি।

কিন্তু এমন দিনে সে দাড়ি না কামিয়ে থাকে কি করে। আয়নার সামনে সে বসে গেল। গালে হাত রাখল। বড় বেশী খসখস করছে গাল। মুখে সে পেষ্ট মেখে, সারা মুখে পাম অলিভের গন্ধ মেখে, নিজের মতো করে মনোরম ভাবে দাড়ি কামাল। গালে হাত দিয়ে দেখল, মসৃণতার অভাব আর তার শরীরে কোথাও নেই। সে ছিমছাম চেহারার মানুষ হয়ে গেল। সে গুন গুন করে গান গাইল। শিস দিল দু-একবার। বাথরুম আর ঘর করতে করতে ইরাকে নিয়ে ঘাসের ভিতর ডুবে যাবে ফের ভাবল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে অনেকক্ষণ দেখল। এত সময় নিয়ে সে কতদিন আয়নার সামনে দাঁড়ায়নি। খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তাকে। সকাল সকাল খেয়ে সে ফের অফিসে বেরুবে ভাবল। অফিস থেকে সোজা চলে যাবে, এবং এখনই একবার ফোন করা দরকার ইরাকে—অবশ্য সে জানে ইরা এখন হোস্টেলে নেই। ওয়ার্ডে চলে গেছে। ওয়ার্ডে গেলে ফোনে ওকে ধরা যায় না। কানেকশান পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বরং সে ভাবল, যখন ক্রমে গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাবে, সে চলে যাবে তার কাছে। হঠাৎ গিয়ে অবাক করে দেবে। সে গাড়িতে যাবে না। একটা বাস আসবে—নীল রঙের বাস। বাসটায় উঠলে সে দেখতে পাবে চারপাশের বাড়ি-ঘর সরে যেতে যেতে বড় শহর, শহরের ভিতরে তার সেই একান্ত পরিচিত রাস্তা, ট্রাম-লাইন এবং পাশে হোর্ডিং-এর নিচে সেই সবুজ হলুদ রঙের শাড়ি পরা মেয়েটি। অবশ্য ফোন না করলে ইরা জানতে পারবে না। অফিসে গিয়ে ফোনে সে সব ঠিকঠাক করে নেবে ভাবল।

সে অফিসে বের হবে। বৌদি ওকে অফিস যেতে দেখে ভীষণ খুশি। স্বাভাবিক আবহাওয়া আবার এ-বাড়িতে বইতে আরম্ভ করেছে, সব ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তখন ফোন। নমিতা বলল, তোমার ফোন টিপু, ইরা ফোন করেছে।

টিপু বলল, ইরা!

—হ্যাঁ, আমি। আজ এস লক্ষ্মী।

—যাব। কিন্তু...।

—কিন্তু কি আবার?

—হাসপাতালের ভিতর যেতে আমার ভয় করে। মনে হয় মানুষের বড় দুর্দিন।

ইরা বলল, টিপু, মানুষের সুদিন দুর্দিন বলে কোনো কথা নেই। সব দিনই মানুষের সুদিন।

টিপু বুঝতে পারে, ইরা চায়, সে একেবারে স্বাভাবিক হয়ে উঠুক।

সে তখন মনে মনে মেয়েটাকে আর না ভালবেসে পারে না। ইরাকে দুঃখ দিতে তার মন চায় না। তারপর টিপু বলেছিল, এভাবে আমি এখনও ভাবতে পারি না ইরা। তোমার ওখানে আমার ভীষণ ভয়, রোজ রোজ মানুষের এমন নিষ্ঠুর মৃত্যুর মোকাবিলা তুমি কি করে যে কর!

ইরা হেসে ফেলেছিল।

ইরা মৃত্যু নিয়ে তামাসা করতে বড্ড বেশী ভালবাসে। তারপর ইরা বলেছিল, আজ কিন্তু আমাদের সেই দিন!

—মানে!

—মানে তুমি জান না!

টিপুর মনে পড়ল, গত বছর এ-সময়েই ওরা গিয়েছিল। এবং মনে হতেই সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে কেমন আমতা আমতা করতে থাকল। তারপর কি ভেবে বলল, যাব।

ইরা বলল, ভুলে যেও না। না এলে আমার দুঃখ রাখার জায়গা থাকবে না।

সে বলল, আচ্ছা।

অফিসে আজ সে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম করেছে। বিকেলের দিকে সে দাদাকে বলেছে, আমি যাচ্ছি।

সে একটা নীল রঙের বাসে চড়ে বসল। ভিড়ের ভিতর সে বেশ একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে। যেন কতদিন সে এভাবে ইরার কাছে যায়নি। ইরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে হোর্ডিং-এর নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। সে পরেছে কালো রঙের প্যান্ট এবং চেক-কাটা দামী হাফ সার্ট। সে সুন্দর রঙ-বেরঙের মোজা পরেছে। ইরার খুব পছন্দ যে সে রঙ-বেরঙের মোজা পরুক। ইরা মাঝে মাঝে ওর গোড়ালি থেকে সামান্য প্যান্ট তুলে পায়ের সাদা রঙ এবং সেই বনরাজিনীলা দেখে অবাক হতে ভালবাসে। কাঁধে ক্রিম কালারের ব্যাগ। ফেরার সময় সে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে ভালবাসে। চন্দন বেঁচে থাকলে টফি কিনত।

এবং এভাবে যা হয়ে থাকে, ইরার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিককার কথা মনে পড়ে যায়। বাস যেন যাচ্ছে না। এত দেরি করার কি অর্থ! একবার ওর চিৎকার করতে ইচ্ছে হল, এই বাসয়ালা, তারপর কেমন সংযত কথাবার্তা মাথায় চলে এলে সে ভেবে ফেলে, সে আর এমন দিনে খারাপ কথাবার্তা বলবে না। বরং সে এখন ইরাকে ভাবতে পারে। ইরাকে ভাবলে, সে ঠিক আবার সহজ মানুষ হয়ে যাবে।

মনে মনে এখন ইরার সঙ্গে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে যায় সে। মুখে তার আশ্চর্য সুগন্ধ থাকে। সে টফি খেতে ভালবাসে। টফি খাওয়া তার শৈশবের অভ্যাস। সে টফি খেতে খেতেই যেন একদিন ইরাকে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এবং ইরার ভারি হাসি পেত, ওর এমন ছেলেমানুষী দেখে। ইরা কতদিন হেসেছে। হাসলেই টিপুর বায়না, ইরা, তুমি একটা খাও। তুমি না খেলে ভাল লাগে না। আর এভাবে টিপু যখন টফি খেত, তখন ইরা কখনও কখনও ভয়ে হাসতে পর্যন্ত পারত না। হাসলেই টিপুর মনে হবে ইরাকে সে টফি দেয়নি। ইরার টফি খেতে ভীষণ ভয়। টফি খেলে ওর সুন্দর উজ্জ্বল দাঁত নষ্ট হয়ে যাবে। টিপু কি যে ছেলেমানুষ, ওর দুঃখটা বুঝতে পারে না।

বসে বসেই টিপুর মনে হল, ইরা সারাজীবন, ওকে ভারি ছেলেমানুষ ভেবে এসেছে। বড় কোমল প্রাণ টিপুর। মানুষ দুঃখ নিয়ে বেশীদিন বাঁচে না, অথচ টিপুর কেন যে মনে হয়, সে সারাজীবন এভাবে দুঃখী মানুষের মতো বেঁচে থাকবে। সেই চিৎকার, গলা জড়িয়ে চিৎকার করে ওঠা চন্দনের, সে যেন এখনও মাঝে মাঝে শুনতে পায়। সে এমন ভাবে এক শিশুর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ করে দিয়েছে।

আর তখনই ইরাকে কেমন দূরের মানুষ মনে হয়। ইরা বলে কেউ তার আছে মনে থাকে না। টিপু নানাভাবে, এই যেমন চারপাশের ঘরবাড়ি, অথবা সবুজ মাঠ কখনও সুন্দর সব যুবক-যুবতীদের দেখে

সেই কঠিন চিৎকারের কথা ভুলে থাকতে চায়। মনে করার চেষ্টা করে ইরার মুখ। হাসি পেলে ইরা ওর দিকে তাকায় না। তখন নদীর পাড়ে সব গাড়ি যায়, এবং সময়ে সূর্যাস্তের রঙ আশ্চর্য হলুদ হয়ে যায়। ইরার হাসি কখনও কখনও নিরিবিলি আকাশে নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতো। তার ভারি খারাপ লাগে তখন এই কথা ভেবে যে, কেন সে এতদিন ইরাকে এড়িয়ে গেছে।

সে বেশ ঠিকঠাক হয়ে বসল। সেই মোড়টা এলে নেমে পড়বে। বাসে চড়া ভাল অভ্যাস নেই। মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে দেখছে ঠিক জায়গায় এসেছে কি না। কিন্তু মনে হল তার সামনে ভীষণ জ্যাম। বোধহয় এ-জ্যাম ছাড়াতে অনেক সময় লেগে যাবে। যেহেতু বাসে চড়ার ভাল অভ্যাস নেই, ঠিক জায়গায় না আসতেই সে উঠে দাঁড়াল। কারণ ওর সব সময়ই মনে হয়, সে নামতে দেরি করে ফেলবে, তাকে নিয়ে বাস চলে যাবে, জায়গা মতো নামতে না পারলে দেরি হয়ে যাবে। এ-রাস্তাটুকু হাঁটতে তার ভাল লাগবে না। কারণ খুব গরীব মানুষেরা এ-অঞ্চলে থাকে। সে গাড়িতে এলে এ-জায়গাটা খুব দ্রুত পার হয়ে যায়। চারপাশে এত বেশী অসাম্য চোখে পড়ে যে, বেশী সময় তা সহ্য করতে পারে না।

আসলে ওর চোখের সামনে সেই কঠিন দৃশ্যটা ভেসে উঠলে সে স্থির থাকতে পারে না। ইরা ওর দুঃখটা বুঝতে পারে—কিন্তু এতদিন দুঃখটা নিয়ে বাঁচার কোনো মানে হয় না। যেকোনো মৃত্যুর দৃশ্যে টিপু ঘাবড়ে যায়। ইরা যে কত বুঝিয়েছে! এমনকি টিপুর যা বোঝার কথা নয় তাই নিয়ে কথাবার্তা। মলেক্যুলার বায়োলজির কথা পর্যন্ত টেনে এনেছে। সবারই মূল উৎস প্রোটোপ্লাজম। অবশেষে ডি.এন.এ এবং আর. এন. এ। ইরা বলত, অথচ দ্যাখো বিজ্ঞানীরা এত করেও শান্তি পেল না টিপু, আমাদের কোষের সেই শেষতম অণুটির কথাই ভাবো, তার ভিতর রয়েছে কত অণু, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে তারা কাজ করছে। কোনোটার কাজ পেশী তৈরি করা, কারো কাজ হরমোন তৈরি করা এবং এ-ভাবেই সে মৃত্যু সম্পর্কে কথাবার্তায় মানুষের শরীর কত অনিত্য বুঝিয়েছে—টিপু, এই যে সৃষ্টি রহস্য, অর্থাৎ ডি.এন.এ এবং আর.এন.এ—হয়তো একদিন মহাজাগতিক পরিমণ্ডলেই জন্মলাভ করেছিল। কোনো নৈসর্গিক কারণে ইরা একটু থামত, টিপুকে দেখতে দেখতে বলত, আমরা তো সব দুঃখহারক ওষুধ আবিষ্কারের আশায় স্পুটনিক, রকেট ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা নিজেরাই জানি না এর শেষ কোথায়। রহস্যের সব রহস্য, অন্তহীন রহস্য এই জীবনধারণে। এতটুকু ভেঙে পড়লে চলে না টিপু।

ইরা নানাভাবে বুঝিয়ে বললেও সে ঠিক যেন ভরসা পায় না। টিপু তার জানলায় চুপচাপ বসে থাকে। পাশের মাঠে সব শিশুরা খেলতে যাচ্ছে। জানলায় বসে সে তাদের সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে ভালবাসে। ওদের দেখতে দেখতে কখনও মনে হয় সে চন্দনের হাত ধরে একটি বড় চড়াই পার হয়ে যাচ্ছে। তার পায়ে পায়ে উঠে আসছে অজস্র শিশুরা। কেউ বেলুন ওড়াচ্ছে, কেউ টফি খাচ্ছে, ওদের মাথায় অজস্র লম্বা চোঙের মতো রঙ-বেরঙের জোকারের টুপি, ওর পরনে সাদা পোশাক। আর মনে হয় টিপু সেই বাঁশিয়ালা। সে যেন এইসব শিশুদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এক বিরাট পর্বতমালা পার হয়ে সমুদ্রে নেমে যাবে। শিশুরা বুঝতে পারছে না, সে কত নিষ্ঠুর। আর তখনই ওর চোখে মা বাবার মুখ জলের ভেতর থেকে দেখা ছবির মতো। সে আর যা দেখেছে, ছোট্ট শিশুর দু'হাতের ভিতর সমস্ত পৃথিবীকে ধরে রাখার বাসনা। পৃথিবী ছেড়ে সে কিছুতেই যেতে চাইছে না। শিশুটির অকারণ মৃত্যুর কথা মনে হলে তার চারপাশে এমন সব বিভীষিকাময় দৃশ্য ঘুরে বেড়ায়। সে তখন ইরাকে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না।

বাস থেকে নামতে নামতে সে চারপাশটা দেখে নিল। দোকান-পাট খোলা। সকাল থেকে শহরটাকে যেন ধোয়ামোছা চলছে। শো-কেসের কাচগুলো ঝকঝক করছে। নানা বর্ণের শাড়ি, এবং পুতুল সাজানো ভিতরে। লাল নীল রিবনে কাগজের ফুল। যুবতীরা রঙ-বেরঙের শাড়ি পরে কেনাকাটা করছে। শরৎকাল আসার আগেই বুঝি সবাই কেনাকাটা সেরে ফেলছে। উৎসব আসছে। সময় নেই আর, এক্ষুনি সেজেগুজে না থাকলে ঠিক ঠিক সময়ে যেন বের হওয়া যাবে না। পুজো দেখা যাবে না। ওরও কিছু কিনতে ইচ্ছে হচ্ছে। অন্তত এই অঞ্চলে সে যদি ফুলের দোকান পেত, তবে ক'টা গোলাপ অথবা কিছু রজনীগন্ধা কিনে নিত। ইরা ফুল ভীষণ ভালবাসে।

ইরার কথা, যেমন ইরা কখনও ফুলের উপত্যকায় হেঁটে গেলে বলত, তুমি আমাকে ফের

ভালবাসতে শেখো টিপু, আমাকে ফের ভালবাসতে না পারলে তুমি তোমার দুঃখ ভুলে যেতে পারবে না।

মা, বাবা, সবচেয়ে বেশী চন্দন—ছোট ভাইপো চন্দন, সে অবোধ, ভাল করে কথা বলতে পর্যন্ত পারে না, পৃথিবীর সুষমা সে ভাল করে বোঝে না, জানে না, অথচ অকারণ কঠিন মৃত্যু চোখের ওপর—টিপু ইরাকে এমন বলতে বলতে কতদিন চুপ করে গেছে—আর তখনই মনে হয়েছে, অনেকটা চন্দনের মতো, কাকু আমাকে টফি দেবে না। আমি আর হাঁটতে পারছি না।

টিপু এভাবে ফুটপাথে উঠেই গাছের ছায়ায় কি দেখল! চারপাশে যানবাহন, ইলেকট্রিক তারে কাক, পুরোনো দোকানে তালিমারা ছবি, জনগণ নির্বিকারে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়াচ্ছে না, গাছটা কি গাছ, তার এখন গাছের পাতা দেখে চেনার কথা, এটা কদমফুলের গাছ, এ-সময়ে কদমফুল ফোটার কথা, কিন্তু একটাও ফুল নেই গাছে, নিচে এক ভিখারিণী মেয়ে, পাশে সাদা চাদরে কিছু ঢাকা। কোনো ধনবতী মহিলা সম্ভবত সাদা চাদরটা দিয়ে গেছে। ধনবতী মহিলা ভাবতেই ইরার মুখ ভেসে উঠল। ইরা কি এই পথে কিছুক্ষণ আগে হেঁটে গেছে! এবং সাদা চাদর দিয়ে নগরীর কঠিন গ্লানি ঢাকতে চেয়েছে!

সে আর এক পা এগুতে পারল না। যারা যাচ্ছে আসছে, তারা এমন একটা নিষ্ঠুর ঘটনার দিকে তাকাচ্ছে না। তারা না তাকিয়ে একটা দুটো পয়সা চাদরে ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ এত ছুঁড়ে দিচ্ছে যে, টিপুর মনে হচ্ছে ওর বুকে লাগছে। চাদরের নিচে কোনো শিশুর মৃতদেহ। ভিক্ষা করে গরীব মেয়েটি তার সন্তানের জন্য পয়সা তুলছে। শিশুটির শেষ কাজের জন্য পয়সা। গরীব ভিখারি মেয়ে মরা সন্তানের পাশে বসে আছে। একটা দুটো পয়সা, এবং পয়সাগুলো গুনে গুনে পাশে রেখে দিচ্ছে। টিপু আর এক পা নড়তে পারল না। ওর ইচ্ছে হল, চাদরটা সামান্য তুলে মুখ দেখে। যেন ওর ধারণা, চাদর তুলে দেখলেই সে দেখবে, চন্দন শুয়ে আছে। সে চন্দনের মুখ দেখলে বলবে, তুমি আবার এখানে কেন শুয়ে! ওর এখন কি যে ইচ্ছে হচ্ছে সব। সে নড়তে পারছে না। পাশে বসে পড়ল। সব মানুষেরা দেখছে, একজন হাল ফ্যাশনের মানুষ প্যান্ট গুটিয়ে বসে আছে। যেন নিরিবিলি হলেই চাদর তুলে দেখবে, আসলে কেউ এই চাদরের নিচে লুকিয়ে আছে কি না!

টিপু শেষে কি ভেবে শিশুর দুঃখিনী মাকে শেষ কপর্দক দিয়ে দিল। তার ফুল কেনার কথা মনে থাকল না। ইরা বলে পৃথিবীতে কোনো মেয়ে আছে তার মনে থাকল না। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে থাকল। আর আশ্চর্য মনে হচ্ছে, শিশুরা আবার পায়ে পায়ে হাঁটছে, সে জোরে জোরে বাঁশি বাজাচ্ছে। সে সামনের পর্বতমালা পার হয়ে যাবে—তারপর মরুভূমি। সব শিশুরা হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত। কেউ রাস্তায় পড়ে থাকছে। কারো মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। বেলুন কেউ হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আকাশে বেলুন, এক দুই তিন এবং হাজার মুখ এভাবে চন্দনের মুখ হয়ে গেলে সে কেমন বিভ্রান্তের মতো ভয়ে ছুটতে থাকল। নগরীর মানুষেরা দেখল, একজন যুবক জ্যামের ওপর দিয়ে গাড়ির বনেটে লাফিয়ে উঠে নিচে নেমে যাচ্ছে, আবার বাসের ছাদে উঠে ওপাশে নেমে যাচ্ছে, ট্রাকের ওপর উঠে লাফিয়ে এই নগরীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ছুটে পালাচ্ছে যেন।

শেষমেষ বুঝতে পারল টিপু, কিছু লোক ওকে ধরার জন্য ছুটছে। সেও ছুটছে। তাকে এখন আর নাগাল পায় কে?

ইরা সারারাত ঘুমোতে পারল না। আর বুকের ভেতর একটা দাহ, অহরহ সে জ্বলছে। সে যে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে ফোনে জানল না, টিপু বাড়ি ফিরেছে কি না। সে মনে মনে ভাবল, আর না। এই শেষ। সারারাত এসব না ভেবে ঘুমিয়ে থাকল। সকালেই নমিতা বৌদির ফোন। সে আটটায় ওয়ার্ডে যায়। সে বের হবে তখন। নমিতা ফোনে জানাল, টিপু দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে।

তারপর যা হয়ে থাকে, সকলেই একধরনের বিচলিতভাব লক্ষ্য করতে থাকল ইরাকে দেখে। ডাক্তারেরা নানাভাবে পরামর্শ দিতে থাকেন, বুঝলি—কিছু হবার নয়, টিপু নিজের মতো খায়, কখনও

অফিস যায়, কোনোদিন যায় না। কারণ বের হলেই মনে হয়, পায়ে পায়ে সব শিশুরা হাঁটছে। সে তাদের নিয়ে সমুদ্রে চলে যাচ্ছে।

আর টিপু মনে মনে বুঝতে পারে সব। কোনো কোনো রাতে সে একা একা কাঁদে। কোনোদিন ইরা আসে, কোনোদিন আসে না। ইরা টিপুর আশা ছেড়ে দিয়েছে! টিপু ক্রমশ এক নিজের জগৎ তৈরি করে ফেলেছে। সেখানে ইরার কোনো বুঝি জায়গা নেই। অথচ কথাবার্তায় টিপু ভীষণ স্বাভাবিক।

যেমন ইরা বলেছিল, তুমি গেলে না?

—ভুলে গেছিলাম ইরা।

—দরজা বন্ধ করে বসে থাক কেন? অফিস আর যাবে না ভাবছ!

—রোজ রোজ যেতে ভাল লাগছে না।

এভাবেই ওদের কথা হয়। ওরা যে কখনও কোনো বাংলোতে দিন যাপন করেছিল, কোনো খোয়াইর জলে পা ডুবিয়ে বসেছিল, কথাবার্তায় তা আর একেবারেই টের পাওয়া যায় না। ইরা মাঝে মাঝে অপলক চেয়ে থাকে। টিপুও মাঝে মাঝে অপলক চেয়ে থাকে। ইরার শরীরের সেই স্বপ্ন কেন যে টিপু আর টের পাচ্ছে না। ইরা বুঝতে পারে না, কতদিন এভাবে চলবে!

তারপর একদিন ফোনে ইরা বলল, টিপু আছে?

গোপাল যেন ধরেছিল। বলল, ছোটবাবু আছে।

—দাও তো।

টিপু ধরলে ইরা বলেছিল, আমি চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—জলপাইগুড়ি।

—কেন!

টার্মস শেষ।

—কবে যাচ্ছ?

—আগামী চোদ্দ তারিখ। তুমি এস।

বার বার এভাবে ইরা ওকে ডাকে।

সে বলল, যাব। আজই যাব।

আবার ইরা দেখতে পায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অথচ সে আসে না। এভাবে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, সে ক্ষোভে দুঃখে নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যায়, সব জামা-কাপড় শরীর থেকে টেনে খুলে ফেলে।—তোমার এত অহংকার। আমার বুঝি দাম নেই! আমার অপেক্ষা, অপেক্ষা নয়। তুমি নিজেকে এত মহার্ঘ ভেবে থাক, তারপরই টিপুর সরল হাসি সহজ কথাবার্তার কথা মনে হলে ওর রাগ জল হয়ে যায়। কার সঙ্গে সে রাগ করছে! সে কিছুতেই আর অভিমান নিয়ে বসে থাকতে পারে না। সে ফোনে শুনতে পায়, বৌদি বলছে, ও তো তোমার কাছে যাবে বলেই বের হয়েছে।

—ও তো আসেনি বৌদি।

—তবে কোনো গাছের নিচে চুপচাপ বসে রয়েছে। কি যে আমরা করি বুঝতে পারছি না।

ইরার ভিতরটা ভীষণ ভার হয়ে গেল ফের। কোথায় থাকতে পারে। কোথায় সে এখন যেতে পারে। সংসারের যে ঘটনা সবাই প্রায় ভুলে গেছে, একমাত্র এই মানুষ সংসারে তা বয়ে বেড়াচ্ছে।

—কোথায় থাকতে পারে বৌদি!

—কিছুই বলতে পারি না।

তারপরই বৌদি যেভাবে কথা বলে থাকে, ঠিক সেভাবে, যেন একইরকম ভাবে, বার বার বলা, এখন যারা গেল, তাদের চেয়ে বেশী ভাবনা ওর জন্য। তুমি তো সবই জান, কোন্‌দিক সামলাব বল!

ইরা তবু বলল, ও আমাকে বলেছে, আসছি। অথচ এল না।

—কি যে করে! কিছু বুঝতে পারছি না। এখন তুমি যদি কিছু করতে পার।

এভাবে বৌদি কথা বললে সে কেমন ভেঙে পড়ে, সে কত কিছু ভেবেছিল—কত স্বপ্ন! সে ভেবেছিল, এখানকার টামর্স শেষ হলেই দেশে ফিরে যাবে না। ভাল একটা লোকালিটি দেখে সে বসে

যাবে। এবং মাঝে মাঝে সুন্দর একটা ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠলে সে দেখতে পায় এনামেল কালারের গ্রিল দেয়া পাঁচিল, বাগানে কিছু গোলাপ অথবা হেনাফুল। দুটো চেয়ারে ওরা দুজন মুখোমুখি বসে। চায়ের কাপ সামনে। ইরা চা ঢালতে ঢালতে যেন পুরোনো ভয়ের কথা বলে জোর হাসছে। তারপর ছেলেমানুষের মতো দার্শনিক কথাবার্তা—জীবন মানে জীবন, তার কাছে হেরে যাবার মতো বোকামি আর নেই।

ইরা এখন যে কি করে! সে সোজা একটা ট্যাকসি নিয়ে বের হয়ে পড়ল। একজন বান্ধবীকে সে তার সঙ্গে নিল। এবং সারা বিকেল, সন্ধ্যা, রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেও যখন টিপুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন ইচ্ছে হল ফিরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

নাঃ, সে আর পারছে না। ইরার সমস্ত অন্তর বেদনায় নীল হয়ে গেল, তার চোখের সামনে মরুভূমির ধূসর রঙ শুধু। আর কতদিন, কতদিন ইরা ঘুরে বেড়াবে এভাবে টিপুর পেছনে। সে চলে যাবে শুনেও টিপু যেমন ছিল তেমনি। ইরা যখন আসে তখন টিপু ঘরে থাকে না। খুব রাতে টিপু ফিরে আসে। তবু ইরা অপেক্ষা করতে ভুল করে না—সে যদি কখনও আসে। তারপর না এলে সেই এক অভিমান। চোখ ছলছল করতে থাকে। বোঝা যায় এই মেয়ে ক্রমে টিপুর জন্য কি যে অধীর হয়ে উঠছে। একজন মানুষের অবহেলায় পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য সে অর্থহীন ভাবছে।

ইরা সকালে ছুটে না আসা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছিল না। সে এসে বলল, কাল কখন ফিরেছে?

—এগারোটার পরে।

—কোথায় যে যায়!

—বলে যায় না জান তো!

ইরা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেল বলতে বলতে, ও ভেবেছে কি!

—জানি না ইরা। তোমার দাদা ভেবেছে কোনো বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু একটা করবে। কিছুটা ইনস্যানিটির লক্ষণ। তুমি তো এ-লাইনে আছ, যদি তোমার জানা শোনা।

ইরার ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। সে প্রায় ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলল, না বৌদি, ওর এমন কিছু হয়নি, আমি বলছি হয়নি। সে এমন বলেই দ্রুত বের হয়ে যাবে ভাবল, এবং সিঁড়ি ধরে নেমে যাবার মুখেই দেখল টিপু উঠে আসছে। বাগানের ভেতর থেকে উঠে আসছে। খুব লম্বা এবং ভীষণ একা মনে হচ্ছে মানুষটাকে। কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। সোজা সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ইরা ওর পেছনে ওপরে উঠে গেল। কিছু বলল না। অথবা ডাকল না। তারপর ঘরে ঢুকে সোজা না তাকিয়ে বলল, তোমার মনে আছে বোধহয়, আগামী শনিবার আমি চলে যাচ্ছি। দেশে ফিরছি।

টিপু খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, আগামী শনিবার কত তারিখ বল তো?

ইরা বলল, ভুলে গেছ! চোদ্দ তারিখ।

—তারিখটা লিখে রাখতে হবে। সব আজকাল ভীষণ ভুল হয়ে যায়। ক'টার ট্রেনে যাচ্ছ?

—সন্ধ্যার ট্রেনে। ইরা সময়টাও বলে দিল।

—ঠিক আছে। আমি তোমাকে তুলে দিয়ে আসব।

ইরা জবাবে কিছু বলতে পারল না। ওর ভিতরে ভীষণ কষ্ট। অথবা হাহাকার করে কাঁদতে পারলে যেন বেঁচে যেত। সে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে ভেবে খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। এবং প্রায় ছুটে বের হয়ে একটা ট্যাকসিতে চেপে বসল। তারপর বড় রাস্তা ধরে মানুষেরা যেমন বড় শহরে যায় ইরা আজ তেমনি বড় শহরে ফিরে যাচ্ছে। সেখানে তার পরিচিত বলতে বুঝি কেউ নেই। আজ থেকে সে পৃথিবীতে বড় একা এবং নিঃস্ব।

আর প্রতিদিন টিপু যেমন বিকেলে অথবা সকালে বের হয়ে যায় তেমনি বের হয়ে যেতে যেতে দেখছে, একই গাছের নিচে সে দাঁড়িয়ে থাকে। গাছটা কদমফুলের গাছ। সে দূরে আর যেতে পারে না। এখানে এলেই সেই ভিখারি মেয়ের মুখ, তার মৃত সন্তান চাদরে নিয়ে সে যেন বসে থাকে। গাছটা এখন ফাঁকা। মাঝে একদিন এক কুষ্ঠ রোগীকে পড়ে থাকতে দেখেছিল। এ-পথটা ছাড়া সে কিছুতেই অন্যপথে ইরার কাছে যেতে পারে না। তার রোজ রোজ ইরার কাছে যেতে ইচ্ছে হয়।

তার এখন দিন ক্ষণের হিসেব নেই। এমনকি ইরা চলে যাবে সে-দিনটাও ভুলে গেছে বোধহয়। যেমন অন্যদিন নীল রঙের বাস থেকে নেমে ঘুরে বেড়ায়, আজও তেমনি ঘুরে বেড়াবার সময় সেই নির্দিষ্ট গাছটার নিচে কি দেখে অবাক হয়ে গেল। আজ আর সে দেখতে পেল না সাদা চাদরের নিচে চন্দনের মতো শিশুরা শুয়ে আছে। বরং সে দেখে অবাক, অন্য এক বালকের সুষমামণ্ডিত মুখ। সে কিছু ফুল নিয়ে বসে রয়েছে। সারা বিকেল সে সবার কাছে ফুল বিক্রি করেছে। অবশিষ্ট কিছু রজনীগন্ধার ঝাড় বিক্রি হলেই সে বাড়ি ফিরে যাবে। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আসবে। আকাশ কালো হয়ে আছে। সবারই বাড়ি ফেরার তাড়া। ইরার বুঝি আজকালের মধ্যে যাবার কথা। সে দিন গুনে বুঝল আজই ইরা চলে যাচ্ছে। সে একদম ভুলে গেছিল।

সে এবার ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পৃথিবীতে চন্দনেরা এভাবে মরে যায়। তবু গাছে ফুল ফুটে থাকে। গাছের নিচে ভিখারি মেয়ের মৃত সন্তান—সাদা চাদরে ঢাকা, আবার সে দেখতে পায় সেখানে এক সুন্দর বালক একদিন চলে আসে ফুল বিক্রি করতে। এবং তার তখন কি যে ভাল লাগে। পৃথিবীটাকে ভারি সুন্দর মনে হয়। তার ভীষণ ভাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় ফের। ইরার জন্য এসময় ফুল নিয়ে যেতে না পারলে বেঁচে থাকা ভীষণ অর্থহীন। সে এবার ছেলেটার কাছে উবু হয়ে বসল। সব ফুল সে বুকে নিয়ে, একটা দুটো পড়ে যাচ্ছিল, সে তাও নিয়ে নিল, কারণ, তার মনে হচ্ছে, কিছু ফেলে যেতে নেই কোথাও—টিপু পয়সা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। সে জানে এখন কোথায় যাবে। বড় বেশী দূর মনে হচ্ছে ইরার কোয়ার্টার। সে এত দূরে বুঝি হেঁটে যেতে পারবে না। তার আগেই ইরা চলে যাবে। ইরার কাছে পৌঁছতে এত সময় লাগে সে জানত না! আর কেবল মনে হচ্ছে ট্রেন দ্রুত গতিতে ইরাকে নিতে চলে আসছে। সে একটা ট্রেনের চেয়েও বেশী দ্রুত গতিতে ছুটতে গিয়ে দেখল, চারপাশে মানুষের ভিড়। মানুষেরা ওকে ঠিক দৌড়ে যেতে দিচ্ছে না। সে কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে নাবালকের মতো ঘুড়ি ধরতে যেন ছুটছে। কোনো দিকে হুঁশ নেই। ওর কাছে শুধু ফুল। যাবতীয় ফুল সে কেবল এখন একজনের জন্যই নিয়ে যাবে। চন্দন বলে তার কেউ ছিল মনে করতে পারছে না। মা, বাবা, সব কেমন নিমেষে চোখের ওপর থেকে সরে যাচ্ছে। ট্রেন দ্রুতগতিতে আসছে তো আসছেই। যেন এক দ্রুত প্রতিযোগিতা সেই ট্রেনের সঙ্গে। কে আগে পৌঁছতে পারে ইরার কাছে। সে ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে ছুটছে। ও-পাশে পড়ে থাকল বিজ্ঞাপনের ছবি। সে হাসপাতালে ঢুকে কোনো মৃত্যুর গন্ধ পেল না। কি সজীব আর তাজা এই জীবনধারণ। আর কি আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত মানুষের ভালবাসা। মানুষের এই বেঁচে থাকা। সে ফুল নিয়ে ঠিক ইরার কাছে পৌঁছে গেল।

লাঞ্ছিতা

ঝুমির সকাল থেকেই বড় অস্বস্তি। রাতেও ভাল ঘুম হয়নি। শরদিন্দু বলে গেছে, ঝুমিদি তুমি মোটেও ঘাবড়াবে না। এবারে তুমি ঠিক পাস করবে। বিজয় স্যার তো বলল, ঝুমি তো ভালই পরীক্ষা দিয়েছে। এবারে ঝুমি খেটেছেও খুব।

তুমি অযথা চিন্তা করবে না।

সেই শরদিন্দু সকালেও এল না। দুপুরেও না। আজই উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হবার কথা। রেজাল্ট বের হলে শরদিন্দু ঠিক চলে আসত।

একবার কেন যে মনে হল, গৌরীর কাছে গেলে হয়। সে যদি কোনও খবর রাখে। পাড়ায় আরও দু'জন পরীক্ষা দিয়েছে। তবে তারা পাস করে যাবে। তাদের বাড়ি যেতেও তার সংকোচ। পরপর দু'বার ফেল করলে স্কুল থেকে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারে। সে কোন্ মুখে খবর নিতে যাবে এমনই সব ভাবছিল।

দুদুমণি বলবে, আমার ঝুমির মাথা পরিষ্কার নয়। মাথায় কিছু ঢোকে না। সবার কি সব হয়! আর ছেলেমানুষ, পড়ে কি লাট হবে। সেই তো হাঁড়ি ঠ্যালা। বিয়ের যোগ্য মেয়ে পড়ার নামে ধিং ধিং নেচে বেড়ালে হয়! দেখতে দেখতে বেলা তো কম গড়াল না। পড়ার নামে জুড়ে থাকলে শেষে যে আমও যাবে ছালাও যাবে। কুড়ির পর বুড়ি।

তা ঝুমির কুড়ি কবেই পার হয়ে গেছে। ক্লাশে একবারে পাস করা তার কোনও কালেই লেখা ছিল না। তার মাথায় কিছু ঢোকেও না। তবে দুদুমণি জোর করে স্কুলে পাঠিয়েছে। বড়মামাও চান, সে অন্তত উচ্চমাধ্যমিকটা পাস করুক। পাত্রপক্ষেরা নাকি আজকাল পাসটাস ছাড়া মেয়ে নিতে চায় না।

তখনই মনে হল, রাস্তায় কেউ সাইকেলের বেল বাজিয়ে বাড়ি ঢুকছে। শরদিন্দু। ঝুমির বুক ধুকপুক করছে। শরদিন্দু কি খবর দেবে সে জানে না। সে যে ঠাকুরের কাছে কত মানত করেছে, আমাকে পাস করিয়ে দাও ঠাকুর, আমার মুখ না হলে যে থাকে না। খোঁড়া মেয়েটার জন্য তোমার কষ্ট হয় না!

শরদিন্দু উঠোনে ঢুকেই বলল, ঝুমিদিদি, তুমি কোথায়!

ঝুমি ঘরের ভিতর। তক্তপোশে চুপচাপ বসে আছে। বের হয়ে বারান্দায় শরদিন্দুর মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছে না। কি খবর দেবে কে জানে! জীবনে পাস করা যে কি কঠিন বস্তু যেন কোনও অসমসাহসিক যুদ্ধের মতো, অথবা, বহু দূরের মাঠ অতিক্রম করে কোনও জলাশয়ের খোঁজ পেয়ে যাওয়া।

সে মাথা গোঁজ করে বসেছিল।

কিছুই তার ভাল লাগছে না। একা বাড়িটায় এভাবে বসে থাকা যে কত কঠিন, কেউ বোঝে না। দুদুমণি দুপুরে দুটো মুখে দিয়ে কোথায় বের হয়ে গেছে। নীলুমাসি গতকাল এসে তাকে সাহস জুগিয়ে গেছে, এবারে তুই ঠিক পাস করে যাবি। তোর মেসো খবর নিয়ে আসবে। তোকে স্কুলে যেতে হবে না।

শরদিন্দু ফের ডাকল, ঝুমিদিদি, তুমি কি বাড়িতে নেই। দরজা খোলা। ঠাইনদিকেও দেখছি না।

ঝুমির ইচ্ছে হল, ছুটে বের হয়ে যায়। মুখ করে শরাকে—এত চেঁচাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে বলবি তো! ঠাইনদিকে কিসের এত দরকার। কিন্তু সে পারে না। ফেল করার অপরাধে যেন আগেই সে কাহিল।

শরদিন্দু সাইকেল বারান্দায় ঠেস দিয়ে রাখল। এ-বাড়িতে সে বারান্দা পর্যন্ত উঠতে পারে। পাশে ঝুমিদির একটা ঘর আছে, জানলা আছে। কেউ এলে সে-ঘরটায় ঝুমিদি বসতে দেয়। তবে তার বেলা এই বারান্দাটুকই যথেষ্ট। একটা কাঠের চেয়ার আর একটা জলচৌকি পাতা থাকে। সে চেয়ারে বসে না। ঠাকুরকর্তা বেঁচে থাকতে, চেয়ারটায় বসে থাকতেন। বড়মামা বাড়ি এলেও বসেন, সে চেয়ারটায় বসার

দুঃসাহস কখনও দেখায়নি। জলচৌকিতে বসার আগে দরজায় উঁকি দিতেই দেখল, ঝুমিদি চুপচাপ বসে আছে ঘরের ভিতর। খুবই ম্রিয়মাণ। সে যে কি বলে!

তোমার রেজাল্ট খুব ভাল।

বলছে কি শরা! ঝুমি যেন হাতে প্রাণ ফিরে পেল। সবাই বড় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তার একটা পা কিঞ্চিৎ খাটো বলে সে খুঁড়িয়ে হাঁটে। পাশেই ছোটমামারা আলাদা বাড়িঘর করে উঠে গেছেন। সম্পর্ক খুব একটা ভাল না। তার পাস ফেল নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা নেই। ফেল করলেই খুশি। দুদুমণিরও পাস ফেল নিয়ে কোনও হায় আফশোশ নেই। এক নীলুমাসি ছাড়া তার কথা বড় কেউ ভাবেও না। রেজাল্ট খুব ভাল হয়েছে শুনে সে বলল, বোস। চা খাবি? মার্কশিট এনেছিস?

শরা আমতা আমতা করে বলল, মেসো যে মার্কশিট স্কুল থেকে আগেই নিয়ে গেছে। নীলুমাসি বিকেলে আসবে।

ঝুমির মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল।

তুই কেন তবে গেছিলি! পাস না ফেল, তার কোনও কথা নেই। রেজাল্ট খুব ভাল! আমি তো ইংরাজিতে ভাল না। তুই খবর নিলি না আমি পাস করেছি কি না।

রোল নম্বর না দিলে জানব কি করে!

তার খুবই ভুল হয়ে গেছে। শরারও বোধহয় খেয়াল ছিল না। নীলুমাসি না এলে জানতেই পারবে না। রোলনম্বর সে জানে, আর মাসি জানে। যেন সবার কাছ থেকে তার এই নম্বরটা আড়াল করে রাখার জন্যই সে কাউকেই বলেনি, তার রোলনম্বর কত। ফেল করে করে তার মাথাও বোধহয় ঠিক নেই।

সে বলল, ভাল রেজাল্ট কি করে বুঝলি।

বিনয় স্যার বলল, ঝুমিটা ইংরাজিতে এত কাঁচা, ইস্ মেয়েটার বড় দুর্ভাগ্য। সব বিষয়ে এত ভাল নম্বর...

ফেল করেছি?

তা তো জানি না ঝুমিদিদি।

তবে কি জানিস!

সব বিষয়ে খুব ভাল পাস করেছ। একটা বিষয়ে নম্বর ভাল না।

আর কিছু বলেনি!

আর কি বলবে?

ঝুমির মাথা খারাপ হবার জোগাড়। তার এই বিধি নির্বন্ধ, একটা বিষয়ে সে খুবই কাঁচা। তার আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি নীলুমাসির কাছে ছুটে যায়। কিন্তু বাড়িটা খালি রেখে যায় কি করে। সে তার সাইকেলে ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসতে পারে। তার সাইকেলের টায়ার পানচার—সাইকেল নিয়ে বের হওয়া কঠিন।

শরা একটা কাজ করবি! একবার মাসির বাড়ি ঘুরে আসবি। মেসোর কাছ থেকে খবরটা নিয়ে আসবি।

চা হবে না!

হবে, ঘুরে আয়।

কিন্তু শরা খুবই গড়িমসি করছে। কোনও তার ব্যাকুলতা নেই। শরা অবশ্য এমনিতেই কিছুটা গোবেচারা স্বভাবের। মাথারও বড় ঠিক নেই। বয়সে তার চেয়ে বেশ বড়, কলেজে পড়তে পড়তে হঠাৎ একবার কেন যে বিবাগি হয়ে গেল মাস তিনেক খোঁজই ছিল না। বাজারে পাটের আড়ত তার বাবার। সে কারবারে কিছুতেই বসতে চায় না। দাদুমণির যজমান তারা। ওর বাবার দেবদ্বিজে ভক্তি একটু বেশী মাত্রাতেই। ঠাকুরকর্তার পরামর্শ ছাড়া এক পা বাড়াতেন না। দাদুমণি বেঁচে থাকতে, রোজ সকালে এসে একবার কর্তার আশীর্বাদ না পেলে, মনের মধ্যে খিঁচ থেকে যেত। শরার মধ্যেও এই স্বভাবটা আছে।

ঝুমি ফের বলল, কি হল, বসে থাকলি কেন?

তুমি বলছ যেতে!

তোর মুণ্ডু বলছি। এতক্ষণ তবে কি শুনলি, কি বুঝলি!

এবার ফেল করলে সবার কাছেই বড় খাটো হয়ে যাবে ঝুমি। এই অপমান বোধেই তার জীবনের নিষ্ক্রিয়তা যেন আরও বাড়ে। শরাকেও এখন তাড়িয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচে। সে চুপচাপ শুয়ে থাকতে চায়। দরজা জানলা বন্ধ করে অন্ধকারে চোখ বুজে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। শরাটা চা-এর আশায় বসে থাকবে সে জানে। অবশ্য তার অন্য কিছু আশা আছে কি না জানে না। তাকে একা পেলেই চা খাবার জন্য বায়না করতে থাকে। দুদুমণি বাড়ি থাকলে সে শুধু খোঁজখবর নিয়েই চলে যায়। দুদুমণি নেই, শরা যেন বেশ সুযোগই পেয়ে গেছে।

বাইরে বের হয়ে বলল, বসে থাকলি কেন!

চা-টা খেয়ে গেলে ভাল হত না!

আসলে শরা সবই জানে। সে বলতে পারছে না, ঝুমিদি তুমি পাস করতে পারনি। বাড়িতে একা আছে বলেই ঝুমিদিকে খবর দিতে সাহস হয়নি। ঠাইনদি থাকলে তার এতটা চিন্তা হত না। ঝুমিদির ছোটমামাও বাড়ি নেই বোধহয়। এসময়ে কখনই থাকে না। মোড়ে দোকান আছে। সকালেই চলে যায়। দুপুরে বাবার খাবার দিয়ে আসে মিলন। তিনি বাড়ি থাকলেও হত। আজ যে ঝুমিদির উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হবার কথা, কারও বোধহয় খেয়ালও নেই।

সে পড়েছে মহা ফাঁপরে।

নীলুমাসির রিকশা করে চলে আসার কথা। নীলুমাসিই বলে দিয়েছে, তুই কিছু বলতে যাস না। যা দিনকাল, কখন যে কি করে বসে ঠিক নেই। আমি তোর মেসোকে নিয়ে দুপুরে যাচ্ছি। মা বুড়ো মানুষ, মা একা সামলাতে পারবে না।

শরা বলল, ঠাইনদি কোন্‌খানে গেছে?

জানি না।

ঠাইনদি জানে না, আজ তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট বের হবে। ঠাইনদি কি তোমার পাস ফেলের খোঁজে বের হয়েছেন?

তুই এখন যাবি, না বসে বসে বকবক করবি!

বসে থাকলে রাগ করবে!

তোর উপর রাগ করা যায় বল! বলেই মুখের উপর খটাস করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এই রে সর্বনাশ! এই ঝুমিদি, তুমি দরজা বন্ধ করলে কেন? শরদিন্দুর আতঙ্ক, দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঝুমি যদি কিছু করে বসে। তারপরই মনে হল, না এত সহজ না, জানলই না, পাস ফেলের কথা, পাস ফেলের কথা না জেনে কেউ গলায় দড়ি দেয় না। দু'বছর আগে সুধন্যকাকার মেয়েটা পাস করতে পারেনি বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। তারপর থানাপুলিশ—নশিপুরের কাছে লাশ পাওয়া গেল। রেলে গলা দিয়েছে। সুধন্যকাকার একটাই মেয়ে। পাস ফেলের আতঙ্কে মরেই গেল মেয়েটা। কি সুন্দর ছিল দেখতে। ঝুমিদির মতো সুন্দর না হলেও দেখতে বেশ ভাল ছিল। হলুদ রঙের ফুলছাপ সালোয়ার কামিজ পরে বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলে যাবার সময় মনে হত, একঝাঁক প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। একটা প্রজাপতি হারিয়ে গেল।

অবশ্য তাকে দেখলেই ক্ষ্যাপাত, ও শরাদা, জান তো খবর!

কি খবর রে!

ঝুমিদির পাত্র দেখা চলছে। তোমার কি হবে গ শরাদা। জগদ্ধাত্রী ঠাকরুনের এবারে বিয়ে হয়ে যাবে।

অমন কথা বলিস না। লোকে শুনলে কি বলবে! ঝুমিদির মতো ক'টা মেয়ে আছে কলোনিতে বল! ঝুমিদির নখের যোগ্যি নস। কত গুণ আছে জানিস, কি সুন্দর সূচের কাজ জানে! ফুলফল লতাপাতা শাড়ির আঁচলে যেন কথা বলে।

ঝুমি তার শাড়িতে ফলস নিজেই লাগায়। আঁচলে সূচের জরির কাজও করে নিতে জানে। ব্লাউজের হাতায় দুটো ফুল একটা কুঁড়ি এমন সুন্দর রঙিন সুতোয় এঁকেছিল যে শরদিন্দু দেখে অবাক।

তুমি করেছ ঝুমিদি!

তবে কে করবে।

ফাইন। একটা কথা বলব ঝুমিদি?

তোর আবার কি কথা!

সবার এত কথা থাকে, আমার কোনও কথা থাকতে পারে না?

তোর কথার কোনও দাম নেই শরা। তোর কথার কোনও উত্তরও দেওয়া যায় না।

না, বলছিলাম, এই যে তোমার সুন্দর পা দু-খানি, আলতা পরলে বড় মনোরম লাগে। পা দু-খানি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। কর্তাঠাকুরের বাড়িঘরে তুমি শোভা হয়ে বিরাজ করছ, একবার এদিকে এলে তোমাকে না দেখে যেতে পারি না। আমার যে কি হয়। তোমাকে দেখতে পেলে দিন বড় ভাল যায়।

ঝুমি বোধহয় এসব কারণেই শরদিন্দুকে মুখে দূরছাই করলেও বাড়ি এলে তাড়িয়ে দিতে পারে না। চা খেয়ে যেতে বলে। দুদুমণি ব্রজসুন্দরীর চোপাকে অবশ্য শরা খুব ভয় পায়।

আবার শরাটা এসেছে জ্বালাতে, ঝুমি শিগ্‌গির তাড়া। আস্কারা দিস না।

ঠিক বাড়ির কুকুর নধরের মতো। কুকুরটা বারান্দায় শুয়ে থাকে, বারান্দায় উঠে আসে। ঘরে ঢুকতে পারে না। ঘরে ঢুকলেই যেন জাত যাবে। নধরকে আবার এ-বাড়িতে বড়ই দরকার। ঝুমি কিংবা ব্রজসুন্দরী যেই থাকুক, কুকুরটা বাড়ি পাহারা দিলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কুকুরটার সেবা যত্নও একটু বেশী মাত্রাতেই হয়। ব্রজ তার ভাত থেকে আলাদা করে কিছুটা খাবার থালায় রেখে দেয়। খেয়ে উঠে দু-বেলাই নধরকে ডেকে খাওয়াবার স্বভাব। বড় বিশ্বাসী কুকুর।

শরদিন্দু দেখল, আজ বাড়িতে কুকুরটাও নেই। বোধহয় ব্রজসুন্দরীর পিছু নিয়েছে। ব্রজসুন্দরী ফিরে এলে কুকুরটাও ফিরে আসবে। এ-বাড়িটায় এই তিনজন ছাড়া আর আছে কিছু গাছপালা, বিঘে তিনেক জমি জুড়ে কত রকমের সব ফলের গাছ, ফুলের গাছ। কর্তাঠাকুরের আমলেই সে জানে গাছগুলো লাগানো হয়েছে। একটি স্থলপদ্মের গাছও আছে। পূজার সময়ে গাছটায় এত ফুল ফুটে থাকে যে, বাড়িটাকে তখন কোনও তপোবনের মতো মনে হয়। সেই কবে সব লাগানো গাছ এখন বৃক্ষ হয়ে গেছে।

ঝুমিদির এত বড় বিপদে সে না থাকলে চলবে কেন। দরজা বন্ধ করে দিলেও সে চলে যেতে পারছে না। নীলুমাসি না এলে সে যেতে পারছে না। ঝুমিদি যতই ক্ষেপে থাকুক, তার দায় আছে—একা থাকলে ঝুমিদি ঘাবড়ে যেতে পারে, একা থাকলে ঝুমিদি দরজা খুলে পাড়াতে বের হয়ে গেলেই, সব জেনে ফেলবে। গৌরী ঠিক খবর দিয়ে দেবে, ঝুমিদি তুমি পাস করতে পারনি। নীলুমাসি এখনও কেন যে আসছে না।

সে তো ভুজং ভাজুং দিয়ে কিছুটা আভাসও দিয়েছে, আবার সাফ সাফ বলেও দেয়নি, তুমি পাস করতে পারনি। গৌরী, মালিনী পাস করেছে। আকাশি তোমার মতো ডাব্বা খেয়েছে। কলোনিতে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট চাউর হতে যে বেশিক্ষণ লাগে না ঝুমিদি ভালই জানে। ঝুমিদির সাহসই নেই, গৌরীদির বাড়ি গিয়ে খবর নেবার। তবু এসময় ঝুমিদির মাথা ঠিক থাকার কথা না, যদি বের হয়ে চলেই যায়—তারপর যদি খবরটা নিয়ে একা ফিরে আসে, বাড়িতে কেউ নেই, কুকুরটা থাকলেও না হয় একটা কথা ছিল, এমন একটা অসময়ে ঝুমিদিকে ফেলে সে চলে যেতে পারে না। নীলুমাসি এলেই সে উঠে পড়বে।

একবার সে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, যদি নীলুমাসি আসে, একবার বাড়ির গাছগুলোর ছায়ায় তার চোখ চলে যাচ্ছে, যদি ব্রজসুন্দরীকে দেখা যায়। যে কেউ এলেই হয়ে যায়। অবশ্য নীলুমাসি তাকে বলেনি, তুই পাহারায় থাকিস, আমি না যাওয়া পর্যন্ত তুই বারান্দায় বসে থাকিস, অথচ নীলুমাসি কেন যে ভাবলেন খারাপ খবর বাতাসের আগে ভেসে আসে। সে না বললেই ঝুমিদির পাস ফেলের খবর আটকে থাকবে হয়!

তাকে এমনিতে কেউ কেউ অবশ্য নির্বোধ ভেবে থাকে। সোজা সরলও ভেবে থাকে, মাথা খারাপও ভেবে থাকে, অবশ্য তাতে তার কিছু যায় আসে না। ঝুমিদিকে সে কবে থেকে দেখে আসছে, সেও তখন ছোট ছিল ঠিক, ঝুমিদিকে নিয়ে সে একবার ঝুলনযাত্রায়ও গিয়েছিল। ঠাকুরকর্তা পূজায় বসে বলেছিলেন, তুই শরদিন্দু না! কৃত্তিবাসের ব্যাটা।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যা তো, ঝুমিকে গিয়ে বলবি, নামাবলিটা যেন দিয়ে যায়।

সে এসে খবর দিলে, ব্রজসুন্দরী বলেছিলেন, এই ঝুমি তোর দাদুমণির নামাবলিটা শরাকে দিয়ে দে। বুড়ো হয়ে গিয়ে ভীমরতি ধরেছে তেনার। কিছু মনে থাকে না।

সে বলেছিল, ঠাইনদি, আমি নিয়ে গেলে হবে! বাসি জামাকাপড়ে আছি। পূজা আচ্চার ব্যাপার।

তখনই ব্রজসুন্দরী ঝুমিকে তার সঙ্গে দিয়েছিলেন। ঝুমি তার সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে রাজবাড়ির গেট পার হয়ে দোলমঞ্চে হাজির হয়েছিল। ঝুমির হাতে সুন্দর রঙ-বেরঙের নামাবলি। ঠাকুরের পায়ের ছাপ নামাবলিতে। কোঁকড়ানো চুলের ঝুমি সেদিন থেকেই কেন জানি তার ঝুমিদি হয়ে গেল। সে বলেছিল, চল ঝুমিদি, তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি। ঠাকুরকর্তার ফিরতে রাত হবে।

সে যে কী করে!

দরজা বন্ধ করে ঝুমিদি কি করছে!

কোনো সাড়াশব্দও নেই।

তার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

ঝুমিদি কি আঁচ করতে পেরেছে।

সে ডাকল, ও ঝুমিদি, দরজা বন্ধ করে রেখেছ কেন? দরজা খোলো। দরজা না খুললে আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না। নীলুমাসি চলে আসবে। বরং কাজে কম্মে হাত লাগাও। চা করে খাওয়াও। তুমিও খাও। কাজের মধ্যে থাকলে মন ভারমুক্ত হয় জানো।

না, তবু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজায় ধাক্কা দিলে হয়। তার যে সত্যি খারাপ লাগছে। ঝুমিদি কিছুদিন থেকেই বড় হীনমন্যতায় ভুগছে।

আরে বোঝো না, পাস ফেল নিয়ে ভাবতে হয়। তোমার বড়মামা তো ম্যাট্রিক পরীক্ষায় শুনেছি অঙ্কে ফেল করেছিলেন। তাঁর কি কিছু কমতি আছে। কত নামী! তিনি তো তাঁর বাবাকে খবরটা দিতে গিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মানুষ ছিলেন বটে, তোমার দাদুমণি। কোনও খবর রাখেন না। ক'বিষয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে হয় তাও তিনি জানতেন না। পুত্রটি কেঁদে ফেললে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন মনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ক'টা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছ?

বড়মামা নাকি চোখ মুছে বলেছিলেন, দশটা বিষয়ে। আর সেই শুনে ঠাকুরকর্তার কি দিগ্বিজয়ী হাসি! হা হা হা। দশটা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছ, একটা বিষয়ে পাস করতে পারনি। কে কবে সব বিষয়ে পাস করেছে, দ্যাখাও দিখিনি। যাও হাত মুখ ধুয়ে আহারে বসোগে।

আর তখনই খটাস করে দরজা খুলে ঝুমি চিৎকার করে উঠল, প্যাচাল থামাবি! না বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব। আমি মরছি, আমার জ্বালায়।

যাক দরজা খুলেছে। শরদিন্দুর চোখ দুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঝুমিদি কোনও আকাম-কুকাম করতে পারে না। বাড়িটার মাহাত্ম্যই অন্যরকমের।

ঝুমি দরজা খোলাই রাখল। দরজা ফের বন্ধ করে দিলেই ফাঁপরে পড়ে যেত। সে বসে বসে পা নাড়াচ্ছে। এটা তার হয়। কারণ ঝুমিদি দরজা খোলা রেখেছে, মনের মধ্যে আগেকার পীড়ন নিশ্চয়ই কিছুটা লাঘব হয়েছে। সেও নিজেকে বেশ হালকা বোধ করল। পরীক্ষার সময়ই দেখেছে, ঝুমিদির মুখ কেমন শুকিয়ে যায়। রাত জেগে পড়ে কালিও পড়ে যায় চোখে। পাস ফেল নিয়ে তার এতটা বিভ্রান্তি, সহ্য হয় না।

ঝুমি ভেতর থেকেই বলল, এই তুই ওঠ এবার। আমাকে একা থাকতে দে।

আমি উঠি! তুমি আমাকে কি ভেবেছ! আমার কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! তোমাকে একা ফেলে গেলে নীলুমাসি খারাপ ভাববে না! মানুষের সময়-অসময় বলে কথা!

ঝুমি জানে শরাকে জোর করে বাড়িছাড়া করা যাবে না। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে। তবু যাবে না। কেন যাবে না, তাও সে বোঝে ঠিক, তবে আধপাগলা, অবশ্য আধপাগলা ভাবতে তার কুণ্ঠা হয় অথবা মনে হয় মানুষের কার কি চাই, অথবা অকিঞ্চিৎকর কে কার কাছে কতটুকু অথবা প্রতিষেধক বোধেই সে নীলুমাসির অপেক্ষায় বসে আছে। শরদিন্দুর এমন স্বভাব যে তাকে অপমান করলেও বোঝে না। তার যশ সুখ্যাতি ছাড়া শরদিন্দু কিছু বোঝেও না। এমন একজন কেউ যদি, তারই বয়সী, অথবা কিছু

বেশী বয়সের বারান্দায় বসে থাকতে চায়, তাকে দুরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়াও কঠিন। একমাত্র ব্রজসুন্দরীর কাছেই শরদিন্দু জব্দ।

দেখলেই ব্রজসুন্দরীর এক কথা, আবার তুই। কি দরকার আমার বাড়িতে। কে তোকে ডেকে পাঠিয়েছে?

ঝুমিদি যে খবর দিল, শহর থেকে রেশমি সুতো এনে দিতে হবে।

ঝুমি! ঝুমি।

যাই।

তুই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিস?

শরদিন্দুকে যা নয় তাই বলবে, এবং অপমান করবে—মরতে আর জায়গা পাস না। দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াস। তোর বাপের কি আক্ষেপ, অকাল কুষ্মাণ্ড, তার তো ধনে জনে ঘর ভর্তি। তুই একটা মাত্র পোলা, মাথা ঠিক না থাকলে তার চলে। যা বাড়ি যা।

ঝুমি অগত্যা কি করে!

এই শরা, নে টাকা। এক ডজন সোনালী রঙের রেশমি সুতো আনবি। খুব দরকার।

শরদিন্দু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

আজ তো আমার মেলা কাজ ঝুমিদি। কাল গেলে হবে না!

কালই যাবি। তারপর টাকাটা হাতে ধরিয়ে মনে করিয়ে দেয়, যত্র তত্র আমার সুখ্যাতি করে বেড়াস না। তুই সুখ্যাতি করলে আমার ইজ্জত যায় জানিস। আমাকে জগদ্ধাত্রী ঠাকরুন বানিয়ে বসে থাকিস, লজ্জা করে না বলতে। যার একটা পা খোঁড়া তার পক্ষে জগদ্ধাত্রী ঠাকরুন হওয়া সাজে। বল, সাজে!

এইসব ভাবতে গিয়ে ঝুমির কেমন মায়া হয়। শরদিন্দু তার হাতের চা না খেলে কেন যে মজা পায় না। শরদিন্দুর কোনো অভাবও নেই। বাড়িতে সে ফিরে গেলেই মাসিমা হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচে। শাসন করারও বয়স নেই। কলেজেও যায় না। টো টো করে কলোনির এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়ায়। যার যত বিপদ, শরদিন্দু অনায়াসে মাথায় তুলে নিতে পারে। এতে যে তার ক্ষতি হয় সে তাও বোঝে না। কিছুটা পরোপকারী স্বভাব থাকলে যা হয়। কাউকে বাসে তুলে দেওয়া, কাউকে স্টেশনে দিয়ে আসা, হাসপাতালে ছোটা, মনা কবিরাজের বউ হাঁপে কষ্ট পাচ্ছে, কত জায়গায় ছুটে গেছে শরদিন্দু, টোটকা, কবচ তাবিজ কিছুই বাদ রাখেনি। তাকে কাজ দিলে সে অকপটে সব কাজ সবার করে দেয়।

পড়াশোনায়ও মাথা আছে। ব্রজসুন্দরী পর্যন্ত ঝুমিকে কথায় কথায় তখন খোঁটা দিতে ছাড়ত না।

দ্যাখত, শরা কেমন বছর বছর পাস করে যায়, আর তুই খোঁটার দড়ি থেকে নড়তে চাস না। তোর কিছু হয়!

তা ঠিক, তার যে কিছু হবে না সে জানে। শরদিন্দুর মতো তার মাথা পরিষ্কারও নয়। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে শহরের বড় কলেজে পড়ছিল। ভাল পাসও করে যেত। পরীক্ষাই দিল না।

এ-বিষয়ে শরাকে সে ঘাঁটায় না।

অদ্ভুত তার যুক্তি। সে কেন পরীক্ষা দিল না, কিছুদিন বাপের টাকা পয়সা মেরে বড় বড় শহরে ঘুরে এল, খড়গপুরে তার পিসি থাকে, সেখানে ঘুরে এল, লামডিং, জায়গাটা নাকি এত সুন্দর যে, তার ইচ্ছে হয় ঝুমিদিকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে যায়। পৃথিবীটা কত বড় বই পড়ে নাকি জানা যায় না। পাহাড়ে চড়ার সময় বার বার তার নাকি ঝুমিদির কথা মনে হয়েছে।

তাই বলে পরীক্ষা না দিয়ে পালালি!

পালাইনি তো। পালাব কেন। বাবাকে বলেই গেছি। আমার পড়াশোনা করতে আর ভাল লাগছে না, বলতেই কারবারে জুতে দিতে চাইল।

তোর বাবার এত বড় কারবার, তুই না দেখলে হয়।

শরদিন্দু হাই তুলে বলেছিল, উঠি ঝুমিদি। তুমি আমার পিছনে এত কেন লাগো বল তো। বছর বছর তুমি ফেল করবে, আর আমি পাস করব, হয়! পড়াশোনার খ্যাতাই মুড়ে দিলাম।

ঝুমি তাজ্জব। বলে কি শরা! লোকে শুনলে কি ভাববে! শরার এমন সব নিষ্পাপ কথাবার্তা কত বড় গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে পারে, আরে শরদিন্দু, তুই অবলীলায় বলে দিতে পারলি, পাহাড়ে ওঠার

সময়, ঝুমিদি কেবল তোমার কথা মনে পড়ছিল। ভাগ্যিস ব্রজসুন্দরী কানে কম শোনে, বুড়ি শুনতে পেলে তোর ঠ্যাং আস্ত রাখত! কায়েতের বাচ্চার এত বড় আস্পর্ধা।

কত কথাই যে মনে হয় ঝুমির।

ঝুমির আতঙ্ক, এইসব ইচ্ছের কথা শরা অকপটে যদি পাড়ার বউদের কাছে বলে ফেলে, বলতেই পারে, এই যে শরা ঠাকুরপো, কোথায় উধাও হয়েছিলে, কলোনিতে সাড়া পড়ে গেল। তুমি নিখোঁজ হয়ে গেছ—তারপর শরার যা স্বভাব, সে যদি বলে দেয়, পড়তে ভাল না লাগলে কি করব। কত দেশ দেখলাম, ভারতবর্ষ যে বড়ই প্রকাণ্ড ভূখণ্ড। তার যে মেলা হাত-পা। তার নাভিকুণ্ড পর্যন্ত দেখে এসেছি। তারপর যদি বলে দেয় পাহাড়ে ওঠার সময় কেবল ঝুমিদির মুখ দেখতে পেতাম। ঝুমিদির টানেই ফিরে এসেছি। তবে তার রক্ষা আছে!

ঝুমি শরদিন্দুর কথাবার্তা শুনে কখনও নিজেই জ্বলে ওঠে।

খবরদার, কাউকে যদি আমার কথা বলিস, তোর একদিন কি আমার একদিন? তোকে আর বাড়িই ঢুকতে দেব না। আবার কখনও সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। না হলে, টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলতে পারত না, আমার জন্য এক ডজন রেশমি সুতো নিয়ে আসবি। তার তো কোনও উপায় ছিল না, শরদিন্দু নির্বিকার চিত্তে কত সহজে মিছে কথা বলে ফেলল। ঝুমিদি ডেকে পাঠিয়েছে। মরণ! তার আর কাজ নেই। কাজেই শরা যাতে অপ্রস্তুত না হয়, সে তাকে এক ডজন রেশমি সুতোর টাকা দিয়ে ব্রজসুন্দরীর চোপা থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করেছিল।

ঝুমির মেজাজ ভাল না। শরদিন্দুকে চা খাওয়ালে চলে যেতে পারে। ঝুমিদির হাতের চা বড় মধুর। ঝুমিদি কত যত্ন নিয়ে তার জন্য চা বানায় তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারে। শরাকে শাসন করতে গেলেও তখন ঝুমির কেন যে মায়া হয়।

সে বলল, চা করে দিচ্ছি। চা খেয়ে কিন্তু একদণ্ড দেরি করতে পারবি না! সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বি।

তুমি চা খাবে না?

না। তোর জন্যই করছি।

তাহলে থাক। নীলুমাসি চলে এলেই উঠে পড়ব।

ক'দিন থেকে বৃষ্টি নেই। অথচ আকাশ গুম মেরে আছে। হাওয়াও দিচ্ছে না। গুমোট গরমে ভ্যাপসা হয়ে আছে ঝুমি। তাছাড়া এসময়ে সে চা খায়ও না। শরা এলে অবশ্য চায়ের সময়-অসময় থাকে না। সে একা বাড়ি থাকলে শরাকে চা করেও দেয়। সে না খেলে শরা সাফ বলে দিয়েছে, সেও চা খাবে না।

ঝুমি না বলে পারল না, তোরা আমাকে কি পেয়েছিস বল তো? নিজের জ্বালায় মরছি, তোকে দিয়ে যদি কোনো কাজ হয়।

ঝুমি কথা বলছে আর কাজ করছে। এই যেমন কাপ প্লেট সাজিয়ে স্টোভ ধরিয়ে কেটলিতে চায়ের জল বসিয়ে দেওয়া, শরা কি করছে, কিংবা নীলুমাসিকে যদি রাস্তায় দেখা যায় মাঝে মাঝে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখা, দুদুমণি কখন যে খেয়ে কোথায় বের হয়ে গেল—অবশ্য কোথায় যায়, কেন যায় তাও সে বোঝে। ঘরে সোমত্ত মেয়ে থাকলে কার ঘুম হয়, এসব নানা অজুহাতে ইদানীং পাত্রপক্ষের খোঁজে বের হয়ে যাবার স্বভাব দুদুমণির। বয়েসকালে বিয়ে দিতে না পারলে গলায় কাঁটার খোঁচা তীক্ষ্ণ হতে থাকে, এও সে বোঝে। তার কপালে কি যে লেখা আছে!

সে বারান্দায় বের হয়ে শরাকে চায়ের প্লেট ধরিয়ে দিল, কোনও কথা বলল না।

তোমার আছে তো?

আছে।

রেশনে কেরোসিন তেল দিচ্ছে। কাল সকালে দিয়ে যাব।

ঝুমি কেমন হাঁসফাঁস করছে গরমে। এদিকটায় লাইট আসেনি। কবে আসবে তাও কেউ জানে না। বড় সড়কের দিকটায় লাইট এসে গেছে। সেজমামার বাড়িতে টিভি দেখতে সে রোজই বিকেলে চলে যায়। সিরিয়াল দেখার নেশা আছে। পরীক্ষা হয়ে গেলে বুঁদ হয়ে সব সিরিয়াল দেখেছে। রেজাল্ট বের হবার খবরে সেই যে পাগল পাগল ভাবটা দেখা দিল, আজ যেন তার শেষকাল। এসপার না ওসপার।

সে ক্রমেই বড় অস্থির হয়ে পড়ছে। নীলুমাসির উপরও ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। এই তোমার কর্তব্য। বুঝবে না কত উচাটনে আছি।

শরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, যাক এসে গেছে।

ঝুমি দৌড়ে উঠোনে বের হয়ে দেখল কুকুরটা বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে ল্যাকপ্যাক করে বাড়ির দিকে আসছে। শরা আর একটা কথা বলল না, সাইকেলে চেপে রওনা হয়ে গেল। ঝুমির এত উচাটনের মধ্যেও দমফাটা হাসি। কুকুরটাকে দেখেই শরা পালাল। কুকুরটার পেছনে পেছনে যে ব্রজসুন্দরী নির্ঘাত আসছে শরা ঠিক টের পেয়ে গেছে। সে আর থাকে!

দুই

আকাশীরও বিয়ে হয়ে গেল। আকাশীর বিয়েতে সে খুব খেটেছে। আকাশীর বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে আরও যেন একা হয়ে গেল।

বসে থাকলে কেমন আলস্য লাগে—কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না। কত কাজ পড়ে আছে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, তারে মেলা শাড়ি সায়া তোলা, কল থেকে জল আনা—কাজের অন্ত নেই। আকাশীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই সে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

পাড়ায় তার আর একজনও সমবয়সী নেই, যাদের বিয়ে হয়ে যায়নি। যাদের বিয়ে হয়নি, তারা কলেজে যায়, কিছু না কিছু নিয়ে সবাই মজে আছে। তারই কিছু যেন করার নেই।

তবু আকাশী ছিল, একসঙ্গে শহরে যেত, সিনেমা দেখত। এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে দুজনে খেতে খেতে বাড়ির পথ ধরত। আর নানাভাবে দুজনের মধ্যে ছিল অন্তরঙ্গ রসিকতা।

সে পরীক্ষায় পাসও করতে পারল না। নীলুমাসি, মেসো এসে দুঃসংবাদটি দিয়ে বলেছিল, মন খারাপ করে বসে থাকিস না। সবার ভাগ্যে সব হয় না।

সে সবই মেনে নিয়েছে। তার হায় উত্তাপও যেন আর নেই। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ভালই হয়েছে। শরা সেই আগের মতোই আসে। আবার আসেও না। তবে খবর দিলে শরা যতই ব্যস্ত থাকুক একবার দেখা না করে যাবে না। তার আর খবর দেবারই বা আছেটা কি। ফুটফরমাস খাটতে শরার মতো ওস্তাদ লোক কমই আছে সে জানে।

আকাশী ছিল বলে, জীবনটা তার অনেকটা ভরে ছিল। আকাশীও তার মতো, মাথায় কিছু ঢোকে না। সেও বছর বছর গড়িয়ে গড়িয়ে একই সঙ্গে পরীক্ষায় বসেছিল—তারও খুঁটি আলগা হয়নি। দু'জনেই তারা এক গোয়ালের গরু, এমনও অনেকে আড়ালে আবডালে বলত। সে বড় হতে হতে অনেক কিছুই অবহেলা করতে শিখেছে, এইসব কথাবার্তা শুনে তার মাথা গরম হত না। যাকে ভগবানই মেরে রেখেছেন, তার আর উপায় কি!

তবু আকাশী ছিল বলে জীবনটা যেন তার ভরেই ছিল। শহর থেকে ফিরতে দেরি হলে দুদুমণি বড় সড়কে উঠে অপেক্ষা করত। দিনকাল ভাল না, রাত হলে দুশ্চিন্তা হবারই কথা। তাকে দেখতে পেলেই চোপা করত—দ্যাখ তর কি হয়! ধিঙ্গি হয়েছিস, টের পাস না। ভগবান কেন আমারে নেয় না।

সংসারে তাকে নিয়ে ভাববার এখনও এই একজনই আছে। নীলুমাসিও আছে। তবে পরের সংসার, মাসিই বা তার জন্য কতটা কি করতে পারে!

কুকুরটা দাওয়ায় শুয়ে আছে। বাড়ির পাহারা। এখন এই বাড়িতে সে আর তার কুকুর নধর। ব্রজসুন্দরীর প্রিয় সঙ্গী।

বছর চারেক হল, ছোটমামা সামনের জমিটায় বাড়িঘর করে উঠে গেছেন। বারান্দায় বসে থাকলে, ছোটমামার বড় ঘরের চাল দেখা যায়। ভাইবোনদেরও কথাবার্তা কানে আসে। পাশের জমিটা খালি, বাড়িঘর ওঠেনি। মেজমামা পাড়ার আর একদিকে জমি কিনে আলাদা হয়ে গেছেন দাদুমণি বেঁচে থাকতেই।

আগে এই বাড়িটাতেই ছিল চার ভিটিতে চারখানা ঘর। ঠাকুরঘর, গোয়ালঘর আলাদা। দাদুমণি বেঁচে থাকতে পূজা পার্বণে সে ছিল তাঁর সঙ্গী। মায়ের কথা সে মনে করতে পারে না। তবে নীলুমাসিই

বাবাকে বলে ঝুমিকে যে সঙ্গে নিয়ে এল, আর তার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দুদুমণি আর মাসির কাছেই সে মানুষ।

একা বারান্দায় বসে থাকলে তার যে কত কথা মনে হয়। সংসারে সবাই থাকতেও তার যেন কেউ নেই।

তবু দুদুমণি বেঁচে আছে বলে রক্ষা। দেখতে সে খারাপ না। শ্যামলা রঙ, মাঝারি গড়ন, চোখ দুটো সবাই বলে বেশ ডাগর। সে মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখার সময়, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আকাশীর বর দেখতে বেশ সুশ্রী। তার কপালে কিছুই জুটছে না। শরদিন্দুর পাগলামিতেও সে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার কিছুদিন ডুব মারলে সেই শরাকে ডেকে পাঠায়। আর কেউ না থাকুক, শরা আছে, ফুটফরমাস খাটার জন্য তাকে বড় দরকার।

দুদুমণি প্রতিবেশীদের বলে, আত্মীয়-স্বজনদের বলে পাত্রপক্ষ যোগাড় করার চেষ্টায় আছে। কিন্তু দেনাপাওনায় আটকে যাচ্ছে। তার গুণও নেই কিছু, পায়ের খুঁতও তার জীবনে একটা বড় বিড়ম্বনা—বড়মামার কথাও রাখতে পারল না, উচ্চমাধ্যমিক পাস হলেও না হয় কথা ছিল। বাজারে তার কোনও দামই নেই। দেনাপাওনার বহর শুনলেই এটা সে টের পায়। দেনাপাওনা, পণের টাকা কে যোগাবে তার হয়ে! সে কেমন মাঝে মাঝে বিমর্ষ হয়ে বসে থাকে।

কে দেবে? আসলে তাকে নিয়ে কারও যেন দায় নেই। বাবার এক কথা, আমার দেবার সামর্থ্য কম। সামর্থ্য না আগ্রহ কম, সে ঠিক বোঝে না। যেন ঠেস দিয়ে বলা—কেন নিয়ে এসেছিলে। আমি তো দিয়ে যাইনি। বাবা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েদের নিয়েই জেরবার। দুদুমণি পণের টাকাটা অন্তত দেবার জন্য বেশী চাপাচাপি করলে, বাবা আর কথাও বলেন না। চুপচাপ বসে থাকেন।

সে তার বাবার দোষ দিতে পারে না। কি-ই বা রোজগার। টানাটানির সংসার থেকে বাবার দেবার সামর্থ্যই বা কতটুকু! আগে তবু শহরে এলে এখানটায় হয়ে যেত। এখন তাও আসেন না। বাবার জন্য তার মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। তখন অবশ্য তার বিয়ের বয়েসটা হাঁ করে থাকেনি। স্কুলে পড়ছে। পড়াশোনা শেষ না হলে তো আর বিয়ের কথা ওঠে না।

আসলে তখন ঝুমির শুধু লেগে থাকা। স্কুলে নাম কা ওয়াস্তে যেতে হয় তাই যায়। তার মাথায় কিছু ঢোকে না। বরং বাড়ির গাছপালা, দুদুমণির হাতের কাজে সাহায্য করা, মিলে যাত্রা হলে দেখতে যাওয়া, পুকুরে সাঁতার কাটা, এ-সবের মধ্যেই ছিল তার এক মনোরম জীবন।

দুদুমণি যে চিরদিন সংসারে থাকবে না—বয়স বাড়ছে, চোখে কম দেখতে শুরু করেছে, কানেও ভাল শুনতে পায় না, যেকোনো দিন দাদুমণির কাছে চলে যেতে পারে—এটা মনে হতেই সে আরও ঘাবড়ে গেছে।

সারা কলোনি জুড়ে দাদুর যজনযাজন—এক ঘর বামুন থাকলে যা হয়, দাদু বেঁচে থাকতে পূজা পার্বণে ছিল সে দাদুর একমাত্র সঙ্গী। চান করে ফ্রক গায়ে দিয়ে দাদুর পেছনে ছুটতে ছুটতে যাওয়ার মধ্যেও ছিল জীবনের অনন্ত রহস্য।

সংসারটাতে তখন অলক্ষ্মী ছিল না। মেজমামার, ছোটমামার বিয়ে হয়নি—সে ছিল তখন সবার চোখের মণি। মামারা তাকে মেলায় নিয়ে যেত, পূজার সময় ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত। তখন বড়মামা মাসোহারা পাঠায়, দাদু যজমানি করে—চড়ুইভাতি হয় শীতকালে। দাদুর এসবে খুব উৎসাহ। আত্মীয়-স্বজনরা ভিড় করে থাকত বাড়িটায়। তাঁর তখন কি দাপট।

আর ব্রজসুন্দরীর তো তখন পূজা-পার্বণের শেষ নেই। বৈশাখ মাসে বারের মঙ্গলচণ্ডী, জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠী, আষাঢ়ে পূর্ণিমা ব্রত, শ্রাবণে পদ্মপুরাণ, মনসার পাট, ভাদ্রে লক্ষ্মীব্রত—এভাবে এসব পূজায় ভোগ রান্না, খিচুড়ি পায়েস লাবড়া, পাত পেতে প্রসাদ খাওয়ার ভিড়—কত কাজ তার তখন। পড়াশোনার চেয়ে এইসব কাজে তার উৎসাহ ছিল বেশী।

আত্মীয়-স্বজনরা বলত, ঝুমির মতো মেয়ে হয় না। মেয়েটা কি কাজের। এখন আর তারাও আসে না, বাড়িটা ক্রমে যেন ছাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বিঘে তিনেক জমি জুড়ে এই বাড়িঘর, বাঁশের জঙ্গল, পুকুর, ফলের গাছই কত রকমের—যে-দিনটায় যে-ফল, লিচু, কাঁঠাল, নারকেল, আম, জাম, কি গাছ ছিল না বাড়িটাতে! এখন সেই গাছগুলিও নেই—কিছু লিচুগাছ আর নারকেলগাছ ছাড়া সব গাছই যে

যার দরকারে মামারা কেটে ফেলেছে। শুধু বাঁশঝাড়টা শেষ করতে পারেনি। শরিকী বাড়ি—বন্টননামা হয়নি বলে, দুদুমণি যা কিছু অবশিষ্ট আছে, দাপটের সঙ্গে ভোগ করছে। লেবু, কাগজিলেবু, বাতাবি লেবু, গন্ধরাজ লেবু, কত রকমের লেবুর ঝোপঝাড় বাড়িটার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঝুমির বড় মায়া হয়, এইসব গাছপালা আর দুদুমণিকে ছেড়ে সে যাবেই বা কোথায়!

সে সকাল হলেই বাসি জামা প্যান্ট ছেড়ে পুজোর ফুল তুলত গাছ থেকে। দেবদ্বিজে তার ভক্তিও কম না। সকালে উঠেই ঠাকুরঘরে ঢুকে ফুলের সাজি নিত হাতে, বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকত, তারপর দু-তিনবার মাথা ঠুকে ঘর থেকে বের হয়ে আসত। তারপর ঠাকুরঘরের তামার টাট, বাসনকোসন পুকুরঘাট থেকে ধুয়ে আনত। দুদুমণির প্যানপ্যানে স্বভাব, ঝুমি সাতসকালে উঠে ঠাকুরঘর নিয়ে পড়ে থাকলে পড়বেটা কখন শুনি! চিৎকার করে ডাকত, এই তুই বের হয়ে আয়, যার কাজ সে করে নেবে।

সে বলত, এই তো হয়ে গেল। চন্দন বেটে দিয়ে বের হয়ে আসছি।

দাদুমণি বারান্দায় বসে হুকো টানতে টানতে বলতেন, ঝুমি, সাতসকালে ব্যারজাসুন্দরীকে চটিয়ে দিস না। তুই বের হয়ে আয়। দিনটা তবে ভাল যাবে না।

তারপর রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বলতেন, নাতনি তোমার পড়ে পদ্মজা নাইডু হবে। যারে যা, তোর দুদুমণির খুন্তি হাতার সেবা করগে। তারপর বিড়বিড় করে বলতেন, ঠাকুরসেবার মতো বড় সেবা আর কি আছে ব্রজসুন্দরী!

ব্যারজাসুন্দরী বললেই ঝুমি ফিক করে হেসে ফেলত। দু'জনে এবারে লাগল বলে। দাদুমণি কুপিত হলে দুদুমণি ব্যারজাসুন্দরী, ক্ষুণ্ন হলে বিরজাসুন্দরী আর খুশি থাকলে ব্রজসুন্দরী। আর তাঁর উল্লাস দেখা দিলে—পাল্কিসুন্দরী।

সে বলত, রাখ তো দুদুমণির কথা! ভোগের রান্নার ফুটফরমাস কে খাটে! সাড়া না পেলে তো পাড়া মাথায় করে বেড়ায়। তখন বুঝি আমার পড়ার ক্ষতি হয় না!

সে জানে তার দুদুমণি এরকমেরই। দাদুর হাতের কাজ এগিয়ে দিলেই তার পড়ার ক্ষতি। আর নিজে যখন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার নাড়ু, মোয়া, তিলের তক্তি কিংবা ভাদ্রমাসে তালের ক্ষীর, তালের মালপোয়া বানাবে, তখন একটু দেরি হলেই ব্রজসুন্দরী খাপ্পা।

যা যা আমার দরকার হবে না। দ্যাখ পারি কি না! তুই যে-দেশে নেই, সেখানে বুঝি নাড়ু, মোয়া আর বানানো হয় না!

ব্রজসুন্দরীর এই একটা চণ্ড রাগ আছে।

যত বয়েস বাড়ছে, সেটা যেন আরও বাড়ছে।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে শুলো না পর্যন্ত। কোথায় কার খোঁজে বের হয়ে গেছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না। ছানি কাটিয়েও চোখে আবছা দ্যাখে। কাছে না এলে কাউকে ভাল চিনতেও পারে না। তবু বের হয়ে যাওয়া চাই।

কোথায় যায়, কেন যায়, সে জানে। তখনই ঝুমির কেন যে কান্না পায়। তার জন্য ব্রজসুন্দরীর আজ এই দুর্গতি। তার ইচ্ছে হয় যেদিকে দু' চোখ যায় বের হয়ে যেতে।

ব্রজসুন্দরীর সঙ্গেও সে যেতে পারে না। সঙ্গে যেতে চাইলেই দশ কথা শুরু হয়ে যাবে। আর যে-জন্য যায়, তার যে এতে মাথা কাটা যায় ব্রজসুন্দরী কিছুতেই বোঝে না। তবু বেহায়ার মতো যেতে চাইলে, কোথায় রাস্তায় পড়ে টড়ে মরে থাকবে ভেবেই যাওয়া—কে শোনে কার কথা।

আমি তর মত পাড়া টোলাতে যাচ্ছি না। আমার সঙ্গে যেয়ে কাজ নেই।

ব্রজসুন্দরী বাড়ি না থাকলে ঘরটা তাকেই পাহারা দিতে হয়। নধরও সঙ্গে থাকে, আবার কখনও দুদুমণির পিছু পিছু বের হয়ে যায়। সে গেলে সব কাজ পড়ে থাকে। সে-জন্যও সঙ্গে যাওয়া হয় না।

কিংবা সে জানে, দুদুমিণি যেখানেই যাক মাথার মধ্যে তার একটাই তাড়া—অ পরাণ, অরা আর কোনও খবর দিল। অ মরণ তর শ্বশুরকে একটা চিঠি দে না। অরা যে দেখতে আসবে কইছিল, আইল না ত! এসব কথার মধ্যে সে থাকে কি করে? এসব কারণেও তার যেতে সংকোচ লাগে।

সে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। দুদুমণি কোথায় যেতে পারে! বেলা পড়ে আসছে। গাছের

ছায়া লম্বা হতে হতে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলেছে। কার বাড়িতে গিয়ে বসে আছে—তার চিন্তা বাড়ছে। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে মুখে হরীতকী ফেলে বলল, আমি একটু ঘুইরা আসি।

খেয়েই বের হলে? শরীর খারাপ করবে না।

আমার আর শরীর খারাপ!

কোথায় যাবে? রোদ পড়লে যেও।

মরতে যাচ্ছি, মরতে। মেলা কথা বাড়াস না।

এমন সব কথা শুনলেই তার কেন যে মনে হয় দিন যত যাচ্ছে তত সে ব্রজসুন্দরীর গলার কাঁটা হয়ে যাচ্ছে।

নিজের ওপর ঝুমির তখন যে কি ক্ষোভ!

তাকে দিয়ে যখন বড়মামাকে চিঠি লেখায় তখনও তার ক্ষোভের শেষ থাকে না। সে যে কি করে। পাত্রপক্ষের খবর দিয়ে চিঠি। দাবিদাওয়ার চিঠি। নিজের বিয়ের কথা চিঠিতে কেউ লিখতে পারে!

তার হাতের লেখা দেখেই টের পাবে বড়মামা, শুধু বড়মামা কেন, মামীমা, ছোট ভাই-বোনেরা সবাই টের পাবে। ঝুমিদির চিঠি এসেছে ভায়া ব্রজসুন্দরীর তরফে। লজ্জা লাগে না।

তবু জোরজার করে চিঠি লেখাবে! না লিখলে অশান্তি। পাড়ার কাউকে দিয়ে কিছুতেই লেখাবে না। বউমাদের দিয়েও লেখাবে না। কার মনে কি আছে? সবাই ঝুমিকে বিষনজরে দ্যাখে। লাগানি ভাঙ্গানির লোকও কম নেই।

ল্যাখ তর বড়মামাকে...।

আমি লিখতে পারব না।

তর ঘাড় লিখবে।

লিখব না তো বলেছি। চিঠি লেখার লোকের অভাব নেই।

তারপরই চোপা শুরু, যেদিকে দু'চোখ যায় বাইর হইয়া যা। আমার যত জ্বালা। সামনে থাকলে চোখ বুজে থাকি কি করে? বাপ তো একবার চিঠি দিয়ে খোঁজও নেয় না। পূজায় সবার জামাকাপড় হয়, তর হয় না ক্যান? অভাবটা বুঝি সব তর বেলায়!

দুদুমণি চুপ করবে? যাব, যেদিকে দু'চোখ যায় বের হয়ে যাব।

ব্যাস হয়ে গেল। বুড়ির থোঁতা মুখ ভোঁতা। তারপরই কাণ্ডখানা শুরু হবে। রাস্তায় ছুটে যাবে, হাউ হাউ করে কাঁদবে, পেটে ধরেনি, তবু কি জ্বালা বলবে। ঝুমি বের হয়ে যাবে বলছে—তরা কেউ কিছু বলবি না। পাড়া প্রতিবেশী থাকে কি করতে!

ঝুমির তখন আর এক মরণ।

সে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে আসবে। মাথা ঠাণ্ডা করতে বলবে। চিঠি লিখে দিতে রাজি হবে। তারপরই সব ঠাণ্ডা। কে বলবে তখন একজন অনূঢ়া কন্যার জন্য বাড়ির বৃদ্ধা কিছুক্ষণ আগেও কাঙালের মতো রাস্তায় চেঁচামেচি করেছে।

ব্রজসুন্দরীকে নিয়ে তার এই হয়েছে এক মুশকিল। মর্জিমতো কাজ না হলেই চোপা। তখন দেখা যাবে বাড়ির চোদ্দগোষ্ঠীকে নিয়ে পড়েছে।

কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। মামা মামীরা কেউ বাদ যায় না।

এত যে জবরজং বাজনা বাজাচ্ছিস তরা সেটা কার জন্য। পেটে না ধরলে সোয়ামীর লগে সোহাগ কই যাইত! আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা নাতনি, চোখের সামনে সোমত্ত হইয়া থাকলে গলায় ফাঁস লাইগা থাকে না!

কোথাও একা গেলে দুদুমণি, তার বড় দুশ্চিন্তা হয়। রাস্তাঘাটে পড়ে না মরে থাকে। মাসির বাড়ি যেতে পারে। লাল সড়ক ধরে শৈলেন জবারের বাড়ি যেতে পারে।

সকাল থেকেই আজ সে দেখেছে, বুড়ি বড় উচাটনে আছে। সকালবেলাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। জঙ্গলে শিশুগাছ দুটো কবেই মহাবৃক্ষ হয়ে গেছে। দাদু বলতেন, দুঃস্বপ্ন দেখলে মহাবৃক্ষকে বলে দিতে হয়।

নদী থাকলে তার পাড়ে দাঁড়িয়ে দুঃস্বপ্নের কথা বলতে হয়। জলের কাছেও দুঃস্বপ্নের কথা বলা চলে। তবে দুঃস্বপ্ন ফলে না। দাদুর কথা তারও বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

সকালবেলাতেই শিশুগাছ দুটোর দিকে ছুটে যাওয়া, পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বুঝেছে, বুড়ি রাতে ঠিক দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

সকালবেলায় মাচা থেকে কুমড়োফুল তুলে এনে থালায় সাজিয়ে রাখার সময় ঝুমি না বলে পারেনি, পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করছিলে কেন?

ব্রজসুন্দরী কোনও জবাব দিচ্ছে না। যেন কিছুই শুনতে পায়নি।

শুকনো খড়কুটো রান্নাঘরে তুলে এনে রাখছে। গাছ থেকে ক'টা কাঁচালঙ্কা তুলে বাটিতে রেখেছে। দুধকচু দিয়ে ব্রজসুন্দরী আজ মুগের ডাল রান্না করবে বোঝাই যায়। আর গাছ থেকে সদ্য তুলে আনা মোচার ঘণ্ট, আমড়ার টক।

ঝুমি বারান্দায় চেয়ারে বসে সব দেখছিল। বুড়ি কিছুতেই তার কথার দিকে আসছে না। নির্ঘাত দুঃস্বপ্ন দেখেছে। দুঃস্বপ্নের কথা এড়িয়ে যেতে চাইছে। সকাল থেকে এইসব সংগ্রহ করে চান টান সেরে যখন বারান্দায় উনুনে খড়কুটো ধরিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, তখনই সে ফের বলেছিল, কি বকছিলে পুকুরপাড়ে?

কি আবার বকব। কাঁচুমাচু মুখে নাতনির দিকে অবলা নারীর মতো চেয়ে থাকল। বড় ম্রিয়মাণ মুখ।

ছবি যে বলে গেল, দেখ গে তোর দুদুমণি পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আপনমনে বকছে।

কি জানি, আমার কিছু মনে নেই।

তুমি গোপন করছ দুদুমণি।

হ্যাঁ আমার ত তর মত গোপন ভাতার আছে, গোপন করব না!

দুদুমণি ভাল হবে না কিন্তু।

এই হয়েছে মুশকিল, দুদুমণির মুখ এত আলগা যে কথা বলতেও ভয় করে।

সত্যি করে বলো, কি বলছিলে, কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

কারও সঙ্গে না। দু-কাল গেল, তিন কালও শেষ হতে যাচ্ছে। এখন আমার আর কে থাকবে কথা বলার।

কিছুতেই ব্রজসুন্দরী ঝেড়ে কাশবে না।

ঝুমি এবার তার উড়ো ভাবনা জুড়ে দিল।

আমি জানি, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে। ঠিক দাদুমণি আজ আবার স্বপ্নে দেখা দিয়ে গেছে।

আমাকে জ্বালাবি না ঝুমি। আমি আছি আমার কামড়ের জ্বালায়, তেনার এখন আমাকে নিয়ে মজা করার শখ।

দুদুমণি তখন বোখনা বসিয়ে মুগের ডাল ভাজছে। সাদা ধবধবে থান পরে দুদুমণি যখন এক হাতে রান্না করে তখন বোঝাই যায় না, তার জীবনে আর কিছু দরকার আছে। কি নিপুণ হাত রান্নার। চোখে ভাল দেখতে পায় না, তবু মুগের ডাল ঠিক ভাজা হল কি না, গন্ধে টের পায়। সে নিজে করে দেখেছে, দুদুমণির মতো এমন সুন্দর রান্না কিছুতেই করতে পারে না। উনুনে, কি রান্নার কতটা আঁচ হবে তাও দুদুমণি কি করে যে টের পায়.। মুগের ডাল ভাজার সময় অল্প আঁচ, সম্বারে মৃদু আঁচ এবং মোচার ঘণ্ট করার সময় অল্পও নয় বেশীও নয়, এমন আঁচ রাখে যে আশ্চর্য স্বাদ তৈরি হয়ে যায় রান্নায়। অতীব পবিত্র মনে হয় সব কিছু তখন। রান্না থেকে দু'জনের খেতে বসার মধ্যে দুদুমণির অতীব এক রুচিবোধ আছে। কতদিন সে পাশে বসে শুধু চুপচাপ দেখে। দেখতে দেখতে চোখে কেন যে জল চলে আসে। এটা ওটা এগিয়ে দেওয়া ছাড়া তার কোনও কাজ থাকে না। কিছু করতে গেলেই বলবে, হয়েছে থাক। যেখানে করার সেখানে করবি। আমাকে আর জ্বালাস না।

এমন সব মনে হওয়ার সময়েই ঝুমি বলেছিল, বলবে না তা হলে! ঠিক আছে আমিও খাব না।

হয়ে গেল। খাব না বললেই বুড়ি কাহিল। বোখনায় জল দিয়ে বলল, না খাবার কি হল! দাদুর সঙ্গে কি কথা হল বলব কেন? তুই তোর সোয়ামির সঙ্গে যখন শুবি, কথা বলবি, আমাকে কিছু বলবি।

সে বলল, মারব কিন্তু দুদুমণি। মুখ খারাপ করবে না।

তবে এত শোনার শখ হয় ক্যান!

ঠিক আছে, শুনতে চাই না। যা খুশি বকবক করোগে। লোকে বলবে, বুড়ির মাথা ঠিক নেই। একা একা বকে।

আমার মাথা ঠিক নেই, তর মামা মামীদের মাথা ঠিক আছে! তর বাপের মাথা ঠিক আছে! কি দায় ছিল আমার তকে বড় করে তোলার! পেটের মেয়েই বেইমানি করে গেল, তুই করবি বেশী কি! তর বড়মামা তখনই বলেছিল, ঝুমি বাপের কাছেই থাকুক। তাকে এখানে এনে আর একটা ভুল করতে যেও না। পরে পস্তাবে।

আসলে ঝুমির মনে হয়, বড়মামার দুরদৃষ্টি আছে। সেই বয়সেই তিনি ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন, তার ভবিষ্যৎটা কি? বড়মামা জানেন বাপ অভাবের দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যাবে। নীলুমাসির তখন সে ভারি আদুরে। মাসির বিয়ে হলে সেও যে দূরে সরে যাবে বড়মামা তাও টের পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, সংসার যার যার তার তার। ছোটমামা, মেজমামা তার বিয়ে নিয়ে ভাবেই না। মেজমামা সরকারি কাজ করে। তার এখন দালান কোঠা চাই। তার মেয়ে বড় হচ্ছে, ছেলে বড় হচ্ছে। ছোটমামা কি করে ভাববে। তার নিজেরই চলে না। বড়মামা বোধহয় দিব্যচোখে সেদিনই তা দেখতে পেয়েছিলেন।

সে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, তুমি আমাকে রাখতে গেছিলে কেন! কি দরকার ছিল। এখন রাতে ঘুম নেই তোমার! ঘুমের মধ্যে যত রাজ্যের প্যাচাল—সারারাত জ্বালাও। আমাকে ঘুমোতে দাও না পর্যন্ত।

আমি না তুই, কে ঘুমায় না! কার ঘুম আসে না! আমি বুঝি না মনে করিস। দেখতে দেখতে পাড়ার সকলের বিয়া হইয়া গ্যাল! কে জানে কেউ তাবিজওবিজ করেছ কি না। বাণ মেরেছে কি না!

আচ্ছা দুদুমণি, কার এত দায় পড়েছে! পাড়া প্রতিবেশীদের তুমি অযথা দুষছ।

তুই বুঝবি কি! আমি বুঝি। আমার সুখ কেউ চায় না। জানস মাইয়া কত রকমের লোক থাকে, কু-মতলব থাকে। তুই বুঝলে ত হইয়াই গ্যাছিল। আচার্য ত কইল, কোন্ গাছের নিচে কে নাকি টোফ পুঁতে রেখেছে। ওটা তুলে ফেলতে পারলেই সব বাধা দূর হইয়া যাইব। তারে আমি কইছি, তুইলা দ্যা মনা, তুই যা চাস তাই দিমু।

সে ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, দাঁড়াও বড়মামাকে চিঠি লিখছি। মনা আচার্য তোমাকে হাতে পাবার জন্য এসব বলেছে। টাকা হাতড়াবার মতলব। মামা জানতে পারলে রক্ষা থাকবে না তোমার।

বড়মামাকেই দুদুমণি একমাত্র সমীহ করে। দুদুমণি এবং তার খরচ বড়মামাই দেন। বেশী বেশীই দেন। ওদের দু'জনের ভালই চলে যায়।

দুদুমণি খুবই যেন ফ্যাসাদে পড়ে গেছে মতো বলেছিল, দেখি না কি হয়। সবই তো করছি। বিপদনাশিনী ব্রত, কালীবাড়িতে মানসিক, কিছুই তো বাদ দিই নাই। তর ভালর জন্যই করতাছি। এইটাও না হয় কইরা দ্যাখি। চিঠি লিখতে যাইস না। তর জন্য নিশ্চিন্তে যে মরব তারও উপায় নাই। উনি ত কইলেন, আর কতকাল একা থাকবা। একা নাকি তেনার ভাল লাগতাছে না। আমারে কেবল কয়, এই-বারে রওনা দ্যাও। তারপর ঝুমির দিকে করুণ চোখে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। শেষে মুখ নিচু করে বলেছিল, আমি যাই কি কইরা! তরে ফালাইয়া যাই কি কইরা! সাফ সাফ কইয়া দিছি, ঝুমির বিয়া না দিয়া আমি যাইতে পারমু না। সে যতই স্বর্গসুখ থাকুক, সে তুমি যতই টানাটানি কর।

দুদুমণি চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ঝুমির চোখও চকচক করছে। সে নির্বাক। সে বাইরে বের হয়ে গাছপালা দেখতে দেখতে মাতামহীর এই নিদারুণ কষ্টে কেমন জড়িয়ে যাচ্ছিল। মাতামহ গাছপালা লাগিয়ে গেছেন, তাকেও গাছের মতো লালন পালন করেছেন, সেও যেন এই গৃহের কোনও গাছের মতো হয়ে গেছে। তার সুখ দুঃখ অনুভূতি সবই এই বাড়িটাকে জড়িয়ে। সে উঠোন পার হয়ে কাঁঠালগাছের নিচে গেল, গাছটাকে ছুঁয়ে দেখল। যেন কত গভীর তার শেকড়। সে ইচ্ছে করলেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে পারে না।

দাদুমণিকে স্বপ্নে দেখলেই বোধহয় মাতামহীর দুশ্চিন্তা বাড়ে। উচাটনে পড়ে যায়। মুখ সারাদিন গোমড়া। দুশ্চিন্তার কামড়ে কি করবে ভেবে পায় না। আসলে দুশ্চিন্তা থেকে যে মাতামহী স্বপ্ন দেখে

কিছুতেই বিশ্বাস করে না। মাতামহীর বিশ্বাস, একা মানুষটার সেখানে কতদিন আর ভাল লাগবে।

সে পরিহাসচ্ছলে বলেছিল, সত্যি তো একা। ওখানে দাদুমণির সঙ্গে চোপা করারও তো কেউ নেই। তুমি গেলে জমবে। দুগ্‌গা বলে রওনা হয়ে যাও না!

ব্রজসুন্দরীও বলতে ছাড়েনি।

সময় হলে ঠিকই চলে যাব। তখন দেখিস মাইয়া তর দুর্গতি। দুর্গতি দ্যাইখ্যা গাছ লতা পাতার চোখে জল ঝরবে। মামী মাসিদের লাঠি ঝ্যাঁটা, মুখনাড়া খাবি আর ঝি বাঁদির মতো কাজ করবি। কেউ একবার ফিরেও তাকাবে না।

কার না রাগ হয়। ঝুমিও তো মানুষ! সারাদিন খোঁটা আর খোঁটা। সেই বা সহ্য করে কি করে! সেও তারস্বরে বলতে ছাড়েনি, বেশ আমার যা হবার হবে। তুমি চলে যাও। আমার জন্য তোমাকে কে পড়ে থাকতে বলেছে।

আর যায় কোথায়, ব্রজসুন্দরীর চোপা শুরু হয়ে গেল।

আমি গেলে সবাই বাঁচে। আমারে কেউ চায় না। ভাল আছি না মন্দ আছি কেউ খোঁজখবর নেয়! তুই মাইয়া এত করি তর জন্য তুইও কস, তুমি চলে যাও না। যামু, যেদিকে দুই চোখ যায় চইলা যামু। তুই ঠ্যাঙ ছড়াইয়া সুখে খাইস।

ঝুমিও রাগের মাথায় ছেড়ে কথা বলেনি।

যাও, তুমি গেলে আমি বাঁচি। তখন যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব। আমি তোমার গলার কাঁটা বুঝি না। তুমি চলে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত। আর কিছু না থাক রেললাইন ত আছে।

রাগের মাথায় কি যে খারাপ খারাপ কথা ঝুমির মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল। সে তো দুদুমণির সঙ্গে এত চোপা কখনও করে না। বড় অনুতাপ। কতদিন দুদুমণি বলেছে, কত মাইয়া ভাব ভালবাসা কইরা বিয়া করে। তর তাও জুটল না। ঘরকুনো মাইয়ার কপাল কবে খোলে।

এ-সব অভিযোগের সে জবাব দিত না। দুদুমণির যে এটা মনের কথা নয় তাও সে বোঝে। সামনে কোনও পথ খোলা না পেয়ে মুখে যা আসছে বলে গেছে। রাগের চেয়ে বরং তার হাসি পেত।

পাত্রপক্ষের খোঁজখবর পেলে তবু কিছুদিন আশা থাকে। আর পাত্রপক্ষের খবর না পেলে ব্রজসুন্দরীর মাথা গরম। এবছরই দু-তিনটে সমন্দ এসেছিল।

একজন পুলিশে কাজ করে।

একজনের বাবার ট্যাকসি আছে, পাত্র ট্যাকসি চালায়। একজন ফুড ডিপার্টমেন্টে পিওনের কাজ করে। আর একজন স্যালো চালায়।

তাদেরই কত দাবি-দাওয়া। পায়ে খুঁত আছে মেয়ের। ঘরে তোলা মুশকিল। তাই নাকি দাবি-দাওয়ার বহর এত লম্বা। দশ হাজার টাকা নগদ, হাতে কানে গলার তিনখানা সোনার গহনা, নমস্কারী কাপড়। কারও আবার খাটপালঙ্কের স্বপ্নও আছে হাতিয়ে নেবার। বড়মামা বলেছেন, নগদ ছাড়া সব তাতে রাজি। নগদ চাইলেই পুলিশে খবর দিয়ে দেব।

আর দুদুমণি পেটে কথা চেপে রাখতে পারে না।

খোকা বলেছে, নগদ চাইলেই পুলিশে খবর দিয়ে দিতে। এসব খবর দু-কান হলে যা হয়, হয়তো জানাজানি হয়ে গেছে, পাত্রপক্ষ আর এমুখো হয়নি। দুদুমণি যে এতটা ভেবে বলেনি ঝুমি তাও বোঝে। আসলে বোধহয় দুদুমণি তার বড় ছেলের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা বলতে চেয়েছে। আমার খোকাকে কে না চেনে—এই একটা গর্ব আছে ব্রজসুন্দরীর।

কিন্তু বেলা পড়ে আসতেই ঝুমির দুশ্চিন্তা বাড়ে। একা একা কোথায় যে গেল! কার কাছে গেল! আজকাল একা বেশী দূরে যায় না। গৌরী কিংবা মিলনকে সঙ্গে ডাকে। পাড়াপড়শীদের বাড়ি গেলে একা যায়। বেলা থাকতেই বাড়ি ফেরে।

কুকুরটা বারান্দা থেকে নড়ছে না। চোখ পিটপিট করে ঝুমিকে দেখছে।

হঠাৎ কি মনে করে ঝুমি কুকুরটাকে তাড়া লাগাল।

কুকুরটা উঠে দাঁড়াল, কিন্তু বারান্দা থেকে নেমে গেল না। লেজ নাড়ছে। বারান্দার অন্য পাশে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

ছোটমামার মেজ মেয়েটা গুটি গুটি হেঁটে আসছে। হাতে রুটি গুড়। ঝুমিকে দেখে বলল, দিদি আমি রুটি গুড় খাচ্ছি। মা রুটি করছে। তুমি খাবে। বলে ওকে দিতে এলে ঝুমি বলল, না, তুই খা। দুদুমণি কোথায় যে গেল।

তারপর সে তার থেকে সায়া শাড়ি তুলে নিয়ে ঘরে রাখল। কল থেকে দু-বালতি জল তুলে রাখল বারান্দায়। আজ টিভিতে ভাল বই আছে। দুদুমণিও তার সঙ্গে যাবে বলেছিল।

বলতে গেলে এখন তার সবই মাথায় উঠেছে।

তার এই বয়েসটা নাকি বড়ই সুসময়। এই বয়সে যদি বিয়ে না হয় তার নাকি জীবনের আসল মজাই নষ্ট। এমন রসিয়ে রসিয়ে কথা বলবে যে, ওর চোখ কান সব গরম হয়ে যায়। দুদুমণি কি টের পায় রাতে সে উসখুস করে।

মাঝে মাঝে কাজের ফাঁকে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। যদি দুদুমণি ফিরে আসে। সে ঘর বারান্দা ঝাঁট দিল। আবার উঠোনে এসে দাঁড়াল। নলিনীকাকার বাড়ির পাশ দিয়ে দুটো রাস্তা দু-দিকে গেছে। একটা গেছে কারবালা রোডের দিকে, আর একটা কলোনির ভিতর দিয়ে বাজারের দিকে। রাস্তায়ও দুদুমণির মতো কাউকে দেখতে পেল না।

একবার ভাবল পালের বউয়ের কাছে যায়। সে যদি কোনও খবর রাখে। কিংবা যদি ছোটমামীর ঘরে গিয়ে খোঁজ নেয়, দুদুমণি তো এখনও ফিরল না। সেই কোন্ দুপুরে বের হয়েছে...। কিন্তু ওদের যে এক কথা, কি ছোটমামী, কি মেজমামী—কার কাছে গিয়ে দ্যাখ বউদের সুখ্যাতি করতে বসেছে।

দুদুমণির যে কোনও বিপদ হতে পারে—এটা তারা ভাবতেই পারে না।

সে রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে দেখবে কি না ভাবল। বারান্দা থেকে নেমে যাবার সময় দেখল কুকুরটা তেমনি শুয়ে আছে। দু'বেলা ঝুমি কুকুরটাকে খেতে দেয়। সেই সুবাদে দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব ভালবাসা আছে। কুকুরটা ঝুমির কথা শোনে। কুকুরটার প্রতি ঝুমির খুবই মমতা জন্মে গেছে।

শুধু কি কুকুরটা—কি নয়, বাড়ির গাছপালা সব। দাদু লাগিয়ে গেছেন। তার বিয়ে হয়ে গেলে গাছগুলি বড় একা হয়ে যাবে, এমনও মনে হয়। দুদুমণি না থাকলে বাড়িটা এবং গাছপালাগুলি যেন আরও অর্থহীন। বাড়িটা ছাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

শীত করছিল ঝুমির।

এক ইটের গাঁথনি দিয়ে বিশাল চৌচালা ঘর। তবে জানলা ছোট। চারপাশে ঘেরা বারান্দা টালির। শালের মজবুত সব খুঁটি, রঙ করা। জানলা বন্ধ বলে ভিতরে অন্ধকার। সে হ্যারিকেন জ্বালাল। তারপর আলোটার সামনে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। বড় একা, দুদুমণি না থাকলে যে নিঃসঙ্গ সে! ক্ষোভে তার চোখ ফেটে জল আসছিল।

সুধন্যমামার বাড়ি যেতে পারে। মনা আচার্যের বাড়ি যেতে পারে। কিন্তু এত দেরি হবার তো কথা না! মাসির বাড়ি যদি যায়। তার নামে নালিশ যা কিছু থাকে—মাসিকে বলতে পারলে শান্তি পায়। তার উপর সে বলেছে, রেললাইন আছে। রেললাইন কথাটা যে বড় আতঙ্কের। রেললাইন কথাটা সে কেন যে বলতে গেল! বুড়ি তার সামান্য কথাতেই বড় ঘাবড়ে যায়।—তুই আমার আগে যাবি, যাওয়াচ্ছি। ভাবলেই হল। রওনা দিলেই হল। সোমত্ত মেয়ের বিয়ে না হওয়াটা বড় অপমানের। রেললাইন কথাটা ব্রজসুন্দরীর কাছে কত মারাত্মক এই মুহূর্তে বুঝতে পেরে সে আর একদণ্ড দেরি করল না। কি জানি বুড়ি যদি ভাবে, এসব দেখার আগে মানে মানে তারই কেটে পড়া উচিত।

তিন

সকাল থেকেই শরদিন্দুর মাথায় পোকা ঢুকে গেছে—মনিবউদি গেল কোথায়! হরদাকে অনাথ করে দিয়ে মনিবউদির এভাবে চলে যাওয়া খুবই অসঙ্গত কাজ। এমন নয় ঝাড়া হাত-পা। কাচ্চা-বাচ্চা আছে। তাদের ফেলে মা হয়ে চলে যেতে পারলে! তুমি কেমন মা বুঝি না।

সকালে কেষ্টই খবরটা দিয়েছিল। সে শীতকাতুরে কিছুটা। তার হাতে কাজও নেই তেমন, যেমন রাস্তায় সেগুনের চারা পুঁতে দেওয়ার কাজটা হাতে নিয়ে বুঝেছে, পঞ্চায়েতের কাছে এটা বড়ই বিধর্মীর কাজ। তার এক্তিয়ারই নেই। যা করার পঞ্চায়েত করবে। তুই কে রে।

সে কেউ না, তার অস্তিত্বই নেই সে ভাবে. তবু কে কখন মগজে পোকা ঢুকিয়ে দেয় বোঝে না। বাপের কাছ থেকে টাকা নিতে তার অসুবিধা হয় না। ক'টা সেগুনের চারা তার ভগ্নিপতিকে খবর দিয়ে আনিয়েছে। কলোনির রাস্তার দু-পাশে গাছগুলি লাগিয়ে দেবে। পাঁচশালা পরিকল্পনা ছিল তার। সব ভেস্তে দিল পঞ্চায়েত প্রধান কুণ্ডুমশাই।

তার এক কথা, এই শরা, রাস্তায় তুই মাটি খুঁড়ছিস কেন?

সে তো হাঁ।

খুঁড়লে কি হয়! গাছ লাগাব।

গাছ লাগাবি, কি গাছ?

সেগুনগাছ।

সেগুনগাছ! কোথায় পেলি?

জলপাইগুড়ি থেকে আনিয়েছি। কত বড় রাস্তা। হিসাব করে দেখেছি বছরে একশোটা সেগুনগাছ লাগালে—বছর পাঁচেক লেগে যাবে সারা রাস্তায়। ধরুন কুণ্ডুমশাই বছরে একশো, পাঁচ বছরে কত হয়?

তুই হিসাব কর। বাড়ি যা। এই নন্দ, এই অনাদি, তোরা ওকে তাল দিচ্ছিস! যা বাড়ি যা! শরার মাথাটা আর বিগড়ে দিস না।

শরদিন্দুর মেলা সাঙ্গোপাঙ্গ। সে ডাকলেই তারা চলে আসে। গাছ নেই, অথচ শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলছে।

গাছ কোথায়?

বাড়িতে।

তোর বাবা জানে?

আজ্ঞে জানবে না তা হয়!

নন্দ বলল, ওর বাবাই আনিয়েছে। তারপর আড়ালে কুণ্ডুমশাইকে ডেকে নিয়ে গেল। কি বলল কে জানে।

কুণ্ডুমশাই বললেন, ডাক্তার বলেছে!

আজ্ঞে ডাক্তার বলেছে, শরদিন্দু যা করতে ভালবাসে তাই করতে দেবেন। শরদিন্দু তো কোনও আকাম কুকামে থাকে না। সে যদি লাগায়ই দোষ কোথায়।

রাস্তা পঞ্চায়েতের জানিস!

শরদিন্দু মাটি খোঁড়া বন্ধ করে উঠে এল, বলল, রাস্তা পঞ্চায়েতের ঠিক কথা। সেগুনের চারা লাগালে রাস্তার কি ক্ষতি বলুন। পঞ্চাশ টাকা ডজনে গাছ আনিয়েছি। সেই জলপাইগুড়ি থেকে। বাসের মাথায় করে নিয়ে আসতেই একদিন লেগে গেল। পঁচিশ-তিরিশ বছর পর গাছের কত দাম হবে বলুন। লাখ টাকা দাম হয়ে যাবে এক একটা গাছের। কলোনির মঙ্গলের কথা। ভেবেই কাজটায় হাত দিয়েছি।

ভাল করেছিস। তোর বাবাকে বলে, গাছগুলি রাস্তায় না হয় আমাদের লোকই লাগিয়ে দেবে। তোর এত পরিশ্রম করে দরকার নেই। তুই বাড়ি যা।

কুণ্ডুমশাই তারপর বাড়িতেও তার হানা দিয়েছিল—ঝাউতলার মোড়ে একতলা বেশ বড় পাকা বাড়ি। অনেকটা জায়গা নিয়ে। চারপাশে পাঁচিল, বড় গেটও আছে। গেট পার হয়ে বাড়িটায় ঢুকতেই শরদিন্দুর বাবা কৃত্তিবাস লুঙ্গি পরে ছুটে এসেছিল, গায়ে ফতুয়া আর সামান্য খদ্দরের চাদর।

আরে তোমার পুত্র ফের পাগলামি শুরু করল।

কৃত্তিবাস ডাকল, এই বৈকুণ্ঠ, বসার ঘরটা খুলে দে। আসুন, ভিতরে আসুন।

আড়তে যাওনি?

আজ্ঞে না। শরার গাছ পাহারা দিচ্ছি। বার বার যে বলে গেল, আমার একটাও গাছ যেন চুরি না যায়।

সত্যিই গাছ আনিয়েছে?

আজ্ঞে তাই তো, চলুন দেখবেন।

আমার এখন দেখার সময় নেই। মুখে পানের রসে ভরে গেছে। ফিচ করে পানের পিক ফেলে বললেন, তুমি শক্ত হও কৃত্তিবাস। এভাবে তো চলে না।

কিন্তু ডাক্তার যে বলল।

কি বলল?

যা পছন্দ ক'রে করতে দেবেন। বাধা দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এইসব করতে করতেই নাকি একদিন সংসারে মন বসে যাবে।

কচু হবে। এতে পাগলামি দিন দিন বাড়বে। ওই তো দেখলে বাড়িতে লাইব্রেরি করব বলল, দুটো কোঠা ছেড়ে দিলে। টেবিল চেয়ার আলমারি কি কিনে দাওনি। ছেলের পছন্দমতো সব বই আনিয়েছ। শরদিন্দু নিজেই পছন্দ করে কিনেছে। শেষে কি করল!

কি করল বলুন।

সে পড়ে শেষ না করে কাউকে কোনও বই ইসু করবে না।

ওটা তো ঠিক কাজই করেছে। বই পেলে তার এমনিতেই মাথা ঠিক থাকে না। কত কথা বলে, রাজ্যের গুপ্ত কথা নাকি বইয়ে ঠাসা আছে।

কুণ্ডুমশাই নিজেও সেদিন বইয়ের তালিকাটি দেখে তাজ্জব। তিনি কলোনির স্কুলের বাংলার টিচার। বাংলায় অনার্স। তারপর পার্টিতে নাম লিখিয়ে এখন পঞ্চায়েত প্রধান। রাস্তায় বিনা অনুমতিতে গাছ লাগানো হচ্ছে, শরার সঙ্গে একদল চ্যাংড়া ছোকরা ঘুরছে, তিনি কাউকে পাঠিয়ে কাজটা বন্ধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু শরা বলেই নিজে ছুটে গেছেন। ইস্কুলের মেধাবী ছাত্রটির এই পরিণাম ভেবে মনে মনে কষ্টও পেয়েছিলেন। বইয়ের তালিকাটি দেখেও কম তাজ্জব হননি। সবই ক্লাসিক পর্যায়ের বই। শরা যে প্রকৃতই কত মেধাবী তালিকাটি দেখে তাঁর অনুমান করতে কষ্ট হয়নি।

সে যা খুশি বাড়িতে করুক। রাস্তায় নেমে গেলে যে মহাবিপদ কৃত্তিবাস। আর কলোনির লোকজনও আছে. শরাকে ক্ষেপিয়ে দিতে পারলে তামাসা দেখার লোকের অভাব থাকে না।

কি রে শরা এখন কি করছিস।

এখন!

হ্যাঁ এখন।

ঘুমাচ্ছি। কেবল ঘুম পায়।

তোর পক্ষে ঘুম দরকার।

আচ্ছা এত ঘুম পায় কেন বলুন তো! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট।

আসলে শহরের একজন বড় সাইকিয়াট্রিকের চিকিৎসায় শরদিন্দু আছে। ডাক্তার বলেছে, খুব ভাল আর মেধাবী ছেলেদেরই এটা হয়। এ-রোগ সহজে সারে না। তবে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। শরদিন্দু যে ছেলেবেলা থেকেই শান্ত স্বভাবের, পড়াশোনায় কোনও ফাঁকি ছিল না। রাত জেগে পড়ত। অনিল মাস্টার বলেছিলেন, শরদিন্দু আমাদের গর্ব। ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাওয়া তো সহজ কথা নয়। সেই শরদিন্দুর কলেজে পড়তে গিয়ে বারোটা বেজে গেল। কেউ বলে নিশ্চয়ই কোনও প্রেমঘটিত ব্যাপার ছিল। শারদা উকিলের নাতনির সঙ্গে ভাবও ছিল খুব। সারদা নাগ, শহরের দীঘির ধারে বিশাল তিনতলা বাড়ি। মোরাম বিছানো রাস্তা। ঝাউগাছের সারি বাড়িটার সামনে। সাদা রঙের বাড়িটা, স্টেশন থেকে নেমে শহরে ঢুকতেই। শরার সঙ্গে কলোনিতেও এসেছে। বাপ-কাকাদের সঙ্গে জনসভায় বক্তৃতাও দেয়। তুখোড় বক্তৃতা। শরা তারই প্রেমে পড়ে গেছে এমন গুজব বেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল।

তারপরই কি হল, অনার্স পরীক্ষার ঠিক আগে ডুব মেরে দিল। মেয়েটা নিজেই নাকি খোঁজাখুঁজি করেছে। কৃত্তিবাস শুধু বলেছে, কি যে করি! কোথায় গেল। পরীক্ষা বলে কথা। এইসব ঘটনা তিন-চার বছর আগের। মেয়েটা ছাত্র ফেডারেশন করে। শরার নামও লেখাতে চেয়েছিল। তার নাকি এক কথা, ঝুমিদি বারণ করেছে। পার্টিবাজি করলে আখেরটি তার যাবে। পার্টিবাজি চতুর লোকেরা করে। ক্ষমতা দখল। মানুষের নাকি এতে কোনও উপকার নেই। সরল মানুষ বলেই ঝুমিদির কথায় এত আস্থা। কথাটা ঝুমিদিরও নিজের না। ঠাকুরকর্তার কথা। আগের মতো আদর্শ নেই, দেশসেবার নামে চতুর লোকদের এটা এক ধরনের ফন্দি। ঠাকুর-কর্তার উপর কথা নেই। সে কিছুতেই ইউনিয়নবাজিতে নাম লেখায়নি।

সোজা কলেজ যেত, ফিরে আসত। মিটিং মিছিলে কিছুতেই যোগ দিত না। শারদা উকিলের নাতনি সেই যে কেটে পড়ল, আর তার পাত্তা পাওয়া গেল না।

ঠাকুরকর্তার আর একটা কথাও তার বড় প্রাণে ধরে আছে। তার বাবা তো ঠাকুরকর্তার কৃপাতেই এত ধনে জনে মানুষ। পূজা-পার্বণে এলেই ঠাকুরকর্তার এক কথা, খুব ছেলেবেলার কথা ঠিক, তবু সে মনে করতে পারে, বাবা কর্তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে বলতেন, লেগে থাক। ব্যবসার মতো আর কি আছে তুই লাছি পাট, গুছি পাট ছাড়া কিছু বুঝিস না। বেশ আর না বোঝাই ভাল। যেটুকু বুঝেছিস তাকেই কাজে লাগা। তোর হবে।

সেই ঠাকুরকর্তার আশীর্বাদে বাবার কি না হয়েছে। দুটো লরিতে পাটের গাঁট যায় রোজ হুগলির কোনো মিলে। পাটের দাদনই দেয় বছরে লাখ লাখ টাকা। তবে কিপ্টে স্বভাবের। এক জোড়া ভাল জুতো পর্যন্ত কেনে না। জমি বাড়ি কেনায় খুব আগ্রহ তার। কিন্তু তার যে এসব ভাল লাগে না, কিছুতেই কিপ্টে মানুষটা বুঝতে চায় না।

ঠাকুরকর্তার আরও একখান আশীর্বাদও আছে।

শরা মনে রাখিস, মানুষের যে ভাল করতে চায়, সে একাই তা পারে। তার জন্য বক্তৃতার দরকার হয় না। তুই তোর মতো মানুষের উপকার করার চেষ্টা করবি। সব মানুষ যদি এটা বুঝত, তবে আর দলবাজির দরকার হত না। খেওখেয়ি হত না। মানুষের উপকারই যখন ধর্ম তখন এ-পথে না সে-পথে এসব ভেবে কি হবে!

আসলে ঠাকুরকর্তা নিজেও ছিলেন বড় ধার্মিক মানুষ। অকপট এবং নিষ্ঠাবান। পূজা-পার্বণের আগে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। কারও বাড়িতে আহার করতেন না। সিধা যেত কর্তার বাড়িতে। সে নিজে কতবার নিয়ে গেছে—ঝুমিদি তখন ফ্রক গায়ে দেয়। কি সুন্দর ঘ্রাণ ঝুমিদির। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল—বাড়ির গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ালে ঝুমিদিকে ছোট্ট পরীর মতো মনে হত।

ঝুমিদির বাড়িতে গেলে তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হত না। যেখানে ঝুমিদি, সেও সেখানে।

এই শরা, গাছে উঠতে পারিস?

খুব পারি। তুমি বললেই পারি।

গাছে কাঁঠাল পেকেছে, গন্ধ পাচ্ছিস না?

খুব খুব।

যা উঠে যা তো, কোন্ কাঁঠাল পাকল খুঁজে বার কর। কাঁঠাল পাকলে হাত দিলেই বোঁটা খুলে আসবে মনে রাখিস।

সে দু-লাফে উঠে গেছিল গাছে। কপাল তার মন্দ, ডালে ঝাঁকুনি খেয়ে কাঁঠালটা আপনা থেকে বোঁটা খসে নিচে পড়ে গেল। তারপর কাঁঠাল ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাঁঠালের কোয়া পিছলে গেল জমিতে।

ঝুমিদি তাকে তেড়ে গেছিল। তুই শরা কোনও কাজের নয়, যা তা।

তখন কুণ্ডুমশাই বললেন, গাছ যখন আনিয়েছে, রাস্তায় না লাগিয়ে বাড়িতেই লাগিয়ে দাও না। দানছত্র খুলে দিলে আখেরে তোমার কি লাভ কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস মাথা চুলকে বলল, সেটা অবশ্য ঠিক। চলুন ভিতরে বসবেন। বৈকুণ্ঠ ভিতরে খবর দে। কুণ্ডুমশাই এসেছেন। চা দিতে বলবি।

কুণ্ডুমশাই বাড়িটার ভিতরে ঢোকার আগে এদিক ওদিক লক্ষ্য করেছিলেন। বাড়ির সামনে একটা সুন্দর ফুলের বাগান, ডালিয়া, জিনিয়া, ক্রিসেন্থিমাম্ ফুলের ছড়াছড়ি। এক কোনায় দুটো গোলাপগাছও দেখতে পেলেন। বেশ বড় বড় গোলাপ। পাঁচিলের পাশে দুটো গন্ধরাজফুলের গাছও লাগানো হয়েছে। কুণ্ডুমশাই জানেন, কৃত্তিবাস পাটের আড়ত ছাড়া কিছুই বোঝে না। ফুলের বাগানটি দেখে প্রশংসাই করতে হয়। তিনি পঞ্চায়েত প্রধান বলেই কোনও গণ্ডগোল না হলে, কারও বাড়ি বড় একটা যান না। তাছাড়া পার্টি অফিসে প্রায় সবার সঙ্গে দেখা হয়। কাজেই কোথাও তাঁর যাওয়ার দরকার পড়ে না।

এদিকে তাঁর বিশেষ আসাও হয় না। মিলের তিন নম্বর গেট পার হয়ে রেললাইন। কিছু গুজরাটি

আছে এলাকাটাতে। তাদেরই একচেটিয়া পাটের কারবার। খুবই প্রতিযোগিতা—একজন বাঙালী সমানে টেক্কা দিচ্ছে, এটা কুণ্ডুমশাইয়ের কাছে বড়ই গর্বের বিষয়। তাছাড়া চাঁদার রসিদ যখন যা পাঠিয়ে দেন—এক বাক্যে পেয়ে যান। এমন একজন মানুষ, একমাত্র লায়েক পুত্র রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরলে সবাইর খারাপ লাগে। কৃত্তিবাসের মনোকষ্ট কি সাংঘাতিক তাও তিনি বোঝেন—যখন রাস্তায় বেরই হওয়া গেল, একবার কৃত্তিবাসেরও খবর নেওয়া দরকার ভেবেই আসা। শত হলেও পঞ্চায়েত প্রধান—গণ সংযোগেরও দরকার আছে।

সাইকেলটা আমাকে দিন, বলে বৈকুণ্ঠ এগিয়ে এল।

এটা তুলে রাখি বারান্দায়।

না হে আমি আর ভিতরে ঢুকছি না।

কৃত্তিবাস বলল, এলেন কষ্ট করে, একটু বসবেন না?

অগত্যা সাইকেল বৈকুণ্ঠের জিম্মায় দিয়ে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন। এত আদব কায়দা কৃত্তিবাস আয়ত্ত করল কবে! শৌখিন সোফা, বাতিদান, সেন্টার টেবিল সব ঝকমক করছে। দেয়াল ডিসটেম্পার করা। বড় বড় জানলা খুলে দিলে কুণ্ডুমশাই সত্যি হতভম্ব।

কৃত্তিবাস বলল, ওই তো মুশকিল, কি করি বলুন, শরদিন্দুর মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব ঝোঁক হয়। বসার ঘরটা তার কিছুতেই পছন্দ না। বাড়ির সামনের জায়গাটা খালি রাখা ঠিক না। রাজ্যের ফুল এনে লাগাচ্ছে। গাছের যত্ন আত্তি করছে। মিস্ত্রি ডাকিয়ে বসার ঘর রঙ করিয়েছে, গাছের পরিচর্যায় খুব মনোযোগ। ভাবলাম শরদিন্দু এবার ভাল হয়ে যাবে।

আচ্ছা কৃত্তিবাস, তোমার কি মনে হয় শরদিন্দুর সত্যিই মাথায় কোনও দোষ আছে?

তা তো জানি না। তবে যখন যেটায় ঝোঁক, তারপরই কেমন হতাশ। এই তো রোজ সকাল বিকাল ফুলগাছের গোড়ায় জল দেওয়ার কাজটা, ঝাঁজরি দিয়ে রোজ দু-বেলা জল দিতে না পারলে তার শান্তি ছিল না, তারপর কি হল, হঠাৎ সবই ভুলে গেল। ও যে গাছগুলো নিজের হাতে লাগিয়েছে তাই বোধহয় ভুলে গেছে। বসার ঘরটা সাজাল। কিছুদিন ঘরটাতে বসেও থাকত। নড়তে চাইত না। মাসখানেক হল, ঘরটায় সে ঢোকেই না। নিজের ঘরে সারাদিন টিভি চালিয়ে মশগুল। সারাদিন টিভিতে কি যে এত মাথামুণ্ডু দেখে বুঝি না।

গাছের রোগটা কবে হল!

দশ-বারোদিন হয়ে গেল। হঠাৎ এসে বলল, ওর কিছু টাকার দরকার। কলোনির রাস্তা সে সাজিয়ে তুলবে। বলল, সেগুনগাছ দিয়েই শুরু করা যাক। সেগুনগাছ লাগালে নাকি মেলা টাকা হয়।

বললাম, তোর ভগ্নিপতি পলাশকে চিঠি লিখে দিচ্ছি তবে। ওদের তো কাঠের কারবার। ওরা ঠিক যোগাড় করে পাঠিয়ে দেবে। রাজি? না, সে নিজে যাবে। বললাম, বৈকুণ্ঠ সঙ্গে যাক, তখনই দেখলাম মুখে হতাশা, বলল, সামান্য কটা গাছ নিয়ে আসব, তাতেও বৈকুণ্ঠ। তুমি আমাকে কি ভাব। আমি কি হনুমান, গাছ আনতে গিয়ে গন্ধমাদন নিয়ে আসব! আমার উপর এটুকু বিশ্বাস নেই তোমার। খুবই মুশকিলে পড়া গেল—কোথায় গাছগুলি লাগাবে! বাড়িতে তো আর আমার জায়গাই নেই। রাস্তায় লাগানোর অনুমতি দিতে আপনার কোনও কুণ্ঠা আছে।

কুণ্ডুমশাই পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নস্যি নিলেন নাকে। রুমাল দিয়ে ফ্যাঁত করে নাক মুছলেন। সঙ্গে এক গ্লাস জল নিলেন হাতে। কুলকুচা করে মুখের পান জানলা দিয়ে ফেলে দিতেই আতঙ্ক কৃত্তিবাসের, শরা দেখতে পেলে ক্ষেপে যেতে পারে। লোকটা তো ভারি উজবুক। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই সব নোংরা করে ফেলছে। ডিসেন্সিবোধ নেই। রাস্তায় গাছ লাগালে যত অসুবিধা!

আচ্ছা কুণ্ডুমশাই, একটা কাজ করা যায় না। গাছ শরদিন্দুই না হয় লাগাল। ওর তো আপনার মতো চেলার অভাব নেই। সে লাগাল, পঞ্চায়েতের খাতায় খরচ দেখিয়ে দিলেন। আপনারও কিছু থাকল, শরারও কাজ হাসিল হল। আপনি যদি বলেন, শরদিন্দুকে কনট্যাক্ট দিয়েছেন। এতে চোরও পালাবে আপনারও দু-পয়সা হবে।

আরে এত মিষ্টি কেন? তুমি কি পাগল হয়েছ বৈকুণ্ঠ! এই নিয়ে যাও। একটা মিষ্টি, না তার বেশী

আব একটাও না। মিষ্টি চামচে তুলে খেলেন, তারপর বললেন, এখন আর কি কৃত্তিবাস সে বয়েস আছে। খেতে তো ইচ্ছে করে, কিন্তু শরীর সহ্য করবে না। তোমার যুক্তি আছে কথায়। বুদ্ধির ধার আছে তোমার। তোমার মতো আর একটাও বাঙালী আছে, পাট কেনা-বেচা করে লাট হয়েছে। তোমার পরামর্শ ঠিকই আছে। দেখি কতটুকু কি করতে পারি।

আপনি পারেন। আপনি সব পারেন।

না হে পারি না। সবাইকে এখন গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমরা হলাম নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমরা ইচ্ছে করলেই পারি না। রাস্তা তোমার বাপেরও না, আমার বাপেরও না। রাস্তা সরকারের। শরা তো বলেছে, তার নাকি পাঁচশালা পরিকল্পনা। পাঁচ বছর সোজা কথা! কত পরিবর্তন হতে পারে। আমি তখন কোথায় থাকব তাই তো জানি না। তবে একটা প্রশ্ন।

বলুন প্রশ্নটা কি?

মূল কথা হল শরদিন্দুর মাথা ঠিক নেই। পরিকল্পনা যদি কখনও বিশবাঁও জলে ডুবে যায়, আমি শরার মস্তিষ্ক ব্যাধির কথা ভেবেই বলছি, তখন আমার কি হবে?

আপনার কি হবে আবার। বলে দিলেই হল, সরকার আর টাকা দিচ্ছে না। কত কাজই তো আধ-খ্যাচড়া হয়ে পড়ে থাকে। এটাও না হয় থাকল।

তবু ভাবতে হবে বুঝলে। শরদিন্দুর মস্তিষ্কে যদি পোকা ঢুকে যায়, গাছগুলো যদি ফের তুলে ফেলতে চায়—সে তো বলতেই পারে। তার গাছ, রাখবে কি তুলে ফেলবে তার ইচ্ছে।

তা হয়, গাছ লাগাতে লাগাতে সে নিজেই ভুলে যাবে, গাছ সে লাগিয়েছে। এটাই তো সুবিধা। সে মনে রাখতে পারে না।

খুব পারে হে। দরকারে তার সব মনে পড়ে। সে আসলে খুবই সেয়ানা, বলতে পারলে খুশি হতেন—কিন্তু বাড়তি টাকার গন্ধ তাকে কিছুটা কাবু করে রেখেছে। নিজের ইচ্ছে পুরণের জন্য কৃত্তিবাস আগু পিছু না ভেবে দরাজ দিল হয়ে যেতেই পারে। এতে সে তার লাভের দিকটা অবহেলা করতে পারে না। পাঁচ বছর মেয়াদি রোজগার, কৃত্তিবাসকে চটানো ঠিক হবে না। লোকটা টাকার কুমীর—আর বংশের একমাত্র বাতির এই অধোগতি, মনে মনে হিসেবের অঙ্কটা জোরদার হতেই—এই যেমন গাছ পিছু চার টাকা, গাছ লাগানোর খরচ চার টাকা গড়ে, বেড়া দেওয়া বাবদ ত্রিশ টাকা গড়ে—তার রক্ষণাবেক্ষণে মাসে অন্তত গড়ে পাঁচশো টাকা—তারপর পাঁচশালা পরিকল্পনায় পাঁচশো গাছ বড়। এতগুলি গড় মিলে কুণ্ডুশাইকে সবিশেষ ধন্দে ফেলে দিতেই তিনি বললেন, বিকেলে পার্টি অফিসে এস, কথা আছে।

তাহলে গাছ লাগানো শুরু হউক।

আজ্ঞে না। আগে শরদিন্দুর সঙ্গে কথা বলি।

আপনার পায়ে পড়ছি কুণ্ডুমশাই, শরাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না। এমনিতেই বাপকে সে চোর বাটপাড় ভেবে থাকে, বাপের প্রতি তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই—কি বলতে কি বলবেন, আর শরা কি ধরে নেবে, তারপর কিছুদিন আর আমার মুখই দর্শন করবে না। বাড়িছাড়া হয়ে থাকবে। খাবে না, চান করবে না। জামা প্যান্ট ছেঁড়া, উসখ খুসক চুলে তাকে যখন খুঁজে পেতে বাড়ি তুলে আনি, সে-দৃশ্য দেখা যায় না। যা বলার আমি তো বলেই দিলাম। চোখ বুজে পারমিশান দিয়ে দিন, টাকার অভাব হবে না।

কুণ্ডুমশাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না, কৃত্তিবাস বড়ই ফাঁপরে পড়ে গেছেন। গাছ না লাগালেও শরদিন্দুর কানে কথাটা তুলে দিলে বাপকে চিবিয়ে খাবে। তিনি ওঠার সময় বললেন, তোমার পুত্রটি আমার ধারণা কিছুই ভোলে না। কুমুদ মজুমদারের নাতনির সঙ্গে পিঁড়িতে বসিয়ে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কৃত্তিবাস জিভে কামড় দিয়ে ফেলল।

আমাদের গুরুবংশ। ও-কথা আর মুখে উচ্চারণ করবেন না। পাপ হবে। শরদিন্দু জানতে পারলে আপনাকে খুনও করে বসতে পারে।

খুন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঝুমি ঠাকরুন তার কাছে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। দেবীজ্ঞানে আরাধনা করে, তার নামে কলঙ্ক দিলে আপনার জান যাবে। মাথা তো ঠিক নেই তার।

কুণ্ডুমশাই ভাবলেন, দেরি করা ঠিক হবে না। শরদিন্দু তার চেলা চামুণ্ডাদের নিয়ে ফিরল বলে। সামান্য কথায় যদি শেষে খুনই হয়ে যেতে হয়, তবে যার যাবে, তার যাবে। শরা তো পাগলা বলে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। রাস্তায় গাছও দরকার নেই তার লাভেরও দরকার নেই।

সে বলল, ঠিক আছে, তবে কি জান কৃত্তিবাস, জীবনে সৎ থাকা ভাল। সংস্কার থাকা ভাল না। সংস্কার থাকলেই পাগল হয় বুঝলে। জীবনে সৎ না থাকলে পাপ হয়—এই চিন্তাটাই খারাপ। তোমার পুত্রটিকে বেশী আর বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে দিও না। বরং টিভি দেখুক। মাথা সাফ হয়ে যাবে। কেবল টিভিতে তো আজকাল ন্যাংটা মেয়ের উদ্দাম নৃত্যও ইচ্ছে করলে নাকি দেখা যায়।

তারপর থেমে বারান্দা থেকে সাইকেল নামানোর সময় ফের বললেন, বেশী রাত জাগতে দিও না। বেশী রাতেই বেশী নাচানাচি হয়। আমার বাড়িতে রাত এগারোটার পর টিভি খোলা নিষেধ।

শরদিন্দুর আলাদা ঘর। আড়ত থেকে ফিরতে রাত হয় কৃত্তিবাসের। তখন শরদিন্দু জেগে থাকে না। তবে মাঝে মাঝে রাত জাগে। তার জননী অনেক সময় তাকে ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়।

ওগো শুনছ, শরা আলো না নিভিয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শরদিন্দু বাইরের দিকের আলগা ঘরটায় থাকে। আলো জ্বালা থাকলে ভেন্টিলেটার দিয়ে ছাদে এসে আলো পড়ে। একদিন চুপি চুপি তিনি একটা চেয়ার রেখে, তার ওপর টেবিল রেখে উঁকি দিয়ে দেখেছিলেন, শরদিন্দু বই পড়ছে। পড়ায় নিমগ্ন। কি বই তিনি জানেন না। এত বেশী লেখাপড়া বংশে কেউ কখনও করেনি। পড়াশোনাই হয়েছে কাল। কলেজেও যাস না, পড়াশোনা কবেই লাটে তুলে দিয়ে বসে থাকলি, রাত জেগে আজে বাজে বই পড়ায় এত যে কি দরকার।

একবার ভেবেছিলেন, দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেন, শরদিন্দু শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।

কিন্তু সাহসে তাঁর কুলায়নি।

যদি প্রশ্ন করে বসে, তুমি এত পেছনে লেগে থাক কেন। ঘুমাই না ঘুমাই আমার ব্যাপার। আমি কি এখনও তোমার সেই কচি খোকা আছি! সব সময় খবরদারি করা ছাড়া তুমি কেন যে থাকতে পার না, বুঝি না।

কুণ্ডুমশাই বললেন, আসলে শরদিন্দুকে ফিজিক্সে অনার্স নিতে না দিলেই পারতেন। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী বোঝ!

আজ্ঞে না আমি তাকে পড়াবার কে বলুন! আমি কিছু বুঝি! আমার বিদ্যার দৌড় কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া। পিতৃদেব আমার বেশী লেখাপড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ক্লাশ এইট বিদ্যে যথেষ্ট। হিসেব বুঝলেই হল।

কুণ্ডুমশাই সাইকেল নিয়ে হাঁটছেন। কৃত্তিবাস পাশে পাশে হাঁটছে। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া দরকার। কলোনির মানীজন। বড়ই মহাশয় ব্যক্তি।

সাইকেলের চেন পড়ে গেল হঠাৎ। তিনি নুয়ে চেন তুলতে গেলে কৃত্তিবাস হা হা করে ছুটে গেল।

আমি দিচ্ছি। আপনি সাইকেলটা ধরুন।

কৃত্তিবাস নুয়ে প্যাডেল ঘুরিয়ে চেন তুলে দেবার সময়ই শুনতে পেল, খবর রাখ, তোমার পুত্রটি উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বেড়ায়। আমাদের সায়েন্সের টিচার, নিরাপদবাবু ক্ষেপে গিয়ে নাকি চড়ই মারতে গিয়েছিলেন। হম্বিতম্বিও কম না। তুই শরদিন্দু নাক টিপলে দুধ গলে, আমার বিদ্যার দৌড় দেখার বাসনা। এত বড় আস্পর্ধা।

কৃত্তিবাস হকচকিয়ে বলল, শরদিন্দুর উপর রাগ সাজে! মাথা ঠিক নেই বলেই তো যত উদ্ভট চিন্তা মাথায় বিজবিজ করে! তার কথা ধরতে হয়! ধরলে যে দুজনেরই মাথা খারাপ বুঝতে হয়। তাছাড়া নিরাপদবাবু তো গোবেচারা মানুষ। সাত চড়ে রা করেন না। হেন কি কথা, যা নিরাপদবাবুর অসহ্য ঠেকল!

সে তুমি বুঝবে না কৃত্তিবাস।

আপনি তো বোঝেন, আপনিই না হয় বুঝিয়ে দেবেন।

আমিই কি ভাল বুঝি। বাংলা পড়াই...।

যতটুকু বোঝেন।

কম্পিউটারাইজড্ সোল বলে কোনও কথা আছে, তাই জানি না।

ক...ম্পি...

হবে না, তোমার আর উচ্চারণে [illegible] নেই। খুবই শক্ত কথা।

এসব দায় যে শরদিন্দুকে কে দেয় [illegible] কুণ্ডুমশাই। পুত্রকে নিয়ে বড় বিপাকে পড়ে গেলাম। পাগল হলে পুরো পাগল হয়ে যা, আধখ্যাচড়া পাগলকে কাঁহাতক সহ্য করা যায় বলুন। তোর কি দরকার লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ানোর! এত গুহ্য কথা তোর মাথায় উসকেই বা দেয় কে? গুহ্য কথা, না, পাগলের প্রলাপ তাও বুঝি না।

রওনা হওয়ার আগে বললেন কুণ্ডুমশাই, এসব হলগে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অভিশাপ বুঝলে! সোল মানে আত্মা, আত্মাকেই কম্পিউটারে ভরে দেওয়া। আত্মা জানই তো বিচরণশীল। আত্মার বিনাশ নেই। মহাকাশের যত্র তত্র উড়ে বেড়াতে পারে। যদি আত্মা থাকেই তবে তাকে কম্পিউটারে ভরে বিশ্লেষণ করা। আমাদের গ্রহ তো হাজার বছর পরই বসবাসের অযোগ্য হয়ে যাবে—তখন এই মনুষ্য প্রজাতি যাবেটা কোথায়! প্রাণ আছে এমন গ্রহেরও সন্ধান চলছে। এসব কাগজে পড়েই শরদিন্দুর বোধহয় মাথার ব্যাধি ছাড়ছে না। সে সোজা বলে দিচ্ছে, অত ঝামেলার কি দরকার! আত্মা বল, মন বল, তাকে যদি কোনও প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে আনা যায়, তারপর তাকে যদি কম্পিউটারে ফেলে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সব গ্রহ- নক্ষত্রের খবরই পাওয়া যাবে। তা করা সম্ভব কি না, বোধহয় তোমার পুত্র এমনই কোনও প্রশ্ন করেছিল নিরাপদবাবুকে।

কিঞ্চিৎ শুনেই কৃত্তিবাসের মাথা ঘুরতে থাকল। তাড়াতাড়ি পাঁচিল ধরে কোনওরকমে বলল, কুণ্ডুমশাই, আপনি যান। আমার কপালে যা আছে তা হবে।

কতক্ষণ পাঁচিল অবলম্বন করে কৃত্তিবাস দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি। মাথাটা এত ঘুরেই বা গেল কেন! এমনকি বৈকুণ্ঠকে ডেকেও বলতে পারেনি, আমাকে ধর, আমাকে বাড়ি নিয়ে যা। শরীরটা কেমন করছে।

তখনই শরদিন্দু সাইকেল চালিয়ে সাঁ করে গেটে ঢুকে যাবার সময়ই দেখল, তার পিতৃদেব বজ্রাহতের মতো পাঁচিল অবলম্বন করে প্রায় যেন নিষ্প্রাণ হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সাইকেল ফেলে পিতৃদেবের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, কি, এখানে দাঁড়িয়ে আছ! আড়তে যাওনি?

আড়তে যাব কি করে? তোর গাছ পাহারা দিতে হল না।

তা এখানে দাঁড়িয়ে করছটা কি?

কৃত্তিবাসের মাথা গরম হয়ে গেল। বলতে পারত ঘাস কাটছি। কিন্তু পুত্রকে ঘাঁটালে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবেই বলা, তুই যা, আমি যাচ্ছি। আমার জন্য ভাবিস না।

শরদিন্দু আর বাক্যব্যয় করল না। তার কি কাজের অভাব! এই তো মণিবউদি পালিয়েছে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কুণ্ডুমশাই গাছ লাগাতে নিষেধ করায় সে বিন্দুমাত্র জলে পড়ে যায়নি। সবই জিনের কাজ। সুন্দরীর প্রেম বল, কটাক্ষ বল, শরীরের উত্তেজনা বল সবই যেন জিন নামে এক স্বার্থপর দৈত্যের কাজ—তা তো সে 'দ্য সেলফিশ জিন' পড়েই জেনেছে। মণিবউদি পালিয়ে যাওয়ায় জিন নিয়ে মোক্ষম একটি বিশ্লেষণের সুযোগ এসে গেল তার। সে এমন সুযোগ কখনও হাতছাড়া করে! স্নানটান সেরে কিছু মুখে দিয়ে মণিবউদিকে এখন খুঁজে বের করাই তার একমাত্র কাজ। এটা যে মণিবউদির এক ধরনের বিবর্তন সে তাও বোঝে। আর এটা যে শুধু মণিদার প্রেমে ব্যর্থতা তাও সে মানতে পারে না। মণিদার প্রেম ভালবাসার খান্তি নেই, শরীরও তার অপুষ্ট নয়। বউদির শারীরিক চাহিদা মেটাবার মতো ক্ষমতা যথেষ্টই আছে। মণিদার শরীরের কাঠামোও মজবুত। তার দুটি শিশু পুত্র এবং একেবারে সুখী গৃহকোণে বাজে গ্রামোফোন—সে ক্ষেত্রে যে লোকটির সঙ্গে বউদির আশনাই, তার তো কোনও চালচুলোই নেই। না চেহারায়, না অর্থের দিকে। তবু মণিবউদি তাকে ঈশ্বর ভেবে যৌন-সংযোগের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

তাছাড়া বিবর্তনের মূলে একটি মাত্র এজেন্ট খোঁজার কোনও মানে হয় না। শুধু যৌন-সংযোগের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে স্থান বদলের কথাও ভাবা ঠিক হবে না। মণিদা মিলের উইভিং সেকশানের সুপারভাইজার, নিমাই সরখেল একজন সাধারণ তাঁতি। মণিদাই মিলে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, দূরসম্পর্কের আত্মীয়। বাড়িতে তার থাকারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যৌন-সংযোগের যে সূক্ষ্ম অঙ্ক থাকে অথবা নিয়ম বলা যায়, তার কোথাও কোনও গণ্ডগোল থাকতে পারে সেটাই মনে হয় স্বার্থপর জিনের কারসাজি। একই বাড়িতে একই ছাদের তলায়—মণিদা এক শিফটে, নিমাই সরখেল আলাদা শিফটে, সুতরাং যৌন-সংযোগের সব রকমেরই সুবিধা। ফুটফরমাস খাটা, বাজার আনা, বউদি অসুস্থ থাকলে শাড়ি সায়া ধোওয়া—এ-সবই ছিল তার কাজ। শুধু অকপটভাবে মৈথুনের সুযোগ ঘটবে এই আশাতেই মণিবউদি যদি গৃহত্যাগ করে থাকেন তবে জিন নামক শরীরের মূল পদার্থটিই দায়ী।

তারপর তার মনে হল কোথায় যেন সে পড়েছে—ফিজিক্সের মূল দর্শন একটাই। রিডাকশনইজম্। একটা গোটা জিনিসের চরিত্র বুঝতে দরকার তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানের ধর্মের যোগফল বের করা। এই হিসেবেই জুয়োলজি হয়ে যায় বায়োলজি। বায়োলজি নেসেসিটি বলেও একটা কথা আছে। বায়োলজি হয়ে যায় কেমিস্ট্রি। আর কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স। তারপরই মনে হল কোথায় যেন সে পড়েছে, দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান সায়েন্স—ফিজিক্স, এভরিথিং এলস ইজ সোশ্যাল ওয়ার্ক। এখন বউদিকে খুঁজে বের করে মণিদার হাতে ফেরত দেওয়ার সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়ে মেতে থাকার একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেছে।

চার

আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল ঝুমি। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। কিছুটা ঝোড়ো বাতাসের মতো। বারান্দা থেকে নেমেই টের পেল চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাওয়ার জন্য হ্যারিকেনের আলো দপ দপ করে নিভে যাবার উপক্রম হতেই সে ফের বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকে গেল। টর্চটা নিলে হয়, তবে ব্যাটারি কেনা হয়নি কতদিন! আলো জ্বালাতে গিয়ে বুঝল, খুবই নিষ্প্রভ আলো। তবু কি ভেবে সে সঙ্গে টর্চটাও নিল। কোথায় গিয়ে ব্রজসুন্দরী ঘাপটি মেরে বসে আছে অথবা যদি সত্যি হন হন করে অন্ধকারে ছুটতে গিয়ে পড়ে হাত-পা ভাঙে, এইসব সাত পাঁচ ভাবনায় সে কিছুটা কাহিল।

মাথায় তার ঘন চুল, সারা মুখে বাতাসে চুল লেপ্টে আছে. মুখ থেকে চুল সরিয়ে সে ভাবল হাঁটা দেবে। কার বাড়ি যে যায়! তাড়াতাড়ির মাথায় চুলে কাঁকুই পড়েনি। মাঝে মাঝে নিজের উপরই তার রাগ হয়, তখন আর চুলে কাঁকুই দেবার কথাও মনে থাকে না।

সে হাঁটতে থাকল। খালপাড় ধরে প্রথমে ভাবল রাস্তাটার চৌমাথায় যায়। সেখানে ঠিক করা যাবে, কার কাছে খোঁজ নিলে ভাল হয়।

মাথায়ও তার বিজবিজে পোকা ঢুকে থাকে। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে সেটা আরও বেড়ে যায়। কেমন নিজের কাছেই নিজে ছোট হয়ে যায় তখন। এ যেন দরদাম করে বাজিয়ে নেওয়া। আকাশী তো তার চেয়ে সুন্দর নয়। তার নাকে মুখে যথেষ্ট ছিরিছাঁদ আছে। কেউ কেউ যে বলে বড় মায়াবী মুখ। সামান্য পাওনা গণ্ডা নিয়ে, কিংবা পায়ের খুঁত, কখনও গায়ের রঙ, বিকোবার জন্য একজন মেয়ের কত কিছুর যে দরকার হয়।

এক একবার মনে হয় বিয়ে না করলেই বা কি! কিন্তু বিয়ে না করে সে করবেটাই বা কি! সকালে বিকালে টিউশন করতে পারে। তার যে বিদ্যে, ছাত্র পাওয়াই কঠিন। তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুদুমণির মাথাও খারাপ। বড়মামা তাকে নার্সে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কি না সে চেষ্টা করেছেন। অন্তত গ্রামসেবিকার কাজ পেলেও সে বর্তে যেত। দুদুমণির এত ধরাধরি সত্ত্বেও অঙ্গনওয়াড়ির কাজটা ফসকে গেল। কুণ্ডুমশাই তাঁর এক শালিকে ঢুকিয়ে দিলেন। সোজাসুজি কুণ্ডুমশাই শেষে বলেও দিয়েছেন, দ্যাখেন ঠাইনদি, আমার তো একজনের কথা বিবেচনা করলে চলে না। পেছনে আমার পার্টি আছে। তাদের পছন্দ অপছন্দের দাম দিতে হয়।

দুদুমণির বুড়ো বয়সে যে কত বড় জ্বালা এ-মুহূর্তে ধরতে পেরে বড় অসহায় বোধ করল ঝুমি। কেউ সাইকেলে আসছে।

ঝুমি তাড়াতাড়ি রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। ঝুমি তুই, রাস্তায় একা।

দুদুমণি যে কোথায় গেল!

কোথায় আবার যাবে! কোথাও জমে গেছে। বাড়িতে একদণ্ড মন টেকে না। হয়তো ওরাই এগিয়ে দিয়ে যাবে।

বরুণমামা সাইকেল থেকে নেমে বলল, কখন বের হয়েছে?

সেই দুপুরে।

তোর মামাদের বলেছিস?

যাচ্ছি। ছোটমামার কাছে যাচ্ছি।

তোর দুদুমণি ঠিকই ফিরে আসবে। তবু বুড়ো মানুষ সময়মতো না ফিরলে চিন্তা হবারই কথা।

বরুণমামা মিল থেকে ফিরছে। এখন এই রাস্তাটায় সাইকেলের খুব ভিড় হবে। যেই যাক তাকে দেখে প্রশ্ন করবেই। সে ভাবল বরং জমির উপর দিয়ে ছোটমামার বাড়িটায় ঢুকে যাবে। যদি সুধন্যমামার বাড়িটার যায়।

কারণ শেষ আশা সুধন্যমামা, সুধন্য চক্রবর্তী, তার কোনো ভাগ্নে মিলে কাজ করে। তার জন্য ভাল সুপাত্রী খোঁজা হচ্ছে। দুদুমণি খবর পেয়েই হাজির—দ্যাখ সুধন্য যদি ঝুমির সঙ্গে হয়।

সুধন্যমামা দুদুমণিকে মুখের উপর কিছু বলতে পারে না। ঠাকুরদা তার বাড়ির পূজাপার্বণ সব সামলাতেন। শনি পূজায় অঢেল আশীর্বাদ—সুধন্য তোর ধনেজনে বাড়বে।

তার যে এখন কি ক্ষোভ হয়! দাদুমণি এত লোক তোমার আশীর্বাদে উতরে গেল, আমার জন্য কিছুই রাখলে না। তোমার ব্যারজাসুন্দরী এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে।

সুধন্য, লক্ষ্মী তোর ঘরে বাধা থাকবে। দাদুমণি যার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রেখে গেলেন, সেই এখন দুদুমণিকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। ঘোরাচ্ছে। দেখি কি বলে! ঝুমির পায়ে খুঁত, কে ঘরে খুঁত ঢোকায়। তবু আমি চেষ্টা করব। ঠাকুরদাও তো সগ্গে গিয়ে ভাল নেই। নাতনিটার হিল্লে না হলে তিনিও যে উচাটনে পড়ে যাবেন।

তবে সুধন্যমামার বড় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল দাদুমণির উপর। সংসারে যে তার সুখ উপচে পড়ছে, সবই ঠাকুরদার নিষ্ঠার জন্য। কোনও শুভ কাজ, দাদুমণির অনুমতি না নিয়ে করত না।

তার বড়পুত্রের বিবাহ দাদুমণি দিয়েছেন। তাঁর অনুমতি নিয়েই সুধন্যমামা পাত্রীপক্ষকে কথা দিয়েছে। তাঁর অনুমতি না নিয়ে সংসারের কুটোগাছটিও নাড়ত না। অন্নপ্রাসন থেকে বিবাহ সবই তাঁর স্থির করা দিনে।

একদিন তো পাগলের মতো ছুটে এসে বারান্দায় হত্যে দিল।

ঠাকুরদা কি করি। বড়ই বিপদ।

কি হয়েছে!

বৃসুদের বারবেলায় রওনা হয় কি করে! ছেলের প্রথম চাকরি, কাজে যোগ দেবে। বিকেলের ট্রেন না ধরলে চাকরি যে যায়।

দাদুমণি বলেছিলেন, যাক, কিছু হবে না। ব্যস ওই একটি মোক্ষম কথাই সুধন্যমামার সব সংশয় দূর করে দিয়েছিল। তার মনে আর খিঁচ থাকে না। ঠাকুরদার জবাব পেয়ে গেছে। তাঁকে কেউ ঠাকুরকর্তা, কেউ ঠাকুরদাদা, যে যেমন পেরেছে ডেকেছে, কলোনির সব মানুষের আপদে বিপদে তিনি ছিলেন ভরসা।

সুধন্যমামা বৃসুদের বারবেলায় দুর্গা দুর্গা বলে রওনা করে দিল ছেলেকে। কোনও অঘটন ঘটেনি। বিশ্বাস বাড়ে। এসব বিপদ আপদে কলোনির লোকদের ঠাকুরদাই ছিল আশ্রয়।

ব্রজসুন্দরীকে এই তো সেদিন বলে গেল, ঠাকুরদাদা উপরে গিয়েও আমাদের কথা ভোলেননি ঠাইনদি। ঘুমের মধ্যে বলে গেলেন, সুধন্য তোর বিপদ আসছে। তুই একটা সত্যনারায়ণের পূজা দে। তোর মেজ মেয়ের মৃত্যু-যোগ আছে।

ব্রজসুন্দরী বোধহয় এত সব শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। বলেছিল, সারাজীবন তো পরের বিপদ-আপদই দেখলেন—নিজের ঘরে যে বিষধর সাপ ফণা উঁচিয়ে আছে সেটা কে দেখে!

একচক্ষু মিনসে।

দেখে ঠিকই। তবে সময় না হলে তিনিই বা কি করবেন! নির্বন্ধ বলে কথা।

আর হচ্ছে! বেঁচে থাকতে ত্যানাকানি, মরলে পরে দানসাগর। আমারে কেবল ফুসলায়। কয় কি জান, তেনার নাকি একা একা দিন কাটতেছে না। তাড়াতাড়ি রওনা হইতে কয়। তা কইলেই হয়। নাতনিটাকে একা রাইখা যাই কি কইরা?

সুধন্য তখনই কি ভেবে যেন বলেছিল, দেখি সুকুর বাবাকে চিঠি লিখে। তিনি যদি রাজি হন।

চিঠির খোঁজে দুদুমণি সুধন্যমামার বাড়ি যদি যায়—সুধন্যমামার বাড়ি কাছেও না। লাল সড়কের দিকে থাকে। রাস্তার দু-পাশে শুধু ঝাউগাছ। শন শন করে হাওয়া বয়। ভূত-প্রেতেরও উপদ্রব আছে ওদিকটায়। কবরখানা আছে। একা খুঁজতে যাওয়া তার পক্ষে খুবই কঠিন। তবে ওদিকটায় লাইট আসায় আগের মতো রাস্তাটা রাতে তেমন ভূতুড়ে মনে হয় না। লোকজনের চলাচলও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

তাদের বাড়িটা পার হলেই মাঠ। পরে পুকুর। আরও দূরে পাকা সড়ক। বাস যায় ট্রাক যায়। পাকা রাস্তা হয়েও সুধন্যমামার বাড়ি সে ইচ্ছে করলে যেতে পারে।

রাস্তাটা রেলগুমটি পার হয়ে শহরে চলে গেছে। অবশ্য দুদুমণি একা শহরে যেতে সাহস পাবে না। কিছু বলেও যাবে না। চিন্তা হয় না। তারপরই মনে হল তিনি ক্ষেপে গেলে যেতেই পারেন। ইলাদিও একটা পাত্রপক্ষের খোঁজ দিয়ে গেছিল। সেই খোঁজে যদি যায়।

যা কিপটে স্বভাব—রিকসা করে যে যাবে না তা বুঝতে ঝুমির কষ্ট হয় না। বরং রাতে ইলাদির বাড়িতে থেকে যাবে। ইলাদির বরকে পাঠিয়ে খবরও দিতে পারে। সাইকেলে আর কতক্ষণ—কিন্তু তুমি বুঝবে না, কত চিন্তা হয়!

যা কিপটে স্বভাবও বলা যাবে না।

বললেই তিনি ক্ষেপে যাবেন।

কোনও আর শখ নেই, তীর্থ করা নেই।

বললেই এক কথা, আমার আবার তীর্থ! যেখানটায় আছি সেটাই আমার তীর্থক্ষেত্র।

একটা পাসবইও খুলেছে তার নামে। নীলুমাসিই করে দিয়েছে। এদিক ওদিক করে কেবল টাকা বাঁচাবার ফন্দি। আনাজ তরকারি কিনবে না, বাড়িতেই লাগাবে। দুটো তো পেট, কোনওরকমে চলে গেলেই হল।

বাড়ির এখানে সেখানে শিমগাছ, লাউগাছ, ঘরের চালে কুমড়োগাছ। সারাদিন গাছের পেছনেই আছে। কলপাড়ের দিকটায় দুটো বারোমেসে লঙ্কাগাছও লাগিয়েছে। শুধু চাল ডাল মশলাপাতি ছাড়া আর বাজার কিছু হয় না। ঝুমির অসুবিধে হয় ভেবে, কেউ বাজারে গেলে আঁচল থেকে গুনে গুনে পয়সা বের করে দেবে মাছ আনার জন্য।

বাড়ি এলে বড়মামা যাতে টের না পায়—খরচপত্তর তখন বুড়ির একেবারে হাত খুলে। যদি বড়মামা বোঝে, সবই তো বাড়ির, কিনতে হয়টা কি—দুটো পেট তিন বিঘে জমি, নারকেলগাছ, বাঁশঝাড়, তার আয় কম না। সব দেখেশুনে বড়মামা যদি মাসোহারা কমিয়ে দেয়—এসব কারণে মাসে মাসে চিঠি, লম্বা ফিরিস্তি—দোকান বাকি, দুধের বাকি, ওষুধের বাকি—শুধু চিঠিতে বাকির কথা।

মামা দুধের জন্যও আলাদা টাকা পাঠায়।

মামা বাড়ি এলে আফশোশ, জানিস তো খোকা বেণুর ঘরে কত দুধ! বেণুর জার্সি গরুটা এক টানে দশ সের দুধ দেয়। আমার কপালে এক ফোঁটা দুধ জোটে না। আমি কি কাউকে বাবা পেটে ধরিনি রে? বেণু ইচ্ছে করলে দিতে পারে না? পারে। তবে বউমা যা খাণ্ডারনি, বেণু আমারে দুধ দেয় সাধ্য কি। অশান্তির চূড়ান্ত করে ছাড়বে না! সব বুঝি রে বাবা, বুঝেও চোখ বুজে থাকি।

বড়মামা বউমাদের নিন্দেমন্দ শুনতে পছন্দ করেন না। বাধ্য হয়ে বলা ছাড়া উপায়ই বা কি থাকে—ঠিক আছে নলিনকে বলে যাব। ওরও তো জার্সি গরু আছে। আধসের করে দুধের ব্যবস্থা করে দিলেই হল। টাকাটা ওর নামে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেব।

হয়ে গেল! বুড়ির মুখ চুন।

না রে বাবা, তুই টাকা আমার নামেই পাঠাস। কোনওদিন দেবে কোনওদিন দেবে না—হিসাব গণ্ডগোল করবে।

এ-দেশে দুদুমণির আসা পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেল। তবু মাতৃভাষা যখন তখন বের হয়ে আসে। রেগে গেলে আরও বেশী।

বড়মামা ঠিক টের পান, মা দুধটুকু পর্যন্ত খাবে না। টাকাটা পাসবই-এ ফেলে রাখার চেষ্টা করবে। কারও উপর মা-র বিশ্বাস নেই। কি যে খারাপ লাগে! তার জন্য দুদুমণি যে বড়মামার কাছে কত ছোট হয়ে যায় কিছুতেই বোঝেন না।

কিছুদিন আগে দুটো গাছই বিক্রি করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা, মেজমামার চিঠি বড়মামার কাছে—নানা অভিযোগ, প্রধান অভিযোগ ঝুমির বিয়ের টাকা জমানোর জন্য মা বাড়ির সব গাছ বিক্রি করে দিচ্ছে। আমরা না হয় চুপ করে থাকলাম—কিন্তু তোমার বউমারা সহ্য করবে কেন? তাদের তো শ্বশুরের সম্পত্তি।

ঝুমি তখন আরও নিরুপায়। এত অভিযোগের হেতুটা সে। ব্রজসুন্দরীর জন্য তার চোখে তখন জল চলে আসে।

রাস্তায় অনেকটা এগিয়েও যখন বুঝল ঝুমি, দুদুমণির ফেরার কোনও লক্ষণ নেই, সে বাড়ি ফিরে এল। ঝুমি কাঁঠালগাছটার নিচে এসে গোপিদাদাদের রাস্তায়ও খুঁজল। আবছা অন্ধকারে দুদুমণির সাদা ধবধবে থান কিছুটা দূর থেকেও বোঝা যায়। শহর থেকে রাতে ফেরার সময় কখনও কখনও ঝুমি এটা টের পেয়েছে।

না, সে আর পারছে না। মেজমামাকে খবরটা না দিলেই নয়। ছোটমামীকে বলে গেলে হত—বাড়িটা দেখো। কিন্তু ঝুমি জানে, এসময় রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকে মামীমা। ছোট ছোট ভাইবোনগুলি এখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে। এক হাতে সব কাজ—খুবই বিড়ম্বনা। তাকে বলা না বলা সমান। তাছাড়া মামীমার ধারণা ব্রজসুন্দরীর ঘরে এমন কিছু নেই যা চোর বাটপাড়ের নজরে পড়তে পারে।

কাঁঠালগাছের নিচ দিয়ে মেজমামার বাড়ি যাবার একটা রাস্তা আছে। রাস্তাটা কুয়োতলায় গিয়ে পড়েছে। দু-পাশে লেবুগাছের ঝোপ। জোনাকি উড়ছে। সে রাস্তায় হ্যারিকেন নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

শীতকাল বলে সাপখোপের উপদ্রব নেই। তবু গা ছমছম করা অন্ধকারে একা আলো ছাড়া হাঁটতে ভয় পায়। পুকুরপাড় ধরে এগোচ্ছে। এখানে একখণ্ড জমিতে মেজমামা আখের চাষ করেছে। রাস্তায় আখের পাতা, পাতা সরিয়ে সে হাঁটছে। আখের পাতায় ধারও আছে। পাতা শরীরে লাগলে খস খস করে। শিশিরে ভিজে গেছে চারপাশ। কেমন অগম্য মনে হচ্ছে সব কিছু।

সহজে সে মামাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না। তারও ভিতরে যে কি অভিমান সেও বোঝে না। ব্রজসুন্দরী এখন যেন সবার কাছে বাড়তি মানুষ। তার কি হল না হল, তাতে মামাদের কিছু আসে যায় না।

হলুদের জমি পার হলেই বেগুনের চাষ—একখণ্ড জমিতে মেজমামা বাঁধাকপি ফুলকপিও লাগিয়েছে। বড় পরিশ্রমী। অফিস থেকে ফিরে একদণ্ড বসে থাকে না।

কুয়োতলার রাস্তায় সাইকেলের ঘন্টির শব্দ শুনতে পেল ঝুমি। মেজমামা বোধহয় ফিরল।

সে ডাকল, মেজমামা, দুদুমণি তো এখনও ফিরল না।

আবার কোথায় গেছে!

সাইকেলটা ঘরে তোলার সময় বেণুর ভারি বিরক্ত মুখ।

কি করে বলব, কোথায় গেছে!

উঠোনে দাঁড়িয়েই ঝুমি কথা বলছে।

কিছু বলা যাবে না! যা ইচ্ছে করুক। কখন বের হয়েছে?

দুপুরে!

মা যে তার ঝুমির জন্যই উচাটনে আছে, এটাই কাল হয়েছে ঝুমির। দুদুমণির কিছু হলে সব দায় যেন তার।

কোথায় যাবে, বলে যায়নি কিছু!

না, কিছু বলেনি।

কেন বলে যায়নি সেটা বলতে সংকোচ হচ্ছে ঝুমির। এই বের হয়ে যাওয়ার জন্য সে-ই দায়ি। তার সঙ্গে সকাল থেকে চোপা করে খেয়েদেয়ে বের হয়ে গেল।

রান্নাঘর থেকে মামীমা বের না হয়েই বলল, কোথায় আবার যাবেন। বউদের সুখ্যাতি করতে পারলে, বাড়ি ফেরার কথা তাঁর আর মনে থাকে না।

ঝুমি জানে তার জন্য দুদুমণি বউদের চক্ষুশূল।

কথায় কথায় মেসোমশায়ের খোঁটা দেবে, এমন দেড়নজরে মানুষ আর দেখিনি বাপু!

ঝুমির এ-সব কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। অথচ তার যেন কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সে চুপচাপ সব শোনে।

তাকে নিয়ে ব্রজসুন্দরী সত্যি বড় কঠিন প্যাঁচে পড়ে গেছে। তাকে নিয়ে দিন দিন জটিলতা বাড়ছে। দুই মামা যতটা পারে ব্রজসুন্দরীকে এড়িয়ে যায়। বাড়ির ভাল-মন্দ বাজার নিয়ে একবারও বলে না, মা আজ বাজারে ভাল উচ্ছে উঠেছিল। এনেছি। তুমি তো উচ্ছে খেতে খুব পছন্দ কর। তোমার বউমা দিল।

ব্রজসুন্দরীর রান্না করার সময় আফশোশ—বেণুর জমিতে কত বড় বড় ফুলকপি হয়েছে! বড়ি দিয়ে ফুলকপি করব। নলিন বাজারে গেলে একটা ফুলকপি আনতে বলিস। বছরকার জিনিস খেতে হয়।

ঝুমি তখন ক্ষেপে যায়।

রাখো তোমার ফুলকপি। আমার জন্য বাজার থেকে ফুলকপি আনতে হবে না। তোমার ইচ্ছে হয় আনিয়ে খেও।

আর তখনই ব্রজসুন্দরী খাপ্পা।

সব তো আমি খাই। তুই কিছু খাস না। আমার পেটটাই বড়। এত করি তবু তোর মন পাই না। আমার আর কি! যিনি খাওয়াবার তিনি খাইয়ে গেছেন। ছেলেদের আশায় থাকতে হবে কেন! কোনও প্রত্যাশা নাই। এই তো এত এত ফুলকপি জমিতে, একটা দিয়ে বলেছে, মা তুমি খাবে। দেবে, দেবে ঠিক, যখন গরুতেও খাবে না, তখন দিয়ে যাবে।

ঝুমি দেখল, মামা সাইকেল তুলে কলপাড়ে হাত-মুখ ধুতে চলে গেল। সে দাঁড়িয়েই আছে। কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। মামার বড় মেয়ে মনা বলল, ও বড়দি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে এস না। এই দেখ বাবা কত বড় বড় কমলালেবু এনেছে।

ভেতর থেকে মামীমা ঝামটা দিয়ে উঠল।

কোথায় আবার বড়। বড় আদেখলা আছিস তোরা। জানিস আমার বাবা ঝুড়িভর্তি কমলালেবু আনত। আমরা খেয়ে ফুরোতে পারতাম না। গোনাগুনতি কমলা, ওগুলো আবার কমলালেবু নাকি! কাউকে হাতে ধরে দিতেও লজ্জা হয়।

ঝুমি শুধু হাসল।

অন্ধকার উঠোনে হ্যারিকেনের আলোতে তাকে বড়ই ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। যেন কোনও এক সুদূরে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্য মেয়েটা আলো হাতে বের হয়ে পড়েছে। উঠোনের শেফালিগাছটা থেকে দু-একটা পাতা ঝরে পড়ল। গোয়ালঘরের ফাঁক দিয়ে জার্সি গরুটা পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মামা গামছা দিয়ে ঘাড় গলা পা মুছতে মুছতে বলল, কেন যে ঘুরছে, বুঝি না। ওদের খাই অনেক। কে দেবে অত।

এসব কথা শুনলে ঝুমির ইচ্ছে হয়, বসুন্ধরা দু'ভাগ হোক। সীতার মতো সে পাতালে প্রবেশ করুক। দুদুমণিকে নিয়ে তাকে মানুষের এই লাঞ্ছনা নির্যাতনে সে বড় অসহায় বোধ করে। হে ভগবান! আর জন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই।

সে তবু বেহায়ার মতো বলল, একটু রাস্তায় এগিয়ে দেখ না মেজমামা। সুধন্য চক্রবর্তীর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিলে হত—বলতে পর্যন্ত সাহস পেল না।

শত হলেও মা। মা'র জন্য সন্তানের ভাবনা হবে না? সে ফের বলল, অন্ধকারে দুদুমণি ভাল দেখতে পায় না।

মামীমা সহসা রান্নাঘরের দরজায় এসে উঁকি দিল। বলল, এখন যাবে কোথায়! এই তো এল। মানুষটাকে তোরা একটু নিশ্চিন্তে বসতে দিবি না ঝুমি। সারাদিন খাটাখাটনি গেছে, মুখে দেয়ইনি কিছু।

ঝুমির মুখ ব্যাজার। মামাও কিছু বলছে না। বারান্দার জলচৌকিতে বসে কেবল গজগজ করছে।—কে বলেছে ঘুরতে। যার মেয়ে তার ভাবনা নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—যাও মর গে। আমরা কি করব! এত জেদ ভাল না। চোখে ভাল দেখতে পাও না, কে বলেছে যেতে!

ঝুমি আর দাঁড়াল না।

সে ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। রাতের অন্ধকারে বাড়িগুলো ডুবে আছে। এদিকটায় লাইট আসায় তবু কিছুটা রক্ষে—মাঝে মাঝে মনে হয় আলোর উৎসব। কেমন এক মায়াবী প্রকৃতি তাকে টানছে যেন।

মেজমামার কোনও সাড়া পাওয়া গেল না আর। সে একা কোথায় খুঁজবে তাও কারও ভাবনা নেই। আকাশ এবং শীতের বাতাস মিলে তাকে আরও কাতর করে দিচ্ছে। সে একবার ভাবল, মনাকে ডেকে সঙ্গে নেয়। কিন্তু ডাকলেই অজুহাতের শেষ থাকবে না।—এই তো পড়তে বসল। পড়াতে এমনিতেই মন নেই, তুলে নিয়ে যাবি, দ্যাখ না বিন্দু যায় কি না।

বিন্দু নলিনমামার মেয়ে। ডাকলে লাফিয়ে বের হয়ে আসবে। পালের সীমানায় তাদের বাড়ি। সম্পর্কে কেউ হয় না।

ঝুমি কি যে করবে!

সে রাস্তায় কিছুটা এগিয়েই ডাকল, দুদুম...ণি।

সে জোরে জোরে ডাকল, দুদুমণি তুমি কোথায় মরতে গেছ। তুমি আসছ না কেন?

ঝুমি এই গাছপালার মাটিতে বড় হয়েছে। এই আকাশ বাতাসের নিঃশ্বাসে সে বড় হয়েছে। সে চেঁচালেও নিন্দের নয়। ঝুমি তার বুড়ি দিদিমাকে খুঁজছে। কতবারই এমন হয়, কোথায় গিয়ে বসে থাকে। ঝুমির সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকে—তারপরই এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে বসে থাকা। ঝুমি খুঁজে পেতে না নিয়ে এলে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। বুড়ি-দিদিমাকে খুঁজতে বের হলে প্রতিবেশীরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। নিত্যকার ঘটনা—কে গুরুত্ব দেবে।

লণ্ঠন নিয়ে ঝুমি রাস্তা ধরে হাঁটছে। দু'পাশে সব বাড়িঘর, লণ্ঠনের আলো, পরিচিতজনের গলার আওয়াজ।

কেরে।

আমি ঝুমি। দুদুমণি তোমাদের বাড়ি এয়েছে?

না তো!

দুপুরে খেয়ে বের হল। বেশী দূর তো আজকাল যায় না। ও দুদুমণি, উত্তর দাও না কেন?

তুমি কি মরেছ দুদুমণি, উত্তর দাও না কেন!

সে যখন বালিকা, দুদুমণিকে খুঁজতে বের হলে এমন সব কথা বলত।

কোথায় গেলে!

আপ্লুত চোখ-মুখ ঝুমির।

সোজা গেলে বড় অশ্বত্থ গাছের নিচ দিয়ে যেতে হবে। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করে। তারপর লাল সড়ক—তারপর সোজা রাস্তা মিলের পাশ দিয়ে গেছে। শেষে রেললাইন।

রেললাইনে যদি—ক্ষোভ দুঃখ ব্রজসুন্দরীরও কম নয়। সবার উপর অভিমান। কেউ আর তার জন্য ভাবে না। মুখে গঙ্গাজল দেওয়ার অপেক্ষায় আছে। মামারা যে যার মতো দূরে সরে গেছে। নীলুমাসির স্কুল আছে। মাসির মেয়েটাও বড় হয়ে গেছে। মেসোমশাই মানুষটি বড় ভাল। তিনিই মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেন। ভালমন্দ বাড়িতে কিছু হলে দিয়ে যান।

সে যে একা, তার আর খেয়াল নেই।

মাঝে মাঝে অন্ধকারে আবছা সাদামতো কিছু দেখলে দ্রুত হাঁটছে। যদি হয়। বলা যায় না, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত বোধ করলে রাস্তায় বসে পড়তে পারে। আশা কুহকিনী—একটা সাদা রঙের কুকুর, তাকে দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে।

আশা কুহকিনী—এমনই মনে হল তার।

রাস্তাটা এখান থেকেই সোজা চলে গেছে সুধন্য চক্রবর্তীর বাড়ির দিকে।

সে ফের চেঁচিয়ে ডাকল, দুদুমণি তুমি কোথায়। কারও বাড়িঘরে বসে থাকলে, তারা বের হয়ে অন্তত খবর দেবে, আমাদের বাড়িতে বসে আছে, নিয়ে যা।

তখনই দেখল একটা সাইকেলে কেউ এদিকে আসছে। টর্চ মেরে বলল, ঝুমি নাকি রে?

হ্যাঁ আমি, দুদুমণিকে খুঁজতে বের হয়েছি। কোথায় যে গিয়ে বসে থাকল।

আসছে। শরদিন্দুর সঙ্গে আসছে। রাস্তা হারিয়ে কোথায় বসেছিল, শরদিন্দু নিয়ে আসছে।

ঝুমি হ্যারিকেন হাতে আরও এগিয়ে গেলে দেখল, শরদিন্দু এক হাতে সাইকেল আর এক হাতে ব্রজসুন্দরীকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে।

ঝুমি আলোটা উপরে তুলে বলল, চোখে দেখতে পাওনা, তবু যাওয়া চাই।

ঝুমির গলার আওয়াজ পেয়েই ব্রজসুন্দরী খেপে গেল।

আমি দেখতে পাই না, যা কিছু দেখতে পাস তুই! তোকে একা এত দূর কে আসতে বলেছে? ভয় ডর নাই! অরে আবাগি—লোকে যে নিন্দেমন্দ করবে। তোর মামারা কোথায়! সোমত্ত মাইয়া তুই একা একা রাস্তায় বাইর হইয়া আইলি!

শরদিন্দু কোনও কথা বলছে না। কোথা থেকে নিয়ে এল, কোথায় বসেছিল, কিছুই না। ঝুমিদি, তাকে কোনও কথাই জিজ্ঞেস করছে না। সে কিছু বললেই যদি বলে দেয়, থাম, তোর আবার কথা। তোরা দু'জনই সমান।

আর তখনই ঝুমির বোধহয় করুণা হল শরদিন্দুর উপর।

শরা, কোথায় ছিলেন তিনি। কোথা থেকে নিয়ে এলি!

আর বলবে না, তুমি জানতো মণিবউদি নিখোঁজ—তারই খোঁজাখুঁজি চলছিল। স্টেশনে, কাদাপাড়া, ব্রহ্মপুর, নাগড়াজল, কোথায় না গেছি। পাওয়া গেল না।

মণিবউদি কে ঝুমি তাই জানে না। কোনও কল্পিত নারী শরদিন্দুর মাথা থেকে নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে। তাকেই সে হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে। মেলা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, শরদিন্দুর বকবকানি শুরু হয়ে যাবে। যত কম কথা বলা যায় ততই মঙ্গল।

ব্রজসুন্দরী তখনও গজগজ করছে।

এত উতলা হবার কি হল! আমি কি রাস্তা চিনি না! যম আমাকে নেবার জন্য বসে আছে! তাড়া লাগিয়েছে, খুঁজতে বের হয়ে পড়েছিস!

ঝুমি জানে রাস্তায় আর কোনও কথাই বলা যাবে না। শরদিন্দুকেও প্রশ্ন করে লাভ নেই। কি বলতে, কি বলবে ঠিক নেই। শরদিন্দুকে ব্রজসুন্দরী পছন্দও করে না। কথা বললে তার চোপা আরও বাড়বে। বললেই হল, আর পিরিতের কাম নাই—বাড়ি যা শরা।

সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধর।

ধরব কেন। আমি ঠিক দেখতে পাই। এতটা পথ এলাম কি করে। কি যে গোলমালে পড়ে গেছিলাম। চার রাস্তার মোড়ে ঠাউরই করতে পারলাম না, কোন্ রাস্তা ধরে হাঁটব। ভাগ্যিস শরা এসে হাজির—একেবারে ঠাকুর দেবতার মতো বিপদে এসে হাজির। শরার সঙ্গে দেখা না হইলে কে দিয়া যাইত আমারে!

শরদিন্দুর উপর ব্রজসুন্দরী বড়ই যে কৃতজ্ঞ! এখনই আবার না বলে ফেলে, চল চা খেয়ে যাবি। তুই তো ঝুমির হাতের চা পেলে আর কিছু চাস না।

শরদিন্দুর গলায় মাফলার। গায়ে চেককাটা কোট এবং পায়ে শু। শরদিন্দুর প্যান্ট সাদা রঙের। দাড়িও কামিয়েছে। ফুলবাবু হয়ে বের হয়ে পড়েছিল বোধ হয় তার কল্পিত নারীকে খুঁজতে। শেষে দেখা হয়ে গেল ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে। অনেক দুঃখের মধ্যে ঝুমির হাসি পেয়ে গেল।

সে শরদিন্দুকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল। শরদিন্দু কিছু বলতে চায় যেন, কিন্তু এখন ঝুমির কিছুই ভাল লাগছে না। বাড়ি গেলে উঠতে চাইবে না। শরদিন্দুর যত আজগুবি কথাও শুরু হয়ে যেতে পারে। সে সামান্য পা টেনে হাঁটে। কোথাও গেলে সে নিজেও লক্ষ্য করেছে, মানুষজনের বড়ই কৌতূহল তার প্রতি। তার সবই অত্যন্ত বেশী পুষ্ট বলে, হাঁটার মধ্যে কোনও যৌন-চিন্তা কাজ করে থাকতে

পারে—তাই মানুষের এত কৌতূহল—এমন সে ভাবে। শরদিন্দুও টের পায় বোধহয়, না হলে বলবে কেন, ঝুমিদি, তুমি সাইকেলে চড়া শিখে ফেল। আমি শিখিয়ে দেব। সাইকেলে যাবে। তুমি হেঁটে গেলে আমার কিরকম খারাপ লাগে! সাইকেলে গেলে কেউ টেরই পাবে না, তুমি পা টেনে হাঁট

সেও তো এটা না ভেবেছে তা নয়। নীলুমাসিকে বললে, পুরোনো লেডিস সাইকেলটা তাকে দিয়ে দিতেও পারে। লেডিজ সাইকেলটা নিয়ে এলে শরা তাকে প্রায় গোপনে স্কুলের মাঠে নিয়ে গেছে। বড় ধৈর্য ধরে তাকে সাইকেল চড়া শিখিয়েছে।

শরদিন্দু খুবই কাতর গলায় বলল, যাই ঝুমিদিদি। তারপরই কি মনে হতেই বলল, রাতুলকে মনে আছে তোমার। একবার তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত—তোমাকে দেখতে চেয়েছিল—সারাক্ষণ ঝুমিদি ঝুমিদি করিস—একবার দেখা না তোর ঝুমিদিকে, দেখে আসি। মনে আছে?

না মনে নেই। তুই যা তো। আমার কিছু মনে নেই।

বড় রাস্তায় উঠে আসতেই মেজমামা বের হয়ে এল।

রাস্তায় মরে টরে পড়ে থাকবে আর কি! এত একরোখা হলে চলে!

ঝুমি তাড়াতাড়ি ব্রজসুন্দরীকে নিয়ে সরে পড়তে চাইছে। বুড়ি এমনিতেই খেপে আছে। কি কথায় মা বেটাতে লেগে যাবে—তখন ঝুমির হবে মুশকিল।

শেষে বাড়ি ঢুকে ব্রজসুন্দরীকে বারান্দায় জলচৌকি এগিয়ে দিল।

বোসো, জিরাও। জল এনে দিচ্ছি। হাতমুখ ধোও।

নধর কোথায়?

তোমার সঙ্গে যায়নি!

গেলে, দেখতে পেতিস না! চোখ খেয়ে বসে আছিস। নধর কোথায় আমারে জিগাস!

আমি জানি না, নধর কোথায়। আমি তো ভাবলাম তোমার সঙ্গেই গেছে। তখনই উঠোনে ল্যাকপ্যাক করে দৌড়াতে দৌড়াতে নধর হাজির।

নধর কি আড়াল থেকে এই বৃদ্ধাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে। ব্রজসুন্দরী বারান্দায় বসতেই নধরের আবির্ভাবে এমনই কেন জানি মনে হল তার।

নধরকে উঠোনে দেখে ব্রজসুন্দরীর রাগ পড়ে গেল।

দুপুরে নধরকে খেতে দিয়েছিলি?

দিয়েছি।

ঝুমি কল টিপছে। বালতি ভরে গেলে জল নিয়ে বারান্দায় রাখছে। গামছা হাতের কাছে রেখে দিচ্ছে—আর ব্রজসুন্দরীর কথারও জবাব দিচ্ছে।

দুধ দিয়ে গেছে নলিন?

হাত-মুখ ধুয়ে নাও। দুধ দিয়ে গেছে। রুটি ক'খানা আমিই করে নেব।

ঝুমি দেখল, ব্রজসুন্দরী আয়াস করে বসেছে। পা-দুখানি বারান্দার নালার কাছে রেখে জল ঢালছে। হাত-মুখ ধুচ্ছে পরিপাটি করে। ফের প্রশ্ন ধূপবাতি দিয়েছিস?

দিয়েছি।

এবারে খুবই প্রসন্ন মনে হচ্ছে ব্রজসুন্দরীকে। বলল, আমার ঝুমির কাজকর্মে কোনও খুঁত নাই। এমন মেয়ের একটা ভাল পাত্র জোটে না ঠাকুর! তারপর দু-হাত জড়ো করে অজ্ঞাত সেই দেবতার উদ্দেশে বার বার প্রণিপাত করতে থাকলে ঝুমি না বলে পারল না, নাও ওঠো। ঠাণ্ডায় আর বারান্দায় বসে থাকতে হবে না।

নধরের বস্তাটা কোথায়?

আছে। আমি ঠিক পেতে দেব। তোমার নধর ঠাণ্ডায় কষ্ট পাবে না। এখন তুমি দয়া করে ঘরে ঢোকো।

ঝাঁটাটা বাইরে পড়ে আছে, তুলে রাখলি না!

রেখে দেব।

কিছুতেই ব্রজসুন্দরীকে ঘরে ঢোকাতে পারছে না ঝুমি। যেন এই যে তিনি এতক্ষণ বাড়ি ছিলেন না, কে কখন কি চুরি করে নিয়ে যায়, পারলে যেন গোটা বাড়িটা, গাছপালা বাঁশঝাড় সহ সব দেখে শুনে ঘরে ঢুকতে পারলে শান্তি। এতেও বড় বিরক্ত হয়ে পড়ে ঝুমি।

ঘরে ঢোকার সময়ই ব্রজসুন্দরী বড় আহ্লাদের গলায় বলল, গেছিলাম, সুধন্যার বাড়ি। তাড়াতাড়ি না গেলে মিলের টাইম হয়ে যাবে তাই গেলাম।

সে জানি। সেখানে তুমি যে মরতে গেছ, জানি।

আমি তো মরতেই যাই।

মরতে যাও না তো কি করতে যাও! আমার জন্য তোমাকে কে দরজায় দরজায় ঘুরতে বলেছে! আর যদি কোনওদিন যাও তুমি আমার মরা মুখ দেখবে।

ব্রজসুন্দরী খুবই কাতর হয়ে গেল নাতনির কথায়। ঝুমি তো খুব একটা একরোখা মেয়ে নয়। ঠিক কেউ কিছু বলেছে! মামীরা যা এক একখানা!

কেমন কৈফিয়তের গলায় ব্রজসুন্দরী বলল, কি করি—আমার তো মন মানে না। গেছি, নিজের জ্বালায় গেছি। আমি না ফিরলে তোর চিন্তা হয় বুঝি, তুই রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া থাকবি তাও জানি, কিন্তু সুধন্যর বউ যে বলল, ঠাইনমামী বসেন। একা যাবেন কি করে? উনি ফিরে এসে দিয়ে আসবে'খন। তোর জন্যই তো দেরি করলাম না। আমি কি জানি চৌমাথায় আইসা আমার মাথা গোলাইয়া যাইব!

তুমি রাস্তা ভুলে যাও, চোখে ভাল দ্যাখ না, কানে কম শোনো, তবু বের হওয়া চাই। কাউকে গ্রাহ্য কর না।

ব্রজসুন্দরী শুধু বলল, কপাল। তারপর ঝুমির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল।

মাথার চুল সব সাদা শণের মতো। কে বলবে, বয়সকালে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। পায়ে রুপোর তোড়া পরতেন। বিয়ে বাড়ির শোভা ছিলেন তিনি—ব্রজে কানু বিনে গীত নাই, আবার ব্রজে তখন তাঁর মতো সুন্দরীও নাই।

আচার্য দাদু এলেই পুরোনো দিনের কথা ওঠে, বারান্দায় বসেই হাঁকলেন, এই যে ব্রজসুন্দরী, তোমার আর সেই ব্রজও নাই, সেই কানুও নাই। কানু ছাড়া গীত নাই, তবু যেতে চাও না, ঘরবাড়ি এতই মায়ার বন্ধনে ধরে রেখেছে। তারপর ঝুমির দিকে তাকিয়ে বলতেন, তোর দুদুমণি পুকুরে ডুব দিয়ে কলসি কাঁখে যখন বাড়িতে জল নিয়ে ফিরত, তখন চুরি করে গাছের আড়াল থেকে দেখতাম—শ্রীরাধিকা কোথায় লাগে? কী সব স্মৃতি রোমন্থনের দিন আমাদের গেছে।

সেই ব্রজসুন্দরীর ঘর গেছে—শরীর গেছে—চোখ দুটো ঘোলা, চামড়া কুঁচকে গেছে, তবু দুদুমণি তার দিকে তাকিয়ে আছে। আসলে সেই দুদুমণির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। দুদুমণির জন্য বড় মায়া হয়। মানুষের জীবন এরকমেরই বুঝি। ঘরবাড়ি, সংসার, চঞ্চল হরিণী হয়ে ঘুরে বেড়ানো, তারপর সন্তান-সন্ততি, তারপর এক প্রবঞ্চক প্রসাধন—এরই টানে মানুষ শেষপর্যন্ত দিদিমা, দাদু হয়ে যায়।

ঝুমি গরম রুটি করে নিল। দুধ জ্বাল দিয়ে গরম রুটি দুধ, আখি গুড় সাদা পাথরে রেখে ব্রজসুন্দরীকে খেতে ডাকল।

সে খেল ভাত, এবং দুপুরের তরকারি। ব্রজসুন্দরীকে বিছানা করে দিয়ে বলল, শোও।

বার বারই সুধন্য কি বলেছে, বলে কথা আরম্ভ করতে চাইলে ঝুমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে। সে তার বিয়ের সম্পর্কে কোনও কথাই শুনতে চায় না।

দুদুমণি তক্তপোশে উঠে গেলে, ঝুমি মশারি টানিয়ে দিল। হাতের কাছে জল রেখে দিল। দরজা বন্ধ করে আলোটা কমিয়ে তক্তপোশের আর এক পাশে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে পড়লেই মনে হয় বড় নিভৃত এই বাড়িঘর—চারপাশে অজস্র কীটপতঙ্গ ডেকে চলেছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন এমনভাবে পড়ে থাকল। কারণ সে জানে সব না বললে দুদুমণি শান্তি পাবে না। ডাকলেও সে সাড়া দেবে না ভাবল।

ঝুমি ঘুমালি?

সাড়া নেই।

ঝুমি শুনছিস! বলে এলাম। সব বলে এলাম। তুমি সুধন্য ইচ্ছা করলে পার। তোমার শ্যালক, তুমি

পার না হয় না। তুমি একবার চেষ্টা করে দ্যাখ—তোমার ঠাকুরকর্তার আত্মা শান্তি পাবে।

না, সাড়া নেই।

ঝুমি ঘুমালি! সাড়া দিচ্ছিস না কেন?

ঝুমি আর কি করে, পাশ ফিরে শুল।

বলে এলাম। পাত্রপক্ষকে রাজি করাতে না পারলে তুমি ঠাকুরকর্তার কোপে পড়ে যাবে। তোমরা আছ বলেই, তিনি নিশ্চিন্তে যেতে পারলেন। আর এখন তোমরাই যদি গা না কর, তেনার রাগ হবে না! যা চণ্ডরাগ ছিল, সাক্ষাৎ দুর্বাসা মুনি।

ঝুমির একবার বলতে ইচ্ছা হল, দুদুমণি, এ-সব কথায় চিঁড়া ভিজবে না। পাত্রপক্ষের খাই তাতে কমবে না। কিন্তু বলতে পারল না। দুদুমণি কত যে অসহায়!

সে বলল, ঘুমাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। সকালে শুনব।

বড় নিঃস্ব এই প্রকৃতি। নিষ্ঠুর এই জীবনপ্রবাহ। কিছু কীটপতঙ্গের আওয়াজ আর কুকুরের ডাক শুনতে পেল। শীতের কামড়ে কোথাও একটা বিড়ালের বাচ্চা মিউ মিউ করে কাঁদছে। গাছপালা অন্ধকারে শীতের কুয়াশায় ভিজছে। তারপরই দূরে এক গভীর অনন্ত বালুকাবেলাতে কোনও নারীর প্রেতাত্মা যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে দেখতে পেল। ঝুমি ভয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকল। দুদুমণির কথায় আর কিছুতেই সাড়া দেবে না।

পাঁচ

চৈত্রমাস গেল, বোশেখ মাসেরও মাঝামাঝি—এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই—সারাদিন শুকনো ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের পাতা ওড়াউড়ি করে—প্রায় দাবদাহের মতো—পুকুর নালা সব শুকিয়ে কাঠ—রোদের তেজ সহ্য করা যাচ্ছে না, দশটা না বাজতেই রোদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে যার ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে। গরম, গুমোট হাওয়া, শরীরে এক বিন্দু ঘাম নেই, শুকনো খটখটে—তখন যদি সহসা ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ভিজে যায়, উঠোনে জল জমে যায়, কালবৈশাখী শুরু হয়ে যায়, কে আর ঘরে থাকতে পারে।

ঝুমি ধড়ফড় করে উঠে বসল তক্তপোশে। কখন মেঘ করেছে আকাশে টের পায়নি।

গরমে দিনরাত হাঁসফাঁস, লু বইছে। দরজা জানলা খোলা রাখার উপায় নেই। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দে ঝুমির ঘুম ভেঙে গেল। দুপুরে খেয়ে তক্তপোশে গড়াগড়ি দিতেই ঘুম এসে গেল। টেরই পায়নি, আকাশে মেঘ জমে গেছে, ঝড় উঠে গেছে।

ঝুমি দৌড়ে তক্তপোশ থেকে বারান্দায়, তারপর উঠোনে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। উঠোনের তারে মেলা সায়া, শাড়ি, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় টেনে আবার বারান্দায়। হাওয়া দিচ্ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া। ঠাণ্ডা বাতাসে ঝুমির শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

তারপরই টের পেল দুদুমণি ঘরে নেই। ঘর খালি। কুকুরটা বারান্দায় শুয়ে আছে। ঠিক তারকের মা'র কাছে গিয়ে বোধহয় বসে আছে দুদুমণি। পেটে কথা থাকে না। পাত্রপক্ষের সাতকাহন পাড়ায় জপিয়ে না আসতে পারলে ভাত হজম হয় না। আরও কত খবর দেবার থাকে। বড়মামা মাসোহারা বাবদ এ-মাসে কত টাকা পাঠাল, নাতিরা কত লায়েক তার, কলকাতায় যে না গেছে বুঝবেই না খোকার দাম কত। বড় পুত্রটির গৌরবেও মাথা ঠিক রাখতে পারে না। আমার কি কিছু কম আছে, বলে দিয়েছি, বি এ পাস যখন, ঝুমির জন্য পাত্রখানা আমার চাইই। পাত্রেরও পছন্দ। কি দশাসই চেহারা। যেমন রঙ তেমনি উঁচু লম্বা। ঝুমির সঙ্গে মানাবে ভাল।

তারপরই আসল কথা।

ঝুমিরও খুঁত আছে। পাত্রেরও খুঁত আছে।

ঠিক তখন তারকের মা কিসের খুঁত প্রশ্ন করলেই দুদুমণির পেট খালি হয়ে যাবে—পাত্রটিও ভালই তবে বি এ. পরীক্ষার পর মাথায় গোলমাল—কেবল বসে বসে কাগজ ছেঁড়ে। এখন ভাল আছে। দেখে মনেই হবে না পাত্রটি একসময় বসে বসে কাগজ ছিঁড়ত, কথা বলত না। সে ত বউমা কবেকার কথা। তিন-চার বছর ধরে বাড়িতে বসে আছে। কাজকাম কিছু করে না। ইচ্ছে আছে ল পড়ার। একটাই দাবি পাত্রকে খোকার বাসায় রেখে ল পড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শহরে পাকাবাড়ি, ঝুমিকে দিয়ে

কিছুতেই চিঠিখানা লেখাতে পারছি না। মাইয়ার ঘাড় ত্যাড়া—সে চিঠি লিখতে পারবে না। কি করি কও ত, কারে ধরি।

ঝুমি বারান্দায় বসে ঝড়বৃষ্টি দেখতে দেখতে এমন সব ভাবছিল। কিছুটা যেন নির্বোধের মতো তাকিয়ে আছে—কেমন দিশাহীন—কে বলবে এই ঝুমি সারাদিন ঘর উঠোন গাছপালার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির কোথাও কিছু পড়ে থাকলে তুলে আনে। মরা ডাল, সুপারির খোল, ঝুনো নারকেল গাছতলায় পড়ে থাকলে তাও তুলে আনে। গাছের পাতা ঝরে গেলে ঝুমি সারাদিন গাছতলায়। ঝুড়ি করে পাতা তুলে আনে। ব্রজসুন্দরী কয়লার আঁচে রান্না করে না। কাঠের জ্বালে রান্না অথবা গাছ পাতায় আগুন জ্বেলে রান্না না করলে ভাত খেয়ে তৃপ্তি পায় না। ঝুড়িতে সব শুকনো পাতা তুলে এনে পেছনের বারান্দার আড়ালে রেখে দেয়।

বড় ছিমছাম ঝুমি। সারাদিন ঘর গোছগাছ করতে ভালবাসে। দাওয়ায় আলপনা দেয়। পূজার ফুল তুলে রাখে। তারকেশ্বরের ফটোতে ফুল জল না দিয়ে সে কিছু খায়ও না।

ব্রজসুন্দরী না থাকলে ঝুমি বাড়িটায় একাই থাকে। তার একটাই গুণ—সূচিশিল্পে তার হাত খুব খোলে। সে কাপড়ে রেশমি সুতোয় ফুল ফল প্রজাপতি, কখনও একটা মস্ত কুকুর অথবা কোনও বৃদ্ধার মুখ কাপড়ে যখন যা মনে আসে, কখনও নদী পাহাড় অথবা কোনও জনপদ তার সূঁচসুতোয় আশ্চর্য রূপ পেয়ে যায়। অবসর সময়ে সে এই কাজে বিকালের দিকে প্রায়ই মগ্ন হয়ে থাকতে পারে। আজও বারান্দায় সুযোগ বুঝে জলচৌকিতে সূঁচসুতো এবং কাঠের রিঙ নিয়ে বসে গেল।

সে যে জীবনে বড় সুন্দর করে বাঁচতে চায় দেয়ালে তার আঁকা এইসব হস্তশিল্প দেখলেই টের পাওয়া যায়। ঘরের ভিতরে তার হাতের কাজ কিছু ফ্রেমে বাঁধানো আছে। শরদিন্দুর পাল্লায় পড়েই এটা বেশী হয়েছে।

শরদিন্দু তার ভিতর কি যে আবিষ্কার করেছে, সেই জানে।

তার ব্লাউজের হাতায় এমন সব রেশমি সুতোর কাজ ছিল যে, কেউ বিশ্বাসই করেনি, দুটো ফুল একটি কুঁড়ি নিয়ে সে এমন সৌন্দর্য তৈরি করতে পারে। দুর্গার ফ্রকে সে একটা বাঘের মুখোশ এঁকে দিয়েছে, কেউ বিশ্বাসই করতে চায়নি, ঝুমির পক্ষে এমন সুন্দর মুখোশ আঁকা সম্ভব। শরদিন্দু শুনলে বলবে, ঝুমিদিই পারে। আর কেউ পারে না। শরাই প্রথম যেন তার ব্লাউজের হাতা থেকে ঝুমির যে আলাদা সত্তা আছে টের পেয়েছিল। শরদিন্দুর সেই থেকে কি যে হল—অবশ্য এ-সব কবেকার কথা, ওই যে ছেলেটা, কি যেন নাম, মনে পড়ছে রাতুল, বেশ লম্বা, গালে হালকা নীল রঙের দাড়ি, গেরুয়া পাঞ্জাবি পরা ছেলেটা হঠাৎ বাড়ি এসে, ঝুমিদি আমাদের কোথায়, ঝুমিদিকে দেখতে এলাম—সে তখন কি করছিল ঠিক মনে নেই, তবে দৌড়ে আড়ালে অন্য দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখেছিল, উঠোনে শরদিন্দুর পাশে অপরিচিত কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কবি কবি চেহারা। কাঁধে নীলরঙের সাইডব্যাগ ঝুলছে।

চেনা নেই জানা নেই, তোর কলেজের বন্ধুকে হঠাৎ এনে হাজির করলি! অপ্রস্তুত হতে হয় না।

অবশ্য এটা শরার পক্ষেই সম্ভব।

ঝুমিদি, আমার এক বন্ধু তোমাকে দেখতে আসবে।

কেন কি দরকার।

সবসময় দরকারেই দেখা করতে আসে!

দরকার না থাকলে, আসতে বারণ করবি।

কিন্তু আমার ঝুমিদিকে সে দেখার জন্য পাগল হয়ে গেছে।

থামবি শরা।

আমার কি দোষ বল, রাতুল যে বলল, এত ঝুমিদির কথা বলিস, আমাকে নিয়ে চল না একদিন, তোর ঝুমিদিকে দেখে আসি।

ঠিক চলেও এসেছিল। কিন্তু কেন যে সেদিন ঝুমি ওর সঙ্গে বিন্দুমাত্র ভাল ব্যবহার করেনি। তার রুক্ষ আচরণে হয়তো ছেলেটা আহতও হয়েছিল। সেকি করবে, সে সামান্য পা টেনে হাঁটে, তার শরীরে খুঁত আছে, এই খুঁত দেখার কোনও প্রলোভন অথবা মজা ভোগ করার জন্য যে আসেনি কে বলবে! সে কিছুতেই উঠোনে বের হয়নি। ঘর থেকেই বলেছিল, বসতে বল।

শরদিন্দুও প্রমাদ গুনেছিল। হুট করে নিয়ে আসা তার উচিত হয়নি। ঝুমিদি যে খুবই অপ্রস্তুত তাও বুঝেছিল, তবে যা হয় শরদিন্দুর যেমন স্বভাব, কিছুটা অগ্রাহ্য করার মতো সব কিছু বলেছিল, এই রাতুল, আয় একটু বসি।

যতটা খোলামেলা ভাবে রাতুল, ঝুমিদি কোথায় বলে ডেকেছিল, বারান্দার চেয়ারে বসে আর ততটা খোলামেলা থাকতে পারেনি। ঝুমি সাড়া না দেওয়ায় বরং কেমন সে গুটিয়ে গিয়েছিল কিছুটা।

ঝুমিদি, রাতুল তোমার হাতের চা খেতে এসেছে। আমি বলেছি, ঝুমিদির হাতের চা খেলে, জীবনেও ভুলতে পারবি না।

ঝুমি ঘরের বাইরে আসেনি, তার কারণ বাইরে বের হলে, তাকে হাঁটতে হয়। সে ঘরে স্টোভ জ্বেলে চা এবং দুটো বিস্কুট প্লেটে রেখে ডেকেছিল, শরদিন্দু চা নিয়ে যা। তোর বন্ধুকে দে।

তার ঠাণ্ডা ব্যবহারে ছেলেটা বোধহয় আরও ঘাবড়ে গিয়েছিল। রাতুল তারপর একটা কথাও বলেনি। বোধহয় চা খেয়ে যত দ্রুত সম্ভব পালানো যায় তারই চেষ্টা করেছিল।

রাতুল কি টের পেয়েছিল, এভাবে তার আসা উচিত হয়নি। একজন খোঁড়া মেয়েকে দেখার এত আগ্রহ, শুধু খোঁড়াই নয়, পড়াশোনায়ও অষ্টরম্ভা, এমন একটা মেয়েকে দেখার এত আগ্রহ যে তামাসা দেখার কৌতূহল থেকে নয় কে বলবে। চার-পাঁচ বছর আগে কোনও হেমন্তের বিকেলে যুবকটি অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে। মাঝে মাঝে ঝুমির এমনও মনে হয়। সে অবশ্য পরে শরদিন্দুকে বলেছিল, তোর বন্ধুর নীল রঙের ব্যাগটা খুবই ন্যাড়া। দুটো সাদা গোলাপফুল আঁকা থাকলে তোর বন্ধুর সম্ভ্রম আরও বেড়ে যেত। ব্যাগটা নিয়ে আসিস আমি ফুল তুলে দেব। শরদিন্দুর মুখ অবশ্য ব্যাজার। সেও কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল। সে বলেছিল, ঠিক আছে, দেখব জিজ্ঞেস করে।

অবশ্য সে শরদিন্দুর সঙ্গে নীল রঙের ব্যাগটা নিয়ে আর কোনও কথাই বলেনি। শরদিন্দু তাকে তার বন্ধুর ব্যাগ সম্পর্কেও কিছু আর বলেনি। সেদিন দুদুমণিকে রাতে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় রাতুল আবার এই শহরেই ফিরে এসেছে শরদিন্দু জানিয়েছে। সে তো ইচ্ছে করলে বলতে পারত, তোর বন্ধু কি করছে এখন। কিছুই সে বলেনি। দুদুমণিকে খুঁজে পাওয়া গেছে, দুদুমণি ফিরে এসেছে, এটাই তার কাছে বড় প্রাপ্তি। এমনও হতে পারে, রাস্তার একজন আগন্তুককে নিয়ে বেশী পাত্তা দিতে চায়নি। যার কোনও পাত্রই পাওয়া যাচ্ছে না, সে যে কত মরমে মরে থাকে, সে যে কত ব্রাত্য, মাথায় এ-সব চিন্তাও তার পাক খেতে পারে। যাই হোক, তার আচরণেও যে খুঁত আছে সূঁচে সুতো পরাবার সময় এমন ভাবল।

তাছাড়া শরদিন্দুর মাথায় গোলমাল আছে। কোনও কল্পিত নারী তার সেদিন নিখোঁজ হয়ে যায়, তারই খোঁজে বের হয়েছিল, পরে সেই বউটির স্বামী নাকি শরদিন্দুর কলার চেপে বলেছিল, এই শরা, তোর পাগলামিতে যে সারা কলোনি অস্থির। আমার বউ নিখোঁজ তোকে কে বলেছে। তুই নাকি আমার বউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস! চল আমার সঙ্গে।

শরদিন্দু কেমন বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, নন্দ যে খবরটা দিল। আমার কি দোষ!

চল নন্দর কাছে। তোরা ভেবেছিস কি! মান সম্মান থাকে না। তোর বউদিই না কি ভাবল! শরাঠাকুরপোর সত্যি মাথায় গোলমাল। চিলে কান নিয়ে গেছে, ব্যাস হয়ে গেল। দৌড় দৌড়। পাগল-ছাগলের উৎপাতে পাড়াতে থাকাই দায় দেখছি।

শরদিন্দুর মাথায় গোলমাল আছে ঝুমিও জানে। তবু কেউ পাগল-ছাগল বললে সে কেমন মনে মনে রুষ্ট হয়।

মানুষের দোষ কি, তার বাবাই ছেড়ে কথা কয় না। বাবাই বলে বেড়ায় মাথা খারাপ, ছেঁড়া ফাঁটা জামা-কাপড় পরে বেড়ায়। আমার কিসের অভাব! মাথার দোষ না থাকলে, কেউ এ-ভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে! নিখোঁজ ছিল কতদিন। মাঝে মাঝেই তিনি ভ্রমণে বের হয়ে যান। আগে থানা পুলিশ, ঘোরাঘুরির শেষ ছিল না। ইদানীং সব সয়ে গেছে।

দুদুমণি খোঁজ নিতে গেলে এক কথা—পুত্র আমার পর্যটনে বের হয়েছে ঠাইনমামী। পর্যটন সেরে কবে বাড়ি ফিরবে কি ফিরবে না কিছুই জানি না।

ব্রজসুন্দরীও আছে তেমনি।

এবারে পর্যটন সেরে ফিরে এলে বিয়ে দিয়ে দাও। ঘরবাড়িতে শেকড় না গজালে মন টিকবে কেন। মন উড়ো উড়ো। তোমারও তো এই বয়েসটা ছিল, বোঝ না কষ্টটা কিসের!

সব বুঝি ঠাইনমামী। তবে মেয়ে দেবে কে, দিলেও সঙ্গে যে একখান কলসি দিলে সুবিধে হয়। এমন আজগুবি সব কথা বলে বেড়ায় যে, তার শিক্ষকরা পর্যন্ত বিচলিত বোধ করে। ওকে দেখলে সবাই পালায়। পুত্র এখন আমার মূত্রের সমান—কিছু আর ভাবি না ঠাইনমামী। যা আছে কপালে, হবে।

এ-কথা বলতে নেই। দশটা না পাঁচটা, এক ব্যাটা তোমার। মুখে আগুন দিতেও লাগবে। কবিরাজ দেখাচ্ছিলে না।

ও নিজেই ধন্বন্তরী ঠাইনমামী। বলে কি না সব উজাড় হয়ে গেছে। কিচ্ছু নেই, সব ধাপ্পা। মানুষ মানুষকে ঠকিয়ে খাচ্ছে। তার চেয়ে নাকি আনারসের ডিগ চিবালে মানুষের বেশী উপকার। আনারসের ডিগে নাকি সঞ্জিবনী সুধা আছে। ক'দিন তো নিজেই খুব সকালে উঠল, আনারসের ডিগ তুলে ছেঁচে রস খেল। ভিতরে নাকি জিন নামক কি একটা দৈত্য আছে—সেটাই তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আনারসের ডিগ ছেঁচে রস খেলে রোগের উপশম। আমরা তো জানি পেটে কৃমি হলে আনারসের ডিগ ছেঁচে রস খায় ঠাইনমামী।

ব্রজসুন্দরী তাতে কিছু ধূপ ছড়িয়ে দিয়ে উসকে দিয়েছিল আগুন। তারপর বলেছিল, কারও পেটে হয়, কারও মাথায় হয়। খাচ্ছে যখন খাক, কিসে কি উপকার হয় আমরাই বা তার কতটা জানি।

বুঝলেন ঠাইনমামী—ঘর তার ভাল লাগে না। এক জায়গায় মানুষ ক'দিন থাকে। সব ঘুরছে। গ্রহ নক্ষত্র তারা কিছুই নাকি বাদ নেই। আর তার মা জননী চোখের জল ফেললে এক কথা, জগজ্জননী বৃহৎ ব্যাপার। মহাবিশ্ব নিয়ে নাকি তার কারবার, কাকে আপনি বোঝাবেন!

ব্রজসুন্দরীর আফশোশ, রেশনের কেরোসিন তুলে দেবে বলেছিল, তার আর পাত্তাই নেই।

লেখাপড়াই তার কাল, বুঝলেন ঠাইনমামী। আপনার বউমাকে কত বুঝিয়েছি, বাপ আমার ছিল মাঝি, আমি করি পাটের দালালি, আমাদের ঘরের ছেলের কি বেশী পড়াশোনা শোভা পায়! বউমা আপনার শুনল না, শহরে পাঠাল দিগগজ করতে, নে এবারে বোঝ—পুত্রটি মাথায় কাকের বাসা নিয়ে হাজির। যখন তখন ডিম পাড়ছে আর ইতিউতি উড়ে যাচ্ছে। সাধ্য কার তারে আটকায়।

বজ্রসুন্দরীর কার সঙ্গে কি কথা হয় বাড়ি ফিরে সব বলা চাই। শরাটা আবার পাগল হয়ে গেছে রে ঝুমি। বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কৃত্তিবাস আড়তে যাবার সময় বলে গেল, ঝুমির কাছে যদি কখনও আসে, খবরটা দেবেন ঠাইনমামী। মাসখানেক হয়ে গেল, ঝুমির কাছে যদি যায়।

আর সেদিনই শরদিন্দু তার বাড়িতে এসে হাজির। প্রথম ঝুমি বিশ্বাসই করতে পারছিল না, পরে সত্যি যখন শরদিন্দু, সে অবাক না হয়ে পারেনি।

ঝুমি বারান্দা থেকে রাস্তায় উঁকি দিয়ে দেখেছিল, শরদিন্দু সাইকেলে বসে, মাটিতে পা ঠেস দিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কোনও অস্বাভাবিক আচরণ নেই। তার কাছে এলেও, কথার পরম্পরা ঠিক থাকে না, তবে মাথা খারাপ ভাবতে কষ্ট হয়। তার চেয়ে শরাকে কৃত্তিবাস মাঝির বাউণ্ডুলে ছেলে বলে ভাবতেই বেশী পছন্দ করে।

এদিকেই আসছে।

বাড়ি ঢোকার রাস্তা থেকেই চিৎকার করছে, জয় ঝুমিদির। কতদিন তোমাকে দেখি না ঝুমিদি। থাকতে পারলাম না। ভাবলাম যাই দেখি, ঝুমিদির হাতের যশ দেখি। ওই যে কাঁথায় তুমি চন্দ্র সূর্য নামিয়ে আনবে বলেছিলে, সেই হল কাল। কাঁথায় চন্দ্র সূর্য নামিয়ে এনে যদি তুমি আমার অপেক্ষাতে বসে থাক, ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। চন্দ্র সূর্য নামাতে পারলে?

ঝুমির এমব্রয়ডারি কাজে ভারি যশ আছে। সূঁচ সুতোর মধ্যে প্রাণের রস সঞ্চার করতে না পারলে এমন ছবি নাকি ফুটে ওঠে না। দু-দুবার তার হাতের কাজ প্রদর্শনীতে প্রাইজ পেয়েছে। নকশি কাঁথার বাজার আছে এমনও শুনেছে সে।

এই একটা কাজে ডুবে যেতে পারলে ঝুমির আর কোনও দুঃখ থাকে না। বড়ই নিবিষ্ট হয়ে যেতে

পারে। এমনকি কাজে নিবিষ্ট হয়ে পড়লে তার আর কিছু খেয়াল থাকে না। কোনও কারণে মন ব্যাজার, কিছু ভাল লাগছে না, পাত্র দেখার উপলক্ষে দুদুমণিকে ঠকিয়ে কেউ কেউ টাকাও হাতিয়ে নেয়, নানা কারণেই মন তার ভারি হয়ে থাকলেও, সুঁচ সুতো নিয়ে সে বসে যায়। কাঁথায় ফুল, ফল, গাছের ছায়া, আকাশ এবং চন্দ্র সূর্য নিয়ে পড়ে আছে শরার কথাতেই। কত খবর রাখে। তা ঘোরাঘুরি করলে খবর না রেখেই বা উপায় কি!

শরার কলেজ একজিবিশনে কবে যেন, সেই যেন কতকাল আগে প্রায় জোরজার করে তার দুটো হাতের কাজ নিয়ে যায়। শরা জোরজার না করলে হত না।

শরা এক সকালে এসে ডেকেছিল, ঝুমিদি আছ?

কে?

আমি শরা ঝুমিদি। তুমি কোথায়?

ঘরের ভিতর ঝুমি ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ঝাঁটা হাতে নিয়ে উঁকি দিলে বলেছিল, ও বাবা তোমার হাতে ঝাঁটা। ঝাঁটাপেটা করবে নাকি? কি দোষ করেছি?

তোর কলেজ নেই। সকালবেলায় এসে হাজির হয়েছিস?

কলেজেই যাচ্ছি। কলেজ কম্পাউণ্ডে মেলা বসবে। বইমেলা। সঙ্গে হস্তশিল্প। ভাবলাম ঝুমিদির কাছ থেকে দুটো হস্তশিল্প নিয়ে যাই—চোখ ধাঁধিয়ে দেব সবার।

হয়েছে থাক। বোস।

সাইকেল থেকে নামল না পর্যন্ত। উঠোনে সাইকেলে বসেই বলল, আরে তুমি দেরি কোরো না। আমার মেলা কাজ—আমি গেলে খুঁটি পোঁতা শুরু হবে। প্লিজ ঝুমিদি দেরি কোরো না।

পাগলামি করবি না তো। ও-সব ছাইপাশ একজিবিশনে কেউ দেখায়। ওগুলো কিচ্ছু হয়নি। তুই যা।

কেন ওই যে দুটো ময়ুর উড়ে জলে গিয়ে বসছে, ওই যে নদী আছে একটা, দুটো তালগাছ আছে, নিচে ছোট্ট সুন্দর মতো বাড়িঘর মানুষের, নদীর পাড়ে দুজন শিশু দাঁড়িয়ে আছে—দাও না ও-দুটো।

বলছি তো পাগলামি করবি না। সোজা কলেজ চলে যা। গিয়ে খুঁটি পোঁতা শুরু কর। ওতে বেশী কাজ হবে।

আচ্ছা তুমি কি ঝুমিদি! আমি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলতে পারি। ঘরে পড়ে থাকলে কে মর্ম বোঝে, দেখই না দিয়ে!

হ্যাঁ দিই, আর দুদুমণি গজগজ করুক।

আমি নিয়েছি বললে, কিছু বলবে না।

অবশ্য শরদিন্দু তখন কলোনির গৌরব। শরদিন্দু বাড়িতে এলেই দুদুমণি বলবে, তোর তো সবই হচ্ছে, আমার ঝুমিরই কিছু হল না।

সেই শরদিন্দু কি হয়ে গেল!

শরদিন্দু বেশী জোরাজুরি করলে বলেছিল, বোকার মতো কথা বলবি না তো। বাড়ি বসে থাকি, কিছু নিয়ে থাকতে হয়। দুদুমণির মতো তোরও দেখছি, আমার সবকিছুতেই যশ খুঁজে পাস।

যশ না থাকলে কে তার প্রশংসা করে ঝুমিদি। দাও তো। আমার সময় নেই, দেরি হয়ে যাবে। ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে আমরা স্টল নিয়েছি আলাদা। ওখানে টেবিলে তোমার কাজগুলি সাজিয়ে রাখব। লোকে আমার ঝুমিদির কাজ দেখে ভিরমি খাবে।

হ্যাঁ খাবে! লোকের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। তোরও যেমন, ঝুমিদি ছাড়া কিছু বুঝিস না।

কি করব, তুমি দয়া করে ঝাঁটা হাতে নিয়ে আর দাঁড়িয়ে থেক না। ঝাঁটা ফেলে এবারে তোমার শিল্পটুকু দাও।

এরপর আর পারে?

নে নিয়ে যা। হারাবি না কিন্তু। হারালে বুড়ির চোপার চোটে ভূত পালাবে বলে দিলাম। যা মুখ।

বড় ছেলেমানুষী স্বভাব শরদিন্দুর। বয়সে তার বয়সীও না, বড়ই হবে, অথচ সেই ছেলেবেলা

থেকে ঝুমিদি ঝুমিদি করে। আর সেও হয়েছে তেমনি, সে কুলিন বামুনের মেয়ে, শরদিন্দুরা বেজাতের বলে কিছুটা হেয়জ্ঞান করার স্বভাব আছে তার। মাঝির বেটা কলেজে পড়ে এটাও হেয়জ্ঞানের কারণ হতে পারে। অথবা কিছুই হয়তো নয়, অভ্যাস, কেউ যদি দিদি দিদি করে আনন্দ পায় সে বাধা দেবার কে?

তখনই শরদিন্দু যে সাইকেলখানা কুমুদ মজুমদারের বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে, ঝুমি কি করে জানবে। রাস্তায় ঢুকতেই বিশাল একটা আমগাছ, তার ছায়া, ঝড় বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় কেমন ঠাণ্ডা আমেজ সর্বত্র, বৃষ্টিতে তার জামা প্যান্ট কিছুটা ভিজে গেছে, কিন্তু কতদিন ঝুমিদির সঙ্গে তার দেখা হয় না, ঝুমিদির কথা মনে পড়তেই সাইকেলের বেগ বেড়ে গেছে, সে সোজা উঠোনে ঢুকেও গেল, বাড়িটায় কেউ আছে বলেই মনে হল না, কুকুরটাও বোধহয় নেই—যদি ঝুমিদিকে সে খুঁজে পায়, ঝুমিদি একা থাকলেও যেন তার বেশী সুবিধা, বিপদ ব্রজসুন্দরী বাড়ি থাকলে।

ঝুমি কিছুক্ষণ বারান্দায় বসেছিল। সূঁচ সুতোর কাজে বারান্দায় বসলে বেশী সুবিধা। জানলায় বসেও সে তার কাজ করে। কখন যে সে বারান্দা থেকে উঠে গেছে নিজেই জানে না। আসলে শরদিন্দুর কথা ভাবতে ভাবতে সে কখন তার হাতের কাজগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল জানে না। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো কাজগুলি তার কতদিন ধরে যেন অবহেলায় পড়ে আছে। শুকনো কাপড় দিয়ে কাচ এবং ফ্রেম মুছে দিচ্ছিল—পরম যত্নে।

এমন সুন্দর ছেলেটার মাথা খারাপ ভাবলেও কষ্ট হয়। না ভেবেও উপায় নেই। কলেজ কবেই ছেড়ে দিয়েছে—বলতে গেলে শরার কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের জন্য রাতুলকেও অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, নিজের শরীর নিয়ে বেশী ভাবলে এমনই বুঝি হয়! ঘর থেকে সহজে বের হতেও চায় না। তবে ঘর থেকে না বের হলেও চলে না। ব্রজসুন্দরীর ফুট ফরমাস থেকে চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসার কাজটা সেই করে। ব্রজসুন্দরীর স্বভাবও সে বোঝে না—নিজেই বাড়ি বাড়ি তার পাত্র সম্পর্কে সাতকাহন বলে বেড়াবে, আবার পাত্রপক্ষকে কোনও খবরাখবর দিতে হলে কিংবা বড়মামাকে পাত্রপক্ষের সব জানিয়ে চিঠি দিতে গেলে—খুবই গোপন রাখার চেষ্টা করবে। যেন এই খবর ঝুমি আর ব্রজসুন্দরী বাদে আর কারও কাছে পাচার হয়ে না যায়। হলেই বিপদ, লাগানি ভাঙ্গানির কূট সংশয়।

শরদিন্দুকে যতই অবজ্ঞা করুক, সে বোঝে শরদিন্দু ছাড়া তার কাজের এত প্রশংসা কেউ করে না। তার তো এসেই এক কথা, তোমার হস্তশিল্পের কি খবর। দেখাও না, দেখলে প্রাণ জুড়ায়—সেই শরদিন্দুর মাথা খারাপ বিশ্বাসই বা করে কি করে। শরদিন্দু কি পাগলামি করে নিজের সঙ্গেই এক আশ্চর্য মজায় মেতে উঠেছে। পড়াশোনা লাটে তুলে দিয়েছে কবে, অথচ বই পড়ে। ভারি ভারি বই। এইসব বইই নাকি তার মগজে ঘুণপোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার এক কথা, ঝুমিদি, এই মহাবিশ্বটি বড় আজব কারখানা। নিয়ত ঘুরছে নিজের কক্ষপথে। কোথাও যে ঠোকাঠুকি হচ্ছে না, তাও বলা যায় না। সৌরব্যাপ্তির কথাও সে বলে থাকে। বিশ্বাসই করবে না, এই মহাবিশ্বে আমাদের গ্রহ কত একা। নিঃস্ব। অন্য কোনও গ্রহেই এখনও প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যায়নি। বড় নিঃস্ব এই গ্রহটি—একমাত্র প্রাণ এবং সুদূরের বার্তা নিয়ে এই একটিমাত্র গ্রহই সৌরমণ্ডলে বিরাজ করছে। কোটি কোটি আলোকবর্ষ পার হয়ে গেলেও আমাদের এই সুন্দর গ্রহটির মতো আর একটি গ্রহও খুঁজে পাবে না। তারপরই সামান্য থেমে ঢোক গিলে বলবে, তুমি ঝুমিদি তার চেয়েও সুন্দর। তার চেয়েও নিষ্পাপ।

এরপর ঠিক থাকা যায়। এলেও মনে হয় বিরক্ত করছে, না এলেও মনে হয় বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সবকিছু।

যদি এসে শোনে ব্রজসুন্দরী বাড়ি নেই, কুকুরটাও বাড়ি নেই—কোথায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখনও তার অতীব সহজ সরল কথা—ঝুমিদি কি করবে! কাউকে তুমি আটকে রাখতে পার না। যে যার কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি চিন্তা করে কি করবে! দিন অবসানে সূর্য অস্ত যায়, নিশি অবসানে সূর্য ফের ফিরে আসে তার নিজের অবস্থানে। ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প মড়ক দুর্ভিক্ষ কেউ তার কক্ষপথ পাল্টাতে পারবে না। তুমি কি করে পারবে, ব্রজসুন্দরীকে ঘরে আটকে রাখতে। যথাসময়ে তিনি ঠিকই ফিরে আসবেন।

শরদিন্দুর কথা ভাবতে গেলেই ঝুমির এসব কথা মনে হয়। রাতুল আবার ফিরে এসেছে, এতদিন কোথায় ছিল, রাতুল যদি ফিরেই আসে, তার সম্পর্কে কিছু বলেছে কি না, এমনও অভিলাষ ছিল জানার।

তখন উঠোনে দাঁড়িয়েই শরদিন্দু এদিক ওদিক চুপি দিল।

কেউ নেই।

গেল কোথায় সব!

সে সতর্ক গলায় ডাকল, ঝুমিদি আছ?

কোনও সাড়া নেই।

ঝুমিদি আমি শরদিন্দু। বাড়ি ফাঁকা রেখে তোমরা যে কে কোথায় কখন যাও।

সে ফের ডাকল, ঝুমিদি, তোমার জয় দিলাম। এবার সাড়া দাও। মুখখানাও দেখলাম আবছা মতো, তারপর কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছ।

সে সাড়া দিল না।

ঝুমিদি তোমার আবার জয় দিচ্ছি। ঘরের কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছ, বের হয়ে এস। কতদিন পর এলাম, একবার ঝলমলে দেবীমুখখানি দেখি।

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

আরে বাবা, ঝুমিদি গাছে কত আম! গাছটা কি তোমার কথা বলে। গাছটা কি তোমার হয়ে কথা বলবে ভাবছ। গাছে রাশি রাশি আম ঝুলছে, গাছও যে নিষ্ফলা হয়ে বাঁচতে চায় না। কাক শালিখ উড়ে আসছে একদণ্ড নিস্তার নেই, কোনো এক অলৌকিক রহস্যে গ্রহটা যে আমাদের চঞ্চল হয়ে আছে। তাজ্জব ব্যাপার, গ্রহপুঞ্জ ঘুরছে ঝুমিদি। আমরা এক একজন ফলের মতো ঝুলে আছি। ছবিটা ভারি মজার, না ঝুমিদি। চন্দ্র-সূর্য নামল!

না বের হলে রক্ষা নেই। সারাক্ষণ উঠোনে দাঁড়িয়ে বক বক করবে।

অগত্যা ঝুমি বের হয়ে বলল, কবে ফিরলি! মন ভাল নেই।

সে তো জানি ঝুমিদি, তোমার মন ভাল নেই বলেই তো চলে এলাম। শরদিন্দু প্রশ্ন করল, চন্দ্র-সূর্য নামল!

শরদিন্দুর সব কথার জবাব দিয়ে লাভ নেই। তবে চন্দ্র-সূর্য নামল বললে সে বোঝে তার হস্তশিল্প নিয়ে শরার ফের কৌতূহল জন্মেছে।

সে কাঁথার নকশাতে চন্দ্র-সূর্য চায়। বিশ্বের অপার রহস্যকে তার কাঁথাশিল্পে শরদিন্দু ছুঁতে চায়। কাঁথায় গাছপালা, ফুল, ফল, পাখির জগৎ দেখতে চায়। খোঁজ নিতে এসেছে, কাঁথাখানার কাজ শেষ, না বাকি আছে আরও কিছু। আসলে কাঁথাখানার রেশমি সুতোর সূক্ষ্ম কাজ সে দেখতে চায়। মন কেমন নরম হয়ে গেল ঝুমির। বলল, বোস।

কোথায় গেছিলি?

কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা সব ঘুরে এলাম। পৃথিবীটা একটা মস্ত ব্যাপার, অতি ক্ষুদ্র অণু, তবে এমনিতে কিছু বোঝা যায় না—মহাবিশ্বের এই একটি মাত্র অণুর মধ্যেই কতই লীলা। ব্রহ্মাণ্ড নিজেই তার কুম্ভীচক্রে নিরন্তর পাক খাচ্ছে। কত লক্ষ কোটি নক্ষত্র নিয়ে মহাবিশ্ব ভাবতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না।

ঝুমি ঘর থেকে জলচৌকি বের করে শরদিন্দুকে আজ বসতেও দিল। বলল, মাথা খারাপ করে কাজ নেই। চা করে দিচ্ছি। খা।

তোমার কাছে বসতে ইচ্ছে করছে ঝুমিদি তোমার কাছে এলে মনে জোর পাই। আমাকে কিন্তু তাড়িয়ে দিও না। তুমি তাড়িয়ে দিলে মন বেজায় খারাপ হয়ে যায়।

তাড়িয়ে দেব কেন! বোস না। সেই লোকটার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল আর?

কোন্ লোকটা বল তো?

তোর বন্ধু, ফিরে এসেছে বললি। ফিরে এল কেন আবার! কি করে।

ও মস্ত কাজ করে। পাল্লা দিয়ে হেরে গেলাম ঝুমিদি। বড় গম্ভীর স্বভাব। সরকারি কাজে আবার ফিরে এসেছে।

ঝুমি স্টোভ জ্বেলে চা বসিয়ে দিচ্ছে। ঘরে বসেই তার সব কথোপকথন—কে দেখে ফেলবে, প্রতিবেশীরা সবাই যে ভাল হয় না, তার দোষ ত্রুটি পেলে আর কথা নেই। শরদিন্দু বারান্দায় বসে আছে, ঝুমি বারান্দায় বসে শরদিন্দুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে, এমনটা দেখলে কারও চোখ কুঁচকে যেতে পারে। সে কাউকে সুযোগ দিতে চায় না।

একবার তার কেন যে ইচ্ছে হল বলে, আমার কথা কিছু বলে? কিন্তু ইচ্ছে দমন না করে উপায় নেই—শরদিন্দু যদি তার দুর্বলতা টের পেয়ে যায়, তবে বেচারা মনে কষ্টও পেতে পারে। যতই মাথার গোলমাল থাকুক, তার এই ভাল লাগাটুকু কিছুতেই কারও কাছে প্রকাশ করতে চায় না। শরদিন্দুর সঙ্গে তার কখনই নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে কথাও হয় না। কে কার উচ্ছ্বাস বশত একবার ঝুমিদিকে দেখতে এসেছিল—অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে, তার কথা মনে রাখারই বা কি দরকার।

তারপরই মনে হল, রাতুল সম্পর্কে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করলে শরদিন্দু হয়তো কিছুই মনে করবে না। অথচ সে কেন যে ভাবল, শরদিন্দু মনে কষ্ট পেতে পারে। এইসব হিজিবিজি চিন্তার পাকে পড়েই যেন বলে ফেলল, রাতুল আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে?

কি বলবে?

না সেই যে তাড়িয়ে দিলাম, ভাবতেই পারে মেয়েটার অহঙ্কার খুব। পাত্তাই দিল না।

রাতুল অমন ছেলেই নয়। তবে ঝুমিদি যতবার তোমার কথা বলেছি, চুপ করে শুনেছে। তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি।

না বলছিলাম, ফিরে এসেও কি একবার ঝুমিদির কথা তার মনে হয়নি?

ঠিক আছে, আবার দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।

খবরদার। তোকে কিছু আর জিজ্ঞেস করতে হবে না।

আমার সম্পর্কে ওকে আর কিছু বলবি না। মনে থাকবে?

বললে কি হবে!

মহামুশকিল, তোকে নিয়ে আর পারি না। সে আমাকে ভুলেই গেছে মনে হয়, খুঁচিয়ে আর ঘা করতে যাবি না।

আচ্ছা ঘা হবে কেন বল তো! সে তো খুশি হবে, ও কি করছে, এটা জানতে চেয়েছ, এর চেয়ে বড় খবর মানুষের কি থাকতে পারে। বললে রাতুল দেখ খুবই খুশি হবে। রাতুলই তো একজিবিশনে তোমার হাতের কাজ দেখাবার জন্য সব ব্যবস্থা করেছিল। তাকে তুমি কেন এড়িয়ে চলতে চাও বুঝি না!

কে বলবে এখন শরদিন্দুর মাথা খারাপ আছে।

শরদিন্দুর সৌজন্যবোধেরও শেষ নেই। রাতুল কে, সে কি করছে, ঝুমিদি জানতে চায়, এমন খবরে রাতুলের খুশি হওয়ারই কথা। না হলে রাতুল কেন বলবে, ঝুমিদিকে এক ঝলক দেখেই বুঝেছি, তার হাঁটা চলায় আশ্চর্য এক সৌন্দর্যবোধ কাজ করে। পায়ে খুঁত আছে বলেই নিজের সম্পর্কে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন। ঝুমিদিকে বলবি, যদি কখনও সময় হয় যতই এড়িয়ে থাকুক, আমি তার কাছে আবার যাব। রাতুলের এইসব কথাবার্তাও শরদিন্দু মনে করতে পারল। তারপরই কেন যে মনে হল তার, আসলে রাতুল কিছুই বলেনি—সে নিজের কথাই যেন রাতুলের হয়ে বলতে চায়। এটা তার চিন্তা, না রাতুলের কথা, এইসব সত্য মিথ্যে যাচাই করতে গিয়ে তার মাথাটা ফের গুলিয়ে গেল।

ঝুমি বারান্দায় চা দিতে এসে দেখল, শরা নেই।

কোথায় গেল!

এতক্ষণ তবে সে ঘরে বসে কার সঙ্গে কথা বলছিল! না, উঠোনে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দেওয়া সাইকেলটা আছে। কাছে কোথাও আছে। এত গাছপালা বাড়িটায় যে সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়।

এই শরা গেলি কোথায়। তোর চা নে।

এখানে ঝুমিদি। ভিতরের লেবুর জঙ্গল পার হয়ে কোথাও শরা দাঁড়িয়ে গাছপালা দেখছে।

চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শরদিন্দুর এই এক দোষ। বাড়িটায় এলে সহজে যেতে চায় না। গাছপালার ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। এতটা জমি, ফলের বাগান, বাঁশঝাড় নিয়ে বাড়িঘর কম মানুষেরই আছে। জমি কেউ রাখছে না, বেশী দরদামে বেচে দিচ্ছে। দুদুমণির জীবিতাবস্থায় বড়মামা পৈতৃক সম্পত্তি বেচে দিতে রাজি না। চলে যখন যাচ্ছে, জমি ভাগ করে কি হবে! ছোটমামা গাইগুঁই করলে কি হবে, তাঁর এক কথা। মা বেঁচে থাকতে জমি ভাগ হবে না। জমির বন্টননামা না হলে যা হয়, পড়ে আছে—দুদুমণির রাজত্বে বড়মামার ভয়ে কেউ হাত দিতে সাহস পাচ্ছে না। এতে ব্রজসুন্দরীর তেজ দিন দিন আরও বাড়ছে। কোথায় যে তার মুণ্ডুপাত করতে বের হয়ে গেলেন! সুধন্যমামার বাড়ি যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ধুবুলিয়ায় শ্যালকের বিয়ে দিয়েছেন, ব্রজসুন্দরী ঠিকই খবর পেয়ে গেছে।

তখনই শরদিন্দু উঠোনে এসে হাজির।

কই চা।

বারান্দায় ঢাকা আছে।

শরদিন্দু চা খেতে খেতে কি ভেবে যে বলে ফেলল, তোমার বিয়ের কিছু হল?

কথাটা বলার মধ্যে শরদিন্দুর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। শরদিন্দুকে ঝুমি এতটা আসকারা কখনও দেয়নি। তারপর ভাবল, আর ওর কথায় রাগ করেই বা কি হবে! শরদিন্দু সবই জানে, ব্রজসুন্দরী তাকে নিয়ে যে আতান্তরে আছে, তাও জানে। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীরাও তাকে যে কেন এমন প্রশ্ন করে অপ্রস্তুতের মুখে ফেলে দেয়—তখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। এই নিয়ে দুদুমণির সঙ্গেও তার বচসা হয়, কেন মরতে তুমি সবাইকে জানিয়ে বেড়াও। আগে চেঁচামেচি করত, তামাসা দেখার লোকের তো অভাব নেই। বিয়ের কথা বললে গা জ্বলে যাবারই কথা। তাকে নিয়ে সবাই মজা করছে, এমনও মনে হত। কিন্তু শরদিন্দুর চোখ মুখ বড় ব্যাকুল দেখাচ্ছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেতে গিয়ে ঝুমি কেন যে হেসে ফেলল। শরারও শেষে দুশ্চিন্তা। তার বিয়ে হচ্ছে না।

খুব গরম চা সে খেতে পারে না। তাড়াতাড়ি থাকলে প্লেটে ঢেলে খায়। এখন তেমন তাড়াহুড়ো নেই, শরদিন্দু এসেছে। তার ভালই লাগছিল. দেশ বিদেশ ঘুরে এলে দাড়ি গজিয়ে যায়। প্যান্ট সার্ট নোংরা হয়ে যায়। ছেঁড়া তালিমারা প্যান্ট পরেও চলে আসে।

শরদিন্দু আজ চুলও শ্যাম্পু করেছে। গোঁফ রেখেছে। মুখ চোখ দেখলে সরল বালকের মতো মনে হয়। ঝুমি যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে।

তুমি হাসলে যে ঝুমিদি?

হাসব না। আমার কবেই বিয়ে হয়ে গেছে। তুই খবরই রাখিস না। তুই এত বোকা।

বিয়ে!

হ্যাঁ বিয়ে।

কার সঙ্গে?

গাছের সঙ্গে।

গাছের সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা কি ভাল দেখায় ঝুমিদি!

ভালমন্দ বুঝি না, তুই আর কোনওদিন বলবি না, ঝুমিদি তোমার বিয়ের কি হল। সবাই বলে। তামাসা দেখার লোকের তো অভাব নেই। তুই অন্তত বলিস না।

শরা কি ভাবল কে জানে। সে উঠে পড়ল। গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তত ঝুমি শরার মুখ দেখে এমনই ভাবল।

ছয়

আজকাল কাজ করতে করতে ঝুমি ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার লজ্জা হয় নিজের দিকে

তাকাতে। কেউ তাকে পছন্দ করে না। তখনই কষ্টটা তিরতির করে বুক বেয়ে ওঠে। সারা শরীরে তার কষ্টটা ছড়িয়ে যায়। তখন তাকে বড় বিষণ্ণ দেখায়।

কখনও পুকুরঘাটে চুপচাপ বসে থাকে। জলে ডুব দিয়ে তার আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। বাসন-কোসন ধুয়ে বাড়ি ফেরার সময় মনে হয়, ঠিক গিয়েই হয়তো দেখবে, কেউ বসে আছে। দুদুমণিকে আশ্বাস দিচ্ছে, খোঁড়া মেয়ের কি আর বিয়ে হয় না। ঠিক সময় হলে সব হবে। গাছে কাগজি লেবু থাকলে দুটো দিন। যা গরম!

বাড়িটায় তো কিছুরই অভাব নেই।

কাগজি লেবুরও না।

দুদুমণির কাছে কিছু চাইতে হলেই, যেন ঝুমির কথা বলতে হবে, বিয়ের কথা বলতে হবে, পাত্রপক্ষের খবর নিতে হবে, তারপরে যে যার বাসনার কথাটি বলে ফেলবে।

নিবি তো দুটো কাগজি লেবু, তার জন্য দুদুমণিকে এত খোশামোদের কি আছে! এমনিতে চাইলে কি দেয় না! অথচ সে জানে, ফুল তুলতে এলেই তার কথা, কাঁঠাল পাতা পেড়ে নিতে এলেও তার কথা, আর তার কথা যে কেবল একটি জায়গায় ঘোরাফেরা করে পাত্র কি করে, দেখতে কেমন, ঝুমিকে পছন্দ করেছে কি না, কি দিতে থুতে হবে, পাত্রপক্ষ আর কোনও খবর দিয়েছে কি না, সেই যে গেল, আর তো দেখা নেই—সে এজন্য বাড়ি ঢোকার মুখেই লক্ষ্য করে থাকে বারান্দায় কেউ বসে আছে কি না। বারান্দায় বসে থাকলেই সে সহজে বাড়ি ঢুকতে চায় না। পালের বউর কাছে গিয়ে বসে থাকে।

আমড়াগাছটার নিচে এসে দেখল, বারান্দা খালিই আছে। সকালবেলায় ব্রজসুন্দরীকে তোষামোদ করতে কেউ বসে নেই। সে বাসন-কোসন নিয়ে সোজা উঠোনে ঢুকতেই, কোথা থেকে হাড় মুখে ছুটে এসেছিল কুকুরটা। তাকে দেখেই হাড়টা ফেলে দু-পা পিছিয়ে দৌড়।

ঝুমির চোখে মুখে বিতৃষ্ণা। ঘেন্নাও কম না। বাসন-কোসন বারান্দায় রেখে হাতে ঢিল নিয়ে দৌড়ে গেল ঝুমি। বাড়িটায় ভাগাড় এসে ঢুকলে সে সয় কি করে!

মরার আর জায়গা পেল না! ভাগ। ঝুমি ছুটে গিয়েও পারে না। ঢিল ছুঁড়েও পারে না। শেষে শাসায়—আবার উঠোনে ঢুকে দেখিস। ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। আর ভাত পাবি না। তোকে কে খেতে দেয় দেখব।

ব্রজসুন্দরী ও-পাশের বারান্দায় সবে মুগের ডালে সম্বার দিয়েছে। ছ্যাঁক করে উঠল, ধোঁয়াও উঠল। তারপর মনোরম গন্ধে ভরে গেল সারা বাড়ি। কিন্তু নধর সকালবেলায় এটা কি করল!

ঝুমি ক্ষেপে গিয়ে বলল, একটা আস্ত পিশাচ। ও দুদুমণি দ্যাখ এসে তোমার নধরের কাণ্ড। আমি কিন্তু কিচ্ছু পরিষ্কার করতে পারব না।

ঘেন্নায় ঝুমির মুখে থু থু উঠল, তারপর ঘেন্নায় ওকও উঠে এল তার। ব্রজসুন্দরী খুন্তিখানা দিয়ে ডাল নাড়তে নাড়তে বলল, পারবি না, পারবি না। অত মেজাজ কিসের!

বুড়ি না বুঝে শুনেই তাকে ধাতাচ্ছে। কি পারবে না, কেন পারবে না, বুড়ি তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। কুকুরটা ফের কি বজ্জাতি করেছে তাও জানে না। কুকুরটা যে ভাগাড় থেকে একটা আস্ত হাড় মুখে করে ঢুকে গেছে উঠোনে তাও জানে না। আর বলে দিল, পারবি না তো পারবি না। অত মেজাজ কিসের।

হ্যাঁ মেজাজ করবে না। এখন কে সাফ করে। দাও বাটি ভর্তি করে দাও। আরও খাওয়াও—বলে দু-হাত নাচিয়ে সেও দুদুমণিকে ঝামটা দিল।

কাকে খাওয়ালাম।

কাকে আবার, নধরকে।

নধর আবার কি করল!

এসেই দেখ না, কি পিরিত! দে সব কটা ভাতই দিয়ে দে।

আমি দিই না, তুই দিস। কে জায়গা দিয়েছে! নধর কোথায়?

পালিয়েছে। একটা এত বড় হাড় ফেলে পালিয়েছে।

ঝুমির বমি পাচ্ছিল। কারণ তার কাছে সারা বাড়িটা অশুচি হয়ে গেছে যেন। টিউকল থেকে বালতি বালতি জল তোলা, ভাগাড় সাফ করা—ভাবতেই দেখল, গুটি গুটি লেজ নাড়তে নাড়তে তালগাছগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছে নধর।

এসে দ্যাখ কি করি! তোল এটা। ফেলে দিয়ে আয়। বলছি ফেলে দিয়ে আয়। কিছু করব না। এই দ্যাখ হাতের লাঠি ফেলে দিলাম। এত খাস তবু ভাগাড়ের লোভ। আর শেকল খুলে দিচ্ছি না। পড়ে থাক বারান্দায়। টোলানোর স্বভাব তোমার আমি বের করছি।

তালগাছের জঙ্গলে মুখ বার করে নধর তার ঝুমিদিকে দেখছে। সে যে বড়ই কুকর্ম করে ফেলেছে তাও সে বুঝতে পারছে। কুঁই কুঁই করে না হলে ডাকত না। জঙ্গলের ভেতর থেকে মুখটা শুধু বের করে রেখেছে।

এত শয়তান! হাড়টা ফেলে না এলে বাড়ি ঢুকতে দিচ্ছি না। আমার এক কথা।

নধর কি বুঝল কে জানে। জঙ্গল থেকে পা পা করে কিছুটা হেঁটে, প্রায় ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল হাড়টা।

ফেলে বাড়ি ফিরে আসবি। কোথাও যাবি না। পুকুরে আজ চুবিয়ে তবে ঘরে তুলব। ঝুমিদি তোর ট্যারা তো ট্যারা। সোজা তো সোজা।

ব্রজসুন্দরী খুবই কুপিত। ভাগাড় ঘাঁটলে স্নান করতে হবে ঝুমিকে। ঝুমির শরীরও ভাল যাচ্ছে না। দু-তিন দিন বেশ জ্বরে কাহিল ছিল। অবেলায় স্নান করলে ঝুমি ফের সর্দি জ্বরে ভুগতে পারে এইসব ভেবেই একখানা লাঠি নিয়ে ছুটে গেল নধরের পিছু পিছু।

কোথায় পাবে নধরকে। মাঠ পার হয়ে ল্যাজ তুলে বড় রাস্তার দিকে পালাল।

লাঠি হাতে রাস্তা পর্যন্ত তেড়ে গেল। নধর খাল পার হয়ে মাঠ ধরে পালাচ্ছে দেখতে পেল ব্রজসুন্দরী।

দিলি তো নধরকে তাড়িয়ে! আর কি, এখন মজা সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। আর বাড়ি ফেরার কথা মনে থাকবে!

যেন সব দোষ ঝুমির।

ঝুমি বোঝে এবার তাকে নিয়ে পড়বে।

রাস্তা থেকেই চেঁচাচ্ছে, তুই চেল্লাস না। ক'দণ্ড বাড়ি বসে থাকিস। যত দোষ নধরের। আমি ঘোরাঘুরি করি—নধর ঘোরাঘুরি করে তুই কিছুই করিস না!

ঝুমিও চেঁচিয়ে না বলে পারল না, দুদুমণি, রাস্তায় নেত্য করবে না। নেত্য করতে হয় বাড়ি এসে কর। আর লোক হাসিও না। তোমার নধর যা খুশি করুক, যেখানে খুশি যাক, আমার কি! তোমার কুকুর, আমি কিচ্ছু জানি না। বলবে না, দ্যাখ তো নধর গেল কোথায়। নধরের জন্য প্রাণ যায় তেনার।

হয়ে গেল।

আমার কুকুর না তোর কুকুর! কে এনেছিল বুকে করে! আমি না তুই। দুদুমণি দ্যাখো কি সুন্দর দেখতে। ওর মা-টা মরে গেছে। রাস্তায় বাসের তলায় চাপা পড়েছে। নিয়ে এলাম। এখন বোঝ নধর আমার না তোর। পেটের পোলারাই খোঁজ নেয় না, একটা চিঠি দেয় না—নধর ভাববে আমার জন্য।

ডাল পোড়া গন্ধ উঠছে—নাক টেনে বুঝল ঝুমি। উনুনে ডাল বসিয়েই নধরের পেছনে তিনি ছুটলেন!

ঝুমি উঠোনে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে গেল পাশের বারান্দায়। উনুন থেকে ডালের কড়াই নামিয়ে গজগজ করতে থাকল।

খাবে, পোড়া ডাল খাবে। আমার কি! পোড়া কাঠও উনুন থেকে তুলে ফেলল কিছুটা। কুমড়োফুলের বড়া, লাউডগার পাঁচমেশালি তরকারি, ইচরের ডালনা সবই বাটিতে ঢাকা। এক বেলা আহার দুদুমণির। ডালে হাতা ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকে দেখল।

ডালপোড়া গন্ধ কি বিশ্রী! খাবে, যেমন কপাল, যাও লাঠি নিয়ে, খেতে বসে টের পাবে।

আসলে নধরই নষ্টের মূলে।

ব্রজসুন্দরী লাঠি হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েই আছে।

ঝুমি জানে, ব্রজসুন্দরী কারও প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। কেউ বোধহয় সাইকেলে আসছে।

কে রে?

আমি পালান ঠাইনদি।

কই যাস?

মিলে।

মিল না বন্ধ। মিলে কাজ কাম নাই শুনছি।

মিলে জমায়েত আছে ঠাইনদি।

নধরকে রাস্তায় দেখলে পাঠিয়ে দিবি তো।

যেন নধর কোনও প্রাণী নয়। পরিবারেরই একজন।

ঝুমির আর সহ্য হয় না। সবাই ঠাইনদির মাথা খারাপ ভাবে। নাতনির বিয়ের চিন্তায় মাথা ঠিক নাই।

তারপরই শুরু হবে ঝুমির শ্রাদ্ধ। ঘরে বসেও সে ঠিক আন্দাজ করতে পারছে। কিছু করারও নেই। ডেকে আনলে আরও রুষ্ট হয়ে উঠবে।

আরম্ভ হয়ে গেল।

তোরা এত লোক আছিস ঝুমির একটা পাত্র জুটল না। আমি আর ক'দিন।

আবার সেই এক কথা।

তর ঠাউরদা আমারে জ্বালায়। আমারে সারারাত টালায়। কি কয় জানস! কয়, দুগগা দুগগা করে রওনা হও। অনেকদিন তো হয়ে গেল। একা আর ভাল লাগছে না।

তারপরই বেচারা মুখ ব্রজসুন্দরীর।

আমি যাই কি কইরা ক'? ঝুমিরে কার কাছে রাইখা যামু। চিন্তায় রাইতে ঘুমাইতে পারি না। কে দেখবে আমার ঝুমিকে!

চোখে জল আসে ঝুমির। আবার রাগও হয়। সবাই মজা লুটছে তার দুদুমণিকে নিয়ে। দুদুমণি কিছুতেই বুঝতে চায় না, মানুষজন তামাসা দেখতেই বেশী ভালবাসে।

যেদিকে চোখ যায়, বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করে ঝুমির। নধরকে লাঠি তাড়া না করলেই হত। নধর এ-বাড়ির আর এক শরিক। তাকে ঘাঁটালে দুদুমণির সহ্য হয় না। তাল বেতালের নৃত্য শুরু করে দেয়। নধর রাতে বারান্দায় শুয়ে না থাকলে ফাঁপরে পড়ে যায়।

সে কোথাও গেলে নধর তার সঙ্গে। বেপাড়ার কুকুরগুলিও হয়েছে তেমনি, যেন বাড়াভাতে কেউ ছাই দিয়েছে। দলবেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ঠ্যাং কামড়ে ধরবে। গলা কামড়ে ধরবে। তবে নধরও ছেড়ে কথা কয় না। রক্তাক্ত নধরকে নিয়ে বাড়ি ফিরেও অশান্তি।

ব্রজসুন্দরী কপাল চাপড়াবে। শোক তাপের তখন শেষ নেই! কাউকে রেহাই দেবে না। কুকুরগুলিকেও না।

মর মর, অতিসার হয়ে মর। আমার নধরকে কামড়ে কেউ তোরা রেহাই পাবি না। ওলাওটা হবে। রক্ত বমি হবে।

ঝুমি তখন হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায় না। বুড়ির ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। ছটফটানিরও শেষ নেই। বেওয়ারিশ কুকুরদের শাপশাপান্ত করবে আর ঘরের এটা টানবে, ওটা ফেলবে—দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়।

আরে ঝুমি চুন আন, হলুদ নিয়ে আয়। গরম চুন হলুদ ক্ষতস্থানে না লাগিয়ে দিতে পারলে শান্তি নেই।

ঝুমি বলবে, যায় কেন বোঝ না। তোমার নাতনিকে সারা রাস্তায় না হলে পাহারা দেবে কে?

পাহারা দিয়েই তো আমার কপাল পুড়ছেল। তর জন্য রাইতে দু' চোখের পাতা এক করতে পারি না। আমার ঘরে কালসাপ আছে অরা কি বোঝে! বুঝলে কি তর মামীরা চিত হইয়া নিজের মরদের সঙ্গে শুইতে পারে। বুঝলে চেষ্টা চরিত্র করে পারে না কানা খোঁড়া যা হোক একটা ধরে আনতে।

ঝুমির এই এক মুশকিল—কোনও অজুহাত পেলেই হল, খোঁটা দেবে, তার পাত্র জীবনেও জুটবে না। তার বিয়ে হচ্ছে না তো, সে কি করবে! কারও সঙ্গে বের হয়ে গেলে বুঝবে মজা। বেরই বা হবে কার সঙ্গে। বড়ই কাতর হয়ে পড়ে নিজের কথা ভাবতে গেলে।

সে তো দেখতে খারাপ না । তার চুলে বাহার আছে। আয়নায় মুখ দেখলে টের পায় সুন্দরী না হলেও সে অসুন্দরী নয়। দুদুমণি প্রসন্ন থাকলে, তার চুলের বাহার নিয়েই কত কথা বলবে। আমার ঝুমির কি কিছু খামতি আছে! মুখখানা কি চাঁদপানা, চুল পরীর মতো ওড়ে। গায়ের রঙখানা ঝকঝকে জ্যোছনা। তোদের মনে ধরে না। দেনা-পাওনা নিয়া গোল কইরা মরস। নিবি ত মাইয়াখানরে। ক্যান নিবি, কি করতে নিবি বুঝি না।

বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমি। বারান্দা পার হলে স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ ফুলের কিছু গাছ, তারপর একটা বাতাবি লেবুর গাছ—গাছগুলি থাকায় কিছুটা আড়াল থেকে সে সব শুনতে পাচ্ছে। ক্যান নিবি, কি করতে নিবি বললে ঝুমিকে যে ছোট করা হয়, তার শরীর নিয়ে মাখামাখির কথা থাকে, দুদুমণির মাথায় তা কিছুতেই ঢোকে না। অবলীলায় কত যে সহজে অশ্লীল কথা দুদুমণির মুখ থেকে বের হয়ে যায়। একবার ভাবল ডাকে, দুদুমণি তুমি আবার আমাকে নিয়ে পড়লে, চলে এস বলছি।

ঝুমির রাগে দুঃখে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। রাস্তায় পালানদাদা সাইকেল থেকে এক পা নামিয়ে ব্রজসুন্দরীকে প্রবোধ দিচ্ছে। কেন যে সে নধরকে তেড়ে গেল—

বড়দা কি বলে?

অর কথা কইস না। কইতে গেলে পিত্তি আমার জ্বইলা যায়। পারে না মা-মরা মাইয়াটার একটা হিল্লে করতে! করব নারে। বউমা আমার ফোঁস। আমি তার কেউ না! কলকাতায় থাকস, খাস, পয়সা উড়াস—নাতনি কি আমার জলে ভাইসা আইছে। তর ঠাউরদা কি মানুষ আছিল, অপদেবতা বিশেষ। অকম্মা মানুষের কপাল পোড়ে। তার পরিবারের কপাল ভাল হবে কোন্ গুণে? তাইন তো আবার নতুন উৎপাত শুরু কইরা দিছে। রাইতে আইসা শিয়রে বইসা থাকে। হাত ধইরা টানাটানি করে। কেবল আমারে যাইতে কয়। বেহায়া বুঝলি, চোপা না করলে শিয়র থাইকা নড়তে চায় না। ঝুমি বোঝে ব্রজসুন্দরীর স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল। পুনরাবৃত্তিরও শেষ নেই। একই কথা জনে জনে কতবার যে বলে।

ঠাউরদার একা ভাল না লাগলে কি করব কন! তাঁর তো দোষ নাই ঠাইনদি। সব আছে, আপনে নাই, মন তো খাঁ খাঁ করবই।

বুঝিরে ভাই, সব বুঝি। চার কুড়ি বয়স পার কইরা পাট তুললি। ধর তিন কুড়ি বছর তার লগে ছিলাম। কতকালের অভ্যাস। একা ভাল না লাগতেই পারে। কিন্তু আমি যাই কি কইরা? ঝুমিরে কার কাছে রাইখা যামু?

শান্তি স্বস্ত্যয়ন করবেন যে কইছিলেন।

ঝুমি দাঁড়িয়েই আছে। সব দেখতে পাচ্ছে এবং সব শোনাও যায়। ব্রজসুন্দরী দুটো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হাওয়ায় ভাসিয়ে বলল, কাঁচকলা। পোলারা টাকা না দিলে করি কি কইরা। তা বার্ষিক কাজ হয়, দেখি বড় পোলা যদি মাথা পাতে। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করালে পঞ্চতীর্থ কইছে তাঁর আত্মার নাকি সদগতি হইব।

ঝুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছে আর ছটফট করছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারে না। সবাই দেখে—ওই যায়, কুমুদ মজুমদারের নাতনি ঝুমি যায়। চিঠি নিয়ে যায়, ব্রজসুন্দরীর চিঠি। ডাকবাক্সে ফেলতে যায়। চিঠিতে পাত্রপক্ষের দাবি-দাওয়ার কথা থাকে। ঝুমিকে দিয়ে লেখায়, ঝুমিই ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসে। সবার কাছেই ঝুমি বড় করুণার পাত্র। পায়ে খুঁত আছে বলে বিয়ে হচ্ছে না।

ব্রজসুন্দরী বোঝে না, এই কলোনি জায়গাটা ভাল না। কেউ কারও ভাল দেখতে পারে না। একবার তো সব ঠিকঠাক—পাত্র স্যালো চালায়, হেকিমপুরে বাড়ি—পর পর কি যে হয়, লাগানি ভাঙ্গানি দেয়, না তারই ত্রুটি—পাত্রপক্ষ বেঁকে বসে।

কলকাতায় বড়মামার বাসায় মাস দু-মাস থাকলে, তার গায়ের রঙ উজ্জ্বল হয়ে যায়। শরীরের লাবণ্য বাড়ে। গেলে তার আদরও আছে—কারণ সে বসে থাকতে পারে না। যেখানে সেখানে ঝুলকালি, গাদাগাদা খবরের কাগজ—বড়মামার সারা ঘরে শুধু বই আর বই—দেয়ালে সব ছবির মতো রঙিন কাঠের সেলফ—কোনওটার কাচ খোলা, কোনওটার বই নিচে গাদা মারা—খাটের নিচে বই, র‍্যাক

এলোমেলো, মেঝেতে বই আর কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। কাজের লোক ছাড়া দুপুরে বাড়িতে কেউ থাকে না। বড়মামীও পেরে ওঠেন না—তাঁর নিজের অফিস, মেয়েরা স্কুলে কলেজে, না হয় নাচ শিখছে, গান শিখছে—বাড়িটাতে ঝি-চাকরদেরই দাপট। ছিমছাম, গোছগাছের বালাই বলতে কিছু নাই। সে সারাদিন তখন কত কাজ করতে পারে। বোনেদের আলাদা ঘর। আলাদা লকার। সে গেলেই সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেবে—সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামবে—মা, ঝুমিদি এয়েছে। বাবা, ঝুমিদি এয়েছে। তারপর যে যার ঘরের চাবি জিম্মা করে দেবে তার হাতে। ঝুমিদি সারাদিন ঘর গোছগাছ করতে বড় ভালবাসে।

ঘরও কম না।

সব ঘরের দরজা জানলা খুলে দেয়। উপরে নিচে সিঁড়ি ধরে সে শুধু নামে আর ওঠে। হাতে ঝাঁটা। হাতে ফুলঝাড়ু। কোনাখামচিতে রাজ্যের নোংরা। সব সাফসোফ করে দু-দিনেই বাড়িটার চেহারা পাল্টে দেয়। খালি শিশি বোতল, টিনের কৌটা সব সিঁড়ির ঘর থেকে বের করে বিক্রি করে দেয়। চাদর, ওয়াড়, র‍্যাক, কাবার্ড যেখানে হাত দেয় মনে হয় সাফসোফ কাচাকাচি ঠিকঠাক হয় না। হলেও বড় যেন দায়সারা কাজ। আর তখন কাজের লোকেদের উপর কি যে রাগ হয় তার। তোরাও তো বাড়িটাতে থাকিস। বাড়িটার জন্য মায়া হয় না! এমন সুন্দর বাড়িটাকে এত নোংরা করে রাখিস তোরা!

মোজাইক ফ্লোর, সে সাবানজল দিয়ে ধুয়ে মুছে দেয়। সারা মেঝে থেকে তেল চিটচিটে দাগ ঘসে তুলে ফেলে। অথচ ঠিকা ঝি রোজ ঘর ঝাঁট দেয়, ঘর মোছে, সাবান কাচা করে গুচ্ছের—কি যে সাবান কাচা হয় সে বোঝে না। রাশি রাশি জামাকাপড় ধোপা বাড়ি যায়। এত খরচ করার পরও বাড়িটায় এত নোংরা জমা হয় কি করে সে বোঝে না! রান্নাঘর সামলাবার মেয়েটা দিনরাত থাকে খায়, মাইনে নেয়—দুই বোনের আয়াটিও সুখ পেয়ে সেই যে থেকে গেছে, আর নড়বার নাম করে না।

বড়মামার বাড়িতে এক-দু' মাস কাটিয়ে এলে দুদুমণিও স্বস্তি পায়। পাত্রপক্ষের দেখতে আসার কথা থাকলেই, হয় নীলুমাসি, না হয় মেজমামা তাকে কলকাতায় রেখে আসে। কলকাতায় থাকলে তার নাকি লাবণ্য বাড়ে। কলকাতার জলের গুণই আলাদা। তার চাপা শ্যামলা রঙ খুলে যায়। তার শ্রী তখন বেড়ে যায়। আর দুদুমণি নীলুমাসি, মেসো, ছোটমামা সে বাড়ি ফিরলেই পাত্রপক্ষকে তোয়াজ করে ঘরে তুলে আনে। তার তখন প্রশংসার শেষ থাকে না।

মেয়ে আমাদের পাস না করলে কি হবে, লক্ষ্মী। জ্যান্ত লক্ষ্মী ঘরে ঢুকবে আপনাদের।

পা দেখি মা।

সে পা টেনে হাঁটে সামান্য। পায়ের খুঁত ঢাকতে সে শাড়ি টানে। কিছুতেই খুঁত তার শাড়িতে আড়াল করা যায় না।

তা একটু খুঁত আছে রমেশবাবু। জন্মলগ্নেই ত্রুটি, ভগবানই মেরে রেখেছেন। দুদুমণি দরজার আড়াল থেকে বলবে, নাতনি আমার পায়ের খুঁত সারা শরীর দিয়ে পুষিয়ে দেবে। এক দণ্ড বসে থাকবে না।

সারা শরীর দিয়ে পুষিয়ে দেবে বললে, গাটা তার কেমন ঘিন ঘিন করতে থাকে। দুদুমণি বোঝে না, কথাটার মধ্যে কত অশ্লীলতা আছে। পাত্রপক্ষ চলে গেলেই ঝুমির মেজাজ গরম ব্রজসুন্দরীর ওপর—আর যদি কাউকে ডাক, সোজা বাড়ি থেকে বের হয়ে যাব।

না ডাকবে না! ঘরের খুঁটি হইয়া থাকতে চান। ঘর থাইকা বাইর হইবেন না। তরে বাইর না কইরা আমি জলগ্রহণ করুম না—দেখিস মাইয়া—আমার নাম ব্রজসুন্দরী।

সুন্দরী! কি আছে তোমার। চোপাখান সার করেছ। দাদুমণি বইলাই তোমারে দেইখা ভুলছিল। যার এত চোপা তারে কে সয়!

ঝুমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। একটাই আতঙ্ক, আবার না পালনদাদাকে বাড়ির উঠোনে এনে তোলে।

পালানদাদা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু যেতে দিলে তো!

আরে শোন পালান, যাইস না। তুই যে শিমুরালি যাইব কইলি, গ্যালি না তো!

টাকাপয়সা কই ঠাইনদি। যাই কি কইরা! মিল বন্ধ বোঝেনই তো।

তরে যে কইলাম, যা খরচ লাগে নিবি। কবে যাবি ক ভাই। আমারে উদ্ধার কর। তর দিদির বাড়ি

বেড়ানোও হবে, আমার কাজটাও সাইরা আসবি। খোঁজ খবর নিবি, কি করে পোলায়। মরণচন্দ তো কইল, বিয়া হয় নাই। পাত্রী পছন্দ হচ্ছে না। পাত্রী পছন্দ হইলেই নিব। দাবি-দাওয়া বিশেষ কিছু নাই। আমার ঝুমির মুখখান কি নিখুঁত তুই ক'। পছন্দ না হইয়া পারে! ছেলের নাকি শিমুরালির বাজারে কাপড়ের দোকান আছে। কারে যে পাঠাই, তুই যা ভাই, ঘুইরা আয়। ঠাউরদা তবে তরে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

দেখি চেষ্টা করে সময় করতে পারি কি না।

না আর চেষ্টা না। মিল থাইকা ফিরবি কখন কইয়া যা। আমি না হয় তর বাড়ি যামু।

ঝুমি জানে পালানদাদার কিছুটা প্রবঞ্চক স্বভাব আছে। মিল বন্ধ থাকায় এর ওর কাছে যখন তখন হাত পাতছে। মানুষকে ঠকাতে ওস্তাদ। ব্রজসুন্দরী তাও বোঝে না। যেন পারলে এক্ষুনি টাকাটা গুঁজে দেয়। পালানদাদা যে ব্রজসুন্দরীকে গ্রাহ্য না করে চলে যাচ্ছে, তাও একটা চাল। এক নম্বরের ছ্যাঁচড়া স্বভাব। সে যত গড়িমসি করবে, তত ব্রজসুন্দরীও টাকাটা হাতে গুঁজে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

এভাবে বুড়ো মানুষকে কেউ ঠকায়! পাপ হবে না!

কত লাগব ক' ভাই। লক্ষ্মীসোনা ভাই, তরাই আমার ভগবান। কাউরে কইস না। তর আমার মধ্যে কথা থাকল। বলেই ব্রজসুন্দরী বাড়িটার দিকে তাকাল। ঝুমি যদি শুনতে পায়, ফের অশান্তি শুরু করে দিতে পারে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলছে।

ঝুমি বারান্দায় মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। লাঞ্ছনার তার শেষ নাই। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। পালানদাদাকে নিয়ে উঠোনে ঢুকল বলে। উঠোনে এসে গেলেই বিপদ। বললেই হল, পালানকে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দে। শিমুরালি যাবে।

পালানদাদা সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ব্রজসুন্দরীর সঙ্গে ঠিক উঠে এল উঠোনে।

কত কথা ব্রজসুন্দরীর।

পোলামাইয়া আমারে না দেখুক ভাই, আমার দশজন আছে। দশ দোয়ার আছে। আমার কিসের অভাব।

ব্রজসুন্দরীর মাথায় এখন আর সংসারের টানাটানির কথাও মনে নেই। দোকানে মেলা বাকি, দুধের দাম সব দিতে পারেনি, বাঁশ বেচার শুধু ক'টা টাকা আছে হাতে।

এই টাকা কটাই সম্বল। মাস শেষ হতেও দেরি—বড়মামার মাসে হারা আসতে আসতে ও-মাসের সাত-আট তারিখ—গেল কুকুর তাড়াতে, কুকুর পালালে পালানদাদাকে ধরল, কুকুরের খোঁজ খবর নিল—কোন্‌দিকে গেল, আবার না কামড়াকামড়ি করে রাস্তায়, সেই আতঙ্কে পালানদাদাকে ডেকে থামাল—তারপর আর নধরের কথা মনে নাই, নধর যে একটি সারমেয় সে বোধও এখন তার নেই—কাকে বোঝায়?

ঝুমি জানে একবার পালানদাদা উঠোনে ঢুকে গেলে বাঁশ বেচার টাকা ক'টা বের করে দিতেই হবে। না দিলে ব্রজসুন্দরী বেজায় অশান্তি শুরু করবে। তখন পালানদাদাই বা কি ভাববে তার সম্পর্কে।

ঝুমি তুই কিরে! লালনপালন করে এতটা তোকে বড় করে তুললেন ঠাইনদি, আর তুই তাঁর মুখের উপর কথা বলিস!

পালানদাদাকে ঢুকতে দেখেই তার যেন সব কিছু অসহ্য ঠেকছিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল। হয়ে গেল, যে-ক'টা টাকা ঘরে আছে, তাও যাবে।

এই সেদিন এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে দুদুমণি হাজির। সক্কালবেলাতেই একবার বের হওয়া চাই। সবার খোঁজখবর নেবার বাতিক। বাড়ি ফিরলে কোঁচড়ে না হয় হাতে কিছু থাকবেই। বামুনের বিধবা, কারও বাড়ি গেলে গাছের কুমড়ো, লাউ, ডাঁটা, ঢেঁড়শ, বেগুন যার যা আছে ক্ষেতের, দেয়।

কুমড়োর ফালি হাতে নিয়ে বলেছিল, পালানের বউ দিল। দুটো গিমাশাক তুলে আনলাম। তিতার ডাইল করুম, পালান কইল, শিমুরালি যাইব। গাড়িভাড়া পঞ্চাশ টাকা চায়। কইলাম এত টাকা আমার কাছে নাই। পঁচিশটা টাকা নিয়া যা। রাজি হয় নাই।

দুদুমণির সঙ্গে শেষপর্যন্ত পঞ্চাশ টাকাতেই রফা হল। পালানদাদা ঠিকই জানে, বুড়ি যাবে কোথায়!

ঠিক ফের এসে ধরবে। যখন পাত্রের খবর দিয়েছে, তখন সর্বস্ব খোয়ালেও তার কথাতেই রাজি হতে হবে।

মেজাজ ভাল থাকলে, টাকাপয়সা যা আসে, ব্রজসুন্দরী ঝুমির হাতেই তুলে দেয়। খারাপ থাকলে দেয় না। নিজেই এখানে সেখানে গুঁজে রাখে।

ঝুমির মুশকিল, দুদুমণি হিসাব রাখতে পারে না। কাকে কি দেয় মনেও রাখতে পারে না। তখন তাকেই সাক্ষী মেনে বলবে, ঝুমিরে জিগাও না, টাকাটা যখন তোমার হাতে দিই সে তো দেখেছে।

কেউ নিয়ে অস্বীকার করলে সে কখনও বলতে পারে, নিয়েছেন, ফেরত দেবেন না কেন? আর তাকে বলে দিলে এক কথা, না বলে দিলে জানবে কি করে! তাকে সাক্ষী মানলে বলতে হবে, হ্যাঁ দিয়েছে তো।

সে তখন কিছুটা বাক্যহারা হয়ে যায়।

যেমন বনমালী আচার্য বলে গেছে, কেউ তুকতাক করেছে ঠাইরেন। একবার কোষ্ঠীখানা দিবেন। বিচার গণনায় কি বলে দেখতে হবে।

কুষ্ঠি দেখে বলেছিল, জন্মলগ্ন শুভ নয়। জাতকের পাপখণ্ডনের দরকার। সূর্য-বন্দনায় পাপ স্খালন হবে। রম্ভা তৃতীয়া ব্রতেরও বিধান দিয়েছিল। ব্রজসুন্দরী সব উপচার সহ ব্রতের আয়োজনে কম টাকা খরচ করেনি। কিছুই না হওয়ায় ইদানীং কিছু তুকতাকের বন্দোবস্ত করে গেছে।

কোষ্ঠীর নামে, তুকতাকের নামেও গোপনে ব্রজসুন্দরী টাকা পয়সা বিলায়।

বাড়িটার কে কোথায় কি পুঁতে রেখেছে—ওঠাতে হয়। তবে সৈন্ধব লবণ এক কেজি আতপ চাল কেজি পাঁচেক আরও নানা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

বনমালী পিশাচসিদ্ধ মানুষ। জলপোড়া চালপোড়াও দেয়। কিসে কি হয়। কেউ বলতে পারে না। ব্রজসুন্দরী সরল বিশ্বাসে সব করে যাচ্ছে। এতে ঝুমির কেন যে মাঝে মাঝে মনে হয় তার মরে যাওয়া উচিত। বেঁচে থাকলে ব্রজসুন্দরীকে সে আরও বেশী বিপদে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সে যে মরতে ভয় পায়। এমন সুন্দর ঘরবাড়ি গাছপালা ফেলে সে যাবেটা কোথায়। বিছানায় পড়ে থাকে তখন। দু-চোখে শুধু অশ্রুপাত।

এই বনমালী হয়েছে এখন টাকা খসাবার যাশু ওস্তাদ। দেখলেই গা জ্বালা করে। মামাদের বললে এক কথা—করতে দে, কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে। না হলে বাঁচবে কি করে।

ঝুমি তখন চারপাশে অন্ধকার দেখে।

পালানদাদা বারান্দার খুঁটিতে সাইকেলখানা ঠেস দিয়ে বারান্দায় উঠে জলচৌকিতে বসে আছে—আশা, ব্রজসুন্দরী তাকে গোপনে টাকাটা হাতে দিয়ে দেবে। ব্রজসুন্দরী তাকে কিছু বলছে না—এখানে সেখানে হাত দিয়ে কিছু খুঁজছে। ঝুমির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

টাকা দিলেই পালানদাদা শিমুরালি যাবে, তাহলেই হয়েছে! না গিয়েই বলবে গেছে। খবরও দেবে—পাত্রখানা ঠাইনদি মন্দ না। সাতটার ট্রেনে গেলাম। আবার রাতের ট্রেনে ফিরে এলাম। সবই ছলনা।

তারপর চা খেতে খেতে বলবে, খবর নিলাম। দিদি বলল, ও পবিত্র! নারাণ মুখার্জির ছেলের কথা বলছিস! বড় ভাল ছেলে। আমাদের চোখের সামনে বড় হয়েছে। মা বাবা ভাই বোন নিয়ে সংসার। খুব কর্মঠ, চালাক-চতুরও কম না। খুবই সংসারী মানুষ। চোখ বুজে আপনার লাঠিখানা তার হাতে তুলে দিতে পারেন ঠাইনদি। সৌভাগ্যবতী না হলে এমন পাত্র পাওয়া মুশকিল। নিজের বাড়ি, নিজের দোকান। জমিজমা মেলা। বাপের গরমেন্ট অফিসে কাজ। দিদি ইস্কুল মাস্টার। কেউ বসে খায় না।

বাঁধা গৎ।

ঝুমির কি এত সৌভাগ্য কপালে সইবে ভাই!

দুদুমণির মন প্রসন্ন থাকলে কখনই বাঙ্গাল কথা মুখ থেকে বের হয় না। বড় মিষ্টি মিষ্টি কথা তখন মুখে। যত মিষ্টি কথা, তত ভিতরে সে খেপে ওঠে।

পাত্রপক্ষের খোঁজখবর দিলেই ব্রজসুন্দরী খুশি হয়ে বলবে, ও ঝুমি কি বলছে শুনছিস! দু-খানা

পোস্টকার্ড কিনে তর বড়মামাকে চিঠি দে। তর বড় মেসোকে খবরটা দিয়ে আয়। পালান পাত্রপক্ষের খবর নিয়া আইছে—একবার তারা যাক। নিজের চোখে দেখুক। ওরাও দেখে যাক।

সে পারে! চিঠি লিখতে পারে! লজ্জা হয় না।

অপমানে লাঞ্ছনায় সে তখন চোখে যেন কিছুই দেখতে পায় না। সে গেলেই বুঝতে পারে মেসো—কেউ পাত্রপক্ষের খোঁজ খবর দিয়ে গেছে। না হলে ঝুমিকে শাশুরিঠাকরুন অসময়ে পাঠাত না।

মেসো বোঝে, নীলুমাসিও বোঝে এটা তাদেরও কম দায় না। চেষ্টা চরিত্র যে করছে না তাও না। তবে সব প্রজাপতির নির্বন্ধ। কোথায় কার অন্নজল মাপা আছে, কে বলতে পারে।

ব্রজসুন্দরী ঘরের এটা টানছে, কৌটা খুলছে, বালিশের তলায় হাত দিয়ে দেখছে, আলমারি খুলে কাপ ডিস সব নামাচ্ছে, তবু ঝুমিকে কিছু বলছে না। সেও চুপচাপ তক্তপোশে বসে আছে—যেন এ-বাড়ির কোনও খবরই সে রাখে না।

পালানদাদা বারান্দায় বসে হাই তুলছে।

তোল হাই, যত পারিস হাই তোল। হাই উঠলেও আমি টের পাই। এই বাড়ির কোন্ গাছের পাতা খসে পড়ল তাও বলে দিতে পারি।

আসলে সে বাড়িটা সম্পর্কে কত সজাগ, ব্রজসুন্দরী সম্পর্কে কত সজাগ—কারণ ব্রজসুন্দরীর টানাটানি দেখেই বুঝেছে—পালানদাদাকে চুপি চুপি আবার টাকা দেবে। ঘটক সেজে পালানদাদা ব্রজসুন্দরীর কাছ থেকে টাকা হাতড়াচ্ছে।

ঝুমি ঘরে বসে থাকতে পারল না। তারপর যে ব্রজসুন্দরী তাকে নিয়ে পড়বে।

কোথায় গেল আমার টাকা, তুই সরিয়েছিস, তারপর ধুন্ধুমার কাণ্ড—ঝুমি মানে মানে পাশের দরজা দিয়ে কুলতলায় চলে গেল। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এই গাছপালার মধ্যে ঢুকে গেলে মান-অপমানের কথা আর তার মনে থাকে না।

কবে থেকে যেন এই বাড়ির গাছপালার সঙ্গে সেও বাড়ছে। জাম, জামরুল. আতা, আম, লিচু যেদিনকার যা, দাদু তার কথা ভেবেই যেন লাগিয়ে গেছেন। বাড়িটায় ঝুমি বড় হবে- -যখনকার যা ফল, না হলে চলবে কেন! বিঘে তিনেক জমির উপর এইসব গাছপালার ছায়া পড়ে। দুপুরের রোদে চরাচর পুড়ছে, এইসব গাছপালার মধ্যে ঢুকে গেলে বোঝাই যায় না। রোদ হেলে যায়, ছায়া দীর্ঘতর হয়, তারপর আঁধার ঘনিয়ে আসে। বাড়িটার মাথায় বিশাল আকাশে সব নক্ষত্র এক দুই করে ফুটতে থাকে। সে সন্ধ্যা দেয়। শাঁখে ফুঁ দেয়। ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সূঁচসুতো নিয়ে বসে যায়, অথবা বেণু মামার বাড়ি টিভিতে ভাল বই থাকলে দেখতে যায়। তারপর দিদা-নাতনির আহার—এবং কখন যে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। এবং মাঝে মাঝে মনে হয় পাত্রপক্ষের ঠেঁটামি না থাকলে জীবন তার ভরেই আছে। সকাল হয়। পাখিরা উড়ে আসে—চারপাশের ঝোপ-জঙ্গলে কত প্রজাপতি ফড়িং—এক আশ্চর্য অনুভবের জগৎ তৈরি করে দেয়।

তখনই ডাকছে ব্রজসুন্দরী, ঝুমিরে পালান শিমুরালি যেতে রাজি হয়েছে। তুই আবার কোথায় গেলি!

ঝুমি সাড়া দিচ্ছে না।

ব্রজসুন্দরী ফের ডাকল, আমার টাকা ক'টা দিয়ে যা।

গাছের নিচে হলুদ রঙের শাড়ি দেখা যায়। ব্রজসুন্দরী ঠিক টের পেয়েছে, সে কাছে কোথাও আছে। সাড়া না দিয়ে উপায়ও নেই।

কিসের টাকা? আমার কাছে টাকা নাই।

ঝুমি সাফ বলে দিল।

তরে দিলাম না, বাঁশ বেচার টাকা। গুরুপদ দশটা বাঁশের দাম দিয়ে গেল। চারটা দশ টাকার নোট, দুটো পাঁচ টাকার নোট।

না, আমাকে দাওনি। কোথায় রেখেছ দ্যাখ।

মিছা কথা কইস না ঝুমি। ভগমান আছে, ভাল হইব না কিন্তু। কাল বিকালে গুরুপদ দিয়া গ্যাল। তুই সূঁচসুতোয় নকশি কাঁথায় ফুলপাতা তুলছিলি।

অকাট্য প্রমাণ, সূঁচসুতোয় ফুলপাতা তুলছিল—যায় কোথায়! সে ফের বলল, আমি জানি না। কখন তোমার গুরুপদ এসেছিল, আমি কিচ্ছু জানি না।

তুই জানস না মাইয়া, সব জানস। তর ফন্দিফিকির বুঝি না মনে করস। ঢ্যাং ঢ্যাং কইরা শহরে, না হইলে যাবি কি কইরা? বই দেখবি কি কইরা? আসুক খোকা, আমি তর ঠ্যাঙে দড়ি না পরাইয়া ছাড়ছি না। আমার নাম ব্রজসুন্দরী।

তা সুন্দরীই বটে। কদমফুলের মতো মাথাখান। চোখে ভারি লেনসের চশমা। ছানি কাটার পর দু-চোখের একটাতে কম দ্যাখে। রঙ পুড়ে গেলে যা হয়—শরীরে বিন্দুমাত্র আর লাবণ্য নেই। সারা শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে—রোগা শরীর। তবে এখনও এক-দু ক্রোশ লাঠি ছাড়া হেঁটে যেতে পারে। এই বয়সেও ডাঁশা পেয়ারা চিবিয়ে খেতে পারে। অসুখ বিসুখও বড় একটা হয় না। হলেও গাছের লতাপাতা মূলই যথেষ্ট।

ঝুমি কেন যে হেসে ফেলল দুদুমণির কথা ভেবে।

সে ঘরে ঢুকে বলল, আচ্ছা দুদুমণি, তুমি রাগ কর কেন বল ত! তুমি হয়ত ঠিকই দিয়েছ, আমি হয়ত খেয়াল করিনি—ঘরে ঠিক কোথাও পড়ে আছে, খুঁজে দেখতে হবে।

তুই ঝুমি তুলে রাখিসনি টাকাটা! আমি ত ভাবলাম, আমিই রাখছি। তারপর মনে হইল, না ত, টাকাটা ত ঝুমির হাতে দিলাম। তুই তুলে রাখিসনি?

না। এক কথা কতবার বলব।

তবে টাকাটা যাবে কোথায়! পঞ্চাশটা টাকা, সোজা কথা। অরে পালান ভাই তুই যাইস না। দেখি মনের ভুলে কোন্‌খানে রাখলাম।

ব্রজসুন্দরী তক্তপোশের নিচ থেকে সব ঝুনো নারকেল টেনে বের করল। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে খুঁজল। ঝাঁট দিলে বাইরে যদি পড়ে—বাইরেও ঘুরে এল।

ঝুমি তক্তপোশে বসেই আছে। পালানদাদাও বারান্দায় টাকার আশায় বসে আছে। ঝুমির বেজায় হাসি পাচ্ছিল।

ঠাইনদি আমি যাই, পেলে নিতাই-র মাকে দিয়ে এসেন। মিলের গেটে জমায়েত, কখন ফিরব ঠিক নাই। টাকা ক'টা পেলে দুগগা দুগগা করে বের হয়ে পড়ব। তারপর ঝুমির কপাল আর আমার হাতযশ।

ঝুমির কপাল না, তোমার কপাল! ঝুমি না ভেবে পারে না।

আহা রে ঝুমির জন্য ঘুম নাই চোখে। মিলে কাজকাম বন্ধ। সাইকেলে টোঁ টোঁ, ছ্যাঁচরামি, ধাওরামি—যা হাতে পাওয়া যায়। এক দু-দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেও তোমার জুড়ি নেই—বুঝি না পালানদাদা! যার আছে তার নাও। আমাদের কি আছে! বুড়িকে পাত্র দেখার নামে জপাচ্ছ, কেন জপাচ্ছ বুঝি না মনে কর পালানদাদা।

ঝুমি ঘরের ভিতর বসেই টের পেল বারান্দার খুঁটি থেকে সাইকেলখানা তুলে নিচ্ছে পালানদাদা। তারপর প্যাডেলে চেপে সিটে উঠে বসেছে। তারপর ক্রিং ক্রিং। তিনি যাচ্ছেন—মিলের গেটে জমায়েত না ছাই। ভাগাড়ে মড়া পড়েছে কি না খুঁজতে বের হলেন। না হলে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ঘণ্টি বাজাও কেন। কে শোনে তোমার ঘণ্টি? কার জন্য বাজাও।

কে যায়?

না পালান যায়।

ব্রজসুন্দরী দৌড়ে যাবে।

দেখা হলেই ঠাইনদিকে নিয়ে নানা মসকরা। দাদুমণি বেঁচে থাকলে তোমার ত্যাঁদরামি বের করে দিত। মাথার উপরে আমাদের কেউ নেই ভাবো! দাঁড়াও না বড়মামাকে সব খুলে লিখব।

হতাশ হয়ে মেঝেতেই বসে আছে ব্রজসুন্দরী।

টাকাগুলি কোথাও খুঁজে পেল না। কত সাধ্যসাধনা করে ভাবল শিমুরালি পাঠাবে পালানকে—সেই পালানই হাওয়া। টাকা ক'টাও হাওয়া। টাকার কি হাত পা আছে না পাখা আছে, উড়ে যাবে!

ব্রজসুন্দরীর মুখ খুবই ব্যাজার।

তারপরই কেমন ভয় ধরে গেল ঝুমির। পালানদাদা খুবই ধুরন্ধর লোক, পালানদাদা যদি ফিরে এসে

বলে, টাকা নেই তো কি আছে, বাঁশঝাড় থেকে আটদশখানা বাঁশ দেন, তা হলেই হয়ে যাবে। টাকায় সব হয় না। আমি শিমুরালি কালই চলে যাব।

ব্রজসুন্দরী সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবে। দুর্বলতার সুযোগ পালানদাদা নেবে না, হয় না।

ঝুমি পালানকে দেখেই টাকাগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। পালানের ফন্দিফিকির সে সবই বোঝে। টাকা সরিয়ে আপাতত সে পালানদাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা করছে।

ব্রজসুন্দরী চোখে অন্ধকার দেখছে। গুম মেরে আছে। একটা কথা বলছে না।

ঝুমি বোঝে বুড়ি এই টাকার শোকে খাবে না, বসেও থাকবে না। সারা ঘরে ফের খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। খাওয়া মাথায় উঠবে।

সে না পেরে বলল, খেতে বস। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। পরে না হয় আমি খুঁজে দেখব। ঘরেই আছে। যাবে কোথায়।

কিন্তু ব্রজসুন্দরী কিছুতেই খেল না।

ঝুমিও খেতে পারল না।

ঝুমি টাকাগুলি বের করে দিতে পারত, দিলেই ব্রজসুন্দরী দৌড়ে গিয়ে টাকাগুলি পালানদাদার বউ-এর হাতে গুঁজে দিয়ে আসবে। তাকে নিয়ে মানুষের এই ধূর্তামি সহ্য করতে পারে না। এই টাকার সঙ্গে তার কেমন মান-অপমান জড়িয়ে গেছে।

সে দুদুমণির পাশে বসে বলল, চল খাবে। সব বেড়ে দিচ্ছি, পালানদাদা অভাবী মানুষ, কর্মদোষে স্বভাব নষ্ট, বোঝ না। পালানদাদা না গিয়েই তোমাকে সব এসে বানিয়ে বানিয়ে বলবে। তুমি বিশ্বাস কর, ও শিমুরালি যাবে?

ব্রজসুন্দরী ঝুমির হাত সরিয়ে বারান্দায় উঠে এল। ঝুমিও পিছু পিছু গেল।

আমি ত বললাম খুঁজে দেখব। তুমি খেয়ে নাও।

কথা বলছে না ব্রজসুন্দরী।

খাবে না তবে!

না।

তাহলে, আমিও খাচ্ছি না।

তুই না খেলে আমার বয়ে যাবে। না খেলে নিজে কষ্ট পাবি। আমার কি? বলেই উঠোনে নেমে গেলে হাত ধরে ফেলল, ঝুমি।

কোথায় যাচ্ছ! না খেয়ে না দেয়ে কোথায় বের হচ্ছ।

যাচ্ছি মরতে। আমার হাত ছাড়। ছাড় বলছি। নধরের পাত্তা নেই। কখন গেল এখনও ফিরে এল না। আমার সব খালি হয়ে যাবে। হাত ছাড় বলছি। পোলারা উড়ে গেল, মেয়েরাও খোঁজ নেয় না। কে আছে আর আমার! তুই বুঝবি আমার দুঃখ। নধরটাও হাওয়া। তোর জন্য সব হাওয়া হয়ে যাবে। টাকারও পাখা গজায় বুঝলি, তুই থাকলে এ-বাড়িতে তিষ্টোয় কে?

ব্রজসুন্দরীর হাত ধরে রাখতে সে কেন যে আর জোর পায় না।

ব্রজসুন্দরী হন হন করে হাঁটছে। আর চোপা করছে—সব হাওয়া হয়ে গেলে তর মজা। মজা বের করছি। তুই খুঁটি হয়ে থাকবি, নড়বি না ভেবেছিস! খুঁটি না নড়িয়ে জলগ্রহণ করুম না। আমার নাম ব্রজসুন্দরী।

বাড়িটা আবার একেবারে খালি। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে নিজেও খেতে পারল না। সে তার নিজের ঘরটায় ঢুকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

পলকে কোথা থেকে পরেশ পালকে ডেকে এনে ব্রজসুন্দরী দশটা বাঁশ বিক্রি করে দিল জলের দরে। তারপর হন হন করে হেঁটে গেল পালানদাদার বাড়িতে। তারপর বাড়ি ফিরে বলল, দিয়ে এলাম। আমাকে ঠেকায় কে দেখি।

তাকে শুয়ে থাকতে দেখেই, বুড়ির তরাস।

তুই খেলি না!

ঝুমি জবাব দিল না।

নধরটা বাড়ি থাকলে দিয়ে দিতাম। না, কেউ যখন খাবে না, তুইই খা। তুই খাবি না মাইয়া, আমি অ খামু না। না খাইয়া কতক্ষণ থাকতে পারস দ্যাখমু।

একজন ঘরে শুয়ে, অন্যজন বারান্দায় বসে। কোনও আর বাক্যালাপ নেই। ডাল ভাত তরকারি সব ঢাকা পড়ে আছে। কড়কড়ে হয়ে গেছে আতপ চালের ভাত। বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছে।

ব্রজসুন্দরী ফের রাস্তার দিকে রওনা হতেই, ঝুমি আর শুয়ে থাকতে পারল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নধরকে ডাকছে দুদুমণি। তু, তু করছে।

বাড়ি এস।

নধর এল না এখনও।

আসবে। তুমি এস।

নধর না এলে ঝুমিরও এই ছাড়াবাড়িতে রাতে ভয় করে। দিনকাল ভাল না। রাতে চোরের উপদ্রবে ঘুমানো যায় না। গাছের লাউ কুমড়ো রাখা যায় না। মেলা নারকেলগাছ, গাছে একটা নারকেল থাকে না। কতদিন থেকে রাতে নধরই সব পাহারা দিয়ে ঠিক রাখছে। নধর কোথায় যে গেল! বড় সড়কে বাস ট্রাক যায়। চাপাও পড়তে পারে। নধর কখনই বেশী রাত করে ফেরে না—বাড়ি ছেড়েও বিশেষ যায় না। বারান্দায় শুয়ে থাকে। বাড়ির বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। সেই নধর এত রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরে এল না—ঝুমিও অধৈর্য হয়ে পড়ছে। বুকে করে তুলতুলে একটি নরম উলের বলের মতো মা-মরা বাচ্চাটাকে সে তুলে এনেছিল—সে যেখানেই যায়, নধরও পিছু পিছু ছোটে।

ঝুমিও রাস্তায় গিয়ে ডাকল, নধর কোথায় গেলি?

ব্রজসুন্দরীও ডাকছে, নধর, নধর।

রাত বাড়ছে। ঝুমি ছোটমামার বাড়ি দৌড়ে গেল।—নধরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মামা, বলেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল ঝুমি।

ছোটমামা বাইরে বের হয়ে বলল, কাঁদবার কি হল? কুকুর কি এক জায়গায় থাকে! কুকুরের স্বভাব—কোথাও গেছে, ফিরে আসবে।

ঝুমি, ব্রজসুন্দরী দুজনই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরতেই দেখল বারান্দায় ঠিক দরজার সামনে নধর শুয়ে আছে। তাদের দেখেই ভারি খুশি, লেজ নাড়ছে। আর কুঁই কুঁই করছে। মুহূর্তে দুই অসমবয়সী নারীর মান অভিমান সব জল হয়ে গেল।

সারাদিন তারা না খেয়ে আছে—তাড়াতাড়ি ব্রজসুন্দরী হাতে পায়ে জল দিয়ে আহ্নিক সেরে আসন পেতে ডাকল, ঝুমিদিদি আমার, বসে যা। তুই খেলে আমি খাব। নধর খাবে।

ঝুমি খেতে বসে কেন যে আজ অঝোরে কাঁদল, ব্রজসুন্দরী বুঝতে পারল না। ঝুমি চুপচাপ খাচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে।

ব্রজসুন্দরী বলল, আর একটু ঝোল নে। এত শুকনো করে খাচ্ছিস কেন! আমার কি মাথার ঠিক আছে রে দিদি। মাথা ঠিক থাকলে চোপা করি এত! কান্নাকাটি করলে বাড়িঘরের অমঙ্গল হয় বুঝিস না!

সাত

সকালবেলায় কি যে হয়, কিছুতেই ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হয় না ঝুমির। লেপের তলায় মুখ ঢেকে কেবল পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। দুদুমণিও চায় সে বেলা করে উঠুক। সকালে উঠে জল ঘাঁটাঘাঁটি করলে শরীর খারাপ হতে পারে—এইসব ভেবেই ব্রজসুন্দরী খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে বারান্দায় বের হয়ে আসে। কিন্তু আজ কি হয়েছে, সকালবেলাতেই গজ গজ শুরু।

অবশ্য আজ কি হয়েছে সে জানে। সকালবেলাতেই ডেকে গেছে, তাড়াতাড়ি ওঠ। কত ঘুমাবি।

ঝুমি লেপে মাথা মুখ ঢেকে পড়ে আছে। কিছুতেই সাড়া দেবে না ঠিক করেছে।

ব্রজসুন্দরী সাত সকালে উঠে কি কি করছে সে চোখ বুজেও টের পায়। আকাশ পরিষ্কার না হতেই উঠে পড়ার অভ্যাস। কাক ডেকে গেলেই দুগগা দুগগা শুরু হয়। উত্তুরে হাওয়ায় দরজা খুললেই ঠাণ্ডায় টাল মেরে যায় ঘরটা। দরজা খুলে কখন বের হয়েছে তাও জানে।

উঠোনে নেমে হাতজোড় করে সূর্যপ্রণাম। তারপর ঘটি নিয়ে কলতলায়। তারপর বালতিতে গোবর

জল, সারা বাড়িতে গোবর ছড়া। ঘর থেকে এঁটোবাসন কলতলায় নিয়ে যাবার সময় ডেকে গেছে, আরে ওঠ। কত বেলা হল। উঠে হাত মুখ ধো। তর একবার সকালেই মেসোর বাড়ি যেতে হবে। গোছগাছ করে দিয়ে না গেলে এক হাতে পারি!

সে সাড়া দেয়নি।

রান্নার জায়গাটা মুছে দেবার সময় আবার ডেকেছে।

কিরে কতক্ষণ থেকে ডাকছি, সাড়া দিচ্ছিস না। একটু চা করে আমাকে দে। তুইও খা। সাইকেলটা মেরামত না করলে যাবি কি করে! অধরকে বলেছি, ঝুমির সাইকেলটা পাংচার হয়ে গেছে। মেরামত করে দিস। খোকার টাকা এলে দিয়ে দেব। ও ঝুমি, কি বলছি, কানে কি যাচ্ছে তর।

ঝুমি সারা দেয়নি।

সে বলতে পারত, এত সকালে উঠে কি করবটা শুনি। রোজই এক কথা কাঁহাতক ভাল লাগে। কিছুই করতে দেবে না। হাত পা নোংরা হবে। সকালবেলায় জল ঘাঁটাঘাঁটি করলে হাতে পায়ে হাজা হবে। পাত্রপক্ষ দেখতে এলে পছন্দ হবে না। পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে শুনলেই মেজাজ তার তিরিক্ষি হয়ে যায়। শীত জাঁকিয়ে পড়তেই আবার পাত্রপক্ষ শুরু হয়ে গেছে। সকালে উঠতেই হবে, নীলুমাসিকে খবর দিতে হবে।

পারব না, আমি কিছু পারব না। লেপটেপ ছুঁড়ে সে উঠে বসল।

গিয়ে বলবি, কৃপানাথ খোঁজ দিয়েছে পাত্রের। পাত্রের বাজারে মুদির দোকান আছে। একটু বয়স বেশী। দোজবর। তাতে কি কিছু কমতি থাকে পুরুষমানুষের।

আমি কোথাও যেতে পারব না। সকালে উঠেই আমার পেছনে লাগবে না বলে দিলাম।

তোর ঘাড় যাবে।

পারব না, যেতে পারব না। খুঁটি হয়ে থাকি, আর বাঁশ হয়ে থাকি, পারব না।

এত ভাল পাত্র হাতের কাছে কোথায় পাব! সব তো এল, দেখেও গেল। আর কোনও খবর দেয় না। কৃপানাথ বলল, ঝুমি মাথা পাতলে হয়ে যাবে।

দুদুমণি তুমি চুপ করবে!

আমি চুপ করব কেন। কি বলেছি, কি খারাপ কথা বলেছি, পাত্র কি খারাপ কথা!

আবার পাত্রপক্ষ বল, চেঁচিয়ে বলে দেখ কি হয়?

ব্রজসুন্দরী ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, পাত্রপক্ষ বললে তার এত মাথা গরম করার কি আছে বুঝি না! চেষ্টা ত কম করছি না। কাকে না ধরেছি? কেউ মাথা পাতে। তোর মামারা তো হাত ধুয়ে বসে আছে। তোর বাপের খবর নিতে গেলে গোপেরবাগ যেতে হয়। কে যায়! তার কি মাথায় আছে মা-মরা মেয়েটার হিল্লে করা দরকার। সে কি মানুষ! মরেছি না বেঁচে আছি তারও খবর নেয় না।

ঝুমি তেজ দেখাবার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারে। পালের বউর ঘরে গিয়ে বসে থাকতে পারে। না খেয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারে। কথায় কথায় খাওয়ার উপর এত রাগ যে, ব্রজসুন্দরী তখন জলে পড়ে যায়। সে গুম মেরে গেলে তাকে আর বেশী ঘাঁটায় না।

কিছুদিন যেতে না যেতে আবার আর এক পাত্রপক্ষ।

সাঁজবেলায় কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে বলেছিল, ছেলেটার সঙ্গে তোর যদি বিয়ে হয় রাজযোটক হবে। বি এ পাস। কিছুদিন মাথা খারাপ ছিল। কেবল বসে বসে কাগজ ছিঁড়ত। থু থু ছিটাত। খুব মেধা। বি এ পাস সোজা কথা। পড়তে পড়তে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শহরে কোঠাবাড়ি আছে। টাকা পয়সা বাপ যা রেখে গেছে তাতে তোদের চলে যাবে। ছেলেটি দেখতেও বেশ। লম্বা দশাসই চেহারা! তোর সঙ্গে মানাবে ভাল। ঝুমি জানে পাত্রটির খবর দুদুমণি তাকে এর আগেও দিয়েছে—কিছুই মনে রাখতে পারে না।

তারপর কি ভেবে একবার ঝুমির দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল। এক গ্লাস জল দে খাই। এতটা রাস্তা হেঁটে কি আসা যায়। রিকসাওয়ালারা সব নবাব। এটুকু রাস্তা, বলে কি পাঁচ টাকার কমে হবে না দিদিমা। তোদের মুণ্ডু, দ্যাখ বুড়ি পারে কি না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম। কৃপানাথ নিয়ে গেছিল। শহরে কাজ আছে বলে সঙ্গে ফিরতে পারেনি।

জল সে দেয়নি। হাত পা ছড়িয়ে তার বালিকার মতো কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। তারপর গুম হয়ে বসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, জল নিয়ে যাও। কে বলেছিল যেতে!

আজকাল আর পাত্রপক্ষের কথা নিয়ে ঝুমির সঙ্গে ব্রজসুন্দরী কখনও মাথা গরম করে না। অনেক সময় ঝুমির সামনে পাত্রপক্ষের কথা তুলতেও আতঙ্ক বোধ করে। দিন দিন ঠ্যাঁটা হয়ে যাচ্ছে ঝুমি। জল চাইলে দিতে হয়। তাও দেয়নি। জল না দিলে পাপ হবে তাও বোঝে না। ব্রজসুন্দরী সব তার কপাল ভেবে নিজেই জল গড়িয়ে খেয়েছিল।

তারপর কেমন স্বগতোক্তি—মাথাখান তার ত সাফই দেখলাম। পোকামাকড় বাসা বেঁধেছে বলেও মনে হল না। শরার মতো নিখোঁজও হয়ে যায় না। আমার সঙ্গে কি সুন্দর কথা বলল। একটাই দাবি—আইন পাস করলে বিয়ে।

ঝুমি চৌকাঠে হেলান দিয়ে বসে আছে। কি শুনছে, কি শুনছে না বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছিল। কুকুরটা শুয়ে আছে বারান্দায়। বাড়িঘর গাছপালা অন্ধকারে ডুবে আছে।

অন্ধকারেই তারকের মা-র গলা পাওয়া গেল। ব্রজসুন্দরীর খবর নিতে যাবার সময় বুড়ি সাতকাহন করে জনে জনে বলে গেছে। সম্বন্ধ এলেই বুড়ির যেন দুটো হাত পা বেশী গজায়।

তারকের মা এক মুখ জর্দা পান চিবোচ্ছিল আর চবর চবর কথা বলছিল।

কথা হল?

হল রে মা। আমার হলে তো হবে না। ওর মেসো মামারা দেখুক, বিয়ে বলে কথা, সাত মণ ঘি না পুড়লে হয়!

কোনও দাবি-দাওয়া।

দাবি-দাওয়া কি করবে। বললাম, মা-মরা মেয়েটাকে উদ্ধার করেন। ঝুমি আমার শরীর দিয়ে পুষিয়ে দেবে।

থামবে। ঝুমি না পেরে ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

ঝুমির জ্বালা ধরে যায়। তারকের মা সুবিধের নয়—সম্বন্ধ না হলে নানা কেচ্ছা ছড়াবে। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল, অন্ধকারে যাবেই বা কোথায়! নলিনকাকার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে পারে—কিংবা বিন্দুর পাশে গিয়ে বসে থাকতে পারে। ওর বইপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে পারে। কিন্তু নলিনকাকা সবাইকে নিয়ে বেথুয়াডহরিতে বেড়াতে গেছে।

দেখলে তো তারকের মা, কেমন ফোঁস মনসা, কোনও কথা বলা যায়!

ঝুমি আর পারেনি। ঘর থেকে অন্ধকারেই উঠোনে নেমে গেল।

বুড়ি তখনও দাবড়াচ্ছে, কথায় তোর এত বিষ, আমাকে সহ্য করতে পারিস না। ওঝার খোঁজে আছি, আসুক, বিষ কি করে নামাতে হয় তখন টের পাবি।

ঝুমি কিছুই শুনতে চায় না। কাঁঠালগাছের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে। কিছু বলাও যায় না। চেঁচাবে। মামারাও ছুটে আসতে পারে—কি নিয়ে আবার লাগলি তোরা! এক দণ্ড মিলে মিশে থাকতে পারিস না!

তুই আবার কোথায় গেলি! আলো নিয়ে উঠোনে বের হয়ে এল ব্রজসুন্দরী। সঙ্গে তারকের মা।

তারকের মা বলল, যা ঘরে যা। খোঁজ খবর না নিয়ে তো আর কথা পাকা হচ্ছে না।

ছেলে কি করে কাকীমা?

কিছু করে না। আইন পড়তে চায়। একটাই দাবি কলকাতায় রেখে ছেলেকে আইন পড়াতে হবে। তা খোকাকে লিখলেই হয়ে যাবে। দুটো তো বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে। খোকাকে আইনটা পাস করিয়ে দেবার কথা লিখব। খোকা আমার কথা ফেলতে পারবে না।

তারকের মা সব খবরই নিয়ে চলে গেল। একই খবর, এর আগেও কতবার দিয়েছে। মাঝে মাথা খারাপ ছিল, এখন ভাল আছে। সুস্থ আছে, বি এ পাস। ঝুমি কিছু পাস না। দু'বার ফেল। পাস না করা মেয়ের বি এ পাস ছেলে পাওয়া কত কঠিন, তাও স্বীকার করে চলে গেল।

যাবার আগে বলে গেল, দেখুন মেয়েটার ভাগ্য যদি খোলে। চেষ্টার তো ত্রুটি নেই—নিয়তি বলে কথা।

উঠোনে দাঁড়িয়েই তারকের মার সঙ্গে ব্রজসুন্দরীর কথা হচ্ছিল। হাতে হ্যারিকেন নিয়ে ব্রজসুন্দরী তারকের মাকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিতেও গেল।

মনে হল ঝুমির—এতক্ষণে বাড়িটায় শান্তি। সে হাতমুখ ধুয়ে সায়া শাড়ি ছেড়ে ঠাকুরের ফটো থেকে ফুল বেলপাতা সরিয়ে সিল্কের কাপড় দিয়ে তারকেশ্বরের ফটো ঢেকে দিল। এই কাজগুলির মধ্যে সে কেমন স্নিগ্ধতার আভাস খুঁজে পায়। জ্বালা থাকে না। কে কি বলছে, শুনতেও তার ভাল লাগে না। রাতে তার জন্য সামান্য ভাত করে নিলেই হয়। দুদুমণি দুধরুটি খায়। সে রান্নাঘরে ঢুকে আটা মাখতে বসে গেল।

দুদুমণি এগিয়ে দিতে গিয়ে হয়ত তারকের মার ঘরেই ফের বসে গেছে। এখনও ফিরছে না। নধর সঙ্গে আছে, একমসয় নধরই ঠিক ব্রজসুন্দরীকে নিয়ে ফিরে আসবে।

সে এখন বাড়িটায় একা। রুটি ক'খানা বেলে আখায় পাটকাঠি জ্বেলে ঢুকিয়ে দিল। শীতের চাদর গায়ে আগুনের উষ্ণতায় সে কেমন কিছুটা বিভোর হয়ে আছে। রুটি হয়ে গেলে ভাত বসিয়ে দিল।

তারপর নধরকে উঠোনে ঢুকতে দেখেই বুঝল ব্রজসুন্দরী আসছে।

সে টের পেল ব্রজসুন্দরীর কথা শেষ হয়নি। নিজেই প্যাচাল পাড়ছে। বয়স হলে এই বুঝি হয়।

তা রাজি হয়ে এলাম। বলে এলাম, আমার বড় পুত্র খুবই বিবেচক মানুষ। মা-র কথা ফেলতে পারবে না। আপনাদের ছেলে আমাদেরও ছেলে। একটা চিঠি লেখাতে হবে তর বড়মাসিকে দিয়ে—নীলুকে বলবি, কালই যেন চলে আসে।

আসলে এখন আর তাকে দিয়ে ব্রজসুন্দরী চিঠি লেখাতে সাহস পায় না।

তর মেসোকেও খবরটাও দিতে হবে। ওরা দু'জনেই যেন চলে আসে। বেণুকেও আসতে বলবি। সবাই পরামর্শ করে চিঠিখানা লেখা দরকার। আমার বড় পুত্রের কোনও অভাব নাই। মেলা ঘর। কাজের লোকই কত। দোতলায় একখানা ঘর না হয় ছেড়ে দেবে। দুটো তো বছর। বুঝিয়ে লিখলে ও মাথা পাতবে। আরে বাবা পণ ছাড়া আজকাল বিয়ে হয়, কখনোই হত না, এখনও হত না। পণ না দিলে কনেরই বা ইজ্জত থাকে কি করে! তা তুই তর কথাও রাখ, মা-র কথাও রাখ। পণ চায়নি, আইন পড়তে চেয়েছে। পরের ছেলেকে লোকে মানুষ করে না! ঝুমির ভবিষ্যৎ বুঝবি না!

কার সঙ্গে ব্রজসুন্দরী এত কথা বলছে, বোঝাও দায়। যাকে শুনিয়ে বলছে, তার কোনও সাড়াশব্দই নেই। সারারাত ঝুমি এক ঘরেই থেকেছে, এক তক্তপোশেই শুয়েছে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীর কথায় বিন্দুমাত্র জ্বলে ওঠেনি।

আজ সকালে উঠেই সেই এক কথা।

যা মাসি-মেসোকে খবর দিয়ে আয়। বেণু অফিস থেকে ফিরলে, না হয় আমিই বলে আসব। সাইকেলটা অধরের দোকানে নিয়ে যাবি। পাংচার ঠিক করে নিবি। আমার হাতের কাজ এগিয়ে দিয়ে চলে যাবি মাসির কাছে। থেকে যাস না আবার। নীলুর কি! বোঝে, আমার কষ্ট বোঝে! আদর করে পাঁচ পদ খাওয়ালে, এটা ওটা দিয়ে ভরে রাখলেই কি শরীর বোঝে!

ঝুমি আর পারে! কাঁহাতক পারা যায়। দিনরাত তার শরীর নিয়ে খোঁটা। মাথাটা তারও বোধহয় ঠিক নেই। সে বলল, তুমি যাও, আমি যেতে পারব না। মানুষ ঠাকুরের নাম করে সকালে ওঠে। এই কি সারাক্ষণ শরীর, শরীর, শরীর!

কি বললি?

এমন মুখে তাকিয়ে থাকল ব্রজসুন্দরী যে ঝুমি কি বলবে আর ভেবে পেল না। চোখে এক অপার্থিব শূন্যতা, যা দেখলে দুদুমণির জন্য বড় মায়া হয় তার। তাকে নিয়ে এত উচাটনে থাকে, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বুঝি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। আবার মনে হয়, এত উচাটনে বুড়ির না শেষে সত্যি মাথা খারাপ হয়ে যায়।

খারাপ যে হয়ে যায়নি তাই বা কে বলবে। তা না হলে বলতে পারে, তোর বড়মামাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। কে না কে, তার স্বভাব চরিত্র কিরকম, সেখানে গিয়ে ফের পাগলামি শুরু হতে

ব্রজসুন্দরীর কথা ভেবে হাসিও পাচ্ছিল, আবার দুঃখও হচ্ছে।

সে আখায় খড়কুটো জ্বেলে চা করে দিল দুদুমণিকে—চা খেয়ে যদি মাথা ঠাণ্ডা হয়। জল ঘাঁটাঘাঁটি করে ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। আগুনের পাড়ে বসে ব্রজসুন্দরী চা খেতে খেতে তার স্বপ্নের কথা শুরু করে দিল।

সেই কবেকার কথা।

তর দাদু, বুঝলি তর দাদুর বাবা, মানে আমার শ্বশুরমশাই আমাকে কোথায় দেখেছিলেন জানিস?

কোথায়?

আমাদের এক শিষ্যবাড়ি। দেখেই পছন্দ। বাবা আমার সেকেলে মানুষ—শিষ্যবাড়িতে দেখলে তো হবে না। আমাদের বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে। সে বড় দুর্গম এলাকা, নদী পার হতে হয়, খাল বিল, তেপান্তরের মাঠ—সব অগ্রাহ্য করে শ্বশুরমশাই তাঁর লোকজন নিয়ে আমাদের বাড়ি হাজির। সে কি ধুন্ধুমার কাণ্ড—কোথায় বসতে দেওয়া হবে, থাকতে দেওয়া হবে, কি খাওয়ানো হবে রাতে, বাবা আমার চোখে সরষে ফুল দেখতে থাকলে শ্বশুরমশাই বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না বিয়াই, আমাদের নৌকায় সব ব্যবস্থা আছে। ওখানেই আহারের বন্দোবস্ত আছে। শুধু কন্যারত্নটিকে দেখে আর একবার চলে যাব। বাবা কোনও বরপণ দিতে পারবেন না, তাতেও রাজি। তর দাদুর বাবা আরও কি বললেন, জানিস, বেয়াই কন্যাটি আপনার রত্ন—যদি দোষ না ধরেন বলি, অসুবিধা থাকলে তুলে নিয়ে না হয় স্বগ্রামে চলে যাব। সেখানেই বিয়ে হবে।

তোমার বাবা রাজি হল?

রাজি হবে না কেন? তারাই তো আমার সব। তারপর ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে একটা মিছিল। পালকিতে আমি আর আমার ছোট বোন সরণি। সামনে পেছনে পাইক। গা ভর্তি গয়না। অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষ—তারাই তো শেষে আমার নিজের লোক হয়ে গেল। তুই এত ঘাবড়ে যাস কেন বল ত? খোকাকে বুঝিয়ে লিখলে, ও বুঝবে না মনে করিস?

আমি কিছু জানি না।

এটা তর রাগের কথা ঝুমি। চায়ে তুই মিষ্টি দিসনি। মাথা দেখছি তরও ঠিক নেই।

তোমার পাল্লায় পড়লে কারও মাথা ঠিক থাকে! মাসি বলেছে না, কৃপানাথ একটা ঠক জোচ্চোর—ঘটকালি করে খায়, ওর পাল্লায় পড়বে না।

আরে নিজচোখে বাড়িঘর দেখে এলাম। মিছা কথা হবে কেন?

যা ভাল বোঝ করো।

তুই তবে চলে যা। কল থেকে দু-বালতি জল তুলে রেখে যাস।

সে বসেই আছে।

যা, তুই না গেলে আমি কাকে পাঠাই বল—বড় কাতর অনুরোধ। আমার আর কে আছে।

সত্যি দুদুমণির কেউ নেই। শেষে সেই পালকিসুন্দরী আজ ব্রজসুন্দরী হয়ে আছে। তবে ব্রজে কেউ নেই। সবাই উড়ে চলে গেছে। একা পুরী আগলাচ্ছে। এখন তাকেও উড়িয়ে দেবার মতলবে কত ফন্দি মাথায় নিয়ে যে ঘুরছে।

যা, দুটো রুটি করে দিচ্ছি, খেয়ে চলে যা। আসার সময় বাজার হয়ে আসিস। ভাল মাছটাছ পেলে আনবি। পালান তো মাথায় চাঁটি মেরে টাকাগুলি নিয়ে গেল। দেখা হলেই বলবে, পাত্রের পিসি দেখে না গেলে ফাইনাল কথা হবে না। ঝাঁটা মারি মুখপোড়া তর ফাইনালে।

তারপরই থেমে বলল, কৃপানাথকে বলেছি খেতে। গরীব মানুষ। এক ডাকে সাড়া দেয়। আমার দুঃখ কি তুই ছাড়া আর কেউ বোঝে!

ঝুমি এখানটাইতে বড় দুর্বল বোধ করে। কিন্তু তার তো ইচ্ছে হয় না যেতে। কোন্ মেয়ে কবে তার পাত্রপক্ষের খবর দিতে মাসির বাড়ি যায়, সে জানে না।

সে সাইকেলে বড়মাসির বাড়ি রওনা হলেই, টিটকিরি। কিরে ঝুমি, মাসির বাড়ি যাচ্ছিস?

সে সাড়া দেয় না।

কিরে ঝুমি কোনও খবর বুঝি এয়েচে!

সাইকেল চালিয়ে লাল সড়কের দিকে যেতে দেখলেই সবাই বোঝে সে মাসির বাড়ি যাচ্ছে পাত্রপক্ষের খবর দিতে।

দুদুমণি বোঝেই না একটা মেয়ের পক্ষে এটা কত লজ্জার কথা।

তার তখন শুধু কান্না পায়। সাইকেলে সে যায় ঠিক, তবে গোপনে কাঁদেও। আজ তার কি যে মনে হল, সে কিছুতেই খবরটা দেবে না। সাইকেলে বড় রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে বাড়ি ফিরে যাবে। তারপরই কেন যে মনে হল, খবর না দিলে, দুদুমণি তার অথর্ব শরীর নিয়েই ছুটবে। রাস্তাঘাটে পড়েটড়ে মরে থাকলে আর এক কেলেঙ্কারি।

মাসি-মেসোকে খবর দিয়ে সোজা বাড়ি চলে এল। মাসি, মেসো মেজমামা গেল পাত্রপক্ষের বাড়ি। তারাও ঝুমিকে দেখে গেল।

তার কিছু ভাল লাগে না। সে যে কি করে!

চিঠিটাও লেখা হয়ে গেল। ইনল্যাণ্ডে ইনিয়ে বিনিয়ে মাসিকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে দুদুমণি—এটাই আমার শেষ কাজ বাবা। অমত করিস না। আমি আর ক'দিন আছি, চোখ বুজলে ঝুমিকে কে দেখবে! কার কাছে রেখে যাব?

ঝুমিকে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসতে হবে চিঠিখানা।

গাছপালার ছায়া পার হয়ে এক অন্তহীন পথ চলে গেছে মনে হল তার। নিমাইদার বাড়ি পার হয়ে স্কুলের মাঠ পার হয়ে সাইকেল চালিয়ে দিল।

কেবল বড়মামীর চোখ ভাসছে। চিঠিটা পড়লেই ক্ষেপে যাবে মামী। তোমার মা ভেবেছে কি! কোথাকার কে, তাকে আমার বাড়িতে জায়গা দিতে হবে। তাও মাথা ঠিক থাকলে হত। মামা বেচারা মুখ চুন করে বসে থাকবে। কিছু বলতে পারবে না। চিঠিটাও যে ঝুমি ডাকবাক্সে ফেলেছে ভাবতেই পারে। কি বেহায়া মেয়েরে বাবা! এতো বাড়িসুদ্ধ সবাইকে পাগল করে ছাড়বে।

এ-চিঠি মরে গেলেও ডাকবাক্সে ফেলতে পারবে না। দুদুমণির করুণ মুখ ভেসে উঠল। চিঠিটা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতেই তার সমস্ত ভার যেন লাঘব হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এলে দুদুমণির এক কথা, ঠিকমতো ডাকবাক্সে ফেলেছিস তো। আমার কপাল।

ঠিকমতোই তো ফেললাম। ঠিকমতোই যাবে। এক গ্লাস জল দাও। বড় তেষ্টা।

মিছে কথা বললে কি জল তেষ্টা পায়! তার এত তেষ্টা কেন!

ব্রজসুন্দরী বড় যত্ন করে এক গ্লাস জল ঝুমির হাতে দিল।

জল খেতে গিয়ে সহসা বিষম খেল ঝুমি। জলময় হয়ে গেল সারা ঘর। সে শুধু কাশছে। এত কাশি যে মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারল না। তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ব্রজসুন্দরী ছুটে এসে মাথায় ধীরে ধীরে ফুঁ দিচ্ছে। ষাট ষাট বলছে। সরল সাদাসিধে এই বৃদ্ধাকে মিছে কথা বলতে গেলে এত কষ্ট হয় আগে জানত না। আজই সে তা টের পেল। চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ায় কি নিশ্চিন্ত মুখ! প্রশান্ত চাওনি ব্রজসুন্দরীর। সে সহ্য করতে না পেরে উঠোনে বের হয়ে গেল। মাথার উপর আকাশ, এবং গাছপালার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল সে। না হলে যেন ব্রজসুন্দরীর কাছে সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে।

তারপরই মনে হল মাথাটা তার বড্ড ধরেছে। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। শীতও করছে। প্রবল শীতে কেন যে সে এত কাতর। কোনওরকমে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে গেল। পাশের পার্টিশান করা ঘরটায় বিছানার চাদর পাতাই থাকে। দুপুরে সে, দুপুরে শুধু কেন সারাদিনই সে ওই ঘরটায় থাকে। কোনওরকমে একটা লেপ টেনে শুয়ে পড়তেই ব্রজসুন্দরী ছুটে এসে কেমন ঘাবড়ে গেল।

কিরে ঝুমি অবেলায় শুয়ে পড়লি, চানটান করবি না। খাবি না? বলে গায়ে হাত দিতেই মনে হল ঝুমির শরীর পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর। ঝুমি কথা বলছে না। বেহুঁশ জ্বরে।

ঝুমির সহজে কোনও অসুখবিসুখ হয় না। কিন্তু এবারকার জ্বরে সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। সারাদিন হয় ঘর না হয় বারান্দায় বসে থাকে। মধু ডাক্তার দেখে বলে গেছে, সেরে যাবে। ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। আপনি চিন্তা করবেন না ঠাইনদি।

ব্রজসুন্দরী ঝুমির আরোগ্য কামনায় মৌনি স্নান করছে রোজ সকালে। অঘোর চতুর্দশী ব্রতও করল একদিন এবং ঝুমি আরোগ্যলাভ করলে বলল, খোকা তো চিঠির কোনও জবাব দিল না ঝুমি।

ঝুমি বলল, ডাকের কোনও ঠিক আছে। চিঠি ঠিকই আসবে। যত দিন যায়, ব্রজসুন্দরী চিঠির জন্য তত মরিয়া হয়ে ওঠে। চিঠি আর আসে না।

ইদানীং ঝুমি দেখেছে, সকালে উঠেই সূর্যস্তব পাঠ করছে। নানা ব্রত করছে, কখনও পাশুপত ব্রত, কখনও মদন ত্রয়োদশী ব্রত। মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত করলে—যদি বৃদ্ধার পাপখণ্ডন হয়। ঝুমির উপর প্রসন্ন হন দেবতারা।

শেষে শুরু করেছে দণ্ডিকাটা। সে ক্ষেপে যাবে শুনলে ভেবেই, মৌনি স্নান শেষে তাকে লুকিয়ে কোথায় চলে গেছে।

তখনই দেখল শরদিন্দু এসে হাজির। আজ সাইকেল আনেনি। হেঁটেই চলে এসেছে।

দুদুমণির চিন্তায় তার মন ভাল নেই। কি যে বিপদে পড়ে গেল। একবার নীলুমাসির বাড়ি খবর দিলে হয়, কিংবা মামাদের—কিন্তু একই কথা সে বার বার বলে কি করে! অভিযোগের আঙুল তার দিকেই উঠবে।

তুই কিছু বলেছিলি?

আমি জানিই না। কখন এক ফাঁকে বের হয়ে গেছে।

কেউ বিশ্বাসই করবে না তার কথা।

শরদিন্দুকে দেখেও তার কোনও ভাবান্তর নেই।

শরদিন্দু বারান্দায় উঠে বলল, ঝুমিদি, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।

শরদিন্দুর এই একটা গুণ আছে, শুধু সে তার বাধ্যেরই না, তার কাছে এসে বিশেষ কোনও অসংলগ্ন কথা বলে না। রহস্যময় মহাবিশ্বের খবরে যে সে বিভোর হয়ে থাকে, শরদিন্দুর কথাবার্তা থেকে ঝুমি অনুমান করতে পারে। সে বুঝেছে, কেউ পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে থাকতে ভালবাসে না। নিজেই সে তার সমস্যা তৈরি করে নেয়, তারপর সে সারাজীবন তার পেছনে ছোটে। ব্রজসুন্দরীর কি দরকার দণ্ডিকাটার। আচার্য রাশিচক্র বিচার করে কি বলেছে কে জানে—সূর্যব্রতে দণ্ডিকাটলে যদি কিছু হয় এমনও বলতে পারে—সারাদিন উপবাস করে দণ্ডিকাটতে হয়, দু-বার তো ভবা পাগলার কালীর থানে সারাদিন হত্যে দিয়ে সাঁজবেলায় ফিরেছিল, কেউ জানে না, সেই রাতে খেতে বসে সব শুনে গুম মেরে গেছে—তার বয়স বাড়ছিল। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, দুদুমণি তুমি আমাকে আর কত ছোট করবে!

ঝুমিদি যে ভাল নেই, শরদিন্দু বুঝতে পেরে বলল, ঠাইনদি কোথাও বুঝি গেছে!

দেখতেই তো পাচ্ছিস!

কোথায় গেল!

কি করে বলব! আমাকে কিছু বলে যায়!

ঝুমিদির মেজাজ ভাল নেই বুঝে সে তার কথাখান খুলে বলতেও আর সাহস পাচ্ছে না।

ঝুমি এবার কেমন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তার মাথায় যে কিছু একটা ঢুকে গেছে বুঝতে পারছে। শরদিন্দুকে বলল, তুই বোস। পুকুর থেকে ডুব দিয়ে আসছি। বেলা দুটো বাজে, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব!

কিছু মুখে দিয়ে যায়নি?

না।

কখন বের হয়েছে? একাই গেল?

একা যাবে কেন, নধর তার সঙ্গী। আসুক ফিরে, নধরকে আজ মজা দেখাব। রাতে নধরকে কে খেতে দেয় দেখব।

যাক, শরদিন্দু কিছুটা হালকা বোধ করছে। তাকে ঝুমিদি তাড়িয়ে দিচ্ছে না, অথবা বলছেও না, তোর বকবকানি শুনতে আমার আর ভাল লাগে না শরা। তুই দয়া করে চুপ কর।

বসে থাকলে কেন ঝুমিদি, যাও, পুকুরে ডুব দিয়ে এস। আমি তো আছি।

ঝুমি বলল, আমি যাচ্ছি, তুই আবার পালাস না।

পালাব কোথায়। ঘাড় ধরে ফের নিয়ে আসবে না।

ঝুমি পুকুরে ডুব দিল। ফাল্গুন মাস পড়ে যাওয়ায় রোদের তাপ বেড়েছে। তার জল থেকে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। শরদিন্দু বসে আছে তার অপেক্ষায়।

সে স্নানটান সেরে ঠাকুরকে ফুলজল দিয়ে বলল, তুই খেয়ে এসেছিস?

আমার জন্য ভেবো না।

যা বলছি উত্তর দে।

খেয়েছি বললেও সত্য কথা হবে না, খাইনি বললেও মিছে কথা হবে।

কি মুশকিল, এখানে দুটো খেলে তোর অসুবিধা হবে?

অসুবিধা হবে কেন। বামুনের বাড়ি এঁটোকাটার বিচার—তাই ভাবছি।

আর ভাবতে হবে না। বসে যা। তোকে খেতে দিয়ে আমি খাব।

বলে আর কোনও কথার প্রতীক্ষা না করে বারান্দায় ঝুমি আসন পেতে দেবার সময়ই বলল, তোর স্নান হয়েছে?

স্নান না হলে আমাকে খেতে দেবে না?

না দেব না।

তাহলে ডুবটা দিয়েই আসি।

ঝুমি দেখল, শরদিন্দু স্নান করতে যাচ্ছে, কিন্তু সঙ্গে কিছু নেয়নি। ঝুমিদি বলেছে, হয়ত প্যান্টজামা পরেই ডুব দিয়ে আসবে। সে ডাকল, এই শোন।

আমাকে ডাকছ!

তবে কাকে! নে ধর। এই তোয়ালেটা নিয়ে যা। বেশী দেরি করিস ন। আমার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে। পালাবি না কিন্তু! তাহলে আমার আর খাওয়া হবে না।

এই প্রথম কোনও অনাত্মীয় খাবে তার হাতে, সে সাজিয়ে থালা গেলাস কারও পাতের সামনে রাখবে। সে আয়নায় চুলে কাঁকুই দেবার সময় এমন ভাবল। কেমন একটা তৃপ্তিও কাজ করছে ভিতরে। শরদিন্দু তার বিপদে আপদে সর্বক্ষণের যেন পাহারাদার। সে যেখানেই থাকুক, তার কথা ছাড়া কিছুই ভাবে না। মুখে সামান্য পাউডার বুলিয়ে একটা নীল রঙের টিপ পরল কপালে। আয়নায় নিজেকে এভাবে দেখতে সে কখনোই অভ্যস্ত নয়। আজ তার কেন জানি আয়নার কাছ থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

শরদিন্দু উঠোনে এসে বলল, আমি এসে গেছি ঝুমিদি, দ্যাখো পালাইনি।

ঝুমি বারান্দায় বের হয়ে দেখল পরিপাটি করে তারে তোয়ালে মেলছে শরদিন্দু। আর দেখে আরও অবাক, বারান্দায় তার কাচা শাড়ি সায়াও বালতি থেকে তুলে নিয়ে মেলে দিচ্ছে তারে।

আরে তোকে নিয়ে তো মহা বিড়ম্বনা। কে বলেছে, ওগুলো তারে মেলে দিতে।

তোমার কাজের সুবিধে হবে।

শরদিন্দু হাত দিয়ে ভিজা চুল পাট করছে। বামুনের বাড়ি, চিরুনি চেয়ে নিতেও লজ্জা।

নে ধর।—বলে ঝুমি নিজের কাঁকুইখানা শরদিন্দুকে এগিয়ে দেবার সময় বলল, চুলে তোর খুসকি নেই তো!

তুমি আমাকে এত নোংরা কেন মনে কর বল তো। এই দ্যাখো না বলে সে তার মাথাখানাই শুধু এগিয়ে দিল না, চুল ফাঁক করে দেখাল, সে বাইরে যতই ভবঘুরে হোক, ভিতরে তার একটা পরিচ্ছন্ন মন আছে। মাথা সত্যি পরিষ্কার, বিন্দুমাত্র খুসকি নেই।

ঝুমি দেয়াল থেকে আয়নাটাও বের করে দিল। বসে চুল আঁচড়া। তারপর খেতে বসে যা।

ঝুমি এক গ্লাস জল এবং আসন পেতো দেবার সময় দেখল, সে কিছু খুঁজছে।

কি চাস?

গাছে কাঁচালঙ্কা ছিল, ঝাল।

আছে। দূর থেকে বোঝা যায় না।

আমার আবার ভাতের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা না হলে খাওয়ায় তৃপ্তি হয় না। সে নিজেই বারোমেসে লঙ্কা গাছটা থেকে লঙ্কা তুলে এনে একটা লঙ্কা আলাদা করে রাখল।—এটা তোমার ঝুমিদি।

ঠিক আছে, রেখে দে।

গাছের লঙ্কা খাও না! ডালের সঙ্গে লঙ্কা ঘসে ঘ্রাণ নিল শরদিন্দু।

কি সুন্দর ঘ্রাণ।

তারপর খেতে খেতে বলল, বামুনের হাতের রান্না, স্বাদই আলাদা। ডালে দেখছি এঁচড় দিয়েছ।

সবই ব্রজসুন্দরী করে রেখে গেছে। ভাত বাড়তে গিয়ে বুঝেছিল, তারই মতো ভাত রান্না করে রেখে গেছে। ব্রজসুন্দরী যে দুপুরে খাবে না, যেন ঠিক করাই ছিল।

সে তাড়াতাড়ি আর এক কৌটা চাল আবার বসিয়ে দিয়ে এসে বলল, পেট ভরে খাস। দু'জনের খাওয়া, আমাদের কিছু একটা হলেই হল।

কম তো হয়নি। বেগুনভাজা, পাঁচমেশালি তরকারি, ডাল, ফুলকপির ডালনা, চাটনি। দই থাকলে তো ভোজের বাড়ির নেমন্তন্ন।

আছে। দই আছে।

একটা প্লেটে দই দিয়ে বলল, খুব যে চেটেপুটে খাচ্ছিস, আর একটু ভাত নে।

আর পারব না।

আসলে সে যে শরদিন্দুর সঙ্গে কথা বলে, ভাত হওয়ার অপেক্ষায় আছে, এটা বুঝতে দিতে চায় না।

তুমি খেতে বসো। আমার আর কিছু লাগবে না।

দেখি যদি দুদুমণি চলে আসে।

ঝুমি কিছুতেই ধরা পড়তে চায় না। শরদিন্দুকে খেতে বলায়, তার ভাতই নেই জানতে পারলে, বেচারা খুবই অস্বস্তিতে পড়ে যাবে। এমনিতেই কিছুটা লাজুক, এবং সরল। ঝুমিদির খাওয়া হয়নি, সে খেয়ে নিল, ভাবতে গেলেই কষ্ট পাবে। আতপ চালের ভাত, হতে বিশেষ সময়ও লাগে না, চৌকাঠে হেলান দিয়ে শরদিন্দুর খাওয়া দেখছিল ঝুমি। কিছুরই অভাব নেই—বাড়িতে ঢুকলে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে, বৈকুণ্ঠদা বলতে গেলে তার খাস চাকর, শরদিন্দু কোথায় থাকে, বৈকুণ্ঠদা তাকে খুঁজেই পায় না। দেখা হলেই বলবে, ঝুমিঠাকরুন, ছোটবাবু কি আপনাদের দিকটায় গেছে।

সে মাথা ঝাঁকিয়ে না করলে, বৈকুণ্ঠদারও মুখ ব্যাজার হয়ে যায়। তারপর স্বগতোক্তি—কোথায় যে যায়, কি যে করে, কর্তাবাবুর মাথা গরম সারাদিন। কিন্তু পুত্রটি তার বাড়ি ফিরে এলে একেবারে যেন তিনি ধন্য হয়ে যান।

এলি! কোথায় ছিলি! তোর জননীর কথা মনে পড়ে না। শরদিন্দু উত্তর দেয় না। নিজের মতো ঘরে ঢুকে টিভি চালিয়ে দেয়।

সেই শরদিন্দু ঝুমি সামান্য মন খুলে কথা বললেই, কি খুশি!

ঝুমি বলল, তোর একখানা কথা ছিল, কি কথা বললি না তো!

শরদিন্দুর মুখ নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কি হল! বল।

বললে রাগ করবে।

রাগ করব কেন?

বড় জটিল কথা। ভয় করে।

ভয় করে! তুই কি রে, আমি বাঘ না ভাল্লুক, বললে আমি কি তোকে খেয়ে ফেলব! না, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করব!

শরদিন্দু বলল, তুমি খেয়ে নাও, পরে বলব।

তোর কথাখান শুনলে, আমি ভাতের উপর রাগ করে না খেয়ে থাকব ভাবছিস!

তুমি খেয়ে নাও না।

শরদিন্দুর বোধহয় কথাখান বলতে খুবই সংকোচ হচ্ছে। তারপরই মনে হল, ওর আবার কথা,

তার আবার দাম। ভাত ধরে এসেছিল, গন্ধ উঠছে। ঝুমি ছুটে গিয়ে আখা থেকে হাঁড়ি নামিয়ে খেতে বসে গেল।

খেতে বসেই বলল, তুই বোস। যাবি না।

তারপর খাওয়া শেষে বারান্দায় এসে অবাক, শরদিন্দু তার থালা গ্লাস বাটি পরিপাটি করে টিউকলের জলে ধুয়ে বারান্দায় উপুড় করে রেখেছে। সে জলচৌকিতেও বসে নেই। তারপর দেখল, যেমন সে এ-বাড়িটায় এলে গাছপালার ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়, তেমনি ঘুরে বেড়াবার জন্য পুকুরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। ব্রজসুন্দরী বাড়ি নেই বলে তার কিছুটা যেন স্বাধীনতা মিলে গেছে। এবং তখনই ব্রজসুন্দরীর জন্য ঝুমির মনটা খচ করে উঠল। এই রোদে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি করছে, কিছুই জানে না। কিছু মুখেও দেয়নি। নীলুমাসিকে খবরটা দিতে হয়, কিংবা নীলুমাসির বাড়ি গিয়ে যদি বসে থাকে। সে খেয়ে নেওয়ায় তার মধ্যে অপরাধবোধ আরও বেড়ে গেছে।

সে উঠোন পার হয়ে কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ডাকল, শরা। শরদিন্দু।

যাই ঝুমিদিদি।

শরদিন্দু কাছে এলে বলল, কি করি বল ত, মন আমার মানছে না।

আর একটু দ্যাখো, চলে আসবে।

তখনই নধর এসে হাজির। ঝুমি কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দুদুমণি হয় ত ফিরছে। সে রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেল। যদি ফিরে আসে। সারারাস্তা খাঁ খাঁ করছে। একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল। গাড়িটার ছই-এর মাথায় একটা কাক বসে আছে।

ঝুমি বাড়ি ফিরে বলল, একবার নরেন সাধুর আশ্রমে যা ত। মনে হয় ব্রজসুন্দরী সেখানে গিয়ে বসে আছে। আমার সাইকেলটা নিয়ে যা। সেখানে না পেলে মাসিকে একটা খবর দিতে হবে। ব্রজসুন্দরীর ধনুর্ভাঙ্গা পণ, কিছুতেই ঘরের খুঁটি করে রাখবে না। আমাকে তাড়াবে। কি করে তাড়ায় দেখছি।

কোথায় তাড়াবে?

কি জানি, বসে থাকিস না। আমার সাইকেলটা নিয়ে চলে যা।

বড় অনুগত শরদিন্দু। সে বারান্দা থেকে সাইকেল বের করে ব্রজসুন্দরীর খোঁজে বের হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে নধরও সাইকেলের পেছনে ছুটতে থাকলে, শরা ডাকল, দ্যাখো ঝুমিদি, তোমার নধর আমার পিছু নিয়েছে। ঘেউ ঘেউ করছে। লাফাচ্ছে। তোমার সাইকেল ধরেছি বলে রাগ।

ঝুমি ডাকল, নধর বাড়ি আয়। শরা সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না। এক্ষুনি ফিরে আসবে। আয় বলছি।

সে কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। মাসির বাড়ি যাবার সময় অথবা শহরে যখন সে যায়, চারপাশের লোকজন দেখে—কেউ বসে নেই। সে কোনওদিন ভাবে বড় রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকান দিলে কেমন হয়! ব্রজসুন্দরীকে প্রস্তাবটা দিতেই তাকে তেড়ে এসেছিল—চায়ের দোকান দিবি? কি বললি, তুই কুমুদ মজুমদারের নাতনি, চায়ের দোকান দিবি! লোকে তোর মুখে থু-থু দেবে। কুমুদ মজুমদারের নাতনি চায়ের দোকান দিয়েছে রাস্তায়। শেষে তুই আরও কি দোকান খুলে বসবি রাস্তায় কে জানে।

আরও কি দোকান খুলে বসবি কথাটাতে কত কুৎসিত ইঙ্গিত—দুদুমণি বোঝে না।

চায়ের দোকান, এই যেমন, তার যা সামান্য পুঁজি আছে—টালির চাল, বাঁশের বেড়া, দুটো টুল, একটা কেটলি, কিছু গ্লাস আর একটা বড় মাটির হাঁড়ি গামলা, হয়ে যাবে মনে হয়েছিল। একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের পেছনে না ছুটে কাজে নেমে পড়া উচিত। তার নকশিকাঁথার কাজ শেষ হলে আরও কিছু পয়সা আসবে। শরাই মাধববাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। শহরে মাধববাবুর একটি হস্তশিল্পের দোকান আছে। ভাল দামই দেবে। তবে বড় সময় লাগে—দিনরাত স্বপ্ন না দেখলে নকশিকাঁথায় চন্দ্র-সূর্য নামে না। কবে যে শেষ হবে, কবে যে নামবে—কখনও জ্যোৎস্নারাতে উঠোনে নকশিকাঁথাখান মাদুরে বিছিয়ে বসে থাকে।

বাড়ি থেকে বিশেষ বেরও হতে পারে না। যখন তখন তো নয়ই। এক অলীক অবরুদ্ধ লক্ষ্মণের গণ্ডির মধ্যে সে কেমন আবদ্ধ হয়ে আছে। কিছুতেই গণ্ডি অতিক্রম করে বের হতে সাহস

পাচ্ছে না। সামান্য পা টেনে হাঁটে বলে মানুষের নজর বড় বিপাকে ফেলে দেয়। সে বড় আত্মগ্লানিতে ভোগে। সে হেঁটে গেলে এত কি দেখার আছে বোঝে না। হাঁটাহাঁটি যেটুকু পাড়ার মধ্যে। পাড়া থেকে বের হলে সাইকেলে, পরিচিত কেউ ডাকলে সে মাটিতে এক পা রেখে সাইকেলে বসেই কথা বলে—সে নেমে হেঁটে গেলে তার পেছনের সামান্য ওঠানামা দেখে যে যৌনসুখে বিভোর হয়ে যায় মানুষজন তাও সে বোঝে। তখন তার মরমে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। মানুষের এক লুব্ধ দৃষ্টি কবে থেকে যেন তাড়া করছে। কখনও সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেকে দেখে। তার পেছনটা বড় বেশী দোল খায়। এমনিতে সে স্থূলকায় নয়। শরীরের গড়ন খুবই তার মজবুত। ঈশ্বর তাকে লাবণ্য এবং সুষমা দুইই দিয়েছেন।

সে তার শরীর নিয়ে বড় হীনমন্যতায় ভোগে। আজ কি যে হয়েছে, সব ছুঁড়ে ফেলে এসপার ওসপার কিছু একটা করতে চায়।

দোকানের কথাতে ব্রজসুন্দরীও ছেড়ে কথা কয়নি।

চা-এর নেশা না ছাই। তোর নেশাতেই দোকানে ভিড় বাড়বে। এটা ব্রজসুন্দরী দশভাতারির মতো ভাবে। নাতনি দশভাতারি হলে ব্রজসুন্দরীর মরণ। গলায় ফাঁস।

শুধু ব্রজসুন্দরী কেন, মামারাও তার সঙ্গে আর সম্পর্ক না রাখতে পারে। মামাদের চটাতে সে সাহস পায় না। তার বন্ধুরা সবাই স্বামীর ঘর করছে। কেউ বসে নেই। বেড়াতে এসে তারা তার খোঁজখবরও নেয়। কোলে কাঁখে বাচ্চা। স্বামীর এলেম কত কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে দেখিয়ে যায়। ব্রজসুন্দরী মনে মনে তখন খুবই অপ্রসন্ন—আমার ঝুমির বিয়ে হচ্ছে না, তোরা সায়া শাড়ি খুলে মরদ নিয়ে পড়ে আছিস—কোলে কাঁখে বাচ্চা নিয়ে দেখাতে আসিস! ঝুমির কি আমার শরীর নাই!

তারও যে খারাপ লাগে না তা নয়। সেও যে অপেক্ষায় আছে। কত রাতে যে তার ঘুম হয় না। এ-পাশ ও-পাশ করে। উঠে জল খায়। ব্রজসুন্দরী ঠিক জেগে থাকে।

বাইরে যাবি!

না।

উঠলি যে।

জল খাব।

দুগগা দুগগা।

জল খাওয়ার সঙ্গে দুগগা দুগগা বলার কি সম্পর্ক আছে সে বোঝে না। দুদুমণি কি টের পায় নাতনিটার এত জলতেষ্টা কেন! এত রাত জেগে থাকে কেন ঝুমি। এ-পাশ ও-পাশ কেন করে।

তখনই শরা সাইকেলে সাঁ করে সোজা উঠোনে ঢুকে গেল।

গেছে?

শরা সাইকেল থেকে লাফিয়ে নামল। তারপর বেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, নরেন সাধুর থানে মচ্ছব। ঠাইনদি পর্যন্ত দণ্ডি কাটছে!

ঝুমি চোখ বুজে দৃশ্যটা ভাবতেই কেমন উন্মাদের মতো আচরণ করে ফেলল।

দণ্ডিকাটছে! কুলো মাথায় রোদে দাঁড়িয়ে আছে, মন্দির প্রদক্ষিণ করছে! সোজা কথা! মানত করেছে। দণ্ডিকাটা বের করছি। বুড়ি মরবে। বুড়ির সর্বস্ব যাবে। সে ঘরে ঢুকেও চেঁচামেচি করছে—নরেন সাধু তুমি মানুষ। ঠাকুরের নামে দুদুমণিকে দণ্ডি কাটাচ্ছ—পাপ হবে না! গন্ধর্ব কবচ পেতে হলে দণ্ডিকাটতে হয়, বললেই হয়েছে!

ঝুমিদি, নরেন সাধু জানোয়ার।

থাম। থাম। জানোয়ার কে নয়! তোরা সব জানোয়ার।

আমি কি করলাম ঝুমিদি!

কি করছিস বুঝিস না। পাগল সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তোর লজ্জা হয় না নিজেকে নিয়ে মজা করতে! তুই আবার কথা বলতে আসিস! মহাবিশ্ব অনেক দূরের কথা, আগে ভাল করে নিজের বিশ্বটা দ্যাখ।

ঝুমির চোখ জ্বলছে।

ঝুমি কি করবে বুঝে পাচ্ছে না। সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সেখানে তার ছুটে যাবারও ক্ষমতা নেই। ব্রজসুন্দরীর মাথা থেকে সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধরে নিয়ে আসবে তারও উপায় নেই। নরেন সাধুর লোকবল এত যে তাকে শেষে না তাড়া করে। সাধুর থানে শনি মঙ্গলবারে পাঁঠা পড়ে। তিথি নক্ষত্র বুঝে লোকে হত্যে দেয়। যার যা মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বাজার পার হয়ে রাজবাড়ির রাসতলায় সাধুর আশ্রম। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় লম্বা টিকি, টিকিতে জবাফুল বাঁধা।

সাধুর চেলা কালিপদই একদিন বারান্দায় বসে বলে গেছে, ঠাইনদি সব গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানে হয়। সেই বলে গেছে বোধহয়—সাধুর কাছে যাবেন, বিধান মতো কাজ করে দেখুন, হাতে হাতে ফল পেয়ে যাবেন।

ঝুমি নিমেষের মধ্যে ঘর থেকে বের হয়ে এল। সে অস্থির হয়ে পড়ছে। মাসিকে খবরটা না দিলেই নয়।

শরদিন্দুকে বলল, এই চল ত শরা, আমার সঙ্গে—

কোথায় যাবে?

চল ত। কোথায় যাব দেখা যাবে।

মাথা ঠাণ্ডা কর ঝুমিদি। তুমি নিজের মধ্যে নেই।

মাসির বাড়ি যাব। দুদুমণির দণ্ডিকাটা বের করছি।

নীলুমাসিকে এখন কি পাবে! স্কুল আছে না। স্কুল থেকে কি ফিরেছে?

কিন্তু আজ সে মরিয়া—এই শরা, যাবি ত চল, না হয় একাই যাচ্ছি।

এই কি জামা-কাপড় পালটে নেবে না। চুলে কাঁকুই দাও। মুখখানা কি চণ্ডরূপ ধারণ করে আছে।

ঝুমির কেমন সম্বিত ফিরে এল। সে ঘরে ঢুকে শাড়ি সায়া পালটে নিল। মুখে সামান্য প্রসাধন। চুল টেনে বড় খোঁপা বাঁধল। দু-পাশে ক্লিপ এঁটে দিল। তারপর দরজা টেনে শেকল তুলে তালা লাগিয়ে দিল।

তাকে বের হতে দেখে নধর কোথা থেকে হাজির।

সঙ্গে যাবে।

কারও যেতে হবে না।

তাছাড়া খালি বাড়ি রেখে সে যেতেও পারে না। শরাকে পাঠাতে পারত, খবর দিয়ে আয় দুদুমণি দণ্ডিকাটছে। খবর পেলে মাসি নিজেও ছুটে আসতে পারে। মাসকাবারি রিকশাওয়ালাকে খবর দিলেই হল। রিকশায় চড়ে মাসি না হয় মেসো চলে আসতে পারে। কিন্তু সে একটা কিছু করতে চায়, লক্ষ্মণের গণ্ডি পার হয়ে কোথায় সেই সোনার হরিণ আজ সে দেখতে চায়।

শরাকে দিয়ে খবর পাঠালে আর দশ দিনের মতোই তার প্রতিবাদের গুরুত্ব থাকবে না। মাসি এসে বলতেই পারে—মা কি করবে! দাদারা মাথা পাতছে না। বড়দা লিখবে আমার সময় কোথায়, টাকাপয়সা যা লাগবে জানাবে। তোর মেসোই বা কি করবে—তারই বা সময় কোথায়! রাতদিন স্কুল, টিউশনি নিয়ে পড়ে থাকে।

এ-সব কথা শুনলে ঝুমির যে মাথা হেঁট হয়ে যায়।

ঝুমি বলল, এই শরা চল। দেরি করিস না। মাসিকে খবরটা এক্ষুনি দিতে হবে।

সাইকেলে? আমি তো সাইকেল আনিনি।

তোর সাইকেল না থাকলেও চলবে। তুই না হয় আমার সাইকেলের রডে বসবি।

মহাবিপদ। ঝুমিদি একা ইচ্ছে করলে যেতে পারে। কিন্তু তাকে সঙ্গে না নিয়ে যাবে না।

রডে বসে গেলে তোমার নিন্দেমন্দ হবে ঝুমিদি।

হোক। আমার নিন্দেমন্দের বাকি আছে কি? মাসিকে খবরটা দিই। না হলে সবাই আমাকে দুষবে—তুই তো বাড়ি ছিলি। সাধুর থানে কখন গেল জানিস!

তারপর থেমে বলল, বুড়ি মরবে। আমি কেন মরার ভাগী হতে যাব।

শরদিন্দুকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছে। ঝুমিদি সাইকেল চালাবে না সে চালাবে বুঝতে পারছে না। রডে কে বসবে তাও অনুমান করতে পারছে না। যেই বসুক লোকের চোখ টাটাবে।

ঝুমিদি, আমাকে না নিয়ে গেলে হয় না!

না হয় না।

এই অবেলায় বের হবে! আমাকে নিয়ে বের হলে লোকে যে কুকথা বলবে!

তুই যাবি না বকবক করবি!

শরা আর কি করে! ঝুমিদির চুলের গন্ধ পাবে রডে বসলে। এই লোভেই সে সাইকেলে চড়ে বসল। ঝুমি লাফিয়ে রডে বসে পড়ল।

কিছুটা যেতেই ঝুমির মনে হল, মাসিকে খবর দিয়েও লাভ হবে না। তার যে একটা আশ্চর্য ইচ্ছে সকাল থেকে জেগে উঠেছে। সে সব ভেঙেচুরে দিতে চায়। সে আর সত্যি পারছে না।

লাল সড়কের দিকে যাবি না। বড় সড়কের দিকে চল।

ওদিকটায় তো ফাঁকা। ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? মাসির বাড়ি যাবে না?

ঝুমি সাড়া দিচ্ছ না যে!

কি কিছু বলছ না যে!

তুই কি আমার গার্জিয়ান! নাম।

শরা ভয়ে ভয়ে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। রাস্তার লোকজন তাদের দুজনকে দেখছে। ঝুমিদি কাউকে গ্রাহ্য করছে না।

চৌধুরীমামা আড়তে যাচ্ছেন। তাকে দেখেই বলল, ঝুমি না?

ঝুমিদি কত সহজে বলে দিল, বড় সড়কে যাচ্ছি।

শরদিন্দু ঘাবড়ে গেল। ঝুমিদির মামারা জানতে পারলে তাকে লাঠিপেটা করতে পারে। এতবড় আস্পর্ধা ঝুমিকে সাইকেলের রডে বসিয়ে কলোনি ঘোরা হচ্ছে! এত সাহস হয় কি করে। অথচ ঝুমিদির আদেশ, সে অগ্রাহ্যও করতে পারে না। মহাবিপদ তার।

এই অবেলায়, সন্ধে হয়ে আসছে, সে ঝুমিদিকে রডে বসিয়ে কলোনির উপর দিয়ে গেলে বড়ই দৃষ্টিকটু দেখাবে। শোভন-অশোভন বলে কথা।

সে বলল, ঝুমিদি বাড়ি চল। মাথা গরম কোরো না। আমি না হয় মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

ঝুমি নিজে সাইকেলে চেপে বসল এবার। শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, রডে বোস। কোনও কথা না। দশ ভাতারের খোঁজে যাচ্ছি। এক ভাতার দিয়ে আমার পেট ভরবে না। বুঝতে চেষ্টা কর।

ঝুমিদি এত খারাপ কথা কখনোই বলে না। ভিতরে চণ্ডরাগ হলে মানুষের সব গোলমাল হয়ে যায়, তার দিদিটিরও তাই হয়েছে—কি সুন্দর স্বভাব—আর সেই কিনা বলছে দশ ভাতারের খোঁজে আছি। তার বড় অচেনা এই ঝুমিদি। দুদুমণি দণ্ডিকাটতে না গেলেই পারত। এমন সুন্দর মেয়ের বর জুটছে না ভাবতেও খারাপ লাগে। দুদুমণিও বোকা আছে—ঘরের কথা কাউকে বলে!

কিন্তু ঝুমিদি যে বলল, গাছের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। সব কিছুই তার কাছে বড় রহস্যজনক ঠেকছে।

ঝুমি কলোনির উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। শরদিন্দু রডে বসে আছে। তাকে কলোনির সবাই চেনে—কুমুদ মজুমদারের নাতনি, পায়ে খুঁত আছে বলে কেউ পছন্দ করছে না। স্কুলের মাঠ পার হয়ে তেলিপাড়ার মোড়ে আসতেই শরদিন্দু বলল, একটু থাম। মাসিকে খবরটা দিয়ে আসছি।

না, কোনও খবর দিতে হবে না।

ঝুমি সোজা বড় সড়কের দিকে উঠে গেল। তারপর সাইকেল থেকে নেমে কিছুটা ঝোপের মধ্যে যেন হেঁটে গেল। শরদিন্দু সাইকেল নিয়ে তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে।

শেষে না পেরে শরদিন্দু বলল, তোমার কি হয়েছে আজ বল তো!

এই যে জায়গাটা দেখছিস দাদুমণি আমার নামে দিয়ে গেছে। এখানটায় কিছু একটা করতে চাই। এই একটা চায়ের দোকান টোকান—সে যাই হোক কিছু করা যাবে। বাসস্ট্যাণ্ড, সারের গুদাম, সরকারি কোয়ার্টার কত কিছু হচ্ছে। রাস্তার ধারে এই জমিটায় তুই আমি মিলে যদি কিছু গড়ে তুলি কেমন হয়। এক ভাতারের হাত থেকে তো আপাতত বাঁচি।

আত্মগ্লানিতে ডুবে যেতে যেতে সে ফের বলল, দশ ভাতারি হয়ে বেঁচে থাকাও অনেক গৌরবের। চা-এর নেশার চেয়ে মানুষের নেশা নাকি আমার প্রতি বেশী। দেখি না দোকান করে। জলে ডুবে যাচ্ছি, তুই না হয় আমার খড়কুটো হয়েই থাক। কি পারবি, রাজি! ঝুমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগল।

তোমার কোন্ কথাটা আমি রাখিনি—কিন্তু তোমার গাছটা রাগ করবে না?

ঝুমি হা হা করে হাসল। গাছ! গাছই বটে। তুই রাজি আছিস কি না বল।

বললে যে কবে, গাছের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে।

বোকা কোথাকার। গাছ কখনও রাগ করে! না সে রাগ করতে জানে! তুই রাজি থাকলে গাছটা মাটিতে লেগে যাবে মনে হয়।

তখন সারা আকাশ ম্লান অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে সহসা রূপালি বন্যায় ভেসে গেল। আবিষ্কারের মতো মনে হল—গাছটা যদি লেগে যায়। জীবনে সামান্য সূর্যালোক। এইটুকুই ঝুমির আজ বড় বেশী দরকার। জমিটায় সে হাঁটুমুড়ে বসল। জমিটা তার নিজের, নিজস্ব। চা-এর দোকান, ভিডিও হল, মানুষজন, ভিড় এবং ব্যস্ততা—তার স্বপ্ন। শরদিন্দু পাশে না থাকলে সে যেন এই স্বপ্নটুকু খুঁজে পেত না।

ঝুমিদি ওঠো। দুটো-একটা তারা ফুটছে। চল মাসির বাড়ি হয়ে যাই।

তুই বোস আমার পাশে। আমার কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করছে না। ঘাস থেকে দুটো-একটা ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজে দিতে থাকল ঝুমি।

শরদিন্দু কেন যে ভাবল, এইসময়, কথাখানা বলার সময়।

ঝুমিদি তার সঙ্গে একা বের হয়েছে। ঝুমিদি তাকে বিশ্বাস করে। সাহস ক্রমে আক্রমক হতে হতে সেও পাশে বসে পড়ল। ঝুমিদি কিছুটা বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সে বুঝল, এই মুহূর্ত—কথাখান বললে ঝুমিদি রাগ করবে না।

ঝুমিদি।

বল।

কথাখান তো শুনলে না।

না বললে শুনব কি করে।

রাগ করবে না তো!

ঝুমি বলল, আমার আর কারও উপর রাগ নেই।

রাতুল এটা তোমাকে দিয়েছে।

সে পকেট থেকে কি বের করে ঘাসের উপর রাখল।

এটা কি?

ওর কাপড়ের সাইডব্যাগ। তুমি বলেছিল, রেশমি সুতোয় দুটো সাদা ফুল এঁকে দিলে রাতুলের সম্ভ্রম বাড়ে। কতকাল থেকে তোমার ইচ্ছের স্মৃতি হয়ে আছে নীল রঙের ব্যাগটা। সে বলেছে, কোনওদিন এখান থেকে বদলি হয়ে যাবে—যদি দাও।

মানুষ সহসা কেন এত আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে ঝুমি বোঝে না। তার ভিতরেও কোনও মহামূল্য মণিকাঞ্চনের মতো একদিনের সেই স্মৃতি উথালপাতাল হতে থাকলে বলল, রাতুলকে আসতে বলিস। ভেবেছিলাম ও বোধহয় আমার কথা ভুলেই গেছে।

আট

ঝুমির দোকানঘরটার কাজ শেষপর্যন্ত শুরু হয়ে গেল। চার কোনায় চারটে বাঁশের খুঁটি, দরমার বেড়া এবং মাটি ফেলে ভিত কিছুটা উঁচু করা হবে। মাথার উপর আপাতত খড়ের চাল, হেরম্বদাদু নিজেই সব দায়িত্ব নিয়ে ঘরটা তুলছে।

অঞ্চলের পাকা ঘরামি হেরম্ব। ঝুমির দাদুমণি ওকে কিছু জায়গাও দিয়ে গেছেন।

এক সকালে ঝুমি নিজেই সাইকেল চালিয়ে হেরম্বদাদুর বাড়ি চলে গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় দাদুমণির এক সময় বেশ বড় একটা ফলের বাগানে হেরম্বদাদু থাকত। বাগান পাহারা দিত। তারপর যা হয়, বাগানের এক লপ্তে কিছু জমি, দেশ থেকে লোকজন এসে থাকে কোথায়। দাদু বলেছিলেন, বাগানেরই এক লপ্তে থেকে যা। কোথায় আর যাবি। সেই থেকে বাড়িঘর করে আছে।

কর্তার এই উপকারের কথা এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে হেরম্ব। তাঁর নাতনি নিজে আশায় তার দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে গেছিল। খড়ের চাল, দরমার বেড়া ঠিক, তবে তাতে হেরম্বদাদুর নানা কারুকার্য থাকবে। ঝাঁপের দরজা—দরজাতে বাঁশ বেত দিয়ে নানা কারুকার্য করারও ইচ্ছে আছে। দরমার বেড়াতেও বেতের কাজ—ঘরটাকে দেখলে লোকে একদণ্ড দাঁড়িয়ে যাবেই। ঝুমিদিদির চায়ের দোকান হবে, লোকজন এসে বসতে পারে তার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে দুটো বেঞ্চিও তৈরি করে দিতে হবে।

তবে প্রথম দিকটায় হেরম্বর ইতস্তত ভাব যে ছিল না তা বলা যায় না।

কি বলছেন ঝুমিদি, আপনি দোকান করবেন, মামারা আপনার রাজি হবে?

হবে। আপনি করে দিন না।

তাতেও মন সায় দেয়নি। হেরম্ব ছুটে গেছে ব্রজসুন্দরীর কাছে। ঠাইনদি কি বলে!

ঠাইনদি কি আর মাথা পাতে।

তার সোজা কথা, আমি কিছু জানি না হেরম্ব, যা খুশি করুক। তুই সোমত্ত মেয়ে, চৌমাথা জায়গাটা ভাল না। ওর বড়মামাকে চিঠি লিখে দিয়েছি। আসুক, তারপর ঠিক হবে ঘর উঠবে কি বরের ঘরে যাবে।

চিঠিটা ঝুমি হাতিয়ে নিয়েছে। সে তার বড়মামাকে লেখা অনেক চিঠিই আজকাল গায়েব করে দেয়। ডাকবাক্সে না ফেলে চিঠিটা পড়ে কুটি কুটি করে উড়িয়ে দেয় হাওয়ায়। চিঠিতে কি লেখা তাও জানে। অনাবশ্যক চিঠি, বড়মামা ব্যস্ত মানুষ—তাঁকে অকারণ বিব্রত করা।

লিখেছে, খোকা, ঝুমি আমার মাথা খারাপ না করে ছাড়বে না। আমি যে পাগল হয়ে যাইনি, সে তোমাদের সাত পুরুষের ভাগ্য। বিয়ের নাম শুনলেই বাড়ি থেকে এক বস্ত্রে পালাতে চায়। এত জোর কোথায় পায় সে বুঝি না। তার এক কথা। ওর নামে তোমার পিতৃদেবের দেওয়া দশ কাঠা জমিতে চায়ের দোকান দেবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে। হেরম্বকে গিয়ে ধরেছে, ঘর তুলে দিতে, আমি বারণ করে দিয়েছি। তবে আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। সাপের পাঁচ পা দেখেছে ঝুমি। পাগলা শরা তাল দিচ্ছে। দিন নেই রাত নেই কৃত্তিবাসের বেটা আমার বাঁশঝাড় সাফ করে দিচ্ছে। ঝুমির সঙ্গে আমার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ।

তারপর লিখেছে—বাঁশ কেটে শরা কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে টানতে টানতে। বাধা দেবার কেউ নেই। দিন নেই, রাত নেই শরদিন্দুর উৎপাত। সঙ্গে আর একটা দামড়া জুটেছে। এক রবিবারে সেও হাজির। ঝুমিকে পটাতে চায়। কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। কে না কে, আমি যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না। ঝুমি বলছে, শরার বন্ধু। পাগলের বন্ধু থাকে বলেও জানি না। আরও যে কত কিছু দেখতে হবে আমাকে। সারাদিন ঝুমি এক দণ্ডের জন্য বাড়ি থাকে না। বাঁশ নিয়েও অশান্তি কম না। কার বাঁশ কে কাটে। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুমকি দিয়েছে, ঝুমি কার বাঁশ কাটছে। কে তাকে এত আসকারা দেয়। রাস্তায় মুখ দেখাতে পারি না। আর তুমি কতকাল চোখ বন্ধ করে থাকবে!

আমি কি করব এখন বলে দাও। শরীরের পোকা মাথায় উঠে গেছে, যে করে হোক বিদায় করার ব্যবস্থা না করলে বংশের মুখে চুনকালি দিয়ে ভাগবে। বংশের মান মর্যাদা যেতে বসেছে। যা হয় কিছু একটা বিধান কর। এদিকে সাবুর শ্যালক একটি ভাল সমন্দ এনেছে। পাত্র বি এ পাস—সোজা কথা! তবে বি এ পাস যখন, বলেছি খোকা ঠিক কোনও একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারবে। বেকার বলে বসে নেই। জ্যেঠার আশ্রয়ে থাকে। নলহাটি থেকে আট ক্রোশ ভিতরে—রাইপুরার চাটুজ্যে বংশের ছেলে। চোলাই মদের ক্যারিং লাইসেন্স আছে। ওতে শুনেছি অনেক পয়সা। পাত্রটি দেখতেও মন্দ না। রোগা, ফর্সা—আর কিছুটা লক্ষ্মী ট্যারা। দোষের মধ্যে এটাই গণ্য করতে পার। দেখি ভগবান কি করেন!

ক্যারিং লাইসেন্স কি তাও মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না। সাবুকে বলতেই বিশদ জানিয়েছে। যেমন জানিয়েছে, তাই লিখে দিচ্ছি। সাইকেলে এক ঠেক থেকে আর এক ঠেকে চোলাই মদ নিয়ে যেতে হলেও

লাইসেন্স থাকতে হয়। তার তা আছে—এক ঠেক থেকে আর ঠেকে চোলাই মদ পৌঁছে দিলেই পয়সা—এত পয়সা যে খায় কে! জিজ্ঞেস করলাম, শুধু কি ক্যারিং করে, খায় না তো। এক বাক্যে বলল, অসম্ভব। চাটুজ্যে বংশের ধাতই আলাদা। খাওয়ার ধারে কাছে থাকে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ঠাইনদি। দাবিদাওয়া একটু বেশী এই যা—চোখ বুজে সমন্দ করতে পারেন।

শুধু ক্যারিং করে, খায় না তো, পড়তে গিয়ে ঝুমির হো হো করে হাসি। দুদুমণি পারেও। ব্রজসুন্দরী কাকে ধরে লিখিয়ে এনে শরদিন্দুকে দিয়েছিল ডাকবাক্সে ফেলে দিতে। সে শরদিন্দুর কাছ থেকে চিঠিটা হাতিয়ে নিয়েছে।

শোন শরদিন্দু।

বলো।

চিঠিটা আমার কাছে থাকল। আমি পোস্ট করে দেব। দুদুমণি কিছু বললে বলবি, ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছিস।

ঠাইনদি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। এদিকে আসতে পারছেন না। ওদিকের বারান্দা থেকেই কথা বললেন, এই শরা দাঁড়িয়ে থাকলি কেন চলে যা। কার সঙ্গে কথা বলছিস।

ঝুমিদির সঙ্গে।

এত কি কথা তার সঙ্গে। বাড়ি যা। তোর মা চিন্তা করবে। কোথায় যাস, কোথায় থাকিস, এখন তো ঝুমিদি তোর ঘাড়ে চেপেছে। বাঁশ কেটে নিয়ে যাচ্ছিস। খোকা আসুক, সব যদি না বলি, তোকে ধরে ঠ্যাঙালে বুঝবি। খোকা কাউকে ছেড়ে দেবার পাত্র না।

ঝুমি চোখ টিপে শরদিন্দুকে চলে যেতে বলল।

আমি গেলাম ঠাইনদি।

যেতে গিয়ে আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলিস না। বাপের তো তোর কম নেই। ঝুমির বেগার খাটতে তোর লজ্জা হয় না। সবাই মিলে তোরা ঝুমির মাথা খাচ্ছিস।

শরা চলে গেলে ঝুমি রক্ষা পায়। চিঠিটা সে আগেই ব্লাউজের ভিতর চালান করে দিয়েছিল। চিঠিটা তার পড়াও হয়ে গেছে। চিঠিতে ক্যারিং করে—ক্যারিং করা তোমার বের করছি। শরদিন্দু চলে গেলে সেও এক ফাঁকে সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। যাবার সময় শুধু ব্রজসুন্দরীকে বলল, আমি এক্ষুনি আসছি। আসছি মানে! দুপুর রোদে টো টো করতে বের হলি। না শরা তোকে নিয়ে যাচ্ছে। পাগলের সঙ্গে ঘুরলে লোকে তোকেও পাগল ভাববে। আসুক খোকা, তোর কত পাখা গজিয়েছে দেখব। রোদে ঘুরে ঘুরে গায়ে ছোপ পড়ে গেছে আয়নায় দেখতে পাস না! সব লিখে দিয়েছি। তোর গুণকীর্তনের কথা একটাও বাদ দিইনি। দোকান করবে। লোক হাসাবে। বারোভাতারি হবে। সব বের করছি।

একবার মোড়ের মাথায় গিয়ে দেখলে হয় হেরম্বদাদুর কাজ কতটা এগিয়েছে। রাতুল এসে সেদিন কত কথা বলে গেল। জায়গাটা দেখে খুবই খুশি। সরকারের নানা পরিকল্পনা আছে জায়গাটা নিয়ে। রাস্তার দু-পাশে মেলা খাসজমি। শহরের বাসস্ট্যাণ্ড নাকি এদিকটায় নিয়ে আসা হবে। দূরপাল্লার বাস শহরে ঢুকতে দেবে না। এই রাস্তার সঙ্গে আরও রাস্তা জুড়ে বাস সব এদিকটায় ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সরকারি দপ্তরে কাজ করে বলে, তার পক্ষে সবই জানা সম্ভব। তবে রাতুলের কোন্ দপ্তরে কি কাজ—সে কিছুই জানে না। সরকারি দপ্তর সম্পর্কে তার সম্যক ধারণাও নেই।

রাতুল খুব কম কথা বলে। ধীরে সুস্থে কথা বলে। বারান্দার চেয়ারে বসেছিল কিছুক্ষণ। পাটভাঙ্গা পাজামা, গিরি রঙের পাঞ্জাবি পরে শরদিন্দুর সঙ্গে সাইকেলে চলে এসেছিল। নতুন ঝকঝকে সাইকেল। কাঁধে সাদা রঙের কাপড়ের সাইডব্যাগ। বাড়িতে সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে দেখে শিশুর মতো খুশি। গালে আগেকার কবি কবি দাড়ি অবশ্য নেই। চুল কোঁকড়ানো, কথা না বললে এত গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয় যে, রাতুলকে বিন্দুমাত্র কাছের মানুষ মনে হয় না।

সেই বলেছিল, চল ঝুমিদি তোমার স্বপ্ন দেখে আসি। কোথায় সেই স্বপ্ন—

ওরা তিনজনই একসঙ্গে বের হয়েছিল। যেতে যেতে বলেছিল, জায়গাটা সত্যি সুন্দর। এত গাছপালা, উদাস করা মাঠ, দিগন্ত জুড়ে ধানের জমি, সরকার এদিকটায় বাসস্ট্যাণ্ড করলে জায়গাটা বড় ঘিঞ্জি হয়ে যাবে।

বা বা, ভিডিও পার্লারও আছে দেখছি। এস ঝুমিদি একটু চা খাওয়া যাক।

সেই প্রথম ঝুমি যেন সায় দিয়ে একটা ত্রিপল ঢাকা চা-এর দোকানে সহজেই বসে যেতে পেরেছিল। রাতুলের দিকে কেন জানি সোজাসুজি তাকাতেও পারছিল না। বরং রাতুল শরদিন্দুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে, সে তাকে চুরি করে দেখেছে। নাক মুখ সব এত নিখুঁত হয় কি করে তাও সে বোঝে না। রাতুলের নীল রঙের ব্যাগটা তার কাছে আগের মতোই পড়ে আছে। ব্যাগ সম্পর্কে সে কোনোই প্রশ্ন করেনি।

তারপর সে তার দশ কাঠা জমিতে নিয়ে গেলে রাতুল চারপাশটা দেখতে দেখতে বলেছিল আট দশ বছরে জায়গাটার অনেক দাম হয়ে যাবে। কিছুই তো নেই দেখছি। অথচ কত কিছু করা যেতে পারে। এটাই শহরের আর একটা উপনগরী হয়ে যাবে ঝুমিদি। এখানে ওষুধের দোকান, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস সাপ্লাইয়ের দোকান করলেও খুব চলবে। ওদিকের পাটের আড়তগুলিও দেখবে এদিকটায় সরে আসবে। হাটতলার রমরমা আর থাকবে না। ঠিক জায়গাই পছন্দ করেছ। জায়গাটা নিয়ে সত্যি স্বপ্ন দেখা চলে।

রাতুলের কথা ঝুমি শুনছিল বড় নিবিষ্ট মনে। সব কথাগুলি এত গুরুত্ব দিয়ে বলেছে যে সে আর একটাও কথা বলেনি। তারপর শরদিন্দুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ঝুমিদিকে নিয়ে একদিন আমার বাসায় যাস। একা থাকি, তোরা গেলে ভাল লাগবে।

'একা থাকি, তোরা গেলে ভাল লাগবে'—শুনে ঝুমি কিছুটা বিমূঢ়। রাতুল সব সময় সবার পেছনে সাইকেল নিয়ে হেঁটেছে। পায়ের চটি রাতুলের বড়ই যেন কোমল। ফর্সা পায়ের গোড়ালি—লম্বা পায়ের পাতা, শরীরের সঙ্গে সবকিছু এত মানিয়ে গেছে যে ঘাসের ভিতর পা ডুবে গেলে মনে হচ্ছে, এই ঘাসে সে তার শরীরের স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। তারপরই কেমন নিজের ওপর সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, সে সাধারণ মেয়ে, তার স্বপ্ন ব্রজসুন্দরী টি স্টল পর্যন্ত। সে তার চায়ের দোকানের নামও ঠিক করে ফেলেছে। যদি স্বপ্ন সফল হয়, সবকিছুই ব্রজসুন্দরীর নামে হবে।

সে সবার পিছনে। রাতুল আগে, সাইকেল নিয়ে তারা বড় রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুতেই সে রাতুলের সামনে হাঁটতে চায় না। পায়ের খুঁত থেকে শরীরের পেছনটা বাড়াবাড়ি রকমের ভারি দেখায়। তার কেমন শীত শীত করছিল। শাড়ি দিয়ে সে তার শরীর ভাল রকমে জড়িয়ে নেবার সময় দেখল রাতুল বড় রাস্তায় উঠে গেছে।

রাতুল বলেছিল, কি ব্যাপার, এত পেছনে পড়ে গেলে। সে, শরদিন্দু দু'জনেই তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে যেতেই রাতুল বলেছিল, যাই ঝুমিদি, পারলে একবার যাবে।

সাইকেলে উঠে সে চলে যাচ্ছিল। ঝুমি তাকিয়ে আছে। গ্রীষ্মের রৌদ্রছায়ায় তাকে চলে যেতে দেখছে। সূর্যাস্তের মুখে এই চলে যাওয়া কিছুক্ষণ ছবি হয়ে থাকল তার চোখের সামনে। শরদিন্দু না ডাকলে যেন তার সম্বিত ফিরত না।

সাইকেলে সে এদিকটায় এসেছে, ব্রজসুন্দরীর চিঠিটা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে বলে। কিন্তু তার কিছুই মনে নেই—কি যে হয়েছে আজকাল, সে হাঁটলে রাতুল পাশে হাঁটে। সে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে রাতুল তার পাশে দাঁড়ায়। রাতে বিছানায় শুলেও মনে হয় কোনও সুন্দর যুবক তার পাশে শুয়ে আছে। রাতুল একা, তার কে আছে সে জানে না বলেই, শরদিন্দুর কাছে খোঁজখবর নিয়েছে। ওর মা নেই। বাবার দ্বিতীয় পক্ষ। তাকে তার বাবা হোস্টেলে রেখে পড়িয়েছে। জেলা স্কুলে এবং কলেজে পড়েছে। তারপর কোনও খবর ছিল না—এই সেদিন চাকরি সূত্রে আবার এখানেই চলে এসেছে। চিঠিটা ব্লাউজের ফাঁক থেকে বের করার সময়ই দেখল, চৌধুরীদাদু স্কুল থেকে ফিরে আসছেন। এই সময় এখানে ঝুমি, ভাবতেই পারেন, নির্জন দুপুরে, জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কেন! তিনিই সব শুনে সেদিন ব্রজসুন্দরীকে বলে এসেছিলেন, মেয়েদের সাবলম্বী হওয়া দরকার ঠাইরেন। কোথায় কোন্ মুল্লুকে কাজ করতেন, সেকালের বি-এ পাস। ঝুমি চৌধুরীদাদুর কাছে কিছুদিন পড়েছেও। তার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কম এটা চৌধুরীদাদুই প্রথম টের পান। দাদুমণি তখন বেঁচে।

দেখা হলেই দাদুকে বলতেন, ঝুমির পড়ায় মন নেই কুমুদদা। ঠাকুরের বাসন-কোসন ধুয়ে রাখলেই চলবে, পূজায় ফুল তুললে চলবে! বাড়িঘরের শোভা হয়ে থাকলে চলবে! ওর তো দেখছি কিছুই মনে

থাকে না। স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। ছেলেদের হাইস্কুলের দুটো ঘর চেয়ে নিয়েছি। রুটিনমাফিক ক্লাশও হচ্ছে। সরকার থেকে অনুমতিও মিলে যাবে। আর কিছু না করুক রোজ স্কুলে গেলে পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে পারে।

সে নির্জন দুপুরে একাকী দাঁড়িয়ে কত কিছু যে ভাবছে।

দাদুমণি মরে গেলেন, মামারা পৃথগন্ন হয়ে গেল। ব্রজসুন্দরীর চোপা দিন দিন আরও খরতর হয়ে উঠল।

সে চিঠিটা ছিঁড়তে পারল না।

বাড়ি ফিরে আজ টিউকলের জলে স্নান করল।

এক পাতে খেতে বসলেই দুদুমণির সব রাগ জল।

চিঠিটা যে পোস্ট করা হয়নি। ব্রজসুন্দরী জানতেই পারল না।

পরদিন সকালে হেরম্বদাদুর কাছেই খবরটা পেল।

শুনছেন ঝুমিদিদি, আপনার বড়মামা আসছেন।

আসুক না।

ঠাইনদি চিঠি দিয়েছে। আপনার দোকান আর হল না।

ঝুমি বলল, হবে।

বড়মামাকেই একমাত্র সমীহ করে ঝুমিদিদি। তিনি যদি এসে অরাজি হয়ে যান ঝুমিদিদির কিছু করার থাকবে না হেরম্ব ভালই জানে। ঘরটা তুলে দিচ্ছে বলে দোষের ভাগী সেও হতে পারে!

ঝুমি হেরম্বকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, তুমিও যেমন দাদু! চিঠি পেলেই হুট করে চলে আসবেন, ভাবলে কি করে! তিনি কত ব্যস্ত মানুষ জান? সেই ফাঁকে ঘরটা উঠে যাবে। ঝুমি চিঠিটা যে শরদিন্দুর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করল না।

ঝুমি বলল, দোকান চালু হয়ে গেলে মনে হয় আর কিছু বলবেন না।

তা অবশ্য ঠিক।

ধর চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলল, ফেললেই তো উড়ে যাবে না চিঠি। সঙ্গে সঙ্গে মামার হাতে গিয়েও পড়বে না। যতই তাড়াতাড়ি যাক, আট-দশ দিন আগে চিঠি কিছুতেই পাবেন না। তারপর ডাকের গণ্ডগোল তো আছেই। ক'টা চিঠি ক'টা লোক ঠিকমতো পায় বল।

তা অবশ্য ঠিক।

আসলে চিঠিই যে যায়নি, কিছুতেই বলতে পারে না হেরম্বদাদুকে। বড়মামা জানতেই পারবেন না, সে হেরম্বদাদুকে দিয়ে ঘর তুলছে—ঘর উঠতে উঠতে খবর পৌঁছে গেলেও সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকবে না। মামা চিঠি লিখে জানাবেন—তা মাসখানেক লেগে যাবে—না ঝুমি, কাজটা তুই ঠিক করিসনি। দিনরাত ট্রাক বাসের ভিড়, ট্রাক ড্রাইভাররা লোক ভাল হয় না—নেশা ভাঙটাঙ করে। ভিডিও পার্লার টার্লার গজিয়ে উঠছে শুনছি, মানুষজনের ভিড় বাড়ছে—একা এমন একটা জায়গায় তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। ফিরতে ফিরতে রাত হবে। রাস্তায় একা ফিরলেও কথা উঠতে পারে। আত্মীয়-স্বজনেরা ভাল চোখে দেখবে না।

আসলে বড়মামা যদি খবরটা পেয়েই যান, যেতেই পারেন, সে তো কেবল দুদুমণির চিঠি গায়েব করেছে, কিন্তু মেজমামা ছোটমামা যে বসে থাকবে না, ঠিক বড়মামাকে নালিশ জানিয়ে আসবে—খবর রাখেন বড়দা?

কিসের খবর?

ঝুমি কারও কথা শুনছে না। বাড়াবাড়ি করছে।

খরবটা কি বলবি তো!

মোড়ের মাথায় আমাদের জমিতে ঝুমি চায়ের দোকান তুলছে। বাঁশঝাড় সাফ। আজকাল মুখে মুখে তক্ক করতে শিখে গেছে। কিছু বলা যায় না। বললেই ওর কি পাকা পাকা কথা।

এটা কি খারাপ কাজ ঝুমি না ভেবে পারে না।

আমি কি নষ্ট হয়ে যাব ভাবছে!

খারাপ ভাল যার যার নিজের। কেউ কি কাউকে খারাপ করতে পারে! ঘরে বসে থাকলেই কি স্বভাব ভাল হয়। স্বভাব মন্দ হলে ঘরে বসে থাকলেও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কি বল হেরম্বদাদু?

আসলে ঝুমি তার জমিতে এসে দেখছে হেরম্বদাদু খুঁটি পুঁতছে। হেরম্বদাদুর সঙ্গে কথা বলছে, কখনও নিজের সঙ্গে কথা বলছে। বাঁশের খুঁটি পচে না যায়, গোড়ায় আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা যে তার স্বপ্ন হেরম্বদাদু, রাতুল, শরদিন্দু ছাড়া কেউ বুঝতে চায় না। নিজের একটা স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা। স্থায়ী উপার্জন ছাড়াও আছে নিজের বিশ্বাসকে খুঁজে পাওয়া। এটা যে কত বড় মুক্তি ব্রজসুন্দরী বোঝে না। নিজের উপর নিজের এই আস্থা খুঁজে পাওয়ার মধ্যে কত বড় জয় আছে সে কি করে বোঝায়।

মজুমদার বাড়ির মেয়ে বলেই তার এ-কাজ শোভা পায় না। এটা একটা কথা হল। মেয়েরা তো এখন সব কাজ করছে। গীতাদি মোটরসাইকেল চালিয়ে ট্রেজারি অফিসে যায়। নীলুমাসি তার হাইস্কুলের টিচার। তার বন্ধুরাও কেউ কেউ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা—কোনও মেয়েই আজকাল বসে থাকতে চায় না। কিছু নিয়ে লেগে না পড়লে শেকড়ের খোঁজও পাওয়া যায় না। সে কিছু পাস না, তাকে কে চাকরি দেবে!

তবে দিনকাল ভাল না।

দুদুমণির আপত্তির কারণ সে বোঝে।

মোড়ে কিছু সমাজবিরোধীর আড্ডাও আছে। পাটের আড়তের অনেককে সে চেনে। তাকে দেখলে তারা শ্রদ্ধাভক্তিও দেখায়। এরা সব দাদুমণির যজমান ছিল একসময়। পূজা-আর্চায় বের হলে কুমুদ মজুমদার তাকে সঙ্গে নিতেন। সে দাদুর লাঠি এমনও বলত অনেকে। এখন সে বড় হয়ে গেছে ঠিক—তবু পাটের আড়তের মালিকরা আছে না। বিপদে-আপদে তারা ঠিক দেখবে। এই ভরসাও তার কম না।

হেরম্বদাদু, ঘর কিন্তু পূর্বমুখী হবে।

সেই মতোই কাজ হচ্ছে।

পেছনটায় জায়গা খালি রাখতে হবে।

তাও তো থাকল।

রাস্তার ঠিক ওপরে হবে না।

ওপরে কোথায়! অনেকটা ভেতরে।

দেখবেন জায়াগা যেন একফোঁটা নষ্ট না হয়।

শরদিন্দু দু'জন মুনিষকে নিয়ে গেছে আরও বাঁশ কাটতে। জমিতে বাঁশের ডাঁই হয়ে আছে। দরমার বেড়া না দিয়ে মোটা বাঁশের বেড়া করারই ইচ্ছে তার।

তখনই এক আশ্চর্য ছবি দেখতে পায় ঝুমি। সারবন্দী ট্রাক, বাস, সার গুদাম, কোল্ড স্টোরেজ, সরকারি অফিস—জায়গাটার চারপাশে একফোঁটা আর জমি ফাঁকা পড়ে থাকবে না। দূরপাল্লার বাস ধরতে এসে মানুষজন গিজগিজ করতে থাকবে। খেতে চাইবে। শুধু চা বিস্কুটে পেট ভরবে কেন, টাকা পয়সা হলে, পাশে ঘর তুলে ছোট একটা পাইস হোটেলও করে ফেলতে পারবে। অবশ্য শরদিন্দু সাহস না দিলে হত না।

ঝুমিদি তুমি লেগে যাও, আমিও আছি। রাতুলও বলেছে, জায়গাটার দাম বাড়বে। জায়গাটা ভারি সুন্দর চয়েস করেছ।

এরা তার স্বপ্নের দোসর। এরা তাকে সাহস যোগাচ্ছে।

তখন শরদিন্দু সাইকেলে ঢুকে গেল জমিটাতে।

ঝুমিদি একটা ভুল হয়ে গেল। বড় টিন দরকার হবে। বড় টিন না হলে বিস্কুট রাখবে কোথায়! বাঁশ কাটতে গিয়ে মনে পড়ল। তোমার নোটবুকে টুকে রাখো। ঠাকুর রাখার তাক করতে হবে। হেরম্বদাদু এদিকটায় উনুন থাকবে। কাঠের পাটাতন থাকবে। ঝুমিদির জন্য একটা মাচান করে দিও। ঝুমিদি সেখানটায় বসবে। একটা চেয়ার রাখতে হবে, না হলে বড়মামা এসে বসবেন কোথায়।

শরা এদিকে আয়, দড়িটা ধর। মেপে দেখতে হবে, কতটা জায়গা পড়ে থাকল। সামনের কিছুটা জায়গায় ফুলের গাছ লাগানো হবে, মৌরসুমি ফলের জন্যও বেড করা হবে। দশ কাঠা জায়গা কম না? পাকা সড়কের চারমাথায় বলে জায়গাটার প্রতি লোভও কম না দালালদের। বড়মামার কাছে জায়গাটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্যও কম চিঠি যায়নি।

বড়মামার এক কথা, না বিক্রি করা যাবে না।

কেন, অসুবিধা কোথায়?

নাবালিকার সম্পত্তি।

তা বিক্রি করে টাকা পয়সা যা লাগে নিন। ধুমধাম করে ঝুমির বিয়ে দিন।

সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে কেন, আমরা কি বেঁচে নেই!

ঝুমির কানে সব কথাই উঠত। ব্রজসুন্দরীই বলতেন, খোকা রাজি না। বাসবঠাকুর জমিটা কেনার জন্য এক পায়ে খাড়া। খোকা সোজা না করে দিয়েছে।

কেউ বলেছিল, জমির এত ভাল দাম কেউ দেবে না দাদা। টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিন, সুদে আসলে দিন দিন বাড়বে।

বড়মামা তাতেও রাজি হননি।

ব্যাঙ্কে রাখলে সুদে আসলে বাড়ে ঠিক, তবে জমিতে রাখলে আরও বেশী বাড়ে।

বড়মামার বিচক্ষণ চিন্তা ভাবনাই জমিটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। সেই দূরদর্শী বড়মামা যদি এসে বলেন, তাই বলে চা-এর দোকান, তুই ঝুমি কি করে ভাবলি এটা। মাথায় তোর এমন কুবুদ্ধি কে দিয়েছে। তাহলেই সর্বনাশ। সে আর এক পাও এগোতে পারবে না। বড় উৎকণ্ঠায় আছে, সত্যি বড়মামার কাছে খবর গেলে কি না জানি হবে!

শরা একটা বাঁশের খুঁটি আলগা করে তুলে রেখেছে। গর্তটা ঠিক হয়নি। আরও কিছুটা মাটি তুলতে হবে। হেরম্ব খোনতা দিয়ে গর্তের ভেতর মাটি খুঁড়ছে আর তুলছে। তারপর বোধহয় পরিমাণমতো গর্ত হয়ে যাওয়ায় হেরম্ব বাঁশটাকে গর্তে ঢুকিয়ে দিল।

শরার মুখ এত কাজের মধ্যেও কামাই যায় না।

ঝুমিদি, বাক্যালাপ কি শুরু হয়েছে?

না।

কবে হবে মনে হয়?

বড়মামা এলে একটা ফয়সালা করে বাক্যালাপ শুরু করবে মনে হয়।

কবে আসবে?

আমি কি করে জানব?

এলে গোলামাল পাকাতে পারেন। তোমার বড়মামা কিছুতেই রাজি হবেন না। ঠাইনদি জান, আমাকে দেখলেই তেড়ে আসে—তুই যত নষ্টের গোড়া। লোক ক্ষ্যাপাবার তালে আছিস। বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব কি না হত, তুই ঝুমিকে লেলিয়ে দিলি! রোদে ঘোরাঘুরি করে হাড়মাস কালি হয়ে গেল। আর বিয়ে হবে? কি আক্ষেপ।

তুই কিছু বললি?

কি বলব?

বলতে পারতিস ঝুমিদি আমার কথায় চলবে—তা হলেই হয়েছে।

বিশ্বাসই করবে না। আমি নাকি সেই কবে থেকে তোমার পেছনে জোঁকের মতো লেগে আছি।

আছিসই তো। ব্রজসুন্দরী মিছে কথা বলেনি। এত করে বলি, যখন দেখছিস খেপে যাচ্ছে, বাড়িতে না এলেই পারিস। বেহায়ার মতো আসা চাই। মনে করিস না তুই না থাকলে ঝুমিদির দোকান চলবে না!

এটা তো বড় রাগের কথা হল ঝুমিদি। কখনও বলেছি আমি না থাকলে তোমার দোকান চলবে না। বাড়িতে একদম ভাল লাগে না, নানা জায়গায় ঘুরি, মাথায় আমার পোকা আছে ভাবে—বাবা তো বলেই ফেলল, ঝুমি ঠাকরুনের কাছে পড়ে না থেকে আড়তে বসে যা। সব বুঝে নে। আমি আর কদ্দিন।

কৃত্তিবাসদাদু তো মিছে কথা বলেনি। দামড়া হয়ে তো গেছিস কবে—টেরই পাস না। তোর বাবাকে বল, একটা বিয়ে দিতে। তুই না পারিস, ব্রজসুন্দরীকে পাঠিয়ে দেব।

কেন তুমি যাও না। তুমি গেলেও খুশি হবে। তোমার ঘর নিয়ে মেতে আছি দেখে বাবা একদম নিশ্চিন্ত। যাক শরার কাজে মন বসেছে। কাজের নেশা কি বুঝতে শিখছে। তবে মুশকিল কি জান! রোজই মনে হয় সকালে তোমার খোঁজ করতে গিয়ে দেখব, বড়মামা বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন—তিনি হাজির। ভাবলেই হাত-পা অবশ হয়ে যায়। কি রাশভারি আর চাপা স্বভাবের মানুষ! হুকুম করলেই হল, যে-হাতে খুঁটি পুঁতেছিস, সে-হাতে তুলে ফেল। ঝুমির দোকান করা চলবে না। আমি বাড়ি থাকি না বলে মগের মুল্লুক পেয়ে গেছিস!

ঝুমি চুপচাপ শুনছিল। শরাও যেন দূরদর্শী হয়ে উঠছে। বড়মামা চলে এলে এ-সব কথা বলতেই পারেন। শরাও টের পেয়ে গেছে। তার চোখ মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বাড়ি এলে, সে কোথাও বের হতেই সাহস পায় না। সাইকেলে কোথাও গেলে অনুমতি নিতে হয়। তিনি বাড়ি এলে তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। একমাত্র এই মানুষটিই সংসারে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবেন।

বারান্দায় বসে আক্ষেপ তাঁর, কি না কি করে—তাদেরই এত খাঁই। সুপাত্র হলে কি না জানি হত।

আগে বছরে দু-একবার আসতেনই। বাড়িঘরের জন্য মায়াও আছে তাঁর। বাড়ি এলে প্রতিবেশীরাও দেখা করে যায়। তাঁর শৈশব, যৌবন, এখানকার মাঠঘাট, বড় সড়ক, শহরের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে কেটেছে। বর্ষায় ভিজেছেন, রোদে শুকিয়েছেন। আম জাম নারকেলের অজস্র গাছের ছায়া যেন তাঁর শরীরে এখনও লেগে আছে। বাড়ি এলে ঝুমি টের পায়। দাদুর গাছগুলির ছায়ায় গিয়ে বিকেলে বসে থাকেন। শৈশব যৌবনের কথা তখন তাঁর মনে পড়তেই পারে। দিন দিন সেই বাড়ি কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল। শুধু বাড়িটায় ব্রজসুন্দরী আর সে পড়ে আছে। বারান্দার চেয়ারে বসে অজস্র প্রশ্ন। প্রতিবেশীরা কে কেমন আছে, কোথায় আছে, কি করছে, বাণীব্রত দুর্গাপুরে কাজ পেয়েছে, কি কাজ—বাণীব্রতর বাবার পাউরুটির ব্যবসা—সেটা কে দেখে, এমনই সব অতি-অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে তাঁর যেন দুশ্চিন্তা। সেই মানুষটা বাড়ি এসে যদি দেখেন, ঝুমিও বিদ্রোহ করেছে, সে কারও কথায় কর্ণপাত করছে না, তবে চিন্তারই বিষয়।

তখনই শরা বলল, কি ঝুমিদি মুখ নিচু করে বসে আছ কেন? কথা বলছ না। কত বেলা হল, খেতে যাবে না?

ঘড়ি দেখে ঝুমি বুঝল, বেশ বেলা হয়ে গেছে। ব্রজসুন্দরীর রান্নাও হয়ে যেতে পারে। সে ফিরে না গেলে চানে যাবে না। সে না খেলে ব্রজসুন্দরীর খেতে দেরি হয়ে যাবে। হেরম্বকে বলল, আমি যাচ্ছি দাদু। আর ক'দিন লাগবে মনে হয়।

দেখি, এখনও তো মেলা কাজ বাকি। মুলিবাঁশ আরও লাগবে। আসার সময় করিম শেখের আড়ত হয়ে এলাম। সে তো বলল, ঝুমিদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা বিক্রি করবে! ওনার মামারা কিছু বলছে না।

ওসব কথা থাক। বাঁশের কথা কি বলল?

পাঠিয়ে দেবে বলেছে। একগাড়ি মুলিবাঁশ হলেই হবে।

দরদাম করলে না!

দরদামের দরকার নেই, তুমি কার নাতনি দেখতে হবে না।

সে যে বেশ দুশ্চিন্তায় তার হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। সে হেঁটে গেল কদমগাছটার নিচে। গাছে তার লাল রঙের সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রাখা আছে।

সে এসেই গাছটার ছায়ায় প্রথম ঢুকে যায়। তারপর সাইকেলটা লক করে টেনে দেখে। জমি আর গাছ এবং এই সাইকেল সম্বল করে সারাটা দিন সে এখানেই কাটিয়ে দেয়।

হেরম্বদাদু তার লোকজন নিয়ে কাজ করে। বাঁশ কাটছে, মাটি গর্ত করে তুলছে, বাঁশের গোড়ায় আলকাতরা লাগাচ্ছে। এ-সব দেখতে দেখতে কখনো সে নিজেও কাজে হাত লাগায়। এটা ওটা এগিয়ে দেয়।

শরাও একদণ্ড বসে থাকছে না। ঝুমির ফুটফরমাস খাটে।

সারাটা দিন ঝুমি কেমন ঘোরের মধ্যে থাকে। শরা মনে করিয়ে না দিলে, ভাত খাওয়ার কথাও তার বুঝি মনে থাকত না।

সাইকেলের সিটে ধুলোবালি জমে থাকে।

বড় রাস্তায় ট্রাক বাস যায়, ধুলো উড়ে। বৃষ্টি হলে ভাল হত। সাইকেলের লক খোলার আগে ঝুমি আঁচল দিয়ে সিটের ধুলোবালি মুছে ফেলল। হাত বুলাল সাইকেলে। কত কালের সঙ্গী!

আর তখনই ঝুমি দেখছে, নধর মাঠের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। ঘেউ ঘেউ করছে। ব্রজসুন্দরীরই কাজ। ব্রজসুন্দরীর ইঙ্গিতে নধর মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ঝুমিদিদি কোথায়। কি করছে? বাড়ি ফিরছে না কেন!

দুদুমণির তাড়া খেয়েই যে ছুটে এসেছে নধর, বুঝতে অসুবিধা হয় না ঝুমির। শরা তার ভাত খাওয়ার কথা মনে করিয়ে না দিলেও নধর যথাসময়ে ছুটে আসত।

এভাবেই মানুষ বোধহয় মায়ায় জড়িয়ে যায়। সে কোথায় যাবে। এই গাছপালা, নিরন্তর উদাস মাঠ, লাল রঙের সাইকেল, ব্রজসুন্দরী, দাদুর ঘরবাড়ি সব মিলে সে তার আলাদা গ্রহ যেন তৈরি করে নিচ্ছে। ঘরটা উঠে গেলে বসবাসের উপযোগী গ্রহে তার কিছুর অভাব থাকবে না। সে এ-সব ফেলে আর কোথাও বুঝি যেতেও পারবে না।

কুকুরটা লেজ নাড়ছে, তাকে শুঁকছে।

নধরের এই স্বভাব। ঝুমিকে দেখলেই গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। চা-এর দোকানটি যে নধর পাহারা দেবে, তাকেও পাহারা দেবে সে বোঝে।

রাতে বাড়ি ফেরার সময় নধর ঠিক সঙ্গে থাকবে। বলা যায় না, ঘর উঠে গেলে. কুকরটা সারাদিন এখানেই পড়ে থাকতে পারে। ঝুমিদির বিপদের গন্ধ পেলে ঘাড়ও কামড়ে ধরতে পারে।

ঝুমি সাইকেলে ওঠার আগে শরাকে বলল, ভাত খেয়ে ফেরার সময় নিমতলা হয়ে আসবি। হেরম্বদাদু একটা ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে এসেছে উপেনের দোকানে। পেরেক, তার, দড়ি, আরও কি যেন। ফর্দমতো বুঝে নিবি সব। মাল এনে হেরম্বদাদুকেও বুঝিয়ে দিবি।

তারপর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় উঠে এল। রোদের তাপ বড়ই প্রখর। শরীর যেন পুড়ে যাচ্ছে।

এদিকটায় বাড়িঘর বিশেষ নেই। কেবল কুন্দমাঝির বিধবা বউটা একটা ঘরে ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। যেতে আসতে, সে আজকাল বাড়িটা হয়ে যায়। কুন্দমাঝির উঠোনে একটা বেজি ঘুরে বেড়ায়। সাপখোপের প্রকোপ আছে—জঙ্গলের মধ্যে ঘরবাড়ি বানিয়ে থাকলে পোকামাকড়ের উৎপাতে পড়তেই হয়। একটা বেজি পোষার শখ তারও কম না। তবে হয়ে উঠছে না। এদিককার জঙ্গলগুলিতে একসময় গো-সাপ, বেজি, খরগোশ, কত না সব প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। দিন দিন মানুষ বাড়ছে। তার চোখের সামনে কত জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ঘরবাড়িও কম উঠছে না।

চা-এর সঙ্গে একটা পাইস হোটেলও যে চলবে, এটাও তার মাথায় আছে। দেখা যাক—

দেখা যাক মানে, বড়মামা শেষে কি বলেন। তাঁর অনুমতি না থাকলে সে বেশীদূর এগোতে পারবে না। রোখের মাথায় কাজটা করে ভাল করল কি মন্দ করল তাও বুঝছে না। বাঁশ খুঁটি তুলে তাকে ফের বিবাহযোগ্যা পাত্রী হয়ে ফিরে আসতে হতে পারে। দিনকাল ভাল না, এটাও ঠিক।

এই তো মাস দু-এক আগে মোড়টা পার হয়ে খালের ধারে একটা মেয়েকে উলঙ্গ করে ফেলে রেখে গেল কারা। রাতের অন্ধকারে না দিনের বেলায়, কেউ বলতেই পারেনি, কখন বা কারা ফেলে রেখে গেছে। খুন করে ফেলে রেখে গেলে হত্যার সূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছুদিন উত্তেজনা, পুলিশ, কুকুর এবং কাগজে বড় বড় হেডলাইনে খবর—তারপর সব ঠাণ্ডা। কেউ ধরা পড়ল না। পুলিশ কাউকে সন্দেহ করে যে আটক করবে তারও উপায় নেই। পার্টির মুরব্বিদের আতঙ্কে, পুলিশ আর বেশীদূর এগোয়নি। মেয়েটি কোথাকার, কার মেয়ে, এমন খোঁজও দিতে পারেনি পুলিশ। ধর্ষণে মৃত্যু হয়েছে, শুধু এইটুকু জানা গেছে। ব্রজসুন্দরীর উৎকণ্ঠা কেন এত, দোকানের নামে এত খেপে যায় কেন, সবই সে বোঝে।

সে ডাকল, এই নধর বাড়ি যা। আমি যাচ্ছি।

নধর এতক্ষণ সাইকেলের পিছু পিছু আসছিল, ধমক খেয়ে দৌড়ে যাচ্ছে বাড়ির দিকে।
ঝুমি এখন উঠোনে বেজিটাকে খুঁজছে।
কুন্দমাঝির বউ বলল, আরে ঝুমিদিদি যে! কি খবর। তোমার ঘরের আর কত দুর?
উঠছে। বেজিটাকে দেখছি না।
কোথায় জঙ্গলে ঢুকে বসে আছে!
ডাক না।
কুন্দমাঝির বউ শিস দিতেই জঙ্গল থেকে তেড়েফুঁড়ে বের হয়ে এল বেজিটা।
ঝুমি বারান্দায় বসে কি ভেবে যে বলে ফেলল, তোমার ভয় করে না মাসি, বাড়িটায় একা থাকতে।
কিসের ভয়!
মানুষের ভয়!
কার সাহস আছে। এক কোপে দুখান করে দেব না!
যা দিনকাল!
নিজে ঠিক থাকলে, কার সাহস আছে কাছে ঘেঁষে!

বেজিটা ঝুমির পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। সে যে মাছ নিয়ে আসেনি বুঝে ফেলেছে। মাছের গন্ধ পেলে বেজিটা পাগল হয়ে যায়। লাফিয়ে কোলে পর্যন্ত উঠে যায়। আজ সে-সবের কিছুই করল না। পায়ের কাছে সামান্য ঘোরাঘুরি করে পেছনের জঙ্গলটায় ফের ঢুকে গেল। তার আর বসে থাকা ঠিক না। সে উঠে পড়ল।

কুন্দমাঝির বউ তাকে দেখে একটা জলচৌকি উঠোনে বের করে দিয়েছিল। এই ভরদুপুরে গাছপালায় ঢাকা বাড়িটায় কেন যে ঢুকে বসে গেল তাও বুঝছে না। দোকান থেকে ডাকাডাকি করলে কুন্দমাঝির বউ সহজেই সাড়া দিতে পারে। বাড়িটা তার জায়গার বেশ কাছাকাছি। বাড়িটা থেকে বের হলেই তার জমির রাস্তায় ঢুকে যাওয়া যায়। একটা কদমগাছ ছাড়া তার জমিটায় কিছু নেইও। উঁচু জমি, বর্ষায় ডুবে যাবারও ভয় নেই। পাট কিংবা আউস ধানের চাষ হয়। এ-বছর ঘর উঠবে বলে কিছুই চাষ করা হয়নি।

মাঝির বউ বলল, জমিটা তোমার বাড়ি থেকে কত দূর?

কত দূর বলার কি আছে? তোমার বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হলেই তো দেখা যায়। খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। বেড়ার বাঁশও এসে গেছে। তোমার চোখের সামনেই তো সব হচ্ছে। দোকানে ইচ্ছে করলে সারাদিন কাজও করতে পার। আমারও লোকের দরকার। আসলে মাঝির বউ যদি ভেবে থাকে, ঝুমির এটা খেয়াল। ব্রজসুন্দরীর বড় পুত্র বাড়ি এলে কি হবে বলা মুশকিল। কিন্তু তার যে কিছু একটা করা দরকার। এটা কেউ কিছুতেই বুঝতে চায় না। তাকে পাত্রস্থ করতে পারলেই সবাই যেন বেঁচে যায়।

বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার মুখে সে টের পেল, কেন সে কুন্দমাঝির বাড়িতে ঢুকে গেছে। এদিকটায় আগে তার আসাই হত না। শহরে যেতে হলে কেতুপাড়ার ভিতর দিয়ে চলে গেলেই হয়। এতটা রাস্তা ঘুরে সে কখনও বড় সড়কে উঠে যায় না। ঘরটা ওঠার মুখেই সে যেতে-আসতে বেজিটার খবর নেয়। তার ছেলে ঘণ্টা, ডেঙ্কার খবর নেয়। ওরা কোথায়, মাঠে কি কাজ করছে, তারও খবর নেয়। আসলে সে মাঝির বউ-এর ঘনিষ্ঠ হতে চায়। বিপদে-আপদে মাঝির বউই তার সম্বল ভেবে এখন যাওয়া-আসার পথে একবার না একবার বাড়িটায় ঢুকে যাচ্ছে।

ঝুমির একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। সে মেয়ে বলেই এত অসহায়। রাস্তাটা ধরে আর সামান্য এগিয়ে গেলেই একটা বাঁক—দু-পাশে চালতে গাছের সারি, আবার উরাট জমিরও অভাব নেই। সাঁ-সাঁ করে সে উঠে এল কালীতলার মোড়ে। নধর বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

নয়

আজ বাড়ি ঢুকেই মনে হল, ও-পাশের বারান্দায় বসে ব্রজসুন্দরী কারও সঙ্গে কথা বলছে। সে ব্রজসুন্দরীর হাতের কাছে সব এগিয়ে দিয়ে গেছে। খুব সকালে উঠতে হয় এ-জন্য। ছাড়া কাপড় জলে

কেচে তারে মেলে দিয়ে গেছে, বাজার থেকে আনাজপাতিও এনেছে। সকালে উঠেই নলিনকাকার বাড়ি যেতে হয়। সামনে দুধ দুয়ে না দিলে ব্রজসুন্দরী খায় না। দুধে জল মিশিয়েছে বলবে।

এমনিতেই ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, বাক্যালাপ নেই—ঝুমি যতটা পারছে ব্রজসুন্দরীকে খুশি রাখার চেষ্টা করছে। দুপুরবেলায় সে খেতে আসে। এতক্ষণে তো দুদুমণির স্নানটান সারা হয়ে যাওয়ার কথা। স্নানে যে তিনি যাননি, তারে সকালের কাচা মেলা থান দেখেই বুঝেছে।

বাড়ি ঢোকার মুখে ঝুমির সাইকেলের ঘন্টি বাজাবার স্বভাব। বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে আর সাইকেলের ঘন্টি বাজায় না। তারও যে কম ক্ষোভ নেই ব্রজসুন্দরীর উপর, ঘন্টি না বাজিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু সাইকেল বারান্দায় তোলার মুখেই দেখল, তিনি ও-পাশের দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। ঠিক টের পেয়ে গেছে, সে এসে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে কথা বন্ধ। কার সঙ্গে কথা বলছিল, কে এসে ও-পাশের বারান্দায় বসে আছে, সে আন্দাজ করতে পারছে না। বড়মামা কি এসে গেলেন! কিন্তু তিনি এলে কথা বন্ধ করার কোনও কারণই থাকতে পারে না। যিনি বসে ছিলেন, যাঁর কাছে দুদুমণি তার মুণ্ডুপাত করছিল, তিনিও চুপ। সে না থাকলে দুদুমণি যে সারাদিন তার মুণ্ডুপাত করে তাও জানে সে। যেই আসবে তারই সঙ্গে ঝুমি ছাড়া কথা থাকে না। তিনি যে এতক্ষণ বসে বসে ঝুমির অপমান শুনে খুউব খুশি বুঝতে তার বাকি নেই। দুদুমণি তাকে দেখেও দেখল না। কাঁহাতক পারা যায়।

তার খিদেও পেয়েছে। ঘরে ঢুকে ও-পাশের বারান্দায় গেলেই বোঝা যেত তিনি কে। দেয়ালের আড়ালে সে বসে আছে। আড়ালে থাকা কেন, তাও সে বুঝছে না। তবে আজকাল কেউ পাত্রপক্ষের খবর নিয়ে এলে তার আড়ালেই কথা হয়। যতীন সিপাই-এর বউ ঘোরাঘুরি করছিল, সেই কি না কে জানে!

সে ইচ্ছে করেই উঁকি দিয়ে দেখল না।

উঁকি দিলেই গুরুত্ব পেয়ে যাবে।

সে বালতি নিয়ে কলতলায় যাওয়ার আগে শুনল, ব্রজসুন্দরী বলছে—আজ মাসের কত তারিখ রে নয়না?

সতের তারিখ ঠাইনদি! আড়াল থেকেই জবাব।

সতের তারিখ! বুড়ি কর গুনছে। সতের তারিখ, তিন মাসের বেশী হইয়া গেল পোলার একখান চিঠি নাই। তার মায় মরছে না বাঁইচা আছে খবর নাই। মাসের টাকার মনি- অর্ডারের খবর ছাড়া খবর নাই। মা তুমি আমার প্রণাম নেবে। আমরা ভাল আছি। তুমি সাবধানে চলাফেরা করবে—এই তার একখানা বাধাধরা বুলি—সেই কবে পাগলা শরাকে দিলাম চিঠি পোস্ট করতে, চিঠির কোনও জবাব নাই।

এতক্ষণে বুঝতে পারল ঝুমি—দেয়ালের ও-পাশে বসে আছে প্রভাত করের দিদি। পাত্রপক্ষের খবর তার কাছেও আছে—বিধবা দিদিটি প্রভাত করের গলগ্রহ। বাইরের একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছে দিদিকে। সেভাবে উপার্জন নেই কোনও। এ-বাড়ি সে-বাড়ি কাজ করে কিছু উপার্জন হয়, তাতে এক পেটও চলে না। স্বামীটা মানুষ ছিল না। রেলে হকারি করত। নেশাভাঙেরও অভ্যাস ছিল, শেষে কোথাকার একটা মেয়েকে নিয়ে রানাঘাটে উধাও হয়েছিল—তাও সইল না। রেলের তলায় নিজেই পড়েছে, না কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছে, তাও জানা যায়নি। বছরখানেক হল, প্রভাত করের বাড়ি এসে উঠেছে। প্রায়ই সে বাড়ি ফিরে তাকে যে দেখতে পায়, তাও না। তবে কিছু না জুটলে ব্রজসুন্দরী তাকে পাতের ভাত ডাল তরকারি ঠেলে দেয়। সেই লোভেই হয়ত বসে আছে। পাত্রপক্ষের খবর দেওয়ার সঙ্গে বুড়ির প্যাচাল শোনারও লোকের দরকার। আগে ঝুমি শুনত, এখন তার শোনা তো দূরে থাকুক মরার সময়ই নেই। দোকান তার লেগে গেছে। সে তার দোকান নিয়েই ব্যস্ত।

তারে মেলা থান তুলে ঝুমি বারান্দার চেয়ারে ভাঁজ করে রাখল। আলনায় কিংবা খাটে রাখলে থান অশুচি হয়ে যাবে। আগে রাখলে অশুচি হত না, এখন কারণে অকারণে অশান্তি করার চেষ্টায় আছে। সে যতটা পারছে, বুড়ির মর্জি মতো কাজ করে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টায় আছে। তাকে দেখেই যে ব্রজসুন্দরী স্বন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তাও বোঝা যায়।

প্রভাত করের দিদিকে বলল, তুই বস। পুকুর থিকা ডুব দিয়া আসি। ঘরের দিকে তাকিয়ে ইশারায় কিছু যে বলছে ব্রজসুন্দরী তাও সে জানে। যেন তাকে শুনিয়েই বলা, আমার কি মরণের সময় আছে? রাজ্য উদ্ধার কইরা আইছেন মহারাণী, পান থেকে চুন খসলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়।

ঝুমি এইসব ঠেস মারা কথার কোনও জবাবই দেয় না আজকাল।

ব্রজসুন্দরী তার পছন্দ অপছন্দ খুবই বোঝে। সে যে চায় না দুদুমণি বাইরের লোকের কাছে পেট আলগা করে দিক। মামা মামীদের নিন্দে করলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, ধমকও না দিয়ে পারে না, আবার আরম্ভ করলে। এতে লোকে মজা পায় বোঝ না!

গামছা নিয়ে পুকুরে ডুব দিতে চলে গেল ব্রজসুন্দরী। ঝুমি বালতিটা কলপাড়ে রেখে আবার ঘরে ঢুকে গেল। ঝড়বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, জোর হাওয়া বইছে, ধুলো বালি উড়ছে, গরমে হাঁসফাস অবস্থা। পুকুরের জল গরম, টিউকলের জল ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা জলে স্নান না করলে শরীর জুড়ায় না। রাস্তা থেকে কলতলার সবই দেখা যায়। সে পাটকাঠির বেড়া দিয়ে কলপাড়েই স্নানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আগের মতো তার অফুরন্ত সময়ও নেই হাতে। কোনোরকমে স্নানটান সেরে যা হয় কিছু মুখে দিয়ে একটু গড়িয়ে নিতে হয়—তারপর সাইকেলে বের হয়ে যেতে হয়।

সে চুল আঁচড়াচ্ছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। আঁচল দিয়ে শরীর ঢেকে চুলে তেল মাখল। আবার চুল আঁচড়াল, খোঁপা করে চুল বেঁধে তোয়ালে সাবান নিয়ে সে কলতলায় ঢুকে গেল। চারপাশে পাটকাঠির বেড়া থাকায় ভেতরে আড়াল আছে। সায়া ব্লাউজ খুলে শরীরে সাবান মাখতে তার অস্বস্তি হয়। তবু যতটা পারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাফ না করে পারে না। গরমে, ঘামে শরীরের ভাজগুলো চ্যাটচেটে হয়ে থাকে। স্নান করে বের হলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায়।

সাবান মাখতে গিয়ে বুঝল, শরীরের রঙ কিছুটা সত্যি পুড়ে গেছে। লাবণ্যও কমে গেছে শরীরের। শরীরের আর দোষ কি, খাটাখাটনি না থাকলে দোকানটা দাঁড় করানো যেত না। কুন্দমাঝির বউ সকাল বিকেল তাকে সাহায্য করে ঠিকই, তবে এখনও সবটা তার উপর ছেড়ে দিতে সাহস পায় না। পাউরুটি সেঁকে মুচমুচে মাখন টোস্ট করার কায়দা কিছুতেই রপ্ত করতে পারছে না। ওমলেট কিংবা ঘনদুধের চা-ও ঠিকমতো করতে পারে না। তবে আস্তে আস্তে সবই হয়ে যাবে।

শরীরের লাবণ্য নিয়ে ঝুমি আজকাল বিন্দুমাত্র ভাবে না। এই শরীর শুধুমাত্র একজন পুরুষের ভোগ্য হোক, আর কিছু তার ভোগ্য নয় ভাবতে সে রাজি না।

ব্লাউজের ভিতর হাত ঢুকিয়ে সে সাবান ঘষল, জল ঢালল—কি ঠাণ্ডা জল, মাথার উপর কোনও চাল নেই, শুধু কাঁঠালগাছের ডালপালায় কিছুটা আব্রু তৈরি হয়েছে—সে মাথায় জল ঢালতেই যেন মেজাজ কেমন প্রসন্ন হয়ে গেল। রাতুলের আজ আসার কথা আছে। বেচারা আজকাল কথা আরও কম বলে। সে যে রাতুলের আকর্ষণে পড়ে গেছে, কিছুতেই বুঝতে দিতে চায় না। সেও কথাবার্তায় গম্ভীর থাকার চেষ্টা করে। পাত্রপক্ষ বলতেই সেই এক পুরুষের মুখ এবং মিছিল, দাবিদাওয়া, পাগল ভাল হয়ে গেছে, ল পড়তে চায়, ক্যারিং করে, খায় না, এ-সব ভাবলেই আবার কেমন সে রাতুলের উপর রুষ্ট হয়ে ওঠে। সেদিনও বলে গেছে, ঝুমিদি তুমি কিন্তু গেলে না। আশা করে বসেছিলাম।

আমি তো কথা দিইনি। বলেছি, যাবার চেষ্টা করব। দোকান ফেলে যাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক একদিন শরাকে নিয়ে তোমার বাসায় চলে যাব। গিয়ে অবাক করে দেব।

আসলে তার মনে হয়, রাতুলও তার আকর্ষণে পড়ে গেছে। সেই কবে একবার শরার ঝুমিদিকে দেখে সে কিছুটা অবাক হয়ে গেছিল, এবং এখানে আসার পর নীলরঙের ব্যাগটাও পাঠিয়ে দিয়েছে, দুটো মাত্র সাদা ফুল, গোলাপ হতে পারে, করবী হতে পারে, যুঁই কিংবা চাঁপা, যে ফুলই হোক সে চায় ঝুমিদি তার ব্যাগে ফুলের কারুকার্য করে দিক। সে বুঝতেই পারছে না, শুধু সাদা রঙ হবে ফুলে, না লাল, অথবা পিঙ্ক কালারেরও হতে পারে। আসলে, এই ফুলের সুঘ্রাণ প্রথম দিন তাকে দেখেই পেয়ে থাকতে পারে—যাই হোক, তার কিছুতেই ব্যাগটা নিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে না। রেশমি সুতোয় ফুল তুলে দিলেই কি সম্মতির কথা থাকে।

রাতুল কি তার জানে সব! জানতেই পারে। শরা যা পেট পাতলা, বলে দিতেই পারে ঝুমিদির পায়ে খুঁত আছে বলে, পা টেনে হাঁটে বলে বিয়ে হচ্ছে না—কিংবা যদি বলে দেয়, ঝুমিদির তো গাছের

সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে হাতে পায়ে সাবান গোলা জল ঢালল—কি ঠাণ্ডা জল—শরীর পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলে সে তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছল—তার নিজের উপর আস্থা ফিরে আসছে। বেড়ার মাথায় তার শাড়ি সায়া ব্লাউজ। সে তোয়ালে দিয়ে শরীর পেচিয়ে শরীর থেকে সায়া টেনে নিল, ব্লাউজটা টেনে নিল, তারপর শাড়িটা দু'ভাজ করে শরীরে জড়িয়ে প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। রাস্তা থেকে বাড়িটা যে একেবারেই খোলামেলা।

দরজা বন্ধ করে সে শাড়ি পরে চুলে তোয়ালে জড়িয়ে রাখতে গিয়ে দেখল, প্রভাত করের দিদি জবুথবু হয়ে বসে আছে দেয়ালের পাশে। ক্ষুধায় চোখমুখ কাতর। মুখ মলিন।

তার দিকে চোখ তুলে একবার তাকিয়েই, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

দেখেই মনে হয় বড় কুণ্ঠিত। অসময়ে দুটো ভাতের জন্য এসে খুবই অপরাধ করে ফেলেছে যেন। এবং উড়ো কথা তার ঘরের চালে মাঝে মাঝে রাতে ঢিল পড়ে। প্রভাত করের বউ, তাকে তাড়াবার জন্য নানারকমের ফন্দি আটছে। সে তবু নড়ছে না। বেহায়ার মতো বাপের ভিটায় পড়ে আছে। প্রভাত কর ইচ্ছে করলে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত অনায়াসে দিতে পারে। তবে দেয় না। পাছে তার স্ত্রী অশান্তি করে।

তার ক্ষোভ ছিল, আবার এসে উদয় হয়েছে ভেবে। খাওয়ার লোভে আসে। বানিয়ে বানিয়ে পাত্রপক্ষের গল্প তৈরি করে। পাত্রপক্ষের খবর পেলেই মাথায় তুলে দুদুমণির নাচানাচি—প্রভাত করের দিদি সেদিক থেকে বলতে গেলে সেয়ানাই বলতে হয়।

কিন্তু ক্ষুধায় যে কাতর, সে তো মিছে নয়।

আর তখনই মনে হল, বউটি সত্যি অসহায়। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে।

ঝুমি সাদা পাথরে ভাত বেড়ে রাখল। ভাজাভুজি ভাগ করে ছোট রেকাবে রাখল। পাথরের গ্লাসে জল। ক্ষুধার মুখে দুদুমণির জন্য এই আয়োজনটুকু খুবই দরকার। ঝুমি সব সাজিয়ে আলগা করে একটা কলাপাতায় ঢেকে রাখল খাবার। আসন পেতে রাখল। পুকুরে ডুব দিয়ে ওঠার মুখেই আহ্নিক সেরে ফেলে, তারপর সারা রাস্তায় জল ছিটাতে ছিটাতে বাড়ি ফেরে। এবং এসে যখন দেখতে পায়, সে বসে আছে ব্রজসুন্দরীর অপেক্ষায়, তখনই বড় প্রসন্ন মনে খেতে বসতে পারে।

কিন্তু প্রভাত করের দিদি, তাকে নিয়ে কি করে—

ভাত বেশীই হয়। নধর আছে, কাক শালিখ আছে—সবার জন্যই ভাত হয়।

কি বুঝল কে জানে, ঝুমি দরজায় ঝুঁকে একটা বড় জামবাটি এগিয়ে দিল প্রভাত করের দিদির দিকে। তাতে ভাত ডাল তরকারি, মোটামুটি পেট ভরার মতো ব্যবস্থা।

সে কিছু বলল না, অথচ দেখা গেল প্রভাত করের দিদি একটা কলাপাতা কেটে কলের জলে ধুয়ে বাইরের বারান্দায় বসে আছে।

সে জামবাটির সব খাবারই কলাপাতায় ঢেলে দিল। বলল, খাও মাসি। ভাত লাগলে বলবে। এঁটোপাতে খাওয়া ঠিক না। সে যত বড় মাপের মানুষই হোক। কাল সকালে আমার দোকানে চলে যেও। কাজ করলে খাওয়া পরার ভাবনা থাকে না।

ঝড় বাদলায় প্রকৃতি ক'টা দিন পাগল হয়ে ছিল। কখনও অঝোরে বর্ষণ, কখনও টিপটিপ বৃষ্টি, কখনও ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে ঝুমি রে:জ সাইকেল চালিয়ে গেছে, দোকানের ঝাঁপ তুলেছে, ঝাঁপ বন্ধ করেছে—কি যে আকর্ষণ তৈরি হয়ে গেছে তার, সে কিছুতেই যত দুর্যোগই থাকুক ঘরে বসে থাকতে পারেনি, ঝড়ে তার ঘরটা না আবার উড়ে চলে যায়।

শরদিন্দু যত নষ্টের গোড়া।

সেই বলেছিল, ঝুমিদি, সবই করলে, ঘরও উঠে গেল, তোমার হাতে চা খাবে বলে মানুষজনও জমে গেছে—কিন্তু একটা কথা বাকি থেকে গেল।

ঝড় বাদল থেমে গেলে এক সকালে আকাশ ফর্সা যখন, তখনই শরদিন্দু দোকানে ঢুকে বলেছিল, এটা তোমার একদিনের কাজ না, প্রকৃতির রোষ বলে কথা, বড়মামা যদি এসে পড়েন, এই আতঙ্কে ভূমি পূজা না করেই খুঁটি পুঁতে দিলে—এই তো কি দুর্যোগ গেল, কত কিছু হতে পারত, বাগদিপাড়ার কত ঘরবাড়ির চাল উড়ে গেল, তোমারটা যে যেত না, তার ঠিক কি! তার চেয়ে একটা কাজ করলে ভাল

হয় না, শনি সত্যনারায়ণের পূজা দিয়ে ঠাকুরের কোপ থেকে যদি রক্ষা পাওয়া যায়।

এই একটা খিচ থেকেই তার আবার ছোটাছুটি।

শরদিন্দু বলল, গণেশের পূজাটাও দিও। গণেশকে খুশি না করলে অন্য ঠাকুরদেবতারা খুশি হয় না। বলত, আমি পঞ্চতীর্থের কাছে যাই। কে কোথায় রাগ পুষে রাখবে, একটা কিছু হয়ে গেলে আফশোশের শেষ থাকবে না।

হেরম্বদাদুও একদিন এসে বলল, সবই তো শেষপর্যন্ত হয়ে গেল, এবারে একবেলা অন্নপ্রসাদের ব্যবস্থা করুন। পাত পেতে খাই।

শরদিন্দু আশা করে বসে আছে এই উপলক্ষে তারা ভালমন্দ খেতে পাবে। কুন্দমাঝির বউ বলল, কতদিন ভালমন্দ খাই না ঝুমিদি, তোমার হাতের রান্না যে না খেয়েছে, সে জানে না হাতের গুণে অন্নব্যঞ্জনের স্বাদই আলাদা।

প্রভাত করের দিদিরও ইচ্ছে, একটা কিছু হোক। তারা মিলেজুলে কাজ তুলে দেবে।

তবে এটা ঠিক দোকান নিয়ে বেশী অশান্তি করছে তার দুই মামা এবং জগৎপুরের মাসি। নীলুমাসি সাতে পাঁচে থাকে না, মেসো তার পক্ষে, তবে শত্রুতা করে কেউ ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে তার যে কত বড় সর্বনাশ! সে নিঃস্ব হয়ে যাবে, বাড়িটায় ফের পাত্রপক্ষের উৎপাত শুরু হয়ে যাবে। যে অগাধ জল থেকে সাঁতরে পাড়ে ওঠার এত চেষ্টা সব একনিমেষে একেবারে অর্থহীন হয়ে যাবে।

দোকান চালু হয়ে যাওয়ায় সে অনেকটা হালকা। এখন তার দোকান সাজানোর কাজ চলছে। এই বাঁশ বেত কঞ্চির তৈরি ঘরও যে একটা শিল্প—সে বেড়ায় রঙ দিচ্ছে। ফল, লতাপাতা আঁকছে ঝুমি নিজেই। সামনের বেঞ্চিতে ভিড় হলে জায়গা দিতে পারছে না, ভিডিও হলে ভাল ছবি থাকলে এটা হয়, সে আর একটা কাঠের লম্বা বেঞ্চ বানিয়ে নিয়েছে এবং খোয়া ফেলে সামনের কিছুটা জায়গা দুরমুস করে নিয়েছে। বৃষ্টি বাদলায় কাদা হয়ে গেলে মানুষজনের চলাফেরায় অসুবিধা। দোপাটি ফুলের চারা লাগিয়েছে, একটা বেড করেছে, শুধু রজনীগন্ধার। বেলফুলেরও কাটিং পুঁতে দিয়েছে। দোকানটা রাস্তা থেকে একনজরে চোখেই পড়বে না শুধু, দোকানির রুচিরও প্রশংসা করবে।

শুভদিন দেখে শনি সত্যনারায়ণের পূজার উপচারের কাজ শুরু হয়ে গেল। রাস্তা থেকে কানেকশন পেয়ে গেছে লাইটের ।টুনি বাল্‌ব জ্বলবে। পুরো দশ কাঠা জমি আলোয় উজ্জ্বল করে তোলারও ব্যবস্থা হচ্ছে।

এত সব হচ্ছে, তবে তার উৎকণ্ঠা, বড়মামা কখন না এসে যান। মামা মামীরা দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কেউ কথা বলছে না।

এই শুভদিনে শরদিন্দু চায়, তার সব হস্তশিল্প বেড়ায় যেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঝুমিদি যে ইচ্ছে করলে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র তার সূচিশিল্পে বন্দি করে রাখতে পারে, না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য কথা কটি সে কখনও লেখেনি—সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হোক সে চায়। বরং সে রঙিন সুতোয় লিখেছে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

কাজেই ঝুমির এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সে দুদুমণিকে তোয়াজ করে চলছে। দুদুমণি খুশি না হলে তার দোকান করাই বৃথা। সে একদিন তাকে জোরজার করে ধরেও এনেছে। রিকশায় জোর করে তুলে দিয়ে বলেছে, চল না, একবার অন্তত দেখে এস। তোমার ঝুমি কোনও খারাপ কাজ করছে না।

দুদুমণি দেখে অবাক।

জঙ্গল সাফ।

এক কোনায় একটা ছোট্ট কুটির যেন। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের তপোবনের ছবিটা ভেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে বিমর্ষ হয়ে গেল। তপোবন থাকলে, সীতাহরণের পালাও থাকে।

ব্রজসুন্দরী বলল, তোর মামা খবর রাখে না, আমার বিশ্বাস হয় না। ঠিক সময়ে চলে আসবে। তখন বুঝবি। ঠিক বলবে, ঝুমির এটা উচিত কাজ হয়নি। এসব করা চলবে না।

রাত হয় ফিরতে। ঝুমি না ফেরা পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকে ব্রজসুন্দরী। উঠোনে পায়চারি করে। রাস্তার দিকেও কিছুটা এগিয়ে যায়—ব্রজসুন্দরী ঝুমি না ফেরা পর্যন্ত তটস্থ থাকে। ঝুমি অবশ্য রাতে

একা ফেরে না। পালানের মিল বন্ধ বলে, ঝুমি তাকেও ডেকে বলেছে, বিকেলে দোকানে চলে যাবেন পালানদাদা। রাতে আপনার সঙ্গে ফিরব। তাকেও সে কিছু হাতে ধরে দেয়। সে মেয়ে বলেই যেন মানুষজন ওৎ পেতে আছে। কখন সুযোগ মিলবে।

এখনও আশায় আছে ব্রজসুন্দরী, খোকার চিঠি এলে, কিংবা খোকা নিজেই চলে এলে ঝুমির হুঁশ ফিরবে। আদরে আদরে ঝুমির মাথাটি নাকি তিনি খেয়েছেন, মামিরা এমনও অভিযোগ করে গেছে। মিছে কথা যে বলেনি, ঝুমি তো কাউকে গ্রাহ্য করে না, বলবেই বা না কেন, একমাত্র ঝুমির মতো জেদী মেয়েকে খোকাই নিরস্ত করতে পারে।

এক সকালে সাইকেল নিয়ে বের হতেই ব্রজসুন্দরী না বলে পারল না, সাত সকালে কোথায় বের হচ্ছিস! মুখে কিছু না দিয়ে বের হচ্ছিস!

পঞ্চতীর্থ দাদুর কাছে যাচ্ছি।

ওর কাছে আবার কি দরকার?

শনি সত্যনারায়ণের পুজো দেব।

তুই পূজা দেবার কে, শুনি!

কেন, আমি দিতে পারি না!

আমার কাছে টাকাপয়সা নেই। তোর দাদু টাকার গাছ লাগিয়ে যায়নি—ঝাড়া দিলে পড়বে।

ঠাকুর দেবতার নামে তুমি ক্ষেপে যাচ্ছ দুদুমণি। তোমার টাকা ধরছি না। আমার যা আছে ওতেই হয়ে যাবে। বাঁশ ছাড়া তোমাদের কিছু আমি ধরিনি। জমিটা নিয়েও গোলমাল পাকাবার চেষ্টা হচ্ছে। বাঁশের দাম, জমির দাম না হয় দিয়ে দেব। দয়া করে আমাকে আর ক্ষেপিয়ে দিও না। একটু সময় দাও।

ঠাকুর দেবতার নামে ক্ষেপে যাওয়া বোধহয় ব্রজসুন্দরীর উচিত হয়নি। কার উদ্দেশে এখন কপালে হাত ঠেকাচ্ছে বোঝাও কঠিন। বড়ই পাপ কাজ হে—এমনও মনে হতে পারে। শনি সত্যনারায়ণের নামে ক্ষেপে থাকলে, ঝুমির অমঙ্গল হতে পারে—তার মঙ্গল ছাড়া ঠাকুর দেবতার কাছে ব্রজসুন্দরীর আর কিছু চাইবারও নেই—তবু বোধহয় নানা সংশয়, পুজো হবে, তিনি কিছুই জানেন না হয় কি করে! হুট করে না বলে না কয়ে পুজোর ব্যবস্থা করলে হ্যাপা সামলাবে কে!

ঘরদোর উঠোন ল্যাপামোছা নেই, ঠাকুরের বাসনপত্র বের করা নেই, এটা কি করছিস বুঝি না। মাথায় কিছু চাপলে তোর দু'দণ্ড সবুর সয় না। তোর এত জেদ।

দুদুমণি ভেবেছে, বাড়িতে পুজো হবে। সে সব খুলেই বলল, পুজো বাড়িতে হচ্ছে না। দোকানে হচ্ছে। এত বড় একটা কাজ ঠাকুর দেবতাকে তুষ্ট না করলে হয়! সবাই যে বলল, সঙ্গে অন্নপ্রসাদ হোক। ভিতপুজোর কাজটাও সঙ্গে সেরে নেব। তুমি সকাল সকাল স্নান করে চলে যাবে। হেঁটে যেতে কষ্ট হলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে নিয়ে চলে যাব।

আমার মরণ!

মরণের কি আছে। তোমাকে সাইকেলের ক্যারিয়ারে নিয়ে যাইনি! ক্যারিয়ারে বসতে না চাও, রিকশা ডেকে আনব। তোমার যেতে কোনও অসুবিধা হবে না।

পঞ্চতীর্থদাদুর বাড়ি হয়ে, শরদিন্দুর বাড়ি হয়ে দোকানে যেতে বেলা হয়ে গেল ঝুমির।

শরদিন্দুকে বাড়িতে পায়নি। সে আড়তে চলে গেছে শুনে ঝুমির ভালই লাগল। কাজের মধ্যে না থাকলে দায়িত্ব বাড়ে না। তার সঙ্গে দোকানের কাজে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় শরদিন্দুর কাজে কি উত্তেজনা থাকে ঠিক টের পেয়েছে। সে বাজারে ঢুকে শঙ্কর মুদির দোকানে একটা লিস্ট ফেলে দিয়ে বলল, ফর্দ অনুযায়ী সব মাল পাঠিয়ে দেবেন। বাড়ি না কিন্তু, আমার দোকানে। চৌরাস্তার মোড়ে। আমার কথাটা এই প্রথম যেন জোর দিয়ে বলতে পারল সে।

সে ফের বলল, দুদুমণির কাছে কিন্তু টাকা চাইবেন না। টাকাটা আমি দেব।

মচ্ছবের আয়োজন হচ্ছে, আমরা যেন বাদ না যাই।

ঝুমি হেসে বলল, গেলে আমার চেয়ে বেশী কে খুশি হবে মামা।

এত সব ঠিকঠাক করে শরাকে নিয়ে দোকানে আসতে বেশ বেলা হয়ে গেল। কুন্দমাঝির বউ উনুনে কয়লা দিচ্ছে। ইতস্তত খরিদ্দার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেঞ্চিতে চেয়ারে বসে আছে. কদমগাছের ছায়া আছে

বলে সকালটায় দোকানের সামনে রোদ পড়ে না। প্রভাত করের দিদি, গরম জলে কাপ প্লেট ধুয়ে তুলে রাখছে। সসপেনে ডিম ভাজা হচ্ছিল তার গন্ধ উঠছে।

কাজের মধ্যে এত উত্তেজনা থাকে ঝুমি আগে জানতই না। যেন এক স্বপ্নের পৃথিবীতে সে ঘোরাফেরা করছে। চারপাশে তাকালে এটা সে আরও বেশী বুঝতে পারে। কেউ বসে নেই। যার যা আছে তাই নিয়ে লড়ছে। মোটর গ্যারেজ থেকে কুমোরদের হাঁড়িপাতিলের কারবার সবই এই উত্তেজনা বশে! এতদিন যেন সে ঘুমিয়েছিল। বিয়ে বিয়ে করে ব্রজসুন্দরী তার মাথাটিও খারাপ করে দিয়েছিল। বিয়ে ছাড়া তার গতি নেই—কি না হেনস্তা—কত লোকের কাছে তাকে খাটো হতে হয়েছে। কতবার তাকে দেখার নাম করে পাত্রপক্ষ বাড়িতে বসে ভালমন্দ খেয়ে গেছে। তারপর আর পাত্তা নেই। পরে কেউ খবরাখবর নিলেও তাকে নিয়ে দরদাম করতে ছাড়েনি। তার মাথা কতবার যে হেঁট হয়েছে।

আজ সে কেমন আশ্চর্য এক মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে। গাছপালা এবং সামনের ভূখণ্ড, বাদশাহী সড়ক, গাড়ি, গ্যারেজ কোল্ড স্টোরেজ, আড়ত, ভিডিও পার্লার—সবই মানুষ নিজের মতো গড়ে তুলছে। এই গড়ে তোলার নেশা যে তারও কত প্রবল, যেন তার শেকড় ঢুকে সবারই সে খোঁজখবর নেয়।

আসলে নিতাইদার চায়ের দোকানটি আবিষ্কার করতে না পেলে সে এতটা জোর পেত না। সড়কের ওপারে ভিডিও পার্লারে ছবি দেখতে এসে নিতাইদার চায়ের দোকানে চা খেয়েছিল। তার সামর্থ্য কম, চা খাওয়ার সময় নিতাইদা তাকে এমনও বলেছিল।

একটা কাঠের পেটি মাথায় করে মোড়ে চলে আসে বলেছিল। জায়গাটায় তখন এত লোকজন ছিল না, তবে ভিডিও পার্লার হয়ে যাবার পর তার দোকান ভালই চলে। নিতাইদাকে দেখেই সে বিশ্বাস খুঁজে পায়।

সে চা-এর দোকান করায় নিতাইদা অবশ্য খুশি না। তাকে বলেওছে, দোকান করবি, চলবে!

কেন চলবে না, তোমার চললে আমার চলবে না কেন বল।

আমার যা অবস্থা, কিছু করার নেই। দুটো তো পেট।

ঠিক চলে যাবে দেখো। ঝুমি মিষ্টি হেসে কথাটা বলেছিল।

ঠাইনদি যে বলল, সোদপুর থেকে তোকে পছন্দ করে গেছে। ওরা যদি শোনে চা বেচিস মোড়ে, তারা কি রাজি হবে!

সে দেখা যাবে। আসলে সে জানে, ব্রজসুন্দরী প্রতিবেশীদের কাছে ঝুমির বিয়ের খবর দিয়ে একধরনের তৃপ্তি পায়।

ঝুমি বোঝে তাকে হতাশ করতে তায় নিতাইদা। তার রাগ হয় না—প্রতিযোগিতা না থাকলে কিছু যে হয় না...।

সে বলেছিল, লোকজন কি হারে বাড়ছে, দেখছ না। তুমি একা পেরে উঠবে না। আমি না করলে অন্য কেউ করবে। জমি তো খালি পড়ে থাকে না।

সেই।

দরকারে তোমার আখা, কয়লা, টুল আমার ঘরেও তুলে দিয়ে যেতে পারবে। মাথায় করে একবার নিয়ে আসা আবার বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতেও কম কষ্ট না। আমার ঘরটা উঠে গেলে সেখানে সব রেখে দেবে।

সে বলেছিল, দেখবে এবার তোমার দোকান আরও ভাল চলবে। আমি ভাল চা দিলে, তুমি খারাপ চা দেবে কি করে। লোকজন যখন টের পাবে এখানে ভাল চা পাওয়া যায়—তখন ভিড় বাড়তে বাধ্য। আমার হলে তোমারও হবে।

আসলে সে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়। কেউ তার উপর বিরূপ হয়ে উঠলে তার কষ্ট হয়।

নিতাইদা যে তার প্রেরণা, সেটা অবশ্য খুলে বলতে চায়নি। তার নিজের খরচ নেই, অন্তত যতদিন দোকান লেগে না যায়, তার খাওয়া পরার চিন্তা নেই, এই চা-এর দোকান থেকে নিতাইদা আর সারদা বউদির ভালই চলে যায়।

ঝুমি বলল, নিতাইদা, সারদা বউদিকেও খেতে বলতে হবে শরদিন্দু। আর কে কে বা‹ গেল দে দরকার। শরদিন্দুকে ব্যাগ থেকে একটি তালিকা বের করে বলল, আর কাকে বলার দরকার আছে দে তো।

শরদিন্দু লিস্ট পড়ে ওটা আবার ফেরত দিয়ে বলল, আসল লো‹কেরই নাম নেই। রাতুলকে বল না?

ঝুমি জিভ কেটে বলল, ইস্, কি যে হয় না আমার। তুই বিকেলে চলে যাবি। ওকে আসতে ব একদিন ছুটি নিলে কিছু হবে না। সারাদিন থাকতে হবে। আমার এত বড় উৎসবে সে না থাকলে চ আমি বুঝি না রাতুল আমার সঙ্গে এত কম কথা বলে কেন! বড্ড মুখচোরা। মাঝে মাঝে কেন যে ম হয় ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। কিছুতেই প্রাণ খুলে কথা বলে না।

হঠাৎ হঠাৎ তার কি যে আজকাল উৎকণ্ঠা দেখা যায়। মনে হয় বাড়ি গিয়ে দেখবে তার বড়ম বসে আছেন।

যত উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে তত তার চিন্তা বাড়ছে। ক'দিন থেকে তার রাতে ভাল ঘু হয় না। সে রাত জেগে রাতুলের সেই নীল রঙের ব্যাগটায় দুটো সাদা ফুলের বদলে একটা সাদা এ একটা গোলাপী ফুল তুলে দেবে বলেছে। সেই মতো সে রেশমি সুতোও আনিয়ে রেখেছে।

আজকাল রাতে ভাল ঘুম হয় না, কারণ বড়মামা এসে না আবার সব ভণ্ডুল করে দেন। উঁ কাজের চাপ এত বেশী যে ইচ্ছে করলেই হুট করে চলে আসতে পারেন না। এমনও ভাবতে পারে চিঠিতে কিছু লিখলে অবুঝ মা তার অশান্তি শুরু করতে পারে। বড়মামার আসারও দরকার আ যতদিন তিনি না আসবেন, ততদিন সে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। সবাই একজোট হয়ে তার বিরু দাঁড়ালে, সে যাবেটা কোথায়।

বড়মামা যদি বলেন, এ-সব পাগলামি ছাড়, আর অনাসৃষ্টি করে দরকার নেই, আমার সঙ্গে চ তাহলেই হয়েছে। বড়মামার মুখের উপর জীবনেও কথা বলেনি। এবারে বলবে ভাবতে গেলেই ধড়ফড় করতে থাকে।

আসলে সে তো চায় সুন্দর কিছু গড়ে তুলতে। দোকানের চেয়ারে বসে সে কত কিছু যে ভাব

ছোট মতো একটা লন থাকলে ভাল হয়। মানুষজন এবং শিশুরা এসে বসবে, খেলা কর চারপাশে লম্বা ঝাউগাছ লাগিয়ে দেবে। এমনকি পয়সা হলে, মামার কলকাতার বাড়ির মতো একটি সু টয়লেটের ব্যবস্থা রাখবে। যারা দূর পাল্লার বাস ধরতে আসবে, দরকারে তারা পোঁটলাপুঁটলি রেখে স্ন টান সেরে ঝোলভাত খেয়েও যেতে পারবে। পরিচ্ছন্ন একটি আবাস গড়ে তুলতে পারলে তারও খ্য বাড়বে। প্রতিবেশীরা বলবে, ঝুমির সত্যি মাথা পরিষ্কার, পড়াশোনার সব ব্যর্থতা তবে তার ঢেকে যা

সে কেন যে ডাকল, শরা এদিকে আয় তো।

শরা পাশের মাচানে বসেছিল—কি কি আইটেম হবে, কত কি লাগবে তার হিসাবে মগ্ন ছি

আমাকে ডাকছ।

ঝুমি বলল, একটা কাজ করবি? দেখে আসবি বাড়িতে কেউ বসে আছে কি না।

কে বসে থাকবে?

তুই গিয়ে দেখে আয় না।

এক পাক ঘুরে আসতে বেশী সময় লাগে না। দশ বিশ মিনিটের ব্যাপার। আসলে কে বসে থাক পারে এটাই তার মাথায় আসছে না। যত দিন যাচ্ছে, তত ঝুমিদি কেন যে এত মনমরা হয়ে যা

তবে সে সাইকেলে চেপে বের হয়ে গেল।

ফিরেও এল।

কেউ বসে নেই।

ব্রজসুন্দরী কি করছে! ঝুমি দোকানের বাইরে বের হয়ে এমন প্রশ্ন করল।

উনি তো বাড়ি নেই। নধর বারান্দায় শুয়ে আছে। আমাকে দেখে চোর ছ্যাচোর ভেবেছে। কি তেড়েও এসেছিল। তারপর কি ভেবে বারান্দায় উঠে আবার শুয়ে পড়ল।

দরজা খোলা না বন্ধ?

দরজা খোলা।

দরজা খোলা রেখে বেশীদূর গেলে পালের বউর কাছে যায়। সীমানা পার হলেই গদাই পাল তার বউকে নিয়ে থাকে। দ্বিতীয় পক্ষের বউ। তার সঙ্গেও বেশ ভাব আছে। তাকেও খেতে বলা হয়েছে। ব্রজসুন্দরী, ভালমন্দ রান্না হলে কখনও ডেকে বলে, একটা বাটি পাঠিয়ে দে বউ। সে বাড়ি থাকতে পারে না বলে দুদুমণির কথা বলারও লোক নেই। অবলা জীব, তার সঙ্গে কাঁহাতক কতক্ষণ কথা বলা যায়। পালের বউটি এখন দুদুমণির সম্বল।

তবে বারান্দায় কেউ বসে নেই, এই ভেবে সে কিছুটা হালকা বোধ করল। তারপরই মনে হল ব্রজসুন্দরী রাগ করে কোথাও বের হয়ে গেল না তো। সকাল থেকে ডাকপিওন সুবলসখার অপেক্ষায় বসে থাকে। রাস্তায়ও ছুটে যায়। অথবা কেউ যদি রিকশা থেকে নামে—তার বড় পুত্রটি চিঠি পেয়ে যদি চলে আসে—এইসব অপেক্ষাই ব্রজসুন্দরীকে সারাদিন উতলা করে রাখে। সকালে তো বলল, যাব যেদিকে দু'চোখ যায় বের হয়ে। আমার কি? যে যার মর্জি বুঝে চলে। বেঁচে আছি না মরেছি, কেউ খবর রাখে না।

ব্রজসুন্দরীকে বিশ্বাসও নেই। মেজাজ খাপ্পা হলে স্টেশনে চলে যেতে পারে। বিপুলদাকে টিকিট কেটে দিতে বলতে পারে। অবুঝ মানুষের যা হয়—কলকাতায় একা একাই চলে যেতে পারে।

ঝুমির আর দেরি করা চলে না।

তুই শরা বারান্দায় বসে নেই, দেখেই চলে এলি! দরজা খোলা, দুদুমণি কি করছে দেখে আসবি না?

শরার মনে হল, সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে। সে জিভ কেটে ফেলল।

ইস্ সত্যি তো।

ঝুমি আর দেরি করল না।

আমি যাচ্ছি। দুপুরে খেয়ে তুই চলে আসবি।

ঠিক আছে। তুমি যাও না।

শরার উপর ঝুমির সত্যি ভরসা আছে। শরা সাইকেলটা এনে তার হাতের কাছে এগিয়ে দিল। কুন্দমাঝির বউকে বলে যেতে হয়, তার ফিরে আসতে, দেরি হতে পারে। একেবারে দুপুরের খাওয়া সেরেও আসতে পারে। সে যাচ্ছে, সবাইকে এমন বলে সাইকেলের মুখ বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিল।

আর বাড়ি এসে হতবাক।

বড়মামা চেয়ারে বসে আছেন। সে যেন ভূত দেখছে।

সে পড়ে গেল বিপাকে।

তাহলে সব খবরই পেয়ে গেছেন তিনি। তার দোকানের রমরমার খবরও পৌঁছে যেতে পারে। ছোটমামা, মেজমামা ছুটে এল বলে। তার একগুঁয়ে জেদি স্বভাবের উপর সবাই জল ঢেলে দিতে পারে। বড়মামার অনুমতি ছাড়া কিছু হয় না বাড়িতে সে ভালই জানে।

তাকে দেখেই তিনি বললেন, তোরা কোথায় থাকিস। দরজা খোলা, কেউ নেই বাড়িতে, মা কোথায়?

বাড়িতেই ছিল।

ছিল তো গেল কোথায়।

ঝুমি পুকুরের দিকটায় ছুটে যাবে ভাবল। এত বেলা হয়েছে, দুদুমণি রান্নাবান্নার কোনও আয়োজনই করেনি। যদি পুকুরে ডুব দিতে যায়। যাওয়ার আগে ভাবল বারান্দায় এক বালতি জল রেখে যাওয়া দরকার। হাতমুখ ধোওয়ার জল। জামা-কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে বসলে এক কাপ চাও করে দিতে হবে। ভোররাতের ট্রেনে ঠিক এসেছেন। দশটা বাজে। স্টেশন থেকে রিকশায় বাড়ি ফিরে কাউকে দেখতে না পেলে রাগ হবারই কথা।

সে বলল, জামা-কাপড় ছাড়ুন। হাতমুখ ধোওয়ার জল থাকল, আমি দেখছি দুদুমণি কোথায় গেল।

মা নীলুর কাছ যায়নি তো?

যেতেও পারে। সে তো সকালে উঠেই দোকানে চলে গেছে। সঠিক জানেও না কিছু। দুদুমণি রাগ

দেখাবার আর সময় পেল না। যত বয়স বাড়ছে, তত ভীমরতি বাড়ছে। এখন বড়মামাকে যে সে কি বলে! সে দুদুমণির খোঁজে পুকুরের দিকে যেতেই শুনতে পেল—বড়মামা বলছেন, বাড়িটাকে যে তোরা সত্যি ছাড়াবাড়ি করে ছাড়লি—তুই নেই, মা নেই, দরজা খোলা। বাড়িটা থেকে কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে গেলে টের পাবি!

আর তখনই দেখল দুদুমণি বাঁশতলার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে, ঠিক শুনতে পেয়েছে মামার কথা।

চুরি ত গেছেই খোকা। তোমাদের সব চুরি গেছে।

খোকা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, মাকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

কোথায় গেছিলে, কেউ তোমরা বাড়িতে নেই।

গেছিলাম মরতে। এখন আমার বাবা মরণ ছাড়া আর কি আছে!

বড়মামা বুঝতে পারলেন, মা তার খুবই ক্ষুব্ধ।

ঝুমিকে কিছুটা দিশেহারার মতো দেখাচ্ছে। সে ঘরে ঢুকে দরজার পাল্লার পাশে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রজসুন্দরীও লাফিয়ে প্রায় ঘরে ঢুকে গেল। ঝুমির দিকে তাকিয়ে বলল, সাক্ষীগোপালের মতো দাঁড়িয়ে থাকলি কেন। কানু-বেণুকে ডাক। বলে আয় খোকা এয়েছে। তারপর বারান্দায় মুখ বার করে বললেন, খোকা তুই আমার কি চিঠি পাস না। এত চিঠি, একটার জবাব নেই! বেঁচে আছি কি মরেছি চিঠি দিয়ে খোঁজ নিস না।

কবে চিঠি দিলে! বাড়ির সবই চুরি গেছে, জানি না তো।

গেছে, সব গেছে।

ঝুমির বড়ই সঙ্কট। জীবনের এত বড় সঙ্কটে তার পাশে কেউ নেই। সে আড়ালে দাঁড়িয়ে বড় অসহায় বোধ করতে থাকল। মামারা কি করে খবর পেয়ে চলে এসেছে। যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে খবর। নীলুমাসিও বোধহয় চলে আসবে। ঝুমির মাথা ঝিম ঝিম করছে।

ঝুমি আসামীর কাঠগড়ায়।

ব্রজসুন্দরী বলল, জিজ্ঞেস কর তোমার ভাইদের। তারা কি বলে আগে জেনে নাও। ঝুমি যখন তখন আমার মাথা কাটছে।

কি হয়েছে রে বেণু!

আমরা জানি না, আমরা কিছু বলব না দাদা। প্রতিবেশীদের ডেকে তুমি জেনে নাও। আমাদের মান-সম্মান সব গেছে। মুখ দেখাতে পারি না। তোমার বউমারা আর বাড়িটায় আসে না। বাড়িটা উচ্ছন্নে গেছে।

ঝুমির কান্না পাচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে সে তার দোকানে নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এত জ্বালা, এত নিন্দামন্দা—সে মেয়ে বলেই, সে কেন এভাবে দিন দিন অপমান হজম করে যাবে, তার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল, না বড়মামা, তোমার, দুদুমণির তোমাদের কারও বিন্দুমাত্র মর্যাদা নষ্ট আমি করিনি। কোনও তোমাদের অসম্মান করিনি।

কিন্তু সে কিছু বলতে পারছে না। সে কেমন বোবা হয়ে গেছে।

বেণু বলল, মাকে নিয়েও টানাটানি। আর কত নিচে নামাবি।

কি হয়েছে বলবি তো!

ব্রজসুন্দরী টি স্টল। বড় বড় হরফে সাইনবোর্ড লেখানো হচ্ছে শুনতে পেলাম দাদা।

ব্রজসুন্দরী আরেক ধাপ এগিয়ে। বারান্দায় ছুটে গিয়ে বসে পড়ল। হা হুতাশ করার মতো বলল, আমি আর মুখ দেখাতে পারি না রে বাবা। আমার একটা তুই ব্যবস্থা কর।

খোকা ওরফে নিখিলেশ কিছুই বুঝতে পারছে না। মা বলছেন, চুরি গেছে সব। বেণু বলছে, ব্রজসুন্দরী টি স্টল—সব কেমন তার তালগোল পাকিয়ে গেছে। বাড়িতে এত অশান্তি—সে জানেই না। কাজের চাপে বিন্দুমাত্র তার অবসর নেই, তার কোনও ছুটিও নেই, নিজের দায়িত্ব সে নিজেই বহন করে চলেছে, সব মানুষকেই তাই করতে হয়। বছরে দু-বছরে সব কাজ দু-হাতে সেরে তবেই সে আসতে পারে—এসে যদি এত অশান্তির মধ্যে পড়তে হয় কাঁহাতক মাথা ঠিক থাকে।

নিখিলেশ মাকে ধমক না দিয়ে পারল না—কি হয়েছে, বলবে তো। চুরি গেছে, কি চুরি গেছে, থানায় ডায়েরি হয়েছে কি না কিছুই বলছ না—কেবল কপাল চাপড়াচ্ছ। লোকে দেখলে কি ভাববে!

লোকে যা ভাবার ভেবে ফেলেছে, ভাবার আর কিছু বাকি নেই রে বাবা। পাত্রপক্ষের কাছে আর কোন্ মুখে ঝুমিরে নিয়া দাঁড় করামু। তোকে এত করে লিখলাম, তুই একটা জবাব পর্যন্ত দিলি না!

নিখিলেশ ডাকল, এই ঝুমি, আমাকে এক গ্লাস জল দে।

ঝুমি সারা শরীর ঢেকে আজ এক অসহনীয় অবস্থায় জলের গ্লাস নিয়ে মামার কাছে দাঁড়াল। পাছে মামা তার মুখের দিকে তাকান—সেজন্য মুখ নিচু করে রেখেছে। তার উদগত অশ্রু চাপবার এই নিরন্তর প্রচেষ্টা যেন বিস্ফোরণের আকার নিতে পারে। ধরা পড়ার ভয়ে সে আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল।

নিখিলেশ বলল, চিঠি পাইনি, কি জবাব দেব! কবে আমি চিঠি লিখি। তোমাদের দেখতে ইচ্ছা হলে, যখন পারি না, তখন সব কাজ ফেলে এখানে চলে আসি। দু-চারদিন থেকে যাই। বাবুর একটা অবশ্য চিঠি পেয়েছিলাম। বাড়ি আসব আসব করে, চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। চিঠিতে এমন কোনও বড় দুঃসংবাদও ছিল না, ও বোধহয় লিখেছিল, ঝুমি বাঁশঝাড় সাফ করে দিচ্ছে। রাস্তার মোড়ে দোকান তুলছে। জমিটার কথাও লিখেছিল, বড় রাস্তার ধারের জমি, যদি ঝুমি দখল করে নেয়, এই রকমের খুচরো খবর ছাড়া আর কিছুই ছিল না চিঠিটাতে। গুরুত্ব দেবার মতো কোনও খবরই ছিল না। ঝুমি দোকানঘর করছে সে তো আনন্দের। ওর দোকানের শেষপর্যন্ত কতটা কি হল দেখতেই চলে এসেছি। এত বড় খবরে মনটা এত ভরে গেছিল, কবে যাব, নিজের চোখে দেখব—এই আশাতেই চলে এসেছি। মনটা এত প্রসন্ন হয়ে গেল, না এসে থাকতে পারিনি।

তুই কি বলছিস খোকা? তোর মন প্রসন্ন হয়ে গেল—আর কিছু তোর হল না। তোর বাবার কথা মনে হল না। তিনি বেঁচে থাকলে এত বড় অপমান হজম করতেন! সোমত্ত মেয়ে, এই তো সেদিন...।

বেণু বলল, দাদা, বাড়ির মান-সম্মান—এমন সোমত্ত মেয়ে রাস্তার ধারে চা বিক্রি করবে।

ব্রজসুন্দরী আরও ক্ষেপে গেল। বলল, মান-সম্মানের খ্যাতা পুড়িয়ে লোক হাসাচ্ছে। আর তুই...।

নিখিলেশ বলল, মান-সম্মান নিজের কাছে মা। ওসব নিয়ে ভেবো না। মেয়েটা এতদিন কত বড় অপমানের বোঝা নিয়ে হাঁটছিল। আমরা কিছুই করতে পারছিলাম না। যা হোক নিজের বোঝা নিজে নিতে শিখেছে। মনটা যে খুবই প্রসন্ন হয়ে গেল মা। দোকানটা দেখারও ইচ্ছে হল, চলে এলাম।

ঝুমি আর পারে! সে বসে পড়েছে। আনন্দে তার দুই চোখ থেকে উদগত অশ্রু বের হয়ে আসছে। সে দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্না সামলাবার চেষ্টা করছে।